ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৫৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০—

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

পৌষ—১৩৫৯

দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

গীতায় অদ্বৈতবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে, বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার প্রথম শুভ উন্মেষ থেকেই, নিগূঢ়তম দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থাদি বিরচিত হয়েছে, যাদের তুলনা জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল। আমাদের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-বেদান্ত-প্রমুখ দর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি, স্মৃতি, পুরাণ, শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি ভারতবাসীদের শাশ্বত জ্ঞানপিপাসা ও সত্যানুভূতির অমর সাক্ষীরূপে বিরাজ করছে। কিন্তু এরূপ অসংখ্য, অনুপম গ্রন্থরাজির মধ্যেও, মাত্র একটী গ্রন্থই যে যুগে যুগে ভারতবাসীর হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে, চির-অম্লান শতদলের মতই শাশ্বত শোভায় প্রস্ফুটিত হয়ে থাকবে—তা' সত্যই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই সম্ভব হয়েছে ভারতের চির-আদরণীয়, জগতে অতুলনীয় দর্শন ও ধর্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বারা। উপনিষদ, গীতা ও বেদান্ত দর্শন—এই তিন শাস্ত্রকে বলা হয় "প্রস্থান-ত্রয়ী" অথবা মুক্তিলাভের তিনটী উপায় স্বরূপ। কিন্তু এদের মধ্যেও, গীতার প্রভাবই আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক, নিঃসন্দেহ। সমাজের উচ্চ-নীচ প্রত্যেক স্তরে এই গীতামৃত-রস-ধারা প্রবেশ করে সংসার-তাপক্লিষ্ট, মুমুক্ষুগণকে সঞ্জীবিত ও তৃপ্ত করেছে। দর্শন-জিজ্ঞাসা, ধর্মালোচনা, প্রাত্যহিক জীবনের নীতিতত্ত্ব—সকল দিক্ থেকেই এই অপূর্ব গ্রন্থ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সে জন্য পারিভাষিক দিক্ থেকে গীতা "শ্রুতি" পদবাচ্য না হয়ে "স্মৃতি" পদবাচ্য হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে 'Hindu Scripture' বা হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থ বলতে গীতাকেই বোঝা যায়। সত্যই পূর্ববর্তী বেদোপনিষদের এবং পরবর্তী বেদান্তাদি দর্শনের সারবস্তু আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি এই একটী গ্রন্থেই এরূপ সরল, সুমধুরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যে, গীতা স্বভাবতঃই 'ভারত দর্শন-সার' রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে

মধ্যেও গীতাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। বহু পাশ্চাত্য মনীষী অকুণ্ঠচিত্তে গীতার নিকট তাঁদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করে গেছেন। সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে গীতাই সর্বপ্রথম ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Chartes Wilkins কর্তৃক "The Song of the Adorable One" এই নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। তারও বহুপূর্বে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও পরিব্রাজক আল্-বারুণী তাঁর প্রসিদ্ধ পার্সী ভারত-বিবরণীতে ("Tahkik-i-Hind" বা "An Enquiry into India") গীতা উদ্ধৃত করেছেন।

ভারতীয় পণ্ডিতগণও যুগে যুগে গীতাকেই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-গ্রন্থ রূপে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অন্য কোনো ভারতীয় গ্রন্থেরই এরূপ অসংখ্য সংস্করণ, টীকা-ভাষ্য, ব্যাখ্যা, অনুবাদ প্রভৃতি হয়নি। একমাত্র লণ্ডনস্থ India Office Libraryতেই গীতা সম্বন্ধীয় সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা সহস্রাধিক। ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ দার্শনিকবৃন্দই গীতার ভাষ্য রচনা করে স্ব স্ব মত প্রপঞ্চিত করেছেন। এমন কি, গীতায় প্রপঞ্চিত ঈশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী শঙ্করাচার্যও গীতাকে উপেক্ষা করতে সাহসী না হয়ে, গীতার ভাষ্য রচনা করে, গীতা যে অদ্বৈতমতানুসারী, তা' প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। এরূপে, প্রখ্যাত পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রপঞ্চক অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক, দ্বৈতবাদী মধ্ব এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ—প্রত্যেকেই গীতা ভাষ্য রচনা করেছেন (নিম্বার্কের ভাষ্য অবশ্য বর্তমানে অপ্রাপ্য)। এতদ্ব্যতীত যমুনাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশবভট্ট (নিম্বার্ক সম্প্রদায়), কল্যাণভট্ট, আঞ্জনেয়, জয়রাম (কাশ্মীরি শৈব-সম্প্রদায়), বলদেব বিদ্যাভূষণ (অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্প্রদায়), অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভক্তিবাদী শ্রীধর স্বামী, কাশ্মীরি-শৈব-সম্প্রদায়-ভুক্ত রাজানক রামকণ্ঠ, প্রখ্যাত আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন প্রমুখ বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর গীতাভাষ্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

গীতার অসংখ্য ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম। শঙ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষ রামানুজের গীতা-ভাষ্যও বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। বেদোপনিষদের যুগ থেকেই ভারতে দু'টী বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায়—একত্ববাদ, (Monism বা Absolutism) এবং একেশ্বরবাদ (Monotheism)। অতি সংক্ষেপে, প্রথম মতানুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র, অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন; শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সাধক। দ্বিতীয় মতানুসারে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, এই ত্রিতত্ত্ব সমভাবে সত্য; জীবজগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র নয়; জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন; জীব ব্রহ্মের চিরসেবক ও নিত্যদাস বলে ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হ'তে পারে না; ভক্তিই মুক্তির সাধন। এই দু'টী দার্শনিক মতবাদের প্রধান প্রপঞ্চকরূপে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁরা দুজনে দু'দিক্ থেকে কিভাবে গীতাকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তা' অতি কৌতূহলোদ্দীপক, জ্ঞানপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য ভাষ্যগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদেরই পুনঃ প্রপঞ্চনা মাত্র। সেজন্য গীতায় অদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে কি না, এই আলোচনা প্রসঙ্গে, গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহের মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের গীতাভাষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবরণী প্রদান করা হচ্ছে।

ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ গীতায় সমর্থিত হয়েছে, কি না। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাদ শঙ্করের অদ্বৈতমতের একটী প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, শঙ্করের মতে, কেবল ব্যবহারিক স্তরেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের (Personal Godর) প্রশ্ন উঠে—যে স্তরে জীব-জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট কার্যরূপে এবং জীব ঈশ্বরোপাসকরূপে ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে, সৃষ্টকার্য জীব-জগতের ন্যায় সৃষ্টকারণ ঈশ্বরও বাধিত ও মিথ্যা হয়ে যান, কেবলমাত্র নির্গুণব্রহ্ম বা পরব্রহ্মই বিরাজ করেন। গীতার বহু স্থলে, প্রায় পঞ্চান্নবার, "ব্রহ্ম" শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই "ব্রহ্ম" শব্দের আক্ষরিক বা শাঙ্করীয় অর্থ গ্রহণ করলে, শঙ্করের নিজেরই বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেজন্য, শঙ্কর স্বমত রক্ষার্থে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই

শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাসলাভ দুষ্কর, কর্মযোগনিষ্ঠ মুনিই অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ("ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি")। কিন্তু এই অর্থ শঙ্করমতবিরোধী হওয়ায়, শঙ্কর এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "সন্ন্যাস" বলে গ্রহণ করেছেন ("সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে")। অর্থাৎ, তাঁর মতে, এই শ্লোকটীর অর্থ হ'ল এই যে, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হ'লে, জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানমূলক কর্ম-সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই অর্থ শ্লোকের আক্ষরিক অর্থের বিপরীত। রামানুজ অবশ্য এক্ষেত্রে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "আত্মা" বলে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ এবং আত্মলাভ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি ব্রহ্মে সকল কর্ম নিবেদন করে' নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি পাপলিপ্ত হন না। এস্থলে, শঙ্কর ও রামানুজের মতে, "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ যথাক্রমে "ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি"।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বল্ছেন: "মহদ্ ব্রহ্মই আমার যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা"। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেই, এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "প্রকৃতি।"

চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শঙ্কর স্বীয় মতানুযায়ী ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, "আমি অমৃত, অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" শঙ্করের মতে, এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "ঈশ্বর-শক্তি" অথবা সবিকল্প বা "সোপাধিক ব্রহ্ম" অর্থাৎ ঈশ্বর এবং "আমি" শব্দের অর্থ "নিরুপাধিক ব্রহ্ম" বা "পরব্রহ্ম"। রামানুজের ব্যাখ্যানুসারে, "ব্রহ্ম" ও "আমি" শব্দ যথাক্রমে "জীব" ও "কৃষ্ণ" বা পরমেশ্বর দ্যোতক। এই শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের সঙ্গে "অমৃত" ও "অব্যয়" বিশেষণ সংযোজিত থাকায়, "ব্রহ্ম" শব্দের "সগুণ ব্রহ্ম" বা শাঙ্করীয় অর্থে "ঈশ্বর" অর্থ-গ্রহণ অনুচিত বলে মনে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকেও একইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মের আশ্রয় ও আধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে: "যা জ্ঞাতব্য বস্তু, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, তা' তোমাকে বলব: তা' হ'ল অনাদি মৎপর ব্রহ্ম ("অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম")। শঙ্কর এস্থলে "অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম" এই পংক্তিটীর "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" এই পাঠ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ, অনাদি, পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য বস্তু ও অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ। রামানুজ অবশ্য "অনাদি মৎপরং" পাঠই গ্রহণ করেছেন।

উপরের এই দু' একটী দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যাবে যে, গীতায় শাঙ্করীয় অর্থে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদ করা হয়নি, এবং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে পারমার্থিক স্তরে বাধিত বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করে, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতাও স্বীকার করা হয়নি। উপরন্তু, সমগ্র গীতাতে, ইংরাজীতে যাঁকে বলে Personal God—সেই ভক্তের ভগবানেরই জয়গাথা গীত হয়েছে।

মায়াবাদ

শঙ্করের মায়াবাদও গীতায় প্রপঞ্চিত হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবদ্গীতায় পাঁচটী স্থানে "মায়া" শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং শঙ্কর সাধারণতঃই সেই সকল স্থলে স্বমতের মূলীভূত মায়াবাদের প্রপঞ্চনা করতে প্রচেষ্টা করেছেন। যথা, চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বল্ছেন: "আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও, স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে, আত্ম-মায়ায় আবির্ভূত হই।" ("সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া")। অবতারবাদবিরোধী শঙ্কর এটী এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:—"...সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়াত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ"—অর্থাৎ, মায়াশক্তি বা প্রকৃতির সাহায্যে পরব্রহ্ম দেহধারী হয়ে যেন ভূতলে জাত হন—এরূপ প্রতীতি হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকলই মিথ্যা মায়া মাত্র, ব্রহ্মের অবতাররূপে জন্ম পারমার্থিক সত্য নয়। এর পরের সেই সুবিখ্যাত শ্লোকও (৪-৭)—

> "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"—

শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন—"তদা আত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া।"

এরূপে দু'বার "ইব" এবং একবার "মায়য়া" শব্দ যোগ করেই কেবল শঙ্কর অতি কষ্টে নিজের মায়াবাদ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন সত্য; কিন্তু মূলের অর্থ তাতে রক্ষিত হয়নি।

নিঃসন্দেহ। রামানুজের অবশ্য এরূপ স্থলে কোনই অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, কারণ তিনি ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসী। তাঁর ও মধ্বের মতে, এই শ্লোকে "মায়া" শব্দের অর্থ "জ্ঞান", এবং "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ "স্বভাব"। বল্লভ মতানুসারে, "মায়া" শব্দ "শক্তি"-দ্যোতক।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোক ব্যাখ্যা কালেও, শঙ্কর "ইব" শব্দ সংযোগে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে: "ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় সর্বভূতকে পরিভ্রমণ করাচ্ছে।" শঙ্করের ব্যাখ্যা এরূপ:—"যন্ত্রারূঢ়ানি অধিষ্ঠিতানীব ইতি ইব শব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃত-পুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ, যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার মতই ঈশ্বর জীবগণকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে নাচাচ্ছেন ও বিভ্রান্ত করছেন। এস্থলে "মায়া" শব্দ "বিভ্রান্তি", "ছলনা" বা "প্রতারণা" এই শাঙ্করীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রামানুজের মতে, "যন্ত্রারূঢ়ানি" শব্দের অর্থ "দেহেন্দ্রিয়াবস্থং প্রকৃত্যাখ্য যন্ত্র-মারূঢ়ানি" এবং "মায়য়া" শব্দের অর্থ "সত্ত্বাদিগুণময়্যা মায়য়া।" অর্থাৎ অন্তর্যামী ঈশ্বর দেহবদ্ধ জীবকে সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা চালিত করছেন।

এরূপে শাঙ্করীয় মায়াবাদেরও কোনো প্রমাণ ভগবদ্গীতায় নেই। গীতায় "মায়া" শব্দের অর্থ "প্রকৃতি", যেমন সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে এই মায়াকে "গুণময়ী" বলা হয়েছে। এই "মায়া" প্রকৃতি বা অচিৎ-শক্তির সাহায্যে, ঈশ্বর অবতাররূপ ধারণ করেন (৬-৬); এই ত্রিগুণাত্মিকা "মায়াই" ঈশ্বরের স্বরূপ জীবের নিকট থেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে (৭-২৫) এবং জীবের জ্ঞান অপহরণ করে রেখেছে (৭-১৫); ঈশ্বরের ভজনা ভিন্ন এই "মায়াই" দুরতিক্রমণীয় (৭-১৪)। শঙ্করও অবশ্য "মায়া" শব্দকে "প্রকৃতি" অর্থে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর মতানুসারে, এই প্রকৃতি মিথ্যা মাত্র এবং জগৎ সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম জীবকে ছলনাই করছেন মাত্র। কিন্তু গীতায় "প্রকৃতিকে" সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, মিথ্যা বা ছলনা অর্থে নয়। ঈশ্বরের ব্যক্তরূপ (কিন্তু মিথ্যা নয়) প্রকৃতি বা জগতে ভুলে, অজ্ঞ জীব ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়—এইটাই কেবল গীতার বলবার উদ্দেশ্য।

মোক্ষ

ভগবদ্গীতায় মুক্তি বা মোক্ষকে চরম লক্ষ্য বা জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হ'লেও মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ বর্ণনাই অধিক পাওয়া যায়। যেমন, মুক্তির অর্থ মৃত্যু, পুনর্জন্ম ও দুঃখক্লেশাদি থেকে পরিত্রাণ (৪-৯) ইত্যাদি। তাছাড়াও বলা আছে যে, মুক্তি ব্রহ্মের নিকট গমন "গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" (৮-২৪), এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি: "স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি" (৫-২৪)। কিন্তু এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির অর্থ নিয়ে বেদান্ত দর্শনে যে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার উদ্ভব হয়েছে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়, অথবা কেবল ব্রহ্ম সদৃশই হয় মাত্র—সে বিষয়ে কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার গীতায় নেই, যদিও একস্থানে বলা আছে যে মুক্ত জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয় বা ঈশ্বরসদৃশ হয় "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" (১৪-২)। শঙ্কর অবশ্য "সাধর্ম্য" শব্দকে "মৎস্বরূপতা" বা মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা এবং রামানুজ "মৎসাম্য" বা মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের সদৃশতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুক্তি অবস্থা সম্বন্ধে এরূপে বিশেষ বিবরণী না থাকায়, শঙ্কর ও রামানুজের অনায়াসে স্ব স্ব মত পোষক ব্যাখ্যা গ্রহণে বাধা ঘটেনি।

সাধন

সাধনাবলীর দিক থেকেও, শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনো প্রমাণ গীতায় নেই। উপরন্তু, গীতায় নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রপত্তি এবং ভগবৎপ্রসাদকে মুক্তির সাধন বা উপায়স্বরূপ বলে বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা, পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্মযোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন। এই একই অধ্যায়ের ১২ শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্মফল ত্যাগ করে শাশ্বত শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়েও ৫৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যিনি তাঁকেই আশ্রয় করে সর্বদা সবকর্মে লিপ্ত থাকেন, তিনি শাশ্বত অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন। গীতায় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বারংবার, বিশেষ ভাবে নিষ্কাম কর্মযোগকে ঈশ্বর-লাভের উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। পুনরায়, জ্ঞানকেও

মুক্তির সাধনরূপে গ্রহণে গীতাকার পশ্চাৎপদ হয় নি। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি শ্রীভগবানের দিব্য জন্মকর্ম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি ভগবান লাভ করেন। একইভাবে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিকেও মোক্ষসাধন বলে প্রপঞ্চনা করা হয়েছে। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে পরমপুরুষ যে অনন্যাভক্তির দ্বারাই লভ্য, তা' স্পষ্ট বলা আছে। এরূপে নিষ্কামকর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-সমুচ্চয়বাদই গীতার অভিপ্রেত, বলে মনে হয়।

শুদ্ধজ্ঞানবাদী শঙ্করকে সেজন্য তাঁর গীতাভাষ্যে বহু স্থলেই কষ্ট কল্পনা, অহেতুকী শব্দ-সংযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। গীতায় মোক্ষে অধিকারের দিক্ থেকে নিষ্কামকর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোনো তারতম্য করা হয় নি; বরং কর্মযোগকে কর্ম-সংন্যাস বা কর্মত্যাগ অপেক্ষা শ্রেয় পর্যন্ত বলা হয়েছে (৫-২)। এবং গীতার শেষে, শ্রীভগবানের সর্বগুহ্যতম, পরমহিতকর, পরমবাক্য রূপে বলা হয়েছে যে, যিনি ঈশ্বরভক্ত ও সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে, ঈশ্বরশরণাগত হন, তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর পাপমুক্ত করেন (১৮-৬২,৬৬)। তা সত্ত্বেও, শঙ্কর মোক্ষবিষয়ক শ্লোক ব্যাখ্যা-কালে, সেগুলি যে কেবল সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ, কর্মত্যাগী, সন্ন্যাসিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এরূপ অন্যায় প্রভেদ করেছেন। যথা, পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভাষ্যে বলছেন: "সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা, কর্মযোগশ্চ ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানপ্রাপ্তিসর্বকর্মসংন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি" (৫-২৭)। অর্থাৎ, তাঁর মতে, কেবল জ্ঞান ও কর্মত্যাগই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, কর্ম নয়—কর্ম কেবল চিত্তশুদ্ধিপূর্বক জ্ঞানোদয়ের সহায়ক মাত্র। কিন্তু গীতার মূল পাঠ ধরলে, এই মতের পোষকতা পাওয়া যায় না। উপরন্তু, নিষ্কাম কর্মযোগকেই গীতার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য বস্তু বলা চলে। কিন্তু শঙ্কর যে যে শ্লোকে কর্মযোগ নিঃসন্দেহে বিহিত হয়েছে, সেই সকল শ্লোকে "অজ্ঞ" এই বাক্যসংযোজন করে, সেগুলি যে কেবল সাধারণ জনের প্রতিই প্রযোজ্য, তা প্রমাণ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন ("অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ ইতি সাংখ্যানাং পৃথক্ করণাদজ্ঞানানামেব হি কর্মযোগঃ ন জ্ঞানিনাম্" ৩-৫)। এবং যে যে ক্ষেত্রে কর্মযোগকেই "ত্যাগ" বলা হয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি সেই বর্ণনাকে স্তুতিমূলক ও গৌণার্থে গ্রহণীয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন ("ত্যাগী সত্ত্বাভিপ্রায়েণ" ১৮-২)।

গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মত ভক্তিযোগমূলক শ্লোকগুলির অর্থ ব্যাখ্যা কালেও শঙ্করকে সমান অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে, তিনি হয় নিরুপায় হয়ে, অতি স্বল্প কথায় "ভজনম্ ভক্তিঃ" (৮-১০) বলে কোনো ব্যাখ্যা না করে (৯-১৪,২৬,২৯ ইত্যাদি) সেরেছেন; নয় "ভক্তি" শব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। (৮-২২; ১৮-৫৫,৫৫ ইত্যাদি)। যথা, অষ্টম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে "ভক্ত্যা অনন্যয়া" বা অনন্যা ভক্তির তিনি এই অর্থ করেছেন: "স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়াঽনন্যয়াঽত্ম-বিষয়য়া", অর্থাৎ, পরমপুরুষ অনন্য আত্মজ্ঞান দ্বারাই লভ্য।

এই দু'একটী দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হ'বে যে, এরূপে স্বীয় শুদ্ধজ্ঞানবাদ রক্ষা করতে শঙ্করকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, এবং অকারণ শব্দ-সংযোজন, এক শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্ আরেক শব্দের একীকরণ, মুখ্যার্থকে গৌণার্থে গ্রহণ প্রভৃতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। রামানুজের ব্যাখ্যা এসব ক্ষেত্রে অনেক অধিক মূলানুসারী ও গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঠিক কোন্ দার্শনিকতত্ত্ব এবং ঠিক কোন্ একটী সাধনপ্রণালী প্রপঞ্চিত হয়েছে, সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে, এতে শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের স্থান নেই। গীতার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অদ্বৈতবাদি-গণের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একেবারেই নন। তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম "পুরুষোত্তম" (১৬-১৮), তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (১৪-২৭)। এই পুরুষোত্তম নির্গুণ হয়েও সগুণ (১৩-১৪), বিশ্ববহির্ভূত হয়েও বিশ্বলীন (১০-৪৩), অনন্ত অসীম হয়েও হৃদিস্থিত (১৫-১৫, ১৩-১৭), অজ অব্যয় হয়েও অবতার রূপে অবতীর্ণ (৪-৬)। সমগ্র জীবজগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও, অংশ-রূপে ভিন্ন (১৫-১৭)। এরূপে গীতার "পুরুষোত্তম" অদ্বৈত-বেদান্ত মতানুসারী, শুদ্ধজ্ঞানলভ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute নন; বৈষ্ণব বেদান্ত মতানুসারী কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, ভগবান্ বা Prsonal

God—যাঁর স্থান, কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মেরও উপরে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবিখ্যাত "Essays on Gita"তে সত্যই বলেছেন--

"*But the Gita* is going to represent Iswara, *the Purushottama*, as higher even than the still and immutable Brahma and the loss of the ego in the Impersonal comes only as a great and initial step towards Union with Purushottama. This is the supreme, divine God, who possesses both the infinite and the finite, and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences are united."

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর মত বিরোধী বলে, শঙ্কর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁর গীতাভাষ্যে অদ্বৈতমতবাদ স্থাপনে সমর্থ হন নি। অপর পক্ষে, এই উভয় দিক্ থেকে শঙ্করের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হলেও, বৈষ্ণব-বৈদান্তিক রামানুজের গীতাভাষ্য বহুলাংশে অধিক মূলানুসারী ও প্রামাণিক।

পরিশেষে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। যুগে যুগে বহু বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকার গীতার বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন সত্য, কিন্তু গীতার প্রধান বাণী সম্বন্ধে সকলেই একমত। সেই বাণী ভারতেরই চিরন্তনী বাণী: "আত্মানং বিদ্ধি"— "আত্মাকেই জান"। এই আত্মতত্ত্বই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতা বলেছেন যে, আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি ব্যতীত মানবের মুক্তি নেই; এবং এই উপলব্ধি স্বপ্রচেষ্টালভ্য— সাধনা ব্যতীত ঈশ্বরকৃপালাভও অসম্ভব, সেজন্য ভগবৎ-প্রসাদধন্য জীবও প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের মুক্তি-সাধন করেন। আত্মসাধনা বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সেই ওজস্বিনী বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, শেষ করছি :—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥" (৬-৫,৬)

"আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করবে; আত্মাকে অবসন্ন বা নিম্নগামী করবে না। কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। যে আত্মা আত্মা দ্বারা জিত হয়েছেন, সেই সংযত আত্মাই আত্মার বন্ধু; কিন্তু যে আত্মা আত্মা দ্বারা জিত হন নি, সেই অসংযত আত্মাই আত্মার শত্রু।"

ইঞ্জিন

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

পিঁপড়ার ঝাঁকের মত লোক চল্‌ছে সাধুর কাছে। কেউ দেখ্‌তে, কেউবা ওষুধের জন্যে।

সাধু দেখ্‌লে পুণ্য হয়। মনের মধ্যে আমারও নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। কা'কেও কিছু জিজ্ঞেস না করে গা' ভাসিয়ে দিলাম সেই জনস্রোতে।

অবাক্ হ'য়ে গেলাম মরা লোককে তাজা দেখে— অবশ্য নিজেকে সে লুকিয়ে রাখবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও ক'রেছে! মাথায় বড় জটা, মুখে দাড়ি ও পরণে গেরুয়া। কিন্তু যেটার উপরে তার হাত নেই সেই চোখ দু'টা দেখেই তা'কে চিন্‌তে পারলাম আমি।

ওর নাম নীরেন। সংসারে আপনার বলতে ওর বিশেষ কেউ ছিলনা, শুধু ছিলাম আমরা কয়েকজন কলেজীয় বন্ধু।

জাপানী বোমার ভয়ে বর্ম্মা থেকে যা'রা তা'দের যা' কিছু সম্বল নিয়ে আস্‌ছিল ভারতে—তা'দেরকে পথের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সরকারী অফিসার নিযুক্ত হ'য়েছিল সে। তখন রক্ষক হ'য়ে ভক্ষকের কাজ করে অনেক টাকা-কড়ি নিয়ে উধাও হ'য়েছিল, সে-খবরও খবরের কাগজে আমরা পড়েছি। তারপর ওয়ারেন্টের কবলে না যাবার জন্যে গেল একেবারে যমের বাড়ী—সে খবরও সরকারী খাতায়

লেখা। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়েছিলাম নীরেনের আত্মহত্যার খবর শুনে।

জনতার মধ্যে ডুবে না গিয়ে একটু দূরে দাঁড়ালাম নীরেনের দৃষ্টিকে আমার দিকে টানবার জন্যে। চেষ্টা ব্যর্থ হল না আমার। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে চিন্‌ল আমাকে। চোখ এবং হাতের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বল্ল—জনতাও তাকাল আমার দিকে।

ওদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে তবুও লোকের ভিড় কমে না। অন্ধকার ভেঙ্গে গেঁয়ো মেঠো-পথে বাড়ী ফিরতে হবে সে চিন্তাই যেন কারো নেই। কাজ শেষ হবে, তবেই যাবে এই ভাব।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের আরও এক বিপুল অভিনেতা নীরেনের এই নাটকীয় ভাব। কলেজের ষ্ট্রাইকের নেতা, রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে পয়সা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া, মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা না-বলার চির-অভ্যাসী এই নীরেন রাতারাতি সাধু বনে গেল!

রাত আন্দাজ আটটার সময় শেষজন বেরিয়ে গেল নীরেনের সঙ্গে কথা বলে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

অন্ধকারের রাত। তবুও মাঠের মধ্যে বলে বোধ করি—অন্ধকারের আধিপত্য অনেকটা কম। চারিদিক ভাল করে দেখে নীরেন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে—আরে, বিকাশ—তুই! ঘরে চল। তা' এখানে কেন, কোথা থেকে এলি? কেমন আছিস্? কোথায় আছিস্? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করল সে।

উত্তর দিলাম এবং জিজ্ঞেসাও করলাম, "তোর দেখছি নতুন জীবন! আবার কোনও মৎলব আছে নাকি?"

আকাশের দিকে চোখ বুজে হাত জোড় করে জিব বের করলে নীরেন। একদিন মৎলবের বশবর্ত্তী হ'য়ে যা' ক'রেছি তারই পাপ কাটাতে আমার এই নতুন জীবন। তোকে বলব সব। চল্ বস্‌বি—তাড়া নেই তো?

তাড়া আমার ছিল না।

তাঁবুতে ফিরলাম রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। কথা দিতে হ'ল, যে কয়েকদিন ওখানে থাকব রোজই যাব তা'র কাছে।

রাত্রে চোখে একটুও ঘুম এলো না। শুধু নীরেনের কথাগুলোই আমার মনে কিল্‌বিল্ করতে লাগল। তবুও তো তা'র সব কথা শোনা হয়নি। যা' শুনেছি, তা' হয়েছে ওর জীবনের হেড-লাইনগুলো। বিস্তারিতভাবে বলবে ক্রমে ক্রমে, তাই ওর আশ্রমে যাওয়ার জন্যে আমার নিমন্ত্রণ।

আশ্রম মানে ওরই টাকায় কাটা প্রকাণ্ড একটা দীঘি। উত্তর পাড়ে একখানি খড়ের কুঁড়ে ঘর। আগে থেকেই বটগাছও একটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বটগাছটার মাথায় গেরুয়া রংয়ের নিশানে লেখা "সেবাই আমার ধর্ম্ম।" পশ্চিম পাড়ে একশো গরুর গোয়াল ঘর, অদূরে ওদেরই বর্ষাকালীন খাবার পঁচিশটা পাহাড়ের মত উঁচু খড়ের পালা। অপর দুই পাড়ে বারোমাসী তরিতরকারির গাছ। দীঘির বুকে ডালিমের রসের মত টল্‌টলে জল—এখানে সেখানে ছোট-বড় মাছের উল্লাস, গরু ও বাছুরের হাম্বারব ও ছুটাছুটী, খড়ের পালার নানা দেশের নানা রকম, পাখীদের কথাবার্ত্তা ও মারামারি যেন আশ্রমের অষ্ট-প্রহরের কীর্ত্তন গান।

জনপদের কোলাহল থেকে দূরে খোলা-মেলা মাঠের বুকে একখানি কুঁড়ে ঘরের এই আশ্রম। মাথার উপরে নীল আকাশের চাঁদোয়া, নীচে শ্যামল ঘাসের আসন বিছান। আসলে ওটা আশ্রমের নামে একটা দানসত্র। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙ্গালীর দেহে যে মর্ম্মান্তিক স্বাক্ষর রেখে গেছে নীরেনের এই আশ্রমটি তারই বিরুদ্ধে আঞ্চলিক অভিযান। সেই অভিযানের হাতিয়ার দু'শো বিঘা খামার-জমির ধান, পুকুরের মাছ, পাড়ের তরি-তরকারী ও ঐ গরুগুলোর দুধ।

ভোর না হতেই লিষ্টি-করা রোগীদের পক্ষ থেকে ঘটী হাতে নিয়ে লোক আস্‌তে থাকে আশ্রম থেকে দুধ নেওয়ার জন্য। খাঁটী দুধ—যতটুকু দুধ ততটুকু রক্ত।

রোগীরা ভাল হয়—তা'দের বরাদ্দের দুধ কাটা যায়। সে ভাগ গিয়ে পড়ে নতুন-আসা কোন রোগীর ভাগ্যে। তারপরে আসে টিকেট হাতে নিয়ে চাল নেবার জন্য গোনা পঁচিশ জন।—এটা দৈনিক। নীরেনের বিশ্বস্ত লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরে আগের দিনই বিলি করে আসে ঐ টিকেট্। বাছ-বিচার নেই জাতিধর্ম্ম নিয়ে।

এই কারণেই সকলে ভক্তি করে নীরেনকে, শ্রদ্ধা ক'রে—মনের মন্দিরে বসিয়ে পূজা দেয়। কত সাধুই তো তা'রা জীবনে দেখেছে, কিন্তু এমনটা কোনদিন দেখেনি বা কানেও শোনেনি বাপ-ঠাকুর্দ্দার মুখ থেকে। কত সন্ন্যাসী শহরে

ঠকাবার পালা শেষ করে পল্লীগ্রামে এসে ঠকিয়ে যায় কত নতুন ফন্দিতে। 'কিন্তু এই সন্ন্যাসী—এ যেন ভগবানের নিজের হাতে গড়া। তা' নইলে এমন দেবতার মত চেহারা, এমন কচি বয়সে সংসারের যাবতীয় সুখ-সৌন্দর্যকে উপভোগ না করে নিজের টাকা পরকে দিয়ে জীবনভোর লোকসানের কারবারে হাত দেবে কেন?

ঐ অঞ্চলে নীরেনের নাম মহানন্দ। শুধু মহানন্দ নয় 'স্বামী মহানন্দ মহাপ্রভু'। এক একটা দিন নীরেনের সম্বন্ধে এক একটা বিস্ময়ের স্তূপ রচনা করতে লাগল আমার মনে। অবাক্ হ'য়ে তাই নীরেনের জীবনের কথা ভাবি। এ যেন নতুন অশোক। কলিঙ্গদেশ জয় করার পর অশোকের নতুন জীবন লাভের মতই পরের টাকা ছলনা করে নেওয়ার পর নীরেনের মধ্য থেকে মহানন্দর আবির্ভাব। একাধারে সন্ন্যাসী, দাতা, ডাক্তার-হাকিম। কত লোক দূর দূর দেশ থেকে রোগী নিয়ে আস্‌ছে, কেউ হেঁটে, কেউ বা নৌকা ভাড়া করে।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "তুই আবার ডাক্তার হলি কবে থেকে? হাত দেখ্‌ছিস, পেটের পীলে দেখছিস্!"

হেসে উঠ্‌ল নীরেন। প্রাণ খোলা হাসি নয়, অপরাধীর ভয়-মেশানো ভেজাল হাসি।

—আমি আবার ডাক্তার হতে যাব কেন? ওদের বলিওনি, তবে কিনা সাধুদের ওপর ওদের একটা অটল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস নিয়েই ওরা আমার কাছে আসে। বিপদে পড়ি আমি। যত বলি আমি কিছু জানি না, ওরা ততই বিশ্বাস করতে চায় না। শেষে ধূলায় গড়াগড়ি যায়, —মাথা কোটে। নিরুপায় হয়ে কোশাকুশী থেকে একটু জল দিই তবে ছাড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনেক রোগী ভাল হয়।

ঠাট্টা করতে গিয়ে নীরেনের মুখ থেকে যা' বেরোল তন্ময় হ'য়ে শুনছিলাম তা'। সে-ভাব কাটল আমার একজন স্ত্রীলোকের করুণ প্রার্থনায়, "বাবা! আমি এসেছি!"

চেয়ে দেখি বছর তিনেকের একটী রোগা ছেলে কোলে স্ত্রীলোকটীর। চোখের পলকে ছেলেটীকে নীরেনের পায়ের কাছে রেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল, "বাবাঠাকুর! এ আমার একটীমাত্র ছেলে, বড় গরীব আমি। ওকে কত ডাক্তার বৈদ্যের কাছে নিয়েছি, কেউ ভাল করতে পারল না। ও না বাঁচালে আমার যে সব অন্ধকার হ'য়ে যাবে বাবা!—তুমি ওকে ওষুধ দেও, তোমার ওষুধেই বেঁচে উঠ্‌বে, আমি স্বপ্নে জেনেছি।"

স্ত্রীলোকটী তখনও কাঁপছে। কে জানে কত দূরের পথ চলার পরিশ্রমে তা'র শরীর ঘামে ভেজা। কতদূর থেকে না জানি সঙ্গীছাড়া একাই নিজের একমাত্র ছেলেকে বাঁচাবার আশায় নিজের পা' দু'খানির উপর নির্ভর করে ছেলে কোলে নিয়ে ছুটে এসেছে মাতৃস্নেহের তাড়নায়। প্রার্থনা: একটীমাত্র ছেলেকে যেমন ক'রেই হ'ক মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে দিতে হবে। অথচ মাতৃবক্ষের এই যে প্রার্থনা, তা' পূরণ করবার ক্ষমতা কি নীরেনের আছে? তা'র না আছে তপস্যা, না আছে পুণ্যের জোরে নিজের উপর নিজের অটুট বিশ্বাস। তা' ছাড়া বিশ্বাস থাকবেই বা কেমন করে? সে স্বামী নয়—পাপী, মহাপ্রভু নয়—মহাপাপী! প্রতারক!! বিপদে-পড়া মানুষের কাছ থেকে, তা'দের টাকা-পয়সা রক্ষা করার নামে তা'দের দুদিনের জন্যে জমা-করা টাকা ছলনা করে এনে সরকারী সমনের ভয়ে গা ঢাকা দিতে এসেছে সে এখানে। এখানেও আবার নূতন বিপদ!—স্ত্রীলোকটী স্বপ্ন দেখেছে নীরেনই ত্রাণকর্ত্তা, তা'র ছেলের রক্ষাকর্ত্তা! সেই স্বপ্ন যদি সত্য না হয়, স্ত্রীলোকটীর আশা যদি নিরাশায় পরিণত হয় তবে ঐ মায়ের বুকখানি মথিত করে যে শোক সাগরের সৃষ্টি হবে তা'তে সমগ্র সৃষ্টি ডুবে না যায়!

বল বাবাঠাকুর! চুপ করে রইলে কেন? আমার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে দেবে না? বল?

—আমার কোন ক্ষমতা নেই, নীরেন বললে: তোরাও যেমন মানুষ আমিও তেমন মানুষ। হয়তো কেন নিশ্চয়ই! তোদের সকলের চেয়ে আমি অধম, অনেক নিকৃষ্ট। আমি হয়তো সাধু সেজে আমার আসল প্রতারকরূপকে ঢেকে রেখেছি—আমায় তোরা বিশ্বাস করিস্ না। আমি ঠগ্, আমি প্রতারক—বলতে বল্‌তে গলা ধরে এলো নীরেনের, চোখের কোনেও এলো জল।

বুঝলাম নীরেনের চোখের জল তা'র বিবেকের দংশন-জনিত। একদিন এই বিবেকের মৃত্যু হ'য়েছিল তা'র অন্তরে। সেদিন তা'র সারা মনে রাজত্ব করেছিল দুষ্টবুদ্ধি,

—তা'র মনের চোখের সাম্নে ভেসে উঠেছিল যত সব কালোবাজারীর নাম ও চেহারা। ওরাই নীরেনকে এগিয়ে দিয়েছিল ছলে, বলে, কলে এবং কৌশলে বর্ম্মা-ফেরৎ লোকদের রিক্তহস্ত করে দিতে। এখন সেই অর্থই হ'য়েছে তার যত অনর্থের মূল। মনের কোনও কোণে শান্তি নেই এতটুকু। আজ নীরেনের মনের সেই মৃত বিবেক আবার জেগে উঠেছে মহানন্দর মনে, কৈফিয়ৎ তলব করছে পূর্ব্বকৃত অপরাধের—মনুষ্যত্বের অবমাননার। সেই বিবেকের তাড়নায় আজ তা'র সারাদেহ বেদনায় বেপথু—সর্ব্বদাই সর্ব্বশরীরে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিকের কোটী কোটী ক্ষমাহীন দংশন। উঠ্‌তে বসতে, নিদ্রায় জাগরণে সেই প্রতারিত লোকদের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আত্মগ্লানিতে তা'র সারা মন ভরা।

—তুমি যে চুপ করেই রইলে বাবা? আমার উপর কি তোমার দয়া হবে না?

দয়া হ'ল।

নিরুপায়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল নীরেন। তারপর ঠাকুরের চরণামৃত এনে দিল ছেলেটীর মাথায়। নিজের চোখেই দেখা এসব—কিন্তু আমার চোখের আড়ালে স্ত্রীলোকটীর হাতে যে কত টাকা গুঁজে সে দিল সেটা রইল আমার অজানা!

যেন তখনই হাতে হাতে প্রাণ পেল স্ত্রীলোকটী। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তা'র কত দিনের বিষাদ-মাখা মুখে লাগল একটু হাসির ছোঁয়া। কিন্তু সেই ছোট্ট হাসি একটা বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল নীরেনের বুকে। কে যেন তার মনের ভিতর বলে উঠ্‌ল, থাক্‌বে তো স্ত্রীলোকটীর মুখে ঐ হাসি? কেঁপে উঠ্‌ল নীরেন। এক অনাগত ভয়ের আশঙ্কায় প্রলয়ঙ্করী একটা ভূমিকম্প হ'য়ে গেল তা'র বুকের মধ্যে।

তুই বুঝি টাকাও দিলি?

হ্যাঁ ভাই, সামান্য কয়েকটা টাকা। দেখ্‌লি না কত গরীব।—মেয়েছেলে—ছেঁড়া কাপড় পরেই এখানে এসেছে।

দেখেছি।—কিন্তু ছেলেটী বাঁচবে তো?

বাঁচাবার আমি কি জানি। ওষুধও দিইনা, ডাক্তারও নই। আমি তো হাতে করে দিই জল—ওদের পেটে গিয়ে হয় ধন্বন্তরী ওষুধ। রোগী ভাল হয়। দশদিকে আমার নাম প্রচার করে। কিন্তু ও নাম চায় কে?—ঐ নামই নাগ হ'য়ে চারদিক থেকে আমাকে তাড়া করে আসে। ভেবে পাই না কোথায় গিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাব। ভয়ে চোখ বুজে থাকি—তাতেও নিস্তার নেই। সেই বর্ম্মাফেরৎ প্রতারিত লোকগুলোর ভিখারী বেশ, তা'দের করুণ মুখ আমার চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে—তাদের ক্ষুধায়-কাতর ছেলেমেয়েদের কান্না আমার কানে বাজতে থাকে।

এম্‌নি করেই দিন, মাস এবং বছর গড়িয়ে চল্‌ছে কালের রথে চড়ে। বসন্ত তার ফুল-ডালি নিয়ে আসে—চলে যায়। শরৎ সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে চলে যায় আকাশের নীল পথে। হেমন্তের ক্ষেত-খামারে সোনার ছড়াছড়ি। প্রকৃতির এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য দু'চোখ ভরে দেখবার অবসর নীরেনের নেই—অভিনেতা সে। বাইরে তার হাসি মুখ, ভিতরে অশ্রুমুখী মন। পাঁচটা মহাসাগরের জল তার দু'টী চোখের দুয়ার পথে থম্‌কে দাঁড়ায়, পথ খুঁজছে তারা বাইরে আসার। এমন সময়ই আমার সাথে দেখা। তাই প্রথম দিনেই চলেছিল, "ভাল সময়েই তুই এসেছিস—বড় প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে।"

সরকারী কাজে গিয়েছিলাম আমি জমি জরীপ করতে। সাত দিনের কাজ, ইচ্ছা করেই দেরী করে পনের দিন লাগালাম। সে-ইচ্ছা আমার প্রয়োজন নয়, নীরেনেরই একান্ত অনুরোধ এবং বিশেষ প্রয়োজনে। মানুষের জীবনে এক এক সময় এমন আসে—যখন সে নিজের বুকের বোঝায় প্রায় পাগল হয়। নিজের গোপনতম কথা প্রকাশ করেও ফাঁসিকাঠে ঝোলাকে শ্রেয়ঃ মনে করে। নীরেনের তখন সেই অবস্থা। তার সে বুকের ব্যথা, সে গোপন কথা শুনবার আমিই হ'লাম নির্ব্বাক শ্রোতা—একমাত্র শ্রোতা।

বাল্যবন্ধু আমি নীরেনের। ওর জীবনের কত কথাই না আমার মনের মধ্যে আজও তালাচাবি দিয়ে আট্‌কান—কত ঝগড়া কত মনোমালিন্যের আঘাতেও তার একটা কথা প্রকাশ পায়নি কোনদিন, নীরেন তা' জানে। হয়তো সেই বিশ্বাসে, নয়তো পাগল হওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে অকপটে সব কথাই খুলে বল্লে আমাকে। কিন্তু সে-বলা নীরেনের সম্বন্ধে। মহানন্দর জীবনের ইতিহাস নয়।

মহানন্দর ইতিহাস সে বলে না। কিছুই, সে ইতিহাসের-

খাতা খোলা আছে সাধারণের চোখের উপর। জিজ্ঞেস করলে বলে, পাপ মুখে কিছু বলতে নেই। তা' ছাড়া বলবার প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। বিনা জিজ্ঞাসায় নিজের চোখে দেখে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। একদিন লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে যে টাকা অসদুপায়ে সে আয় করেছিল, তার একটী পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় না ক'রে ব্যয় করে স্কুল প্রতিষ্ঠায়, দুস্থ রোগীর সেবায়, পুকুর কাটায় এবং দরিদ্র ছেলেদের স্কুলের মাইনে দেওয়ায়—এমন রকম আরও অনেক দানে। ঐ দানেই তার শান্তি, তা'র নিরানন্দময় জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপন নিজের জীবনকে ধূপকাঠির মত জ্বালিয়ে যদি কিছু পুণ্য অর্জ্জন করা যায় তাই হবে তার পরকালের পাথেয়।

ওদিকে আমার ওখানকার জীবন শেষ হ'য়ে এলো। নীরেনের প্রয়োজনে তার সঙ্গীর অভাব দূর করবার জন্য আমি যে কাজ সাত দিনে শেষ করতে পারতাম তা পনের দিনে শেষ করেছিলাম ; কিন্তু সেই পনের দিন যেতেই আরও কয়েক দিন থাকবার প্রয়োজন হ'য়েছিল আমারও। চাকুরের এক ঘেয়ে বস্তাপচা জীবনে, যেখানে বৈচিত্র্যের লেশমাত্র নেই, সেখানে পেয়েছিলাম আমি প্রচুর আনন্দ। আশ্রমের পবিত্র আবহাওয়া, নীরেনের সাধু-সান্নিধ্য—তার উপরে দান-গৃহীতাদের হাসি-মুখ আমার জীবন-ব্যাঙ্কে একটা স্থায়ী আমানতের মত জমা হ'য়ে থাকবে চিরকাল।

আঠের দিনের দিন, আমার দেরী হওয়ার জন্য সন্তোষ-জনক কারণ জিজ্ঞাসা করে আফিস থেকে চিঠি এলো আমার নামে। চিঠির উপরে লেখা 'কপিড়।' বুঝতে বাকী রইল না যে, ঐ মূল চিঠির নকল আমার আফিসের ভাগ্য-খাতায় চিরদিনের জন্য আট্‌কানো থাকবে আমার উন্নতির পথে কাঁটা হ'য়ে। তবুও চিঠিখানি পড়ে হাসি পেল আমার।

দেরী হওয়ার জন্য সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে লেখার মত আমার কিছুই ছিলনা, যা' ছিল তা' না-লেখার। সেই না-লেখার বিষয়-বস্তুকে উপলব্ধি করতে হ'লে যে অনুভূতি-শক্তির দরকার, আফিস-আদালতের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। অতএব তেল থাকতে প্রদীপ নিববার মত একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আশ্রমের মায়া কাটাতে হ'ল আমার।

বেশ ছিলাম ওখানে কয়েকদিন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁবুতে না থেকে থাকতাম ঐ আশ্রমেই। পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গত। চোখ মেলেই পেতাম নবারুণের এক ঝলক হাসি উপহার। দিনে চলত রোদ-বাতাসের খেলা, আর রাতে বান ডেকে আসত চাঁদের আলো।

পরের দিন আশ্রম ছেড়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লাম কলকাতার ট্রেণ ধরবার জন্য। অনেক নিষেধ না শুনেও নীরেন ষ্টেশন পর্য্যন্ত এলো আমার সঙ্গে। বিশ্রাম ঘরে অনেক কথাবার্ত্তার পর এক সময় নীরেন আমার একখানি হাত ধরে বল্লে, "আমার জন্য তোর হয়তো আফিসে মিথ্যে-কথা বলতে হবে, চাকরীতেও গোলমাল হতে পারে ; কিন্তু সেজন্য তুই কিছুই ভাবিস্‌নি বিকাশ! চলে আসিস্ তুই আমার এখানে—এক সঙ্গে কাজ করা যাবে, কেমন ?"

কথা না বলেই উত্তর দিলাম শুধু হাসি দিয়ে।

চল্‌ছে ট্রেণ। চল্‌ছে ট্রেণের কামরায় যাত্রীদের নানা ভাষায় আলাপ-আলোচনা। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ফেরিওয়ালাদের চীৎকার এবং লোকজন ওঠা-নামার একটা হট্টগোলের মধ্যেও আমি ছিলাম নির্জ্জনে—ওদের কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে, ভিন্ন জগতে। ওদের কোন কথাই আমার কানে আসছিল না বা আফিসে সন্তোষজনক কি কারণ দেখাব সে চিন্তাও আমার মনের মধ্যে ছিল না তখন। শুধু আমি ভাবতে লাগলাম—পাপী নীরেনকে নিশ্চিত নরকবাসের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করবার জন্য স্বামী মহানন্দ মহাপ্রভুর প্রাণপণ প্রচেষ্টার কথা !!

দার্জ্জিলিং ও পশ্চিম-বাংলা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন কিছুদিন থেকে দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। বিহার, উড়িষ্যা বা আসামেও বাঙ্গালী তার আগের সম্মান হারিয়েছে সত্য, কিন্তু দার্জ্জিলিংয়ের সঙ্গে এসব জায়গার অবস্থার তুলনা করে সান্ত্বনা খোঁজা চলে না। দার্জ্জিলিং পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বাংলারই একাংশে বাঙ্গালী লাঞ্ছিত হ'লে সে লজ্জা বাস্তবিক অসহ্য।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর সঙ্গে দার্জ্জিলিংয়ের সংযোগতো কম নয়। এখানে নেপালী শ্রেণীর পাহাড়ীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও স্থায়ীভাবে বাস করে বহু বাঙ্গালী এবং সরকারী চাকুরিয়াদেরও অধিকাংশ বাঙ্গালী। তাছাড়া মরশুমে সরকারী বেসরকারী বাঙ্গালীর ভিড় প্রচুর। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রুচিতে এই সব বাঙ্গালীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক গোর্খালী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। তবু বাঙ্গালী দার্জ্জিলিংয়ে অবাঞ্ছিত এবং সম্প্রতি কিছুটা কমলেও পাহাড়ীরা মাঝে এমন ধুয়োও তুলেছিল যে, দার্জ্জিলিংকে আসাম বা বিহারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হোক, পশ্চিম বাংলায় তারা কিছুতেই থাকবে না।

অথচ পাহাড়ী-অধ্যুষিত হলেও বাঙ্গালী এবং পশ্চিম বাংলা সরকারের জন্যই দার্জ্জিলিং টিকে আছে। বর্ষাকালের মাস দুয়েক বাদ দিয়ে সারা বছর অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীরা দার্জ্জিলিং অঞ্চলে বেড়াতে যান এবং দুহাতে পয়সা খরচ করেন। এঁদের এই খরচই স্থানীয় পাহাড়ীদের জীবিকা সংস্থান করে দিচ্ছে। এছাড়া দার্জ্জিলিং দারুণ ঘাটতি এলাকা। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী তহবিল থেকেও দার্জ্জিলিং জেলার জন্য প্রতি বছর মোটা টাকা খয়রাত করা হয়। বলা বাহুল্য, এটাকাও পরোক্ষভাবে বাঙ্গালীরাই দিচ্ছে। কাজেই এসব সত্বেও যদি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দার্জ্জিলিংয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা বাঙ্গালী-বিদ্বেষ পোষণ ও প্রকাশ করে, এবং পশ্চিম বাংলা সরকার ও বাঙ্গালীর অজস্র সহানুভূতি অস্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক হ'তে চায়, তা অবশ্যই গভীর পরিতাপের বিষয়।

তবে এজন্য শুধু দার্জ্জিলিংয়ের পাহাড়ীদের নিন্দা করলেই চলবে না। দার্জ্জিলিংয়ের পাহাড়ীরা যে পশ্চিমবঙ্গকে ভালবাসতে পারছে না, এজন্য তারা যতটা দায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা সাধারণভাবে দার্জ্জিলিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালীদের দায়িত্ব তার চেয়ে কম নয়। পাহাড়ীদের সারল্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। বাঙ্গালী বা বাংলা সরকার এতদিন সুযোগ পেয়েও কেন পাহাড়ীদের বাঙ্গালী করে, অন্ততঃ বাংলার প্রতি দেশপ্রীতিপরায়ণ করে তুলতে পারলো না, তার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ দরকার। বর্তমান যুগ গণজাগরণের যুগ, পাহাড়ীরা আজ যে উত্তেজিত হয়ে বাঙ্গালীদের সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জোর গলায় ঘোষণা করছে, এতে তাদের সত্যকার অপরাধ হচ্ছে কতখানি, নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে তা বিচার করতে হবে। গণতান্ত্রিক পশ্চিম বাংলা রাজ্যে বাস ক'রে এবং সর্ব্বদিক থেকে ন্যায্য নাগরিক অধিকার পেয়েও তারা নিজ রাজ্যের বা দেশবাসীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হ'চ্ছে—যে ভাবেই হোক এ বিষম অবস্থার অবসান ঘটা দরকার।

সত্যকথা বলতে গেলে অর্থব্যয় ছাড়া বাঙ্গালী বা পশ্চিম বাংলা সরকার পাহাড়ীদের হৃদয় জয় করবার মত বা নিজ প্রদেশের প্রতি মমতাবান করে তোলবার মত বিশেষ কিছু করেন নি। সম্প্রতি রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জ্জির আমলেই এদিক থেকে সরকারী সক্রিয়তা তবু কিছুটা দেখা যাচ্ছে এবং ফলে বাঙ্গালী বিদ্বেষের পরিমাণও লক্ষণীয় ভাবে কমেছে। এই প্রয়াস যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্য ভবিষ্যতে দার্জ্জিলিং নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে।

এ পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গালীদের সঙ্গে পাহাড়ীদের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই চলে আসছে। এই সম্পর্ক স্থায়ী সম্প্রীতির দ্যোতক নয়। বাঙ্গালী বরাবর পাহাড়ীদের ঝি-

চাকর রেখে বা তাদের কাছ থেকে ডিম দুধ আনাজ কিনে তাদের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করেছে, ফাউ হিসেবে তাদের ওপর অত্যাচারও করেছে নানা ভাবে। প্রাত্যহিক বা সামাজিক জীবনে পাহাড়ীদের সঙ্গে বাঙ্গালীর হৃদয়ের যোগ কখনই স্থাপিত হয়নি এবং বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা গৌরবের সঙ্গে পাহাড়ীদের অন্তরঙ্গ করে তুলতে সরকারী-বেসরকারী কোন সূত্রেই বাঙ্গালীদের গরজ দেখা যায়নি। এদিকে যুগ পালটে যাচ্ছে, পাহাড়ীরাও লেখাপড়া শিখে ক্রমে হয়ে উঠছে আত্মসচেতন। এ অবস্থায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে অপরিচয়ের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পাহাড়ীরা নিজেদের বাঙ্গালীদের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভেবে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় উৎসুক হচ্ছে। বাঙ্গালীদের সঙ্গে অন্তরের কোনরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি বলে পাহাড়ীরা বাঙ্গালীদের রাজ্য পশ্চিম-বাংলা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার কথা চিন্তা করে এবং উত্তেজনাবশে মনে করে যে, দার্জ্জিলিং পশ্চিম-বাংলার চেয়ে আসাম বা বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত হ'লে তারা লাভবান হবে।

এই শোচনীয় অবস্থা বা পাহাড়ীদের এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব অঙ্কুরেই শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। চেষ্টা করলে এ পরিবর্ত্তন সাধন মোটেই অসম্ভব ছিল না, প্রয়োজন ছিল শুধু মাত্র একটু আন্তরিকতার। কিন্তু প্রথম দিকে যখন সুযোগ ছিল প্রচুর, তখন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট ছিলেন, স্বাস্থ্যকামী বা ভ্রমণকারী বাঙ্গালী এ নিয়ে মাথা ঘামান নি, দার্জ্জিলিংয়ের স্থায়ী বাঙ্গালীরা কিছুটা সংখ্যাল্পতার অসুবিধায় ও কিছুটা নিজেদের ইজ্জৎ রক্ষার ভ্রমাত্মক আগ্রহে এ সম্পর্কে চুপচাপ ছিলেন। আবার এর বিপরীতে দেখা গেল—দার্জ্জিলিংয়ের চা-কর এবং মিশনারী সাহেবেরা নিজেদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখতে বাঙ্গালীদের সংস্পর্শ থেকে পাহাড়ীদের সরাবার জন্য প্রাণপণ করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে, বাঙ্গালী উচ্চশিক্ষিত এবং সাম্প্রদায়িক জাত, পাহাড়ীরা যত লেখাপড়াই শিখুক, বাঙ্গালীদের সঙ্গে কাজেকর্ম্মে প্রতিযোগিতা করে তারা কিছুতেই পারবে না এবং পাহাড়ীদের ন্যায্য দাবী মেনে নেবে এমন বড় মন বাঙ্গালীর নয়। বরং যদি দার্জ্জিলিং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বিহার বা আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়, দয়া মায়ার প্রশ্ন বাদ দিয়ে নিজের কৃতিত্বেই পাহাড়ীরা শাসনযন্ত্রে উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারবে। বাঙ্গালীদের কাছে হৃদয়হীন ব্যবহার পেয়ে পাহাড়ীরা এমনি চটে ছিল, সরল হৃদয়ে তারা সাহেবদের এ যুক্তি বিশ্বাস করল। এরই ফলে ধূমায়িত হ'ল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ।

বর্ত্তমান রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জ্জি বৎসরের অনেকখানি সময় এখন দার্জ্জিলিংয়ে কাটাচ্ছেন, পাহাড়ীদের সঙ্গে তিনি মেলামেশাও করছেন যথেষ্ট। তাঁর অবস্থিতি, শুভেচ্ছা ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে একথা আগেই বলেছি। ডাঃ মুখার্জ্জি এমনি লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালবাসেন, অনেক পাহাড়ী প্রতিষ্ঠানে তিনি যান। স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় তাঁর সুপারিশে নেপালী ভাষা সর্ব্বাংশে প্রধান মাতৃভাষার মর্য্যাদা লাভ করায় পাহাড়ীরা তাঁর ওপর খুবই সন্তুষ্ট। এই সময় দার্জ্জিলিংয়ের সরকারী কর্ম্মচারী, বাসিন্দা ও ভ্রমণকারী বাঙ্গালীরা যদি নিজেরা আগ্রহশীল হয়ে পাহাড়ীদের সঙ্গে একটু আন্তরিক মেলামেশা করেন এবং বাঙ্গালীর জাতিগত সংস্কৃতিবোধ ও মানবতা সম্পর্কে পাহাড়ীদের অবহিত করে তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারেন, তাহলে উন্নতিশীল পাহাড়ীরা শুধু যে নিজেদের পশ্চিম-বাংলার অধিবাসী বাঙ্গালী বা বাঙ্গালীর সমান দায়িত্বসম্পন্ন মনে করতে আগ্রহশীল হবে তা নয়, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টি অধিকতর আয়ত্ত করতে তারা উৎসাহিত হবে। বলা বাহুল্য, কর্ম্মঠ পাহাড়ী সম্প্রদায়ের এই বিশ্বস্ততা পশ্চিম-বাংলাকে বলীয়ানও করে তুলবে। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি দার্জ্জিলিংয়ে যে শাখাটি খুলেছেন, তাতে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা বেশ আগ্রহ করেই বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও নাচগান শিখছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন পাহাড়ী ইতিমধ্যে বাংলা শিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন এবং গ্রামাঞ্চলে বাংলা শিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করছেন। এই রকম চারজন শিক্ষক বেকার ছিলেন, যাতে তাঁরা নিরুৎসাহ না হয়ে পড়েন, তার জন্য রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জ্জি নিজ তহবিল থেকে তাঁদের মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। রাজ্যপালের এ উৎসাহদান অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

দার্জ্জিলিংয়ের বাঙ্গালীবিদ্বেষ বিদূরিত করতে স্থায়ী বাঙ্গালী বসিন্দাদের দায়িত্ব সত্যই খুব বেশি। তাঁদের

নিজেদের মধ্যে দলাদলি করলে চলবে না, জাতীয় স্বার্থে আদর্শ বাঙ্গালী জীবন তাঁদের তুলে ধরতে হবে পাহাড়ীদের সামনে। বাঙ্গালী জাতীয়তার ঐশ্বর্য্য সমগ্রভাবে যদি তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাঁরা যদি পাহাড়ীদের বন্ধুত্ব ফিরে পান, পাহাড়ীরা বর্ত্তমান মনোভাব পরিত্যাগ করবেই। পাহাড়ীদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের হৃদয়হীন সম্পর্কটুকুতেই সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁরা যদি তাঁদের স্বদেশবাসীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও মমতা প্রদর্শন করতে থাকেন, সরলস্বভাব পাহাড়ীদের নরম মনের কাছে সে আন্তরিকতার আবেদন না পৌঁছে পারে না।

বাঙ্গালী জীবন পাহাড়ীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে কতকগুলো সাধারণ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি পাহাড়ীরা সিনেমা দেখতে খুবই ভালবাসে। সহরের লোকতো নিয়মিত ছবি দেখেই, গ্রামাঞ্চলের লোকও সহরে এলেই সিনেমায় ভিড় করে। দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং প্রভৃতি সহরে ভাল বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা নেই, অথচ এ ব্যবস্থা করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। প্রথম প্রথম হিন্দী ও ইংরেজী ছবিতে অভ্যস্ত পাহাড়ীরা হয়তো বাংলা ছবি দেখতে চাইবে না, সিনেমাগুলোকে অর্থ সাহায্য করে টিকিটের হার সাময়িকভাবে কমিয়ে তাদের আকর্ষণ করা যায়। ভাল বাংলা ছবি অবাঙ্গালীদেরও যে ভাল লাগে, সে প্রমাণ আমরা দেবদাস, রামের সুমতি, ভুলি নাই, মহাপ্রস্থানের পথে, স্বয়ংসিদ্ধা প্রভৃতি ছবিতে বহুবার পেয়েছি। দেখলে বাংলা ছবি পাহাড়ীদেরও ভাল লাগবে। তাদের যে রসজ্ঞান আছে, দার্জ্জিলিংয়ের রিঙ্ক বা ক্যাপিটাল সিনেমায় ইংরেজি ভাল ছবির ভিড় দেখে তা বোঝা যায়। ইংরেজিও তারা এমন কিছু বোঝে না, হিন্দীতেও পণ্ডিত নয়, ইংরেজি বা হিন্দী ছবি যদি তারা নিতে পারে, ভাল বাংলা ছবিই বা পারবে না কেন? এইভাবে বাংলা ছবির ভিতর দিয়ে বাংলার ভাষা-সাহিত্য, বাঙ্গালীর জীবন ও রুচির সঙ্গে পাহাড়ীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। এই সঙ্গে সরকার চেষ্টা করলে তাঁদের 'নিউজ রিল' বা প্রচার চিত্রগুলি সিনেমায় বাধ্যতামূলকভাবে দেখাতে পারেন। পাহাড়ী গ্রামাঞ্চলে সরকারী প্রচার অধিকর্ত্তা যোল মিলিমিটারের ভাল বাংলা ছবি ও নিউজ রিল প্রদর্শনের এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বাংলার নিজস্ব গৌরব প্রচারের ব্যবস্থাও করতে পারে। সামাজিক উৎসব, জীবনযাত্রা প্রণালী, শিল্প প্রভৃতির উপর বিনাপ্রবেশমূল্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করলেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলার কথকতা, কবিগান, লোক-সঙ্গীত ও নৃত্য, মঞ্চাভিনয়, যাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে পাহাড়ীদের পরিচয় নেই। এই পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এ সব ব্যবস্থা করা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। দার্জ্জিলিংয়ে এমনি সরকারকে বহু টাকা খয়রাত করতে হয়, পশ্চিম বাংলার সঙ্গে দার্জ্জিলিংয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের স্থায়ী অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করতে আর কিছু বেশি ব্যয় কেউই অপব্যয় বলে মনে করবেন না। মিশনারী কলেজ থাকা সত্বেও দার্জ্জিলিংয়ে সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার বিপুল ব্যয়ভার সরকার স্কন্ধে নিয়েছেন। ছাত্রসংখ্যা হিসাব করে এই কলেজের লাভ লোকসানের কথা কেউ ভাবে না, বরং কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সকলের প্রশংসাই পেয়েছেন। তেমনি উপরোক্ত খাতে কিছু অর্থব্যয় করলে সরকারের নিন্দাভাজন হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

দার্জ্জিলিংয়ের দোকানপাটের বিজ্ঞাপনাদিতে ইংরেজি ও হিন্দীভাষা চলে, সাধারণ স্থানের পরিচিতিপত্র ও রাস্তাঘাটে বাংলার চিহ্নমাত্র নেই। অবাঙ্গালী অনেক জননায়ককে দার্জ্জিলিংয়ে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে, কিন্তু বাংলার মহাপুরুষেরা সেখানে অবজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির নামে দার্জ্জিলিংয়ের রাস্তার নামকরণ হয় না কেন? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিংয়েই মারা গেছেন, তাঁকে দার্জ্জিলিং কতখানি সম্মান দিয়েছে? এইভাবে বাংলা ভাষাকে এবং বাঙ্গালী মহাত্মাদের পাহাড়ীদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে রাখবার যে চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত।

দার্জ্জিলিং সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের অধিকাংশই তরুণ। নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ীদের অন্তরজয়ে এঁদের উৎসাহিত করা সরকারের কর্ত্তব্য। বিশেষ করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন, সরকারের দেখা উচিত তাঁরা যেন সত্যকার সুরুচিসম্পন্ন কৃষ্টিবান যোগ্য ব্যক্তি হন। দার্জ্জিলিংয়ে কষ্ট বেশি ও কলেজ নোতুন বলে নেহাৎ নোতুন লোক না পাঠিয়ে অন্ততঃ বাংলা বিভাগে কৃতী ব্যক্তিদের পাঠানো দরকার। এই সব বাংলার অধ্যাপকই যেন পাহাড়ীদের আকর্ষণ করা যায় এমন অনুষ্ঠানলিপির সাহায্যে সাহিত্যচর্চ্চা, প্রীতিসম্মিলন, নাচ-গান-অভিনয়ের আসর প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করতে পারেন।

শোলার কাজ

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

াংলার গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির ধারাগুলির একটা সাধারণ পর্যালোচনা রতে গিয়ে যে জিনিষটা স্বতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হোল ার প্রকাশ-মাধ্যমের বৈচিত্র্য। একদিকে যেমন দেখতে পাই—কাঠ াটির পুতুল প্রভৃতি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বাঁশ-বেতের নানাবিধ মগ্রী। এরই মধ্যে কি শিল্প-নৈপুণ্য, কি হাতের কাজ হিসেবে একটা তন্ত্র্য নিয়ে বিশেষ একটা স্থান দখল করে রয়েছে শোলার কাজ। ন্তু আজ সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে, বিশেষতঃ সামাজিক ও অর্থ-তিক কারণে এ-শিল্প অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত—এমন কি ধ্বংসের সম্মুখীন। রই জন্য আজ এ নিয়ে আলোচনা, এর দিকে নজর দেওয়ার বিশেষ য়োজন।

শোলা জিনিসটা কম বেশি আমাদের সকলেরই পরিচিত—অন্ততঃ
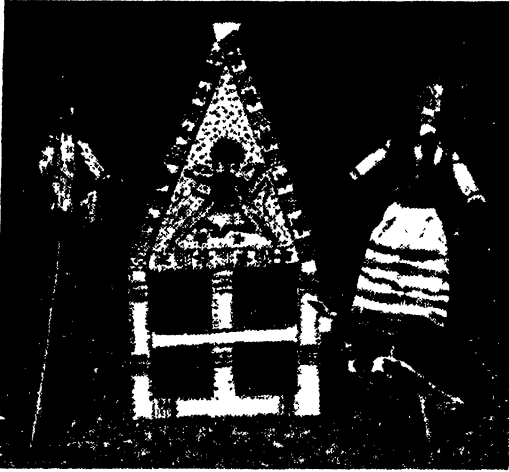
ালার খেলনা : ছবিতে মন্দিরাকৃতি একটি মনসা-পটও দেখা যাচ্ছে
(আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে। ফটো—মনো মিত্র

র টোপর বা পূজোর চাঁদমালা কারুরই একেবারে অচেনা নয়। াটি বা পাটকাঠির মতো অনেকটা দেখতে এই উদ্ভিজ্জটি, আপনা ই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়—বিশেষতঃ নীচু জমিতে এবং বাংলার প্রায় অঞ্চলেই। বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে এ জমিগুলো াই সাময়িকভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। শিল্প কাজের জন্যে এসব থেকেই সাধারণতঃ শোলার চালান আসে। আর এসব কাজের ভাত-শোলার চাহিদাটাই বেশি হয়। শোলাকে বেশ ভালো করে র শুকিয়ে নেবার পর ,এর বাইরের খোলাটা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। র প্রয়োজনানুযায়ী মাপ মতো শোলার "চাদর" তা' থেকে বের করা হয়। এই শাদা কাগজসদৃশ শোলার চাদরগুলি সত্যিই এক আশ্চর্য সৃষ্টি—এতো পাত্‌লা, এতো মসৃণ, অথচ ছেঁড়া ফাটা নয়! সাধারণতঃ এগুলোর ওপরেই এবং এগুলি নিয়ে কারিকর নমুনা বা নক্সা তোলার কাজে লিপ্ত হয়। তবে সময়ে দরকার মতো চৌকো বা গোল টুকরোও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শোলার কাজের সঙ্গে এদেশের মালাকর সম্প্রদায়ের নাম প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অন্যান্য বহু জাত-ব্যবসার মতো, এক্ষেত্রেও প্রধানত অর্থনৈতিক চাপের ফলেই, বেশ বড়-সংখ্যক মালাকরকেই এ ব্যবসার বাইরে চলে আসতে হয়েছে, তবুও এখনও এরাই এ-শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যদিও আগেকার চেয়ে অনেক ভগ্নাবস্থায়। দুর্গাপূজার সময়ে শোলার কতকগুলি জিনিষের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। এখানে বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে বছরের সে সময়টা সে সব জিনিষ তৈরী করে পল্লী অঞ্চলে বহু ভদ্র পরিবারের দুঃস্থা-অনাথা স্ত্রীলোক কিছু অর্থ সংস্থান করবার সুযোগ পান।

শোলার তৈরী জিনিষের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে টোপর আর চাঁদমালার নাম। জীবন থেকে এগুলোকে একেবারে নির্বাসন দেওয়া এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলেই শহরে লোকের এগুলোর সঙ্গে এখনও কিছু পরিচয় আছে। এর পরেই নাম করা যেতে পারে, পুতুল ও পাখি (কাকাতুয়া ইত্যাদি) জাতীয় খেল্‌নার, শাদা ও রঙীণ নানা ধরণের ফুলের। এর মধ্যে কদম ফুলের নমুনাগুলি আমাদের খুব পরিচিত। মেলা ইত্যাদি নানা জমায়েতের সময় বাংলার পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন মেলায় এগুলো পাওয়া যায়। আর একটু আশ্চর্যের বিষয় হলেও এটা সত্যি যে রথ বা চড়ক গাজনের মেলার সময় শহর-কলকাতায়ও এসবের দেখা মেলে।

কিন্তু বিভিন্ন মূর্তির, বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমার জন্যে তৈরী শোলার সাজ নিঃসন্দেহে শিল্পীর নৈপুণ্যের চরম ও সুন্দরতম প্রকাশ। কি সূক্ষ্ম হাতের কাজে, কি বর্ণ ভংগিমায়, কি নমুনার দিক থেকে—এগুলি উচ্চাংগের শিল্প-পর্যায়ভুক্ত হবার দাবী রাখে। এ জাতীয় সাজের মধ্যে প্রতিমার মুকুট, আঁচলা ও সময় সময় শাড়ি, নানা ধরণের অলংকার, বিভিন্ন ধরণের নক্সা ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডিজাইন বা নমুনা তোলার জন্যে শিল্পীকে কোনো কোনো সময় মোম গঁদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। তার, সরু জরি ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয়। অতুলনীয় শিল্প সৃষ্টি হিসেবে কৃষ্ণনগরের সাজ একসময় দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ প্রসংগে তথাকার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা—বিশেষ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। কোনও কোনও সাজ চারশো-পাঁচশো টাকাতেও বিক্রী হতো। এ শিল্পের দ্বারা

সেখানে একসময় প্রায় পাঁচশো ঘর কারিকরের অন্ন-সংস্থান হতো বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শোলা জিনিষটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে অতি পবিত্র বলে গণ্য হয়ে আসছে। হয়ত এ কারণেই এই শ্বেত-শুভ্র বস্তুটি প্রতিমা নির্মাণ কার্যে, বিশেষত পুজো-পালির মংগল প্রতীক চাঁদমালা তৈরীর জন্যে আবহমান কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেবদেবী মূর্তির শোলার পট-চিত্রও বাংলার অনেক অঞ্চলে, বিশেষতঃ উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে, আর দক্ষিণের মেদিনীপুরের দিকে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও সেই ভেজাল। "শুদ্ধ" শোলার সাথে কাগজ জড়িয়ে এক ধরণের "মিশ্র" পট-চিত্র আজকাল দেখা যাচ্ছে, যদিও সেগুলো জনপ্রিয়তা এখনও ততটা অর্জন করতে পারে নি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই শোলা-শিল্প আজ গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। শুধু লোপ পাওয়া নয়, লোকে একে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, এমন দিনের আর খুব বেশি দেরি নেই বলে মনে হচ্ছে। সস্তা আর চক্‌চকে বিদেশী—বিশেষ করে জার্মাণ আর জাপানী মালের সাথে প্রতিযোগিতায় শোলার জিনিষ আজ ধরাশায়ী। টুপী ছাড়া এ বস্তু আর কোনও কাজে লাগবে সে সম্ভাবনা দিনে দিনে কমে আসছে। একসময় এই স্বদেশী-আন্দোলনের অব্যবহিত কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশী "ডাক সাজ" দেশী শোলার সাজকে বাজার থেকে একেবারে উৎখাত করে দিয়েছিলো। হয়তো যুদ্ধের ফলে আবার সে বাজার কিছুটা ভাল হয়েছিলো। কিন্তু আবার নতুন প্রতিযোগিতার ফলে সে সমস্যা তীব্রতর চেহারা ধরতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে। শিল্পের এই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় বহু মালাকর আজ পিতৃ-পুরুষের ব্যবসা ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত। জনৈক বয়স্ক মালাকরের সংগে বর্তমান শিল্পের এই দুর্দশা নিয়ে একটু আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিলো। এ-অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। টাকা-পয়সার সব সময়ে ততটা দরকার করে না। যেটুকুও বা করে এবং যাঁরা সে সাহায্য নিয়ে এ শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিতে অনায়াসে এগিয়ে আসতে পারেন বা আসা উচিত, তাঁরা আজ নির্বাক দর্শক। কাঁচা-মালও আছে, নিপুণ কারিকরেরও অভাব নেই, নেই শুধু ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মতে খুবই কম দামে নানা ধরণের শোলার খেলনা তৈরী করা অত্যন্ত বেশি রকম সম্ভব। চাহিদা যদি তার বেশি হয়, তবে ভাঙা জিনিষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনা মূল্যে সারিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দিয়েও কাজে নামা যেতে পারে অত্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে। উনি মনে করেন যে মালের চাহিদা বেড়ে গেলে বেশি মাল উৎপাদনের জন্যে এদেশেই কম পয়সায় ছোট খাটো কলকব্জা তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ এই শিল্পী-কারিকরের মতে নির্ভয়ে খেলনা-শিল্পে বিদেশী মালের সাথে তখন পাল্লা দেওয়া চলতে পারে। এ প্রসংগে তাঁর আর একটা কথা মনে পড়ছে। সম্প্রতি এদেশে রাঙতা, জরির সুতো ইত্যাকার নানা দ্রব্য তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। যদিও সে সব এদিকের কারিকরেরাই সব চেয়ে বেশি কেনে, তবুও কারখানাগুলো প্রায় সবই পশ্চিম ভারতে। অনেক চেষ্টা করেও কোনও ধনীকেই তিনি এ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি, সে দুঃখ তিনি করলেন। পুজোর

চাঁদমালা ও শোলার সাজ

। শ্রীরাধাবল্লভ মালাকরের সৌজন্যে। ফটো:—মনো মিত্র
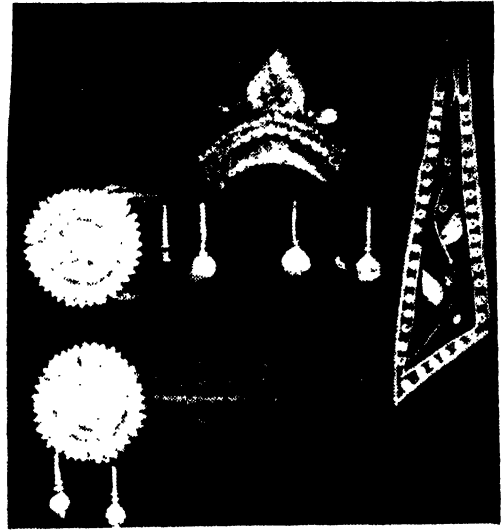
সময় ছাড়া বছরের অন্য সময়টা সাধারণতঃ তাঁদের কাজকারবার একটু ঢিলে। এ শিল্পের ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস। সত্যি কি-ই বা তাঁর আর বলবার আছে এ বিষয়ে নতুন করে? অপ্রিয় হলেও আজ স্বীকার করতেই হবে যে বিদেশী শিল্পের খরিদ্দার হয়ে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে এ শিল্পের মৃত্যুর পথ আমরাই সুগম করে দিয়েছি। এ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার খাওয়া নয়, গ্রাম-বাংলার একটা বিশেষ শিল্প-সংস্কৃতি-ধারার অবলুপ্তির সূচনাও বটে।

পশ্চিম বাংলার গ্রাম

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তব্য হবে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দেওয়া—পৃথিবীর ন্যান্ত সুসভ্য দেশের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার মান কতটা নীচু এবং বনযাত্রার মান নীচু হওয়াতে তাদের কর্মক্ষমতাও পাশ্চাত্য দেশবাসীর লনায় কতটা কম। কর্মশক্তি স্ফুরণের জন্য দরকার পুষ্টিকর খাদ্য ও স্থ্যকর পরিবেষ্টনীতে বাস অর্থাৎ বর্তমানে অধিকাংশ ভারতবাসী যা য়ে থাকে বা যেভাবে বাস করে থাকে তার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওয়া ও থাকা। উন্নত জীবনযাত্রার ফলে যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাবে ততদিন পর্যন্ত ভারত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তিযোগিতায় সব সময়ই পিছিয়ে পড়ে থাকবে ; তাদের সমকক্ষ কখনও ত পারবে না। এতকাল ভারতবাসী পিছিয়ে পড়েছিল ইংরেজের ধীনে থেকে ; পরাধীনতার দরুণ পিছিয়ে-পড়ার সব দোষই ইংরেজের পর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এতদিন, কিন্তু আজ স্বাধীন হয়ে জেদের দুর্গতির জন্য অপরকে দায়ী করা আর চলবে না। আজ মবাসীদের উপলব্ধি করতে হবে—নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মোন্নতির য় সচেষ্ট হবার সময় ও সুযোগ এসেছে। তাদের জীবনের উন্নতিই রতের উন্নতি। তাদের দিয়েই প্রকৃত ভারতের পরিচয় : কতিপয় মের নগর বা নাগরিকের সমৃদ্ধি দিয়ে নয়।

গ্রামে কোন উন্নতিই সম্ভব হবে না যে পর্যন্ত গ্রামবাসীদের মনে বনযাত্রার মান উন্নত করার আকাঙ্ক্ষা জেগে না ওঠে। কিন্তু এ কাঙ্ক্ষা জাগাবার আগে পঞ্চায়েতের প্রথম কর্তব্য হবে জীবনযাত্রার মান ত করা বলতে কি বোঝায় তা বুঝিয়ে দেওয়া। অনেক গ্রামেই দেখা ব—ছেলের গায় একটি দামী জামা, কিন্তু জামাটা নিতান্ত নোংরা ; অপর কটি রোগা ছেলে—গায়ে তার সোনার গয়না। বৌ'এর ছেলে হবে, ডাকা ন একটি অনভিজ্ঞ দাই ; ছেলে হলে যথেষ্ট খরচ করে সবাইকে মিঠাই ওয়ান হ'ল। বাবার অসুখে কোন চিকিৎসাই হোল না, মৃত্যুর পর টাকা খরচ করে, এমন কি ধার করে তার শ্রাদ্ধ হ'ল। উৎসব লক্ষে দু' একদিন বেশ ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া হ'ল, পরে কয়েক-ন অনাহারে কাটাতে হ'ল।

এ ভাবের জীবনযাত্রা মোটেই উন্নত ধরণের নয়। বেশী দামী জামার টেই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হচ্ছে যে জামাই হোক সর্বদা পরিষ্কার রিচ্ছন্ন রাখা ; দরকার হলে একটি বেশী দামী জামার পরিবর্তে দুটি ম দামী জামা কেনা। ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তার স্বাস্থ্যের পর ; যদি তার কোন অসুখ থাকে, সে অসুখের চিকিৎসায় টাকা খরচ রাটাই হবে টাকার সদ্ব্যবহার, কিন্তু তা না করে অসুস্থ ছেলের গায়ে টাকা চ করে গয়না তৈরী করে দেওয়াটা হবে টাকার নিতান্ত অপব্যবহার। র্যাপ্ত অর্থ না থাকলে ছেলে হলে মিষ্ট বিতরণ করার কোনই য়োজন নেই ; প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্যে প্রসবের ব্যবস্থা রা, কারণ অশিক্ষিতা দাইএর সাহায্যে প্রসব করালে অনেক সময়ে মা এবং শিশু উভয়েরই মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। কোন উৎসব বা ক্রিয়া-কাণ্ডে নিজের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর না রেখে অর্থ ব্যয় করায় নিজের কোন কৃতিত্ব তো নেই-ই, বরং নিতান্তই অশোভনীয়। এতে পরে অর্থাভাবে নিজেরও কষ্ট পেতে হয়, পরিবারের অন্য সবাইকেও কষ্ট দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে প্রথম কর্তব্য হবে দৈনন্দিন জীবনে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ; নিত্য প্রয়োজনীয় যা কিছু দরকার, তার যেন কোনদিনই অভাব না হয়। এমনভাবে অর্থ কিছুতেই ব্যয় করা উচিত নয়—যার ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্যের, জামা কাপড়ের এবং অসুখ করলে চিকিৎসার সংস্থান সম্ভব হবে না। দৈনন্দিন জীবনের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে নিয়মিত আয় ও কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সব রকম অপচয় বন্ধ করতে হবে।

সহরবাসীর মনে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে—গ্রামের লোকের তো বুদ্ধির অভাব নেই, বিশেষতঃ বৈষয়িক বুদ্ধি তাদের যথেষ্ট, তবুও নিজেদের সম্বন্ধে তারা এত নিশ্চেষ্ট কেন? গ্রামে অনেক কিছু করবার রয়েছে, গ্রাম-বাসীদের অবসরও অফুরন্ত, তবুও তারা কোন মতে দিন চলে গেলেই হল এ ভাব নিয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে কেন? প্রধান কারণ এই—তারা নিজের ওপর বিশ্বাস অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে—তাদের নির্ভর করতে হয় অনেকটা প্রকৃতির ওপর, নিজেদের ওপর নয়। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চাষ করলো, কিন্তু কোন ফল হ'ল না ; অনাবৃষ্টি না হয় বন্যা এসে সবটা ফসলই নষ্ট করে দিয়ে গেল। দেশে মড়ক লাগলো, গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিয়ে গেল, কোন প্রতিকারই হ'ল না। এতে নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবারই কথা। আজ গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিতে হবে তারা সত্যসত্যই অতটা অসহায় নয় ; অনাবৃষ্টি হলেও তারা জলের ব্যবস্থা করতে পারে। বান এলেও সে বানের জল তারা রুকতে পারে ; দেশে মড়ক লাগলেও প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারে, কিন্তু এর জন্য চাই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান, আর সেজন্য সমবেত প্রচেষ্টা।

গ্রামবাসীদের এ চেতনা জাগিয়ে তোলাই আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এবং এ জন্য দরকার গ্রামে গ্রামে একনিষ্ঠ কর্মী—যাদের প্রেরণা জোগাবেন গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম কর্তব্য হবে গ্রামবাসীদের নিশ্চল মনে একটা চঞ্চলতা এনে দেওয়া—ভালভাবে থাকবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা। এ আকাঙ্ক্ষা শুধু মনে মনে পোষণ করলেই তাদের চলবে না—সফল করবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে—অলসতা দূর করতে হবে, নিজের পায় দাঁড়াতে হবে, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করতে হবে। শুধু তাই নয় ; নিজের নিজের পরিবারের বা নিজের বাড়ীখানার উন্নতি-সাধনই ভালভাবে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভালভাবে থাকতে হলে গ্রামে অনেক কিছুই দরকার—যা সমবেত প্রচেষ্টা ভিন্ন কখনই সম্ভবপর হয় না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আভীরপল্লী

বাংলা দেশের বহু প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়, সেকালে ময়ূরাক্ষী নদীর একটি সখী-নদী ছিল; কজঙ্গলের পর্বতসানু হইতে নিঃসৃত হইয়া নদীটি কর্ণসুবর্ণ নগরের নিকট ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। তারপর দুই সখী একসঙ্গে কিছুদূর দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়া নদীটি এখন আর নাই; হয়তো মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, হয়তো অন্য নামে অন্য খাতে বহিতেছে। তাহার পুরাতন নামও মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ হইতে অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এই নদীর নাম ছিল ময়ূরী, চলিত কথায় মৌরী-নদী। গৌড়বঙ্গের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে।

মৌরী নদী ময়ূরাক্ষী অপেক্ষা ক্ষীণা। বর্ষায় তাহার জল দুকূল ছাপাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাপগমে আবার জলধারা শীর্ণ ও স্বচ্ছ হইয়া খাতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে। তখন আর তাহার বুকে বড় নৌকা চলে না, তাহার তীর রেখার পাশে পাশে মানুষের পদচিহ্ন-মসৃণ পথ জাগিয়া ওঠে।

এই পদাঙ্ক চিহ্নিত রেখা ধরিয়া উজান পথে গমন করিলে মৌরীর তীরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। রাজধানী হইতে যত দূরে যাওয়া যায় গ্রামের সংখ্যা ততই বিরল হইয়া আসে। অবশেষে কর্ণসুবর্ণ হইতে অনুমান ত্রিংশ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে একটি গ্রামে আসিয়া পথ শেষ হয়। ইহাই শেষ গ্রাম, ইহার পর আর গ্রাম নাই।

গ্রামটি আভীরপল্লী; নাম বেতসগ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বেকার গৌড়দেশের এক প্রান্তে মৌরী নদীর তীরে এই ক্ষুদ্র গ্রামের কয়েকটি নরনারীকে লইয়া এই কাহিনী।

আভীরপল্লীর বেতসগ্রাম নামটি সার্থক। নদী ও গ্রামের ব্যবধানস্থলটুকু ঘন বেতসবনে পূর্ণ। নদীর পূর্বতীরে উচ্চ বাস্তুভূমির উপর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত, গ্রাম হইতে বেতসবনের ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে হয়। নদীর সরসতায় পুষ্ট বেতসলতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া ঊর্ধ্বে বিতান রচনা করিয়াছে; যেন এক একটি নিভৃত কুটীর-কক্ষ। মধ্যাহ্নেও এই কুঞ্জ-কুটীরগুলির অভ্যন্তরে সূর্যের তাপ প্রবেশ করে না; ভূমিতলে স্খলিত পত্রের কোমল আস্তরণ সুখশয্যা রচনা করে।

এই বঞ্জুল-কুঞ্জগুলি গ্রামের বিরাম নিকেতন। এখানে বালকবালিকারা লুকোচুরি খেলা করে; ক্লান্ত কৃষাণ দ্বিপ্রহরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে; কিশোরী সখীরা গলা ধরাধরি করিয়া মনের কথা বিনিময় করিতে যায়; কদাচিৎ কন্দর্পপীড়িত যুবকযুবতী গোপনে সংকেতকুঞ্জে অভিসার যাত্রা করে। প্রকৃতির কোলে সহজ মধুর মন্থর জীবনযাত্রা। জটিলতা নাই, আড়ম্বর নাই, উদ্বেগ নাই। মহাকাল এখানে অতি মৃদুচ্ছন্দে পদপাত করেন।

গ্রামের পশ্চিমদিকে যেমন বঞ্জুলবন ও মৌরী নদী, দক্ষিণদিকে তেমনি ইক্ষু ও ধানের ক্ষেত। ধান্য ইক্ষু ও গোধন, এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ধান্য হইতে যে চাউল হয় তাহা গ্রামেই থাকে। বাঙালী চিরদিন অন্নভোজী জীব; ভাত তাহার অন্ন, ভাত তাহার পানীয়। বাঙালীই প্রথম ভারতে ভাত হইতে তীব্র পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

তারপর গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী; আর ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়ই দেশের প্রাণবস্তু; গুড় হইতেই দেশের নাম গৌড়। আভীরগণ ঘৃত নবনী ও গুড় ভারে

অথবা উজ্জ্বল শ্যাম; দুই চারিটি নবদূর্বাশ্যাম, কদাচিৎ এক আধটি গোধূমবর্ণ। এই গ্রামের মেয়ে রঙ্গনা এমন অপূর্ব পাণ্ডুশ্রী কোথায় পাইল?

প্রশ্নটি কেবল আলঙ্কারিক প্রশ্ন নয়; একদিন এই প্রশ্ন গ্রামের সকল স্ত্রীপুরুষকে উচ্চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে যাক। এত রূপ লইয়াও রঙ্গনার এখনও বিবাহ হয় নাই। গ্রামের নিয়ম, কন্যার যৌবন-উন্মেষ হইলেই বিবাহ হইবে। কিন্তু রঙ্গনা পূর্ণযৌবনা হইয়াও এখনও অবিবাহিতা।

রঙ্গনা বারবার ঘর-বাহির করিতেছিল, আর তাহার সতৃষ্ণ চক্ষুদুটি ছুটিয়া যাইতেছিল ঐ মাঠের দিকে যেখানে তাহারই সমবয়স্কা মেয়েরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া নূপুর কঙ্কণ বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে। রঙ্গনার চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হইতেছিল সে বুঝি এখনি ছুটিয়া গিয়া ওই নৃত্যাবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবে; কিন্তু আবার অভিমানে অধর দংশন করিয়া সে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার যৌবন-ভরা মনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ যেন ঐখানে পুঞ্জিত হইয়া আছে; কিন্তু ওখানে তাহার যাইবার উপায় নাই।

গোপা সূতা কাটিতে কাটিতে মেয়ের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার কঠিন দৃষ্টি মাঝে মাঝে মাঠের দিকে যাইতেছিল; অধরের দৃঢ়বদ্ধ রেখা বাঁকিয়া উঠিতেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার টাকুতে মন দিতেছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি তুলিয়া গোপা ডাকিল—'রাঙা!'

রঙ্গনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল—'তোর ঘরের কাজ সারা হল?'

রঙ্গনা বলিল—'হাঁ মা।'

'তবে নদীতে যা। নেয়ে জল নিয়ে আসবি।'

'যাই মা।'

রঙ্গনা কলসী আনিতে ঘরের ভিতর গেল। তাহার একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। সে যখন কলসী কাঁখে কুটীর হইতে বাহির হইল তখন গোপাও তাহার পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঙ্গনার জন্মকথা

কুটীর হইতে বাহির হইয়া রঙ্গনা মাঠের দিকে গেল না. যদিও মাঠের ভিতর দিয়াই নদীতে যাইবার সিধা পথ। সে কুটীরের পিছন দিক ঘুরিয়া নদীরপানে চলিল। মাঠের ভিতর দিয়া যাইলে সকলে তাহাকে দেখিতে পাইবে, হয়তো কেহ কিছু বলিবে। তাহাতে কাজ নাই।

চলিতে চলিতে রঙ্গনার কালো চোখ দুটি ছলছল করিতে লাগিল। আবার একটি নিশ্বাস পড়িল।

ক্রমে সে বেতসবনের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। এই দিকটা বেতসবনের শেষ প্রান্ত; তেমন ঘন নয়। এখানে ওখানে দুই চারিটা ঝোপ, যত নদীর দিকে গিয়াছে তত ঘন হইয়াছে।

এইখানে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে একটি নিভৃত বেতসকুঞ্জ ছিল; এটি রঙ্গনার নিজস্ব, আর কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। পাখীর খাঁচার মত চারিদিকে জীবন্ত শাখাপত্র দিয়া ঘেরা নিরালা একটি স্থান; এই স্থানটিকে সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া রঙ্গনা কুটীর-কক্ষের মতই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে যখন ঘরে মন টিকিত না বা হাতে কাজ থাকিত না তখন সে চুপিচুপি এই কুঞ্জে আসিত। কয়েকটি খড়ের আঁটি আগে হইতেই কুঞ্জে সঞ্চিত ছিল, তাহাই বিছাইয়া শয়ন করিত। নির্জন দ্বিপ্রহরে পত্রান্তরাল-নির্গলিত সবুজ আলো উপর হইতে ঝরিয়া পড়িত; রঙ্গনা সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া যৌবনের কল্পকুহকময় স্বপ্ন দেখিত। কখনও একজোড়া মৌটুসী পাখী আসিয়া শাখাপত্রের মধ্যে খেলা করিত; কখনও দূর আকাশে শঙ্খচিল ডাকিত। এইভাবে তাহার নিঃসঙ্গ তন্দ্রামন্থর মধ্যাহ্ন কাটিয়া যাইত।

আজ রঙ্গনা মাতার আদেশ অনুযায়ী নদীতে না গিয়া প্রথমে তাহার কুঞ্জে আসিয়া ক্লান্তভাবে কলস নামাইয়া বসিল। মনের মধ্যে যখন অভিমান ও অভীপ্সার মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে তখন শরীর অকারণেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রঙ্গনা দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঠ এখান হইতে অনেকটা দূরে, তবু নৃত্যপরা যুবতীদের কণ্ঠোত্থিত ঝুমুর গান বংশীর সহযোগে তাহার কানে আসিতে লাগিল—

ও ভোমরা সুজন, তুমি কাছে এস না
আমার রসের কলস উছলে পড়ে
কাছে এস না।

রঙ্গনা চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল—কেন। কেন

আমি ওদের একজন নই? কেন সবাই আমাকে দূরে ঠেলে রাখে? কেন আমার বিয়ে হয়নি। কেন আমার মা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে? কেন? কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে রঙ্গনার জন্মকথা বলিতে হয়।

আঠারো বছর আগে গোপার স্বামী দারুক বেতসগ্রামের অধিবাসী ছিল। গোপার বয়স তখন একুশ বাইশ; দারুকের বয়স ত্রিশ। কিন্তু তাহাদের সন্তান হয় নাই। এই লইয়া স্ত্রী-পুরুষে কলহ কোন্দল লাগিয়া থাকিত। দারুক রাগী মানুষ, গোপাও অতিশয় প্রখরা; উভয়ে উভয়কে দোষ দিত। গাঁয়ের লোক হাসিতে হাসিতে তামাসা দেখিত।

একদিন বসন্ত কালের প্রভাতে দাম্পত্য কলহ চরমে উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীরা কুটীর সম্মুখে সমবেত হইয়া বাগযুদ্ধ উপভোগ করিতেছিল এবং শব্দভেদী সমর কখন দোর্দণ্ড রণে পরিণত হইবে উদ্‌গ্রীবভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। দেখা গেল, গো-রথে আরোহণ করিয়া একজন আগন্তুক গ্রামে প্রবেশ করিতেছে।

গ্রামে বহির্জগৎ হইতে বড় কেহ আসেনা, উদ্দীপনা উত্তেজনার অবকাশ বড় অল্প। সুতরাং গ্রামের যে-যেখানে ছিল সকলে গিয়া গো-রথ ঘিরিয়া দাঁড়াইল; স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, কুকুরবিড়াল, কেহই বাদ গেল না। এমন কি দারুক ও দাম্পত্য কলহ ধামা চাপা দিয়া মাঠে আসিয়া জুটিল।

মাঠের মাঝখানে গো-রথ থামাইয়া যিনি অবতরণ করিলেন তিনি একজন রাজপুরুষ, নাম কপিলদেব। অতি সুন্দর আকৃতি, বলদৃপ্ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ। পরিধানে যোদ্ধবেশ, মস্তকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ কটিদেশে তরবারি। পরমদৈবত শ্রীমন্মহারাজ শশাঙ্কদেবের পক্ষ হইতে ইনি সৈন্য-সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন।

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক তখন হর্ষবধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। রাজ্যবর্ধনের অপমৃত্যুর ফলে উত্তর ভারতে যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পৃথিবী গৌড়শূন্য করিবেন, গৌড়পত্তন শশাঙ্কের রাজ্য ছারখার না করিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। বছরের পর বছর যুদ্ধ চলিয়াছে; শশাঙ্কের কান্যকুব্জ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যসীমা ক্রমশ পূর্বদিকে হটিয়া আসিতেছে। যুদ্ধে ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হইতেছে; তাই নিত্য নূতন সৈন্যের প্রয়োজন। গৌড় রাজ্যের প্রতি গ্রামে প্রতি জনপদে রাজপুরুষগণ পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন।

বেতসগ্রামে ইতিপূর্বে কেহ সৈন্য সংগ্রহে আসে নাই, কপিলদেবই প্রথম। কপিলদেবের আকৃতি যেমন নয়নাভিরাম, বচন-পটিমাও তেমনি মনোমুগ্ধকর। তিনি সমবেত গ্রামিকমণ্ডলীকে নিজ আগমনের উদ্দেশ্য সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। গৌড়-গৌরব শশাঙ্কদেব উত্তর ভারতে অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, রণদুর্মদ গৌড়-সৈন্যের পরাক্রমে আর্যাবর্ত থরথর কম্পমান। যে সকল বীর গৌড়বাসী যুদ্ধে যাইতেছে তাহারা বহু নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। এস, কে যুদ্ধে যাইবে—কে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিবে? তে নির্যান্ত ময়া সহৈকমনসো যেষাং অভীষ্টং যশঃ।

প্রথমেই দারুক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'আমি যুদ্ধে যাব।'

আরও দুই চারিজন নবীন যুবক তাহার সহিত যোগ দিল। কপিলদেব তাহাদের বলিয়া দিলেন—কোথায় গিয়া রাজসৈন্যদের সহিত মিলিত হইতে হইবে। কপিলদেব নিজে তাহাদের সহিত যাইবেন না, আজ রাত্রে গ্রামে বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রাতে কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া যাইবেন।

দারুক লাফাইতে লাফাইতে নিজ কুটীরে ফিরিয়া গিয়া সদর্পে পিঠে ঢাল বাঁধিল, হাতে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রাকালে গোপাকে শাসাইয়া গেল—'যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আর একটা বিয়ে করব। দেখিস্ তখন ছেলে হয় কিনা।'

গোপা খরশান চক্ষে চাহিল। তাহার জিহ্বায় যে কথাটা উদ্‌গত হইয়াছিল তাহা সে অধর দংশন করিয়া রোধ করিল। দারুক বীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল।

কপিলদেব গ্রামে রহিলেন। গ্রামের মহত্তর সসম্মানে রাজপুরুষকে স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিলেন। দধি দুগ্ধ ছাগবৎস প্রভৃতি চব্যচুষ্যেরও প্রচুর আয়োজন হইল। রাজপুরুষ মহাশয় কিছুই অবহেলা করিলেন না।

অন্যান্য গুণাবলির সঙ্গে রাজপুরুষ মহাশয়ের আর একটি সদ্‌গুণ ছিল; সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত। গোপাকে তিনি দেখিয়াছিলেন; তাঁহার অভিজ্ঞ চক্ষের মানদণ্ডে গোপার রূপ-যৌবন তুলিত হইয়াছিল। অবশ্য সামান্যা পল্লীবধূ নগরকামিনীর বিলাস-বিভ্রম কোথায় পাইবে? কিন্তু মধুর অভাব গুড়ের দ্বারা পূরণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদবাক্য আছে। সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? রাজকার্যে ভ্রাম্যমাণ সৈন্য-সংগ্রাহকের মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনেরও তো প্রয়োজন আছে!

সেদিন অপরাহ্ণে গোপা নিজের দ্বার-পিণ্ডিকায় বসিয়া তুলার পাঁজ কাটিতেছিল। তাহার অন্তরের ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। দারুক তাহাকে মিথ্যা দোষ দিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইহার প্রতিশোধ যদি সে লইতে পারিত! কিন্তু সে কী করিবে? নারী তো আর যুদ্ধে যাইতে পারে না—

একটি মধুর কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত চিন্তার উপর যেন কোমল করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিল—'সুচরিতে, তোমার কাছে আমি বড়ই অপরাধী—'

গোপা চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, কান্তিমান রাজপুরুষ স্মিতমুখে কুটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গোপা জড়সড় হইয়া চক্ষু নত করিল।

কপিলদেব অনাহূত দেহলীর এক প্রান্তে বসিলেন। দক্ষিণ হইতে ঝিরি ঝিরি বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোপার কর্ণে তালপত্রের লঘু অবতংস দুলিতেছে। কপিলদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে মানুষকে কত অপ্রীতিকর কাজ করিতে হয়, কত সুখের সংসারে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হয়। গ্রামবধূরা স্বভাবতই পতিপ্রাণা হইয়া থাকে—

এই কথা শুনিয়া গোপা অধরের ঈষৎ ভঙ্গী করিয়া ভ্রূকুটি করিল, কপিলদেব তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি তৃপ্ত মনে অন্য কথা পাড়িলেন। নগরের নানা কথা; গ্রাম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। গোপা প্রথমে নীরব রহিল, তারপর একাক্ষর উত্তর দিল; শেষে দুই একটি কথা বলিল।

তারপর তাহাদের চক্ষু এক সময় পরস্পর আবদ্ধ হইয়া গেল। চোখে চোখে যে কথার বিনিময় হইল তাহা জীবনের আদিমতম কথা, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

কপিলদেব গ্রামে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষেই গো-রথে আরোহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গ্রামের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কপিলদেব যে গভীর রাত্রে গোপার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা একজন বিনিদ্র প্রতিবেশীর চক্ষু এড়ায় নাই। কথাটা কিন্তু কানাঘুষার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল, প্রকাশ্যে কেহ গোপার নামে কোনও রটনা করিতে সাহস করিল না। প্রমাণ তখন বলবান নয়; গোপা বড় মুখরা; তাহার নামে এরূপ অপবাদ দিলে সেও ছাড়িয়া কথা কহিবে না।

ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেল। গোপার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে নিজেই তাহা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিল। কাহারও দোষ ধরিবার উপায় ছিল না, তবু গ্রামের কৌতুক-কৌতূহলী রসনা আর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। রসিক ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ভাগ্যে রাজপুরুষ আসিয়া দারুককে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল তাই তো দারুকের বংশরক্ষা হইল।

দারুক আর যুদ্ধ হইতে ফিরিল না। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মুদ্‌গগিরির যুদ্ধে দারুক মরিয়াছে। গোপা হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া কপালের সিন্দুর মুছিল।

তারপর যথাসময়ে, দারুক যুদ্ধে যাইবার নয় মাস পরে, গোপা এক কন্যা প্রসব করিল। এই ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত ছিল, সুতরাং ইহা লইয়া অধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টির কথা নয়। কিন্তু জানা গেল, সদ্যপ্রসূত কন্যাটির গাত্রবর্ণ দুগ্ধফেনের ন্যায় শুভ্র! ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? দারুকের বর্ণ ছিল ধান-সিদ্ধ-করা হাঁড়ির তলদেশের ন্যায়, গোপাকেও বড় জোর উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে। তবে কন্যা এমন গৌরাঙ্গী হইল কেন? গোপার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। এত বড় প্রমাণ হাতে পাইয়া কেহই চুপ করিয়া রহিল না।

কন্যা জন্মিবার একুশ দিন পরে গ্রামের মহত্তর মহাশয় গোপার কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোপা কুটীরের মধ্যে কন্যা কোলে লইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'সকলে জানতে চাইছে তোমার মেয়ে এমন ফরসা হল কি করে?'

গোপা মুখ কঠিন করিয়া বলিল—'আমি দেবস্থানে রাঙা ডাব মানত করেছিলাম, তাই রাঙা মেয়ে হয়েছে।'

মহত্তর মহাশয় বয়সে প্রবীণ, তিনি একটু হাসিলেন। লেন—'গোপাবৌ, আমরা তোমাকে বেশী শাস্তি দিতে না। যা হবার হয়েছে। তুমি পাঁচ কাহন দণ্ড দিলে ৷ কেউ কিছু বলবে না।'

কিন্তু দণ্ড দিলেই প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করা গোপা শক্ত হইয়া বলিল—'আমি এক কানাকড়ি দেবনা।'

মহত্তর বিরক্ত হইলেন। 'না দাও তুমি সমাজে পতিত বে। তোমার জারজ সন্তানের বিয়ে হবে না।' বলিয়া তনি চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর সমস্ত গ্রাম গোপার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। গোপা যদি গ্রামের শাসন মানিয়া লইত তাহা হইলে তাহার অপরাধ কেহ মনে রাখিত না, দু'দিন পরে ভুলিয়া যাইত। এমন তো কতই হয়। কিন্তু গোপা দণ্ড দিল না; সে ভাঙ্গিবে তবু মচ্‌কাইবে না। গ্রামের লোক তাহার স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিল। নষ্ট স্ত্রীলোকের এত তেজ কিসের!

এরূপ অবস্থায় এক নিঃসহায় রমণীর গ্রামে বাস করা কঠিন হইত। কিন্তু দেবস্থানের পূজারী চাতক ঠাকুর দয়ালু লোক ছিলেন; অনাথা স্ত্রীলোক যাহাতে অনাহারে না মরে তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার প্রভাবে গাঁয়ের লোকের রাগও কিছু পড়িল। কিন্তু গোপার সহিত গায়ে পড়িয়া কেহ সদ্ভাব স্থাপন করিতে আসিল না। গোপাও শক্ত হইয়া রহিল।

গোপার মেয়ে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ফুলের মতন সুন্দর টুকটুকে মেয়েটির চাতক ঠাকুরই নাম রাখিলেন - রঙ্গনা। কিন্তু রঙ্গনার সহিত গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলা করেনা; তাহারা খেলা করিতে চাহিলে তাহাদের বাপ-মা তাড়না করে। রঙ্গনা কাঁদে, মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়ে। গোপা মেয়েকে বুকে চাপিয়া গলদশ্রুনেত্রে তিরস্কার করে—'ওরা তোর সমান নয়। তুই ওদের সঙ্গে খেলবি না।'

রঙ্গনা যখন কিশোরী হইল তখন সে নিজেই সমবয়স্কাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে শিখিল। গ্রামে তাহার সমবয়স্কা যত মেয়ে আছে সকলকে সে চেনে, সকলের নাম জানে; কিন্তু কাহারও সহিত মেশে না। কদাচিৎ নদীর ঘাটে কোনও মেয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা হয়, তাহার বেশী নয়। অন্য মেয়েরাও রঙ্গনার সহিত মিশিতে উৎসুক; তাহার রূপের জন্য অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিতা, তবু রঙ্গনা তাহাদের আকর্ষণ করে। সে কেন তাহাদের একজন নয়, কিশোরীরা তাহা ভাল করিয়া জানে না। রঙ্গনাকে লইয়া নিত্য তাহাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হয়, কিন্তু নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কেহই তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে সাহস করেনা।

রঙ্গনার সমবয়স্কাদের একে একে বিবাহ হয়। বিবাহে নৃত্যগীত উৎসব হয়। কিন্তু রঙ্গনা তাহাতে যোগ দিতে পারে না। রঙ্গনার বিবাহের কথাও কেহ তোলেনা। গ্রামের দুই চারিজন অবিবাহিত যুবক দূর হইতে তাহার পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বটে, কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সাহস কাহারও নাই। আর, রঙ্গনার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না; গোপার তীক্ষ্ণ চক্ষু ও শাণিত রসনাকে সকলেই ভয় করে।

এই ভাবে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া রঙ্গনা যৌবনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। শৈশবে নিঃসঙ্গতার বেদনা শিশুই জানে।—কৈশোরে সঙ্গিসাথীর অভাব মর্মপীড়াদায়ক। কিন্তু নিঃসঙ্গ যৌবনের অন্তর্দাহ বড় গভীর যন্ত্রণাময়। (ক্রমশঃ)

শুচীন্দ্রম্

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ-ভ্রমণ লীলা-প্রসঙ্গে প্রভুর মোক্ষণতীর্থে পদার্পণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিবার কথা উক্ত। * আমরা দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে এই গজেন্দ্রমোক্ষণ-যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম ; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে স্থানের প্রকৃত নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। কন্যা কুমারিকা হইতে যাইবার পথে ৮ মাইল উত্তরে দেবেন্দ্রমোক্ষণ বা 'শুচীন্দ্রম্' একটি সুপ্রাচীন তীর্থস্থান আছে। এই গ্রামটি ত্রিবাঙ্কুর জেলার র্গত। কিন্তু ইহা গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থ বলিয়া পরিচিত নহে। মলয়-পেরুমল শুচীন্দ্রম্ বা দেবেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থের প্রধান দেবতা। ণু=শিবলিঙ্গ, মল=বিষ্ণু, অয়=ব্রহ্মা)—এই ত্রিমূর্তি এক স্বরূপে স্থানে অধিষ্ঠিত। শুচি+ইন্দ্রম্=শুচীন্দ্রম্—যে স্থানে ইন্দ্রের পবিত্রতা সাধিত হইয়াছিল, তাহাই 'শুচীন্দ্রম' নামে খ্যাত। যদি এই দেবেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থকে 'গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং এই স্থানের বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার একই স্বরূপাধিষ্ঠানে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণু দর্শন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা হয় অথবা এই স্থানে শিবমন্দিরের দক্ষিণে যে একটি পৃথক শ্রীবিষ্ণু-মন্দির আছে, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণু দর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেবেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই স্থানে যে পেরুমল-চতুর্ভুজ বা চতুর্ভুজ-শ্রীবিষ্ণুমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা এক বিশাল কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী দণ্ডায়মান মূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর হস্তে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রা এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীমহালক্ষ্মী। এই মূল অচল-মূর্তির সম্মুখে শ্রী ও ভূদেবীর সহিত ধাতুময়ী চতুর্ভুজ-উৎসবমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীবিষ্ণুর মূল মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শেষ শয্যায় শায়িত অনন্ত-পদ্মনাভমূর্তি। আর্কটের নবাব চাঁদা সাহেবের সৈন্যগণ পদ্মনাভমূর্তির সংলগ্ন বলিমণ্ডপের চতুর্দিকে অবস্থিত দীপদানকারিণী শ্রীমূর্তিগুলিকে ভগ্ন করিয়া দিয়াছিল। উহার নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। শুচীন্দ্রমে শিব ও বিষ্ণু উভয় প্রকার শ্রীমূর্তির অবস্থানহেতু শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার অর্চকই অর্চন করিয়া থাকেন।

শুচীন্দ্রম্

ইন্দ্রমোক্ষণতীর্থ পূর্বে একটি গভীর অরণ্যে পরিবেষ্টিত ছিল। উহা 'জ্ঞানারণ্যম্' নামে উক্ত হইত। এই অরণ্যে একমাত্র মহর্ষি অত্রি ভার্যা অনসূয়ার সহিত বাস করিতেন। অত্রি ঋষির আশ্রম শুচীন্দ্রমের পশ্চিমভাগে যে গ্রামে অবস্থিত ছিল, তাহা অদ্যাপি 'আশ্রমম্' নামে অভিহিত হয়। কথিত হয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ইন্দ্র এই স্থানে এক লিঙ্গস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারও পূর্বে এই জ্ঞানারণ্যে বনবাস কালে শ্রীযুধিষ্ঠির মহাদেবকে, দ্রৌপদী শ্রী দুর্গা দেবীকে, ভীম শ্রীসুদর্শন চক্রকে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে, নকুল নারায়ণীশ্বরীকে (কাশী-শিবলিঙ্গকে) ও সহদেব রামেশ্বরকে স্থাপন করেন। এই ছয় মূর্তি শুচীন্দ্রম্-মন্দিরের পশ্চিমভাগে দৃষ্ট হয়। স্থাণুমলয় পেরুমল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন মূর্তি মিলিয়া এক লিঙ্গ। লিঙ্গের উপর স্বর্ণ বিল্বপত্র, তদুপরি সুবর্ণ ষোড়শ চন্দ্রমা। এই লিঙ্গ সাধারণতঃ 'শুচীন্দ্রম্'-মহাদেব নামে কথিত। কন্যাকুমারীর অবতার ধর্ম-সম্বর্দ্ধিনীর সহিত এই স্থানের মহাদেবের বিবাহ হয়। ইনি দ্বিভুজা। শিবমন্দিরের পূর্বোত্তর ভাগে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের পূর্বোত্তরে পূর্বগোপুরমের সংলগ্ন সভামণ্ডপ। এই স্থানে দেবতাগণ সভা করিয়া ইন্দ্রকে তপ্ত ঘৃতে স্নান করাইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা ইন্দ্র শুচী হইয়াছিলেন। নিকটেই 'ইন্দ্রতীর্থ' নামক একটি কূপ ও ইন্দ্র-

* গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি।
।।নাগড়ি-তীর্থে আসি দেখিল সীতাপতি ॥—চৈঃ চঃ ম ৯।২২১

গণেশ নামক গণপতির মূর্তি। ইন্দ্র এই কূপে স্নান করিয়া পরে গণেশের পূজা করিয়া প্রত্যহ মহাদেবের পূজা করেন।

শুচীন্দ্রমের মন্দিরটি অতি বিরাট্‌ ও অপূর্বদর্শন। ইহার সম্মুখে পূর্বাভিমুখী একটি সপ্ত-তলা-বিশিষ্ট সুন্দর কারুকার্যখচিত গোপুরম্‌ আছে। গোপুরমটি প্রায় ১২০ ফুট্‌ উচ্চ। মন্দিরের উত্তরভাগে 'তপঃকুলম্‌' নামে একটি প্রস্তর-সোপান-মণ্ডিত বিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ আছে। শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের উৎসবমূর্তি নৌকাবিহার-উৎসবকালে এই স্থানে আগমন করেন। মন্দিরের প্রবেশ মুখে (১) দক্ষিণামূর্তি (বৃহস্পতি—দেবগুরু); (২) গরুড়, (৩) গরুড়ের দক্ষিণে তিরুমল-নায়কের দণ্ডায়মান মূর্তি।—(যিনি মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন); (৪) সুপ্রাচীন (স্থানীয় ব্যক্তিগণের মতে দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন) চম্পক বৃক্ষ; পশ্চাতে ও উহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের যুগমণ্ডলত্রয়, তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের প্রথম মন্দির; তৎপরে (৫) নন্দী (বৃষবাহন); (৬) বসন্ত মণ্ডপ—ইঁহার চন্দ্রাতপে প্রস্তরে খোদিত নবগ্রহের মূর্তি;—(৭) নীলকণ্ঠ-বিনায়ক (মায়াগণেশ বা শক্তিগণেশ একটি বিরাট্‌ কৃষ্ণ-প্রস্তরের গণপতি-মূর্তি; তাঁহার বাম ক্রোড়ে মায়া বা শক্তি); (৮) কাঙ্গালনাথ শঙ্কর—(ইনি ব্রহ্ম-কপাল হস্তে অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছেন); (৯) শ্রীভূতবলি মণ্ডপম্‌—(চতুর্দিকে স্তম্ভের মধ্যে খোদিত নারীমূর্তি ও উহাদের হস্তে চৌদ্দশত প্রদীপমালা। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এই সকল প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়)।

ভূতবলিমণ্ডপের উত্তরে একটি পর্বতখণ্ডের উপর শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ইহাতে শুচীন্দ্রমের ইতিহাস পালিভাষায় খোদিত আছে।

এখানে অগস্ত্য ঋষি যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা 'কৈলাসনাথ' নামে পরিচিত। কৈলাসনাথ-মন্দিরের বহির্দেশে ও পর্বত-গাত্রমধ্যে শিলালেখ আছে। উচ্চ প্রদেশে পাহাড়ের গাত্রে যে স্থানে কৈলাসনাথের মন্দির, তাহা 'কৈলাস' নামে খ্যাত। উপরে একটি বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ ছায়া প্রদান করিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে উভয় দিকেই শিলালিপি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পশ্চিম-কোণে হরিহরনাথ দ্বিভুজ মূর্তি; পশ্চিমোত্তর কোণে পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। লক্ষ্মণ ও হনুমান বাহিরে দণ্ডায়মান। উত্তর-পূর্ব কোণে হনুমানের বিরাট্‌স্বরূপ অর্থাৎ বিশালকায় বজ্রাঙ্গজীর মূর্তি।

'জ্ঞানারণ্যম্‌' ছিল। দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে পাণ্ডবগণ নামক এক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানারণ্যে মহর্ষি অত্রি সহ অনুসূয়ার সহিত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মার দর্শনার্থ কঠোর আ করেন। উক্ত ত্রিমূর্তি অনুসূয়াকে দর্শন দান করিবার পূর্বে পরীক্ষা করেন। অত্রি ঋষির অনুপস্থিতিকালে তাঁহার আশ্রমে বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনজন উলঙ্গ সাধুর মূর্তিতে অনুসূয়ার নিকট হইয়া তাঁহাকে বিবস্ত্রা হইয়া ভোজন দান করিবার জন্য অ করিলে অনুসূয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে উক্ত তিন মূর্তিকে শিশুরূপে প করেন এবং তাঁহাদিগকে বাৎসল্যভরে স্তন্য পান করাইয়া পালন করেন।

এদিকে গৌতমশাপগ্রস্ত ইন্দ্র শ্রীনারদের শরণাগত হইলে ইন্দ্রকে জ্ঞানারণ্যস্থিত যে পিপ্পলবৃক্ষের তলে উক্ত ত্রিমূর্তি অ ছিলেন, তথায় লইয়া যান। উক্ত পিপ্পলবৃক্ষ চারিযুগে যথাক্রমে পি

শুচীন্দ্রম্‌ মন্দিরের গোপুরম্‌ ও তপঃকুলম্‌

তুলসী, বিল্ব ও কোন্নই বৃক্ষের আকার ধারণ করে। অদ্যাপি শুচী মন্দিরে সহস্র বৎসরের পুরাতন একটি কোন্নই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উ পাদদেশে ত্রিমূর্তির শ্রীমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীনারদের সহিত জ্ঞানারণ্যে প্রজ্ঞাতীর্থের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় তাঁহার স্থাপন করিয়া উক্ত পিপ্পলবৃক্ষের পাদদেশে আগমন করেন। যে ইন্দ্র রথ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'রথগ্রাম' (দিরু দিঃ = রথ, উর = গ্রাম) নামে কথিত হয়। শিবভৃত্য নন্দী ইন্দ্র বিমানে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিয়া বৃহস্পতির শরণাগত হ বলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির শরণ গ্রহণ করিলে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে গণপতি ও নন্দীর নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন এবং তৎপরে ইন্দ্র তপ্ত ঘৃতকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া অষ্টোত্তর-সহস্র মন্ত্র পাঠ করিবার উপ প্রদান করেন। বৃহস্পতির আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ইন্দ্র জ্ঞানার

পশ্চিমঘাট হইতে জল আনয়ন করিবার আদেশ করেন। ঐরাবত তাঁহার দন্তের দ্বারা নদীগর্ভ রচনা করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং প্রজ্ঞাতীর্থের পশ্চিমতটে কিছুকাল বিশ্রাম করে। সেই সময় হস্তী পিপ্পলবৃক্ষের একটি শাখা ভঙ্গ করায় ঐ শাখাটি তপস্যানিরত বেদব্যাসের উপর পতিত হয়। বেদব্যাস হস্তীকে 'প্রস্তরে পরিণত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। অদ্যাপি উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমতটে হস্তীর আকারবিশিষ্ট বৃহৎ শৈলখণ্ড দৃষ্ট হয় এবং নদী 'দন্তনদী' নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 'প্রজ্ঞাতীর্থ' নামক কুণ্ডটী মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

ইন্দ্র ঐরাবতের আনীত জলে স্নান করিয়া গণপতি ও নন্দীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া উক্ত পিপ্পলবৃক্ষের পরিক্রমা করেন এবং তথায় একটি ফুটন্ত তপ্ত ঘৃতভাণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এইভাবে ইন্দ্র এই স্থানে পবিত্র হন। ইন্দ্রের অনুকরণে কাহারও শপথের সততা বা চারিত্রিক পবিত্রতা প্রমাণ করিবার জন্য এই স্থানে ফুটন্ত ঘৃতভাণ্ডে যাত্রিগণের বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের হস্ত নিমজ্জিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই কুপ্রথাকে স্বামী তিরুমলরাম বর্মা (১৮২৯—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) উঠাইয়া দিয়াছেন। ইন্দ্র এই স্থানে শুচী হইয়া একই লিঙ্গ-স্বরূপে ত্রিমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানের নাম হয় শুচীন্দ্রম্।

শুচীন্দ্রমের মন্দিরটি অতীব প্রাচীন; বহু রাজন্যবৃন্দ এই মন্দিরে মূলমূর্তি ও উৎসববিগ্রহগণের জন্য বহু স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল রত্নাভরণ মন্দিরে প্রবেশের পথে একটি প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত আছে এবং সশস্ত্র প্রহরীগণ তাহা রক্ষা করিতেছে। বর্তমানে এই মন্দির দেবস্বম্ বোর্ডের পর্যবেক্ষণে আছে।

কিংবদন্তী এই যে, ইন্দ্র এই মন্দিরে প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে ত্রিমূর্তির সর্বশেষ অর্চন সম্পাদন করেন। এখানে একই অর্চককে ক্রমাগত দুই দিন অর্চন করিতে দেওয়া হয় না। প্রত্যহ রাত্রিকালে ইন্দ্র কর্তৃক ঠাকুরের শয়নোৎসবাদির সম্পাদন-সেবাকে গুপ্ত-ভাবে সংরক্ষণ করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক অর্চককে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, তিনি প্রত্যূষে অর্চনার্থ উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের অঙ্গাভরণ ও বসন ভূষণাদির যে কিছু পরিবর্তন বা বিমানের অভ্যন্তরে যে কিছু অলৌকিক ব্যাপার দর্শন বা শ্রবণ করিবেন, তাহা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। মালাবারের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে অর্চকের কায করেন।

জাপানের কথা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

জাপানে চা-পান এক বিচিত্র ব্যাপার। চীন পান করে খুব কড়া চা দুধ চিনি না মিশিয়ে। জাপান পান করে সবুজ চা। গরম জলে সবুজ চায়ের পাতা ফেলে দেয়। তার পর সেই গরম জল হয় চা। তাকে পেয়ালায় ঢেলে অল্প অল্প পান করা পদ্ধতি। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানে অবশ্য পাশ্চাত্য রীতি। তাই চা পান করতাম আমাদেরই প্রথায়।

কিন্তু জাপানী চা-পান মাত্র চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করা নয়। বলে রাখি কতকদিন অভ্যাস না করলে তেমন চা-পান করা মনোরম ব্যাপার নয়। অবশ্য চিরাতা সিদ্ধ জলের মত না হলেও পানীয়টি তিক্ত। বলছিলাম ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে বা বন্ধুহিসাবে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে চা পান করার পদ্ধতি। কিন্তু পরিবেশ না বুঝলে সে সমারোহের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা হবে অসম্ভব।

জাপানের মহিলা বিলাতী মেম সেজেছে বাহিরে। ঘরে সে জাপানী। ধনী গৃহের মহিলা ঘরে কিমোনো ব্যবহার করে। যার অর্থ নাই সে বহুবার পোষাক বদলাতে পারে না। আমাদের যে সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল সেথায় কিমোনো-বিভূষিতারা অভ্যর্থনা করেছিলেন।

শতকরা নিরানব্বইটি বাড়ি দেশী অর্থাৎ কাঠের বাড়ি, মেঝে আগাগোড়া মাদুর দিয়ে ঢাকা। গৃহের প্রবেশ পথে থাকে কতকগুলি খড়ের চটি। গৃহস্থ এবং অতিথি সকলকে সেথায় জুতা খুলে খড়ের চটি পায়ে দিয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। ঘরে বিশেষ আসবাব নাই—খাট, চৌকী, চেয়ার প্রভৃতি একেবারে বিরল। এক এক ঘরে দেওয়ালের ধারে ছোটো ছোটো আলমারিতে আছে পুস্তক সাজানো। কোথাও একটি পুতুল। মোট কথা ঘরের মেঝেয় মাত্র একটি ছোট জলচৌকী হ'তে কিছু উঁচু টেবিল থাকে। চকচকে পালিস কিম্বা কালো জাপানের পালিস। উপরে একটি গাছ বা পাখী আঁকা। কোণে তেমনি একটি টেবিলে—

দুটি একটি ফুল। সরঞ্জামের বাহুল্য নাই। দেওয়ালে একখানি ছবি। ছবিতে একটি ডালে দুটি ঘুঘু কিম্বা একটি সুন্দরীর মুখ। কোনো বাড়ির ভিতরের ছাদে পদ্ম বা চেরি-ফুলের ছবি আঁকা। দেওয়ালে প্রায় কাঠের কাজ।

বাড়ির গৃহিণী বা কোনো মহিলা কোমর দুইয়ে বার তিনেক অভ্যর্থনা করেন অতিথিকে। অতিথিও বাউ করে। বেচারা আমার মত বিদেশী হলে হোটেলে ফিরে বোঝে কোমরের দুরবস্থা সৌজন্যের অত্যাচারে। তার পর টেবিলের একদিকে অতিথি বসে নতজানু হয়ে। মহিলা চায়ের পেয়ালা নিয়ে আর একদফা কোমর-ভাঙা অভিবাদন ক'রে নতজানু হয়ে ব'সে টেবিলে চা রাখেন। তার পর দুই জানুতে হাত রেখে অল্পক্ষণ পরে উঠে যান অন্য কিছু খাবার আনতে। অবশ্য অতি মৃদু হাসির পরিবেশন সঙ্গে সঙ্গে চলে।

ভোজের পূর্বে একটা থালায় গরম জলে ভেজানো এক একটি তোয়ালে থাকে মুখ মোছবার জন্য। তার পর বাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন। একটা চেরা কাটি টানলে দুভাগ হয়—মাঝখান থেকে খড়কে পড়ে। কাটি দুটি ডান হাতে ধরে, বাম হাতে বাটি রেখে চালাতে হয়। ভাত তরকারি সুর সুর করে সারি বেঁধে উদরে শোভাযাত্রা করে।

কয়েকটা মন্দিরে খেয়েছিলাম নিরামিষ। কিন্তু যে মন্দিরে সভা হয়েছিল তার পাশের ঘরে চেয়ারে বসে খেতাম—মাছ, মাংস। আর মাংস এক একদিন থাকতো—মা ভগবতীর দেহাংশ। আমরা ক'জন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এবং ভিক্ষুরা ব্যতীত—সিলোনী, বর্মী, থাই, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ইত্যাদি কারও গো-মাংসে অনাস্থা নাই বোঝা গেল। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সবাই

জাপানীর সৌজন্য অসাধারণ। পথে, ঘাটে, দোকানে, গাড়িতে সবাই ভদ্রতা দেখাবার জন্য ব্যস্ত। জায়গা ছেড়ে দেয় পুরুষেরা। বিদেশী দেখে আমাকে জায়গা ছেড়ে দিত জাপানী যুবক রেলে বা বাসে। আমি সখ করে তেমন যানবাহনে চড়তাম। কারণ য সমিতি সদাই আমাদের গাড়ি দিত এবং স্বেচ্ছাসেবক থাকত।

খুব বড় দোকান ছাড়া সব দোকানে দর চলে। এখানে জাপান এসিয়া। বড় রাস্তার ধারে দোকানের সারি। রাত্রে নিওন আলোকের রশ্মিতে সহর ভরপুর থাকে।
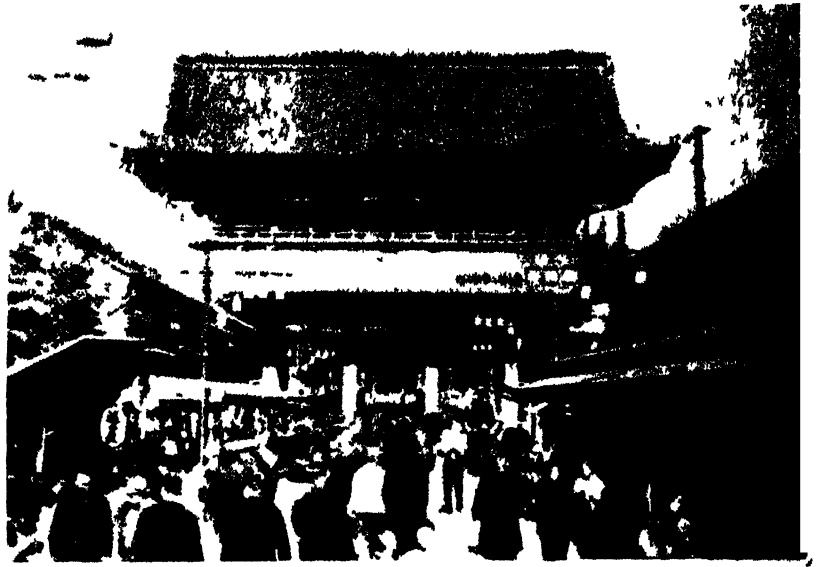
মন্দির দুয়ার

সৌখীন দোকান গিঞ্জা ষ্ট্রীটে। কথাটির সঙ্গে আমাদের গঞ্জের মিল আছে।

লোক দারুণ পরিশ্রমী। একজন ভদ্রলোক বল্লেন—যে কাজ নারীর দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে, সে কাজে পুরুষ নিয়োগ করা শক্তির অপব্যয়। ছেলেদের শক্ত কাজ করতে হবে। জাপানকে গড়তে হবে।

জাপানের প্যাগোডা দেখতে ভালো। কিন্তু কাঠের মন্দিরের তেমন শোভা নাই যেমন ব্রহ্ম, শ্যাম বা কাম্বোডিয়ায় আছে। মন্দিরে কাঠের কাজ সুন্দর। বুদ্ধদেবের মূর্তির বাহার যথেষ্ট। কিন্তু মন্দিরের বাহিরে তেমন চূড়া নাই।

বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল হোঙ্গাংজি মন্দিরের মধ্যে। মন্দিরের গড়নটি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের মত—সাঁচির অনুকরণে। তার সঙ্গে মেশানো গ্রীক-রোমক ভাব। কারণ প্রথমেই বাগান পার হয়ে মন্দিরের হলে প্রবেশ করতে হয় প্রশস্ত সিঁড়ির সার বেয়ে। যেমন আমাদের কলেজ ষ্ট্রীটে আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হলে প্রবেশ করবার সোপান। তার পর বিস্তৃত হল—কলিকাতার টাউন হল অপেক্ষা বড়। সেই হলের শেষে বেদী-গৃহ। পালার কাজ-করা বন্ধ দরজা। দরজার পাল্লাগুলা ছোট

লেখক

ছোট—ভেঙ্গে মুড়ে খুলে যায়। মন্দিরে সুন্দর বুদ্ধ-মূর্তি। সামনে বেদী—নানা প্রকারের বাতি এবং বিচিত্র সাজ। ই হলের দুপাশে দুটা দ্বিতল বাড়ি! হলের নিচে এবং াই অট্টালিকার উভয়তলে অনেক ঘর। যে কয়েকটি মন্দির টোকিওর মধ্যে এবং আশে পাশে ছোট ছোট সহরে আছে—হোঙ্গাংজির মন্দিরই বড় বলে মনে হল। এটি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে নির্মিত।

মূর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়—নারার কামাকুরার বুদ্ধ-মূর্তি। উচ্চ বেদীর উপর বসে আছেন ব্রোঞ্জ ধাতুর মূর্তি। উচ্চে ৫০ ফুট। পরিধি শত ফুট। মাত্র মুখখানি ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, কর্ণ ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি। ধ্যানী বুদ্ধ। অত বড় মূর্তি কিন্তু দাইবুৎসুর প্রশান্ত ভাব।

মূর্তিটি বারশত বৎসর পূর্বে নির্মিত। পৃষ্ঠে একটি দরজা আছে বোঝা যায় না। শুনলাম তার মধ্যে দিয়ে মূর্তির ভিতর পৌছান যায়।

শুনেছি প্রথম কাঠের ফঁরমা করে তার উপর মাটি দিয়ে মূর্তি গোড়ে সে মূর্তির উপর মোম লেপন করা হয়। তার ওপর আবার মাটি লাগানো হয়। তার পর তপ্ত গলিত ধাতু ডুপুরু মাটির মাঝখান দিয়ে মোমের ওপর ঢালা হয়। মোম গলে গেল—তলা দিয়ে নির্গত হ'ল। বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হল গলিত ধাতু কঠিন হ'লে। ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারা যায় মাত্র। যাদের সখ আছে, সময় আছে, পরীক্ষার দ্বারা এই ঢালাই শিল্পকে বাস্তবে পরিণত করলে দেশের ও দশের উপকার অবশ্যম্ভাবী। কারণ আজিও আমাদের দেশে মূর্তি এবং পুতুলের চাহিদা যথেষ্ট। ঢালাই করা ফাঁপা পুতুলে ধাতু কম লাগবে এবং দামেও শস্তা হবে।

বহু মন্দিরে আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ল। পূজা ও বন্দনার বাজনা বাদ্য সঙ্গীত আরতি সকল অনুষ্ঠান আছে মহাযান পদ্ধতিতে। থেরাবাদীরা খুব উপভোগ করছিল না সে আনুষ্ঠানিক পূজা। তবে মন্দিরে সকল সময় নিস্তব্ধতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত। কে জানে কোন্ কালে আমরা ধাক্কা না খেয়ে, চিৎকারে মাথা গরম না ক'রে, বিশ্বনাথের মাথায় জল দিতে পারব বা মা-কালীর পাদ-পদ্মে জবাফুল অর্পণ করবার যোগ্যতা অর্জন করব। আমার এসিয়ার বহু বৌদ্ধমন্দির, বাত, ক্রায়া, প্যাগোডা প্রভৃতি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সর্বত্র শান্তি এবং নিস্তব্ধতার পরিবেশ। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের যাত্রীরাও শান্ত।

বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতেরা সৌম্যমূর্তি। আমি কয়েকটি মন্দিরে উপহার পেলাম। আকাসুকা বিহারে ভোজন-কালে আমার বেশ শীত করছিল, কারণ সেদিন গরম জামা পরিনি—দুপুরে প্রখর সূর্য্য ছিল। ভদ্রলোক পালিভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—শীত করছে? আমি বলিলাম —সত্য। তাঁর আজ্ঞায় এক ভিক্ষু একটি রেশম ও পশমে বোনা ওয়েষ্ট কোট আনলেন। ভদ্রলোক আমার

চাপকানের নিচে নিজের হাতে সেটি পরিয়ে দিলেন। জামাটি বোধ হয় তাঁর ব্যবহার করা। কিন্তু সে উপহার আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। হোটেলে পৌঁছে সেটি ফেরত দিব, বল্লাম। তিনি বল্লেন—নহি! নহি! মম উপহার। সুতরাং মাথা নত করলাম।

সাইতামা মন্দিরে মেয়েরা ঘণ্টা বাজিয়ে গান করছিল। প্রায় ৫০০ মহিলা। ঘণ্টাগুলি আমাদেরই ঘণ্টার মত—কিন্তু শ্বেত ধাতুর এবং লাল রেশমী ঝুমকা বাঁধা। আমি পূজার শেষে একটি হাতে করে নিয়ে দেখেছিলাম। তার পরদিন হোটেলে বিনীত এক পত্র পেলাম প্রদেশের গবর্ণরের সহি-করা, সঙ্গে একটি ঘণ্টা উপহার। এক মন্দিরে সাধুদের গলায় দেবার মত এক রেশমী কলার পেলাম। বল্লাম—আমি গৃহস্থ। হাই প্রিষ্ট হেঁসে বল্লেন—এটি পুণ্যবান গৃহস্থের জন্য। সন্ন্যাসীর কলার গৈরিক রঙের। আমি এ ঘটনাগুলি বর্ণনা করছি ভারতবর্ষের লোকের প্রতি সাধুদের প্রীতির পরিচয় দিবার জন্য। এই উপহার অধ্যায়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। এক নবীন আমেরিকা সৈনিক দলবদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে শেষে বল্লে—স্যার আপনাকে একটি উপহার দিব? আমি সম্মতি প্রকাশ করলাম। সে আমাকে একখানি বাইবেল উপহার দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নাম সহি করতে ভুলে গিয়েছিল। আমি এখানে এসে দেখলাম। ব্যবসাদারেরা দাঁতের মাজন, বুরুশ, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপহার দিয়েছিল—প্রতিনিধি, দর্শক, স্বেচ্ছাসেবক সকলকে। ব্যবসা ধর্ম-সভাকেও ছাড়ে না। তবে যে অর্থ খরচ হয়েছিল সম্মেলনে, তাতে ব্যবসায়ী ধনীর অংশ নিশ্চয় ছিল অধিক মাত্রায়।

সহরে দেখবার বিচিত্র প্রাসাদ মিকাডো বা সম্রাটের। আজ নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মিকাডোর পূর্বের স্থান নাই। একদিন মিকাডোর দেহান্ত হলে বহু নাগরিক হারিকিরি বা আত্মহত্যা করত। প্রকাণ্ড প্রাসাদ চারিদিকে গড়কাটা, তাতে আজিও জল থৈ থৈ করছে। মোঙ্গলীয় পদ্ধতিতে নির্মিত রক্ষীভবন। রাজার বাড়ি কেমন তা দেখবার উপায় নাই। একটা সেতু আছে, বিশেষ দিনে সম্রাট সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ দর্শনের পুণ্য দান করতেন প্রজাবৃন্দকে। প্রকাণ্ড আমি। সেই গড় কত বড় তা হাড়ে হাড়ে বোঝে সে—যে ট্যাক্সি চড়ে প্রদক্ষিণ করে প্রাসাদ, কারণ ঘুরতে লাগে ৪০০ য়েন প্রায় চারটাকা। যাত্রাটা প্রায় দু মাইল। সহরের অন্যত্র এক প্রাসাদ আছে। সেটি আমাদের রাজভবনের মত এবং নেপালের রাজার প্রাসাদের অনুরূপ। তিনটিই গ্রীক-রোমক স্থাপত্য। একদিন আমাদের সান্ধ্য ভোজ দিলেন মন্ত্রীরা সেই প্রাসাদে। ভোজন হ'ল দেশী বিলাতী মেশানো মতে, যেমন কলিকাতার হোটেলে হয়—পোলাও তরকারীর সঙ্গে সিদ্ধ মাংস এবং ফল। কিন্তু

শ্রীমতী নিবেদিতা

পরিবেশন করলে কিমোনা-ভূষিতা নারী সেবিকারা প্রতিবার কোমর বেঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ ক'রে।

গিন্‌জা (Ginza) রাস্তার কথা বলেছি। এখানে দুটি প্রধান দোকান আছে—পাচতলা প্রকাণ্ড বিপনী। দাঁতের খড়কে হ'তে মতির মালা অবধি পাওয়া যায়। অবশ্য সেখানে দর চলেনা। মেয়েরা বিক্রী করে। বিলাতের শেলফ্রিজের মত। উলওয়ার্থের বড় দোকান হ'তে বড়। নাম ভুলে গেছি। একটির বর্ণনা দিব। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইয়াসিমা হোটেল হ'তে একটু এগিয়ে

গিন্জার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। ওপারের বড় দোকানে কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে। চৌরঙ্গী ধর্মতলা মোড়ের মত এখানে গাড়ি ও লোকের ভিড়। সুতরাং পথ পার হওয়া বিপজ্জনক। একটা সুড়ঙ্গে লোক ঢুকছে। বুঝলাম লণ্ডনের পিকাডিলির মত পথ পার হবার সুড়ঙ্গ। ব্যবসাদার জাতি। সুড়ঙ্গের মধ্যেও বিপনী। দুটা পথ। একটা দিয়ে ওপারে যাওয়া যায়—আর এক পথে দুটা

শ্রীমতী অনুরাধা

রাস্তা পার হ'য়ে গিন্জার অপর পারে যাওয়া যায়। সেই সুড়ঙ্গ পার হয়ে বড় দোকানে প্রবেশ করলাম।

মাঝে একটা মঞ্চ। সেই মঞ্চে বাদ্য হচ্ছে। চার কোণে চার জন নর্ত্তকী। একজন অন্তরাল হতে গান করছে, তার সঙ্গে নর্ত্তকী গেইশারা দেহ বিন্যাস করছে, আর হাত দিয়ে এক একটা দিক দেখিয়ে দিচ্চে। গান ও মুদ্রার অর্থ কি?

একজন ভদ্রলোক ভাঙ্গা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিলেন—গান বলছে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায় দোকানে এবং নাচের ছন্দে নর্ত্তকী দেখিয়ে দিচ্চে কোন্ তলায় কোন দিকে কি পাওয়া যায়। নাচের ছন্দে তাও বাতলানোর এ ব্যবসায়ী-বুদ্ধি ভারতে নাই। প্যারিস, রোম, ভেনিস প্রভৃতি সহরে রাত্রে ভোজনালয়ে মঞ্চের উপর নাচ হয়। নাচ শেষ হ'ল বেলা আন্দাজ দুটার সময়, ভিড় পাতলা হয়ে গেল। তার পর দেখলাম এক এস্কুলেটার—এসকুলেটার সিঁড়ি সারি। বিলাতের নল-রেল-পথে আছে। একটা সারি উঠ্ছে। একটা সারি নামছে। একটা ধাপে দাঁড়ালে সিঁড়ি আপনিই ওপরে তুলে নিয়ে যাবে। আরোহীর সোপান যখন উপর তলার সঙ্গে সমতল হবে, তখন বুদ্ধি করে সতর্কভাবে পা বাড়ালে নেমে বা উঠে পড়া যায় গন্তব্য তলায়। দ্বিতীয় তলায় উঠ্লাম। এক মহিলা সম্ভাষণ করে কি বল্লে। আমি বৃদ্ধ, কোমরকে যথাসাধ্য নুইয়ে বাংলায় বল্লাম—তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।

অন্য এক যুবতী ধরলে। ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই? বিদেশে কেহ কি চাই জিজ্ঞাসা করলে বিভীষিকার রূপ ধ'রে দমদমার কাষ্টমস্ বেষ্টনী আবির্ভূত হয় মনে। সুতরাং ক্রয়েচ্ছা অবদমিত হল। চারিদিকে ঘুরলাম। আবার ঐ ভাবে আরও উপর তলায় গেলাম। ওঃ! নিজের ব্যবহারের জিনিসে শুল্ক লাগে না। নিজের জন্য গেঞ্জি কিনে অপর এক বৃহৎ বিপনীতে গেলাম। সেথায় নাচ, গান বা এস্কুলেটার নাই—বাকী সব আছে। বিলাতের বড় দোকান—উলওয়ার্থ প্রভৃতির সমান। পূর্বে কলিকাতায় হোয়াইটওয়ের দোকান ছিল, তা' হতে বহুগুণ বড়।

আমরা পূর্বে বহু জাপানী নারীর চিত্র দেখেছি—কিমোনো-পরিহিতা, পিঠে বাঁধা শিশু। এখনও বিলাতী স্কার্ট-পরিহিতা দরিদ্রা জননীর পিঠে বাঁধা সন্তান দেখতে পাওয়া যায়, মাত্র অলিতে গলিতে নয়, ট্রামে, বাসে ও রেলে। এ প্রথা হংকং প্রভৃতিতেও প্রচলিত। আমাদের ও সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি মহিলারা নিজ নিজ জাতীয় পোষাকের সাথে সন্তানকে পিঠে বাঁধা ঝুলিতে নিয়ে কাজ কর্ম করে।

—এক—

"Viemos buscar, Cristaos e speciarias"

প্রথমে চাই ক্রীশ্চান, তার পরে চাই মশলা।

এই মূলমন্ত্র নিয়েই ডা-গামা এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন কালিকটের বন্দরে। তার পরে চলল চক্রান্ত, দস্যুতা আর রক্তধারার সুদীর্ঘ ইতিহাস। কোচিনের পাশা হাতে পর্তুগীজের ভাগ্যক্রীড়া শুরু হল কালিকটের ব্রাহ্মণ রাজা জামোরিণের সঙ্গে। আলবুকার্কদের হাতে গড়ে উঠল ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম পর্তুগীজদের দুর্গ। আর সেই দুর্গচূড়া থেকে কয়েকটা রক্তবর্ণ কামানের গোলা উড়ে গিয়ে পড়ল ভারত মহাসমুদ্রের নীল জলে। পূর্ব পৃথিবীর নতুন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিতে আঁচড় কাটল ইয়োরোপের লুব্ধ থাবা।

ওদিকে ইয়োরোপে আরব-সাম্রাজ্যের ওপর ঘনাচ্ছিল সর্বনাশের ছায়া; টলমল করে উঠছিল মক্কা থেকে রোম পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল প্রতাপের বনিয়াদ। একদিন তা ধ্বসে পড়ল কিউটার দুর্গে। মুসলমান জগতের বাছা বাছা আরব বীরদের নিয়ে সালাত্ বেন সালাত্ দুর্গরক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নতুন জাগ্রত হিস্পানিয়া—স্পেন আর পর্তুগালের মিলিত শক্তি মুর-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিলে। জিব্রাল্টার প্রণালীর রক্তমাখা জলে স্নান করে জন্ম নিল এক দুর্জয় জাতি।

রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে যুবরাজ হেনরী এসে যখন বিজয়গর্বে রাজা দোম জোয়ানের পদপ্রান্তে প্রণতি জানালেন, সেদিন তাঁকে রাজাই শুধু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন না; সমস্ত জাতিই এই জয়ের উল্লাসকে ভাগ করে নিলে। শক্তির নেশায় মাতাল হয়ে উঠল নবজাগ্রত পর্তুগাল।

নতুন দেশ চাই—চাই নতুন পৃথিবীর অধিকার। দুর্গম সাগর পেরিয়ে পাড়ি জমাতে হবে পূর্ব-পৃথিবীর দিকে। পার হয়ে যেতে হবে ঝড়ের অন্তরীপ 'কাবো টরমেণ্টোসো'—পৌঁছুতে হবে ঐশ্বর্যের জগৎ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ—সোনা দিয়ে গড়া স্বপ্নের দেশ; দারুচিনি আর লবঙ্গের সুগন্ধে যেখানে বাতাস মন্থর হয়ে থাকে—হীরা, মণি, মুক্তো—যেখানে পথে পথে ছড়ানো!

কোভিলহান, বার্থোলোমিউ ডায়াস, কাব্রাল, ভাস্কো ডা-গামা। কোচিনের পাশা হাতে কালিকটের সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা। না—পুরোপুরি সাম্রাজ্য বিস্তার আমরা করব না। এত বড় বিশাল দেশকে আয়ত্তে রাখবার মতো শক্তি আমাদের নেই—আমরা একে রক্ষা করতে পারব না। মাঝখান থেকে বিরোধী শক্তির আক্রমণে আমরা চুরমার হয়ে যাব। তার চেয়ে মিত্রতা করা দরকার ভারতবর্ষের মানুষগুলোর সঙ্গে; তাদেরই সাহায্যে বিধ্বস্ত করব পূর্ব-পৃথিবী জোড়া আরব-বাণিজ্যের একাধিপত্য—প্রাচ্যের মশলা আর সোনার সঞ্চয়ে পূর্ণ করে তুলব লিসবনের রাজভাণ্ডার।

পশ্চিমের বাণিজ্য লক্ষ্মী রক্তমুখিনী হয়ে পদক্ষেপ করলেন দক্ষিণ ভারতের উপকূলে। একটির পর একটি দুর্জয় দুর্গে প্রসারিত হল তাঁর পদ্মাসন, কামানের গর্জনে গর্জনে উঠল তাঁর শঙ্খধ্বনি।

প্রাচ্য-পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়ে এলেন দোম ফ্রান্সিসকো ডি আলমীডা। লোহার মতো কঠিন হাতে আলমীডা দণ্ডধারণ করলেন। খরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, বাঘের মতো

নিষ্ঠুরতা। ভারতবর্ষের মাটিতে আরো গভীরে প্রবেশ করল পর্তুগীজের শিকড়।

১৫০৯ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারী আর একবার রক্তের রঙ ধরল ভারত মহাসাগর। ইয়োরোপ থেকে বিতাড়িত অপমানিত আরব শক্তি শেষবার চেষ্টা করল নিজের মর্যাদা ফিরে পাবার; চেষ্টা করল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের মাটি আঁকড়ে থাকতে। আলমীডার নৌ-বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালো মিলিত মুসলিম নৌ-বহর—; এলো নুবিয়ান থেকে আরব, ইথিওপিয়ান থেকে আফ্‌রান, পারসিক থেকে মিশরীয় 'রুম'; আর সেই সঙ্গে ভারতীয় বণিকের দলও এসে দাঁড়ালো মুসলিম বহরের পাশাপাশি—দিউ থেকে—কালিকট থেকে।

সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রণনিপুণ আলমীডাই জয়লাভ করলেন। পর্তুগীজ কামানের সামনে পড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল তীর-ধনুক, বল্লম-তলোয়ার, মুষ্টিমেয় বন্দুক। আরব বাণিজ্যবহর তার অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে চিরদিনের মতো অতলে তলিয়ে গেল—ক্রুশ-চিহ্নিত নতুন পতাকায় এসে পড়ল নতুন সূর্যের আলো।

একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যুদ্ধ জিতলেন আলমীডা। চোখের জল ঝরতে লাগল আগুন হয়ে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। শুধু যুদ্ধজয় করেই সে প্রতিশোধ চরিতার্থ হয়নি। আরো রক্ত চাই—চাই আরো প্রাণবলি।

আলমীডার আদেশে যুদ্ধবন্দীদের এনে বেঁধে দেওয়া হল কামানের মুখে। তার পর বারুদে দেওয়া হল আগুন। কামানের বীভৎস শব্দে তলিয়ে গেল বুকফাটা আর্তনাদ—বন্দীদের ছিন্ন মুণ্ড আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শুকনো পাতার মতো কালিকটের পথে পথে ঝরে পড়ল।

আলমীডার পরে এলেন আলবুকার্ক। স্থির, ধীর, বিচক্ষণ। যে সাম্রাজ্যকে আলমীডা অঙ্কুরিত করে গিয়েছিলেন, আলবুকার্ক তাতে ধরালেন নতুন পল্লব। রক্তপান শেষ করে পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী বসলেন বরদা হয়ে।

কিন্তু বাংলা দেশ তখনো অনেক দূরে। ভাস্কো-ডা-গামা যে দেশের কাহিনী শুনেছিলেন স্বপ্নের মতো, তখনো সেই 'প্যারাডাইজ্ অব্ ইণ্ডিয়া' পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায়; তখনো তার ধান ক্ষেতে ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, তার 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডি' চট্টগ্রামে মুর বাণিজ্য তরীর পাশাপাশি নোঙর ফেলছে বাঙালি বণিকের সপ্তডিঙা মধুকর। তার তাঁতী তখনো নিপুণ হাতে বুনছে অপূর্ব মস্‌লিন, আর তার আকাশে-বাতাসে ভাসছে চণ্ডীদাসের গান।

আর সাসারামের বাঘ শেরসাহ সবে তাঁর থাবা বাড়িয়েছে দিল্লীর সিংহাসনের উদ্দেশে। টলমল করছে সম্রাট আকবরের শাহী তখ্‌ত।

* * * *

চট্টগ্রামের বন্দর পার হয়ে শঙ্খদত্তের বাণিজ্যবহর এগিয়ে চলল দক্ষিণ পাটনে।

চার চারখানা বোঝাই ডিঙা। শুকনো লঙ্কা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, আর ঢাকাই মস্‌লিন। চড়া দামে বিক্রী হবে কালিকট, কোচিন, আর গোয়ার বন্দরে। সেখানকার ব্যবসা চুকলে সিংহল—যেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত।

শীতের সমুদ্র। যেন এলিয়ে পড়ে আছে শীতল-পাটির মতো। জলের রঙ্ কালীদহের মতো নীল—ছোট ছোট ঢেউ তুলছে নাগশিশুর মতো। চারখানা ডিঙির মোলোখানা পালে লেগেছে উত্তুরে হাওয়ার ঠাণ্ডা অলস আমেজ—ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে চলছে বহর।

হালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত। গায়ে তুলোর মেরজাই। মাথায় কান পর্যন্ত ঢাকা শাদা পাগড়ী, শুধু দু কানের সোনার বীরবৌলি দুটো ঝক্‌ঝক্ করছে রোদে—ঝিকিয়ে উঠছে কাঁধের ওপরে সরু সোনার হার। ঘাড়ের ওপর কোঁকড়া চুলের রাশ দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

অন্যমনস্কভাবে শঙ্খদত্ত তাকিয়েছিল উত্তরের দিকে। তাম্রলিপ্তির বন্দর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আকাশ জুড়ে এখনো সাগর-চিলের আনাগোনা। তার মানে, কূল কাছেই আছে।

এক বছর পরে পাটনে বেরিয়েছে শঙ্খদত্ত। কালো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। এখন কেবল কূলকিনারাহীন জল আর জল। এই মুহূর্তে শান্ত নিথর ভাবে ঘুমিয়ে বিভোর হয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই একে। কে জানে—কখন এই শীতের দিনেও

খন হয়ে দেখা দেবে কালো মেঘের দল—ক্ষেপে উঠবে এই আদি-অন্তহীন কালীদহ, হাজার হাজার রাক্ষসী। গজরে উঠবে এর অন্ধকার পাতাল থেকে। এই চারখানা ডিঙা গিলে ফেলতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে না তাদের।

এমনি অকূল সাগর পার হয়ে যেতে যেতে ঘরের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে দুধের মতো শাদা সরস্বতীর জল: তার দু ধারে নীল ছায়া নেমেছে আম-জাম-বাঁশবনের। বাঁধা ঘাটের ওপরে সপ্ত শিবের মন্দির—সোনার ত্রিশূল দেওয়া চূড়ো জ্বলছে রোদের আলোয়। তার পর সারি সারি নৌকোর ভিড়ে সরস্বতীর জল দেখা যায় না—সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী। তার দেশ, তার ঘর।

শঙ্খদত্তের সমস্ত চিন্তা আকুল হয়ে উঠল। মুখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ো বাপ ধনদত্তের মুখ। মাথাভরা ধবধবে শাদা চুল—তোবড়ানো গালে-মুখে সংখ্যাতীত বলিরেখা।

সামনে একখানা কষ্টিপাথর নিয়ে সোনা ঘষছিলেন ধনদত্ত। চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জ্যোতি ও অন্ধকার হয়ে আসছে—আজকাল খুব কাছের জিনিস ছাড়া দেখতে পান না।

আস্তে আস্তে ধনদত্ত বললেন, দক্ষিণ পাটনে যেতে চাও?

—হাঁ বাবা। ঘরে বসে বসে কুঁড়ে হতে বসেছি।

—তা বটে।—ধনদত্ত বিড় বিড় করতে লাগলেন: সদাগরের ছেলে—সাগর পেরিয়ে না এলে জাত থাকে না।

—তা হলে সামনের মাসেই বেরিয়ে পড়ি বাবা।

—যাও—ধনদত্ত আবার কী বিড় বিড় করে বললেন স্বগতোক্তির মতো, ভালো করে শোনা গেল না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর পর্যন্ত যেতে চাও?

—সিংহল।

—সিংহল—ধনদত্ত চমকে উঠলেন: ওদিকের গোলমাল সব মিটেছে?

—কিসের গোলমাল?

—সেই হার্মাদের উৎপাত? শুনেছি, দক্ষিণের কূলে কূলে কেল্লা বসিয়েছে ওরা। দরিয়াতেও বন্দরগুলোর ওপর নানা রকম উপদ্রব করছে?

—সে সব এখন মিটে গেছে বাবা। খবর পেয়েছি, কালিকটের জামোরিণের সঙ্গে কী সব চুক্তি হয়েছে ওদের। মুসলমান সওদাগরদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়েই যা কিছু গোলমাল ছিল—সেগুলোর ফয়শালাও হয়ে এসেছে। তবে দরিয়ায় উপদ্রব এখনো মাঝে মাঝে যে করে না তা নয়। কি সে সব মুসলমানদের বহরের ওপর। আমাদের কোনো ভাবনা নেই বাবা।

—মুসলমানদের বহর, মুসলমানদের বহর।—ধনদত্ত আবার বিড় বিড় করতে লাগলেন: আমার কিন্তু ভালো লাগছে না শঙ্খ। এ হার্মাদের মতলব ভালো নয়। কথায় কথায় তলোয়ার বের করে—গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়—মিথ্যে ছুতোনাতা করে অন্যের সর্বস্ব লুটে নেবার ফিকির খোঁজে। ওরা একদিন সর্বনাশ করবে—গোটা দেশের সর্বনাশ করবে। আজ মুসলমানের ঘাড়ে কোপ দিতে চাইছে, কাল হিন্দুর মাথাও বাদ দেবে না।

—এসব মিথ্যে ভাবনা বাবা।—শঙ্খদত্ত বিরক্তি বোধ করল: আমাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ওদের? আরবেরা পয়সা দিয়ে আমাদের জিনিস কেনে—ওরাও তাই। বরং দাম ওরা বেশিই দেয়। ওদের সঙ্গে কাজ কারবার করেই লাভ বেশি।

—বেশি যারা দেয়, তারা বেশি নিতেও জানে শঙ্খ—একবার দৃষ্টিহীন ঘোলা চোখ ছেলের মুখের দিকে তুলেই কষ্টি পাথরের ওপর নামিয়ে নিলেন ধনদত্ত—তাকিয়ে রইলেন সোনার আঁচড়ে আঁকা উজ্জ্বল সরীসৃপ রেখাগুলোর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

……শঙ্খদত্ত ফিরে এল নিজের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভেতরে। চার চার খানা পালে উত্তুরে হাওয়ার আমেজে ডিঙা ভেসে চলেছে দক্ষিণের দিকে। ঘুমিয়ে আছে কালীদহের কালীয় নাগ—চারদিকে শুধু তার শিশুরা ছোট ছোট ফণা তুলে খেলা করে চলেছে। ডিঙার হাল ধরে 'কাঁড়ারেরা' ঝিমুচ্ছে নিরুদ্বেগ মনে।

এই সাগর। শঙ্খদত্তের কপালের রেখা হঠাৎ কুঁচকে এল। হঠাৎ মনে হল—এই সাগরের উপর যেন একটা নতুন শক্তির ছায়া পড়েছে—হার্মাদের ছায়া। এই মানুষগুলোর দু'একজনকে দেখেছে চট্টগ্রামের বন্দরে—অসংখ্য কাহিনীও শুনেছে এদের সম্পর্কে। শাল গাছের মতো বিরাটকায় সব শক্তিমান মানুষ—রোদের আঁচ-লাগা ফুটফুটে গায়ের রঙ্। মুখে তামাটে রঙের দাড়ি—উল্টে দেওয়া হাঁড়ির মতো দু ভাঁজ টুপি বাঁ দিকে কাত্ করে পরা—বাঁ চোখটা

তাতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ; ডান দিকের বাদামী চোখ ঈগলের দৃষ্টির মতো নিষ্ঠুর কঠিনতায় ঝকঝক করে। গলার আর দু কাঁধের পোশাক বিচিত্র রকমে কুচি করা—বুকের শাদা জামার ওপর মোটা মোটা কালো ডোরাগুলো দেখে কোথায় যেন বাঘের সঙ্গে সাদৃশ্য মনে এসে যায়। কোমরে মস্ত বাঁটওয়ালা সরল সুদীর্ঘ তলোয়ার—সেই বাঁটের ওপর একখানা হাত রেখেই তারা পথ চলে। চলার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত জুতোর আওয়াজে মাটির পথ যেন কাঁপতে থাকে।

নতুন মানুষ—নতুন চেহারা। সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত রুক্ষতা। শঙ্খদত্ত শুনেছে, ওদের দেশে নাকি মরুভূমির মতো মাটি, গাছপালা চোখে পড়ে না ; পাখির ডাক কানে আসে কচিৎ কখনো, আর পাহাড়-ঘেরা খাড়ির ওপর নোনা সমুদ্রের জল কেঁদে বেড়ায়। ওদের মাটি দেয়না পেট ভরাবার ফসল, ওদের সমুদ্র দেয়না তৃষ্ণা মেটাবার জল। তাই অসহ্য ক্ষুধা নিয়ে ওরা শুষে নিতে এসেছে—সমুদ্রের মতো সব বুঝি গিলে খাবে।

ভয় পেয়েছেন ধনদত্ত। শঙ্খদত্তের হাসি এল। না—এখনো ধনদত্ত সব খবর শুনতে পাননি। শুধু দিউ কিংবা গোয়ার বন্দরই নয়। চট্টগ্রামের দিকেও হাত বাড়িয়েছে হার্মাদেরা। কিছুদিন আগেই তাই নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তা পৌঁছোয়নি ; আর পৌঁছুলেও বার্ধক্যে অবসন্ন ধনদত্তের কানে কেউ তোলেনি সে সব। সেগুলো শুনলে ধনদত্ত তাকে পাটনে বেরুতে দিতেন কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসেছিল হার্মাদ সিল্‌ভিরা। কিন্তু শহরের সুলতানের সঙ্গে বাধল তার গণ্ডগোল। তাড়া খেয়ে মাঝ সমুদ্রে পালিয়ে গেল সিল্‌ভিরা, কিন্তু শোধ না নিয়ে গেল না। ইচ্ছেমতো দিন কয়েক বহরগুলোর ওপর লুটতরাজ করল, তারপর একদিন সুযোগ বুঝে এসে বন্দরে ধরিয়ে দিলে আগুন। প্রমাণ করে দিয়ে গেল—রক্ত আর আগুন দিয়ে যেমন করে গোয়া আর দিউ তারা দখল করেছে—যেমনভাবে রক্তে স্নান করিয়েছে কোচীন আর মালাবারের উপকূল—দরকার হলে এখানেও তাই করবে। কোয়েল্‌হো বলে আর একজন হার্মাদ একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। সুলতান বলেছেন হার্মাদের জাহাজ আর বন্দরে ঢুকতে দেবেন না ; আর বন্দরে আগুন দিয়ে হার্মাদ জানিয়ে দিয়ে গেছে, এত সহজেই ফিরে যাবার জন্যে তারা আসেনি।

দক্ষিণ পাটনে বেরুবার আগে দেবতার কাছে একবার আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিল শঙ্খদত্ত। গিয়েছিল চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সর্ববিঘ্নহারী শঙ্করকে প্রণাম করতে।

সেইখানেই দেখা সোমদেবের সঙ্গে।

মন্দিরের অন্যতম পুজারী সোমদেব। শালগাছের মতো ঋজু দীর্ঘদেহ। গভীর কালো গায়ের রঙ্—দুটি আরক্ত চোখ যেন সব সময় ঘুরছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের রক্তরেখা—আচমকা দেখলে একটা হিংস্র বন্য মহিষের মতো মনে হয় তাঁকে।

মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা ছাতিম গাছের তলায় একখানা বড় পাথরের ওপরে বসে ছিলেন সোমদেব। কালো মুখখানা চিন্তায় যেন আরো কালো হয়ে গেছে। উজ্জ্বল ভয়াল চোখ দুটো স্তিমিত। কপালে ভ্রূকুটি।

সেইখানে শঙ্খদত্তকে ডাকলেন সোমদেব।

সশঙ্ক শ্রদ্ধার সামনে এসে দাঁড়ালো শঙ্খদত্ত। সোমদেব বললেন, বোসো।

নীরবে আদেশ পালন করল শঙ্খদত্ত।

কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে মগ্ন থেকে সোমদেব চোখ মেললেন। একটা কঠিন দৃষ্টি ফেললেন শঙ্খদত্তের মুখের ওপর : হার্মাদের তুমি দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কী মনে হয় ?—পরীক্ষকের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন সোমদেব।

—মনে হয়, দুঃসাহসী জাত—ভেবে চিন্তে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—শুধু দুঃসাহসী নয়, দুরাকাঙ্ক্ষীও বটে। ওরা এতদূরে কেন এসেছে জানো ?

—ব্যবসা করতে। মশলা কিনতে।

—কেবল ব্যবসা করে আর মশলা কিনেই ওরা ফিরে যাবে ?—সোমদেব আবার ভ্রূকুটি করলেন : ওদের দেখে তা তো মনে হয়না। যা দেখে তাতেই ওদের চোখ লোভে চক চক করে ওঠে। ওরা শুধু মশলা নেবে না—আরো কিছু নেবে। যদি চেয়ে না পায়, ছিনিয়ে নেবে। চট্টগ্রামের বন্দরে কী হয়েছে সব জানো বোধ হয়।

—জানি।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথার জটা বাঁধা ঝাঁকড়া চুলগুলো একবার ঝাঁকালেন সোমদেব : সেদিনই আমি ওদের চিনেছি। দয়া নেই, মায়া নেই, বিবেক নেই। বিশ্বাসঘাতকতা ওদের মজ্জায় মজ্জায়। দুর্বলের ওপর কথায় কথায় তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসে, সবলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে পোষা কুকুরের মতো। একটা কিছু করে তবে ওরা যাবে।

—কী জানি!—শঙ্খদত্ত নিশ্বাস ফেলল।

—তুমি জানো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওদিকে দিল্লীর বাদশার মাথার ওপরে বিপদ নামছে—পাঠান শের খাঁ বিদ্রোহ করেছে। একটা গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে চারদিকে। এই সুযোগ।—সোমদেবের চোখ দুটো একবার ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল।

—কিসের সুযোগ? সবিস্ময়ে জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

একবার চন্দ্রনাথের সমুচ্চশীর্ষ মন্দির, আর একবার অরণ্যময় পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে সোমদেব দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, এই চন্দ্রনাথের মন্দির, এই দেব-বিগ্রহ, এ হিন্দুর ছিল না।

—সে কী কথা!—শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সত্যি কথাই আমি বলছি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—সোমদেব আবার মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেন: একদিন এই মন্দির ছিল বুদ্ধের—বৌদ্ধেরা এইখানে এসে 'সম্মা সম্বোধি' লাভ করত। আজ এখান থেকে বুদ্ধের বিসর্জন হয়ে গেছে—হিন্দুর দেবতা এইখানে বিছিয়েছেন তাঁর আসন। বেদ-নিন্দুকের দল যেমন একদিন বাংলা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, তেম্নি করে এই পাঠান-মোগলও যাবে। ওই পর্তুগীজ হার্মাদের সঙ্গে বাধবে তাদের লড়াই। আর তারই সুযোগে হিন্দুর হিন্দুত্ব আমরা ফিরিয়ে আনব—ফিরিয়ে আনব বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজাকে।

শঙ্খদত্ত বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। সোমদেবের রক্তিম চোখদুটো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার জটা-বাঁধা চুলগুলো অল্প অল্প দুলছে, যেন একরাশ গোখরো সাপ ফণা ধরে আছে কঠিন ভয়ঙ্কর মুখখানার চার পাশে।

পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যা নামছে। নিচের শাদা মেঘগুলো ক্রমশ কালো হয়ে আসছে—ওপরের একখানা মেঘে ডুবে-যাওয়া সূর্যের শেষ আলো জ্বলছে তখনো; যেন ক্রুদ্ধ চন্দ্রনাথ ওইখানে মেলে ধরেছেন তাঁর আগ্নেয় তৃতীয় নেত্র। অশ্রান্ত কান্নার মতো কোথাও একটা ঝর্ণা ঝরে চলেছে অবিরাম। নির্জন পাহাড়ের বুকের ওপর কী একটা আসন্ন হয়ে আসছে—তীব্র ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কারে যেন সেই অনাগত সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে কেউ মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে; যেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত ওই মন্ত্রজপ আর থামবে না।

স্তব্ধতা ভেঙে চন্দ্রনাথের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

সোমদেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পাটনে যাচ্ছ, খুব ভালো কথা। কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখবে। লক্ষ্য রাখবে হার্মাদের ওপর। কী ওরা করে, কী ওরা বলে, কী ভাবে ওরা চলে। তোমার কাছ থেকে সব খবর আমার চাই।

শঙ্খদত্ত সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর সোমদেবকে অনুসরণ করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। দেবতার আরতি শুরু হয়ে গেছে।

সোমদেব আবার বললেন, বেশ বুঝতে পারছি—চট্টগ্রামের ওপরে বিপদ আসবে। এখানকার দুর্বল সুলতান হার্মাদকে রুখতে পারবে না। মনে রেখো শঙ্খদত্ত, এই আমাদের সুযোগ—এই আমাদের সুযোগ—

······আর একবার চমক ভাঙল শঙ্খদত্তের। চন্দ্রনাথের পাহাড় নয়—সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বন্দরও নয়। বঙ্গোপসাগর। অল্প অল্প ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তার বহর একদল রাজহাঁসের মতো দক্ষিণে ভেসে চলেছে—উত্তরের বাতাস লক্ষ্যপথে নিয়ে চলেছে তাকে।

আর দূরে—

দূরে তিনখানা জাহাজ আসছে। হার্মাদের জাহাজ।

আকাশ ছোঁয়া বড় বড় মাস্তুলে অজস্র পাল। সেই পালের গায়ে লাল রঙে আঁকা যোগ-চিহ্ন—ওরা বলে 'ক্রুশ।' একখানা পালে তিনটে বাঘের মূর্তি—যেন বাংলা দেশের মাটির ওপর ওরা ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শঙ্খদত্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল।

দূরে বলেই শঙ্খদত্ত দেখতে পেল না, মাঝের বড় জাহাজখানির ওপরে আর একটি মানুষ তারই মতো উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে চক্ররেখাহীন সমুদ্রের তটভূমির দিকে। সে মানুষটি ডি-মেলো। মার্টিম অ্যাফোন্সো ডি-মেলো—আগামী এক মহানাটকের সে মহানায়ক।

(ক্রমশঃ)

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কথা-সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক। তিনি তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসসমূহে সুখে-দুঃখে ও আনন্দ বেদনায় ভরা বাঙ্গালীর জীবনচিত্র এঁকেছেন। এমনি এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে সুগভীর দরদ ও সহানুভূতির সহিত তিনি চিত্রগুলি এঁকেছেন, যার ফলে সেগুলি বাস্তব ও স্বাভাবিক হয়ে ফুটে উঠেছে। একজন অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের ন্যায় মানব হৃদয়ের গভীরতম রহস্য এবং মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশও তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দেখিয়েছেন। পাঠকের চেনা ও জানা এবং মনের কথাকেই তিনি এমনি করে বাস্তবরূপ দিতে পেরেছেন বলেই, তাঁর সাহিত্য এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।... তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"

শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের হাসিকান্নার কথা বলতে গিয়ে, যে সমাজ জীবনের সঙ্গে এই 'ব্যক্তি' ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সমাজের কথাও তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তুলেছেন। এই সমাজের মধ্যে যে সব মিথ্যা ও ফাঁকি, যে অনাচার ও নিষ্ঠুরতা এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের যে সব স্তূপ তিনি দেখেছেন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতে বা কশাঘাত করতে তিনি ছাড়েন নি। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে এই ক্ষমা ও সামঞ্জস্যহীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করেছেন। তবে তাঁর সাহিত্যে সমাজের ত্রুটি এবং সমস্যার কথা থাকলেও, কোথাও কিন্তু তিনি সমাধানের কোন পথ দেখান নি। সমাধান সংস্কারকের কাজ বলে, তিনি ওপথে না গিয়ে শুধু সমস্যারই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—"সমাজ-সংস্কারকের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে। সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তাছাড়া আর কিছুই নয়।"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সমাজের প্রচলিত রীতি ও নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও তিনি সমাজকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি। সমাজকে তিনি স্বীকার করেছেন; তবে সমাজের কুসংস্কার ও ফাঁকিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিশেষ করে নরনারীর উভয়ের মিলিত ত্রুটিতে সমাজ যেখানে পুরুষকে স্থান দিয়েছে, কিন্তু নারীকে দেয়নি, বরং তাকে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা করেছে, সেইখানেই তিনি এই লাঞ্ছিতা নারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন এই অবহেলিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি সমাজের উপরও আঘাত হেনেছেন। সমাজের গলদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—"সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়, সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে,...পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী।"

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর সাহিত্যে সমাজচ্যুতা ও পতিতাদের স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তিনি তাঁর অসীম দরদ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাই "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" প্রভৃতি পুস্তকে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অনেকে এজন্য শরৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।"

শরৎচন্দ্র কয়েকটি প্রবন্ধে এবং অভিভাষণ ও পত্রাদিতে তার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন—"লোকে বলে আমি পতিতাদের সমর্থন করি। সমর্থন আমি করি নে। শুধু অপমান করতেই মন চায় না। বলি তারাও মানুষ, তাদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে এবং মহাকালের দরবারে এদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইলো। অথচ লোকে সংস্কারের অন্ধতায় এ-কথাটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না।"

এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন—"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।...অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। ...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একবস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যে যদি স্থান না পায় ত, এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"

তাই শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সমাজ-পরিত্যক্তা ও লাঞ্ছিতা নারীদের মধ্যেও "একনিষ্ঠ প্রেম" ও "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের" সন্ধান পেয়ে তাদের জয়গান করতে আদৌ ইতস্ততঃ করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে, সামান্য একটা পদস্খলনই তাদের জীবনের সব নয়। এটুকু বাদ দিলেও স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতির গুণেও তারা পরিপূর্ণ নারীত্বের মহিমায় মহিমান্বিত।

শরৎচন্দ্র এই সমাজচ্যুতা, লাঞ্ছিতা ও অবহেলিতা নারীদের প্রতি তাঁর দরদ দেখাতে যাওয়ার ফলে, তাঁর গল্প উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলির অধিকাংশই এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী, কমল, অভয়া, কমললতা, অচলা, কিরণময়ী প্রভৃতি এরা ত একরূপ সমাজচ্যুতা পতিতাই। এদের কথা বাদ দিলেও রমা বিধবা—সে রমেশকে ভালবাসে, বিধবা মাধবী সুরেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্টা হয়।

সমাজচ্যুতা পতিতা ও বিধবার প্রেম বা ভালবাসা সমাজবিরোধী এবং সমাজের চোখে অবৈধ। এই প্রকারের প্রেম সমাজের কাছে দোষণীয় হলেও শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, নারী সে পতিতা বা বিধবা হতে পারে, কিন্তু তার নারী-হৃদয়ে যে স্বাভাবিক দুর্বার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে ত কখন মিথ্যা নয়! শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে তাই এই সত্যকেই স্বীকার করেছেন। উপন্যাস যখন সমাজের ছবি, তখন সমাজের এই স্বাভাবিক সত্যকে উপন্যাসে স্থান দিতে আপত্তিই বা থাকবে কেন?

আগের দিনের সাহিত্যিকরা পতিতা ত দূরের কথা, বিধবার প্রেম বা ভালবাসার কথা পর্যন্তও সাহিত্যে স্থান দিতে সাহস করেন নি। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র এক স্থানে লিখেছেন—

"আমার মনে আছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী আর কিছুই রইল না! ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?— আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায়—বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।" (সাহিত্য ও নীতি)।

শরৎচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়ে মনশ্চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচিত্তের যে দুরবস্থা দেখেছিলেন, নিজের সাহিত্য সাধনার সময় তিনি আর তার পুনরভিনয় করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচিত্ত যেমন তাঁর নিজেরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল, শরৎচন্দ্রের কবি-মন কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করে নি। শরৎচন্দ্র যাকে সত্য বলে জেনেছিলেন, তার প্রচারের জন্য তিনি প্রচলিত রীতি বা নীতির বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অবশ্য এই প্রকারের প্রেমের চিত্র প্রথম আঁকেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম তাঁর "চোখের বালি" উপন্যাসে বিধবা বিনোদিনীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষার চিত্র আঁকেন এবং বিধবা বিনোদিনীর এই প্রেমকে নারী হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবেই স্বীকার করে নেন। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁর উপন্যাসে বিধবার প্রণয়চিত্রকে স্থান দেওয়ায় বাঙ্গলা উপন্যাস জগতে এক নবধারার প্রবর্তন হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চোখের বালি"তে বিধবা বিনোদিনীর প্রেম আকাঙ্ক্ষার কথা উত্থাপন করে বাঙ্গলা উপন্যাসে যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তারই পূর্ণ ও সার্থক পরিণতি ঘটে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। আর শরৎচন্দ্র শুধু বিধবাই নয়, সমাজচ্যুতা এমন কি পতিতা বারবনিতারও জীবনে যে সত্যকার প্রেম বা প্রকৃত ভালবাসা জাগতে পারে, তারও চিত্র তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি দেশের নীতিবাগীশ-দের কাছ থেকে অজস্র গালাগালি পেয়েছেন এবং এখনও হয়ত খাচ্ছেন। তবে তিনি যাকে সত্য বলে জেনেছিলেন, কারও গালাগালি বা সমালোচনার ভয়ে তা থেকে একটুও পিছু পা হন নি। এ সম্পর্কে তিনি নিজে অনেকবার বলেছেন—"প্রথম যখন চরিত্রহীন লিখি, তখন পাঁচ ছ বছর ধরে গালাগালির অন্ত ছিল না। তবে মনের মধ্যে আমার এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিষটা আমি ধরেছিলুম।"

শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজের কথা উল্লেখ করেও আর এক জায়গায় বলেছেন—"পল্লীসমাজ বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে।......রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)।"

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসের অনেকগুলি নারীচরিত্রে সমাজ-অপ্রচলিত এই প্রকারের অবৈধ প্রণয়ের প্রকাশ দেখালেও, তিনি সামাজিক বৈধ প্রণয়ের চিত্রও বহু এঁকেছেন। বহু পতিভক্তি-পরায়ণা সতী নারীর চিত্র, তাদের দাম্পত্য জীবনের হাসি-কান্না, মান-অভিমান প্রভৃতির কথাও তিনি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। শুভদা, সুরবালা, মৃণাল প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের অনেকেই তাদের স্বামী-গৃহের বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু তবুও এদের পতিভক্তি এতটুকুও কমে নি। এমন কি মৃণালের মত একজন সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী যুবতীর সঙ্গে এক বৃদ্ধের বিবাহ হলেও মৃণাল তার বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কোথাও কম করে নি। এই মৃণাল অচলাকে তাই একবার বলেছিল—"স্বামী জিনিষটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি সত্য, জীবনেও সত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাঁকে আর আমরা বদলাতে পারি নে।" (গৃহদাহ)।

আর এই মৃণাল শুধু তার বৃদ্ধ স্বামীকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করত না, তার স্বামীর সমস্ত সংসারের ভারই সে ঘাড়ে নিয়েছিল। কত না যত্ন করে সে তার মুমূর্ষু শাশুড়ীর পর্যন্তও সেবা করত। তাই সুরেশ একদিন মৃণালকে বলেছিল—"যাও দিদি তোমার বুড়ো শাশুড়ীকে সেবা করে কর্তব্য করগে, আমি আর তোমাকে আটকে রাখব না। এই হতভাগা দেশে আজও যদি-

কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমাদের মত মেয়ে মানুষ। এমন জিনিষটি বোধ করি, আর কোন দেশ দেখাতে পারে না।" (গৃহদাহ)।

শরৎচন্দ্র নরনারীর কি বৈধ আর কি অবৈধ উভয় প্রকারের প্রণয়-চিত্রগুলিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়িনীদের দিয়ে তাদের প্রেমাস্পদদের খাওয়ানোর চিত্রও এঁকেছেন। এখানে বৈধ, অবৈধ প্রণয়ের কোন প্রশ্ন নেই। উভয় প্রকারের প্রণয়িনীরাই তাদের ভালবাসার পাত্রদের খাওয়াচ্ছেন। মেয়েরা যে সাধারণতঃ তাদের প্রেমাস্পদকে নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতে ভালবাসে, এই কৌশল বা, টেকনিকটা শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রণয়-চিত্র ফোটানোর ব্যাপারে অনেক জায়গায় প্রয়োগ করেছেন। তাই দেখা যায়—শুভদা, কি বিরাজবৌ তারা নিজেরা না খেয়েও তাদের নিজ নিজ স্বামীকে খাওয়াবার জন্যই সর্বদা ব্যস্ত। সৌদামিনী তার আত্মভোলা স্বামীর খাওয়ার জন্যই তার সংশাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করেছে। এ সব ছাড়াও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর খাওয়ার যত্নের জন্য ব্যস্ত, কমললতা সেও শ্রীকান্তকে নিজের হাতে খাওয়াতেই ভালবাসে। আরও দেখা যায় যে, বিজয়া নরেনকে, রমা রমেশকে, কিরণময়ী উপেনকে, বন্দনা বিপ্রদাসকে, এমন কি দরিদ্র কমল যে জামা কাপড় সেলাই ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে সেও অজিতকে খাওয়াচ্ছে।

শরৎচন্দ্র প্রেমের চিত্র ফোটাবার জন্য এই খাওয়ানো ছাড়া আর একটি কৌশলও অবলম্বন করেছেন। সেটি হ'ল প্রণয়িনীকে দিয়ে তার প্রেমাস্পদের সেবা করানো। এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির সেবা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসীর দলে মিশে যখন কঠিন ব্যারাম হয়ে একান্ত অসহায় হয়ে পড়ল, তখন রাজলক্ষ্মী গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনল। চন্দ্রমুখী দেবদাসকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে, সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচাল।

শরৎচন্দ্রের এই খাওয়ানো ও সেবার টেকনিকে প্রণয়চিত্রগুলি ফুটেছেও চমৎকার ভাবে।

নারীর প্রণয়চিত্র ছাড়া নারী-হৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের চিত্রও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তবে এই ব্যাপারে শরৎ-সাহিত্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার এই যে, নারীহৃদয়ের এই স্নেহ-বাৎসল্য প্রায়ই তার নিজের স্নেহাস্পদ বা সন্তান অপেক্ষা কোন না কোন আত্মীয়সন্তানের উপরই বেশি করে গিয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মা-ই তার সন্তানকে স্নেহ যত্ন করে, এর মধ্যে এমন কিছু নতুনত্ব নেই। তাই শরৎচন্দ্র মায়ের অপত্যস্নেহের চিত্র তেমন বেশি করে দেখাতে চেষ্টা করেন নি। বরং মানুষের যে ধারণা, কোন নারী তার সপত্নী-পুত্রকন্যাদের স্নেহ করে না, কোন বৌদি তার ছোট বৈমাত্রেয় দেবরকে ভাল চোখে দেখে না, কোন কাকী তার বড় জায়ের ছেলেকে ভালবাসে না, মানুষের এই ভুল ধারণাকেই শরৎচন্দ্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের এই অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে বিমাতা তার নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হলেও, সুরেন্দ্রের দেখাশুনাতের সীমা ছিল না।

দেবদাসে পার্বতী তার বড় বড় সপত্নীপুত্র ও কন্যাদের কি সুন্দর আদর যত্ন করছে ও কেমন ভাবে তাদের আপন করে নিয়েছে। পার্বতী তার নিজের গয়নাগুলো পর্যন্তও তার সপত্নীকন্যা যশোদাকে পরিয়ে দিল। যশোদা সৎমার স্নেহে অভিভূত হয়ে তার দাদা মহেন্দ্রকে তাই জিজ্ঞাসা করেছিল—"আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত আদর যত্ন করতে পারে?"

হেমাঙ্গিনী তার বড়জা কাদম্বিনীর বৈমাত্রেয় ভাই কেষ্টকে খুব যত্ন করত। রামের সুমতিতে নারায়ণী তার পুত্র গোবিন্দ অপেক্ষাও বৈমাত্রেয় দেবর রামকে অধিক স্নেহ করত। আর বিন্দু ত তার বড়-জায়ের ছেলেকে আপন ছেলেই করে নিয়েছিল।

শরৎ-সাহিত্যে আরও কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারী-চরিত্র রয়েছে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন পল্লী-সমাজের জ্যাঠাইমা, গৃহদাহের পিসিমা প্রভৃতি কয়েকটি উদার-হৃদয়া, আদর্শ নারী আছে, অপর দিকে তেমনি রামের সুমতির বৃন্দাবনী, বামুনের মেয়ের রাসমণি, মেজদিদির কাদম্বিনী প্রভৃতি কয়েকটি নীচমনা, ক্রূর-প্রকৃতির নারী-চরিত্রও রয়েছে। এই উভয় প্রকারের নারী-চরিত্রগুলিই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেই নারীর প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে এবং নারীকে নারীত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নারী-চরিত্রগুলিকেই প্রধান বা মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর পুরুষচরিত্রগুলি অপ্রধান বা গৌণ হয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত পুরুষচরিত্রগুলি অপেক্ষা নারী-চরিত্রগুলিই বেশির ভাগ বলিষ্ঠ। যেমন, রাজলক্ষ্মী কি কমললতার কাছে শ্রীকান্ত, অভয়ার কাছে রোহিণী, চন্দ্রমুখী কি পার্বতীর কাছে দেবদাস, শুভদার কাছে হারাণচন্দ্র, সাবিত্রীর কাছে সতীশ, কিরণময়ীর কাছে দিবাকর, আর শেষ প্রশ্নের কমলের কাছে ত ঐ গ্রন্থের প্রায় সকল পুরুষচরিত্রগুলিই দুর্বল বলে মনে হয়। তবে শরৎচন্দ্র গৃহদাহে মহিম, চরিত্রহীনে উপেন, পল্লী-সমাজে রমেশ, বিপ্রদাসে বিপ্রদাস, শেষপ্রশ্নে রাজেন, পথের দাবীতে সব্যসাচী প্রভৃতি কয়েকটি বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্রও এঁকেছেন এবং এই চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ফুটেছেও চমৎকারভাবে।

শরৎ-সাহিত্যে কতকগুলি বোহিসাবী, অবৈষয়িক, আপন-ভোলা, পরোপকারী মানুষের চিত্রও রয়েছে। নিষ্কৃতির গিরিশ, বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল, শুভদার সদানন্দ চক্রবর্তী বা সদা পাগলা, বিরাজ-বৌএ নীলাম্বর, বামুনের মেয়ের প্রিয়নাথ, শ্রীকান্তের গহর, বড়দিদির সুরেন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চরিত্রগুলি সৃষ্টির দিক থেকে অস্বাভাবিক ত হয়ই নি, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়েছে।

দেখিয়েছেন, তেমনি পল্লী-সমাজে বেণী ঘোষাল, শুভদায় হরমোহন, শেষপ্রশ্নে অক্ষয় প্রভৃতি অনেকগুলি স্বার্থপর, পরছিদ্রান্বেষী, ক্রুর চরিত্রের কথাও বলেছেন। এই চরিত্রগুলি এত বাস্তব হয়েছে যে, মনে হয় এদের যেন আশে-পাশে আমরা অনেকবার দেখেছি। এরা যেন আমাদের অনেকদিনেরই চেনা ও জানা।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে শিশু ও কিশোরকিশোরীর চরিত্রগুলিও চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। শিশুর মনস্তত্ত্বকে তিনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিশুমনের রহস্য ও তাদের মনের কথা এমন আশ্চর্যরূপে বলা হয়েছে যে, মনে হয় যেন লেখক নিজে শিশু সেজে তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরই মুখের কথা টেনে এনেছেন। শিশুর প্রশ্ন ও কৌতূহল, ভয় ও বিস্ময়, হাসি ও কান্নার কথা পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকারাও যেন অজ্ঞাতে আপন আপন শৈশবে ফিরে যান এবং এই সব শিশুদের কার্যকলাপের কথা প'ড়ে, নিজেদের শৈশব-স্মৃতি স্মরণ করে পুলকিত হন। রামের সুমতিতে রাম ও গোবিন্দ, বিন্দুর-ছেলেয় অমূল্য, বিরাজ-বৌএ পুঁটি, বিজয়ায় পরেশ, শ্রীকান্তে ইন্দ্রনাথ, বালক শ্রীকান্ত, যতীন প্রভৃতি, দেবদাসে শিশু দেবদাস ও পার্বতী, নিষ্কৃতিতে কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু ও কিশোরকিশোরীর চরিত্র তিনি এঁকেছেন এবং সৃষ্টির দিক থেকে সবক'টি চরিত্রই নিখুঁত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে অনেক ধনী, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও জমিদারের কথা বললেও, তিনি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজকে নিয়েই তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সাহিত্যে অতি সাধারণ মানুষ বা দরিদ্র ব্যক্তিদের যে স্থান নেই তা নয়, বরং এই অতি সাধারণ এবং দরিদ্র মানুষেও তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা দখল করেছে। শুভদা, বিরাজ-বৌ, অরক্ষণীয়া, মহেশ, শেষপ্রশ্ন, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ প্রভৃতি গল্প উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র বহু দারিদ্র্যের চিত্র দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর দরদ দিয়েই এই অভাবের চিত্রগুলি এঁকেছেন। এই অভাবী ও বঞ্চিত মানুষদের কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।"

তিনি অন্যত্র আরও বলেছেন—"এই অভিশপ্ত দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"

দরিদ্র, বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষদের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা অকৃত্রিম দরদ ছিল বলেই তিনি এমন কথা বলতে পেরেছেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

মালাবারে ওনাম উৎসব

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মালাবার এক বিচিত্র দেশ। প্রাচীন ধরণের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উৎসবাদি আজও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবারের 'ওনাম উৎসব' তত্রত্য জনপদবাসীর সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতি বছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত জনপদ আনন্দে মাতিয়া উঠে। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকেরাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে এই উৎসবটি উদ্‌যাপনের জন্য। পর্ণকুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া সৌধাবলী আলোকমালায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই আলোর উৎসব দেখিলে বাংলা দেশের দীপান্বিতা পর্বের কথা মনে পড়ে। এই উৎসব সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাবলীর রাজত্ব মালাবারের জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁহার সুশাসনে প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করিত। সর্বত্র এক মহান শান্তি বিরাজিত ছিল। ধন-প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। মহাবলী দৈত্যকুলোদ্ভব। দেবাসুরের মধ্যে সদ্ভাব কোন কালেই ছিল না। তাই দৈত্যেশ্বর মহাবলীর সুযশ এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেবগণের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল। মহাবলীর ক্রমবর্ধমান শক্তি খর্ব করিবার জন্য দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। মদগর্বে স্ফীত দৈত্যাধিপকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ জানাইলেন। ভগবান বিষ্ণু দেবতামণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় করিলেন। অতঃপর তিনি বামনরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। একদিন বামনরূপী ভগবান মহারাজাধিরাজ মহাবলীর নিকট উপনীত হইলেন। বামনের মাধুর্যমণ্ডিত অপরূপ সৌন্দর্যে দৈত্যরাজ মুগ্ধ হইলেন। তিনি বামনকে অতি সমাদরে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। অধিকন্তু বামনের মনোমত প্রার্থিত বস্তু প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। তখন ছদ্মবেশী বিষ্ণু স্মিতহাস্যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাবলী তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কী আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে বামনের ক্ষুদ্র দেহ বিরাট আকার ধারণ করিল। বামন দুই পায়ের দ্বারা স্বর্গ এবং মর্ত্য অধিকার করিয়া বাকী তৃতীয় পদের জন্য ভূমি চাহিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া দৈত্যেশ্বর মহাবলী স্বীয় মস্তকে ভগবানের তৃতীয় চরণ ধারণ করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ভগবান দৈত্যরাজকে পাতালে বাস করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু

প্রজারঞ্জক রাজাকে হারাইয়া সমস্ত জনপদবাসী শোকে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদের ক্রন্দন বামনের হৃদয় স্পর্শ করিল। প্রতি বছর একবার করিয়া মহাবলী পাতালপুরী হইতে মর্তধামে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহাবলীর এই প্রত্যাবর্তন সাধারণতঃ আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে হইয়া থাকে। দৈত্যাধিপতির পুনরাগমন উপলক্ষে যে বিরাট জাঁকজমক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই মালাবারের 'ওনাম উৎসব' নামে অভিহিত। এই উৎসব অল্পকাল স্থায়ী হইলেও সমস্ত জনপদ এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। অল্প সময়ের মধ্যে যে সমারোহ সেখানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা দর্শকমাত্রেরই এক পরম বিস্ময়ের বস্তু! ভূতপূর্ব রাজার প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নাচ-গান, ভোজ, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন হয়।

মালাবারের এই উৎসব-কাল সর্বত্র সমান নহে। স্থানবিশেষে ইহা চারদিন, পাঁচদিন -এমন কি ছয়দিন পর্যন্তও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'তিরুবনম্' দিবসের দশদিন পূর্ব হইতেই ইহা সুরু হয়। এই দিবস প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব স্ব গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হয়। এই কার্যের ভিতর দিয়া 'ওনাম উৎসবের' আগমন সূচিত হইয়া থাকে। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বরের কিছু অংশ এবং বসত-বাটীর ভিতর গোবর জলের দ্বারা প্রতিদিন নিকানো হয়। এই পরিষ্কৃত জায়গায় বিভিন্ন ধরণের পাখী ও জীব-জন্তুর মূর্তি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এই সকল মূর্তি ফুলের তৈয়ারী ; নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে বেশ একটা শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মালাবারে কোন কোন স্থানে এই তিরুবনম্ দিবসের তিন চারদিন আগেই 'ওনাম উৎসব' আরম্ভ হয় ; তবে তিরুবনম্ দিবসেই সত্যিকারের 'ওনাম উৎসব' সুরু হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্র পরিবারে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও ভৃত্যবর্গকে নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার এবং 'পার্বণী' হিসাবে দেওয়া হয়। ইহা 'ওনাম উৎসবের' আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হয়। ছোট-বড় সমস্ত নর-নারী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া প্রত্যেকে উৎসব-আনন্দে মত্ত হয়। আঠালো মাটি দিয়া এক অদ্ভুত ধরণের মূর্তি তৈয়ারী করা হয়। বিভিন্ন ফুলগাছের ডালাপালা, বিশেষ করিয়া বাঁশ এই সব মূর্তির মস্তকের উপর স্থাপিত হয়। এই অদ্ভুত মূর্তিগুলি সদর জায়গায় রাখা হয়। এই সব জায়গা আলপনা দ্বারা চিত্রিত এবং গোময় দ্বারা লেপন করা হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মূর্তিগুলির যথাবিহিত পূজা-অর্চনাদি হইয়া থাকে। পূজার পূর্বে কেহই জলটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করে না। পূজা শেষে সকলে প্রসাদ পাইয়া থাকে। উৎসবের কয়দিন নিয়মিতভাবে এই পূজা-অর্চনাদি চলিতে থাকে। এই সকল দেবমূর্তি 'তৃক্কক্কর অপ্পন' নামে অভিহিত। তিরুবনম্ দিবসের আগের দিন এই সমস্ত বিগ্রহ গৃহে আনীত হয়। বিগ্রহগুলি যথাস্থানে স্থাপিত হইলে সমবেত জনতা সমস্বরে এক ধরণের উচ্চ শব্দ করিতে থাকে ; ইহা দ্বারা 'ওনাম উৎসবের' আগমন ঘোষিত হয়।

'ওনাম উৎসব' উপলক্ষে প্রতিদিন ভোজ-পর্ব চলিতে থাকে। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কাঁচকলার বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়। এইগুলি দুই-তিন টুকরা করিয়া জলে সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধকরা কাঁচকলা অতি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ পৃথক্‌ভাবে এক জায়গায় বসিয়া আহার করে। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে ভোজন-পর্ব সমাধা হইয়া যায়। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করিয়া থাকে। উদয়াস্ত ফুটবল, মল্লযুদ্ধ, দাবা, পাশা ও তাস খেলা প্রভৃতি চলিতে থাকে। সাধারণতঃ মেয়েরাই নাচ-গানে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ফুটবল খেলায় ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। ইহার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। ওনাম উৎসবে যুবতী রমণীগণের নৃত্য-গীত দেখিবার মত বস্তু। এক একটি দলের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। নির্ধারিত স্থানে তাহারা উপনীত হইয়া মণ্ডলাকারে নাচিতে সুরু করে। বিভিন্ন ধরণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত গীতাবলী হইতে তাহারা গানের বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। মালাবারের নাটকাবলীর অংশ বিশেষও গীত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দলের একজন গানের একটি পয়ার গাহিবার পর বাকী সকলে এক সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে বিচিত্র সুর-লয়-তানসহ সেটির পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। একই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত গানটি গীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় গানের পালা আসিলে অপর এক যুবতী সেটি গাহিতে সুরু করে এবং একই ভাবে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। পালাক্রমে দলের প্রত্যেক যুবতীকে প্রধানা গায়িকার অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এই ভাবে সমস্ত দিনমান, এমন কি অনেক রাত্রি পর্যন্ত নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় চলিতে থাকে।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার সময় উক্ত মৃত্তিকা নির্মিত দেবমূর্তিগুলি অন্যত্র অপসারিত করা হয়। এই অপসরণ কার্য একটি শুভদিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শেষদিনে শুভক্ষণ না থাকিলে দুই তিনদিন বাদেও অপসরণ কার্য চলিতে পারে। এই ব্যাপারে যথেষ্ট জাঁকজমক পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্র একটা সুমহান গাম্ভীর্যের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। আগামী বছরে যাহাতে দেবতা কৃপা করিয়া পুনরাগমন করেন তজ্জন্য জনগণ দেবমূর্তিগুলির চরণে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানায়।

পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পি-এইচ-ডি-

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল। ঋকবেদে নারদীয় সূত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই দার্শনিক প্রশ্ন। বিভিন্ন উপনিষদে যে সকল বিষয়ের আলোচনা আছে তাহারাও দার্শনিক সমস্যা। বেদান্তদর্শন উপনিষদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহার আয়তন বিস্ময়কর। প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিল। বহুদেশ হইতে ছাত্রগণ তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার জন্য আগমন করিত। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের যে অন্যান্য দেশের চিন্তার সহিত পরিচয় ছিল—তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু ভারতে বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ভারতীয় সমাজ কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করে। সভ্যতার নিম্নতর স্তরে অবস্থিত বিজেতা সমাজের সংসর্গ হইতে আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এই কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন তখন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহার ফল ভাল হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। বহুদিন যাবৎ ইহার ফলে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিদেশী চিন্তার সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ভারতের সহিত ইউরোপের যোগাযোগ আবার আরব্ধ হয়। ইউরোপীয়গণ যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করেন, তেমনি অনেক ভারতীয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। কিন্তু বিদেশীয় চিন্তার সহিত এই পরিচয় মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ ও সাধারণ লোক ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহাদের নিকট পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধই থাকে। ইহার ফলে ভারতীয় দর্শনে বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও নূতন চিন্তার আবির্ভাব হয় নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনের আলোচনাতেই ব্যাপৃত আছেন। পাশ্চাত্য চিন্তার সহিত পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিতে পারিলে, তাঁহারা দার্শনিক সমস্যা-গুলিকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন এবং ভারতবর্ষে আবার নূতন নূতন দর্শনের আবির্ভাব সম্ভবপর হইবে। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা যাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে ইহা আশা করা যায়। কেন না তাঁহারাই ভারতীয় চিন্তাধারার ধারক, বাহক ও পোষক। যে ধারা এতদিন চক্রাকার খাতের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতেছিল, সেই খাত হইতে বহির্গমনের পথ পাইলে তাহা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই এমন অনেকে স্বকীয় চেষ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। তথায় বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি স্বদেশী ভাষায় লিখিত বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বাংলাদেশেও দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি যদি বাংলায় লিখিত হয়, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত অনেকে স্বকীয় চেষ্টায় দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।—এইজন্যই শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়ের "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস"কে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। ইহার প্রথম খণ্ড কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও যে বঙ্গীয় পাঠক কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার যে পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ পারদর্শী, গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল এবং বর্ণনাভঙ্গি মনোহর। গ্রন্থ পাঠের সময়ে দর্শন পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না। প্রথম খণ্ডে

* পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

পাইথাগোরাস, পারমেনিদিস, সক্রেতিস, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শন তিনি যেরূপ সরল ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দর্শনে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এরূপ মনোরম ভাষায় দর্শনের আলোচনা বিরল। কলেজে যে সকল ইংরেজী ভাষায় লিখিত দর্শনের ইতিহাস পড়ানো হয় তাহাদের অপেক্ষা বিষদতর ভাবে এই গ্রন্থে উপরোক্ত দার্শনিকদিগের মত বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সক্রেতিস, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শনের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার প্লেটোর রচনাভঙ্গীর অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে। ক্যাণ্টের দর্শনের পটভূমিকা ও হেগেলের দর্শনের পটভূমিকায়ও গ্রন্থকারের রচনা রীতির সৌন্দর্য্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত। ভল্টেয়ার ও রুশো শীর্ষক অধ্যায় দুইটি সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২ ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১২। দ্বিতীয় খণ্ডে বেকন হইতে হেগেল পর্য্যন্ত দার্শনিকদিগের দর্শন বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্পিনোজার দর্শনে ৭১ পৃষ্ঠা, ক্যাণ্টের দর্শনে ৫৭ পৃষ্ঠা এবং হেগেলের দর্শনে ৯২ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে।

নোভালিস স্পিনোজার দর্শন পড়িয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি স্পিনোজাকে "ঈশ্বরোন্মাদ" বলিয়াছিলেন। কিন্তু Martineau তাঁহার study of Spinoza গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে God শব্দের একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। Spinozaর substance God নহেন, কেন না তাঁহার মধ্যে বুদ্ধি (Intellectus) নাই। সুতরাং Spinozaর দর্শনে God নাম ব্যবহার করা সঙ্গত হয় নাই। যাঁহার মধ্যে বুদ্ধি নাই তাঁহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা শব্দের অপব্যবহার মাত্র। গ্রন্থকার নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে Spinoza যে বুদ্ধি ঈশ্বরে নাই বলিয়াছেন, তাহা মানবীয় বুদ্ধি; তিনি যে চৈতন্যময় পুরুষ তাহা Spinoza অস্বীকার করেন নাই।

গ্রন্থে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহাদের অনেকগুলিই যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

Being—সত্বা
Perception—প্রতীতি
Idea—প্রত্যয়
Conception—সম্প্রতী
Concept—সম্প্রত্যয়
Becoming—ভবন
Phenomenon—প্রতিভাস, সমুৎপাদ
Thing-in-itself-Noumenon—স্বগতবস্তু

এই শব্দগুলির অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। সকল শব্দের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকারকে বৃদ্ধ বয়সে যে শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার জন্য তিনি দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বাংলাভাষাকে যাহা দান করিলেন তাহার জন্য তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমরা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

(ত্রয়াঙ্ক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৌবাজার ষ্ট্রীটে ছোট একটি বাসা বাড়ী। বাড়ীর বাসিন্দা জয়ন্ত চৌধুরী বৌবাজারে অবস্থিত একটী হোমিওপ্যাথি কলেজের ছাত্র—সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবক; স্ফূর্তিবাজ ও দিলদরিয়া মেজাজ—সর্বোপরি ধনীর সন্তান বলিয়া সহজেই বন্ধু মহলে 'কাপ্তেন' বনিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত পিতার একমাত্র সন্তান, তদুপরি মাতৃহীন। শৈশব হইতেই পিতার অতিশয় আদরে প্রতিপালিত। পিতা ডাঃ দীনদয়াল চৌধুরী একজন নামকরা হোমিওপ্যাথ। কলিকাতা হইতে অনতিদুর মদনপুরে তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি। তিনি সেইখানে প্র্যাক্‌টিস করেন। জয়ন্ত এমনি দরাজ হাতে খরচ করে যে বাবা তাহার জন্য মাসে মাসে যে টাকা পাঠান—তাহাতে জয়ন্তর সাত-দিনেরও খরচ কুলায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে ধার করিতে হয়। এ ভাবে ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই ঋণজাল হইতে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়—আজ সকালে উপবেশন কক্ষে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে জয়ন্ত চৌধুরী তাহাই ভাবিতেছিল। উপবেশন কক্ষটীও শৌখিন রুচি অনুযায়ী সাজানো। একটি আলমারিতে হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই শোভা পাইতেছে। আলমারীর পাশেই টেবিল-চেয়ার। জয়ন্ত সেখানে বসিয়া পড়া-শোনা করে। আর একদিকে সোফা-সেট।

জয়ন্তর সহপাঠী ও অন্তরংগ বন্ধু বিমান এবং অনাদির প্রবেশ—তাহাদের হাতে পাঠ্য পুস্তক

বিমান॥ সওয়া সাতটা বাজতে চললো—হাসপাতাল ডিউটীতে যাবে না।

অনাদি॥ আর এই বা কি। তুমি জয়ন্ত চৌধুরী—ষ্টেট এক্সপ্রেস কোম্পানির একজন এক নম্বর খদ্দের—তুমি কিনা বিড়ি টানছ?

বিমান॥ ব্যাপার কি বলতো। হাসপাতালে যাবে না?

জয়ন্ত॥ আর হাসপাতাল। কোন মুখে যাবো বলো? কাল দুই পাওনাদার একেবারে কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। দেনার দায়ে মানৎ-ইজ্জৎ আর রইলো না ভাই বিমান।

অনাদি॥ আরে তোমার আবার দেনা। বাড়ীতে অমন কামধেনু বাপ রয়েছেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে একখানা চিঠি ছেড়ে দাও—হুড় হুড় করে টাকা এসে পড়বে।

জয়ন্ত॥ না ভাই অনাদি, সে পথ আর খোলা নেই। 'অসুখ হয়েছে'—'পকেট মারা গেছে'—'খান কতক দামী বই কিনতে হবে'—এ সব আর বাবা বিশ্বাস করবেন না। বাসাখরচ বাদে—পড়াশোনা আর হাতখরচ বাবদ মাসের ১লা তারিখে একশটী টাকা দেন। বাসাখরচ তো বাসা-খরচেই যায়। বাদবাকী একশ টাকায় আমার কি করে চলে বলতো? বাবা বলেন—তিনি যখন কলেজে পড়েছেন, পঞ্চাশ টাকার বেশী তাঁর লাগেনি। বাবাকে তো জানো—একবার যা গোঁ ধরবেন—আর তা ছাড়বেন না।

অনাদি॥ তাইতো—তাহলে তো বড় বিপদ, জয়ন্ত।

জয়ন্ত॥ যাও ভাই—তোমরা কলেজে যাও আমার আর কলেজ-টলেজ ভালো লাগছে না। দশজনের সামনে পাওনাদারের লাঞ্ছনা—ও ভাই আমি সইতে পারবোনা।

বিমান॥ তবে থাক—আমরাও যাব না। কি বলিস অনাদি?

দুই বন্ধু বইগুলি ধপাস করিয়া টেবিলে রাখিল এবং সোফায় বসিয়া পড়িল

অনাদি॥ না,—ওকে ছেড়ে যাব না। ভাল লাগে না।

বিমান॥ একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে।

অনাদি॥ দাঁড়াও আগে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয় দেওয়া যাক।

বিমান॥ কিন্তু সে ভাই তোমার ঐ বিড়িতে হবে না।

এই বলিয়া নিজের পকেট হইতে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বাহির করিল

জয়ন্ত॥ (ম্লান হাসিয়া) দাও। 'Any port in the Storm.'

পার্শ্বস্থিত শয়নকক্ষ হইতে গৃহ-কর্মরত ভৃত্য ভোলার প্রবেশ

এই ভোলা—তিন পেয়ালা চা কর দেখি।

ভোলা॥ করছি। কিন্তু দুধ-চিনি ছাড়া কবরেজী চা হবে।

বিমান॥ সে কি বাবা। কবরেজী চা!

জয়ন্ত॥ বুঝলে না। তার মানে গোয়ালা আর মুদী দুজনেই বেঁকে বসেছে। বকেয়া না পেলে হালে আর বাকী দেবে না। ভাই, তোরা যদি কেউ পারিস—কিছু টাকা দিয়ে মাসের এই বাকী কটা দিন চালিয়ে দেনা।

অনাদি॥ তা যদি পারতাম—সে তোকে আর বলতে হত না।

বিমান॥ কি কপাল দেখ! আমিই তোর কাছ থেকে আজ কিছু নেব ভাবছিলাম।

জয়ন্ত॥ তবে কবরেজী চা-ই খাও। দে ভোলা—তাই দে।

অনাদি॥ না বাবা—চা-ই খেতে চাই। পাচন খাব না। এই টাকাটা নাও—দুধ চিনি আন।

এই বলিয়া অনাদি ভোলার হাতে একটী টাকা দিতে গেল।

ভোলা টাকা না নিয়া বলিল—

ভোলা॥ (জয়ন্তকে) কেমন হ'ল তো? পরের পয়সায় চা খেতে হবে তোমাকে? যার বাপ লক্ষপতি, লক্ষ টাকা যার দান খয়রাত! আমি আজই বাড়ী চলে যাচ্ছি—কর্তাবাবুকে গিয়ে বলছি, আমাকে দিয়ে হবে না। এখানকার সংসার চালাতে হলে হয় তিনি নিজে আসুন—নয় একটা জাঁদরেল দেখে বউ ঘরে আনুন। নইলে এ যা দাঁড়িয়েছে—এ একেবারে অচল।

হনহন করিয়া ভোলা বাহিরের দিকে যাইতেছিল। জয়ন্ত ডাকিল—

জয়ন্ত॥ আরে শোন, শোন। কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলা॥ দুধ-চিনি আনতে যাচ্ছি। আবার কোথায় যাচ্ছি!

জয়ন্ত॥ পয়সা?

ভোলা॥ পয়সা তোমার না থাকতে পারে—কিন্তু তোমাদের চাকরের আছে। কুড়ি টাকা মাইনে পাই। কীই বা আমার খরচ আর কেই বা আমার আছে। ভেবেছিলাম একবার তারকেশ্বর যাব—তা যাব না।

ভোলা কেটলি নিয়া চায়ের জোগাড়ে বাহিরে চলিয়া গেল

জয়ন্ত॥ তা সত্যি। ওর জন্যেই মাসের শেষে দুটো ডাল-ভাত জোটে।

অনাদি॥ স্ত্রী আর ভৃত্য—এ ভাই ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

বিমান॥ যা বলেছ। ভৃত্য ভাগ্য তো ভালই দেখছি। এবার স্ত্রী-ভাগ্যটা যাচাই করে দেখ না হে জয়ন্ত। ঐ তো বলে গেল—কর্তাকে গিয়ে বলবে—'জাঁদরেল একটী বউ ঘরে আনো।'

জয়ন্ত॥ দাঁড়া—দাঁড়া—দাঁড়া···বোধ হয় হয়েছে। হাঁ-হাঁ-হাঁ···

অনাদি॥ কিরে—কী হল?

বিমান॥ অমন করছিস কেন? ক্ষেপে গেলি যে!

জয়ন্ত॥ ধর তোর একটা বোন আছে।

বিমান॥ বোন! আমার আবার বোন কোথায়?

জয়ন্ত॥ আঃ। ধর না—নিজের বোন না থাক—মামাতো কি মাসতুতো বোনই ধর। ধর তার বিয়ে হচ্ছে। ধর আমি বিয়েতে গিয়েছি। ধর—পণের পুরো টাকা না পেয়ে বর পিড়ি থেকে উঠে গেল। ধর—তোরা আমাকে সেই পিড়িতে বসিয়ে দিলি। ধর—তোর মতো বন্ধুর এই বিপদে আমি না বলতে পারলাম না। ধর—বিয়ে হয়ে গেল। ধর—বউ এনে আমি এ বাড়ীতে তুললাম। দেশের বাড়ীতে বাপের কাছে না নিয়ে এখানে কেন তুললাম?

অনাদি ও বিমান॥ তাইতো—কেন তুললে?

জয়ন্ত॥ ধর—তোর বোন পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আধমরা হয়েই ছিল—তার পর বিয়ের রাত্রে এই শক্ মানে প্রায় হার্ট ফেল হয় আর কি।

অনাদি॥ ঠিক—ঠিক।

বিমান॥ না হওয়াই আশ্চর্য।

জয়ন্ত॥ তবেই ধর—অক্সিজেন চাই। সে সব তো তোমার পাড়াগাঁয়ে হবে না। বাবার কাছেও না। কাজেই এই বাড়ী।

বিমান॥ বেশ বৌ এই বাড়ীতেই তুললে। কিন্তু তারপর?

অনাদি॥ তুমি পার পাচ্ছ কিসে?

জয়ন্ত॥ কেন ঐ অক্সিজেন। তাছাড়া, ওষুধ আছে,

নার্স আছে। আর তার ওপর বড় একজন ডাক্তার নাড়ী ধরে বসেই আছেন। খরচা? খরচা খুব কম করেও পাঁচশটা টাকা। একটি রাত্রেই বেরিয়ে যাবে না?

অনাদি॥ তা যাবে!

বিমান॥ তাতো যাবে। কিন্তু সে টাকাটা আসছে কোত্থেকে? দিচ্ছে কে?

জয়ন্ত॥ আমার কল্পতরু বাবা—আমার দয়ালু বাবা—ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী।

বিমান॥ কিন্তু তাঁকে এসব জানাচ্ছে কে? who is to bell the cat?

অনাদি॥ ও বাবা! তোমার ঐ বাঘা বাপের কাছে কে যাবেরে বাবা!

জয়ন্ত॥ না, না—কেউ না। যাবে একটা চিঠি। আটদশ লাইনের একটা Express letter. যার শেষ লাইনে থাকবে—'যদি এই অভাগিনীকে বাঁচাইতে চান—তবে অবিলম্বে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে পাঁচশটা টাকা পাঠান।'

বিমান॥ তোমার বাবার কথা তোমার মুখে যা শুনেছি—তাতে আমি জোর করে বলতে পারি—এমন হৃদয়ভেদী চিঠি পেয়ে পাঁচশ টাকা তিনি সংগে সংগেই T. M. O. করে পাঠাবেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কি করে? একদিন না একদিন বৌটিকে সশরীরে তাঁর কাছে জমা দিতে হবে।

জয়ন্ত॥ ইডিয়ট্! আরে জমা দেওয়ার আগেই যে খরচ লিখে ফেলব। ধর টাকাটা পেলাম। সংগে সংগেই তখন আর একখানা চিঠি—'বাবা হতভাগিনী আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গত রাত্রে আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।'

অনাদি॥ মার্ভেলাস! সাবাস! সাবাস!

বিমান॥ মেরে দিয়েছিস্—মেরে দিয়েছিস্—(হঠাৎ থামিয়া গিয়া) কিন্তু···

জয়ন্ত॥ আবার কিন্তু কি?

বিমান॥ ধর—চিঠি পেয়ে T. M. O. না করে তোমার দীনদয়াল বাবা নিজে চলে এলেন।

অনাদি॥ কিংবা ধর—টাকাও পাঠালেন—আবার প্রাণের ব্যগ্রতায় পরের ট্রেণেই তিনি নিজে এসে হাজির

জয়ন্ত॥ তোরা আমার বাবাকে জানিস্ না বলে এসব কথা বলছিস। আমার মার স্মৃতিরক্ষার জন্যে বাবা নিজের গ্রামে—নিজের বাড়ীতে যে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন—তার কাজ ফেলে—রোগীদের চিকিৎসা ফেলে তিনি একমুহূর্তের জন্যেও বাইরে আসবেন না। এইতো—সেবার আমার অমন অসুখ হোল। এসেছিলেন? টাকা পাঠালেন, লোক পাঠালেন, বলে দিলেন—সুবিধে না বুঝলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

বিমান॥ মানে, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছামি'। না। মেরে দিয়েছিস। তা ওটা হাজারই করে দেনা। আমারো কিছু দরকার—ভারি ঠেকে পড়েছি।

জয়ন্ত॥ না, না, ভাই। বাপকে ঠকানোরও একটা সীমা আছে। এই পাঁচশো টাকা পেলে দেনাগুলো সব শোধ করে—গংগাস্নান করে প্রতিজ্ঞা করব, আর রেস নয়, ফ্লাশ খেলা নয়, শখের থিয়েটার নয়। (বন্ধুদের মুখের চেহারা খারাপ হইতেছে দেখিয়া) না, না, তোদের নিয়ে ফারপোতে যাবো, সিনেমায় যাবো, পিকনিক করব—দুদশ টাকা ধারও দেব···না, না, ভাই ওর বেশী আর পারবো না।

এমন সময়ে বাহির হইতে কেট্‌লিতে চা নিয়া ভোলা ভিতরে ঢুকিল

বাঃ—এই তো চাও সময় বুঝে এসে গেছে। Let us celebart

অনাদি॥ Celebrate তো করছ। কিন্তু (ভোলাকে লক্ষ্য করিয়া) ঐ শালটা সামলাবে কে? ধর—কর্তা ওকে জিজ্ঞেস করে বসলেন "ভোলা—বৌমা যে পটলটি তুললেন কেমন করে তুললেন।" তখন বোঝ ঠেলা!

জয়ন্ত॥ হাঁ···তোর যেমন বুদ্ধি! আমি বুঝি তা ভাবিনি। আরে যে দুটি তারিখে ঐ দুর্ঘটনাগুলো সাজাবো, সে দুটি তারিখের জন্যে ওকে বাবা তারকেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভোলা আসিয়া তিনজনকে চা দিল

অনাদি ও বিমান॥ জয় বাবা—তারকেশ্বরের জয়

ভোলা॥ হাঁ, বাবা তারকনাথই যদি এখন দয়া

না। বাবার কাছে মাথা খুড়তাম—তবে যদি তোমার একটু সুমতি হত।

জয়ন্ত॥ তাই কর ভোলা। তুই যাবি। তে-রাত্রি থাকবি ওখানে—বুঝলি তে-রাত্রি।

ভোলা॥ এঁ্যা···তবে বোধহয় এদ্দিনে একটা গতি হোল্। জয় বাবা তারকনাথের জয়!

তিনবন্ধু॥ জয় বাবা—তারকনাথের জয়!

তারকনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম

দ্বিতীয় দৃশ্য

মদনপুর গ্রামে ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরীর বিশাল ভবনের একাংশে মমতাময়ী হোমিও হাসপাতাল অবস্থিত। তাহারই অফিস কক্ষ—সকাল-বেলা। হাসপাতালের সেক্রেটারী এবং সহকারী ডাক্তার ভুজংগ মিত্র যুধিষ্ঠির দাস নামক একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছিলেন

যুধিষ্ঠির॥ ভাগ্যিস দয়াল ডাক্তারের এই হাসপাতাল ছিল, তাই এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলাম স্যার। বেঁচে উঠে আবার না মরি এবার সেইটা দেখুন স্যার।

ভুজংগ॥ তার মানে?

যুধিষ্ঠির॥ তার মানে—অসুখে ভুগে ভুগে কারখানার কাজটিতো গেছে। এখন নিজেই বা কি খেয়ে বাঁচি—আর একপাল পোষ্যকেই বা কি খাওয়াই! এই হাসপাতালেই যদি দয়া করে একটা চাকরী দিতেন স্যার!

ভুজংগ॥ বাঃ বেশ লোক তো তুমি! মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে বলো নি—এই রক্ষে! যতো সব···

যুধিষ্ঠির॥ আজ্ঞে স্যার—তাহলে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন—একমাস এখানেই চিকিৎসায় ছিলাম। সেটা দেখিয়ে চাকরিটা যদি আবার ফিরিয়ে পাই।

ভুজংগ॥ (কাগজ কলম লইয়া) কি যেন তোমার নাম?

যুধিষ্ঠির॥ আজ্ঞে শ্রীযুধিষ্ঠির দাস।

ভুজংগ॥ যুধিষ্ঠির! ধর্মপুত্তুর!

তাহার Case sheet বাহির করিয়া দেখিয়া certificate লিখিতে লাগিলেন, এমন সময় নার্স বেলা বোসের প্রবেশ

বেলা॥ ডক্টর···

ভুজংগ॥ ইয়েস্ নার্স···

বেলা॥ তিন নম্বর বেডের রুগী—

ভুজংগ॥ খাবি খাচ্ছে তো! আঃ।

চেয়ার ছাড়িয়া ভুজংগ উঠিলেন, এবং নার্সের সংগে চলিয়া গেলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া টেবিলের উপরে রক্ষিত ভুজংগের দামী পকেট ঘড়িটি যে মুহূর্তে তুলিয়া তাহার ট্যাঁকে গুজিতে গেল—ঠিক সেই মুহূর্তে ভুজংগ পুনঃ প্রবেশ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার নিকট হইতে ঘড়িটি উদ্ধার করিলেন

ভুজংগ॥ এক মিনিটের জন্যে ঘড়িটা ভুলে ফেলে গেছি—এরই মধ্যে—বেটা যুধিষ্ঠির! ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! (চীৎকার করিয়া) ব্যাটা নেমকহারাম পাজি! চুরি করবার আর জায়গা পাওনি? ওষুধ পথ্যি খেয়ে যে হাসপাতালে প্রাণ বাঁচলে—সেখানেই চুরি···

ভুজংগের এই চীৎকারে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্তা ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন। হাসপাতালের চাকর-বেয়ারা ও নার্সও আশে-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল

দীনদয়াল॥ ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভুজংগ!

ভুজংগ॥ দেখুন তো ব্যাটার নেমকহারামী! কমাস ধরে ঔষধ পথ্যি দিয়ে আমরা ব্যাটাকে চাংগা করে তুললাম, আজ ছাড়া পেয়েই ব্যাটা আমার ঘড়িটা চুরি করে পালাচ্ছিল!

বেলা॥ ও, সেই লোকটা! পাশের বেডের রোগীর পথ্যি চুরি করে খেত!

ভুজংগ॥ বেটা চোর—আবার নাম 'যুধিষ্ঠির'! ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির!

দীনদয়াল॥ অন্যায়—অন্যায়, এ তোমার ভারী অন্যায় যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির॥ আর করবো না হুজুর—আমায় এবারটী মাফ করুন—হুজুর মা-বাপ।

দীনদয়াল॥ মাফ্ করবো? চুরি করেছিস, তোকে মাফ করবো—মাপ করলে কি তোর চুরি শোধরাবে।

যুধিষ্ঠির॥ (দীনদয়ালের পা জড়াইয়া ধরিয়া)—পেটের দায়ে চুরি করেছি হুজুর! হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কি খাবো—সেই ভাবনায় চুরি করেছি হুজুর।

দীনদয়াল॥ পেটের দায় তো বিশ্বশুদ্ধ লোকের রয়েছে। সবাই চুরি করছে?

ভুজংগ॥ দিন বেটাকে থানায় চালান করে। জেলে পচুক, ঘানি টানুক। তবে শিক্ষা হবে।

দীনদয়াল॥ বলছ কি ভুজংগ! সামান্য একটা ঘড়ি চুরি করার জন্যে ওকে জেলে পাঠাবো? ৮ [illegible]

থেকে ডাকাত হয়ে বেরুবে। না, না, জেল নয় ভুজংগ, জেল নয়।

ভুজংগ॥ তবে ?

দীনদয়াল॥ যাও—তোমরা সব যে যার কাজে যাও।

চাকর বেয়ারা ও নার্স চলিয়া গেল

জেল নয়—ভুজংগ—জেল নয়। ওর দরকার আরও চিকিৎসা—Treatment.

ভুজংগ॥ চিকিৎসা! Treatment!

দীনদয়াল॥ চুরিই বলো আর ডাকাতিই বলো আসলে সবই হচ্ছে রোগ হে—রোগ। ঠিক মত ওষুধ পড়লে সবই সেরে যায়। কি ব্যারামে ভুগছিল লোকটা ?

ভুজংগ টেবিল হইতে যুধিষ্ঠিরের রোগের বিবরণ পত্রটি দেখিয়া

ভুজংগ॥ হার্টের কলিক।

দীনদয়াল॥ (বিবরণ পত্রটি দেখিয়া) হৃৎ শূল! প্রধান লক্ষণ অস্থিরতা, নড়িলে রোগীর যন্ত্রণার বৃদ্ধি তথাপি না নড়িয়া পারে না। গান করিবার প্রবল আবেগ। কি হে—

যুধিষ্ঠির॥ আজ্ঞে ও আমার অনেক কালের রোগ। গান যখন চাপে—তখন গান গেয়ে গেয়ে গলা না ভাঙা পর্য্যন্ত তার ক্ষান্তি নাই। হুজুর—দু-দুটো চাকরি এই জন্যেই গেছে।

দীনদয়াল॥ হতেই হবে—হতেই হবে! এরপর তোমার আর একটি গুপ্ত লক্ষণ আজ ধরা পড়ল। অর্থাৎ অপরের দ্রব্য তার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করবার বা অপহরণ করবার প্রবল ইচ্ছা! যাকে বলে Kleptomania চৌর্যোন্মাদ। ভুজংগ, It is a clear case of Tarentula Hispania. আয় হতভাগা—আয়! তোর রোগ আমি দু-মাসেই ভালো করে দেবো।

দীনদয়াল তাহাকে টানিতে লাগিলেন

যুধিষ্ঠির॥ (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে—আমায় ছেড়ে দিন হুজুর। হুজুর বাপ-মা। ছেড়ে দিন হুজুর।

দীনদয়াল॥ ছেড়ে দেব কি? তোর রোগ আমি জন্মের মতো সারিয়ে দেব। চল বেটা কাজ করবি। ভুজংগ, আজ থেকে ওকে হাসপাতালের বেয়ারা করে নাও। বুঝলি, ব্যাটা—আজ থেকে তুই এখানে চাকরী করবি।

ভুজংগ॥ এই চোরটাকে আবার হাসপাতালে চাকরীও দিচ্ছেন ?

দীনদয়াল॥ শুধু ওষুধ দিলেও হবে না ভুজংগ! ওকে observationএ রাখতে হবে বেশ কিছু দিন।

ভুজংগ॥ বেশ, হাসপাতাল তা হলে যত ছোটলোক বদমাইসেরই আড্ডা হয়ে উঠুক! অবশ্য আপনার টাকায় এই হাসপাতাল। কিন্তু তবু বলব—একে যখন ট্রাষ্ট প্রোপার্টি করে এর পরিচালনার ভার পাঁচজনের হাতে রেজেষ্ট্রি দলিল করে ছেড়ে দিয়েছেন—তখন সেই ট্রাষ্টের সেক্রেটারী হিসাবে আমি না বলে পারছি না স্যার—হাসপাতাল দরিদ্র রোগীদের জন্যে—কারো খামখেয়াল মেটাবার এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে নয়—চোর বদমাইসের জন্যে নয়।

দীনদয়াল॥ চোর বদমাইস! আমি বলছি—সেও এক ব্যাধি! তোমাদের কতবার বলেছি—ভগবানের সৃষ্টি ভগবানের মতই সুন্দর। তাঁর সৃষ্ট লোক কখনো খারাপ হতে পারেনা। না—কক্ষনো নয়।

ভুজংগ॥ (ব্যঙ্গে) হাঁ, দুনিয়ার সব লোকই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কেউ খারাপ নয়।

দীনদয়াল॥ খারাপ হয়—খারাপ অবশ্যই হয়, কিন্তু যখনই খারাপ হয়—তখন বুঝতে হবে—লোকটির কোন ব্যাধি হয়েছে। ব্যাধিগ্রস্ত হয়েই লোকে পাপ কার্য করে, অসৎ হয়, হিংসুক হয়, কারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, খারাপ কাজ করে। ব্যাধিটি সমূলে বিদূরিত হলেই লোক তার স্বাভাবিক সুন্দর মনোবৃত্তি ফিরে পায়। চোর অথবা খুনী, কোন ব্যাধির প্রকোপেই চোর বা খুনী হয়েছে, নতুবা হতো না।

ভুজংগ॥ তাহলে আপনার এই থিওরী নিয়ে আপনি থাকুন স্যার কিন্তু না ব'লে পারছিনা লোকে আপনাকে সামনে বলে দেবতা, পেছনে গিয়ে বলে পাগল। যাক আপনি আমায় বিদায় দিন স্যার। চোর বদমায়েস নিয়ে আমি হাসপাতাল চালাতে পারবোনা স্যার।

দীনদয়াল॥ তুমি—তুমি মমতাময়ী হাসপাতালের আদি কথাটাই ভুলে গেছে।

দীনদয়াল এই বলিয়া ভুজংগকে টানিয়া লইয়া দেয়ালে টাঙানো স্বর্গতা সহধর্মিনী মমতাদেবীর তৈল-চিত্রের নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া

সাধু বদমাস বলে কিছু ছিলনা ভুজংগ। (তৈলচিত্রের দিকে তাকাইয়া) যেখানে যে দুঃখী, যেখানে যে রুগ্ন, যেখানে যে অসহায় সকলের ছিল তোমার সমান মমতা। তাই তো তোমার স্মৃতি বাঁচিয়ে অমর করে রাখবার জন্য আমি মন্দির, মিনার, মঠ গড়ে তুলিনি—গড়ে তুলেছি এই হাসপাতাল—মমতাময়ী হাসপাতাল। তাজমহলের শুভ্র গম্বুজের দিকে চেয়ে চেয়ে বাদসা সাহজাহানের বুকে তাঁর মমতাজের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকত। আর আমার কি হয় জানো? এখানে একটি দুঃখী, একটি অসহায় রোগী যখন সেবায়, শুশ্রূষায় নীরোগ হয়ে ওঠে—তখন আমি বুঝতে পারি—তোমার অমর আত্মা চরম তৃপ্তি লাভ করে। আর তাই—তাই বুকের রক্ত দিয়ে আমি এই হাসপাতাল গড়ে তুলেছি, ভুজংগ।

কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন ভুজংগ নাই। তাঁহার এই আবেগপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যস্থলে বিরক্তিভরে ভুজংগ প্রস্থান করিয়াছে। দীনদয়াল বেদনা বোধ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে শুধু একটি কথাই নিঃসৃত হইল—

"যাক গে"—

দীনদয়াল ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন এবং সম্মুখে রক্ষিত চিঠি-পত্রগুলি খুলিতে লাগিলেন। প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া তাহাতে কি লিখিয়া বাস্কেটে ফেলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন। এ পত্রখানি জয়ন্তর। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবাবেগ দমন করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া উঠিলেন

ভুজংগ! ভুজংগ! তিনকড়ি! অবিনাশ! তোমরা সব শুনে যাও। আমার জয়ন্ত বিয়ে করেছে। গরীব বন্ধুর জাত রক্ষা করেছে।

পত্র পড়িতে লাগিলেন

"আমার বাবার হৃদয় কত উঁচু তা আমি জানি বলেই এ বিয়ে করতে আমি সাহসী হয়েছি। বৌ নিয়ে এক্ষুণি তোমার কাছে ছুটে যেতাম। কিন্তু শরীর তার ভাল নয় বাবা। যখন তখন হার্ট ফেল করতে পারে। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।"

ইতিমধ্যে ভুজংগ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

আরে দেখছ কি—জয়ন্ত বিয়ে করেছে। দাঁড়াও।

আবার পত্র পড়িতে লাগিলেন

"পাঁচশ টাকা টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে পত্র পেয়েই পাঠাবে বাবা। নতুবা অভাগিনীকে বাঁচানো যাবে না।" পড়ো—ভুজংগ, পড়ো। (পত্রখানি ভুজংগের হাতে দিলেন। ভুজংগ পড়িতে লাগিল। অন্য সকলেও উদগ্রীব হইয়া তাহা পড়িতে লাগিল।) একটা অসহায় পরিবারকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। জয়ন্ত আমার মুখ রেখেছে! পাঁচশটাকা এখনি টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে পাঠাতে হবে—না কি—আমি নিজে যাবো! কি করে যাই! এতগুলো রোগী! (ইতস্তত করিতে লাগিলেন) তোমরা ভাই—হাসপাতাল একটা দিন চালিয়ে নিতে পারবে না? একটা দিন—মাত্র একটা দিন। হাঁ—হাঁ—পারবে পারবে। আচ্ছা টাকাটা এখনি টেলিগ্রাম মণি অর্ডার করে পাঠিয়ে তাতেই লিখে দিচ্ছি—আমি কাল ভোরেই কলকাতা পৌঁছাচ্ছি। টেলিগ্রাম ফর্ম—টেলিগ্রাম ফর্ম—এই যে—

দীনদয়াল পরম ব্যস্তায় টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারের ফর্ম লিখিতে বসিলেন

(ক্রমশঃ)

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এ দুটি নয়ন তুলে কভু দেখি নাই
অনঙ্গের রাগরঙ্গ অপাঙ্গে তোমার!
তব দেহযমুনার যৌবন-জোয়ার
তুলি' শুধু ক্ষণিকের আকুল হিল্লোল
রেখে গেছে একখানি ক্ষীণ রেখা শুধু
আমার এ জীবনের বেলা-বালুকায়
কবে নাহি জানি! দুগ্ধশ্বেত মুক্তাফল
তব বক্ষশুক্তিপুটে হ'য়েছে সঞ্চার
কোন্ স্বাতী নক্ষত্রের সলিল সম্পাতে
অলক্ষ্যে কখন্! ওগো অনাঘ্রাত ফুল,
নির্ম্মম নখরাঘাতে ছিন্ন করি নাই,—
পবিত্র পূজার থালে রেখেছি তোমায়
রাত্রিদিন। এ জীবনে তুমি থাকো তাই,
দূর হ'তে দেখি আমি মাধুরী তোমার!

সাঁচীর তৃতীয় স্তূপের দ্বার
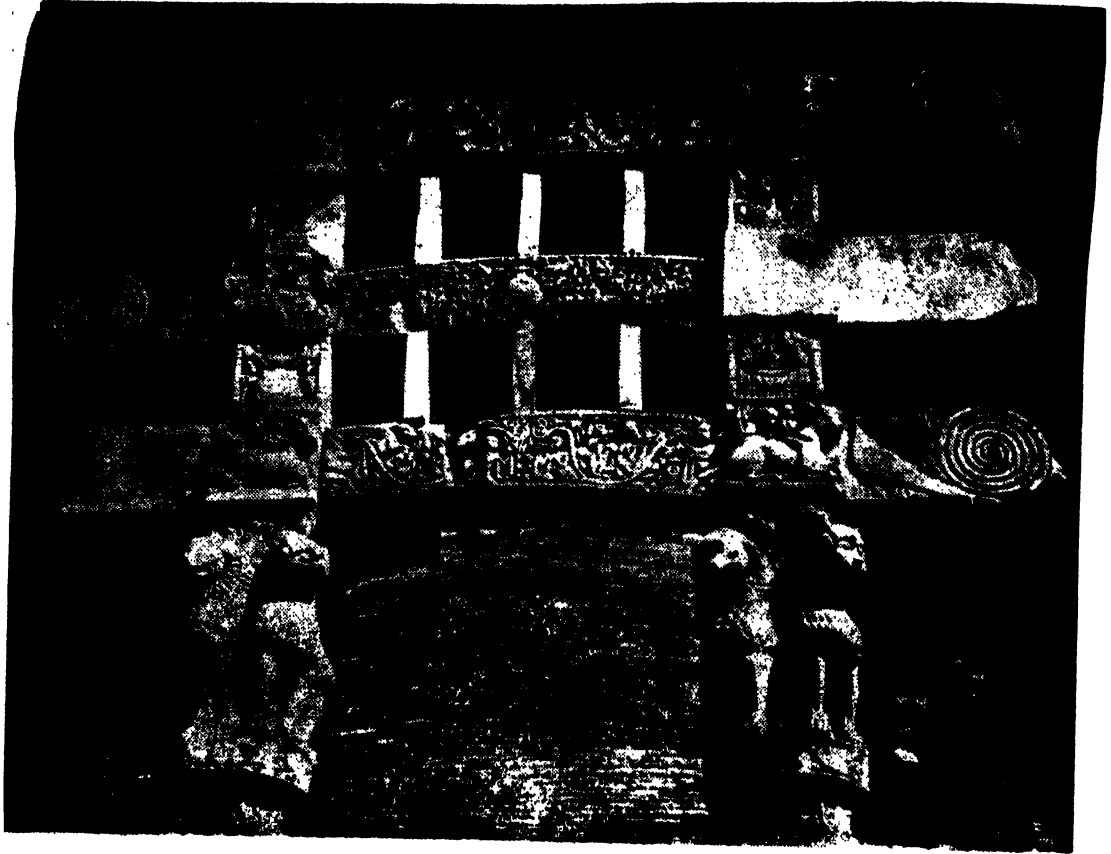
বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লায়নের পূতাস্থি ১৮৫১ সনে জেনারেল কানিংহাম কর্তৃক সাঁচীর এই তৃতীয় স্তূপে আবিষ্কৃত হয়। ভারতের ক্ষীয়মান বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে এই স্তূপটিই সর্ব্বাধিক মনোরম।

পূতাস্থির আধারটি পাঁচ ফুটেরও অধিক দেখা প্রস্তর খণ্ডের নীচে প্রথিত ছিল। উহাতে পাথরের দুইটি বাক্সে পূতাস্থি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দুইটি বাক্সের ঢাকনীই ছয় ইঞ্চি পুরু। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বাক্সটার উপরে ব্রাহ্মী হরফে "সারিপুত্তস্ঞ" অর্থাৎ সারিপুত্তের এবং উত্তর পার্শ্বস্থ বাক্সটার উপরে "মহামোগ্‌গল্লায়নস্ঞ" অর্থাৎ মহামোগ্‌গল্লায়নের এই কথা দুইটি লিখিত ছিল। বাক্স দুইটি বর্ত্তমানে সাঁচী যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সাঁচীর তৃতীয় স্তূপ ব্যতীত অন্যত্রও সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লায়নের পূতাস্থির অবস্থিতির উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধ চীনা পর্য্যটক ফা হিয়েন ও হুয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মথুরায় বুদ্ধদেবের এই দুইজন প্রধান শিষ্যের স্মৃতি-স্তূপের উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার সন্ধান কেহই দিতে পারে না। অপর দিকে, সাঁচী স্তূপের মাত্র সাড়ে ছয় মাইল পশ্চিমে সাতধারা নামক স্থানে জেনারেল কানিংহাম অপর একটি ছোট স্তূপেও ঐ দুইজন মহাপুরুষের ভস্মাবশেষের সন্ধান পাইয়াছেন।

সাঁচী অতীতে কোকনদবন্তী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্ব মালায়ার অন্তর্বর্ত্তী এই স্থানটির পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুঙ্গ সাম্রাজ্যের রাজধানী ও বেত্রবতী নদীর তীরবর্ত্তী সুপ্রাচীন রাজধানী বিদিশা নগরীর অনতিদূরে এই স্থানটি অবস্থিত।

অশোকের রাজত্বের পরে সাঁচী বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়। সামুদ্রিক বন্দর ভারুকচ্ছ, উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বির যাত্রা পথে অবস্থিত বলিয়া সাঁচীতে রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মপ্রচারকদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে সেখানে সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্মৃতিস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। শুঙ্গ বংশের রাজত্বকালেই এই স্মৃতি পূজার সর্ব্বাধিক প্রচলন হয়।

তমলুকে নব-আবিষ্কৃত একটি গ্রীক

অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ

বাঙলার আন্তর্জাতিক বন্দর তাম্রলিপ্ত। এককালে এই নগরী ছিল সমগ্র এশিয়ার এক বিরাট সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক ... অন্যূন খৃষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ... গুরুত্ব ছিল অক্ষুণ্ণ। তাম্রলিপ্তের বিপুল খ্যাতির কথা আমরা ...তে পারি প্রাচীন গ্রীক, রোমান, চৈনিক এবং সিংহলদেশীয় সাহিত্য... থেকে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও অনুশাসনে এই বন্দরের ... যথেষ্টই আছে।

...ন তাম্রলিপ্ত আজ বিলুপ্ত। তবে নানা কারণে প্রমাণিত ... যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকের ভূমিগর্ভে সমাধিস্থ ...য় আছে এই প্রাচীন মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ। গত এক বৎসরের ... প্রচেষ্টায় আমি তমলুক অঞ্চলে বহু মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কার ...তে সক্ষম হ'য়েছি। এইগুলির অধিকাংশই পোড়ামাটির মূর্ত্তি এবং পাত্র।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এইরকম একটি অতিশয় মূল্যবান ...ড়ামাটির মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করব। এই শিল্প-নিদর্শনটি ...সংশয়ে প্রাচীন বাঙলার বিস্মৃত ইতিহাসে যথেষ্ট আলোক-সম্পাত ...বে।

উল্লিখিত মূর্ত্তিটি একটি পুরুষের। এর নাভিমণ্ডল থেকে নিম্ন অংশ ...ঙা। কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত অনেকটা অটুট আছে। ...র দৈর্ঘ্য ২½ ইঞ্চি। রঙ মেটে লাল। উপরিভাগ মসৃণ প্রলেপ-...lip) যুক্ত।

মনুষ্যটির হস্তদ্বয় বক্ষনিম্নে স্থাপিত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিক্ষেপ করলে হাতের ...লগুলি নজরে পড়ে। কণ্ঠনিম্নে পোষাকের অর্দ্ধবৃত্তাকার সীমারেখা ...ষ্ট। মূর্ত্তির মুখটি কোমল ও স্নিগ্ধ ভাবাবেগে উদ্ভাসিত। নাকের ...ভাগ কিছুটা ভাঙ্গা। কেশরাশি প্রাচীন হেলেনীয় ভঙ্গিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...কলকের ন্যায় কপালের উপর স্থাপিত। মূর্ত্তিটি নিঃসংশয়ে বৈদেশিক। ...ঙ্গকগত বিচারে ব্যক্তিটিকে গ্রীক বলেই মনে হয় এবং কোন ...বানের প্রতিমূর্ত্তি হওয়াও বোধহয় অসম্ভব নয়।

এখন, এই শিল্প-নিদর্শনটির যুগ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। ভারতে ...ক শিল্প-রীতি ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে প্রবেশ করে খৃষ্টীয় প্রথম ...ব্দী থেকে। আমরা জানি, কুষাণ সম্রাটগণের রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ...—২য় শতাব্দী) † এইভাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে গান্ধার শিল্প অথবা হেলেনীয়-বৌদ্ধ কলার উদ্ভব হয়। এই কলায় ভারতীয় এবং গ্রীক সৌন্দর্য্যবোধের সুচারু মিশ্রণ ঘটে।

ভারতে গ্রীক শিল্পধারা পর্য্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যে তমলুকে প্রাপ্ত গ্রীক মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর। এতদ্ভিন্ন এই যুগে মূর্ত্তিটিকে নির্দ্ধারিত করবার আর একটি বিশেষ
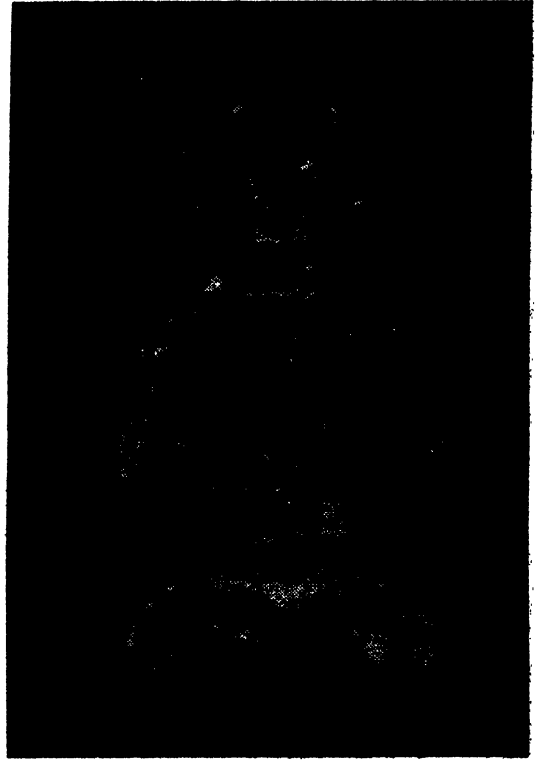
নব-আবিষ্কৃত গ্রীক মূর্ত্তি

(আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর)—তমলুক

কারণ আছে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান সাহিত্যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে।

প্লিনি (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) ও টলেমীর (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন হেলেনীয় সামুদ্রিক বিবরণী "Periplus of the Erythrian Sea" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে

---

* এই প্রত্নবস্তুসমূহের অধিকাংশই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ...তোষ চিত্রশালায় রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

† কুষাণগণ ইউ-চি (Yue-Chi) জাতির একটি শাখা। ইউ-...মূল জাতিতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। শেষ উল্লেখ-যোগ্য কুষাণ সম্রাট বাসুদেবের (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) মৃত্যুর পর তারা যথেষ্ট হীনবল হ'য়ে পড়ে।

গ্রীক বণিকগণ বাঙলাদেশে গাঙ্গে (Gange) নামক এক বিরাট বন্দরে বাণিজ্যার্থে আগমন করতেন। নানা কারণে মনে হয় যে, সম্ভবতঃ, পেরিপ্লাসের রচয়িতা (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) গাঙ্গে নামে তাম্রলিপ্তকেই অভিহিত করেছেন। এতদ্‌ব্যতীত, কবি ভার্জ্জিল, ভ্যালেরিয়াস্ ফ্লাক্কাস্ এবং কার্শিয়াস্‌এর রচনায় বাঙলার উল্লেখ আছে।

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান বৃত্তান্তসমূহ পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় যে খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে বাঙলার সঙ্গে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল-সমূহের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যগত এবং সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ছিল। সুতরাং আমাদের নব-আবিষ্কৃত পোড়ামাটির মূর্ত্তিকে এই যুগে নির্দ্দেশ করাই বোধহয় সমীচীন।

প্লিনি, টলেমী এবং 'পেরিপ্লাসে'র লেখকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যে, অতীতকালে গ্রীক এবং রোমান নাবিকগণ দূর-প্রাচ্যে বাণিজ্য করতে যাত্রা করবার পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত বন্দরে কিছুকাল রশদ সংগ্রহের জন্য অবস্থান করতেন। এইখানকার বাঙালী নাবিক এবং ভৌগলিক-গণের নিকট থেকেই তারা সংগ্রহ করতেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। তাম্রলিপ্তের উল্লিখিত মূর্ত্তিটি ভিন্ন আমি আরও কয়েকটি অতি মূল্যবান বৈদেশিক শিল্প-নিদর্শন তমলুক অঞ্চলে আবিষ্কার করতে সক্ষম হ'য়েছি। এইগুলি মিশরীয়, রোমক এবং হেলেনীয় মূর্ত্তি। দুইটি লম্বাধরণের কালোরঙের মৃৎপাত্র সুপ্রাচীন রোমান এ্যাম্ফো (Amphora) কলসের প্রায় অনুরূপ।* এই প্রত্নবস্তুসমূহ স গভীর কূপ, খাল এবং পুষ্করিণী খননের ফলে উঠেছে। ভবিষ্যতে তাদে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করবার আকাঙ্ক্ষা রইল।

তাম্রলিপ্তে এতগুলি প্রাচীন বৈদেশিক মূর্ত্তি এই প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল এইগুলি যে কেবল বাঙলায় দূরবর্ত্তী দেশসমূহের নাবিক ও ভ্রমণকারী গণের উপস্থিতি প্রমাণ করে তা' নয়, এইগুলি অবলোকন করলে স্থি নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রাচীন যুগে দুঃসাহসী বাঙালী নাবিক আবিষ্কারকগণ সপ্তসাগরে নৌচালনা করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না তাম্রলিপ্তে এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে বাঙলার গৌরবম প্রাচীন ইতিহাসের কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হবে।

* ইং ১৯৪০ সালে গুরুসদয় দত্তের (I. C. S.) চেষ্টায় প্রত্নতা স্বর্গ শ্রীরামচন্দ্র তমলুকে কতকগুলি মৃৎপাত্র আবিষ্কার করেন। এইগুলি প্রাচীন মিশর, গ্রীস এবং ক্রীটদ্বীপের (ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত) মৃৎ পাত্রের অনুরূপ।

ছায়াপথ

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন দেখেছি আমি
আকাশের ঘন কালো বুকখানি চিরে
নিবিড় তিমির রাতে নীলাম্বর প'রে
ঝিকিমিকি তারকার ছায়াপথ ধ'রে,
স্বপনপরী সে এল স্বপনের রথে
নীলিমার ছায়া পথে পথে।
তারার মুকুটে সাজি তারা টিপ এঁকে
দুটি চোখে মায়াঞ্জন মেখে
তারকার মালাখানি দুলায়েছে বুকে।
সাথে লয়ে এল মোর মানস পরীরে
এল মনোরথে
ভুলে যাওয়া স্মৃতি পথে পথে।
জীবনের গোধূলি বেলায় মনে পড়ে আজ
কত হাসি, কত ব্যথা, সুখ-পরিহাস,
পিছনেতে ফেলে রেখে এসেছি এগিয়ে
ফিরে আর চাইনি হেলায়;

একে একে স্মৃতি-পটে দেখা দিল আসি
রিক্ত-প্রাণ ধূসর-সন্ধ্যায়
এ অমানিশায়।
তারার দীপের মত হাতে ল'য়ে স্নেহের বর্তিকা
বিস্মৃতির ছায়াপথ খানি,
ক'রে দিল আলোক-উজ্জ্বল;
সহসা লুকায়ে গেল তারা ওই মেঘের আড়ালে,
আঁধারে ঢাকিয়া দিল আসি,
স্মরণের স্বর্ণ-পত্র-রাশি,
বারে বারে করাঘাত হানি আমি বৃথা
অন্তরের রুদ্ধ দুয়ারে,
অতীতের স্মৃতি-পথ-পারে।
নক্ষত্রের ছায়াপথও মিলালো যে হায়,
পুঞ্জীভূত কালো-মেঘমালা,
নিবালো নিমিষে
মণি-দীপ-জ্বালা !!

(পূর্বানুবৃত্তি)

গুণপতির সহিত চার্বাক পদব্রজেই পথ অতিবাহিত করিতেছিল। শকটের শ্রেণী আগাইয়া গিয়াছিল। গুণপতির গাড়ীটি কেবল দেখা যাইতেছিল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে গাড়ীতে চড়িবেন এই অভিপ্রায়ে গুণপতি গাড়ীটিকে বেশী আগাইয়া যাইতে দেন নাই। চার্বাক যখন তাঁহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা পরামর্শ করতে চাই—" তখন তাঁহাকে বলিতে হইল--

"তাহলে হেঁটেই যাই চলুন কিছুদূর। আমার বিদ্যাধর গাড়োয়ান অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক, তবু কাজ কি, জ্যোৎস্নায় হাঁটতে ভালও লাগবে"

ঠিক কিভাবে প্রসঙ্গটার অবতারণা করিবে চার্বাক ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর গুণপতি বলিলেন, "কি ব্যাপারটা কি"

"ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে যে আপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে হয় তো অদ্ভুত ঠেকবে"

"আরম্ভই করুন না শোনা যাক। আমার বিদ্যের দৌড় অবশ্য বেশীদূর নয়, আপনাদের মতো পণ্ডিতদের কথাবার্তা আমার না বুঝতে পারারই কথা, তবু চেষ্টা করি, বলুন আপনি"

চার্বাক কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন, আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মাত্র আছে। ওই আমার যথাসর্বস্ব, কিন্তু তা-ও আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব—বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটি উপকার করেন"

"দেখুন মহর্ষি, আমি ব্যবসায়ী লোক, আপনাদের তুলনায় মূর্খ লোকও বটে, কিন্তু উপকার আমি বিক্রয় করি না। যদি আপনার মতো একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের উপকারে লাগতে পারি তাহলে আমি নিজেকে ধন্যই মনে করব। ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না"

"আমি সুন্দরানন্দের যজ্ঞস্থলে যেতে চাই

"যাবেন কি করে'! সুমন্ত্রের মুখে তো শুনলেন যে অনিমন্ত্রিত কোন লোককে সেখানে যেতে দেবে না। তবে শ্রেণীতে যদি কুলিশপাণির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তিনি আপনাকে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে"

"আমার নেই। কুলিশপাণির আদেশেই আমাকে কিছুদিন পূর্বে সুন্দরানন্দের রাজত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল"

"বলেন কি!"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"একথা তো অনেকেই জানে, আপনার জানার কথা"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করবার অর্থ কি তাও তো বুঝতে পারছি না"

"কারণ আমি জ্ঞান-মার্গের পথিক, ওঁরা অন্ধ বিশ্বাসী"

"বটে!"

উভয়ে আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে গুণপতি বলিলেন, "ওঁদের সঙ্গে যখন আপনার মতেরই মিল নেই, তখন ওঁদের যজ্ঞস্থলে যেতেই বা চাইছেন কেন?"

"যে মানুষটিকে ওঁরা যজ্ঞের নামে খুন করতে চাইছেন তাকে বাচাতে চাই"

"বাঁচাতে চান? বলেন কি!"

গুণপতি সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চার্বাকের দিকে চাহিয়া রহিলেন

"পারবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই পারব"

"কি করতে হবে বলুন"

"আপনার ঘিয়ের জালাগুলি বেশ বড় বড়। আমি অনায়াসেই একটির মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে পারি"

"একটা জালার ঘি তাহলে ফেলে দিতে বলছেন ?"

"ফেলে দেবার দরকার কি। কাল ভোরে নূতন একটা জালা কোথাও থেকে কিনুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি এবং আপনি তার বাইরে ঘি মাখিয়ে সেটাকে ঘি বলে' চালান করে' দিন। জালা কি পাওয়া যাবে না ?"

"পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায়"

"পয়সা দিতে তো আমি প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবস্থা করে' দিন"

"ব্যাপারটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। ভেবে দেখুন"

"একটা জঘন্য নরহত্যা নিবারণ করবার জন্যে আমি যে কোনও বিপদকে বরণ করতে রাজি আছি"

গুণপতি মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি তো আছেন, কিন্তু বিপদ যদি হয় তাহলে আমিও যে জড়িয়ে পড়ব। আমরা ছাপোষা লোক, ব্যাপারটা ভাল করে' ভেবে দেখুন মহর্ষি"

"আপনার গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে সে ব্যবস্থা আমি করব"

"কি করে ?"

"আমি যদি ধরা পড়ি তাহলে আপনার নাম করব না। বলব যে গুণপতি যখন নিদ্রিত ছিল তখন আমি একটি ঘিয়ের জালা সরিয়ে তার স্থানে একটি খালি জালা রেখেছিলাম এবং সেই জালার ভিতর ঢুকে বসেছিলাম। এর জন্য গুণপতি একেবারেই দায়ী নয়"

"এত বড় মিথ্যাভাষণটা আপনি করবেন ?

"করব। মিথ্যাভাষণ করে' যদি একটা নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচান যায় তাহলে তা করতে আমার আপত্তি নেই। স্বার্থের জন্য মিথ্যাভাষণকে আপনি নিন্দা করতে পারেন কিন্তু পরার্থে মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় নয়"

"আমি মূর্খ মানুষ স্বার্থটাই বুঝি। আমাকে যদি এতে জড়িয়ে না ফেলেন তাহলে আপনার আদেশ পালন করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।. বলব ?"

"বলুন"

মানলাম, কিন্তু আপনার কথা মানা তো কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা। আমরা যে ষড়যন্ত্র করে' এ কাণ্ড করতে পারি তা কল্পনা করা কুলিশপাণির পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। লোকটা দেখতে একটু হোঁৎকাগোছের, কিন্তু অবসর পেলেই কবিতা লেখে শুনেছি।..."

"মিথ্যাটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে"

"কি করে' হবে সেটা"

"ভেবে দেখি একটু"

"ভাল করে' ভাবুন। জীবন-মরণ সমস্যা তো"

চার্ব্বাক কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে গুণপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি যদি ভয় পান, তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব না আর। সত্যই এটা জীবনমরণ সমস্যা। আমার এই প্রচেষ্টায় যদি আপনার অন্তরের সায় না থাকে তাহলে আপনাকে এতে জড়াতেই চাই না। যজ্ঞের নামে দেশ জুড়ে এই যে অনাচার চলেছে—আমি বরাবর তার প্রতিবাদ করেছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে করব। আমার এই কাজে যদি আপনার আন্তরিক সমর্থন থাকে আসুন আমাকে সাহায্য করুন, যদি না থাকে আপনাকে জোর করব না। আমি নিজেই যেমন ক'রে' পারি সেখানে গিয়ে হাজির হব"

এই কথায় গুণপতি এক মুখ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখুন মহর্ষি, আমি ভীতু মানুষ। আমার অন্তরের কথাও আমি নিজে জানি না ঠিক। সত্যি বলছি, মাত্র দুটি জিনিসই আমাকে চালিত করেছে সারাজীবন। স্বার্থ আর ভয়। আপনি একজন তপস্বী লোক, আপনাকে চটাতেও ভরসা পাচ্ছি না। ভাবছি কি জানি মহর্ষির অন্তরে কষ্ট দিলে যদি কিছু অনিষ্ট হয়ে যায় শেষকালে। ব্রহ্মশাপে অনেক কিছু হতে পারে—"

"আমি আপনাকে শাপ দেব না, আর দিলেও যে তা ফলবে এ বিশ্বাস আমার নেই"

"আমার আছে। আমি ছাপোষা লোক পারতপক্ষে ব্রাহ্মণকে চটাতে চাই না। আপনি যদি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর চার্ব্বাক বলিল, "আপনার শব্দ-

"খুব"

"আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করে' দেবে না তো ?"

"না। প্রাণ গেলেও না। ওর সমস্ত পরিবারকে আমি পালন করি, আমার বিপদে ওরও বিপদ যে"

"বেশ, তাহলে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে শুনুন"

"কি বলুন"

"আপনি আপনার প্রধান শকটচালক সুমন্থকে গিয়ে বলুন যে আপনি আরও জালা কিনে আরও ঘি কেনবার জন্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাচ্ছেন বিদ্যাধরকে নিয়ে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়ে আপনি প্রকাণ্ড একটি জালা কিনে তার বাইরেটা ঘৃত সিক্ত করে' ফেলুন, আমি তার ভিতর ঢুকে বসে থাকি। তারপর আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করে' শুয়ে পড়ুন। বিদ্যাধর আপনার অজ্ঞান দেহটাকে গাড়িতে তুলে ছুটতে ছুটতে এসে বাকী সকলকে খবর দিক যে আমি আপনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে' টুঁটি টিপে হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে সফলকাম হই নি—ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছি। তারপর আপনার জ্ঞান ফিরে আসুক। আপনি আমাকে নিয়ে শ্রোণী গ্রামে পৌছে দিয়ে আসুন। তারপর আমি নিজের পথ নিজে ঠিক করে নেব"

গুণপতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চার্ব্বাকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাথা বটে আপনার। তাহলে তাই করি চলুন। কিছু অর্থ তাহলে দিন আমাকে। ঘি কিনতে হবে, জালা কিনতে হবে, বিদ্যাধরকেও দিতে হবে কিছু। বিদ্যাধর এমনি খুব বিশ্বাসী, তার ওপর কিছু পুরস্কার দিলে, বুঝলেন না"

চার্ব্বাক স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া দিল।

শিংশপা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক বিরাট সরোবরে নীল হংস-মিথুন ভাসিতেছিল। পাশাপাশি ভাসিতেছিল কেবল—এই ভাসাটাকেই তাহারা একাগ্র হইয়া উপভোগ করিতেছিল যেন। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত—শিংশপা বৃক্ষের শাখায় আত্মগোপন করিয়া একটি পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া ডাকিতেছিল। তাহার সহিত অদৃশ্য সেতারী এবং গায়ক এই জ্যোৎস্নালোকে হইয়া উঠিয়াছে।

পিতামহ কথা কহিলেন।

"বাণী, মনে হচ্ছে ভাগ্যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলু[illegible] তাইতো এত আনন্দ পেলাম। ভৃগুটা আমাকে দাম্ভি[illegible] বলে' উপহাস করেছিল, সে বুঝতে পারেনি আমার[illegible] আমার আনন্দের প্রকাশকে আমার স্বতোৎসারি[illegible] উচ্ছ্বাসকে সে দম্ভ বলে' ভুল করেছিল। করবেই তো, [illegible] বড় তপস্বীই হোক, মানুষ তো—"

"চুপ করুন"

"ও, আচ্ছা"

আবার উভয়ে নীরবে ভাসিতে লাগিলেন।

"একঘেয়ে ভাসতে কিন্তু আর ভাল লাগছে না বা[illegible] এই বাধাহীন স্বাধীনতায় জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেল[illegible] যেন। বন্দী সিংহটাকে আমার হিংসে হচ্ছে—"

বাণীর দৃষ্টিতে চাপা হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"শিখর সেনের গল্পটা বন্ধ থাক তাহলে"

"চল একটু মুখ বদলে আসা যাক। অনেকক্ষণ [illegible] হয়ে আছি"

"ক্রমাগত তো মুখ বদলাচ্ছেন"

"তুমি আমার কল্পনার ভাষা, তুমিও বুঝতে পারছ কেন বদলাচ্ছি! সৃষ্টি মানেই পরিবর্ত্তনের লীলা যে। [illegible] লীলার আবেগেই কয়লা হীরে হয়, গাছে ফুল ফোটে, শি[illegible] বড় হয়, বুড়োরা মরে। রূপ থেকে রূপান্তরই সৃষ্টি, চার[illegible] শিখর সেন। শিখর সেনের গল্প অনেকক্ষণ তৈরি [illegible] গেছে, যথাকালে সেটা তোমার কবির মনে সঞ্চারিত [illegible] যাবে। এখন বেচারাকে ঘুমুতে দাও না একটু, পাশে ঘরে ওর বউটা একা ছটফট করছে।"

"কুমার সুন্দরানন্দ যে সিংহটাকে বন্দী করে রেখে[illegible] আপনি ঠিক সেই রকম সিংহ হতে চান"

"হ্যাঁ। তোমাকে হতে হবে সেই সিংহের খাঁচা! নি[illegible] কারাগার হয়ে আমাকে বন্দী কর তুমি, আর আমি গু[illegible] করব তার মধ্যে বসে। চমৎকার হবে! চল—"

"চলুন"

জ্যোৎস্নালোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া হংসমিথুন উ[illegible]

চকিত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল দুর্দ্দান্ত এক সিংহ। পশু-পক্ষীরা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা জানিতে পারিল না যে এ সিংহ বাণী-কারাগারে বন্দী, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে এ গর্জ্জন সিংহের গর্জ্জন নয়, আনন্দিত শ্রদ্ধার অট্টহাস্য।

শ্রোণী গ্রামে যথাসময়ে গুণপতির শকটশ্রেণী উপস্থিত হইল। স্বয়ং কুলিশপাণিই ঘৃত-কুম্ভগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। জালার ভিতর বসিয়া চার্ব্বাক অনুমান করিতেছিল যে অনেক অশ্বারোহীও বোধহয় সঙ্গে আসিয়াছে। কারণ অশ্বের হ্রেষা এবং ক্ষুর-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইতেছিল। অনেকগুলি ঘণ্টার শব্দও পাওয়া যাইতেছিল। চার্ব্বাকের মনে হইল ওগুলি সম্ভবত গরুর গলার ঘণ্টা। কুলিশপাণি ঘৃত-কুম্ভগুলিকে লইবার জন্য বোধহয় নূতন শকট আনিয়াছেন। সহসা চার্ব্বাক শুনিতে পাইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতি কথা বলিতেছেন। সে যে জালাটির ভিতর বসিয়া আছে ঠিক তাহার পাশে দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন। কথা-বার্ত্তার ধরণে মনে হইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতির হৃদ্যতা আছে। থাকিবারই কথা, গুণপতির মতো উৎকৃষ্ট ঘৃতসরবরাহকারী ও অঞ্চলে আর নাই। ও প্রদেশের সমস্ত যজ্ঞের আজ্য গুণপতিই সরবরাহ করেন। চার্ব্বাকের মনে হইল হয় তো তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই গুণপতি কুলিশপাণিকে এই জালাটির নিকট আনিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। চার্ব্বাক রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। গুণপতি কহিলেন—"আর্য্য, কুমার সুন্দরানন্দ আরও তো অনেকবার যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু এমন গোপনতার আশ্রয় নিতে তাঁকে তো ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। সত্যি বলছি ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড়ই কৌতূহলী হয়েছি"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই এ যজ্ঞ একটু অসাধারণ যজ্ঞ হ'চ্ছে। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হলে' দুর্ব্বল-চিত্ত লোকেদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, তাই কুমার এটার অনুষ্ঠান লোক-চক্ষুর বাইরে করছেন"

গুণপতির কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না।

"অসাধারণ যজ্ঞ মানে?"

"এতে নরবলি হবে। ঠিক নর নয়, নারী"

"বলেন কি!"

"নারীটির নাম শুনলে আপনি আরও চমকে যাবেন"

"কি রকম?"

"নারীটি অপর কেউ নয়, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা নর্ত্তকী সুরঙ্গমা"

জালার মধ্যে চার্ব্বাক শিহরিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

উপলব্ধি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী

একলা ঘরে আপন মনে নিজের কথা ভাবিতে বসি যেই—
অমনি দেখি, কই সে আমি, আমার মাঝে আমিই শুধু নেই।

ভবের হাটে নিঃস্ব মোরে সবার মাঝে হারিয়ে ফেলি যেই,
মিলিত সুরে মিশিয়া যায়, শোনা না যায়
ক্ষীণ বাঁশীটি এই।

এই তো সবে প্রভাত হল,
নিশি স্বপন এখনো লেগে চোখে,
প্রিয়ার বাহু-লতার মালা এখনো যেন জড়িয়ে আছে বুকে।
ধনে ও জনে পূর্ণ-ধরা মুঠির মাঝে ধরিতে চাহি যেই
অমনি দেখি আছিই আছি, আমার যারা
তাহারা কেউ নেই।

বিন্দু আর সিন্ধু মাঝে, পায় যে রূপ একটি শুধু কায়া—
ধন্য হয় এ পরমাণু বিশাল বুকে হৃদয় টুকু দিয়া।
ভীরু আশায় এ অনুরাগ
মনের কোণে জনম লভে যেই,
অমনি দেখি, এই তো আমি, সবার মাঝে আমার সীমা নেই

পূর্ব্ব-পাকিস্তান ও ভারত—

পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদিগের সমস্যার কোনরূপ সন্তোষজনক সমাধান যে হইতেছে না, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমান ভারত সরকার বিদেশী সরকার নহেন। সুতরাং এ বিষয়ে লোকমত যে সরকারের কার্য্যের ও সরকার-পরিচালকদিগের মনোভাবের সমর্থন করিতে পারিতেছে না, ইহা লোকের পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে। বিশেষ ইহার জন্য যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রধানতঃ দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি বক্তৃতাপ্রিয় এবং কেহ যদি "inebriated with the exuberance of his own verbosity" হয়, তাহা হইলে যাহা ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যেভাবে অপরের মত অবজ্ঞা করেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জননেতার দায়িত্ব উপেক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গসমস্যা সম্বন্ধে তিনি পরমতের সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি করেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে "Petulance is not sarcasm and insolence is not invective." সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ও অন্যত্র তাহার বক্তৃতায় তিনি এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অপরের মতকে মর্য্যাদাদানে অসম্মত হইয়া তাহা "হাতুড়ের ঔষধ" বলিয়া অভিহিত করায়—একদিন গ্লাডষ্টোন যুষ্ট ডিশরেলীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে হয় :—

"Whatever he has learned—and he has learned much—he has not yet learned the limits of discretion, of moderation, and of forbearance, that ought to restrain the conduct and language of every member of this House, the disregard of which is an offence to the meanest amongst us, but it is of tenfold weight when committed by the leader of the House of Commons."

যখন দেশে একটি সম্ভ্রান্ত দল প্রস্তাব করেন—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক অবরোধ অবলম্বন করিয়া সমস্যার সমাধানচেষ্টা করা হউক, তখন তিনি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য এত তুচ্ছ যে তাহা অবজ্ঞা করা যায়! অথচ কয়লা ও লৌহ, কাপড় ও লবণের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান ভারত রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে এবং পূর্ব্ববঙ্গের পাট ভারত রাষ্ট্রের এত প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গে আশু ধান্যের অনেক জমীতে সরকারের চেষ্টায় পাটের চাষ করান হইতেছে। সে বাণিজ্য যদি তুচ্ছই হয়, তবে তাহা বন্ধ করিতে জওহরলালের আপত্তি কি? তিনি আবার বলিয়াছেন, অর্থনীতিক অবরোধে দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিতে পারে! যে কারণ তুচ্ছ তাহাতে পাকিস্তান যুদ্ধ করিবে কেন? এইরূপ যুক্তিতে মনে হয়, জওহরলাল যুক্তির দ্বারা কোন বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা ব্যবহার করিতে চাহেন না বা পারেন না এবং যুদ্ধের ভয় তাঁহাকে "পাইয়া বসিয়াছে।" অকারণে যুদ্ধ কোন মানুষ বা কোন রাষ্ট্র চাহে না। তাহা অসঙ্গত; কিন্তু যে অধিকার ন্যায়সঙ্গত তাহা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কি আত্মরক্ষারই নামান্তর নহে? পাকিস্তান হিন্দুদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহার প্রতিকার করা কি জওহরলাল প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন না? আশা করি, হিন্দু যদি বাঙ্গালী হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবেচনা তিনি প্রয়োজন মনে করেন না।

অল্পদিন পূর্ব্বে (২৩শে নভেম্বর) বহু রাজনীতিক দল একমত হইয়া "পাকিস্তান দিবস" উদযাপন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কম্যুনিষ্ট দল গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন সে যুদ্ধ "গণ যুদ্ধ"—এই মত প্রকাশ করিয়া ভারতে বৃটিশ সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন, এ বার তেমনই—পাকিস্তানী ব্যাপারে—কংগ্রেসের অর্থাৎ জওহরলালের মতেরই সমর্থন করিতেছেন! এই ক্ষয়বর্দ্ধমান দল "শুভেচ্ছা মিশন" পাঠাইয়া সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী। সে উদ্দেশ্য যে প্রশংসনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারা এত দিন সে উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফল দেখিবার কার্য্যে বিরত রহিয়াছেন কেন? যত দিন যাইতেছে ততই যে অবস্থা হইতেছে, তাহাকে বলিতে হয়—

"—Never can true reconciliation
grow,
Where wounds of deadly hate
have pierced so deep

হিন্দু বিতাড়নই যদি পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হয়, তবে কিরূপে তাহাদিগকে প্রীতিপরবশ করা সম্ভব হইতে পারে? জওহরলালের নির্দ্দেশে কংগ্রেস "পাকিস্তান দিবস" উদযাপনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু

কে সে দিবস উদ্‌যাপনের সাফল্য কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রাষ্ট্রের বহু স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে ইহা উদ্‌যাপিত করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ; কারণ, আজ রাষ্ট্র-সচিব সেই ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু—শিয়ালদহ রেল উদ্বাস্তুদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বাস্তুত্যাগি- পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সমস্যামাত্র নহে- ইহা সর্ব্বভারতীয় । পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান ছলে বলে —সর্ব্ববিধ উপায়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগকে বিতাড়িত চাহিতেছে। তাহার পরে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, ন্দুদিগকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তান অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারিবে।

এ সকল উক্তি উপেক্ষণীয় নহে। পাকিস্তান সমস্যা যে রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ, ভারত সরকারকে এক জন সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। আর কোন দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার জন্য যে মন্ত্রী আছেন, তা আমাদের জানা নাই। সুতরাং ভারত সরকার সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন না।

পূর্ব্ব পাকিস্তান যে হিন্দুর ধন প্রাণ মান—নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না বা করিতে পারিতেছে না, তাহা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে তাঁহারা কেন প্রতীকারবিমুখ হইবেন? ইহাই বিস্ময়কর। প্রতীকারের উপায় যদি হাতুড়ের ঔষধ" হয়, তবে জওহরলালের পঙ্গুজনোচিত ভাব কি কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না? তিনি কি মনে করেন, প্রতীকারের কোন উপায় নাই বা কোন উপায় অবলম্বন করা অসঙ্গত?

পাকিস্তান যে পুনঃ পুনঃ ভারতরাষ্ট্রে প্রবেশ ও ভারত রাষ্ট্রের অধিকৃত স্থান অধিকারের চেষ্টা করিতেছে, ভারত সরকারের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিতেছে, ভারতীয় প্রজাকে উৎপীড়িত করিতেছে। এ সকল ভারতবাসীরা ভারত রাষ্ট্রের সম্ভ্রমহানিকর বলিয়া বিবেচনা করে। জওহরলাল যদি সে মত ভিত্তিহীন মনে না করেন, তবে কি গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না? আমরা তাঁহাকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিব। মতার মোহমুক্ত হইলে তিনি এ বিষয় বুঝিতে পারিবেন- ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। ভারত রাষ্ট্রের সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই নহে— রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক সে দায়িত্ব অনুভব করে।

া—

যে সকল কৃষিজ পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারত রাষ্ট্র অর্থলাভ করে—চা সে সকলের অন্যতম এবং চা পাটেরই মত ব্যবসার বাজারে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব্বে চা চীনেই উৎপন্ন হইত। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাহা য়ুরোপে রপ্তানী করিবার একচেটিয়া অধিকার ছিল। চা'র চালান বোষ্টন বন্দরে জলে ফেলিয়া দিয়া আমেরিকানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাঠাইয়াছিলেন ; সেই জন্য অনেকের বিশ্বাস—উহা ভারতীয় চা। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার শেষ হয়, তখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতে বড়লাট। তিনি ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান—তিনি শুনিয়াছিলেন, আসামে যে অংশ ব্রহ্ম-সংলগ্ন তাহাতে চা গাছ আছে। তিনি ভারতে চা উৎপন্ন করা যায় কি না, অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করেন এবং অনুসন্ধানফল আশাপ্রদ হইলে ভারতে চা'র চাষের ব্যবস্থা করেন ; প্রথমে চীন হইতে চারা আনিয়া চাষের যে চেষ্টা হয়, তাহা ব্যর্থ হয়। কিন্তু দেশীয় চা'র চাষের ফল ভাল হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারত হইতে ইংলণ্ডে চা প্রেরিত হয়। তাহার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে চা-পান প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এ দেশের ইংরেজ সরকার আসাম কোম্পানীকে চা চাষের ভার দেন। তখন ইংলণ্ডে চা'র মূল্য অত্যধিক (অর্দ্ধ সেরের মূল্য ৬০ টাকা) হওয়ায় চা'য় ভেজাল আরম্ভ হয়।

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চা'র চাষও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে চা-পানাসক্ত করিবার অভিপ্রায়ে "পয়সা প্যাকেট" প্রভৃতির প্রচলনে শিল্পকে সাহায্য করেন।

যদিও বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানীরা চা বাগান করিবার জন্য উৎকৃষ্ট জমী অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি দেশীয়গণও চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশে ও এ দেশে চা'র চাহিদা-বৃদ্ধিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। শাখা হইতে প্রথম তিনটি পাতা বা কুঁড়ি ও দুইটি পাতা সংগ্রহ না করিয়া কুঁড়ি ও ছয়টি পাতা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হইতে থাকে। তাহাতে চা'র উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ করিয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ায় চাহিদা হ্রাস হইলেও পূর্ব্ববৎ উৎপাদন করিবার জন্য উৎপাদন হ্রাস করা হয় নাই। কাজেই বাজারে মাল চাহিদার তুলনায় অধিক হইয়াছে। সেই কারণে চা'র মূল্য হ্রাস অনিবার্য্য। আবার যুদ্ধের পরে যখন প্রস্তাব হয়, কলিকাতাতেই চা নিলাম হইবে—লণ্ডনে নহে, তখন কতকগুলি ব্যবসায়ীর অবিমৃষ্যকারিতায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এখন লণ্ডনে নিলাম হওয়ায় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা "আপন কোটে" পাইয়া চা'র মূল্য কমাইয়া দিতেছে। এই দুই কারণেই যে কেবল চা'র মূল্য "পড়িয়াছে" তাহা নহে। ভারত সরকার চা'র উপর পরিমাণ করিয়া শুল্ক আদায় করেন এবং শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা যেমন করিয়াছেন, তেমনই তাহাদিগের জন্য বাগানের পক্ষ হইতে অধিক মূল্যে চাউল কিনিয়া তাহা অল্প মূল্যে দিতে হয়। আবার দেশ-বিভাগের পরে বাগানে কয়লা লইবার ব্যয়ও বাড়িয়াছে।

ফলে আজ চা-বাগানগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে এবং বাগানের পর বাগান বন্ধ হওয়ায় সহস্র সহস্র শ্রমিক নরনারী বেকার হইয়াছে ও হইতেছে।

দেশীয়দিগের বাগানগুলির অধিকাংশ অধিক লাভের সময়—মজুদ তহবিল বর্দ্ধিত করা অপেক্ষা লাভ লইয়া যাইবার জন্যই অধিক

গ্রহণীল হইয়াছিল এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির মত তাহারা ব্যাঙ্ক তে ঋণও পায় না। তাহারাই অধিক বিপন্ন হইয়াছে।

এই বিপদে বাগানগুলি রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট বেদন হইয়াছে এবং ভারত সরকারও সাহায্য করিবার প্রয়োজন অনুভব তেছেন। কিন্তু বিপদ যে অনিবার্য তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করা ত ছিল। যুদ্ধের পরে যখন চাহিদা কমিয়া গেল, তখনই উৎপাদন-হ্রাসের ও বিদেশে চা'র প্রচলন বর্দ্ধিত করার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ছিল। রুশিয়া যে সময় ভারত হইতে চা অধিক লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন—কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার সহিত ব্যবসা-বিস্তারে ভারতের ইংরেজ সরকারের আগ্রহের অভাবই লক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভারত সরকারের রাষ্ট্রদূত ও ব্যবসাদূত আছেন। অথচ আমেরিকার মত বিশাল রাষ্ট্রে ভারতীয় চা'র প্রচলন বর্দ্ধিত করিবার জন্য আবশ্যক প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করাও হয় নাই। এমন কি পশ্চিমবঙ্গে কফির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য মাদ্রাজে কফি উৎপাদকরা যে চেষ্টা করিতেছেন, সে চেষ্টারও পরিচয় আমরা আমেরিকায় ভারতীয় চা'র ব্যবহার-বৃদ্ধির জন্য দেখিতে পাই নাই। এই ক্রটির সংশোধন ও উৎপাদকদিগকে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি।

এ দেশে খুচরা চা বিক্রয়কারীরা—অর্থাৎ যে সকল বিদেশী ও স্বদেশী কোম্পানী ভিন্ন ভিন্ন চা মিশাইয়া বিক্রয় করেন, তাহারা যদি লাভের মাত্রা হ্রাস করেন, তবে এ দেশেও চা'র প্রচলন বৃদ্ধি হইতে পারে। সেদিকে সরকার দৃষ্টি দিতে পারেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বিদেশী চা-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান চা-পাতার সঙ্গে ডালের কাঠি প্রভৃতি মিশাইয়া চা বলিয়া বিক্রয় করায় আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধিপরিবর্ত্তন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। তাহার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাইয়াছে। আজ যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা'র উৎপাদন-হ্রাসের জন্য উপদেশ দিতেছেন, তাহাতে সেই কথা মনে পড়ে—"গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল।" চা'র উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম উপায়—চা'র সঙ্গে কাঠি প্রভৃতি প্রদান অপরাধ ধার্য্য করা।

ব্যাঙ্কের মত চা-বাগানেরও উপযুক্তরূপ মজুদ টাকা লভ্যাংশ হইতে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কি না, তাহাও বিবেচ্য। সঙ্গে সঙ্গে চা'র নীলাম যাহাতে বিদেশে না হয়, তাহা বিবেচনা করাও প্রয়োজন। নহিলে সহজে চা-বাগানের বিপদের অবসান হইবে বলিয়া মনে হয় না! বিদেশে ভারতীয় চা'র প্রচলন বৃদ্ধির জন্য প্রচার-কার্য্যের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

চা'র চাহিদা হ্রাস হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের চাহিদা কমিবে এবং আর একটি শিল্পও নষ্ট হইবে।

আর যে স্থানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইবার সম্ভাবনা সে স্থানে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে অবস্থার জটিলতা-বৃদ্ধিই হইবে এবং—

"নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।"

সরকার ও চা-বাগানের প্রতিনিধিরা ও চা-ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে একযোগে চেষ্টা করিবেন—ইহাই অভিপ্রেত। কারণ, ভারতীয় চা যদি সিংহল, জাভা প্রভৃতির চা'র সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তবে ভারতের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহা অসাধারণ।

পশ্চিমবঙ্গে পাট-চাষ—

পাটকে অবিভক্ত বাঙ্গালার "সোণার আঁশ" বলা হইত। কারণ পাট ও পাটজাত চট ও থলিয়া প্রভৃতি রপ্তানী করিয়া বাঙ্গালা প্রভূত অর্থ পাইত। পাট প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে উৎপন্ন হইত বটে, কিন্তু পাট-কল সবই পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতার নিকটে গঙ্গার কূলে অবস্থিত। পাট পূর্ব্ববঙ্গ হইতে রেলে ও ষ্টীমারে কলিকাতায় আসিত—কতক কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত, কতক কলে পণ্যোপকরণরূপে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালা পূর্ব্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে (ভারত রাষ্ট্র) বিভক্ত হইবার পরে—পাটকলগুলিকে যাহাতে উপকরণের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে না হয়, সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গে—আশু ধান্যের জমীতে পাটের চাষ আরম্ভ করান হয়। ভারত সরকার সেই জন্য—ঐ জমীতে যে ধান উৎপন্ন হইবে, তাহা পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পাকিস্তান তথায় পাটকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াও নিরস্ত হয় নাই—এমন অভিযোগও উপস্থাপিত করিয়াছে যে, তাহার অনিষ্ট সাধন-জন্য ভারত রাষ্ট্র পাটচাষে উৎসাহ দিতেছে।

গত বৎসর পাটচাষে লাভ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা—সরকারের উৎসাহে অনেক জমীতে পাটচাষ করিয়াছে। এ বার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের পরিমাণের চতুর্গুণ। পাটচাষ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা স্বীকার্য্য—কারণ, আয়ার্লণ্ডে ফ্লাক্সের মত পাট জলে পচাইয়া আঁশ বাহির করিতে হয়—জল দুষ্ট হয়। তথাপি, অন্নসঙ্কটের সময়েও—সরকার আশু-ধান্যের চাষের জমীতে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ করাইতেছেন—অধিক লাভের প্রয়োজনে।

এ বার কিন্তু পাটের দাম এত অল্প হইয়াছে যে, প্রজারা হাহাকার করিতেছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদনই ইহার কারণ নহে। পাকিস্তানের প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ।

পাকিস্তান হইতে প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রভূত পরিমাণ পাট পশ্চিমবঙ্গে আমদানী হইয়াছে। চোরা-কারবারীরা গোপনে এত পাট—শুল্ক না দিয়া—রপ্তানী করিয়াছে যে, তাহাদিগের কাজ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তনের তাহাও অন্যতম কারণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

গোপনে যে পাট পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহার আগমন নিবারণের আবশ্যক ব্যবস্থা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবলম্বন করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। ইহার উপর আবার প্রকাশ্যে পাকিস্তান হইতে বহু পরিমাণ

পাট আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত পূর্ব্ব পাকিস্তানের চুক্তি—রেলের মালগাড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কয়লা প্রেরিত হইবে, আর সেই সব গাড়ীতে পাকিস্তান হইতে পাট আসিবে।

পশ্চিমবঙ্গে—ধানের জমীতে পাট চাষ করায়—যত পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, রপ্তানীর জন্য ও কলের জন্য আবশ্যক পাট হইতে তাহা বাদ দিয়া পাকিস্তান হইতে যদি কেবল অবশিষ্ট পাট আমদানী করা হইত, তবেই তাহা সঙ্গত হইত। কারণ, তাহাতে দুইটি কাজ হইত :—

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট বাজারে না আসায় পশ্চিমবঙ্গে পাটের দর ক্ষতিজনক হইতে পারিত না।

(২) পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতে ও পশ্চিমবঙ্গের চাষীদিগের ক্ষতি করিতে পারিত না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও ভারত সরকারের অবিমৃশ্যকারিতায় তাহা হয় নাই। সেই জন্য কলিকাতায় বেলগেছিয়ার পাটের আড়তদার সমিতি বলিয়াছেন—পাকিস্তানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহারা এ বিষয়ে সরকারের নিকট মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

বিষয়টি বিবেচনা করিয়া সরকার কি করিবেন, তাহা জানিবার জন্য দেশের লোকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক।

ব্যবসা যদি রাজনীতিক কারণে প্রভাবিত না হয়, তবে যে এক দেশের উপকরণে অন্য দেশের শিল্প সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। মিশর, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের তুলা উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ড তাহার সমৃদ্ধ বয়নশিল্প গঠিত করিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া নানা দেশকে পশমী কাপড়ের জন্য ভেড়ার লোম সরবরাহ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের পাটকল ভারতের পাট উপকরণরূপে ব্যবহার করে। সুতরাং বিশেষ কারণ না থাকিলে, ভারত রাষ্ট্রের পাটকলগুলি পাকিস্তানের পাটের উপর উপকরণ জন্য নির্ভর করিতে পারিত। কেন তাহা হইতেছে না, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভারত রাষ্ট্র পাকিস্তানের পাট সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিতে পারিতেছে না। সেজন্য কে দায়ী তাহাও আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ভারত সরকার ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেও পাট চাষের চেষ্টায় বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায় ও বিহারে পাটচাষ বৰ্দ্ধিত করিয়া পাটকলগুলিকে উপকরণ সম্বন্ধে নির্বিঘ্ন করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত হয়, তবে যাহাতে ভারত রাষ্ট্রের পাট পাকিস্তানের পাটের অসম প্রতিযোগিতায় ক্ষতির কারণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করাই ভারত সরকারের কর্তব্য। কৃষকের ক্ষতি করিয়া ও খাদ্যশস্যের অভাব ঘটাইয়া পাটকলগুলিকে লাভবান করা কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারত সরকার যদি এ বিষয়ে সচেতন না হ'ন, তবে যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য হইবে, তাহা অবাঞ্ছিত—আমরা আজ কেবল এই কথাই বলিব।

সুন্দরবনের সমস্যা—

সুন্দরবনের সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন, জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ ও গঙ্গার জল-নিয়ন্ত্রণ না হইলে সুন্দরবন সম্বন্ধে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা করা যায় না। অবশ্য গঙ্গার জল নিয়ন্ত্রিত হইলে সুন্দরবন-সমস্যা কতকটা আপনিই শেষ হইবে; কারণ, লোনা জলের স্থান মিঠা জল অধিকার করিবে। কিন্তু জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন সরকার কবে করিবেন? উড়িষ্যায়ও জমীদারী প্রথা বিলুপ্ত হইল। পশ্চিমবঙ্গে তাহার উচ্ছেদসাধন হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে তাহা হইবে কি? যদি বাঁধ রক্ষা করা জমীদারের দায়িত্ব হয়, তবে সে দায়িত্ব পালন না করায় কেন জমীদারের অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয় না?

এবার সুন্দরবনে—যথাকালে বাঁধ সংস্কার না করায়—বন্যায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কলিকাতার রাজপথে যে সকল ভিখারী নরনারী ও কঙ্কালসার শিশু দেখা যাইতেছে, তাহারা সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের হিসাবে দেখা গিয়াছে, গত এপ্রিল মাস হইতে কলিকাতায় নিঃস্ব ও যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুর সরকারী হিসাব এইরূপ :—

মাস	নিঃস্ব মৃত	যক্ষ্মায় মৃত
এপ্রিল	৩৩০	২২৯
মে	৩৫৬	২৩৬
জুন	৩০১	২৪৭
জুলাই	৩১২	২২০
আগষ্ট	৩৮৪	৩০২
সেপ্টেম্বর	৩৫৪	২২৭
অক্টোবর	৩৫২	২৩৫
নভেম্বর (অসমাপ্ত)	২৭৪	২৬০

গত এপ্রিল মাসের পূর্ব্ব হইতেই সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের লোক অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই যে কলিকাতার রাজপথে নিঃস্বগণ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী? ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের বাঁধ ভাঙ্গার পর হইতেই যাঁহারা সরকারকে সতর্ক হইতে বলিয়া আসিতেছেন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। কিন্তু আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই।

সচিব ডক্টর আমেদ—সংবাদপত্রে সংবাদ ও চিত্র প্রকাশের পরে সুন্দরবন পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি অবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করেন নাই, তবে সরকারী রীতিতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে ভারতসরকারের খাদ্য মন্ত্রী মিষ্টার কিদোয়াই সুন্দরবনে গিয়াছিলেন—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চল দেখিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও সুন্দরবনের কতকাংশ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব না কি ২৪ পরগণার দুর্গত অঞ্চলে

সাহায্যের জন্য এক পরিকল্পনা করিয়া তাহার জন্য কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সে পরিকল্পনা কি তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে ২৪ পরগণার দুর্গত অঞ্চল যে সুন্দরবন অঞ্চল তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয়, সেই পরিকল্পনার জন্যই—পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শদাতা শ্রীরামমূর্ত্তি, কেন্দ্রী জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য সর্দ্দার মান সিংহ ও পরিবাহন বিভাগের পরিকল্পনাকারী মিষ্টার শেনী কলিকাতায় আসিয়া সুন্দরবন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাভুক্ত করিতে বলিয়াছেন। সদস্যত্রয় নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় বিবেচনা করিবেন—

(১) পানীয়জল সরবরাহ

(২) নলকূপ বসান

(৩) রাস্তা ও খাল খনন।

সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের, পথ নির্ম্মাণের ও খাল খননের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু সে সকল অপেক্ষাও সুন্দরবন অঞ্চল লোনা জল হইতে রক্ষা করা অধিক প্রয়োজন। কতদিনে ফারাক্কায় বাঁধ নির্ম্মিত হইবে এবং কখন তাহা হইবে কি না, তাহা যখন বলা যায় না, তখন বাঁধ-সংস্কারে মনোযোগ দান প্রয়োজন।

আর প্রয়োজন—বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে অনশনে মরণাহত—সর্ব্বস্বান্ত অধিবাসীদিগকে রক্ষা করা। সে জন্য অবিলম্বে আবশ্যক সাহায্যদান-ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে সাহায্য প্রদান করা হইতেছে, তাহা যথেষ্ট নহে। তাহার প্রমাণ—কলিকাতার রাজপথে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগের সমাগম এবং কলিকাতায় বহু নিরন্নের মৃত্যু ও আরও অনেকের ক্ষয়রোগ।

মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে যে সাহায্য প্রদান করা হইতেছে, তাহা প্রশংসনীয়। পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ কি সেইরূপ সাহায্য লাভের আশাও করিতে পারে না?

সাহায্যদান কার্য্যে যদি সরকার কোন রাজনীতিক দলের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস করেন, তবে তাঁহারা অন্যায় করিবেন। সে জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাব্রত ব্যক্তিদিগকে ভার প্রদান করাই কর্ত্তব্য। নহিলে অর্থেরও অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা দূর হইবে না।

সুন্দরবন অঞ্চলে এ বার যে শস্যহানি হইয়াছে, তাহাতে লোককে কেবল কিছুদিন চাউল দিলেই হইবে না—বস্ত্র দিতে হইবে এবং গৃহ সংস্কারের জন্য যেমন, কৃষির জন্য যন্ত্র ও পশু ক্রয়ের জন্যও তেমনই অর্থ —ঋণ ও খয়রাতী দান হিসাবে দিতে হইবে। তাহা না হইলে পুনর্গঠনের কাজ হইবে না।

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোভাব—

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" চতুর্দ্দশ বার্ষিক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিদেশী লেখকগণ ও তাঁহাদিগের মতাবলম্বী ভারতীয়গণ মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয়গণ দর্শনে, সাহিত্যে ও শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেও তাঁহারা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুশীলন করেন নাই এবং পরিচয়ও দিতে পারেন নাই; বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তাঁহারা অন্য-দেশীয়দিগের নিকট ঋণী।

সে মত যে বিচারসহ নহে, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রযুক্ত করিয়া সেই উক্তি খণ্ডন করেন। চীনে ও কাম্বোডিয়ায় প্রাপ্ত প্রমাণও তিনি উপস্থাপিত করেন।

ইতঃপূর্ব্বে সুধী ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন য়ুরোপীয়দিগের মত খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন—স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে ভারতীয়গণ রোম্যান ও গ্রীকদিগের নিকট ঋণী নহে, রমেশচন্দ্র তেমনই প্রতিপন্ন করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাবে প্রাচীন ভারতীয়গণ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রীকদিগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল যে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার অবসর তিনি লাভ করেন নাই। আজ সেই গবেষণা সম্পূর্ণ করিবার প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। একটিমাত্র বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র কেবল তাহার সূত্রসন্ধান দিতে পারিয়াছেন। তিনি যদি এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে স্বাধীন ভারতের মনীষীদিগের মনোভাব বুঝাইবার ও তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের পরিচয় দেন, তবে তিনি সুধীসমাজের ধন্যবাদ ও ভারতীয়দিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। বিদেশীর বিজয়বাত্যায় ও বিজয়ীর প্লাবনে ভারতবর্ষে যদি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তবে যে নূতন অবস্থায় তাহা স্ফুরিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা বহু বৈজ্ঞানিকের কার্য্যে পাইয়াছি। সে কথা "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" প্রবেশ করিলেই মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে নূতন আশার উদয় হয়।

বিজ্ঞান মন্দিরের কার্য্য এখন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিৎ বিদ্যা।

শেষোক্ত গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে—তিল প্রভৃতি তৈলজ শস্যের বীজ বর্দ্ধিত ও পাটের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছে। সে কার্য্যে রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পদার্থবিদ্যা বিভাগে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে।

তিন বিভাগেই গবেষকরা ও ছাত্রগণ কাজ করিতেছেন। সরকারও মন্দিরের কার্য্যে অর্থ প্রদানের প্রয়োজন বুঝিয়াছেন।

সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, একটি বিদেশী পরিবারের এক জন মহিলা ও তাঁহার ভ্রাতা "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" গবেষণা পরিচালনার্থ প্রায় ৬৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইঁহারা যে পরিবারের সেই পরিবারের সহিত জগদীশচন্দ্রের পরিচয়—তিনি যখন ইংলণ্ডে ছাত্র সেই সময় হইয়াছিল।

আমরা আশা করি, এ দেশের সরকার ও ধনীরা এই প্রতিষ্ঠানের ও এই জাতীয় অন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নতি কল্পে অর্থ প্রদান করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

আজ আমরা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিতেছি—

"জয় তব হোক জয়।"

শিক্ষার সমস্যা—

ভারতের নানা সমস্যার মধ্যে শিক্ষার সমস্যার গুরুত্ব অল্প নহে। যতদিন দেশের সকল লোক শিক্ষিত না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি দ্রুত হইবে'না। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—যত দিন দেশের জনসাধারণ অজ্ঞতায় মগ্ন ও দারিদ্র্যে পিষ্ট থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগের ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রকেই দায়ী মনে করিব।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, আজও ভারতরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সরকার সম্ভব করেন নাই।

যে সকল কারণে অরবিন্দপ্রমুখ মণীষীরা ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন, সে সকল কারণ দূর করা হয় নাই। সে সকলের মধ্যে দুইটি—"Its calculated poverty and insufficiency and its anti-national character."

প্রাথমিক শিক্ষার পরে মাধ্যমিক শিক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভ্রষ্ট অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার সহিত সম্পর্ক-শূন্য করা হইয়াছে। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যে উপকরণ উৎপন্ন করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষার জন্য তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। সেই জন্য—দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবর্ত্তিত, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হওয়া পর্য্যন্ত—মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার সহিত সম্পর্কশূন্য করা সময়োপযোগী নহে—ইহাই অনেকের মত। বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে ছাত্ররা যাহাতে নানা বিষয়ে ব্যবসা প্রভৃতিতে এবং সামরিক ও নৌ-বিভাগে যাইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মাধ্যমিক শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব—জাতীয় ভাবের প্রসারকামী নহেন—এমন একটি গোষ্টির হস্তে দিলে তাহাতে কোনই ঈপ্সিত ফললাভ হইতে পারিবে না। তাহাও বিশেষ বিবেচ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি—তাহাদিগের পরিকল্পনা-প্রাবল্যে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে "কল্যাণী" সহরে লোক তাঁহাদিগের আশানুরূপ আকৃষ্ট হইতেছে না, বিশ্ববিদ্যালয় তথায় লইয়া যাইয়া তাহার শূন্য স্থান পূর্ণ করা হইবে! ইহার জন্য যে ব্যয় অনিবার্য্য তাহা কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু ব্যয় ব্যতীত বিবেচনার আরও বিষয় আছে, যথা—পরিচিত পরিবেষ্টনের প্রভাব ও দেশের লোকের সামাজিক ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ বেলেঘাটা অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবও হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ বর্ত্তমানে বালীগঞ্জে ও রাজাবাজারে স্বতন্ত্র রহিয়াছে—উভয়ের একীকরণ বাঞ্ছনীয়। তাহা অসম্ভবও নহে।

তাহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। ইংরেজী শিক্ষার আদর্শ বা মান আরও খর্ব্ব করা হইবে—কি তাহা বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে আন্তর্জ্জাতিক ভাষার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করা হইবে, তাহা বিবেচিত হইতেছে। হিন্দী কত দিনে রাষ্ট্রভাষার কাজ করিবার উপযুক্ত হইবে এবং কখনও তাহা হইবে কি না, তাহা বলা দুষ্কর। এই অবস্থায়—বিশেষ আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে—ইংরেজী শিক্ষার মান খর্ব্ব করা বর্ত্তমান সময়ে সঙ্গত কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির যে গৌরব পূর্ব্বে ছিল, আজ যে তাহা নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ত্রুটি লক্ষিত হইলে তাহা সংশোধন করিতে হইবে। শিক্ষায় যাহাতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা করাও প্রয়োজন।

ব্যবসায়ীদিগকে সরকারী সাহায্য—

সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন শিল্পের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করিয়া থাকেন। যে আইন অনুসারে সেই ঋণ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করিয়া কেন্দ্রী সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টের কয়জন সদস্য অধমর্ণ-প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করিতে বলায় সরকার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, ব্যাঙ্ক যেমন অধমর্ণদিগের নাম প্রকাশ করে না, এই প্রতিষ্ঠানও তেমনই নাম প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু উপ-মন্ত্রী মিষ্টার সিংহ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ব্যাঙ্কের মূলধন জনসাধারণের নহে এবং ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে। সরকারী টাকা যদি ঋণ দেওয়া হয়, তবে অধমর্ণের নাম জানিবার অধিকার জনগণের প্রতিনিধিদিগকে দিতেই হইবে।

বিশেষ, যে সকল প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের হিসাবে ঋণের বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবেই।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি অধমর্ণ-প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা দেখিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস, সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান অনায়াসেই সমর্থন করিতে পারিবেন। সে অবস্থায় নাম প্রকাশে সরকারের আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু সরকার পক্ষ কিছুতেই সে সংবাদ দিতে সম্মত হন নাই।

শেষে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যাপারটি ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন—সভ্যগণের অধমর্ণদিগের নাম জানিবার অধিকারের দাবী অসঙ্গত নহে, কিন্তু—

(১) এতদিন নাম গোপন রাখার যে রীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অধমর্ণদিগের সম্মতি ব্যতীত ত্যাগ করাও সঙ্গত হইবে কি না, সন্দেহ।

(২) অধমর্ণদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা হইবে না, তাহা ভঙ্গ করাও সঙ্গত হইবে না।

তিনি বলেন, যদি কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোন সদস্যের সন্দেহের কোন কারণ থাকে, তবে তিনি তাহা জানাইলে সরকার বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—নাম না জানিলে সদস্যরা কিরূপে সন্দেহের বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী সাধারণতঃ সর্ব্বজ্ঞের মত ব্যবহার করিলেও এ ক্ষেত্রে স্বীকার করা সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন যে, তিনি ব্যাঙ্কের লেন-দেন

প্রথাদি অবগত নহেন এবং সেই জন্য অর্থ-মন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন না। অর্থ-মন্ত্রী অনুপস্থিত। সুতরাং এখন এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না!

ইহা যে কোনরূপে দাবী এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষ প্রধান-মন্ত্রী যে এই কর্পোরেশনের সহিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মত আর গোপন থাকে নাই।

যদি দেশের স্বার্থে কোন প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা সরকার প্রয়োজন মনে করেন, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম গোপন করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বৃটিশ সরকার যে সুয়েজখাল কোম্পানীতে ও পারস্যের এ্যাংলো-পার্সিয়ান তৈল প্রতিষ্ঠানে বহু টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা কখন গোপন রাখেন নাই।

সরকারের এই নাম প্রকাশে অসম্মতিই লোকের মনে অধমর্ণদিগের সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে।

সাঁচী—

কয় মাস হইতে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি এককালে সমৃদ্ধ—অধুনা অবজ্ঞাত সাঁচীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সাঁচী এককালে বৌদ্ধ প্রভাবের অন্যতম কেন্দ্র ও পূর্ব্ব-মালবের রাজধানী ছিল। ইহার সহিত প্রাচীন ভারতের নানা গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত—বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম প্রচারার্থ নানা দিগ্দেশে প্রচারক প্রেরণ, দিকে দিকে বৌদ্ধমত প্রচার, অশোকের সাম্রাজ্য, চীন হইতে পরিব্রাজকদিগের তীর্থক্ষেত্র ভারতে আগমন—বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি বন্দরের সমৃদ্ধি প্রভৃতি।

কালক্রমে সে নগর বিলুপ্ত হইয়াছে—বৌদ্ধমতের ভারতে আর পূর্ব্ব প্রাধান্য নাই—তাহা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনার অনাবিল মাহাত্ম্য হারাইয়াছে। কিন্তু সাঁচী ও তাহার নিকটবর্ত্তী সাতধারা প্রভৃতি স্থানের বিরাট স্তূপসমূহ ও জীর্ণ বিহার স্মৃতি লইয়া অবস্থিত—পুরাবস্তুর নিদর্শন—অতীতের সাক্ষী।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগের পরিকল্পনানুসারে যখন অনুসন্ধান হইতে থাকে তখন জেনারল কানিংহাম এই স্থানের স্তূপগুলিতে সন্ধানরত হ'ন। মে-ইসী তাঁহার সহকারী ছিলেন। অনুসন্ধানকালে কানিংহাম একটি স্তূপে যে প্রস্তরাধার আবিষ্কার করেন, তাহাই পরে বুদ্ধদেবের দুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য সাধু শারীপুত্র ও মহামগ্গলায়নের অস্থির অংশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। বহিরাধারে লিখিত দুইটি অক্ষর হইতে উহা নির্ণীত হইয়াছিল।

আধারে হয়ত বহুমূল্য রত্নাদি আছে মনে করিয়াও বটে, আর কি আছে সে সম্বন্ধে কৌতূহলহেতুও বটে আধার ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। আধার ও আধারস্থিত অস্থির অবশেষ ভারতে আনিবার চেষ্টা বহুদিন ব্যর্থ হইয়াছিল। শেষে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহা ভারতকে প্রদান করা হয়।

মহাবোধী সমিতি উহা পূর্ব্বের মত সাঁচীতে রাখিবার ব্যবস্থা করেন ও সেইজন্য তথায় নুতন বিহার রচনার আয়োজন করেন।

ইতোমধ্যে ঐ পবিত্র বস্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও—এমন কি কাম্বোডিয়ায়ও ভক্তদিগকে দেখান হয়। লক্ষ লক্ষ নরনারী সসম্ভ্রমে তাহা দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে যেভাবে লোক উহা দর্শন করিয়াছে, তাহাতে ভগিনী নিবেদিতার কথা স্বতঃই মনে হয়—বৌদ্ধমত হিন্দু ধর্ম্মেরই অংশ। সেই জন্যই বাঙ্গালী কবি জয়দেব বুদ্ধকে হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন:—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
> কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
> জয় জগদীশ হরে॥"

আর দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গবন্দনা মনে পড়ে—

> "উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার;
> আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।"

সাঁচী আজ অজ্ঞাত বটে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন সম্রাট অশোকের বা অন্য কোন সম্রাটের রাজ্যকালে তথাগতের শিষ্যদ্বয়ের অস্থির অংশ এই স্থানে সমাহিত হইয়াছিল, তখন সাঁচী সমৃদ্ধ। হয়ত সেদিনও নানা স্থান হইতে ভক্তগণ সেই উপলক্ষে সাঁচীতে সমবেত হইয়াছিলেন! "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" রবে সাঁচীর গগন পবন মুখরিত হইয়াছিল।

আজও সাঁচীতে বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্যের যে পরিচয় বিদ্যমান, তাহা বিস্ময়কর।—অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগের সংস্কৃতির ও শিল্পের পরিচায়ক সাঁচীতে যে অস্থি একদিন রক্ষিত হইয়াছিল, আবার তাহা তথায় রক্ষিত হইল। যেদিন প্রথম উহা রক্ষিত হয়, সেদিন কিরূপ উৎসব হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। হয়ত সেদিনও নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধি ও তীর্থযাত্রীরা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যদি পৌরোহিত্য করিতেন, তবে তাহা যেরূপ শোভন হইত, প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সেরূপ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে অনুষ্ঠানের গৌরবহানি হয় নাই—হইতে পারে না। মহাবোধী সভা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়াছেন—হিন্দু মতের সহিত বৌদ্ধ মতের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-সম্মিলনে সময়োচিত উক্তি করিয়াছিলেন—আজ জগৎ জড়বাদজর্জ্জরিত—ইহকাল-সর্ব্বস্ব মনোভাবহেতু আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা হারাইয়াছে; আজ যুদ্ধ মানুষের স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছে, তাই চারিদিকে "শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি রব"—শ্রুত হইতেছে; মানুষ মারণাস্ত্রের উন্নতিসাধনে বিজ্ঞান নিযুক্ত করিয়াছে। এই সময় যে বুদ্ধের বাণী অশান্তির মধ্যে শান্তি আনিতে পারে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মনিরপেক্ষতার পক্ষপাতী এবং

কোন মন্দিরে পূজা করেন না বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন, তিনি যখন বুদ্ধের বাণীতে লোককে অবহিত হইতে বলেন, তখন সে উক্তিতে আন্তরিকতার অভাব অনুভব করা অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয় কথা—এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় জওহরলাল যে অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গোহত্যা-নিবারণ আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া বিষোদগার করিয়াছেন, তাহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তৃগণ অতিথি ও তীর্থযাত্রীদিগের জন্য নিরামিশ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বাহ্নে সে বিষয় ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আহূত সভায় পণ্ডিত জওহরলাল—অকারণে গোহত্যা-বিরোধী আন্দোলনকারীদিগকে রাষ্ট্রের শান্তিভঙ্গকারী পর্য্যন্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—তিনি কখনই পার্লামেণ্টে গোহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া আইন বিধিবদ্ধ হইতে দিবেন না। ইহাতে কেবল একনায়কত্বের ধৃষ্টতাই প্রকট হয় না, ইহা ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একান্ত অশোভন।

আমরা এই ব্যক্তিগত ত্রুটি সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

আমরা আশা করি, বুদ্ধের বাণী বিদ্বেষ ও ঘৃণায় জর্জ্জরিত সমাজে শান্তির প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ এসিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আবার নূতন মৈত্রীর বন্ধন দেখা যাইবে। এসিয়া এক—হিমালয় তাহাকে বিভক্ত করিয়া ঐক্যই প্রতিপন্ন করে।

অমিতাভের ধর্ম্মমত-প্রচারকগণ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত ও উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে, চীনে, জাপানে, কোরিয়ায়, যবাদি দ্বীপে—কাম্বোডিয়ায় যে সংস্কৃতি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তাহাই এসিয়ার সংস্কৃতি।

সেই আধ্যাত্মিকতাস্নিগ্ধ সংস্কৃতি আবার জয়লাভ করুক—জগৎকে ধন্য ও পুণ্যপূত করুক।

কোরিয়া—

কোরিয়ায় যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। তথায় কমুনিষ্টরা দৃঢ় ব্যবস্থাও করিতেছেন। যুদ্ধবন্দীদিগের সম্বন্ধে ভারত রাষ্ট্র হইতে জাতিসঙ্ঘে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে—রুশিয়া তাহাতে আপত্তিজ্ঞাপন করিয়াছে; চীনও সম্মতিজ্ঞাপন করে নাই। কিন্তু তাহা বহুমতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। কারণ, তাহাতে এমনও মনে করা সম্ভব যে, আমেরিকা জয়ী হইয়াছে। আর বৃটেন তাহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছে।

যদি ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে তাহা যুদ্ধের সুষ্ঠু সমাধানে সহায় হইবে, এমন নহে। তবে তাহাতে কি লাভ হইবে, বলা যায় না। অবশ্য প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতের পক্ষে বলা সম্ভব হইবে—জাতিসঙ্ঘে তাহার সম্ভ্রম আছে। অপরদিকে আবার রুশিয়া হয়ত বলিবে, প্রস্তাবটি আমেরিকার পক্ষ হইতেই আসিয়াছে। প্রস্তাবটি "বেনামী" এমন কথা আমরা বলিতেছি না। আমাদিগের মনে হয়, ভারত সরকার যদি অল্পে তুষ্ট না হইয়া যুদ্ধের সমাধানে—প্রকৃত শান্তি সংস্থাপনে সাহায্য করিতে পারিতেন, তবে ভারতের কৃতিত্ব অভিব্যক্ত ও তাহার সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইত।

ভারত সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মনোভাব কি তাহার পরিচয় আমরা কাশ্মীরের ব্যাপারে পাইয়াছি ও পাইতেছি। সুতরাং সে বিষয়ে অধিক কিছু বলা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যদি ভারত কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানে জাতিসঙ্ঘকে প্ররোচিত করিতে পারিত বা পাকিস্তানের অনাচারের প্রতীকার করিতে পারিত, তবে যে তাহার প্রকৃত সম্ভ্রম লাভ হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

কোরিয়ার ব্যাপারে ভারতের তাহা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—সম্ভাবনা থাকিতেও পারে না।

কাশ্মীর—

কাশ্মীর-সমস্যা যেরূপ ছিল, তেমনই রহিয়াছে। যুবরাজ করণ সিংহ রাজা হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যে প্রধানের পদলাভ করিলেন। কাশ্মীরের জন্য ভারতের অর্থব্যয় অল্প হইতেছে না। অথচ কাশ্মীর ভারতের একটি প্রদেশ নহে—তাহা স্বতন্ত্র। এই অবস্থার অসামঞ্জস্য সপ্রকাশ। অথচ এই অবস্থায় ভারত সরকারের অর্থ কাশ্মীরের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতেছে!

আমেরিকা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ফলে কি হইবে, তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই। সামরিক রাষ্ট্রপতির অভাবে যুদ্ধ প্রবল হইতে পারে, অনেকের মনে এই বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে এবং তাহা হয়ত অসঙ্গত নহে। তবে আজ পৃথিবীর নানা দেশের শান্তি—কোন একটি দেশের উপর নির্ভর করে না। সেই জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স, বৃটেন ও রুশিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইলে আমেরিকাও তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও কেহ একক যুদ্ধ করে নাই। সুতরাং আমেরিকার নূতন রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় যে বিশ্বযুদ্ধ হইবে, এমন মনে করা যায় না। তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপকরণ যে বিভিন্ন দেশে সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্ফুলিঙ্গপাতে বিস্ফোরণ হইতে পারে। যতদিন মানুষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত না হইবে, ততদিন শান্তিরক্ষা সহজসাধ্য হইবে না।

১৫ই অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৌভাতও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে—গোপালপুর ও পলাশডাঙ্গায় সমস্ত ইতরভদ্র মতিঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে খাইয়াছে—ডাল, মাছ ও চাটনি দিয়া। পায়স হয় নাই, তবুও ভুরি-ভোজনই হইয়াছে। ভগবতী নিজে খাইতে বসিয়া রান্নার তারিফ করিয়াছেন।

বিবাহের ভোজন ও সারদার কীর্ত্তি গোপালপুরের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে।

মাঘী পূর্ণিমা।

খয়রাশোলে বড় মেলা হয়। ভরত ও আদুরী মেলায় যাইবে ঠিক করিয়াছিল। ভরত ও আদুরীর সাঙ্গার পরে ভৌতিক ব্যাপারটা লইয়া বিশেষ কেহ আর আলোচনা করে না। আদুরী সংসারের কাজ করে, ভরত চাষ-আবাদের জন্য আর চিন্তিত নাই—ঘরে বৎসরের খাদ্য মজুত, মাঝে মাঝে পচুই না হয় মহুয়ার মদ খাইয়া দুইজনে গান করে—ভরত সেইজন্য একতারা তৈয়ারী করিয়াছে। আদাড়ী ঠাকুর সেইদিন রাত্রে সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে আর আসে নাই। আদুরী মাঝে মাঝে তাহার কথা না ভাবে এমন নয়—আদাড়ীকে তাহার জন্যই দেশান্তরী হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভরতের অপরিসীম স্নেহ ও যত্ন যেন সে ক্ষতস্থানটাকে নিরন্তর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখে—

মেলায় কয়েকটা সাংসারিক জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল—যথা খই মুড়ি ভাজিবার খোলা হাঁড়ি, লোহার হাতা-খুন্তি, কয়েকটা জিনিষ রাখিবার হাঁড়ি, কুলো প্রভৃতি। ভরতের মনে মনে ইচ্ছা ছিল একখানা রঙীন ডুরে শাড়ী আদুরীকে কিনিয়া দিবে। দুইজনে সকালে খাইয়া ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মেলায় রওনা দিল—

খয়রাশোল ক্রোশ দেড়েক রাস্তা—যাইতে সামান্য সময়—মেলায় মিষ্টির দোকান, মনিহারী দোকান, তাঁতিদের দোকান, কামার কুমোরের দোকান সারি সারি রহিয়াছে—

মেলায় পৌঁছিতেই ছেলেটা একখানা বড় পাঁপর ভাজা পাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে চারি-পাশে চাহিতেছে। বাদ্য সহকারে মেলাস্থলে ৺গোবিন্দজীউ আসিলেন, কুলবধূগণ শাঁখ বাজাইয়া পিছন পিছন আসিলেন, —তাহার পিছনে আম্রবনের মাঝে ঝুমুর গান গাহিতেছে মেয়েরা। তন্বী শ্যামা স্বাস্থ্যবতী বাউরী ও সাঁওতাল মেয়েরা—সেখানে যুবকগণের ভীড়। তাহার পিছনে কতকগুলি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর—সারি সারি। সেখানে ভীড় নাই কিন্তু গোপনীয় একটা নিঃশব্দতা রহিয়াছে। আদুরী কহিল—উ কি ভরত ?

ভরত একগাল হাসিয়া কহিল—তু, জানিস্ না।

—না।

—মেয়েমানুষ—ব্যবসা করবেক তাই মেলায় এসেছে। ভরত আর একবার হাসিল। আদুরী থু করিয়া খানিক থুথু ফেলিয়া কহিল—গলায় দড়ি দেয় না কেনে ?

ভরত রসিকতা করিল—তু চল, দেখবি—

—ছিঃ—মু যাবেক কেনে ?

মেলায় দ্রষ্টব্য দেখিয়া তাহারা মিষ্টির দোকানে কিছু খাইয়া তাহারা একটু জিরাইয়া সওদা করিতে বাহির হইল—প্রথমেই দেখে একটা দোকানে বড় ভিড়—কোন মতে মাথা গলাইয়া দেখিল—লণ্ঠন বিক্রয় হইতেছে। চারকোণা কাচে ঢাকা—ঝড়ে নেভে না বলিয়া দোকানদার ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে—

ভরত কহিল—বড় ভাল জিনিষ বটে আদুরী—রাতে মাছ ধরবেক আম কুড়াবেক—কেরাচিন্ তেল্ ত হাটে হাটে মিল্‌বেই—

আদুরী কহিল—হাঁ হাঁ, কেন কেনে—

ভরত কোন কিছু চিন্তা না করিয়া লণ্ঠন কিনিয়া ফেলিল—দুইজনে লণ্ঠনটা নাড়িয়া-চাড়িয়া তারিফ করিয়া আবার চলিল—কাপড়ের দোকানের দিকে—তাঁতির দোকানে তেমন ভীড় নাই কিন্তু একটা দোকানে খুব ভীড়—

দের মিহি কাপড় নক্‌সা-পাড় বেশ সস্তা বিক্রয় হইতেছে, বিলাতী কাপড় সুন্দর মসৃণ। ভরত বিস্ময়ে কহিল—কি সুন্দর রে আদুরী—লিবি?

—লুবো—নক্‌সা পাড় লে একটী—

ভরত নক্‌সা-পাড় একখানা পাছা-পাড় কাপড় কিনিয়া আদুরীর হাতে দিল—সুন্দর মিহি কাপড়—আদুরী হাতে করিয়া খুশী হইল—ভরতের কাঁধে হাত দিয়া ক্রীড়াভঙ্গি সহকারে কহিল—তু দিলি?

—হাঁা—তু মোর সাঙ্গা—

আদুরী হিহি করিয়া অনেকক্ষণ হাসিল—কৃতজ্ঞতায় এবং ভরতের স্নেহের মর্য্যাদা রক্ষার্থে। তু মোকে ভালবাসিস্—

—হাঁারে—

মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা পড়িয়া আসিল—সন্ধ্যার শীতের আমেজ দিতেছে। ভরত কহিল পয়সা ত আর নেই রে আদুরী, হাঁড়ি ও হবেক না—

—খেলো হাঁড়ি—আর হাতা ত লাগবেকই রে! মুড়ি ভাজবেক কিসে? ভাত রাঁধবেক কেমনে—

—চল—

মেলা খুঁজিয়া কোন মতে একটি খেলো হাঁড়ি ও হাতা কিনিতেই ভরতের অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। মেলার প্রান্তে মহুয়ার মদের দোকান, ভরত তৃষ্ণার্ত্তভাবে তাহার দিকে তাকাইল—আদুরী তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বুঝিল ভরত বড়ই ব্যথিত হইয়াছে; মেলায় আসিয়া সে পান করিতে নাই। আদুরী কহিল—কিছু নেই রে ভরত!

—না, সব ত খরচ হ'য়ে গেল—চল্—কুলো হাঁড়ি পারে কিন্‌বেক বক্রেশ্বরের মেলায়, চল—

আদুরী ও ভরত সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল কিন্তু মেলার পরে ফিরিয়া যেমন আনন্দ হয় তেমন কিছু হইল না—ভরত বিষণ্ণভাবেই দাওয়ায় বসিয়া রহিল—আদুরী নূতন শাড়ীর কথা ভুলিয়া গিয়া গৃহের পানে চাহিয়া দেখিল সংসারের প্রয়োজনীয় কিছুই আসে নাই।

সাম্‌নে দোল—ভগবতীর পৈতৃক দোলের উৎসব আছে তাহাতে একটা ছোটখাটো মেলা হয়—ভোজনাদি ব্যাপারেও খুব আছে—

ভগবতী ও মতিঠাকুর সকালে বসিয়া দোলের কর্ম্ম ও করণীয় ঠিক করিতেছিলেন। প্রিয়নাথ এককোণে বসিয়া গড়গড়া টানিতে টানিতে নানারূপ প্রস্তাব দিতেছিলেন। হঠাৎ তাহারা লক্ষ্য করিলেন—বৈঠকখানার আলিশায় বসিয়া আছে নব তাঁতিসহ আরও কয়েকজন, শীতলকুমার গোবিন্দ তিলি। তাহাদের মুখ বিষণ্ণ, একটা কিছু হইয়াছে—

ভগবতী তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন—কি নব, গোবিন্দদা কি? তোমাদের মুখের চেহারা যেন কেমন মনে হ'চ্ছে—

নব কহিল—হাঁা কর্ত্তা। শীতকালের মেলায়ই আমরা যা হয় দু'পয়সা বেচে পেটের ভাত পাই, কিন্তু মেলায় নতুন বিলাতি কাপড় আমদানী হ'য়েছে—আমাদের বিক্রি বন্ধ, সবই প্রায় ঘরে-ফিরে এসেছে, এখন আপনি একটা ব্যবস্থা না করলে অনাহারে মরতে হয়—কর্ত্তা আপনার দুয়োর ধরে চোদ্দপুরুষ কাটিয়েছি—

শীতলকুমার কহিল—মেলায় লণ্ঠন, কাপড় আর বিলিতি সব বাসন কিন্‌ছে লোকে—এনামেল না কি? হাঁড়ি ত কেউ কেনে না—আমরা কি করে বাচবো কর্ত্তা—

গোবিন্দ তিলি কহিল—রেড়ির তেলের ঘানিটা ত বন্ধ হ'তে চলেছে কর্ত্তা—কেরাচিন দিয়ে সব লণ্ঠন ল্যাম্পো জ্বলেছে, আমরাই বা কি করি কর্ত্তা?

ভগবতী সমস্ত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—মানুষে আকস্মিকভাবে যদি দেখে বিরাট প্লাবন আসিতেছে, ঘরদুয়ার মানুষজন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তখন মুখখানার চেহারা যেমন হয় ভগবতীর মুখখানাও তেমনি বিশুষ্ক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এই প্লাবনে তিনি ডুবিবেন,—দেশ ভাসিয়া যাইবে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভগবতী আকস্মিকভাবে নিজেকে যেন অত্যন্ত অসহায় মনে করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতিঠাকুরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর মশায়—

মতিঠাকুর দিব্যচক্ষে অনেকখানি দেখিয়া ফেলিয়াছেন। কল্পনায় অনুভব করিয়াছেন, কুলুর ঘানি বন্ধ হইয়াছে, তাঁত বন্ধ হইয়াছে, কুম্ভকারের চাকা অচল হইয়াছে—দেশে বুভুক্ষিত জনগণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। মতিঠাকুর দীর্ঘশ্বাস নিক্ষ্রান্ত করিয়া কহিলেন—কি ভগবতী!

—কি করা যায় ?

মতিঠাকুর ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—কি করা যায় ? আমি ভেবে পাচ্ছি না ভগবতী। সকলেরই যদি এই হয় তবে তুমি একা—একা তুমি ক'জনকে রক্ষা করবে। আমার মনে হচ্ছে—ভাঙ্গন ধরলো, এ ভাঙ্গন কতদূর যাবে কে জানে—সুখের সংসারে আগুন লাগলো—নীলকুঠীতে ধানচাষ বন্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষ হ'তে চলেছিল, আর এখন সব শিল্পই ত ভেসে যাবে নতুন ভাঙ্গনে—

ভগবতী কহিলেন—কিন্তু গোবিন্দদা, নব এরা না খেয়ে মরবে আমরা বেঁচে থাক্‌তে তাই বা হয় কি করে ? তবে আর আমার জমিদারী করে লাভ কি ? আচ্ছা গোবিন্দদা, দোলের মেলায় কোন বিলিতি জিনিষের দোকান বস্‌তে দেব না—তোমাদের দোকানই থাক্‌বে,—লণ্ঠনও বেচতে দেব না—

মতিঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—তুমি না হয় দোলের মেলায় ঠেকালে, কিন্তু তোমাদেরই সকলে অন্য মেলা থেকে কিনে আন্‌বে তুমি কি করবে—ভয়ে ডরে না হয় দু'দিন শুন্‌লো তার পর ?

—তার পর ? ততদিন ত বেঁচে থাকবো না, যা হয় হবে !

মতিঠাকুর কহিলেন—সে ত হ'ল, আমিও ত বলে দিয়েছি, বিলাতী কাপড় গামছায় কোন দেবকার্য্য বা প্রেতকার্য্য হবে না। সাধভক্ষণ, এঁয়োতি কোন কাজেই লাগ্‌বে না,—কারণ ম্লেচ্ছ কৃত কাপড় দৈবকার্য্যের অনুপযুক্ত কিন্তু ক'দিত ভগবতী ?

উভয়েই সহসা নীরব হইয়া গেলেন—তাহাদের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মতিঠাকুর ভবিষ্যতের দৃশ্য ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং প্রায় অশ্রুপ্লুত চোখে কহিলেন,—ভগবতী আর রক্ষা নেই, ভাঙ্গন ধ'রেছে এখন প্লাবনে সকলের প্রাণই যাবে ? তবুও তৃণটিকেও সম্বল ক'রতে হবে, উপায় কি ?

গোবিন্দ তিলি কহিল—কোম্পানী রেলগাড়ী খুলেছে, বর্দ্ধমানের কাছে আমার ভায়রা বাড়ী,—গাড়ীতে সব মালই চলে যাচ্ছে কলকাতা—দাম সব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—

নুর কহিল—রেলগাড়ী দেখেছ গোবিন্দ দা ?

—না, শুনেছি। এবার গেলে দেখে আস্‌বো— নাকি বিরাট দৈত্যের মত, হুস্ হুস্ করে চলে—হাজার মণ মাল নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করে—

—বল কি ? হাজার মণ ?

—হ্যাঁ, হাজার হাজার মণ মাল, অন্ততঃ দু'শো গরুর গাড়ীর মাল ত নেবেই—

কথাটায় বিশেষ কেহ কান দিলেন না। ভগবতী গম্ভীর হইয়া রহিলেন—কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—আচ্ছা যাও গোবিন্দদা, দোলের মেলাটা দেখ,—আমি থাক্‌তে না খেয়ে মরবে না—যাও—

একটা ভরসা পাইয়া সকলে চলিয়া গেল। মতিঠাকুর বলিলেন—ওরা ত তোমার ভরসা পেয়ে চলে গেল কিন্তু আমি ত কোন ভরসাই দেখছি না ভগবতী। কি হবে ? দেশের কি অবস্থা হবে ? বল্‌তে পারো—

ভগবতী কহিলেন—জানি না, তবে চন্দ্রমাধবকে ইংরাজি পড়াব ভাবছি। নতুন বিদ্যা নিয়ে হয়ত সে কিছু সমাধান করতে পারবে।

—হ্যাঁ চাঁদু বেশ ছেলে—পণ্ডিতের মুখে শুনেছি খুব বুদ্ধিমান আর স্মরণ শক্তিও যথেষ্ট। শশধর ত যা হোক জমিদারী দেখা-শোনাটা শিখে নিয়েছে প্রায়,—চাঁদু যদি নতুন বিদ্যায় দেশকে রক্ষা ক'রতে পারে—

—হ্যাঁ, দেখি। গোপালপুরে মাইনর স্কুলে পাশ করলে সদরের জেলা স্কুলেই পাঠাবো ভাবছি।

প্রিয়নাথ গড়গড়া হস্তান্তরিত করিতেই ভগবতী উহাতে মনোযোগ দিলেন। মতিঠাকুর উঠিয়া পড়িলেন—তাহা নিত্য দেবসেবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

দোলের মেলায় ভগবতী বিদেশী কোন দ্রব্য বিক্রয় হইতে দেন নাই সত্য কিন্তু নতুন নতুন জিনিষের দোকান না থাকায় মেলাও জমে নাই। ভিন্ন গ্রাম হইতে সামান্য লোক আসিয়াছে, যাত্রা কথকথা ও রামায়ণ শুনিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই তবে আপাততঃ অন্যান্য মেলা হইতে বিক্রয় ভালই হইয়াছে—এবং মতিঠাকুর মশায়ের আদেশ অনুসারে গ্রামে বিলাতি কাপড়ে কোন দৈব্যকার্য্য হইতে পারিবে না শুনিয়া লোকে অন্ততঃ ধর্ম্মকার্য্যের জন্যও তাঁতের কাপড় কিনিয়াছে।

আপাততঃ নব গোবিন্দ শীতল প্রভৃতি কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছে।—

মতিঠাকুর একদিন ভগবতীকে কহিলেন—ভগবতী একটা কাজ করা দরকার, দিগর গ্রামের পণ্ডিতদের একদিন ডাকো—তাঁতিদের বাঁচাতে হ'লে সব পণ্ডিত একমত হ'য়ে একটা ব্যবস্থা দেওয়া দরকার,—অন্ততঃ পূজায় মাটির জিনিষ ও রেড়ির তেল প্রভৃতির ব্যবস্থা চাই—

ভগবতী দেখিলেন কথাটা সমীচিন, তিনি কহিলেন,—ভালই ত মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধের তিথিটা ত চৈত্রের প্রথমে। ঐদিনই সব নিমন্ত্রণ করি, কি বলেন?

—হাঁ, সেই ভাল।

যথাসময়ে ভগবতী নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেন—দশ ক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত নামকরা পণ্ডিত আছেন সকলকেই নিমন্ত্রণ লিপি পাঠান হইল এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে তাহাও জানান হইল,—বস্ত্র, উত্তরীয়, একটি ধাতু নির্ম্মিত জলপাত্র ও একটি টাকা বিদায় দেওয়া হইবে।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁতি পাড়ায় তখন দিবারাত্রি তাঁত চলিতেছে চৈত্রের শুক্লা সপ্তমীর পূর্ব্বেই একশত বস্ত্র ও একশত উড়ুনী দিতে হইবে,—কাঁসারীপাড়ায় প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত টুং টাং শব্দ হইতেছে,—পিতলের ঘটি একশত চাই। সাড়ম্বরে কাজ চলিতেছে। ভগবতী আগাম ধান ও টাকা দিয়াছেন—

নব তাঁতি সেইদিন তাহার বৈবাহিকের নিকট পুকুর-ঘাটে সেই কথাই বলিতেছিল,—আমাদের কর্ত্তা দেবতুল্য ব্যক্তি, ব্যবসা ত আমাদের গিয়েছিল কেবল কর্ত্তার জন্যে কাজ চল্‌ছে—

তাহার বেয়াইএর বাড়ী বর্দ্ধমানে, সে কহিল,—হাস্‌ছো বেয়াই তাঁত চ'লছে দেখে—কিন্তু তোমাদের কর্ত্তার মাতৃ-শ্রাদ্ধ ত বারোমাস হবে না,—বন্ধ ত আজ হ'লেও হবে কাল হ'লেও হবে। আমাদের গাঁয়ের তিরিশখানা তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ লাঙ্গল ধরেছে, কেউ বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা করছে—না খেয়ে ত' চলে না,—একটা কিছু করতে ত হবে?

নব সরল সহজ মানুষ, সে সবিস্ময়ে কহিল—জাত ব্যবসা ছেড়ে লাঙ্গল ধরেছে,—আর সেই ম্লেচ্ছর তৈরী কাপড় মাথায় করে হাটে হাটে বেচে বেড়াচ্ছে, তাঁতির তাঁত বন্ধ ক'রতে?

—করবে কি? বাঁচতে ত হবে?

—কেন তোমাদের জমিদার নেই—

বেয়াই হাসিয়া কহিলেন—জমিদারে কি করবে বেয়াই? আমার রুচি মত পছন্দ মত কাপড় ত আমি পরবো—সস্তা কাপড় ভাল কাপড় লোকে কেন কিনবে না? তাই বল্‌ছি এই সময় একটা কিছু ধর।

নব বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি বেয়াই, জাত-ব্যবসা ছাড়া মহাপাপ, আর জাত-ব্যবসা ছেড়ে কি করবো? লাঙ্গল ত ধরতে পারবো না।

বেয়াই বিজ্ঞের মত হাসিলেন—তাঁহার বাড়ী শহরের কাছাকাছি তিনি অনেক কিছুই জানেন এমনি একটা মুখশ্রী করিয়া কহিলেন—দেখি, দেখবো আরো কত কি?

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ—

গত ৩রা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্সিয়ং সহরে পূর্ণ রেশনিং প্রথা বলবৎ রাখা হইবে এবং রেশনের চাউলের পরিমাণ বাড়াইয়া মাথা পিছু দৈনিক ৬ আউন্স করা হইবে। রেশন এলাকাভুক্ত মোট ৬৮ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে কমপক্ষে ৪ লক্ষ টন চাউল দরকার হইবে। নিয়ন্ত্রণ প্রথার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখানো হইয়াছে—(১) সরকার পূর্বে বস্ত্র ও চিনি বিনিয়ন্ত্রণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রকাশ্য বাজার হইতে মাল অন্তর্হিত হইয়াছে ও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া সরকার ৬৮ লক্ষ শিল্পাঞ্চলবাসী ও শ্রমিকদের বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিতে পারেন না। (৩) নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সহরবাসীদের অধিক পরিমাণে গম খাইতে বাধ্য করিয়া গ্রামবাসীদের জন্য চাউলের সংস্থান করা সম্ভব হইয়াছে (৪) খাদ্য সংগ্রহ ব্যতীত শিল্পাঞ্চলের উৎপাদনকারীদের উচিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা অথবা কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এলাকায় হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্য মূল্য হ্রাস করা সম্ভব নহে। আগামী বৎসর হইতে ত্রিশ বিঘার অধিক জমির মালিক অথবা চাষীর উদ্বৃত্ত শস্য লেভী প্রথায় সংগ্রহ করা হইবে। নূতন খাদ্যনীতির প্রবর্তনের ফলে খাদ্য সহজে পাওয়া গেলে দেশ হইতে অসন্তোষ দুরীভূত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে লোক আরও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

কলিকাতা ছাত্রভবন—

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী কলিকাতায় একদল ছাত্রকে উপযুক্তভাবে শিক্ষাদান ব্যবস্থার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একদল সন্ন্যাসী-কর্মী কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস খুলিয়া তথায় ছাত্রগণকে রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৬ সালে এই কাজ আরম্ভ হয়—১৯৩২ সালে দমদমে নিজস্ব জমী ও বাড়ী কিনিয়া তথায় ছাত্র ভবন স্থানান্তরিত হয়—যুদ্ধের সময় সে বাড়ী বিমান-বন্দরের জন্য সরকার গ্রহণ করায় আবার পূর্বের মত কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছাত্র ভবন ফিরিয়া আসে। বর্তমানে স্বামী সন্তোষানন্দের পরিচালনায় ২০নং হরিনাথ দে রোডে একটি বাড়ীতে ৫০জন ছাত্র আছে—তন্মধ্যে ২৭জন বিনা খরচে, ৯জন কম খরচে ও ১৪জন খরচ দিয়া তথায় থাকে। ১৯৫০ সালে বেলঘরিয়া রেল ষ্টেশনের নিকট লাইনের পূর্বদিকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় ৩৫ একর জমি ক্রয় করিয়া তথায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহ, পুষ্করিণী করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দমদমের জমী ও ... ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা সমস্ত নির্মাণ কার্য্য শেষ করা যাইবে না। তথায় ছাত্র ভবন ছাড়াও খেলার মাঠ, সবজি-বাগান, ফলের বাগান, টেকনিকাল বিভাগ প্রভৃতি করার ব্যবস্থা আছে। জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ... করিতেছে। সহৃদয় দেশবাসী সকলকে আমরা এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত হইতে ও ... কাজে লাগিতে অনুরোধ করি।

আগামী কংগ্রেস সভাপতি—

আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে হায়দ্রাবাদে ... নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্য শ্রীজহরলাল নেহরুর নাম প্রায় সকল কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতবাসী আনন্দলাভ করিবেন। যদিও এইবার লইয়া তিনি ছয় কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন, তথাপি বর্তমান সময়ে পরিচালনায় দেশ যে সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। তাঁহার নেতৃত্ব কেবল ভারতের সকল সমস্যার সমাধান করিতেছে, তাহাতে আরও দীর্ঘকাল তাঁহার পরিচালনায় সকল কার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে।

ফরক্কায় বাঁধ নির্মাণ—

ফরক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মিত না হইলে যে পশ্চিম-বঙ্গের সেচ ও জল সরবরাহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্যাই অমীমাংসিত থাকিবে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে ফরক্কা বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। এই বাঁধ পরিকল্পনায় ৮ বৎসরে ৫০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে—প্রথম ৫ বৎসর প্রতি বৎসর ১ কোটি টাকা করিয়া ও ষষ্ঠ বৎসর হইতে অধিক টাকা ব্যয় হইবে। বাঁধের উপর রেলপথ ও সেতুর উপর রাস্তা নির্মাণের জন্য আরও ৩ কোটি টাকা খরচ হইবে। খসড়া পরিকল্পনা পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়াছেন।

সহিত তাঁহার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা শেষ হইয়াছে। ভারতের সুদীর্ঘ পার্বত্য-সীমান্ত রক্ষা এখন ভারতরাষ্ট্রের এক মহাসমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। লাডাকের লামার এ বিষয়ে বর্তমান চেষ্টা ভারতের পক্ষে আশার কথা।

ভারতীয় কোবিদের সম্মান—

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ গত ১২ই নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ঐ পদে ১৯৫৩ সালের জন্য আর কাহারও নাম প্রস্তাবিত হয় নাই। ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই।

শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব—

গত ৩রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘে কোরিয়া প্রসঙ্গে ভারতের শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ায়

রাষ্ট্রপতির জন্মদিন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে সৈনিকগণের কুচকাওয়াজ।

সম্মুখে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন-রত রাষ্ট্রপতি

লাডাকে কেন্দ্র-শাসিত করণ—

লাডাকের প্রধান লামা কোশাক বাপুলা গত ৫ঠা নভেম্বর নয়া দিল্লীতে যাইয়া লাডাকবাসীদের দাবী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতের সহিত লাডাকের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ও লাডাককে একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করাই লাডাকবাসীদের দাবী। লামা মহাশয় কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত

সমগ্র বিশ্বের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। প্রস্তাবের পক্ষে ৫৪ ভোট গৃহীত হয়—রুশ-গোষ্ঠীর ৫টি ভোট বিরুদ্ধে গিয়াছে এবং জাতীয়তাবাদী চীন ভোট গ্রহণের সময় অনুপস্থিত ছিল। সংঘের ইতিহাসে কখনও কোন বিষয়ে এত অধিকসংখ্যক ভোট গৃহীত হয় নাই। কোরিয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধাবসানের জন্যই এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। গান্ধীজির অহিংস বাণী তাহার আদর্শরূপে ভারত আজ গ্রহণ করিয়াছে, সেই বাণী

সমর্থন করায় ইহাই প্রমাণ হইয়াছে। চীন ও উত্তর কোরিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব জানানো হইয়াছে ও অবিলম্বে এ বিষয়ে তাহাদের অভিমত জানাইতে বলা হইয়াছে। রুশ-গোষ্ঠী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করায় বিশ্বে এখনও লোক সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের এই উদ্যম—এক দিকে যেমন ভারতের নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিবে—অন্য দিকে তেমনই সমগ্র বিশ্ববাসী এই চেষ্টা দেখিয়া শান্তির আশায় শক্তিলাভ করিবে।

ভারতের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য নয়া দিল্লীতে ভারত যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি

পরলোকে বসন্তরঞ্জন রায়—

গত ২৩শে কার্তিক রাত্রিতে খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার ঝাড়গ্রামস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বসন্তরঞ্জন আজীবন সাহিত্যসেবা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সদস্যদের অন্যতম। কয়েক বৎসর তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার, তাহার সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম-এ ক্লাস খোলার সময় হইতে দীর্ঘকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। ১৩২৩ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রথম প্রকাশিত হয়—তাঁহার ফলে বাংলা সাহিত্যের এক নবযুগ আবিষ্কৃত কৃষি কলেজের কর্মী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বসন্তরঞ্জনের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীমতী রেণুকা রায়—

শ্রীমতী রেণুকা রায় বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা। তিনি বহুবৎসর যাবৎ সমাজ সেবার ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তু-সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি সে কাজে যেরূপ উৎসাহ, তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণই বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এবার নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সময় প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর পুনবসতি বিভাগের কার্যভার প্রদান করিয়াছেন। সে কাজও যে তিনি সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিতেছেন, তাহা তাঁহার কার্যফলে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রী হইবার সময় তিনি বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন না। সম্প্রতি মালদহ জেলার রতুয়া কেন্দ্রে একটি সদস্যপদ খালি হওয়া শ্রীমতী রেণুকা রায় তথায় সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অন্য সকল প্রার্থী নিজ নিজ নাম প্রত্যাহার করায় বিনা বাধায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার এই নির্বাচন-সাফল্যে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

নৌকা মোচন উৎসব—

এক সময়ে কলিকাতার নিকট গঙ্গার দুই তীরের গ্রামসমূহের যুবকগণ নৌকায় দাঁড়-টানা ও বাচ-প্রতিযোগিতায়

তাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। গত ২রা নভেম্বর হাওড়া-বালীর রাধানাথ বাচ সমিতির সদস্যদের চেষ্টায় 'অলকানন্দা' নামক নূতন নৌকার নৌকা-মোচন উৎসব হইয়াছে। উৎসবে রাষ্ট্রপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। এই নূতন উৎসবের মধ্য দিয়া ঐ অঞ্চলে আবার নৌকার বাচ প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাতে সকলেরই আনন্দ ও উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তাঁতশালা ও অপর একটিতে গোশালা খোলা হইয়াছে। কর্মীরা ভিক্ষা বা চাঁদা সংগ্রহ করেন না—প্রবর্ত্তক সংঘের কর্মীদের ন্যায় শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া তদ্বারা গ্রাম-সেবা করিতে চাহেন। এ ধরণের আত্মনির্ভরশীল আশ্রম অতি অল্পই দেখা যায়। এই গ্রাম-সেবা-কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া কর্মীরা ঐ অঞ্চলে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু কলোনীতে নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন। বাংলার বর্তমান দুর্গতির দিনে তাঁহাদের কার্য্য সকলের দেখা ও অনুকরণ করা কর্তব্য।

নৌশেহারার সেনাবাসে সঙ্গীগণসহ পরলোকগত ব্রীগেডিয়ার ওস্মান

হাটথুবা গ্রাম-সেবাকেন্দ্র—

২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমায় হাবড়া রেল ষ্টেশনের নিকট হাটথুবা একখানি ছোট গ্রাম। কয়েকজন গঠনমূলক কর্মী সেই গ্রামে যাইয়া একটি গ্রাম-সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেন্দ্রের সন্নিকটে কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনী হইয়াছে—পথের ধারে এক প্রশস্ত মাঠে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—তাহার জন্য একখানি বড় পাকা বাড়ী হইয়াছে। কয়েকজন মহিলাকে শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে—৪টি সেলাই কল প্রায় সর্বদা চালাইয়া নানারূপ সেলাই কাজ করা হইয়া থাকে। একটি ছাত্রাবাস খুলিবার জন্য একটি বড় পাকা দালান হইয়াছে—মহিলাদের বাস ও

শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

একজনমাত্র অক্লান্ত কর্মী জন-সেবকের চেষ্টায় কত বড় একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে, ২৪ পরগণা জেলার আরিয়াদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় তথায় ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রসূতি ভবন হইয়াছে। তথায় মাত্র ২০টি মাতার স্থান নির্দিষ্ট থাকিলেও এক এক সময়ে ৩০টি পর্য্যন্ত মাতাকে স্থান দেওয়া হয় এবং শম্ভুবাবুর পরিচালনায় সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। ঐ অঞ্চলের বহু ধনী ব্যক্তি ও কারখানার মালিকগণ প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ দান করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব

রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা দেবী স্থানটি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথায় একটি মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য মাসিক তিনশত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু হাসপাতালের মাসিক ব্যয় প্রায় ২ সহস্র টাকা। আমরা দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি এবং আমাদের বিশ্বাস ঐ আদর্শ সর্বত্র প্রচারিত ও অনুকৃত হইলে দেশ ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিশালী হইবে।

ভারতের উন্নয়নে মার্কিণ সাহায্য--

১৯৫২ সালের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে এক বৎসরে ভারতের উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ডলার সাহায্য করিয়াছে। ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে মার্কিণ হইতে ভারত ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ডলার (প্রায় ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা) সাহায্য লাভ করিবে। গত ৩রা নভেম্বর এই সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত দিল্লীর মার্কিণ প্রতিনিধিদের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র জগতের অর্থনীতিক উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর জগতের অনুন্নত দেশগুলিকে বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই অর্থ ঐ সাহায্যের অংশ। ঐ অর্থ সদ্ব্যয় হয় কিনা—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহা দেখা হয়। তাহা ছাড়া এই অর্থ গ্রহণের অন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু—

গত মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ৫ মাসে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বর্ডার স্লিপ লইয়া মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত ৬৮ জন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় আগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬৬ হাজার ৫ শত ৯০ জনকে সরকারী দায়িত্বে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া হাঁটাপথে, নৌকায়, ট্রেণযোগে আরও বহু উদ্বাস্তু আসিয়াছে—তাহারা কোন বর্ডার স্লিপ লয় নাই। প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তু এত ব্যাপারে সরকারকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। সরকার এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ—

ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের উপযোগিতা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য ৩ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিশন গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ এম-এল-এ উক্ত কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এ সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর এই সম্মানলাভ বাঙ্গালীর গৌরবেরই পরিচায়ক।

বিষ্ণুপুরে ভিক্ষুকদের জন্য গৃহ—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় এক স্থানে ৪০০ বিঘা জমীর উপর গৃহ নির্মাণ করাইয়া তথায় কলিকাতার ৫ হাজার ভিক্ষুককে লইয়া যাইবেন এবং তাহাদের বাস ও কাজকর্মের ব্যবস্থা করিবেন। অল্পবয়স্কদের লেখাপড়া ও বয়স্কদের শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাদের কর্মক্ষম করা হইবে। পাগল, অন্ধ, কানা, খোঁড়া, রোগগ্রস্ত প্রভৃতিদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে বহু লোক উপকৃত হইবে।

শ্রীনেহরুর নৃত্য ও ক্রন্দন—

গত ২রা নভেম্বর ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সেবাগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে ডাক্তার জাকির হোসেন যখন মহাত্মা গান্ধীর কথা বলেন, তখন নেহরুজীকে ক্রন্দন করিতে দেখা গিয়াছিল। বাপুজী যে গৃহে বাস করিতেন, নেহরু সে গৃহেও কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১লা নভেম্বর রাত্রিতে হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের ছাত্রছাত্রীগণ যখন 'ভারত-কি-কথা' নামক নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়া ভারতীয় ইতিহাসের দৃশ্য প্রদর্শন করেন, তখন নেহরু তাহাদের আহ্বানে তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করেন। নেহরুজী যে প্রাণবন্ত মানুষ এবং এই বয়সেও তাঁহার জীবন-চাঞ্চল্য

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী—

১৮৯৮ সালের কালীপূজার দিন ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে কলিকাতা বাগবাজার পল্লীতে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির উপস্থিতিতে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯১৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত বিনা বেতনে তথায় শিক্ষা দেওয়া হইত—ঐ সময় হইতে মাধ্যমিক বিভাগে বেতন লওয়া হইতেছে। নিয়মিত-ছাত্রীরা ছাড়া বহু মহিলা বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগে শিল্প শিক্ষা করেন। ২৫শে অগ্রহায়ণ হইতে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হইতেছে। ঐ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। ৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদের সম্পাদিকা রেণুকা বসুর নিকট সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত হইবে। নিবেদিতা বিদ্যালয় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য—

ভারতবর্ষে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হইলেও প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য আমদানী করিয়া ভারতের অভাব মিটাইতে হয়। নিম্নে ৩ বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল—

	নারিকেল সংখ্যা (হাজার)	শুষ্ক শাঁস (টন)	তৈল (হাজার গালন)
১৯৪৯-৫০	২১২৭	১২৪১৭	৭১৩৫
১৯৫০-৫১	১১৩৪	৮৬২৭	৯৩৭৬
১৯৫১-৫২	১০৮৮	১১৫৩৬	৬৯৯৩

ইহা সত্ত্বেও এ দেশের লোক নারিকেল-উৎপাদন ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে সামান্য চেষ্টা করিলেই লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছ উৎপাদন করা যায়।

সিন্ধ্রী সার কারখানা—

সিন্ধ্রীর সারের কারখানা মাত্র অল্পদিন হইল চালু মাস পর্য্যন্ত কারখানায় যে সার হইয়াছে তাহার ফলে ভারত সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে ৩ কোটি ২৬শত টাকা সাশ্রয় হইয়াছে। এই কারখানা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বিদেশ হইতে সার আমদানী করা হইত—আর এখন ভারতে প্রস্তুত সার বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে।

তাঁত শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা—

গত ৪ঠা নভেম্বর মাদ্রাজ বিধান সভার অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক সরকারী প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে—পাড়যুক্ত ধুতি ও রঙীন শাড়ী বয়ন হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হউক। সমগ্র মাদ্রাজ রাষ্ট্রে প্রায় দেড় কোটি তাঁতী হস্তচালিত তাঁত শিল্পে নিযুক্ত আছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা দিলে মিল শিল্পের কোন ক্ষতি হইবে না—কারণ মিলের বস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন—পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালার তাঁতীরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—

গত ৯ই ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে এই পরিকল্পনায় ভারতের উন্নতির জন্য মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ঐ টাকার শতকরা ৬০ ভাগ ভারতরাষ্ট্র সরবরাহ করিবেন। দামোদর পরিকল্পনায় বিহারের সহিত পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হইবে বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ফরক্কা বাঁধের কার্য্যের হিসাব এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে স্থান লাভ না করায় পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রই বিশেষ দুঃখিত হইবেন। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় বীরভূম অঞ্চল কতক পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবে—কিন্তু ফরক্কা বাঁধ না হইলে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা জেলার কোন সেচ-কার্য্যকেই স্থায়ী করা সম্ভব হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ বর্ত্তমানে ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে—তাহা একত্র করিতেও ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ বিশেষ প্রয়োজন।

হা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ই। আমাদের বিশ্বাস, পরিকল্পনার মালিকগণ সত্বর াহাদের এই ভ্রম সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উহার প্রতিকারে নোযোগী হইবেন।

ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান—

রাষ্ট্র সংঘের বৈঠকে যাইয়া ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে কাশ্মীর মস্যা সমাধানের জন্য যে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব উপস্থিত করা য়াছে, তাহা ভারত-রাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করিবে। কারণ কলেই স্বীকার করেন যে পাকিস্তান বে-আইনিভাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বহু স্থান দখল করিয়া আছে ও সে সকল স্থানে বিপ্লব সৃষ্টি করিতেছে—সে সকল স্থান হইতে পাকিস্তানীদিগকে তাড়াইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। রাষ্ট্র-সংঘের সদস্যরা যদি দৃঢ়ভাবে ও সাহসের সহিত পাকিস্তানের এই অন্যায় কার্য্যের জন্য পাকিস্তানকে দোষী সাব্যস্ত না করেন, তবে ভারতরাষ্ট্র কেন রাষ্ট্র-সংঘের সালিশ মানিবে। শুধু জাম্মু ও কাশ্মীরে নহে, পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গেও পাকিস্তানীরা বে-আইনিভাবে ভারতের জমি দখল করিয়া আছে—এ অবস্থায় রাষ্ট্র-সংঘ কিছু না করিলে ভারত-রাষ্ট্র কি তাহার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইবে না ?

ভারতীয় পাঞ্জাবে পাকিস্থানী—

পূর্ব-পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার ২টি স্থান ও অমৃতসর জেলার ১টি স্থান—মোট ১১ বর্গ মাইল পরিমিত ভারতীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানী সৈন্যরা জোর করিয়া দখল করিয়াছে—দখল করার সময় যথাক্রমে (১) ১৯৫১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী (২) ১৯৫২ সালের ২৬শে মার্চ ও (৩) ১৯৫২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। উভয় রাষ্ট্রে এ বিষয়ে আপোষের চেষ্টা করিয়া কোন ফল হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ঐরূপ কয়টি স্থান যে পাকিস্তানীরা বলপূর্বক দখল করিয়া লইয়াছে, তাহার হিসাব আমরা জানি না। এই সকল দখল হইতে ভারত রাষ্ট্রের কর্তারা যদি তাঁহাদের জমী উদ্ধার না করেন বা করিতে না পারেন, তবে তাহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে কি শ্রীনেহরু প্রমুখ নেতাদের কিছু করিবার নাই ?

যাদুকর এ-সি-সরকার—

তরুণ যাদুকর এ-সি-সরকার সম্প্রতি বিহারের রাজ্যপাল ভবনে অপূর্ব্ব যাদু কৌশল প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ইনি যাদুসম্রাট পি-সি সরকারের সহোদর। ইনি অল্পদিনের মধ্যে যাদুবিদ্যায় বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। রাজ্যপাল ভবনে যে খেলা ইনি দেখান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রাজ্যপাল বাহাদুরের হীরার আংটিটিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে নীলায় রূপান্তরিত করা। অবশ্য

যাদুকর এ-সি-সরকার

পরক্ষণেই উহা পূর্ব্ববৎ হীরার রূপ পরিগ্রহ করে। এই অদ্ভুত যাদু কৌশলকে বিহারের রাজ্যপাল অসামান্য যাদু কৌশল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই তরুণ যাদুকরের উন্নতি কামনা করি।

পৃথক অন্ধ্র রাজ্য গঠন—

মাদ্রাজ রাজ্যে ৪টি ভাষাভাষী লোক বাস করে—(১) তামিল (২) তেলেগু (৩) মালায়ালাম ও (৪) কানাড়ী। তেলেগুভাষাভাষী অঞ্চল অন্ধ্র দেশ বলিয়া পরিচিত—উহাই মাদ্রাজ রাজ্যের সর্ববৃহৎ অংশ। ঐ অংশটিকে একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত করার জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন হইতেছিল—সম্প্রতি ভারত সরকার এ বিষয়ে সম্মতি দান করিয়াছেন—তবে মাদ্রাজ সহরকে অন্ধ্র রাজ্যের মধ্যে দেওয়া হইবে না। মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীও স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠন প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন—তিনিও মাদ্রাজ সহর বাদ দিতে অন্ধ্রবাসীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই নূতন রাজ্য-গঠন প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ সম্মত হওয়ায় ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরাও তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইবেন।

কুৎসা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রুশ গল্প : অন্তেন শেকভ)

সার্জি কাপিতোনিচ্‌ আখিনেইভ···স্কুলে লিপি-লিখনের টীচার। তাঁর কন্যা নাতালিয়া। কন্যা নাতালিয়ার তিনি বিবাহ দিয়েছেন ভূগোল আর ইতিহাসের টীচার আইভান পেত্রোভিচ লোশাদিনিখের সঙ্গে।

বিবাহের ভোজ চলেছে সমারোহে—নর-নারীর ভিড়। হল-ঘরে নাচ চলেছে, গান চলেছে। ক্লাব থেকে ওয়েটার ভাড়া করে আনা হয়েছে। তারা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে ভোজ্য আর পানীয়ের পাত্র নিয়ে। কলরবে-কোলাহলে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। সামনের পথে লোকজনের ভিড়···সামাজিক অবস্থা-বৈগুণ্যে তাদের এ আসরে প্রবেশ নিষেধ—বন্ধ সার্শির ভিতর দিয়ে তারা দেখছে ঘরের মধ্যে নাচের বাহার।

রাত প্রায় বারোটা···কর্তা আখিনেইভ শ্রান্ত···তিনি এলেন রান্নাঘরে সন্ধান নিতে—খাবার-দাবার তৈরী হলো কিনা? রান্নাঘর···মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত ধোঁয়ায় ভর্ত্তি··· সে-ধোঁয়ায় রান্না মাংসর গন্ধ···ডুটো টেবিলের উপর বেশ আর্টিষ্টিক কেতায় সাজানো নানা রকমের রান্না এবং পানীয়ের পাত্র। পাচিকা মার্ফা···মার্ফা মোটা-সোটা প্রৌঢ়-বয়সী···মুখখানা সিঁদুরের মতো রাঙা···সে সাজাচ্ছে খাবার-দাবার।

ছু-হাত রগড়ে ঠোঁট কোচলে আখিনেইভ বললেন মার্ফাকে—খাশা গন্ধ বেরিয়েছে, মার্ফা! ইচ্ছা হচ্ছে, গোটা রান্নাঘরটাকে খেয়ে ফেলি।···ভালো কথা—মাছের ষ্টার্জন দে তো খানিকটা, চেখে দেখি! কোণের বেঞ্চের উপর থেকে তেল-মাখা পুরোনো একশীট খবরের কাগজ তুললেন—কাগজের নীচে মস্ত ডিশ, ডিশের উপরে টিপির মতো রান্না মাছ—মাছের গায়ে তেল, ঘী, মশলা জব-জব করছে··· আখিনেইভ এগিয়ে এসে দেখলেন···মুখে লালা···ছুচোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। আখিনেইভ বললেন—উঁহু···হাত নোংরা করবো না। আমি ঝুঁকে বসি—বসে হাঁ করি—তুই আমার মুখে দে চামচেয় করে ফেলে!

মার্ফা তাই করলো···আখিনেইভ খেলেন···তার পর ঠোঁট ছুটো চাটতে লাগলেন চুক্‌-চুক্‌ শব্দে···

ঠোঁট চাটতে চাটতে তিনি এলেন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে···

রান্নাঘরের সামনে প্যাসেজ···সেখানে কজন ভদ্রলোক বসে গল্প গুজব করছেন; তাঁদের ভিতর থেকে এ্যাসিষ্টেণ্ট টীচার ডানকিন বলে উঠলো—আখিনেইভের পানে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে···ব্যাপার কি? এঁ্যা—চুমুর শব্দ···চুক্‌-চুক্‌! কার অধরে চুম্বন করে এলে?

কথা শুনে আখিনেইভ ভাবলেন···রহস্য! তিনিও রহস্য করে বললেন—ভারী মিষ্টি চুমু হে!

—বটে! বটে! বলে ডানকিন এলেন রান্নাঘরের দরজার সামনে—উঁকি দিয়ে দেখেন, রান্নাঘরে মার্ফা একা···

ডানকিন বললেন—আরে···সার্জি কাপিতোনিচ···বুড়ো সালিক···মার্ফার সঙ্গে গোপনে প্রেম করছিলে···মার্ফার চুমু!

আখিনেইভ তাকালেন সকলের দিকে। সকলে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে···আখিনেইভ বললেন—কি যে বলো, ছি! চুমু খাবো কি! মাছ···মাছ···ষ্টার্জন কেমন হলো, চেখে দেখলুম। টাকনা! টাকনা!

—মাছের টাকনা! বটে! ডানকিন বললেন—ও কথা আর যাকে হয় বলো গে দাদা—চুমুর শব্দ স্পষ্ট শুনেছি আমি···এই স্বকর্ণে!

—এ কি রসিকতা! শেষে মার্ফা! আর মানুষ ছিল না পৃথিবীতে? আখিনেইভ করলেন মন্তব্য।

ডানকিন বললেন—চোরের রাত্রি-বাসই লাভ! জানো তো কথায় বলে, ঝড়ের সময় যে-কোনো বন্দর! হা হা হা!

বিরক্ত হয়ে আখিনেইভ সরে এলেন হল-ঘরে··· মনে দুশ্চিন্তা—হতভাগার এ বদ্‌ রসিকতায়···কী বিভ্রাট না ঘটে!

হল-ঘরে এলেন ভয়ে ভয়ে···এসে দেখেন ডানকিন···

ঘ্যানোর ধারে দাঁড়িয়ে—পাশে ইন্সপেক্টর···মাথা ঝুঁকিয়ে ডানকিন কি বলছেন ইন্সপেক্টারকে চুপি-চুপি···

আখিনেইভ ভাবলেন, নিশ্চয় ঐ কথা! ইন্সপেক্টর বিশ্বাস করেছে···হুঁ! না হলে ভুরু দুটো কপালে তুলে এমন হাসবে কেন। লোকের কুচ্ছো পেলে মানুষ যেমন হাসে? নাঃ—দেখছি বুঝিয়ে আমাকে বলতে হবে! সকলকে বলবো! না হলে মুখে-মুখে এ মিথ্যা গল্প রটলে··· এ বয়সে···ছি, ছি!

আখিনেইভ কি ভাবলেন—তার পর এলেন পদেকয়ের কাছে···

পদেকয়কে বললেন—একটু আগে গ্যাখোনা···আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলুম—খাবার-দাবারের দেরী কত খোঁজ নিতে···আর জানো তো—মাছটা আমি কী ভালোবাসি··· তা একটু ষ্টার্জন নিয়ে চেখে দেখেছি—রসালো তো··· টাকনা দিয়েছি···জিভ চাটতে-চাটতে রান্নাঘর থেকে বেরুতে দেখি, সামনে ডানকিন···তার সঙ্গে আরো কজন। আমাকে জিভ চাটতে দেখে ডানকিন বলে উঠলো—আরে··· কাকে চুমু খেয়ে এলে···চুক্-চুক্ শব্দ! উঁকি মারলো রান্নাঘরে—ঘরে শুধু মার্ফা! তাকে দেখে ডানকিন বললে— মার্ফাকে চুমু! বোঝো কতখানি ইতর এ রসিকতা, চুমু খাবো আমি মার্ফাকে! একটা কুৎসিত কদাকার ধুমসী মাগী! আরে থু-থু-থু···ডানকিন, কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, ভাই!

পদেকয়ের পাশে ছিল তারানতুলাভ—তার কানেও কথাটা পৌঁছুলো। তারানতুলাভ বললে—কে রটাচ্ছে?

—ডানকিন!

এমনিভাবে এ গল্প আখিনেইভ আবার বললেন আর একজনকে। বললেন—এমন অসম্ভব কথা কেউ বিশ্বাস করে কখনো? ভাবো···কি বদ্ ইয়ার্কি! আরে, পথে লেড়ি কুত্তো নেই? মার্ফাকে চুমু খাওয়ার চেয়ে পথের লেড়ি কুত্তার মুখে চুমু খাওয়া ঢের ভালো!

অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা নেই! ঐ মাজদা···আখিনেইভের পানে কেমন এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! ওকেও তাহলে বলেছে ডানকিন!

মনে অস্বস্তি···আখিনেইভ বললেন—এই যে মাজদা! ডানকিন তোমাকেও বলেছে···নিশ্চয়! গ্যাখো দিকিনি, কি রকম গেঁইয়া! এমন তামাসাও মানুষ করে! যদি কেউভাবে, সত্যই আমি···

সবিস্ময়ে মাজদা বললেন—কি? কি কথা? সত্যই তুমি কী···

আখিনেইভ বললেন—তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে ঐ ভুঁদি রাঁধুনি মার্ফাকে···মাহিনা-করা দাসী···ঐ তার চেহারা···তাকে আমি চুমু খেয়েছি রান্নাঘরে ঢুকে? মার্ফা সেখানে ছিল একা! বলো? কি দুঃখে—কিসের অভাবে ···আমার স্ত্রী রয়েছেন—তাঁর বয়স এখনো—বোঝো একবার! আমাকে নিয়ে এমন কদর্য্য রসিকতা···আমাকে আহম্মক বানিয়ে তুলেছে!

মাজদা ভালো করে কথাগুলো শোনেনি···তাছাড়া হঠাৎ এমন খাপছাড়ামতো···মাজদা প্রশ্ন করলে—কে কাকে আহম্মক বানিয়ে তুলেছে?

—কে আবার? ঐ ডানকিন। সকলকে বলে বেড়াচ্ছে রান্নাঘরে ঢুকে মার্ফা···আমার রাঁধুনি-মাগী মার্ফা—তাকে আমি চুমু খেয়েছি!

এমনিভাবে একজন-একজন করে অভ্যাগতদের সকলের কাছে আখিনেইভের এই নালিশ! আধ ঘণ্টার মধ্যে অতিথিরা সকলে শুনলো ডানকিন কি গল্প বলে বেড়াচ্ছে আখিনেইভের সম্বন্ধে।

সকলকে বলেও আখিনেইভের অস্বস্তি ঘোচে না! তিনি ভাবলেন, এখন বলুক ডানকিন সকলকে···যত পারে বলতে! আমি নিজে বলে দিলুম তো! ডানকিন বলবার জন্য মুখ খুললেই এরা তাকে থামিয়ে দেবে'খন—ডানকিনকে বলবে —থামো, থামো—ও গল্প আমরা শুনেছি—জানি।

ভাবতে ভাবতে মনের ভাব এমন হলো—যেন নির্বিকার! ভাবলেন,···বলে, বলুক। যার খুশী বিশ্বাস করুক—বয়ে গেছে!

আখিনেইভ অবিরাম সুরার পাত্র তোলেন মুখে—সুরার নেশায় মনকে ডুবিয়ে রাখতে। না, ও-চিন্তা আর নয়!

নেশা এমন হলো যে হ্রস্ব-দীর্ঘ বিচার-বোধ রইলো না শেষে।

ভোজের পর অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। মেয়ে নাতালিয়া, জামাই আইভান—দুজনকে আখিনেইভ পাঠালেন

জাদের ঘরে—বললেন—ঢের রাত হয়েছে। যাও, শোও গে! তার পর নিজে গেলেন শুতে। শোবামাত্র ঘুম…সরল শিশুর মতো ঘুম—চিন্তাবিহীন স্বপ্নবিহীন বিঘ্নবিহীন বিচার-বিহীন ঘুম।

কিন্তু হায়রে—মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন। মানুষের রসনায় যে-বিষ আছে, সে বিষ যদি ক্ষরিত হয়…

আখিনেইভের অতখানি কৌশল ব্যর্থ হলো!

এক হপ্তা পরে…সেদিন বুধবার…ক্লাশে থার্ড লেশন শেষ হবার পর টীচারদের ঘরে দাঁড়িয়ে ছাত্র ভিশ্-ইয়েকিনের অনাচারের সম্বন্ধে আখিনেইভ আলোচনা করছেন—তখন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর এসে আখিনেইভকে ডাকলেন একান্তে। ডেকে আখিনেইভকে তিনি বললেন—শোনো, সার্জি কাপিনো'তিনা—মানে, কিছু মনে করো না…আমি নিজে থেকে এ-কথা বলচি না—আমার কর্ত্তব্য পালন। সহরে সবার মুখে শুনছি ভারী নোংরা কথা। তোমার বাড়ীর মাহিনা-করা রাঁধুনি মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে তোমার নাকি ভয়ানক রকম অন্তরঙ্গতা! দুজনে তোমরা একপ্রাণ! তা যাক গে, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। বাড়ীতে যা খুশী করতে পারো… মানুষের কত রকমের দুর্বলতা থাকে- এবং যার যেমন রুচি! কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করা—বা নির্লজ্জের মতো… মানে, গোপন করা নয়- এতে স্কুলের দুর্নাম…ক্ষতি। এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো বাড়াবাড়ি করো না! ভুলে যেয়ো না তুমি স্কুলের টীচার…ছাত্রছাত্রীরা টীচারকে আদর্শ-মানুষ বলে মানে। তোমার এ চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য অনেক গার্জেন এ-স্কুলে ছেলে-মেয়ে পাঠানো বন্ধ করতে পারেন… তোমার চাকরি যেতে পারে।

আখিনেইভ নিঃশব্দে এ কথা শুনলেন…শুনে নিমেষে যেন পাথর! এক ঝাঁক মৌমাছি যেন তাঁর অঙ্গে অঙ্গে হুল ফুটোচ্ছে…তাঁর মনে যেন এক-বালতি ফুটন্ত জল কে ঢেলে দেছে—এখন জ্বালা মনে এবং এ জ্বালা বয়ে আখিনেইভ বাড়ী ফিরলেন ছুটীর পর। পথে চলার সময় মনে হচ্ছিল যেন পচা নর্দ্দামায় পড়ে পাঁক মেখে পথে চলেছেন! বুকখানার মধ্যে দারুণ ছমছমানি—বাড়ীতে না জানি কি রকম অভ্যর্থনা হবে!

বাড়ী এলেন। কথা কন্ না—কারো ধারে ঘেঁষেন না—নির্লিপ্ত নির্বিকার। আখিনেইভের খাবার টেবিলে…স্ত্রী বললেন—তোমার কি হয়েছে বলো তো? কিছু মুখে দিচ্ছ না! অথচ যে সব ডিশ তুমি ভালোবাসো—আজ ব্যবস্থা হয়েছে সেই সব।…কি ভাবছো গা—সত্যি?

স্ত্রীর কণ্ঠে দরদ—মমতা।

আখিনেইভ কোনো কথা বললেন না—বলতে পারলেন না! কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরে আছে!

স্ত্রী বললেন—কথা নেই যে?…ভাবছো চুপ করে থেকে দরদ কাড়াবে। কার কথা ভাবছো…ও পাড়ার লিভিয়া? না, কুরোশোর বাড়ীর দাসী মার্চিশকা? উঁ…ডুবে ডুবে জল খাও—আমি ভাবি, ভালো মানুষ। ভাগ্যে পাঁচজনে আমার চোখ খুলে দেছে!…

কথাগুলো বলতে বলতে স্ত্রীর মেজাজ উঠলো তেতে …আখিনেইভের গালে তিনি মারলেন সবলে এক চড়।

আখিনেইভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন…মাথা ঘুরছে…পা-দুখানা টলছে…মাথায় টুপি নেই…গায়ে কোট নেই…চললেন ডানকিনের বাড়ীতে।

ডানকিন বাড়ীতে ছিল। বললে,—কি খবর আখিনেইভ?

আখিনেইভ হুঙ্কার তুললেন—রাস্কেল! পৃথিবীর সকলের সামনে আমার নামে এমন করে কাদা ছিটুলে কেন? কেন আমার নামে এমন মিথ্যা অপবাদ? এমন কদর্য্য কুৎসা? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি?

ডানকিন বললে—বাঃ! অবাক করলে আখিনেইভ! আমি কাকে কি নোংরা কথা বলেছি তোমার নামে?

বলোনি সকলকে যে আমি মার্ফাকে চুমু খেয়েছি? বলো…বলো—বলো নি তুমি?

ডানকিন অবাক! ভাবতে লাগলো—মনের গহনে। কিছু মনে পড়ে না! ডানকিন বললে—দোহাই আখিনেইভ, যে-দিব্যি করতে বলো—সেই দিব্যি করে আমি বলছি, কাকেও আমি এ কথা বলিনি…এমন কথা আমার মুখ থেকে যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়! বিশ্বাস করো তুমি!

ডানকিনের স্বরে সত্যের দৃঢ়তা—কাপট্য নেই…মিথ্যার বাষ্পাভাস নেই!

কে তাহলে এমন মিথ্যা রটালে আমার নামে? দুনিয়ায় কারো শত্রুতা করিনি আমি!

আকুল কণ্ঠে আখিনেইভ বললেন—এ কথা।

অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারলেন না। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—কে? কে আমার নামে এ সব মিথ্যা কুৎসা…?

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ১-০ গোলে পশ্চিম বাঙলাকে হারিয়ে 'সন্তোষ ট্রফি' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রতিযোগিতার প্রথম বছর ১৯৪০ সাল থেকেই প্রতি বছর বাঙলা দেশ ফাইনালে উঠেছে এবং গত নয় বছরের খেলায় (১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৮ এই তিন বছর খেলা বন্ধ ছিল) বাঙ্গলা দেশ মোট ৬ বার 'সন্তোষ ট্রফি' পেয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে বাঙলা দেশ পর্য্যায়ক্রমে চারবার 'সন্তোষ ট্রফি' পায়। বাঙলা দেশ ছাড়া মাত্র দু'টি প্রদেশ—দিল্লী (১৯৪৫ সালে) এবং মহীশূর (১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে) সন্তোষ ট্রফি জয়লাভের গৌরবলাভ করেছে। মহীশূর ফাইনালে যায়—ত্রিবাঙ্কুরকে ৪-১ গোলে, বোম্বাইয়ের সঙ্গে চারদিন খেলা ড্র ক'রে পঞ্চমদিনে ২-১ গোলে, সেমি-ফাইনালে উড়িষ্যাকে ২-৪ গোলে হারিয়ে।

বাঙলা দল ফাইনালে যায়—মাদ্রাজের সঙ্গে দু'দিন খেলা ড্র ক'রে ৩য় দিনে মাত্র ১-০ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে দিল্লীকে ৪-০ গোলে হারিয়ে।

১৯৪৬ সালের ফাইনালে মহীশূর দল এই অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম মাঠেই বাঙলা দলকে হারিয়ে ছিল। ঐ বছরের খেলায় এ বছরের বাঙলা দলের আমেদ, এণ্টনী এবং রমণ মহীশূর দলের পক্ষে খেলেছিলেন। আলোচ্য বছরের ফাইনালে মহীশূর দলের নিজামুদ্দিন গোল করেন। বাঙলা আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা বল-আদান-প্রদানে দক্ষতার পরিচয় দিলেও গোল মুখে সময়মত সট করতে পারেন নি। সারা মাঠে বাঙলা দলের অধিনায়ক মান্না আত্মরক্ষামূলক খেলা দর্শকদের চমৎকৃত করে, তাঁর ঐ খেলার জন্যই মহীশূর দল একটার বেশী গোল করতে পারে নি।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ১০৬ (পি রায় ৩০। ফজল মহমুদ ৫২ রানে ৫ উইঃ) ও **১৮২** (অমরনাথ নট আউট ৬১, ডি কে গাইকোয়াড ও উমীগড় ৩২। ফজল মহমুদ ৪২ রানে ৭ উইকেট)

পাকিস্তান ঃ ৩৩১ নাজার মহম্মদ ১২৪, মাকসুদ আমেদ ৪১। গুলাম আমেদ ৮৩ রানে এবং নয়াদল ৯৭ রানে ৩ উইকেট)

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে ভারতবর্ষকে হারিয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। খেলোয়াড় আহত ও অসুস্থ হওয়ার ফলে ২য় টেষ্টে উভয় দলই শক্তিশালী দল গঠন করতে পারে নি। ভারতবর্ষের পক্ষে হাজারে, মানকড় এবং অধিকারী আহত এবং অসুস্থ হওয়ার কারণে খেলেন নি। প্রথম টেষ্টের খেলোয়াড়দের মধ্যে পাকিস্তানের দু'জন খেলেন নি—খান মহম্মদ এবং ইসরার আলী।

টসে জিতে ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট ক'রে ১ম ইনিংসে মাত্র ১০৬ রান তুলে। সর্ব্বোচ্চ রান, রায়ের ৩০। ফজল মহমদ ৫০ রানে ৫টা উইকেট পান। কোন উইকেট না হারিয়ে পাকিস্তান প্রথম দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ৭ রান করে।

দ্বিতীয় দিনে ৭ উইকেটে পাকিস্তানের ২৩৯ রান। ফলে পাকিস্তান ১৩৩ রানে এগিয়ে যায়। হানিফ মহম্মদ ৮৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হলে ১ম ইনিংসের খেলায় পাকিস্তান ২২৫ রানে এগিয়ে থাকে। ওপনিং ব্যাটসম্যান নাজার মহম্মদ ১২৪ রান নট আউট থাকেন। উভয় দলের টেষ্ট খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী।

ভারতবর্ষ ২২৫ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। হাতে খেলার সময় তখনও ৯½ ঘণ্টা। আশাবাদীরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করলেন—ভারতবর্ষ সাধারণতঃ দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলে থাকে। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনাতেই বিপর্যয় দেখা দিল। রায় দলের ৪ রানের মাথায় মাত্র ২ রান ক'রে আউট হলেন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১১৫ রান দাঁড়িয়েছে। অষ্টম উইকেটের জুটিতে অমরনাথ এবং জোসী প্রাণপণ ক'রে খেলতে লাগলেন। তাঁদের জুটিতে ৫৫ রান ওঠে। অমরনাথ ৫০ রান পূর্ণ করার পরই সেদিনের শেষ ওভারে মাহ্‌বীব ইলাহীর বলে জোসী ১৫ রান ক'রে এবং শেষ ব্যাট গুলাম আমেদ কোন রান না করেই কাচ তুলে আউট হ'ন। সেদিন আর নয়ানচাঁদের পক্ষে উইকেটে আসার সময় ছিল না; অমরনাথ ৫০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। হাতে মাত্র একটা উইকেট, পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের রানের থেকে তখনও ভারতীয় দল ১ম ও ২য় ইনিংসের রান মিলিয়ে ৫৫ রান পিছনে পড়ে আছে।

চতুর্থ দিনের ১৫ মিনিটের খেলায় শেষ উইকেট পড়ে যায়, ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৮২ রানে শেষ হয়। লালা অমরনাথ ৬১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। পাকিস্তানের লেগ-ব্রেক বোলার ফজল মহমুদ দুই ইনিংসে ৯২ রান দিয়ে ১২টা উইকেট পান। ভারতবর্ষের মত অভিজ্ঞ শক্তিশালী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে তরুণ পাকিস্তানদলের এ জয়লাভ যে খুবই গৌরবের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্কোর-বোর্ড ঃ

পাকিস্তান ঃ ১৮৬ (ওয়াকার হোসেন ৮১। ৪২ রানে ২ উইকেট) ও ২৪২ (হানিফ মহম্মদ ৯৬, ওয়াকার হোসেন ৬৫। মানকড় ৭২ রানে ৫ এবং গুপ্তে ৭৭ রানে ৩)

ভারতবর্ষ ঃ ৩৮৭ (৪ উইঃ ডিক্লেঃ হাজারে নট আউট ১৪৬, উমরীগড় ১০২, মানকড় ৪১। মহম্মদ হোসেন ১২১ রানে ৩ উইকেট) ও ৪৫ (কোন উইকেট না পড়ে মানকড় নট আউট ৩৫, আপ্তে নট আউট ১০)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্টে ভারতবর্ষ ১০ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ২—১ টেষ্ট ম্যাচে এগিয়ে যায়। ১ম টেষ্টে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৭০ রানে জয়লাভ করে কিন্তু ২য় টেষ্টে পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে জয়লাভ করায় ফলাফল তখন সমান হয়। ৩য় টেষ্টে পাকিস্তান হেরে গেলেও ২য় ইনিংসে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ইনিংস পরাজয় থেকে দলকে রক্ষা করেছে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা থেকে তারা ২০১ রান পিছনে পড়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দলের খেলার সূচনা ভাল হয় না; কোন রাণ উঠবার আগেই ১টা উইকেট পড়ে যায়। ২য় উইকেটে হানিফ মহম্মদ এবং ওয়াকার হোসেন জুটি বেঁধে ৫½ ঘণ্টা খেলে দলের ১৬৫ তুলে দেন। হানিফ মহম্মদ মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরী করা থেকে বঞ্চিত হ'ন। ওয়াকার হোসেন দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৮১ ও ৬৫ রান করেন।

মানকড়ের 'ডবল' সম্মান ঃ

পাকিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের ২য় ইনিংসে ওয়াকার হোসেনের উইকেট পেয়ে ভিনু মানকড় সরকারী টেষ্ট খেলায় তাঁর হাজার রান এবং একশত উইকেট পূর্ণ করেন এবং সেই সঙ্গে কম সংখ্যক টেষ্ট খেলে এই ডবল সম্মান পাওয়ার দরুণ বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মাত্র পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড় সরকারী টেষ্ট খেলায় এই 'ডবল' (হাজার রান এবং একশত উইকেট) সম্মান লাভ করেছেন। ইংলণ্ডের দু'জন উইলফ্রেড রোড্‌স এবং মরিস টেট্, অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন এম এ নোবল এবং জর্জ্জ গিফেন এবং ভারতবর্ষের ভিনু মানকড়। এই 'ডবল' সম্মান পেতে এঁদের পাঁচজনকে

ভিনু মানকড় (ভারতবর্ষ) ২৩টি, এম এ নোবল অষ্ট্রেলিয়া) ২৭টি, জর্জ গিফেন (অষ্ট্রেলিয়া) ৩০টি,

ভিনু মানকড়

মরিস টেট্ (ইংলণ্ড) ৩৩টি এবং উইলফ্রেড রোড্স (ইংলণ্ড) ৪৩টি।

লর্ডসে মানকড়ের অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পর এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করায় মানকড়কে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর একমাত্র নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেন অষ্ট্রেলিয়ার কেথ মিলার। এই দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তা নির্ণয় করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলের প্রবীণ সমজদার এবং ধুরন্ধর সমালোচকগণ সমস্যায় পড়েছেন—একদলের মতে মানকড় এবং অপরদলের মতে মিলার। ভোট গণনা দ্বারা এই মীমাংসার চেষ্টা অবিশ্যি এখনও হয় নি।

বিশ্ব-অপেশাদার বিলিয়ার্ডস ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-অপেশাদার বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের লেসলী ড্রিফিল্ড অপরাজেয় অবস্থায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ান বব্ মার্শেল পেয়েছেন ২য় স্থান এবং ভারতবর্ষের চন্দ্র হিরজী ৩য় স্থান। মোট পাঁচটি দেশ—ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, স্কটল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

চতুর্থ টেষ্ট ঃ

পাকিস্তান ঃ ৩৪৪ (আব্দুল কারদার ৭৯, জুলফিকার আমেদ ৬৩)

ভারতবর্ষ ঃ ১৭৫ (৬ইঃ অসমাপ্ত ইনিংস। উমরীগড় ৬২ আপ্তে ৪২।)

মাদ্রাজের ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ বারিপাতের দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছে। খেলার ৩য় এবং ৪র্থ দিনে খেলা সম্ভব হয় নি ফলে খেলাটি ড্র গেছে।

আমি যাযাবর

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গৃহহারা আমি বেদুইন।
পথেরে বেসেছি ভালো, পথে তাই কেটে যায় দিন।
মুক্তিপথ চলে গেছে দিক হতে দিগন্তর পানে—
শেষ তার কোথায় কে জানে!
ঊর্দ্ধে নীলমহাকাশ, শুভ্র মেঘ ভেসে চলে যায়
ফাল্গুনের পাখী-ডাকা সকাল বেলায়।

নীলকণ্ঠ উড়িতেছে—ডানাদুটী রঙীন সুন্দর!
বেণুবনে কপোতের স্বর।
ফিঙে নাচে বাবলার ডালে,
দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ—দিক্‌চক্রবালে
আকাশে মাটিতে চলে প্রেমগুঞ্জরণ
করে বিচরণ

শ্যামল প্রান্তরে যত গ্রাম্য পশুপাল।
তরুচ্ছায়ে খেলা করে নগ্নকায় পল্লীর রাখাল।
শিশু গাছে টেয়াপাখী করে কলরব।
বাতাবী পুষ্পের মন-মাতানো সৌরভ
ভেসে আসে প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে।
কোথাও আপন মনে
ডাকে পিক আম্রকুঞ্জে। কারে ডাকে অমন করিয়া?
বিশ্বের বিরহী যত যুগে যুগে প্রিয়ারে স্মরিয়া
ডেকেছে আকুলকণ্ঠে, কত দূরে? তুমি কত দূরে?
তাদের সবার কান্না বসন্তের কোকিলের সুরে!
মুক্ত পথ চলিয়াছে দূর হতে সুদূরের পানে।
চলিয়াছি সে পথের টানে
জানা হ'তে অজানায়। আমি যাযাবর।
রৌদ্র দীপ্ত আসে দ্বিপ্রহর;
তরুর ছায়ায় বসি জুড়াই শরীর।
কাকচক্ষু জলধারা বহে 'জলাঙ্গী'র।
কুলুকুলু কুলুকুলু কুলুকুলু তানে
নিশিদিন মধু ঢালে কানে।
স্নান করি জলে তার জুড়ায় জীবন,
উড়াইয়া যায় প্রাণ মন।
ঝুলি হ'তে বার করি পথে পাওয়া আহার্য্যের পুঁজি,
অমৃতের স্বাদ পাই খুঁজি,
তার পর মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম;
কোনখানে কেহ নাই, দূরে দূরে দেখা যায় গ্রাম।
আমি আর নিস্তব্ধ দুপুর,
কানে আসে 'জলাঙ্গী'র কুলুকুলু সুমধুর স্বর
বউ-কথা-কও পাখী ডাকিছে কোথায়!
পাতায় পাতায়
জাগায়ে মর্ম্মরধ্বনি বহিছে বাতাস,
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশ।
স্বপ্ন দেখি, আমি যেন ধরিত্রীর মানব প্রথম,
বনচারী একাকী আদম
সৃষ্টির প্রত্যুষে শুয়ে স্বর্গের উদ্যানে।
ভ্রমর গুঞ্জন আসে কানে।
দিন আসে হাতে নিয়ে সূর্য্যের মশাল,
তারাভরা আসে রাত্রিকাল।
আপনারে নিয়ে মোর কেটে যায় দিবস-শর্ব্বরী,
সাথী শুধু প্রকৃতি সুন্দরী—
আর কেহ নয়।
নিষ্পাপ উলঙ্গ আমি একা একা ফিরি বনময়।
স্বপ্ন ভেঙে যায়—দেখি অপরাহ্ণ আকাশে তপন
রশ্মিধারা করে বিকীরণ।
বার করি কবিতার পুঁথি—
মর্ম্মের মাঝারে পাই স্বর্গীয় রসের অনুভূতি।
সে অনুভূতিতে পূর্ণ করি প্রাণমন
সুরু করি পথপর্য্যটন।
দিনান্তে মাঠের প্রান্তে ডুবে যায় জবারক্ত রবি—
চেয়ে চেয়ে দেখি তার ছবি।
ধূলি উড়াইয়া ফিরে গোধন পল্লীর,
সায়াহ্নের আকাশে পাখীর
উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে শেষের কাকলি।
এখনই উঠিবে দীপ জ্বলি।
কুটিরে কুটিরে।
আকাশের বুক চিরে
বাহিরিয়া আসিবে তারারা।
পুনঃ চলি আমি গৃহ-হারা।
কোথায় মিলিবে মোর রজনীর বিশ্রামের ঘর—
নাহি জানি, আমি যাযাবর।

সাহিত্য-সংবাদ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঘ—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত মানসোল্লাস বার্তিক

স্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরী

'দক্ষিণামূর্তি স্তব' ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিত সুপরিচিত স্তোত্র। ইহা গুরুরূপী ব্রহ্মের উপাসনার একটি উপায়। দক্ষিণামূর্তি—বিশ্বগুরু শিবের মূর্তি বিশেষ। ইনি ত্রিনেত্র ও রজতবর্ণ, হস্তে মুক্তামরী জপমালা, অমৃতকুম্ভ, বিদ্যা ও জ্ঞান বা তত্ত্বমুদ্রা, কক্ষে সর্প, ললাটে চন্দ্র ও অঙ্গে নানাবিধ বিভূষণ। নবরত্ন ও মণিমণ্ডিত বটবৃক্ষের মূলে বিরাজিত। শাস্ত্রে আছে (শিব) শঙ্করের কাছে পরম জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিবে। দক্ষিণামূর্তি শব্দের সংস্কৃত কোষগ্রন্থে বিভিন্ন অর্থ আছে, তন্মধ্যে দাক্ষিণ্যযুক্ত, অনুকূল অর্থও আছে, দক্ষিণ-মুখে বিরাজিত অপর অর্থ। কথিত আছে পরমজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই স্তব রচনা করিয়া গুরু বন্দনা করেন। বস্তুতঃ ইহা একটি পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সমস্ত ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ও অনুধাবন করিবার সহজ উপায় ও সুষ্ঠু পন্থা।

উক্ত স্তবটি দশটি মাত্র শ্লোকে বেদান্ত রচনা। গম্ভীর বেদান্ত বিষয় শুধু মাত্র সরলার্থ দ্বারা সাধারণ পাঠকের নিকট পরিস্ফুট ও অনুধাবনযোগ্য হয় না, এজন্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধ হইয়াছিল এবং মানসোল্লাস বার্তিক নামে রচিত হইয়া বিদ্বৎসমাজে পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই স্তবটির অনুবাদ ভারতীয় বহু ভাষায় প্রচারিত, কিন্তু বার্তিকটির অনুবাদ বঙ্গীয় বা অপর কোনও প্রান্তীয় ভাষায় আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই; তবে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রী মহাশয় নিজ টীকা টীপ্পনি ও মূল বার্তিক সহ এক ইংরাজী সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন। স্তবটীকে অনেকে দশশ্লোকীও বলেন; উহার যে বার্তিক আমরা পাই তাহা দৃষ্টে আমার বার বার মনে হইয়াছে যে আমার মত বেদান্তশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ জিজ্ঞাসুর জন্য ইহার অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন; মাতৃভাষার এই বহুমুখী প্রসারের দিনে এমন একখানি বঙ্গানুবাদ পাইবার আশা কি দুরাশা?

বার্তিকের অর্থজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে সংস্কৃত কোষ ও বাঙ্গালা অভিধানে যে উত্তর পাই তাহা এই—'উক্তানুক্ত দুরুক্তাদি চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে। তৎগ্রন্থং বার্তিকং প্রাহু বার্তিকজ্ঞ মনীষিণঃ॥' অর্থাৎ উক্ত, অনুক্ত, দুরুক্ত প্রভৃতির চিন্তা যে গ্রন্থে হইয়া থাকে বার্তিকবিদ্ মনীষিগণ তাহাকেই বার্তিক বলিয়া থাকেন। বাংলা অভিধানে অর্থ টীকা বিশেষ। উক্ত লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়—দুরূহ গ্রন্থ অনায়াসে বোধের জন্য বার্তিক-প্রণয়ন প্রাচীনকাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত এবং ভারতের প্রায় প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র বার্তিক দ্বারা সমৃদ্ধ—যেমন উদ্দোতকরের 'ন্যায়বার্তিক', পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বার্তিক, মীমাংসাদর্শনের উপর কুমারিলভট্টকৃত 'শ্লোক' ও 'তন্ত্র' বার্তিক। সুরেশ্বরাচার্য্য বেদান্তের অনেকগুলি বার্তিকগ্রন্থের প্রণেতা এবং সাধারণে যেমন ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকার নামে পরিচিত তেমনই তৎশিষ্য সুরেশ্বর বার্তিককার নামেই পরিকীর্তিত। আলোচ্য স্তবের বা দশশ্লোকীর ইনিই বার্তিককার অর্থাৎ স্তবের উক্তানুক্ত, দুরুক্ত বিষয়সমূহের চিন্তা ও স্পষ্টীকরণের জন্য এবং জ্ঞানপিপাসু, বেদান্তরস-পিপাসু ও জিজ্ঞাসুজনের তৃষ্ণা নিবারণ ও বোধসৌকর্য্যার্থ 'মানসোল্লাস' বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। সে আজ হইতে কত শত বৎসর অতীতের উল্লাস।

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য—শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য, শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য, শ্রীহস্তামলকাচার্য্য ও শ্রীতোটকাচার্য্য। পদ্মপাদাচার্য্যকৃত বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চপাদিকা এবং তৎগুরুকৃত প্রপঞ্চসার তন্ত্রের টীকা, সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ বার্তিক, সম্বন্ধবার্তিক, দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র বার্তিক, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি। হস্তা-মলকাচার্য্যকৃত একখানি হস্তামলকগ্রন্থ আছে যাহাতে মাত্র চৌদ্দটি শ্লোক এবং আচার্য্য শঙ্কর তাহার ভাষ্যকার। তোটকাচার্য্যের একটি মাত্র গুরুবন্দনা স্তব আছে, অপর গ্রন্থ নাই। দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রবার্তিক বা 'মানসোল্লাস' দশটি উল্লাসে (অধ্যায়) তিনশত সাতনটি শ্লোকে এবং অনুষ্টুপ ছন্দে পূর্ব্বোক্ত উক্তানুক্ত দুরুক্তাদি চিন্তন দ্বারা প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রচারক তাহা বহুজনবিদিত। তাঁহার গুরুর কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না, তবে 'একাদয়' গোবিন্দ ভগবৎপাদের নামে চলিত বোধহয় তাঁহারই কৃত। শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্যের প্রণীত মাণ্ডুক্যকারিকা অতিপ্রসিদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-প্রস্থানের মূল ধরা যাইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর আলোচ্য স্তোত্রে গুরুবন্দনা করিতে আত্মতত্ত্ব সংক্ষেপে অতি বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, বার্তিককার উহা আরও বিস্তার করিয়া এমন সুনিপুণভাবে বুঝাইয়াছেন যাহাতে মানসোল্লাস নাম সার্থক হইয়াছে, সেই সূত্রে তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মত ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। কাশ্মীরীয় অদ্বৈত শৈবাগমের সহিত শ্রীশঙ্কর ও তৎশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বিশেষ পরিচিত ছিলেন, স্তোত্র ও কারিকাতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। পূর্ণাহন্তা, ষটত্রিংশৎতত্ত্ব, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সামানাধিকরণ শিবাদ্বৈত মতের বৈশিষ্ট্য। আচার্য্যদ্বয় উহা একপ্রকার স্বমত বলিয়াই এই স্তোত্রে ও তদ্বার্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ভগবান সুরেশ্বরাচার্য্য আলোচ্য বার্তিকের রচয়িতা কি না, এবম্প্রকার সন্দেহ কেহ কেহ কদাচিৎ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বৃহদারণ্যক বার্তিকের রচনাশৈলী যেমন ভাবগম্ভীর তেমনই দার্শনিক সূক্ষ্মতাপূর্ণ—এমনটি মানসোল্লাস বার্তিকে দৃষ্ট হয় না! আমি যে সকল প্রমাণলব্ধে গ্রন্থখানি সুরেশ্বরের কৃত জানিয়াছি তাহা প্রকট করিলাম। ভবিষ্যতে বিদ্বান, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আরও বাস্তবিক তথ্য পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধন করিবেন আশা রাখি। গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন, তাহা পূর্ব্বকালীন দার্শনিকগণের নিজ নিজ গ্রন্থে আলোচ্য পুস্তকের অংশ উদ্ধৃতি হইতেই প্রমাণিত হয়। 'তার্কিক রক্ষা' গ্রন্থের প্রণেতা নৈয়ায়িক বরদরাজ বা বরদাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার উক্ত গ্রন্থের প্রমাণপ্রকরণে আলোচ্য বার্তিকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭।১৮ শ্লোক প্রামাণ্য রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং একাদশ শতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই গ্রন্থ বহুল প্রচার, পঠন ও পাঠন হইতেছিল এবং বিদ্বৎসমাজে ইহার বেশ প্রভাব ছিল তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ন্যায়ের এবং অপরাপর গ্রন্থেও ইহা হইতে উল্লেখ দেখা যায়—বাহুল্য বিবেচনায় একটিই লিখিলাম। আচার্য্য সুরেশ্বর ও তাঁহার গুরু একই সময়কার। আজকালকার অধিকাংশ বিদ্বানের মতে আচার্য্য শঙ্করের জন্মকাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়, যদিও পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'শঙ্কর ও রামানুজ'

গ্রন্থে বহু গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ; তাঁহার সম্পাদিত অপর গ্রন্থের ভূমিকাতে সুরেশ্বরের সময় ৬৭৫-৭৭৩ খৃষ্টাব্দ স্বীকার করিয়াছেন; যদি শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ ধরা যায় তাহা হইলেও সুরেশ্বরাচার্য্য মহারাজকে সমসাময়িক বলিলে ভুল হয় না; অতএব বার্তিকখানি ঐ সময়ের মধ্যে রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং একাদশ শতকের উদ্ধৃতি স্বভাবতঃ প্রমাণ। জার্মান পণ্ডিত ও সংস্কৃত গ্রন্থসূচিকাকার অফরেক্ট সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সংকলিত প্রসিদ্ধ ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালগোরামের মধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্যের তেরখানি পুস্তকের কথা লিখিয়াছেন ৫৯৩ পৃষ্ঠাতে, তাহার মধ্যে 'মানসোল্লাস বার্তিক' অন্যতম। এই বৃহৎ গ্রন্থসূচিমধ্যে আচার্য্য সুরেশ্বরের (একই) নামের আর কোন বেদান্তগ্রন্থকর্ত্তা পাই নাই। উক্ত জার্মান পণ্ডিত ভারত হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণের গ্রন্থসূচী সকল একত্রিত করিয়াই এই বিরাট পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও নিঃসন্দেহে সুরেশ্বরের নামসহ নিজ নিজ সূচী তৈয়ার করিয়াছেন; এমন হইতেই পারে না যে সকলে একই ভুল করিতেছেন। অধ্যাপক হিরীয়ান্না সুরেশ্বরাচার্য্যের 'নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি'র বম্বাই হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার মধ্যে লিখিয়াছেন মানসোল্লাস সুরেশ্বরাচার্য্যের লেখনীপ্রসূত। পণ্ডিত যোগেন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের বাংলা অনুবাদ ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধির' ভূমিকা মধ্যে (প্রথম ভাগ ১৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র-টীকা মানসোল্লাস সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত। হিন্দি লেখক ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালী ভাষার অধ্যাপক সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় এম, এ মহোদয় কৃত 'আচার্য্য শঙ্কর কি জীবনচরিত তথা উপদেশকা প্রামাণিক বিবরণ' গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠাতে আলোচ্য বার্তিক সুরেশ্বরকৃত লিখিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাপক দক্ষিণভারতীয় পণ্ডিত রামচন্দ্র দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে আলোচ্য গ্রন্থ সুরেশ্বরের কৃত এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই এবং যে শৈলীতে উহা রচিত তাহাও আচার্য্যের নিজস্ব। বারাণসীস্থ কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ মহাশয় বলিয়াছেন মানসোল্লাসবার্তিক সুরেশ্বর কৃত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে—আমি উক্তবার্তিক পণ্ডিতহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছি ও উহা সুরেশ্বরাচার্য্য প্রণীত। এই সকল পণ্ডিতমহাশয়দের স্বীকৃতি ও কাশীস্থ অপরাপর পণ্ডিতগণের মতামত পাইয়া অটল বিশ্বাসে লিখিতেছি যে 'মানসোল্লাস বার্তিক' গ্রন্থ সুরেশ্বর কৃত—অপর কাহারও নহে এবং যতদিন না উক্ত প্রমাণ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ সহ অনুসন্ধান দ্বারা উপরোক্ত মতসকল খণ্ডন হইতেছে ততদিন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

প্রচলিত দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রের শ্লোক সংখ্যা এখন আর দশটি নহে এবং দশশ্লোকী নামের উল্লেখ আর শুনা যায় না। আজকাল পঞ্চদশ শ্লোক প্রচলিত এবং সকল স্তবের পুস্তকেই এই প্রকার দেখা যায়। কিন্তু বার্তিককার যিনি স্তবের রচয়িতার সমসাময়িক, এই স্তবের টীকাকার স্বয়ং প্রকাশ যতি এবং বার্তিকের টীকাকার শ্রীমৎ রামতীর্থ মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দশটি মাত্র শ্লোকের উপর আপনাপন গ্রন্থ রচনা করিলেন। অবশ্য রামতীর্থ মহারাজ বার্তিকের টীকা দশটি শ্লোকেরই করিতে বাধ্য, কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ যতি মহারাজ তো মূল শ্লোকের টীকাকার—তিনিও দশটি শ্লোকের টীকা করিলেন। অথচ এই দুই মহাত্মার কেহই অপর পাঁচটির কোনও উল্লেখ করিলেন না ইহার কারণ কি? রামতীর্থের সময়েও যদি পনেরটি শ্লোক চলিত থাকিত তবে অন্ততঃ তিনি তাঁহার টীকার মধ্যে তাহার উল্লেখ করিতেন আশা করা যায়। অতিরিক্ত শ্লোক পাঁচটি কোথা হইতে এবং কবে থেকে মূল স্তবের সহিত যুক্ত হইল এ সন্দেহ সতত মনে উদয় হয়। একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যায় যে শ্রীমৎ রামতীর্থ মহারাজ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; তাঁহার পরবর্তী সময়ে এইগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এগুলির অর্থও প্রধানতঃ দক্ষিণামূর্ত্তির ধ্যানমূলক এবং আমার মনে হয় দক্ষিণামূর্ত্তির বিভিন্ন প্রকার ধ্যান নিবারণার্থ এই বহু-প্রচারিত স্তবের সাহায্যে একই মূর্ত্তির প্রচলন চেষ্টাতে কোন সুচতুর ব্যক্তি সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের পরে সংযোগ করিয়াছেন। আলোচ্য মূর্ত্তির বিভিন্ন ধ্যান সূত-সংহিতার শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য প্রণীত তাৎপর্য্য-দীপিকার আদ্যখণ্ডে (আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালার ২৫নং গ্রন্থে) ২৮২ পৃষ্ঠায়, আর্থার এভেলন সাহেবের সংকলিত তান্ত্রিক টেক্সটের ১৯ খণ্ডে ৩৫২ পৃষ্ঠাতে, প্রপঞ্চসার তন্ত্রের ২৮ পটলে, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন

ভাবে আছে। উক্ত গ্রন্থসকল দৃষ্টে ও প্রচলিত পাঁচটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকানুযায়ী প্রবন্ধের প্রথমেই ধ্যানমূর্তি বর্ণনা করিয়াছি চলিত বিশ্বাসের উপর আঘাত না করিবার জন্য। কিন্তু ভগবান শঙ্কর ও সুরেশ্বরাচার্য্য কেহই তাঁহাদের আলোচ্য স্তবে ও বার্তিকে ধ্যানের উল্লেখ করেন নাই বা মূর্তি কোথাও বর্ণিত হয় নাই—তবে মূল দক্ষিণামূর্তি স্তবের নবম শ্লোকে সেই অনুযায়ী বার্তিকের নবম উল্লাসে ঈশ্বরোপাসনা বিধান পদ্ধতি আছে।

সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রণীত এই বার্তিক কবে ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত ও পূর্বে কি প্রকারে প্রচারিত হয় তাহার সংক্ষেপ সংগ্রহ জানাইলাম। বার্তিককারের অপর গ্রন্থসকল বহুকাল হইতেই সুপ্রচারিত ও বেদান্ত পাঠে অত্যধিক প্রচলিত। কিন্তু আলোচ্য বার্তিকখানির ইদানিং বহুল প্রচার না থাকাতে আধুনিক সুধীগণের ইহা দৃষ্টিবহির্ভূত অজ্ঞাতভাবে ছিল। ইহার প্রধান কারণ গ্রন্থখানির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পুঁথিগুলির প্রচার দক্ষিণ ভারতেই প্রচলিত অর্থাৎ দক্ষিণামূর্তি দক্ষিণায়নে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ভারত-খণ্ডের উত্তরায়ণে মহাপ্রস্থান করিল। শৃঙ্গেরী মঠের প্রথম আচার্য্য সুরেশ্বর সেখানেই বোধহয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং অধিকাংশ পুঁথি ঐ প্রান্তীয় ভাষাগুলিতে লিখিত। একালে মহীশূর রাজ্যের কোন এক দেওয়ান বাহাদুরের চেষ্টাতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম ছাপান হয়। তাহারই ভূমিকা দেখে জানা যায় সেখানে যতগুলি পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র একখানি দেবনাগরী লিপিতে এবং অধিকাংশ পুঁথি উক্ত রাজ্যের প্রাচ্য পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহালয়ে রক্ষিত। আরও চারখানা দেবনাগরী লিপির পুঁথির খবর পাইয়াছি; উহার মধ্যে একখানি এ্যডায়ার থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সংগ্রহ, দ্বিতীয়খানি কাশী সরস্বতী ভবনের সম্পত্তি, তৃতীয় ও চতুর্থ পুঁথি কলিকাতাস্থ (রয়াল) এসিয়াটীক সোসাইটিতে আছে। যে দু'খানি দেখেছি উহার মধ্যে ৪র্থ খানি ১৭৮৮ সংবতে (১৭৩১ খৃঃ) আশ্বিন অমাবস্যা তিথিতে লিখন সমাপ্ত এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। ইহাই ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত। মহীশূর (১৮৯৫ খৃঃ) ও মাদ্রাজ (১৮৯৯ খৃঃ) হইতে প্রকাশের পর ১৯৫৯ সংবতে (১৯০২ খৃঃ) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বোম্বাই নির্ণয় সাগর ছাপাখানা হইতে পণ্ডিত জেঠারাম মুকুন্দজী শর্মার সম্পাদকতায় স্বয়মপ্রকাশ যতির দক্ষিণামূর্তির টীকা ও রামতীর্থ মহারাজের বার্তিকের টীকা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল বার্তিকের পুঁথি এখনও দেখি নাই; যতগুলি পুঁথির সন্ধান পেলাম তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে রামতীর্থ মহারাজের টীকা সমেত; স্বয়মপ্রকাশ যতির মূল স্তবের টীকাতে বার্তিকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহার স্থিতিকাল এখনও ঠিক করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু রামতীর্থের বার্তিক টীকা, স্বয়ংপ্রকাশ যতির দক্ষিণামূর্তি স্তবের টীকা উত্তর ভারতের কোন ভাষায় বা বঙ্গদেশে প্রচার বা প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া—এমন কি রামতীর্থের বার্তিক টীকার মূল পুস্তক কখনও এসব দেশে ছাপা হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস কখনও ছাপান হয় নাই এবং সমুচিত প্রচার না হওয়ার জন্য অনেকেই এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্দিহান। আলোচ্য বার্তিকের অন্যত্র প্রচার না হইয়াছে এমন নহে,তবে গ্রন্থকারের অপরাপর গ্রন্থ যেমন বহুলপ্রচারিত ও পঠিত—তেমনটি এখানির সম্বন্ধে ইদানিং হয় নাই। অথচ আমরা দেখিতেছি দুইশত বৎসর পূর্বেও রামতীর্থের টীকাসহ হস্তলিখিত পুঁথি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাতে অনেক-গুলি বর্তমান। এই গ্রন্থও যাহা ছাপা হইয়াছে গত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারেও পাওয়া যাইতেছে না। আলোচ্য বার্তিকের মধ্যে দেহতত্ত্ব, যোগের প্রক্রিয়া, যোগসিদ্ধি লক্ষণ প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গতঃ সুরেশ্বরাচার্য্য মহারাজ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এরূপ একখানি প্রকরণ-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নিরপেক্ষ সুধীগণ মনে করেন—তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের ইহা অতীব উপযোগী এবং ফলপ্রদ; একথা মূল স্তবের দশম শ্লোকে এবং বার্তিকের দশম উল্লাসের শেষের কয়েক শ্লোকেও আছে।

উদ্বেল সাগর

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

দু'জনেই ওরা সমুদ্রকে দেখছিল।

ঢেউএর পর ঢেউ এসে তাদের কাছে আছড়ে প'ড়ছে। একটা ব্যাকুলতার আবেদন বুকে ভর্তি ক'রে ব'য়ে এনে ঢেউগুলি শতধা হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ছে প্রকাশের ভাষায়। আর দূরে—অনেক দূরে—নিঃসীম অনন্তের বুকে যে বিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশি—তার যে কোথায় আদি আর কোথায় অন্ত সে রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে গেলে ব'লতে হয়—

নিত্য বিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি—আদি অন্ত তাহার কোথারে,
কোথা তার তল, কোথা কূল। বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি। কখনো বা আপনারে
রাখিতে পারে না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি
নির্দয় আবেগে।···

সমুদ্র-কাব্যের এই ভাব যখন ওদের দু'জনের মধ্যে দানা বাঁধতে চাইছে তখন ওদের মাঝখানে হঠাৎ এক ছেদ প'ড়লো।

রমলাদি চিনতে পারেন?

জ্যোতির্বিকাশের ঘন সান্নিধ্য থেকে স'রে ব'সে চশমার মোটা কাঁচের ফাঁক দিয়ে রমলা দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে। অদূরে অপেক্ষমান একজন তরুণ একটি শিশু-পুত্রকে কোলে নিয়ে তারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

মেয়েটি হেঁট হ'য়ে রমলাকে প্রণাম ক'রে বললে, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি অলকা।

অলকা? ও হ্যাঁ, এইবার চিনেছি। ফরটিনাইনের ব্যাচ তোমরা। তুমি, শকুন্তলা, দীপ্তি, মণিকা—

মিষ্টি হাসি হেসে মেয়েটি রমলার কথায় সায় দেয়।

কী ক'রছো তুমি এখন? পড়াশুনা—

ঈষৎ লজ্জায় অলকা মুখ হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ও, বুঝেছি। কতদিন হ'ল বিয়ে হ'য়েছে?

এই পুরো দু'বছর। অলকা স্বামীর কাছ থেকে শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে রমলার কোলে দেয়। রমলা বলে, বাঃ, ভারী লভ্‌লি বয় তো? বয়েস কত?

এই এক বছরে প'ড়েছে।

ভারী খুশী হ'লাম। বেশ, বেশ, সুখে থাকো তোমরা।

আলাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। অলকার স্বামী এসে রমলাকে আর জ্যোতির্বিকাশকে নমস্কার ক'রলে। ঘর সংসারের কথা থেকে সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, রাজনীতির দুর্বিপাকে কাছের সমুদ্র দূরে স'রে যায়।

কোথায় আছো তোমরা?

রমলার এ প্রশ্নের জবাবে অলকা উত্তর দেয়, আর্য-নিবাসে।

আপনারা?

আমরা আছি ভিক্টোরিয়া ক্লাবে। হোটেলের খাওয়া সহ্য হবে না ব'লে আমরা নিজেরা রেঁধে-বেড়ে খাচ্ছি, কিন্তু তাতেও খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট। চালে বালি, ঘিয়ে ভেজাল; আনাজ-পাতি তো পাওয়াই যায় না।

অলকা রমলাদির কথা সমর্থন ক'রে বলে, আমরা তাই চাল, ডাল, ঘি, তেল সব কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি।

চাল আনলে কেমন ক'রে? ধরা পড়বার ভয় হ'ল না?

গর্বের হাসি হেসে অলকা বলে, উনি পুলিশে চাকরি করেন।

ও, তাই বল।

অলকার স্বামী নিখিলেশের সঙ্গে জ্যোতির্বিকাশ তখন কংগ্রেস এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন নিয়ে আলোচনা সুরু ক'রেছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যায় গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা, আর কালোবাজার সমর্থনে পুলিশের সক্রিয়তা, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে তর্কটা বেশ জ'মে উঠেছিল চড়া পর্দায়। লাল-চীনের নীতি যদি হয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা, আর রাশিয়া যদি তাতে ইন্ধন প্রদান করে তা হ'লে ভাবী পৃথিবীতে কমুনিজমের স্থান হবে না এবং ভারতের পক্ষেও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে না—নিখিলেশের এ মন্তব্যে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্যোতির্বিকাশ ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু তখনি একটা বড় রকমের ঢেউএর বন্যা এসে তাদের বসবার জায়গাটি ভিজিয়ে দিতে সকলেই উঠে প'ড়লো তর্কটাকে মুলতুবি রেখে।

অলকা ব'ললে, যাবেন রমলাদি' আমাদের হোটেলে।

রমলা উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই! তুমিও এসো।

কিন্তু রমলা আরও খুশী হ'লো নিখিলেশের কথায়; এখানকার চালে বালি হবেই। সমুদ্রের বালি ক্ষেতের ফসলে মিশে থাকে। আমাদের সঙ্গে বেশি চাল আছে। অলকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো কিছু আপনাদের জন্য।

রমলা বলে, তা কী হয়?

নিখিলেশ জবাব দেয়, কেন হবে না? গুরু-দক্ষিণা আমাদের প্রাচীন ভারতের প্রচলিত প্রথা।

খুশী মনে রমলা সম্মতি জানায়।

বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপনান্তে অলকা ও নিখিলেশ প্রস্থান করে। রমলা এবং জ্যোতির্বিকাশ আবার তাদের পূর্ব পরিবেশের মাঝে ফিরে আসে।

সমুদ্রকে ভালো লাগছিল ওদের। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যতিক্রমকে অনুভব করে রমলা এবং জ্যোতির্বিকাশ মনে প্রাণে। কমলা বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিস্‌ট্রেস রমলা সমুদ্রকে দেখে বয়েসের গাম্ভীর্যোচিত আবরণের মুখোস পরে নয়। যদিও সে কিশোরীসুলভ কুমারী মেয়ের চপলতায় সমুদ্র দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে না; তবুও মনে তার উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য জেগে ওঠে। বয়স্ক বুদ্ধিজীবী অর্থশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক স্বামীকে সে তার মনের কথা প্রকাশ করে কাব্যের ভাষাতেই।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি,
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণ দেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্য তারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে—
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন॥

জ্যোতির্বিকাশের মধ্যে কাব্য না থাকলেও কাব্যানুভূতি প্রবল। কথায় কথায় রমলার মতন রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি না ক'রলেও সমুদ্র-কাব্য দর্শনের দার্শনিক ব্যাখ্যা সে করে।

সমুদ্র নিয়ে দিন কাটাবার মতলবেই রমলা-জ্যোতির্বিকাশ এসেছে পুরীর সমুদ্র-সৈকতে। শহরের কর্মময় জীবনে কাব্যের অবকাশ নেই। আর সমুদ্র-দর্শন এই তাদের জীবনের প্রথম অনুভূতি।

চাল, তরি-তরকারী, ভালো ঘি প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে অলকা এলো নিখিলেশের সঙ্গে রমলার ঘরে।

রমলা ব'ললে, একি, না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

নিখিলেশ উত্তর দিলে, ব'লেছি তো গুরুদক্ষিণা। আমাদের প্রাচীন ভারতের পদ্ধতি।

রমলা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করে, প্রাচীন ভারতের পদ্ধতির প্রতি আপনার বুঝি খুব বেশি শ্রদ্ধা?

হ্যাঁ, এম্-এ-তে আমার এন্‌সিয়েণ্ট হিষ্ট্রি ছিল; নিখিলেশের একথায় সকলেই হেসে উঠলো।

রমলা ব'ললে, এন্‌সিয়েণ্ট হিষ্ট্রিতে এম্-এ পাশ ক'রে পুলিশে চাকরি নিলেন কেন?

জ্যোতির্বিকাশ উত্তর দিলে, এ তোমার মাষ্টারী করার মতন কথা হ'ল। পুলিশে যে মাইনে—মাষ্টারীতে তা নেই ব'লে।

কেন, রিসার্চ ক'রে ডক্টরেটও তো হওয়া যেত।

রমলার একথায় জ্যোতির্বিকাশ ব'ললে, হ'লেই বা কী লাভ হ'ত?

নিখিলেশ এই তর্কের মীমাংসার সূত্র টেনে দিলে, কোনও রকমে এম্-এ পাশ ক'রেছিলুম। অত বিদ্যে

রমলা যেন ঠিক এই কথাটিই শুনতে চেয়েছিল। নিখিলেশ এম্‌-এ-তে কোন ক্লাশ পেয়েছে তা সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রতে ভদ্রতায় বাধে তাই। তবুও সাধারণতঃ পুলিশের লোকেদের প্রতি যে ধারণা রমলার, তা ব্যতিক্রম ঘটলো নিখিলেশের বেলায়। কথাবার্তায় তার অসাধারণ স্মার্টনেশ; কবিতার সঙ্গে কবিতার পাল্লা দিতে সে বেশ অভ্যস্ত।

অলকার মধ্যে কোন শিক্ষা বা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ নেই। নিতান্ত সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে। ঘর, সংসার আর বাস্তব বোধের বাইরে আর তার কোন ব্যক্তিত্বই প্রকাশ পায় না। শুধু ফুটফুটে শিশুটির সঙ্গে যখন সে ছড়া কাটে, তাকে যখন আদর করে, তখন তার মধ্যে একটা আলাদা রূপ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। তার মিষ্টি চেহারায় আরও যেন খানিকটা রঙের জৌলুস লাগে।

সেদিন আহারাদির পালা রমলার গৃহেই সমাপ্ত ক'রতে হ'ল। অত চাল, তরি-তরকারী, ঘিয়ের বিনিময়ে যখন কোন মূল্য দেওয়া যাবে না, তখন অলকা আর নিখিলেশকে না খাইয়ে কিছুতেই যেতে দেবেন না রমলাদি।

কোর্মাটা চমৎকার হয়েছে;—নিখিলেশের একথায় সকলেই সায় দিলে। রমলা শুধু এই কথায় এক অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ পেলে।

ছোট্ট সংসারটিতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর বসবাস। স্বামীর প্রফেসারী আর স্ত্রীর মাষ্টারী জীবনে সংসার-জীবন অস্বীকৃত। সারাদিন খেটেখুটে আর রান্না-বান্নায় মন-দেবার অবকাশ কিংবা প্রবৃত্তি থাকে না রমলার। কোনদিন যদি সখ ক'রে রাঁধেও রমলা, জ্যোতির্বিকাশের তার জন্যে মাথা-ব্যথা নেই। এই স্কুল-জীবনে তার আসক্তি অত্যন্ত কম; বরঞ্চ বাধাই দেয় সে। কী প্রয়োজন রান্না-বান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম করা?

জ্যোতির্বিকাশ বলে, তার জন্যে তো মাইনে করা লোক আছে!

রমলা উত্তর দেয়, মাইনে করা লোক দিয়ে কী সব রান্না করানো যায়।

জ্যোতির্বিকাশ এ কথার অর্থ বোঝে না। এর চেয়ে বরঞ্চ স্বামী-স্ত্রীতে ব'সে খানিকটা রাজনীতি আলোচনা ক'রতেই ভালোবাসে সে। সেই নিখিলেশের সঙ্গেই আজ জ্যোতির্বিকাশ যখন এক সুরে মাংসের কোর্মার প্রশংসাবাদ জানালে তখন রমলার বিস্ময় বোধ জাগে বৈ কি?

রমলা নিখিলেশকে বললে, ওঁর প্রশংসার কোন দাম নেই; কিন্তু আপনার যখন ভালো লেগেছে তখন স্বীকার ক'রতেই হবে যে রান্নাটা ভালোই হ'য়েছে।

নিখিলেশ বললে, মাষ্টারমশাইকে এ ভাবে বাদ দিচ্ছেন কেন?

রমলা উত্তর দিলে, খাওয়াটা ওঁর কাছে আমার—শুধু জীবন ধারণের প্রয়োজন মাত্র।

নিখিলেশ বললে, রমলাকে রসিয়ে না দিলে কিন্তু কোন রসই জমে না। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বীকার ক'রেছেন, সকল রসের সেরা রসনার রস।

আর এক দফা হাসি-খুশীর মাঝে আহারের পর্ব শেষ হয়।

অলকা, নিখিলেশ আর তাদের শিশুপুত্রই সমুদ্রকে সরিয়ে রাখলে ওদের জীবনের কাছ থেকে। নিবিষ্টচিত্তে সমুদ্র-দর্শনের আর অবকাশ নেই রমলা এবং জ্যোতির্বিকাশের।

রাশীকৃত বাসন-পত্তর এনে জড় ক'রলে অলকা। জগন্নাথের মন্দিরের কাছে সারি সারি বাসনের দোকান; উড়িষ্যার নক্সা শিল্প-শোভায় সমুন্নত। অলকা দেখাতে লাগলো—শাশুড়ির জন্যে কেনা পূজার বাসন হ'তে আরম্ভ ক'রে ননদ, জা প্রভৃতি সংসারের সকলের জন্যে ক্রীত কিছু কিছু উপহার সামগ্রী।

কিনবেন রমলাদি'?

অলকার এ প্রস্তাব রমলার মনের ভাষারই যেন প্রতিধ্বনি। তবু একটু অনিচ্ছাকে প্রকাশ ক'রতেই হয়।

কার জন্যে কিনবো বলো। ফিকে হাসির অন্তরালে রমলার মনের আফশোষই প্রকাশ পায়।

নিখিলেশ বলে, কেন নিজেদের জন্যে? কী চমৎকার ফ্লাওয়ার ভাস দেখুন।

রমলা বললে, চমৎকার!

ওটা আপনার জন্যে অলকা কিনেছে।

রমলা তীব্র প্রতিবাদ জানালে, না; এ কিছুতেই হ'তে পারে না। এরকম ক'রলে কিন্তু আমাদের কালই পালাতে হবে এখান থেকে।

নিখিলেশ বলে, এতই বিপন্ন ক'রে তুলেছি আপনাদের ?

না, সত্যি ; পরিহাসের কথা নয়। খাওয়া-দাওয়া থেকে সুরু ক'রে আবার যদি বাসনপত্তর পর্যন্ত যোগান দেওয়া হয়, তাহ'লে প্রীতির সম্পর্ক বিপন্ন হ'য়ে ওঠে বৈ কি !

রমলার এ কথায় নিখিলেশ বলে, নিছক প্রীতির জন্যে তো নয়, ব'লেছি তো এ হ'চ্ছে রীতি। অলকার গুরু আপনি ; সুতরাং এটা নিতান্তই সামান্য। ফিরৎ দিলে নিশ্চয়ই বেদনা বোধ ক'রবো আমরা।

রমলাকে বাধ্য হ'য়েই ফ্লাওয়ার ভাসটি গ্রহণ ক'রতে হয়।

নিখিলেশের অনুরোধেই অলকা জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল রমলাদি'কে কাপড়ের দোকানে। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত কট্‌কী শাড়ি, ভারী পছন্দ হয় রমলার।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্যোতির্বিকাশ প্রথমেই বাধা দেয়, কলকাতার বাজারে এগুলি মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়।

অলকা বলে, তবুও আসল জায়গার জিনিসের মতন কী হয় ? অলকা ছেলেমানুষ ; তার বয়েসের মেয়েদের মুখে একথা স্বাভাবিক ও শোভন, কিন্তু রমলাও যখন সায় দিলে তখন জ্যোতির্বিকাশের আর কোন আপত্তিই কার্যকরী হয় না।

রমলা ব'ললে, কলকাতায় তো সবই মেলে ; তা ব'লে সেখানকার ক'টা জিনিসই বা আমরা কিনে রাখছি ? আর তা' ছাড়া পুরীর স্মৃতি হ'য়ে থাকবে এগুলি।

জ্যোতির্বিকাশের কোন কথাই খাটে না আর।

নিখিলেশ বলে, মিথ্যে বাধা দেওয়া। ওঁদের আপনি ঠেকাতে পারবেন না। এ হ'চ্ছে ছোঁওয়াচে রোগ। আর অলকাই এই সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়।

স্বামীর কথায় ভীষণ রেগে যায় অলকা। একেই সে নিজেকে সামলাচ্ছে অতি কষ্টে ; তার ওপর আবার এই অপবাদ ! রাগে বারুদফাটা হ'য়ে সে বলে নিখিলেশকে উদ্দেশ করে, তুমিই তো আমাকে দিয়ে কাপড় কেনার কথা বলালে, এখন আবার মিথ্যে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছো আমাকে ?

হো হো ক'রে হেসে ওঠে নিখিলেশ ! দেখলেন তো, কী ছেলেমানুষী স্বভাব ওর ? হয় তবে ছোঁওয়াচে রোগীর কাছ থেকে দূরে স'রে থাকলেই তো পারো !

অলকাকে শান্ত করতে অনেক সময় লাগে সকলের। আর সবচেয়ে বেশি অপরাধী হ'য়ে ওঠে জ্যোতির্বিকাশ।

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে রমলা তাকে বলে, কোন একটা সখ যদি থাকে তোমার জীবনে ! কে তোমার পয়সা খাবে বলো তো ?

অপরাধীর মতন জ্যোতির্বিকাশ বলে, আমি কী তাই ব'লেছি ?

তবে কিসের তোমার আপত্তি শুনি ?

আপত্তি এই যে, বেড়ানোটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

এটা বুঝি ঘরে শুয়ে থাকা ? রমলা বলে, চমৎকার লজিক তোমার ! অনর্থক বাক্য ব্যয় না ক'রে আর জ্যোতির্বিকাশ ত্রুটি স্বীকার ক'রে নেয়। শুধু ত্রুটি স্বীকার ক'রে ক্ষান্ত থাকে না, ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে তিরিশ টাকা দামের একখানি চমৎকার কটকী শাড়ি কিনে সে অলকাকে তা উপহার দিয়ে ব'সলো।

অলকা আপত্তি ক'রলেও নিখিলেশ বরঞ্চ আনন্দই প্রকাশ ক'রলে এ ব্যাপারে।

মাস্টারমশাইয়ের স্নেহের দান, এতে আপত্তি করবার আছে কী ? রমলা খুশীই হ'ত যদি কাপড়খানির দাম তিরিশ না হ'য়ে টাকা পনেরোর মধ্যে কেনা যেত। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় সে মনে মনে অপ্রসন্নই হয়, কিন্তু এর পরেও জ্যোতির্বিকাশ আর এক কাণ্ড বাধিয়ে ব'সলো।

বাঘের চামড়ার দামী জুতো সে রমলা এবং অলকা দু'জনকেই কিনে দিলে। অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকের এই বেহিসাবী কাণ্ডে রমলা রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে মনে মনে। অলকার প্রতি এতখানি আগ্রহ জ্যোতির্বিকাশের লৌকিকতার নামে হ'লেও কেমন তার দৃষ্টিকটু ঠেকে।

সমুদ্র স'রে গেছে ওদের জীবনের মাঝখান থেকে।

নীলজলরাশির ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস আর দিগন্তবিলীন নীলিমার ব্যাপ্তিকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার অবকাশ নেই আর রমলা এবং জ্যোতির্বিকাশের জীবনে।

রমলা মাঝে মাঝে সচকিতা হ'য়ে ওঠে ; কিন্তু নিখিলেশ

কথার ব্যঞ্জনায় নিখিলেশ রমলাকে সত্যিই মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। এমন কোমল হৃদয়-বৃত্তিসম্পন্ন তরুণ যুবককে পুলিশের কাজে কিন্তু কিছুতেই মানায় না। রমলা বার বার সে কথা বলে।

নিখিলেশ বলে, জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে এমনি অনেক অমিলকেই মানিয়ে নিতে হয় রমলাদি'!

অলকার শিক্ষয়িত্রী, এই সূত্রেই নিখিলেশ রমলাকে রমলাদি ব'লে সম্বোধন করে। রমলা বলে, পড়াশুনা একেবারে ছেড়ে না দিয়ে রিসার্চ করেন না কেন?

নিখিলেশ উত্তর দেয়, লাভ কী?

কেন? জীবনে এখনও আপনার অনেক উচ্চাভিলাষ থাকা উচিত।

রমলার একথায় নিখিলেশের হৃদয়-বৃত্তি আলোড়িত হ'য়ে ওঠে! আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে সত্যিই অনেক কিছু ছিল।

এর মধ্যে সব মিটে গেল?

হ্যাঁ, এখন শুধু দিনগত পাপক্ষয়।

এই বয়েসে এত পেসিমিজম্ কেন আপনার মধ্যে?

রমলার এ প্রশ্নে নিখিলেশের কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে আসে। পুরু চশমার কাঁচ দিয়ে রমলা লক্ষ্য করে নিখিলেশকে। বড্ড ছেলেমানুষ আর সেন্টিমেন্ট্যাল—পুরুষের মধ্যে নারীত্বের ভাবই যেন বেশি তার মধ্যে।

হঠাৎ রমলা প্রশ্ন করে নিখিলেশকে, অলকা গেল কোথায়? আজকে সে যে বড় বেড়াতে এলো না!

নির্লিপ্তভাবে নিখিলেশ উত্তর দিলে, যাক্ গে! তার কথা আর ব'লবেন না।

কেন, তার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া ক'রেছেন?

এখানেও দেখুন অমিল। ওই নিতান্তই নারীকে নিয়ে জীবন-পথে চলা যে কত বড় দুরূহ কাজ, আপনারা তা হয়ত বুঝবেন না। কোন দিক থেকেই আমার সঙ্গে মিল নেই। না শিক্ষা-দীক্ষায়, না আচার-ব্যবহারে! অথচ দেখুন কেমন মানিয়ে চ'লেছি ওকে নিয়ে, ঠিক যেমন পুলিশের কঠিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

নিখিলেশের এ কথায় রমলা অনুভব করে তার মর্মব্যথা! কিন্তু তার কাছে এই উচ্ছ্বাস প্রকাশের কারণ কী? হেড মিস্ট্রেস রমলা হঠাৎ সচকিতা হ'য়ে ওঠে।

চ'লুন এইবার ফেরা যাক্! দেখি আবার অলকা কোথায় গেল?

রমলার কথায় নিখিলেশের যেন চেতনা ফিরে আসে। রমলাদি'র কাছে নিজের হৃদয়কে এমনিভাবে মেলে দেওয়ার মধ্যে নিজের দুর্বল চিত্তবৃত্তিই বুঝি বা ধরা পড়ে।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস ক'রলে, প্রফেসর সোম আজ বেড়াতে বার হ'লেন না যে!

শরীরটা আজ তাঁর বিশেষ ভালো নেই! রমলা উত্তর দিলে।

শরীর কী তাঁর খুবই খারাপ?

না, খুব খারাপ হ'লে কী আমি তাঁকে ছেড়ে বার হই? ব'ললেন, গাটা শিরশির ক'রছে; আজকে আর সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগাবো না! নিখিলেশের কথায় রমলারও মনে হ'ল অনেক আগেই তার আজ বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। জ্যোতির্বিকাশ মুখে প্রকাশ না করলেও শরীরে তার বেশি অসুস্থতা; তা না হ'লে যার আগ্রহ বেশি সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর—সেই আজ অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রলে কেন? রমলাও স্বামীকে ছেড়ে একলা বার হ'তে রাজি হয় নি; কিন্তু জ্যোতির্বিকাশের আগ্রহেই সে বেরিয়েছে। আর ভিক্টোরিয়া ক্লাব থেকে ফ্ল্যাগ স্টেশনের কাছে আসতেই তার নিখিলেশের সঙ্গে দেখা। তারপর কথায় কথায় তারা অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকতেই রমলা যেন সাপ দেখে চমকে উঠলো।

জ্যোতির্বিকাশের শিয়রের পাশে অলকা উপবিষ্টা—তার সযত্ন অঙ্গুলি দিয়ে সে জ্যোতির্বিকাশের মাথার চুলগুলি আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে। আর তার শিশুপুত্রটি পরম নিশ্চিন্তে বিছানার অপর প্রান্তে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হ'চ্ছে মাস্টারমশাইয়ের, অলকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে কথাগুলি উচ্চারণ ক'রলে।

রমলা গম্ভীর হ'য়ে গেল। তার মুখভাবের এ পরিবর্তনকে লক্ষ্য না ক'রেই নিখিলেশ ব'ললে, অলকা আমাদের ঘর থেকে ওডিকোলেনের শিশিটা নিয়ে এসে মাস্টারমশাইয়ের মাথাটা ধুইয়ে দাও।

অনেক রাত্রে আহারাদির পালা সাঙ্গ করিয়ে তবে নিখিলেশ আর অলকা চ'লে গেল। মাস্টারমশাইয়ের অসুখ, এ অবস্থায় অলকা কিছুতেই র'াধতে দেবে না রমলাদি'কে।

আপনি বরঞ্চ বসুন মাস্টারমশাইয়ের কাছে ; রান্না-বান্না ক'রে আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, অলকার এ কথায় খুশীই হ'ল নিখিলেশ। জ্যোতির্বিকাশও পরম স্বস্তি অনুভব করে। অনেকদিন পরে এক অনাস্বাদিত জীবন-মাধুর্যের সন্ধান আজ সে পেয়েছে। অলকা আজ তাকে পরম আত্মীয়ার যত্নে যে পরিচর্যা ক'রেছে—তাতে তার অন্তর ভ'রে ওঠে!

কিন্তু কি যে হ'য়েছে রমলার—কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। না পারলে রমলা নিখিলেশের সঙ্গে ভালো ক'রে কথাবার্তা কইতে, না পারলে অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা ক'রতে। আজ অলকার রাঁধা আহার্য অরুচিতে ভ'রে উঠলো।

গভীর রাত্রে সমুদ্রের ডাকে জ্যোতির্বিকাশের চিত্তে যখন উদ্বেলিত কাব্যের আবেগ, তখন শুধু রমলা ভাঙা কান্নায় ভেঙে প'ড়লো। স্থূল দেহে তার কিশোরী মেয়ের মতন এত কান্নার আবেগ কোত্থেকে আসে ?

বিস্মিত জ্যোতির্বিকাশ অনেক ক'রেও রমলার কান্না থামাতে পারে না। শেষে রমলা ব'ললে, কালই চ'লে যাবো আমরা, আমার আর একটুও ভালো লাগছে না এই জায়গা।

জ্যোতির্বিকাশ বলে, কেন, কী হ'ল তোমার ? তোমার আগ্রহেই তো এখানে আসা।

অভিমানহত কণ্ঠে রমলা উত্তর দেয়, সে আগ্রহ আমার মিটে গেছে।

কিন্তু এখনও অনেকদিন ছুটি আছে আমাদের। রসিয়ে রসিয়ে আমরা আরও অনেকদিন সমুদ্র দেখতে পারতুম।

বেহায়া স্বামীর এই বেহায়াপনায় সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে ওঠে রমলার। তবুও শালিনতাকে বজায় রেখে কঠিন স্বরে সে বলে, না, কালই চ'লে যাবো আমরা। নির্বোধ অর্থনীতির অধ্যাপক এ রহস্যের তথ্য উদ্ঘাটন ক'রতে না পারলেও রমলাকে খুশী রাখবার জন্যেই ব'লে, আচ্ছা, তাই হবে।

সমুদ্রের ডাকে উচ্ছ্বসিত হৃদয় ; কিন্তু রমলাকে সে কথা এখন জানাবার উপায় নেই জ্যোতির্বিকাশের।

রামায়ণ আখ্যান

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, পিএচ্-ডি

বালকাণ্ড। উপক্রমণিকা—রামায়ণ রচনা

(১)

সুন্দর তমসা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, প্রয়াগ হইতেও অনেকখানি পূর্ব্বে। এই তমসার তীরে মহামুনি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। তিনি তপস্যা ও বেদ-অধ্যয়নে কাল কাটাইতেন। একদিন অপরাহ্ণে তিনি শিষ্য-পরিবৃত হইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাদ্য, অর্ঘ, আসন, বন্দনাদির দ্বারা বাল্মীকি তাঁহার যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহার পথশ্রম দূর করিলেন। বিশ্রাম লাভের পর দেবর্ষি যখন নানান দেশের বিচিত্র কথা বলিতেছিলেন তখন বাল্মীকি এই বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ নারদকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবন্, পৃথিবীর সমস্ত দেশের কথাইত আপনি জানেন। সম্প্রতি এই পৃথিবীতে এমন কোনও পুরুষ আপনি দেখিয়াছেন সত্য হইতে বিচ্যুত হ'ন না। যিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। যাঁহার মন কখনও অনুদার নয় এবং এই উদার মন লইয়া যিনি সর্ব্বদা সকলের হিতে নিজকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যিনি আত্মবান্ ও ক্রোধজয়ী। যিনি অসীম ধৈর্য্যে অন্যের অজস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইতে পারেন এবং কখনও কাহারও প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহার রোষ-রক্তিম মুখ দেখিয়া দেবতারাও ভীত হ'ন, অথচ সৌম্য-মূর্ত্তিতে যিনি অশেষ কান্ত-গুণের অধিকারী। এক কথায়, সর্ব্বগুণের আকর লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সুষমা লইয়া কোন্ একমাত্র ব্যক্তিতেই আজ আবির্ভূ'তা হইয়াছেন ? এমন কাহারও কথা যদি আপনার জানা থাকে আমাদের বলুন।"

প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিতে লাগিলেন, "আপনি যে সমস্ত দুর্লভ বহুমুখীন-গুণের নাম করিলেন, তাঁহাদের একত্র সমাবেশ দেবতাদের মধ্যেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যে নরচন্দ্রমার চরিত্রে এই

অযোধ্যার নরপতি ইক্ষাকু-বংশীয় রামচন্দ্র।" এই বলিয়া নারদ রামের কীর্ত্তিসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। তাঁহার জন্ম, বালক কালেই তাঁহার অসামান্য বীর্য্যবত্তা, মিথিলার জনককুলে সীতার সহিত তাঁহার বিবাহ, তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেকের উদ্যোগ, বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে এই উদ্‌যোগের ব্যর্থতা, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের বনগমন, ভরত কর্ত্তৃক রামকে ফিরাইয়া আনার বৃথা চেষ্টা, রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, বানরদিগের সহিত রামচন্দ্রের সখ্য, সেতুবন্ধন করিয়া বানরদের সাহায্যে সমুদ্র পার হওয়া, সবান্ধবে রাবণকে বধ করিয়া পাপকারীর দণ্ড, লঙ্কাপুরে সীতার দর্শন; রামের রূঢ়বাক্যে সীতা দেবীর অগ্নিতে প্রবেশ, সীতার অগ্নি শুদ্ধি, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ—এ সমস্তই নারদ উৎসাহের সহিত সশিষ্য বাল্মীকির নিকট বলিয়া যাইতে লাগিলেন। মুগ্ধ হইয়া সকলে দেবর্ষির বাক্যামৃত যেন পান করিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে নারদও সাদর সম্ভাষণে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(২)

নারদ চলিয়া যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথাগুলি যেন সকলের মনে অনুরণিত হইতে লাগিল। বেলা শেষ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সন্ধ্যা-স্নানের জন্য ঋষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজকে লইয়া তমসার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসার জন্য একটি সুন্দর জায়গাও দেখিতে পাইলেন। তীর সেখানে ক্রমশঃ নীচু হইয়া জলের সাথে আসিয়া মিশিয়াছে, অথচ পারে কোন কাদা নাই। জলও অতি নির্ম্মল, সাধুজনের মনের মত অনাবিল। ঋষি শিষ্যকে কহিলেন, "ভরদ্বাজ, এই সুন্দর ঘাটেই আজ আমরা স্নান করিব। তুমি কলসটি এখানে নামাইয়া রাখ; আমার বল্কল দুইটি আমার হাতে দেও। ভগবান্ সূর্য্য প্রায় অস্ত যাইতেছেন।" দুইজনেই নদীর তীরে অনেকটা পথ হাটিয়া আসিতেছিলেন। নদীর বক চরে তাঁহাদের কাছেই দুইটি ক্রৌঞ্চ বা বক-পাখী তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। পাখী দুইটি জলে চঞ্চু ডুবাইতেছিল ও মনের আনন্দে সুন্দর শব্দ করিতেছিল। এই সুখী ক্রৌঞ্চ-যুগলকে দেখিয়া ঋষির মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে এক ব্যাধ আসিয়া তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিল। তীরের আঘাতে পুরুষ পাখীটি মাটিতে পড়িয়া গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রক্তে তাহার পালকগুলি ভিজিয়া গিয়াছিল। প্রিয় সহচরকে রক্তাক্তদেহে মরণযন্ত্রণায় মাটিতে লুটাইতে দেখিয়া ক্রৌঞ্চী করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। রৌপ্যের ন্যায় শাদা ঝক্‌ঝকে তাহার পাখা ও সুন্দর তাম্রবর্ণ তাহার মাথার ঝুঁটি ধূলি ও রক্তে একাকার দেখিয়া ক্রৌঞ্চীর আর শোকের পরিসীমা রহিল না। পাপাত্মা নিষাদ এমন সুন্দর ক্রৌঞ্চকে মৃত্যুর কঠোর আঘাত হানিয়াছে দেখিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা ঋষির মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তারপর করুণার আতিশয্যে ঋষি উত্তেজিত দুঃখের কণ্ঠে বলিলেন,

• মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

"যেহেতু তুমি এই ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে প্রেমে মুগ্ধ পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ সেইজন্য কালের চিরন্তন স্রোতে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবে কিন্তু তুমি কোনও দিন (এ পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।" দুঃখার্ত্তা ক্রৌঞ্চীও যেন ঋষির মুখে এই সমবেদনার বাক্য শুনিতে পাইল।

মুখ দিয়া এই কথাগুলি বাহির হওয়ার সাথে সাথেই ঋষির মনে হইল—"পাখীটির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমার মুখ দিয়া এ কি কথা বাহির হইল?" একটু ভাবিয়া তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "চারিটি চরণে বদ্ধ, অক্ষর সমান রাখিয়া তান-লয়-সমন্বিত, আমার এই শোকের বাণী দেখ শ্লোকের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।" প্রতি চরণে আটটি করিয়া অক্ষর, এমন বত্রিশ অক্ষরে সম্পূর্ণ অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক ইহার পূর্ব্বে শুধু বেদের মন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইত। কি আশ্চর্য্য, এমন ছন্দঃ যে পৃথিবীর সুখদুঃখের প্রকাশেও রচিত হইতে পারে সে কথা কেহ কোনদিন মনে করে নাই। ভরদ্বাজও গুরুর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন যে নিঃসন্দেহে ইহা বৈদিক অনুষ্টুপ্ ছন্দঃই বটে, যে ছন্দে এতদিন শুধু দেবতাদেরই অর্চ্চনা হইয়া আসিয়াছে।

স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিয়া বাল্মীকি যখন শিষ্যদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখনও রহিয়া রহিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, "মনে বৈরভাব লইয়া সেই অন্যায়কারী ব্যাধ এমন সুন্দর ক্রৌঞ্চটিকে অকারণ মারিয়া ফেলিল; আহা পাখিটির মুখে তখনও কোমল সুন্দর মধুর ধ্বনি বাজিতেছিল।" একথা বলিতে বলিতে ঋষির মুখ দিয়া দুঃখের প্রেরণায় আবার সেই অনুষ্টুপ্ শ্লোক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শিষ্যগণ বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে ঋষির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় স্বয়ং ব্রহ্মা যেন আসিয়া মুনিকে বলিলেন, "দুঃখের আবেগে স্বচ্ছন্দে তোমার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা পাদ-বদ্ধ সুষ্ঠু শ্লোকের আকারেই রচিত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে বিচারের আর আবশ্যক নাই। তুমি নারদের মুখে রামের যে জীবন-কাহিনী শুনিয়াছ এই শ্লোকে তাহারই প্রচার কর। যতদিন পৃথিবীতে পর্ব্বত-সকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যতদিন নদীগুলি সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন ধরিয়া এই পৃথিবীতে তোমার রচনা যশস্বী হইয়া থাকিবে। জাহ্নবী ও হিমালয়ের ন্যায় যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহা লোকের কল্যাণ করিবে—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

মহীতলে যতদিন গিরি ও নদীর স্থান রহিয়াছে ততদিন ধরিয়া লোকে লোকে তোমার এই রামায়ণ কাব্যের প্রচার চলিতে থাকিবে।"

দেবতার এই আশ্বাসবাণী বাল্মীকির দেহমন পুলকিত করিয়া তাঁহার প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার করিল। তিনি মন স্থির করিয়া এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করিলেন, "রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়া রামায়ণ-নামে একখানা গোটা কাব্য আমি এই ছন্দের শ্লোক দিয়াই রচনা করিব।"

উদারবৃত্তার্থ-পদৈ র্মনোরমৈ স্তদাস্য রামস্য চকার কীর্ত্তিমান্ ॥
সমাক্ষরৈঃ শ্লোক-শতৈ র্যশস্বিনো যশস্করং কাব্যম্ উদার-দর্শনঃ ॥

তখন উদার-দৃষ্টি কীর্ত্তিমান্ ঋষি উদার ছন্দে সম-অক্ষরে শত শত শ্লোকে মনোরম পদবিন্যাসে যশস্বী রামচন্দ্রের জীবনী লইয়া এই যশস্কর কাব্যের রচনা করিলেন।

(৩)

রচনা আরম্ভ করার পূর্ব্বে মহর্ষি আচমন করিয়া শুদ্ধভাবে কুশাসনে পূর্ব্বমুখীন উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাম-চরিত্রের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি তিনি নারদের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন। মনে মনে সেগুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন। আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারই তিনি নিজের মনে ভাবিয়া লইয়া প্রত্যেকটি ঘটনাকেই এত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন যেন তাহা করতলস্থিত অতি প্রত্যক্ষ একটি আমলকী ফল—পাণাবলকং যথা।

এইভাবে তত্ত্বদর্শনের দ্বারা তিনি সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া রামচন্দ্রের অতি মনোহর চরিত্র সংবলিত আদিকাব্য রামায়ণ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রামায়ণ কাব্য—

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্ম্মার্থ গুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্ব্বশ্রুতি মনোহরম্ ॥

সাংসারিক কামনাদিরভাবে যেমন পরিপূর্ণ তেমনি সাত্ত্বিক ধর্মগুণেও ভরপুর। ইহা সমুদ্রের ন্যায় নানা ভাবরত্নের আকর এবং শ্রবণ বিষয়ে সর্ব্বলোকের নিকটই মনোজ্ঞ।

এই গ্রন্থে ভগবান্ বাল্মীকি মহামুনি রামের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণ বধের পর তাঁহার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। ইহাতে ছয়টি কাণ্ড ও ন্যূনাধিক পাঁচ শত সর্গের সমাবেশ ছিল এবং ইহার শ্লোক সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের তিরোধান পর্য্যন্ত অন্যান্য ঘটনাবলি যাহা বাল্মীকির জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল মুনিবর তাহা উত্তর কাব্য নামে অন্য একখানি গ্রন্থে বর্ণনা করেন, বিশেষ করিয়া "সীতায়া শ্চরিতং মহৎ"—সীতাদেবীর অপূর্ব্ব চরিত্র কাহিনী। এই উত্তর কাব্য ষটকাণ্ডে সমাপ্ত, রামায়ণের সপ্তমকাণ্ডভাবে সংযোজিত হইয়া একখানি সম্পূর্ণ রামচরিতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উত্তরকাল নামে পরিচিত উত্তর কাব্য মহর্ষির জীবিতকালে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু ইহাও আদিকবিরই রচনা। যুদ্ধ কাণ্ডের পরিসমাপ্তির পর রামের জীবনের এখন পর্য্যন্ত অনাগত যে সমস্ত ঘটনা তাঁহার তিরোভাব পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল তাহা এই উত্তরকাব্যে সন্নিবেশিত হয়। উক্তই আছে—

অনাগতং চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকি ভগবান্ ঋষিঃ ॥

এই সমগ্র রামায়ণ কাব্যই পরবর্ত্তীকালের কবিগণের আশ্রয়ের বস্তু। সংযোগেও ইহার অপূর্ব্ব গান সর্ব্বলোকের চিত্তাকর্ষক এবং মন ও প্রাণের আহ্লাদনকারী। ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাক্য-বিশারদ হয়, ক্ষত্রিয় রাজত্ব লাভ করে, বৈশ্য তাহার ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ হয় এবং শূদ্রগণও মহত্ত্ব লাভ করে। ইহা সর্ব্বলোকের কল্যাণবিধায়ক এবং সর্ব্বমানবের নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সহায়ক।

(৪)

গ্রন্থ রচনার পর বাল্মীকির মনে এই চিন্তা আসিল—কাহাকে তিনি এই রামায়ণ শিক্ষা দিবেন, কে লোকসমাজে ইহার প্রচার করিবে। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় কুশ ও লব নামে দুই ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। ইহারা রাজপুত্র, কিন্তু আশ্রমে বর্দ্ধিত। ঋষিপুত্রদের সাথে ইহারা মহর্ষির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। ইহারা রূপে ছিলেন গন্ধর্ব্বতুল্য এবং গন্ধর্ব্বের মতনই ছিল ইহাদের সঙ্গীতে দক্ষতা আর সুললিত কণ্ঠ। সুতরাং সুরসপ্তকে গঠিত, তন্ত্রীলয়-সমন্বিত রামায়ণ গান ইহাদের কণ্ঠেই সুন্দর শুনাইবে মনে করিয়া মহর্ষি ইহাদিগকে গ্রন্থ পাঠ করাইলেন। অপূর্ণ একাদশবর্ষীয় এই কিশোর দুইটির কণ্ঠে রামায়ণের আবৃত্তি আশ্রমবাসী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিল। তারপর স্বরসংযোগে কণ্ঠস্থ শ্লোকগুলি গানে প্রকাশ করিতে আদিকবি বালক দুইটিকে শিক্ষা দিলেন। ঋষিদিগের সভায় এই কাব্যের অল্প কয়েকটি সর্গও গীত হইলে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "এই সঙ্গীতের কি মাধুর্য্য এবং শ্লোকগুলির কি অপূর্ব্ব বিন্যাস। যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাও আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া যেন দেখা দিল।" ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কিছু না কিছু দান করিলেন,—কেহ দিলেন একজোড়া বল্কল, কেহ বা একটি জলাধার কলসী, কেহবা দিলেন কৌপীন, কেহ দিলেন কুশাসন, কেহ বা যজ্ঞডুমুরের পিঁড়ি, কেহবা দিলেন কাষায় বস্ত্র, কেহবা জটা বন্ধনের জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর, কেহবা কৃষ্ণমৃগের অজিন। সঞ্চয়হীন মুনিসমাজের এই যে দান ইহার মূল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইল তাঁহাদের অন্তরের স্নেহের দ্বারা। তাঁহারা দুই ভাইকে যে কি বর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না এবং গানের রচয়িতাকেও অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর আশ্রম হইতে আশ্রমে এই বালকদের সঙ্গীত শুনিবার জন্য ঋষিদের আহ্বান আসিতে লাগিল। কোন কোনও স্থলে একাদিক্রমে অনেকদিন ধরিয়া রামায়ণ গান চলিতে লাগিল, কারণ সকলেরই আগ্রহ ছিল আদ্যন্ত সমগ্র আখ্যানটি শুনিয়া নিতে। আশ্রম হইতে শেষে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে দুই ভাই এই রামায়ণ আখ্যান গান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। চতুষ্পথে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে, অট্টালিকায়, রথচলার প্রশস্ত রাজমার্গে অপূর্ব্ব রামায়ণ-গীতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই গান শুনিতে কাহারও আগ্রহের বিরাম ছিল না।

গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারপর বালক দুইটিকে সাদরে রাজপুরীতে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে মহাসমাদরে তাহাদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্র নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত এই গায়কদ্বয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—

ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ কুশীলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্ভূতিকরং প্রচক্ষতে মহানুভাবং চরিতং নিবোধত॥

রাজপুত্রাদির মত লক্ষণসম্পন্ন এই মুনিকুমার দুইটি গায়কের বেশেও মহাতপস্বী: ইহারা আমারই মহানুভব চরিত্র বর্ণনা করিয়া যে মঙ্গলদায়ক গীতি প্রচার করিতেছেন উহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।

এই মুনিবালক দুইটি দেখিতে রাজপুত্রের মত—যেমন বলিষ্ঠ ও সুন্দর আকৃতির, তেমনি তাঁহারা যখন গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন রাজসভায় পারিষদবৃন্দ সকলেই লক্ষ্য করিলেন রামচন্দ্রের সহিত তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য, যেন দর্পণে কোন মূর্ত্তি হইতে প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকলের সবিস্ময় দৃষ্টির সম্মুখে মুনিবেশধারী কুশীলব বিচিত্রার্থপদসংবলিত হৃদয়ানন্দকারী রামচরিত তন্ত্রীলয়সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করিলেন—

হ্লাদয়ৎ সর্ব্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ॥
শ্রোত্রাশ্রয়—সুখং গেয়ং তদ্ বভৌ জনসংসদি॥

সভাস্থ সকলের দেহ মন ও হৃদয় আহ্লাদিত করিয়া যে সংগীতধ্বনি উঠিতে লাগিল উহাতে সকলেরই শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থতা লাভ করিল।

রামচরিত্র বর্ণনের আরম্ভেই গুরুগম্ভীর স্বরে মহর্ষির রচিত প্রারম্ভ শ্লোক-কয়টি উদার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

সর্ব্বা পূর্ব্বমিথং চেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্॥
ইক্ষাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্
মহদ্ আখ্যানমুৎপন্নং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।

সমগ্র পৃথিবী পূর্ব্বে যাহাদের শাসনাধীন ছিল, প্রজাপতি মনু হইতে যে বংশের উদ্ভব, বহু জয়শালী নৃপতি যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সেই প্রভাবশালী ইক্ষাকু রাজবংশে এই মহৎ আখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে রামায়ণ নামেই ইহার খ্যাতি।

বালক দুইটি আরও বলিলেন, "আমরা দুইজনে সেই রামায়ণ ভাষ্যের সমস্তই আপনাদের নিকট আদ্যন্ত বর্ণনা করিব। ধর্ম্মকামার্থ গুণসম্পন্ন এই বিচিত্র আখ্যান আপনারা সমস্ত বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করুন।

তাহার পর মুনিবালক দুইটি কোশলরাজ্য ও তাহার রাজা বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের গুণাবলী বর্ণনাসমন্বিত রামায়ণ আখ্যানের প্রারম্ভ মধুর কণ্ঠে যেন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন।

ভাঙ্গন বিধ্বস্ত ধুলিয়ান

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম গঞ্জ ও ব্যবসার আড়ৎ হিসাবে জেলার উত্তর প্রান্তে ধুলিয়ান পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। ধান্য, গম-ছোলা-কলাই প্রভৃতি বিভিন্ন চৈতালী শস্য, পাট, লাক্ষা প্রভৃতি নানা জাতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা ধুলিয়ান সহরকে বাংলা ও বিহারের সীমান্তে খ্যাতিমান করিয়াছিল। গত চার বৎসরে পদ্মার ভাঙনে এ বিখ্যাত গঞ্জ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। প্রত্যেক বর্ষায় এই ভাঙন আরম্ভ হয় এবং জল নামিয়া যাওয়ার পরেও অট্টালিকা, আড়ৎ কলকারখানা প্রভৃতি সমেত সহরের নদীপার্শ্বস্থ অংশগুলি ভাঙিয়া নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়। ইহার কোনও প্রতিবিধান এ যাবৎ সম্ভব হয় নাই। স্থানীয় জনগণের ধারণা ফরক্কায় গঙ্গাবাঁধ নির্মিত না হইলে এই বিভীষিকা বন্ধ হইবেও না।

ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ধুলিয়ান সহরকে মুর্শিদাবাদের এক নদী পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ বাণিজ্যের স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কতিপয় গ্রামকে একত্রিত করিয়া ধুলিয়ান পৌর সভার পত্তন করা হয়। ১৯১১ সালে ধুলিয়ানের লোক সংখ্যা ছিল ৮২৯৮ এবং ১৯৫১ সালে

বঙ্গ ও বিহারের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত বলিয়া ধুলিয়ান একটি বৃহৎ ব্যবসায়ের কেন্দ্র রূপে দুই প্রদেশেই সুপরিচিত। নবাবী আমলেও ধুলিয়ান গঞ্জ রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে মাড়োয়ারী, গুজরাটি, ভাটিয়া বা বিহারী ব্যবসায়ীরাও বহুকাল হইতে আড়ৎ বা কারখানা চালাইয়া আসিতেছে। ধুলিয়ানে প্রধানতঃ পাট, রবিশস্য, ডিম ও লাক্ষার চালানী কারবার চলিতেছে। তাহা ছাড়া বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে এখান হইতে বিড়ি, বিড়ির তামাক-পাতা ও লৌহের দ্রব্যাদি পদ্মার অপর পারে চালান যাইত। ফলে এখানে কয়েকটি কলও স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশের সহিত কোটি কোটি টাকার কারবার ধুলিয়ান হইতে চলিত। প্রতিবৎসর মাত্র বিক্রয়কর হিসাবে এখান হইতে সরকারী তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় হইত।

বর্ত্তমানে সে ধুলিয়ান আর নাই। গত চার বৎসর যাবৎ গঙ্গার ভাঙ্গনে ধুলিয়ান সহরের বর্দ্ধিষ্ণু অংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। উপরিস্থ বৃহৎ অট্টালিকা, কলকারখানা, গুদাম আড়ৎ, বাজার, ডাকঘর, থানা সমস্তই গঙ্গার জলে তলাইয়া গিয়াছে। প্রায় ১১৭৭ একর জমির

ভাঙ্গনে চলিয়া গিয়াছে। অনেক কাল পুর্ব্বে পুরাতন ধুলিয়ান সহর এইভাবে লুপ্ত হয়। বর্ত্তমান সহরের অবস্থান যেখানে সেখান হইতে ছয় মাইল দূরে গঙ্গার তীরে পুরাতন সহর ছিল। বর্ত্তমানে সহরের চারটি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র কাঞ্চনতলা ওয়ার্ডটি সম্পূর্ণ আছে। অনুপনগর ও লালপুর ওয়ার্ডের বেশীর ভাগ গিয়াছে এবং পরাণপাড়া ওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। অপর দিকে পদ্মার প্রধান জলস্রোতের অপর পারে এক তিন মাইল বিস্তৃত দীর্ঘ চর জাগিয়া উঠিয়াছে। এই চরও এককালে বিধ্বস্ত ধুলিয়ান সহরের অংশ ছিল। গঙ্গার ভাঙনে মহাজন পটি, বাজার আড়তের সহিত দরিদ্র মোমিন, দর্জ্জি ও মিস্ত্রিদের পাড়াগুলিও ধ্বংস হইয়াছে। যাহারা পাকা ঘরে বাস করিত নদী নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা ইমারৎ হইতে ইট কাঠ যাহা পারিয়াছে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে এবং রেল লাইনের অপর পারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু গৃহহারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দ্দশা এখনও কাটে নাই। বর্ত্তমানে বহু দরিদ্র পরিবার রেললাইনের কাছাকাছি অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কোনও প্রকারে বসবাস করিতেছে। দিনমজুরের দল আজ পর্য্যন্ত বসবাসের কোনও ঠাঁই করিতে পারে নাই। গঙ্গার ভাঙ্গনে গৃহচ্যুত পরিবারের সংখ্যা ধুলিয়ান সহর ও নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে প্রায় ৩০০০ হইবে। কোনও কোনও পরিবারের গৃহ একাধিকবার গঙ্গার গহ্বরে গিয়াছে। সেই কারণে গৃহচ্যুত পরিবারগুলি বর্ত্তমানে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে বাঁশ ও চাটাইএর ঘর তুলিয়াছে, যে ঘরে বর্ষাকালে বসবাস করা দুঃসাধ্য।

গত চার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত কাটার ফলে বর্ত্তমানে বারহারওয়া ব্যাণ্ডেল লুপ লাইনের ধুলিয়ান ও তিলডাঙ্গা ষ্টেশন দুইটির মধ্যবর্ত্তী প্রায় আট মাইল রেলের বাঁধ বিপন্ন হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে অল্পদূরে বাগমারী রেল সাঁকোর উপর হইতেও লাইন-বীম বা স্লীপার রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সরাইয়া লইয়াছেন। উক্ত সাঁকোর অল্প কিছু উত্তর পশ্চিমে রেলপথের বাঁধের অনেকাংশ পদ্মার ভাঙনে লোপ পাইয়াছে এবং কাছাকাছি বাঁধের অনেকাংশ পদ্মার ভাঙনে লোপ পাইয়াছে ও কাছাকাছি বাঁধের নানা স্থানেই ভাঙন লাগিয়াছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তিন মাইলের কিঞ্চিদধিক রেলপথের সমস্ত কিছুই উঠাইয়া লইয়াছেন এবং ধুলিয়ান হইতে তিলডাঙ্গা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ট্রেণ চালাইবার জন্য অন্য পথ নির্দ্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ধুলিয়ানের ওধারে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে এতদঞ্চলের বিশেষ করিয়া ফরাক্কা ও সমশেরগঞ্জ থানার অধিবাসীদের বিপন্ন হইতে হইয়াছে। তিলডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে সাধারণতঃ ফরাক্কা গঙ্গাবাঁধ নির্ম্মাণের স্থানে যাওয়া যায়। ট্রেণ চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে সেখানে যাতায়াতও বিশেষ আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কতদিনে নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া ধুলিয়ানের সহিত বিহারের সংযোগ সাধন হইবে তাহা বলা যায় না। তবে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হওয়ার জন্য যাত্রীদের যে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে, নদী পথে মোটর লঞ্চ যোগে যাত্রীবহনের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার বহুলাংশে লাঘব হইত। কিন্তু এ যাবৎ যাত্রী বা মাল-পরিবহনের জন্য নদী পথে কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। ধুলিয়ান হইতে মালদহ যাতায়াতের জন্য ষ্টীমার চলিতেছে বটে; কিন্তু ফরাক্কা থানার নানা গ্রামে যাতায়াত করিবা জন্য এখন দ্বিচক্রযান কিম্বা হাঁটাপথই একমাত্র উপায়। ফলে স্থানী ছোট দোকানদার ও ফেরীওয়ালাদের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

ধুলিয়ান সহর বার বার ভাঙনের মুখে পড়ার ফলে অধিবাসীগণ রেল লাইনের অপরপারে কাঞ্চনতলা ওয়ার্ডে সরিয়া গিয়াছে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। সাধ্যমত মূল্য দিয়া যে যেখানে পারিতেছে জমি খরিদ করিয়া কুটির নির্ম্মাণ করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া জমিদার উচ্চমূল্য হাঁকিতেছেন, যাহাদের সঙ্গতি আছে, তাহারা উচ্চ দামেই জমি ক্রয় করিতেছে। আর যাহাদের জমিক্রয় সাধ্যাতীত, তাহারা বিব্রত হইতেছে। অর্থশালী ব্যবসায়ীরা উচ্চমূল্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে জমি ক্রয় করিয়া পুনরায় দোকান ও আড়ৎ তৈয়ার করিয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে পুনরায় বাজার, গদী ও আড়ৎ গড়িয়া উঠিতেছে যদিও তাহার ফলে মাল আমদানী রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে অঞ্চলে নূতন বাজার বসিয়াছে সে অঞ্চলের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা দেখিয়া মনে হয় না যে ধুলিয়ান সহরে পৌর শাসন ব্যবস্থা এখনও বর্ত্তমান।

ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবর্গ সরকারের নিকট ভাঙন-বিধ্বস্ত সহরবাসীর জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের আবেদন করিয়াছিলেন। বিধান সভার সদস্যবৃন্দ, এমন কি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মহাশয়ও ধুলিয়ানে আসিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। সরকারী সাহায্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য অনুরোধ সহরবাসীর পক্ষে তাহাদের সকাশেও করা হইয়াছে। কিন্তু ধুলিয়ানবাসীর ভাগ্যে কিছু জমাট দুধ ও কিছু কাপড় ছাড়া অন্য সাহায্য মিলিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। সরকারী ঋণ প্রার্থনা করিতে হইলে যে জমি বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে তাহার দলিল বা চেক দেখাইতে হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে গৃহহারা দরিদ্রদের জমিদার পক্ষ হইতে চেক পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। কাজেই ভাঙন বিধ্বস্ত অধিবাসীদের পুনর্বসতি সহজসাধ্য হয় নাই। ইহা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় সরকার হইতে যদি জমির মালিককে টাকা দিয়া প্রজার নামে দলিল লিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। মোটের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান আছে বলিয়া মনে হয় না।

ধুলিয়ান ও নিকটবর্ত্তী ভাঙন-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ফরাক্কার গঙ্গাবাঁধ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা বিশেষ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ফরাক্কায় গঙ্গাবাঁধ নির্ম্মাণের সম্ভাব্যতা তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও স্বস্তির সঞ্চার করিয়াছিল। কারণ তাহারা জানে যে ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মিত হইলে পদ্মার প্রধান স্রোতের গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইত এবং বর্ত্তমানে ধুলিয়ানের যে অংশ টিকিয়া আছে সেটুকুও বাঁচিয়া যাইত। সহরবাসী পুনঃ পুনঃ গঙ্গার ভাঙনে গৃহহারা হইত না। তাহারা এখনও বিশ্বাস করে ফরাক্কায় গঙ্গাবাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। যদিও সাম্প্রতিক নানা প্রকার পরস্পরবিরোধী সংবাদে ধুলিয়ানবাসী হতাশ হইয়া পড়িতেছে, তত্রাচ তাহাদের বাসভূমি রক্ষার জন্য ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ [illegible]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাতক ঠাকুরের দূরদর্শিতা

বেতসকুঞ্জে দণ্ডার্ধকাল বসিয়া থাকিয়া রঙ্গনা উঠিল। আবার কলসী কাঁখে নদীর পানে চলিল।

হেমন্তের মৌরী নদী নিজের খাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেশী চওড়া নয়, কিন্তু স্রোতের টান আছে; অদূর পর্বতগুহা হইতে যে দুরন্ত চঞ্চলতা লইয়া বাহির হইয়াছিল তাহা এখনও শান্ত হয় নাই। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জল, তল পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রবেশ করিয়াছে; তলদেশে শুভ্র নুড়িগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দুই দিকের উপলবিকীর্ণ তীরভূমি সমতল নয়; কোথাও প্রক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড মাথা তুলিয়া আছে, কোথাও প্রবণ বেলাভূমি ক্রমাবনত হইয়া নদীতে মিশিয়াছে।

এইরূপ একটি বেলাভূমিতে বেতসগ্রামের স্নান-ঘাট। বাঁধানো ঘাট নয়, নুড়ি বিছানো স্বাভাবিক ঘাট। কিন্তু আজ ঘাটে কেহ নাই; এ সময় যাহারা ঘাটে আসিত তাহারা নৃত্যগীতে মত্ত।

রঙ্গনা আসিয়া কলস পূর্ণ করিয়া ঘাটে রাখিল, তারপর স্নান করিতে জলে নামিল। এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সে অন্যমনস্কভাবে চুলের বিননি খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে আহ্বান আসিল—'রাঙা মেয়ে! রাঙা মেয়ে!'

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল—দক্ষিণ দিক হইতে নদীর তীর ধরিয়া চাতক ঠাকুর আসিতেছেন। তাঁহার এক হাতে কয়েকটি সনাল পদ্ম, অন্য হাতে পদ্মপাতার একটি ঠোঙা।

চাতক ঠাকুরের বয়সের যদিও কেহ হিসাব রাখে না তথাপি তাঁহার দেহযষ্টি এখনও অটুট ও কর্মক্ষম আছে। বেণুবংশের ন্যায় শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, গাত্রবর্ণ শুষ্ক তালপত্রের ন্যায়। সুদূর অতীতে মাথায় ও মুখে হয়তো চুল ছিল, এখন একটিও নাই। তুণ্ড সম্পূর্ণ দন্তহীন। তবু রেখাঙ্কিত মুখে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্ত শ্রী আছে। অঙ্গে বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই, কটিতটে কেবল একটি কষায়বর্ণ বস্ত্র জড়ানো; তাহাও হাঁটু পর্যন্ত। সেকালে স্ত্রীপুরুষ কাহারও কটিবাস হাঁটুর বেশী নীচে নামিত না; তবে মেয়েরা বসনাঞ্চল দিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করিত। আগুল্ফলম্বিত শাটী পরিধানের রীতি ছিল না।

রঙ্গনা চুলগুলি হাত-ফের দিয়া জড়াইতে জড়াইতে তীরের দিকে ফিরিল—'ঠাকুর! কোথায় গিয়েছিলেন?'

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন,—'তোর জন্যে কি এনেছি দ্যাখ। মৌরলা মাছ!' বলিয়া পদ্মপাতার ঠোঙা খুলিয়া দেখাইলেন।

রঙ্গনার মুখেও হাসি ফুটিল। মৌরী নদীতে মাছ আছে; কিন্তু যে ধরে সেই খায়, বিতরণ করে না। রঙ্গনার ভাগ্যে মৌরলা মাছ বড় একটা জুটিয়া ওঠে না। অথচ তখনকার দিনে মৌরলমচ্ছ সংযোগে ওগ্‌গরাভত্তা অতি উপাদেয় ভোজন বিলাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বহু শতাব্দী পরেও রসনা-রসিক কবিরা কদলীপত্রে তপ্ত ভাত, গব্য ঘৃত, মৌরলা মাছ ও নালিতা শাকের গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইতেন।

চাতক ঠাকুরের হাত হইতে ঠোঙা লইয়া রঙ্গনা কলসীর পাশে রাখিল, হাসিমুখে বলিল,—'মাছ আনতে গিয়েছিলেন?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন,—'মাছ আনতে যাই নি। ভোরবেলা উঠে ভাবলাম, আজ পর্বদিন, ঠাকুরদের পায়ে পদ্মফুল দেব, যাই দক্ষিণের বিল থেকে পদ্মফুল তুলে আনি। তিন কোশ বৈ তো নয়। গিয়ে দেখি জলগাঁয়ের জেলেরা মাছ ধরছে। তারাই পদ্মফুল তুলে দিলে, আর চারটি মৌরলা মাছও দিলে। তা ভাবলাম, নিয়ে যাই, আমার রাঙা মেয়ে খাবে।'

অদ্ভুত মানুষ এই দেবস্থানের পূজারী; ছয় ক্রোশ পথ

এক হাতে দেবতার পূজার ফুল, অন্য হাতে মৌরলা মাছ লইয়া ফিরিয়াছেন।

চাতক ঠাকুর যে সহজ সাধারণ মানুষ নয়, সত্যই একজন অদ্ভুত মানুষ, তাহা শুধু বেতসগ্রামের লোক নয়—দক্ষিণের আরও পাঁচখানা গ্রামের লোক জানিত। উপরন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার উপর দেবতার ভর হইত; তখন তিনি দেবাবিষ্ট হইয়া অতি আশ্চর্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীরা অবাক হইয়া যাইত। প্রবীণ ব্যক্তিরা বলিত, 'ঠাকুরের বায়ু রোগ আছে, থাকিয়া থাকিয়া বায়ু কুপিত হয়।

ঠাকুরের বায়ু কুপিত হওয়ার কথা রঙ্গনা মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কিন্তু কখনও চোখে দেখে নাই। আজ আকস্মিক ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়া গেল।

চাতক ঠাকুর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন—'যাই, দেবস্থানে ফুল চড়াই গিয়ে।—মৌরলা মাছের কী রাঁধবি ?'

রঙ্গনা জানিত মাছের প্রতি ঠাকুরের লোভ নাই, তিনি নিরামিষাশী। সে সলজ্জ কণ্ঠে বলিল,—'মা যা বলবে তাই রাঁধব।'

'টক্ রাঁধিস্'—বলিয়া রঙ্গনার প্রতি সস্নেহ স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। একটা সোনাপোকা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া রঙ্গনার সীমন্তের উপর বসিল; কালো চুলের মাঝখানে সোনাপোকাটা জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। রঙ্গনা জানিতে পারিল না, কিন্তু চাতক ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, তিনি স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন—'তোর সিঁথেয় সিঁদুর কেন রে রাঙা মেয়ে ?'

সিঁদুর ! রঙ্গনা চমকিয়া চুলের উপর হাত রাখিতে গেল, অমনি সোনাপোকা ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল। রঙ্গনা উড্ডীয়মান পতঙ্গটাকে উজ্জ্বল চক্ষে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া উঠিল,—'সোনাপোকা !'

চাতক ঠাকুর কথা না বলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে একটি প্রস্তর পট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন, মরীচিকার দৃশ্য দেখিতেছে এমনিভাবে শূন্যে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের এই দেবাবেশ দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইল; তারপর সতর্কভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে জানিত এ সময়ে কথা কহিতে নাই, ঠাকুরকে জাগাইবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

চাতক ঠাকুর যতক্ষণ অদৃশ্য লোকের স্বপ্ন দেখিতেছেন এই অবকাশে আমরা তাঁহার অতীত সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিয়া লই।

অনুমান ষাট বছর আগে, গ্রামের বর্তমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন বালকবালিকা ছিল, তখন একদিন চাতক ঠাকুর কোথা হইতে বেতসগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই বগলে দুইটি প্রস্তরমূর্তি। ঠাকুরের চেহারা একটু ক্ষেপাটে গোছের, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়।

বেতসগ্রাম চিরদিন অতিথি বৎসল; গ্রামের তাৎকালিক প্রবীণ ব্যক্তিরা চাতক ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি তৎকালে নিজের কি পরিচয় দিয়াছিলেন, কোথা হইতে আসিতেছেন, কোন বর্ণ—কী গোত্র, এ সকল কথা এখন আর কাহারও স্মরণ নাই। তাঁহার বয়সের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই; চেহারা দেখিয়া মনে হইয়াছিল মধ্যবয়স্ক।

যাহোক, চাতক ঠাকুর গ্রামে রহিয়া গেলেন। দেবস্থানের অশ্বত্থবৃক্ষ তলে তখন কেবল একটি ধ্বজা প্রোথিত থাকিত, ওই ধ্বজার মূলেই গ্রামের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদিত হইত। চাতক ঠাকুর তাঁহার আনীত মূর্তি দুটি ধ্বজার দুই পাশে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মূর্তি দুটির একটি বুদ্ধমূর্তি এবং অন্যটি বিষ্ণু বিগ্রহ—সেজন্য কাহারও আপত্তি হইল না। বরং একসঙ্গে এক জোড়া দেবতা পাইয়া গ্রামবাসীরা উৎফুল্ল হইল। সে সময় উপাস্য দেবতা লইয়া বেশী বাছ-বিচার ছিল না; পূজার মাত্র যা-হোক একটা থাকিলেই হইল। অধিকন্তু ন দোষায়। যাহার যেটা ইচ্ছা পূজা করিবে।

গিয়াছে; আরও দুই পুরুষ কাটিয়াছে। চাতক ঠাকুরের কিন্তু ক্ষয়-ব্যয় নাই, তিনি তাঁহার শিলা-বিগ্রহের মতই অবিনশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে জল্পনা করে। কেহ বলে তাঁহার বয়স আশী; কেহ বলে শটকে পুরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসেন, উত্তর দেন না; নিজের বয়স কত তাহা তিনি নিজেই জানেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত নিজের সম্বন্ধে তাঁহার মন সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি তিন পুরুষ ধরিয়া গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; রোগে এমন সেবা করিতে আর দ্বিতীয় নাই। দুই চারিটি শিকড়-বাকড় মুষ্টিযোগও জানেন এবং প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনও ভাবনা-চিন্তা নাই। দেবস্থানের পূজা, দিনান্তে দুটি তণ্ডুল এবং হাসি-মুখে নির্লিপ্তচিত্তে গ্রামবাসীদের সকল কাজে সাহচর্য—ইহাই তাঁহার জীবন।

গ্রামবাসীরা সস্নেহে বলে—আমাদের পাগলা ঠাকুর। মাঝে মাঝে বায়ু কুপিত হয় বটে কিন্তু এমন আপনভোলা মানুষ হয় না।

বায়ু রোগই হোক আর দেবাবেশই হোক, মৌরীর ঘাটে প্রায় একদণ্ড কাল হতচেতন অবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর চাতক ঠাকুরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; তাঁহার চোখের দৃষ্টি আবার সহজ হইল। রঙ্গনা এতক্ষণ দুই চক্ষে উৎকণ্ঠা ভরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ক্ষীণ হাসিলেন। রঙ্গনা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। চাতক ঠাকুর স্খলিতপদে গিয়া নদীর জলে মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মাথায় জল দিলেন। তারপর আবার শিলাপট্টে আসিয়া বসিলেন। এই একদণ্ড সময়ের মধ্যে তাঁহার শারীরিক শক্তি যেন সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

রঙ্গনা তাঁহার পাশে বসিয়া সংহত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'ঠাকুর! কী হয়েছিল?'

চাতক ঠাকুর ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন—'তোর চুলে সোনাপোকা বসেছিল; আমার মনে হল, সিঁদুর ডগ্‌ডগ করছে। সেইদিকে চেয়ে রইলাম। তারপর দেখতে দেখতে সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, নদী ঘাট কিছু রইল না। তার বদলে 'দেখলাম যুদ্ধ হচ্ছে—হাজার হাজার লোক অস্ত্র নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করছে। আহত মানুষের কাৎরানি, হাতী ঘোড়ার ছুটোছুটি—আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ছে, গম্‌গম্ শব্দে রণভেরী বাজছে—ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—'

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়াছে, যুদ্ধ তাহার অপরিচিত নয়। সে বলিল—'কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন—'তা জানি না। ঐ দিকে—উত্তর দিকে। দুই পাশে পাহাড়, একদিকে প্রকাণ্ড নদী, আর একদিকে জঙ্গল; তার মাঝখানে যুদ্ধ হচ্ছে।'—

'তারপর?'

'অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলল। দক্ষিণ দিকের দল হটে যেতে লাগল। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী উল্কার বেগে বেরিয়ে এল—ঘোড়া ছুটিয়ে এই দিকে পালিয়ে আসতে লাগল। শাদা ঘোড়ার পিঠে প্রকাণ্ড-শরীর আরোহী, তার কপালে তলোয়ারের কাটা দাগ, রক্ত ঝরছে।—শাদা ঘোড়া আর আরোহী জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

'আর কি দেখলেন?'

'ক্রমে যুদ্ধ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দক্ষিণের দল পালাতে লাগল; বিজয়ী দল তাদের তাড়া করল। দেখতে দেখতে রণস্থল শূন্য হয়ে গেল, কেবল মরা মানুষ হাতী ঘোড়া পড়ে রইল।'

'আর কিছু দেখলেন না?'

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া একবার আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন—'আর একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম। শূন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আকাশের পানে চোখ তুলে দেখি। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রকাণ্ড একটা মেঘ ছুটে আসছে, কালবোশেখীর কালো মেঘ। মেঘ যখন আরও কাছে এল তখন দেখলাম, মেঘ নয়—ধুলোর ঝড়! যেন ঐদিকের কোনও মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, তাই ধুলো-বালি উড়ে আসছে। চক্ষের নিমেষে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল, সূর্যের আলো নিভে গেল। আর কিছু দেখতে পেলাম না; অন্ধকারে অন্ধের মত বসে রইলাম।—তারপর আস্তে আস্তে চোখের সহজ দৃষ্টি ফিরে এল।'

ছিল, সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'এর মানে কি ঠাকুর?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন—'তা জানিনা রাঙা মেয়ে। মনে হয় বড় দুর্দিন আসছে। ঐ যে মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, এ ঝড়ের ঝাপটা আমাদের গায়েও লাগবে, আমাদের ঘরের মট্‌কাও উড়ে যাবে—কিছুক্ষণ নতমুখে নীরব থাকিয়া তিনি উদ্বিগ্ন চক্ষু তুলিয়া রঙ্গনার পানে চাহিলেন—'কিন্তু তোর সিঁথেয় সিঁদুর দেখলাম কেন রে রাঙা মেয়ে? তোর কি তবে বিয়ের ফুল ফুটেছে! কোথা থেকে বর আসবে? কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্তুর আসবে?' বলিয়া তিনি স্নেহকম্পিত করাঙ্গুলি দিয়া রঙ্গনার চিবুক তুলিয়া ধরিলেন।

সলজ্জে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল, তাহার মা কখন অলক্ষিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লজ্জায় আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল—'তোর দেরি হচ্ছে দেখে এলাম। তুই এখন ঘরে যা। আমি ঠাকুরের সঙ্গে দুটো কথা বলব।'

রঙ্গনা কলসী ও মৌরলা মাছের ঠোঙা লইয়া চলিয়া গেল। গোপা তখন প্রস্তরপট্টের উপর বসিয়া বলিল—'ঠাকুর, কি কথা বলছিলেন রাঙাকে, আমায় বলুন। ওর কি বিয়ের ফুল ফুটেছে? কবে কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা। আপনি কী জানতে পেরেছেন বলুন।'

চাতক ঠাকুর তখন দিব্য চক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ গোপাকে শুনাইলেন। শেষে বলিলেন—'রাঙা মেয়ের চুলে সোনাপোকা বসেছিল, ঠিক সিঁদুরের মতন দেখাচ্ছিল; তাই ভাবছি ওর বুঝি সিঁদুর পরবার সময় হয়েছে—দেবতারা তাই ইসারায় জানিয়ে দিলেন।'

গোপা ব্যাকুল হইয়া বলিল—'কিন্তু কি করে হবে ঠাকুর? গ্রামের কোনও ছেলে কি?—কিন্তু তাই বা কি করে হবে? মোড়লদের ভয়ে গাঁয়ের ছেলেরা যে ওর পানে চোখ তুলে তাকায় না। নইলে আমার রাঙার মত মেয়ে—'

চাতক ঠাকুর ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'গাঁয়ের জানে? মহাভারতের গল্প শুনেছ তো। শকুন্তলা বনের মধ্যে মুনির আশ্রমে থাকত; কোথা থেকে হঠাৎ এলেন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে। রাঙা মেয়েরও তেমনি দুষ্মন্ত আসবে। তুমি ভেবো না।

গোপা চাতক ঠাকুরের পায়ের উপর নত হইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—'ঠাকুর, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোনাপোকা

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে উৎসবকারীরা ক্লান্ত দেহে এবং ঈষৎ মদমত্ত অবস্থায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। মাঠের মাঝখানে ইক্ষুযন্ত্রটা নিঃসঙ্গভাবে দণ্ডায়মান ছিল; কেবল কয়েকটা কাক ও শালিখ পাখী তখনও আখের ছিব্‌ড়ার মধ্যে মাদকদ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

গোপা ও রঙ্গনা আপন কুটিরে ছিল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া গোপা মেয়েকে ডাকিল—'রাঙা, আয় তোর চুল বেঁধে দিই।'

রঙ্গনা মায়ের সম্মুখে আসিয়া বসিল। গোপা তাহার চুলে তেল দিল, কাঁকই দিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইয়া সযত্নে বেণী রচনা করিল। তারপর কানড় সাপের ন্যায় দীর্ঘ বেণী জড়াইয়া জড়াইয়া কবরী বাঁধিয়া দিল। পক্ক তাল ফলের ন্যায় সুপুষ্ট কবরী রঙ্গনার মাথায় শোভা পাইল।

চুল বাঁধিয়া গোপা নিজের আঁচল দিয়া রঙ্গনার মুখখানি অতি যত্নে মুছিয়া দিয়া ললাটতটে খদিরের টীপ পরাইয়া দিল, স্নেহক্ষরিত চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়া গণ্ডে একটি চুম্বন করিল।

রঙ্গনা মায়ের এমন স্নেহার্দ্র কোমলভাব কখনও দেখে নাই, সে লজ্জা পাইল। সে কেমন করিয়া জানিবে তাহার মায়ের মনের মধ্যে কী হইতেছে। গোপার মন আশায় আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার যেন আর তর্ সহিতেছিল না। কবে আসিবে রঙ্গনার বর? এখনি আসে না কেন? চাতক ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি সে কেবলই মনে মনে দেবতার উদ্দেশে বলিতেছিল—

আজ্ঞার পদধূলি মাথায় লইয়া রঙ্গনা সলজ্জ চক্ষু তুলিল—'মা, পলাশ বনে আল্‌তা-পোকা খুঁজতে যাই ?'

গোপা বলিল—'তা যা। ঘটি নিয়ে যাস, একেবারে বাথান থেকে দুধ দুয়ে ফিরবি।'

রঙ্গনা ঘটি লইয়া পলাশ বনের দিকে চলিল। আজ পূর্বাহ্ণে চাতক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাহার মনেও যেন কোন মধুর ভবিতব্যতার বাতাস লাগিয়াছে। মন উৎসুক উন্মুখ, প্রাতঃকালের বিষণ্ণ বিরসতা আর নাই।

বনে প্রবেশ করিয়া রঙ্গনা দেখিল, সেখানে আরও কয়েকটি গ্রামযুবতী উপস্থিত হইয়াছে। তাহারাও দোহন-পাত্র লইয়া আসিয়াছে, বাথানে গো-দোহন করিয়া ঘরে ফিরিবে। কারণ উৎসব উপলক্ষে আর সব কাজ বন্ধ রাখা চলে, গো-দোহন না করিলে নয়। যুবতীদের সকলেরই একটু প্রগল্‌ভ অবস্থা, ইক্ষুরসের প্রভাব এখনও দূর হয় নাই। তাহারা রঙ্গ-রসিকতার ছলে পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; স্খলদঞ্চলা হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে চটুল বাক্‌-চাতুর্যের বিনিময় হইতেছে তাহাতে আদিরসের ব্যঞ্জনাই অধিক।

রঙ্গনা তাহাদের দেখিয়া একটু থতমত হইল। কিন্তু পলাশবন বিস্তীর্ণ স্থান, সে তাহাদের এড়াইয়া অন্যদিকে গেল। যুবতীরা রঙ্গনাকে দেখিয়াছিল; তাহারা চোখ ঠারাঠারি করিয়া নিম্নকণ্ঠে হাস্যালাপ আরম্ভ করিল।

তাহাদের ভাঙা ভাঙা হাসির শব্দ রঙ্গনার কানে আসিতে লাগিল। উহারা যে তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে তাহা বুঝিয়া রঙ্গনার গালদুটি উত্তপ্ত হইল; কিন্তু সে তাহাদের ছাড়িয়া বেশী দূরেও যাইতে পারিল না। এই সমবয়স্কা যুবতীদের প্রতি তাহার মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল না; বরং তাহাদের সহিত মিশিয়া তাহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিবার গভীর ক্ষুধা তাহার অন্তরে ছিল, কিন্তু তবু উপযাচিকা হইয়া তাহাদের সমীপবর্তিনী হইবার হঠতাও তাহার ছিল না। সারাজীবনের একাকীত্ব তাহাকে ভীরু করিয়া তুলিয়াছিল।

লাক্ষাকীটের অন্বেষণে বিমনাভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা সোনাপোকা দেখিয়া রঙ্গনা উৎফুল্ল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। আবার আশ্রয় খুঁজিতেছিল; সে একটা বৃক্ষকাণ্ডে বারবার বসিতেছিল, আবার উড়িয়া যাইতেছিল। তাহার অঙ্গে আলোর ঝিলিক খেলিতেছিল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ সন্তর্পণে স্কন্ধ হইতে আঁচল নামাইয়া হাতে লইল, তারপর টিপিয়া টিপিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। সোন বা কাঁচপোকা দেখিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয় না—এমন সেকালে ছিল না, একালেও নাই।

রঙ্গনা আঁচল হাতে লইয়া গাছের নিকটবর্তিনী সোনাপোকাটা উড়িয়া গেল; কিন্তু বেশী দূর গেল কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল। রঙ্গনার মনে হইল, যে পোকা আজ সকালে তাহার চুলে বসিয়াছিল এ সোনাপোকা। সে মহা উৎসাহে তাহার পিছনে করিতে লাগিল।

যুবতীরা দূর হইতে সোনাপোকা দেখিতে পা না, কেবল রঙ্গনার ছুটাছুটি দেখিতেছিল। দেখিবার পর একটি যুবতী বলিল—'রঙ্গনা এমন করছে কেন ভাই? ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌—ঠিক যেন বাথ গাই!' *

রসিকতা শুনিয়া অন্য যুবতীরা হাসিয়া মাটিতে পড়িল! আর একজন বলিল—'তা হবে না? অত আইবুড় মেয়ে—!'

ওদিকে রঙ্গনা আরও কিছুক্ষণ সোনাপোকার করিয়া অবশেষে তাহাকে আঁচল চাপা দিয়া ধরিয়া চোখে মুখে উচ্ছল আনন্দ, আঁচলসুদ্ধ সোনাপোকাকে মধ্যে লইয়া কানের কাছে আনিয়া শুনিল, মুঠির ভি হইতে আবদ্ধ সোনাপোকার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন আসিতেছে।

এই সময় তাহার চোখে পড়িল, যুবতীরা অদূরে কৌতূহল সহকারে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ছুটিয়া কাছে গিয়া কলোচ্ছল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ও ভাই, আমি সোনাপোকা ধরেছি!'

যুবতীরা কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। তারপর মেয়েটি বাথানিয়া গাইয়ের রসিকতা করিয়াছিল সে

কহিল। তাহার নাম মঙ্গলা ; যুবতীদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা বাক্-চটুলা। মঙ্গলা বলিল—'ওমা সত্যি ? তা ভাই তুমি তো সোনাপোকা ধরবেই, তোমার তো আর আমাদের মতন গুব্‌রে পোকার বরাত নয়। একটু দেরিতে ধরেছ, এই যা। তা কেমন সোনাপোকা ধরলে দেখি ! সত্যি সোনাপোকা বটে তো ?'

রঙ্গনা এই বাক্যের ব্যঙ্গার্থ বুঝিল কিনা বলা যায় না ; সে মঙ্গলার কাছে গিয়া তাহার কানের কাছে সোনাপোকার মুঠি ধরিল, বলিল—'হ্যাঁ, সত্যি সোনাপোকা। এই শোনো না।'

মঙ্গলা মুঠির মধ্যে গুঞ্জন শুনিল। আরও কয়েকটি যুবতী কান বাড়াইয়া দিল ; তাহারাও শুনিল। মঙ্গলা বলিল—'গুন্ গুন্ করছে বটে। তা সোনাপোকা না হয়ে ভোমরাও হতে পারে।—হাঁ ভাই, সোনাপোকা ভেবে একটা কেলে-কিষ্টে ভোমরা ধরনি তো ?'

'না, সোনাপোকা'—বলিয়া রঙ্গনা যেন সকলের প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই অতি সাবধানে মুঠি একটু খুলিল। সোনাপোকা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভোঁ করিয়া বাহির হইয়া তীরবেগে অন্তর্হিত হইল।

রঙ্গনা বলিল--'ঐ যাঃ !'

যুবতীরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মঙ্গলা বলিল—'হায় হায়, এত কষ্টে সোনাপোকা ধরলে তাও উড়ে গেল। ধরে রাখতে পারলে না ? এর চেয়ে আমাদের গুব্‌রে পোকাই ভাল, তারা উড়ে পালায় না। কি বলিস ভাই ?' বলিয়া সখীদের প্রতি কটাক্ষ করিল।

সখীরা মুখে আঁচল দিয়া হাসিল। রঙ্গনার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। এতক্ষণে সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল, ইহারা তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছে। তাহার চোখ দুটি মাটিতে নত হইয়া পড়িল। স্খলিত আঁচলটি ধীরে ধীরে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া সে গমনোদ্যত হইল।

মঙ্গলা কহিল—'দুঃখ কোরো না ভাই, তোমার কপালে আবার সোনাপোকা আসবে। যার অমন রূপ, তার কি সোনাপোকার অভাব হয় ?'

রঙ্গনা তাহার প্রতি বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—'কী না। তোমার জন্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর আসবে।' বলিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে মঙ্গলা বাথানের দিকে চলিয়া গেল। অন্য যুবতীরাও তাহার সঙ্গে গেল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তারপর একটু রাগ হইল। সে মনে মনে বলিল—'আসবেই তো রাজপুত্তুর !'

রঙ্গনার অদৃষ্ট-দেবতা অন্তরীক্ষ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় একটু করুণ হাসিলেন। যে-ব্যঙ্গোক্তি অচিরাৎ সত্য-রূপ ধরিয়া দেখা দেয়, যে-কামনা সফলতার ছদ্মবেশ পরিয়া আবির্ভূত হয়, তাহার প্রকৃত মূল্য অদূরদর্শী মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে ?

অতঃপর রঙ্গনা কিয়ৎকাল বৃক্ষ শাখায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে বৃক্ষতল ছায়াচ্ছন্ন হইল। এতক্ষণে অন্য মেয়েগুলা গো-দোহন শেষ করিয়া নিশ্চয় বাথান হইতে চলিয়া গিয়াছে। রঙ্গনা নিজের দোহন পাত্রটি মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া বাথানের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় পিছন দিকে একটা শব্দ শুনিয়া সচকিতে ফিরিয়া চাহিল।

উত্তর দিকের তরুছায়ার ভিতর দিয়া এক পুরুষ শ্বেতবর্ণ অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া আসিতেছে। বিশালকায় পুরুষ ; তাহার পাশে ক্লান্ত স্বেদাক্ত অশ্বটিকে খর্ব মনে হয়। পুরুষের দেহে বর্ম চর্ম, কটিবন্ধে অসি, মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ ; কিন্তু দেশবাসের পারিপাট্য নাই। কপালে ক্ষতরেখার উপর রক্ত শুকাইয়া আছে। রঙ্গনা ও পুরুষ পরস্পরকে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। পুরুষ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইজনে কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর পুরুষ অশ্বের বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া রঙ্গনার দিকে অগ্রসর হইল। রঙ্গনার বুকের মধ্যে তুমুল স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্মোহিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল, চাতক ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে বিশালকায় পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে উল্কার বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এ কি সেই অশ্বারোহী ?

পুরুষ রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; রঙ্গনাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডল বিশদ হাস্যে

বোধ হয় গ্রাম আছে, কিন্তু গ্রামে যাবার আমার ইচ্ছা নেই। আমি রণক্লান্ত যোদ্ধা, আমাকে কিছু খাদ্য পানীয় দিতে পার?'

রঙ্গনা মোহাচ্ছন্নের ন্যায় চাহিয়া রহিল; তারপর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া আসিল—'তুমি কি রাজপুত্তুর?'

পুরুষের চক্ষে সবিস্ময় প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল। তারপর সে ঊর্ধ্বে মুখ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। প্রাণখোলা কৌতুকের হাসি। মানুষটি যে স্বভাবতই মুক্তপ্রাণ, তাহা তাহার হাসি হইতে প্রতীয়মান হয়। অবশেষে সহসা হাসি থামাইয়া সে বলিল—'আমার পরিচয় কি কপালে লেখা আছে? ভেবেছিলাম পরিচয় দেব না। কিন্তু তুমি ধরে ফেলেছ। তবে একটু ভুল করেছ, আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু আপাতত রাজা।'

এই পুরুষের সহজ বাক্‌ভঙ্গী এবং অকপট কৌতুকহাস্য শুনিয়া রঙ্গনা অনেকটা সাহস পাইয়াছিল, প্রথম সাক্ষাতের বিহ্বলতাও আর ছিল না। তবু বিস্ময় অনেকখানি ছিল। সে পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—'রাজা!'

পুরুষ বলিল,—'হাঁ, গৌড় দেশের রাজা। আমার নাম—মানবদেব।'

'কিন্তু—গৌড় দেশের রাজার নাম তো শশাঙ্কদেব।'

মানব নীরবে কিছুক্ষণ রঙ্গনার সরল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'মহারাজ শশাঙ্কদেব আজ আট মাস হল দেহরক্ষা করেছেন। আমি তাঁর পুত্র। তুমি বোধহয় বিশ্বাস কর না—'

অবিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা রঙ্গনার নয়। বিশেষত গ্রামে রাজা-রাজড়ার খবর কয়জন রাখে? কোন্ রাজা মরিল, কে নূতন রাজা হইল—এ সকল সংবাদ গ্রামাঞ্চলে বহু বিলম্বে আসে, আসিলেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনা। রঙ্গনা জন্মাবধি শুনিয়াছে শশাঙ্কদেব রাজা; রাজা যে মরিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার মনে আসে নাই। এখন মানবের শালপ্রাংশু আকৃতির দিকে চাহিয়া তাহার মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সে যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের জয় হোক।'

রাজাকে 'জয় হোক' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয় ইহা সে চাতক ঠাকুরের কাছে পৌরাণিক গল্প শুনিবার

মানব হাসিল। বলিল—'জয় আর হল কৈ? আজ তো পরাজয় হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যে জয়ন্ত ছিল—নৈলে—' বলিয়া মানব তাহার জয়ন্ত নামক রণঅশ্বের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অশ্বকে দেখিতে পাইল না। তৃষ্ণার্ত অশ্ব অদূরে জলের আঘ্রাণ পাইয়া নদীর দিকে গিয়াছে।

রঙ্গনার দিকে ফিরিয়া মানব বলিল—'পরাজিতকে সকলে ত্যাগ করে, জয়ন্তও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমি ভরসা।—তোমার নাম কি?'

রঙ্গনা নাম বলিল। মানব স্মিত-প্রশংস দৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলিল—'তোমার মত রূপসী রাজ-অবরোধেও বিরল। কপালে সিঁদুর দেখছি না; এখনও কি বিয়ে হয়নি?'

নেত্র অবনত করিয়া রঙ্গনা মাথা নাড়িল। মানব বলিল—'তোমাকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য লাগছে। এই সুদূর জনপদে তুমি কোথা থেকে এলে জানিনা, কিন্তু মনে হয় তোমার হৃদয় তোমার দেহের মতই কোমল। আমি তোমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম, আজ রাত্রির জন্য আমাকে রক্ষা কর।'

রঙ্গনার মনে পড়িল তাহার রাজপুত্র ক্ষুৎপিপাসাতুর। চকিতে মুখ তুলিয়া সে বলিল—'তুমি এখানে থাকো, আমি এখনি তোমার জন্যে দুধ দুয়ে আনছি।' বলিয়া দোহনপাত্র লইয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল মানব সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, এ কি পলাশবনের বনলক্ষ্মী! তারপর বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া সে নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

আজ হইতে ঠিক আট মাস পূর্বে গৌড়কেশরী শশাঙ্কদেব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শশাঙ্ক একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন অন্যদিকে তেমনি অসামান্য কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এক হাতে পূর্ববঙ্গের রাজ্যগৃধ্নু নৃপতিবৃন্দকে এবং অন্য হাতে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হর্ষবর্ধনের বিপুল রাজশক্তিকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার জীবদ্দশায় শত্রু গৌড়রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানব গৌড়ের সিংহাসনে

দুর্মদ বীর, তাহার বিপুল দেহে সিংহের পরাক্রম। কিন্তু তাহার স্বভাব উন্মুক্ত ও সরল, মনের কথা সে গোপন রাখিতে পারেনা; ছলচাতুরী তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যতদিন সে যুবরাজ ছিল ততদিন পিতার অধীনে সৈনাপত্য করিয়াছে, অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু মন্ত্রণা-সভায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে নাই। তাই সিংহাসন লাভের পরেও তাহার প্রকৃতিগত স্বধর্ম পরিবর্ত্তিত হইল না। যে-মন্ত্রিগণ শশাঙ্কের জীবিতকালে মাথা তুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখন মাথা তুলিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন; রাজ্যের কল্যাণচিন্তা ভুলিয়া আপন আপন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় তৎপর হইলেন। রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রাজ্যের মর্মকোষে কীট প্রবেশ করিল।

শত্রুপক্ষ এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা গোপনে হর্ষবর্ধনের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, তিনি সসৈন্যে গৌড়ের উত্তর প্রান্ত আক্রমণ করিলেন।

কজঙ্গলের শিলা-বন্ধুর উপত্যকায় ভাস্করবর্মার সহিত মানবের যুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার বিষ সেনাপতিদের মনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবার পর মানব বুঝিল, যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। রক্তাক্ত দেহে সে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল। এখন তাহার একমাত্র ভরসা শত্রুর আগে কর্ণসুবর্ণে পৌছিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আজ দ্বিপ্রহরে রণক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া সে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কজঙ্গল হইতে কর্ণসুবর্ণ বহু দূর, অশ্বপৃষ্ঠেও দুই দিনের পথ। মানব পলাশ-বনের ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগ্নদেহে ক্ষুৎপিপাসার্থ অবস্থায় বেতস গ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্মুখে রাত্রি, পশ্চাতে শত্রু আসিতেছে। এই উভয় সংশয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে মানব নিজ ভাগ্য চিন্তা করিতেছে—অতঃপর অদৃষ্ট-শক্তি তাহাকে কোন পথে লইয়া যাইবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ রহস্যের ভ্রূণ লুক্কায়িত আছে?—ভাবিতে ভাবিতে তাহার অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঙ্গনার পুষ্পপেলব যৌবন-লাবণ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধর্ম্মপ্রচার

শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ

পরমহংস স্বামী যোগানন্দ ও যোগদা সৎসঙ্গ—

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম সারা সভ্য জগতকে আলোক দান করিয়া আসিতেছে। এই সনাতন ধর্ম্মের বাণী আমেরিকারও অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক রূপটিকে যখন প্রকাশ করিয়াছিলেন, যুগ সভ্যতায় গর্ব্বোন্নত আমেরিকাবাসী তখন সহজেই সেই সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের বেদীতে মাথা নত করিয়াছে।

আজ বহু ভারতীয় সন্ন্যাসী আমেরিকায় আছেন যাঁরা প্রাচ্যের ভাব-ধারাকে বিশ্বসভ্যতার সহিত মিলাইয়া দিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। দৈহিক শক্তির বলে নহে, প্রচার-নৈপুণ্যের বাগজালে মগ্ন করিয়া নহে—বাসীদের প্রাচ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু ১৯২০ সালে পরমহংস স্বামী যোগানন্দ—যোগদা সৎসঙ্গের প্রতিনিধিরূপে বোষ্টননগরীতে আন্ত-র্জ্জাতিক মহাধর্ম্ম-সম্মিলনে যোগদান করেন এবং তার পর হইতে এই দ্বাত্রিংশৎ বৎসর ধরিয়া বহু মন্দির ও আশ্রম স্থাপন করিয়া প্রাচ্যের যোগসাধনার প্রতি আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ভারতীয় নানা সাধনার ধারা প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাদের মধ্যে পরমহংস যোগানন্দজীর প্রচারিত শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যমূলক শিক্ষার কথা যুক্তিপ্রবণ মনকে অধিক আলোড়িত করায় বহু কৃতবিদ্য মনীষী তাঁর শিক্ষাকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিলাইতে পারিয়াছেন।

আবাল্য বৈরাগী ধর্ম্মগতপ্রাণ পরমহংস যোগানন্দজী কৈশোরেই যোগ-

শয়ার অতি আধুনিক উন্নত দেশ জাপানে যান। সেথান হইতে ফিরিয়া সিয়া ভারতীয় শিক্ষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে মহারাজ ৺মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর র্থানুকুল্যে রাঁচি যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও ভারতীয় ধনায় গভীরভাবে নিযুক্ত থাকেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সাচ্যুসেটস্ প্রদেশের বোষ্টন নগরীতে উদারমতাবলম্বীদিগের সপ্তম-র্ষিক অধিবেশন আহুত হয়। উক্ত অধিবেশনে পরমহংস স্বামী যোগানন্দ রিজী ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তথায় তিনি ধর্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

আমেরিকায় যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক তাঁর শিক্ষায় আকৃষ্ট য় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বোষ্টন নগরীতে একটী সৎসঙ্গ সভা পিত হইল। ১৯২৪ সালে স্বামীজী কতিপয় ভক্ত ও অনুচরবর্গের হত প্রচার কার্যে বহির্গত হন।

পরমহংস যোগানন্দ

বোষ্টনের ডাক্তার এম, ডব্লিউ লুইস সাহেবের সাহায্যে তিনি নউইয়র্কে আসেন এবং তথাকার টাউন হলে তাঁর একটী মাত্র বক্তৃতায় বরাট কার্য্যের ভবিষ্যত সূচিত হয়।

প্রচণ্ড জড়বাদী আমেরিকাবাসীদের আধ্যাত্মিক-জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া ামীজি বিশেষ চমৎকৃত হন। তথায় বহু গণ্যমান্যব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ রেন। প্রায় পনর হাজার শ্রমিকের অন্নদাতা নিউইয়র্কের ষ্টাণ্ডার্ড টেক্সটাইল প্রোডাকটস্—কোমুনির প্রেসিডেণ্ট এলভিন হানসিকার স্বামীজির ার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমেরিকাবাসীদের আন্তরিকতায় উৎসাহিত ইয়া পরমহংস স্বামী যোগানন্দ তাঁদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত

প্রত্যেক সহরে তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন এবং হিন্দুধর্ম্মের বাণীপ্রচার করেন। ১৯২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় লস্ এঞ্জেলস্ সহরে এক বক্তৃতা করেন—এই সময় তাঁর সভায় পনেরো শত লোক দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। এঁদের চেষ্টায় লস্ এঞ্জেলসে মাউণ্ট ওয়াশিংটন পর্ব্বতোপরি সুরম্য অট্টালিকা ও উদ্যান মধ্যে যোগদা সৎসঙ্গের পাশ্চত্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

আমেরিকায় যোগদা সৎসঙ্গ 'Self Realization fellowship' নামে সমধিক পরিচিত। মার্কিনবাসীরা উদ্যোগী হইয়া চিকাগো, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডি, সি, কিডল্যাণ্ড, পিটস্‌বার্গ প্রভৃতি ২৫টী শাখা আশ্রম স্থাপন করেন। স্বামী যোগানন্দ সাধনার মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা বাড়াইয়াছেন তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন

কর্ণেল এ-আর-স্টাইমবার্গ, আমেরিকায় ভারতীয় দূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের স্ত্রী ও পরমহংস যোগানন্দ

—মৃত্যুর কিছু পূর্বে গৃহীত ফটো

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বহুনগরীর মেয়র কর্তৃক সরকারী ও বেসরকারী ভাবে স্বামীজির অভ্যর্থনায়। ১৯২৭ সালে প্রেসিডেণ্ট স্বামীজির কর্ম্ম প্রসারতার ও যোগদা সৎসঙ্গের শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি বিধায়ক সাধনা ও শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন।—আমেরিকায় নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন গির্জ্জায়, ক্লাবে ও ধর্ম্মোৎসবাদিতে পরমহংসজী আমন্ত্রিত হইয়াছেন ও সর্ব্বত্র সমভাবে ভারতীয় সাধনার কার্য্যকরী যোগশিক্ষার ধারার বাহকরূপে সমাদৃত হইয়াছেন। তাঁর নিকট প্রায় আঠা

আমেরিকায় বর্ত্তমানে প্রায় ৩৪টী কেন্দ্র আছে। ইহা ব্যতীত পৃথিবীর নানাস্থানে: ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাওয়াই এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রম স্থাপন করিয়া যোগদা সৎসঙ্গ হিন্দুধর্ম্মপ্রচার করিতেছে। মার্কিণবাসীদের সহিত বহু ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক স্বামীজির কার্য্যে আত্মদান করিয়া নানা কেন্দ্রে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্বর্ণজগতনগর নামে একটী বৃহৎ নগরও স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে স্বর্ণপদ্মের পার্পড়িযুক্ত হিন্দু মন্দিরের চূড়ায় সনাতন ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান। বহুদূর হইতে এই মন্দিরের তোরণ দ্বার দর্শকমাত্রকে আকৃষ্ট করে। এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, জরথুষ্ট্র, শঙ্করাচার্য্য, কনফিউসিয়াস, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মের সত্য সাধক প্রেমিক মাত্রই এই মন্দিরে আপনার অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারেন। এই মন্দিরে স্বামীজির পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও শ্রীগুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বরজীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে যোগদা সৎসঙ্গ, শ্যামাচরণ মিশন প্রতিষ্ঠান, দক্ষিণেশ্বর যোগদা মঠ, রাঁচি যোগদা আশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের স্থায়ী ভিত্তি আমেরিকায় শিষ্যদের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় পনের বৎসর মার্কিণের বিভিন্ন কেন্দ্রে ধর্ম্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার পর তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মহাপ্রস্থানের সময় তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা, মহীশূর, বোম্বাই, পুণা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি প্রধান শহরে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের বহু কৃতি মণীষী তাঁর প্রদর্শিত

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার জাতীয় পতাকাতলে অন্তিম শয়নে শায়িত যোগানন্দ

করিয়াছেন। অতি অল্পকাল ভারতে থাকিয়া তিনি পুনরায় আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি ১৯৪২ সালে হলিউড, ১৯৪৩ সালে সান ডিয়েগো, ১৯৪৭ সালে লংবীচ্ প্রভৃতি সহরে চার্চ্চ অফ অল রিলিজন্স স্থাপন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি একটী "হ্রদতীর্থ" প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে মুক্ত আকাশতলে একটী ছাদহীন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দিবসেই গান্ধী-স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় মহাত্মা গান্ধীর ভস্মাবশেষ রক্ষিত হয়। আমেরিকার প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন "ইণ্ডিয়া হাউস" যোগানন্দজী কর্ত্তৃক ১৯৫১ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে হলিউডে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার গভর্ণর রাইট অনারেব্‌ল্ গুডউইন নাইট এবং কন্সাল জেনারেল এম, আর, আহুজা ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। যোগানন্দজী গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ বহু প্রবন্ধ এবং মূল্যবান পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকগুলি লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীর প্রেরণা যোগাইয়াছে।

যোগের অলৌকিক শক্তি

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সাধুসভার সভাপতি, ভারতবর্ষের যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি এবং আমেরিকার সেলফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোসিপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট পরমহংস যোগানন্দ গিরিজী মহারাজ গত ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ লস্ এঞ্জেলিস শহরে আমেরিকার ভারতীয় দূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রদানান্তে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন।

সভায় উপস্থিত ভক্তশিষ্যবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুণ্যদেহ লস্ এঞ্জেলিসে সেলফ রিয়্যালাইজেশন ফেলোসিপের হেড কোয়ার্টার মাউণ্ট ওয়াশিংটন এষ্টেটস্ স্থিত আশ্রম ভবনে লইয়া আসেন। পরে ১১ই মার্চ্চ ১৯৫২ তারিখে পরমহংস যোগানন্দজীর শেষকৃত্য ও উপাসনাদি সমাপনান্তে তত্রত্য ফরেষ্ট লন্ এসোসিয়েশনের শবাগারের একটী গৃহে তাঁহার দেহ সমাধির অপেক্ষায় রাখা হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে তাঁহার দুইটী ভক্তশিষ্য শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট এবং ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশ, সেক্রেটারীকে একবার শেষ গুরু দর্শনের সুযোগ দিবার জন্য তথা হইতে তারবার্ত্তায় একটী আমন্ত্রণ আসে। উক্ত

ইতিমধ্যে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শবাগারের কর্তৃপক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, গত ৭ই মার্চ্চ তারিখ হইতে ২৭শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত এই বিশ দিন ধরিয়া পরমহংস যোগানন্দজীর দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ ফরেষ্ট লন্ এসোসিয়েশনের শবাগারের ডাইরেক্টর মিঃ হ্যারি, টি, রো স্থানীয় নোটারি পাব্লিকের দ্বারা স্বীকৃত একটি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নীচে তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

"আমাদের অভিজ্ঞতায় পরমহংস যোগানন্দজীর শবদেহে পচন ক্রিয়ার কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া এক অভাদ্ভুত ঘটনা...... পরমহংস যোগানন্দজীর মৃত্যুর বিশ দিন পরেও তাঁহার দেহে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।"

সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তাঁর শোকজ্ঞাপনের দিন ১১ই মার্চ্চ তারিখ হইতে ২৭শে মার্চ্চ তারিখ যে দিনে তাঁর ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত শবাধার কাঁচ সাহায্যে সীল করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয় সেদিন পর্য্যন্ত শবদেহটী ফরেষ্ট লন্ এসোসিয়েশনের শবাগারে দৈনিক পর্য্যবেক্ষণে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পরমহংস যোগানন্দজীর দেহচর্ম্মের উপর কোন mould এর আবির্ভাব দেখা যায় নাই বা শরীর তন্তুতে কোন প্রকার শুষ্কতাও দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের জ্ঞানে শবাগারের ইতিহাসে শরীরের এরূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ ও অবিকৃতি একেবারে অদ্বিতীয়।
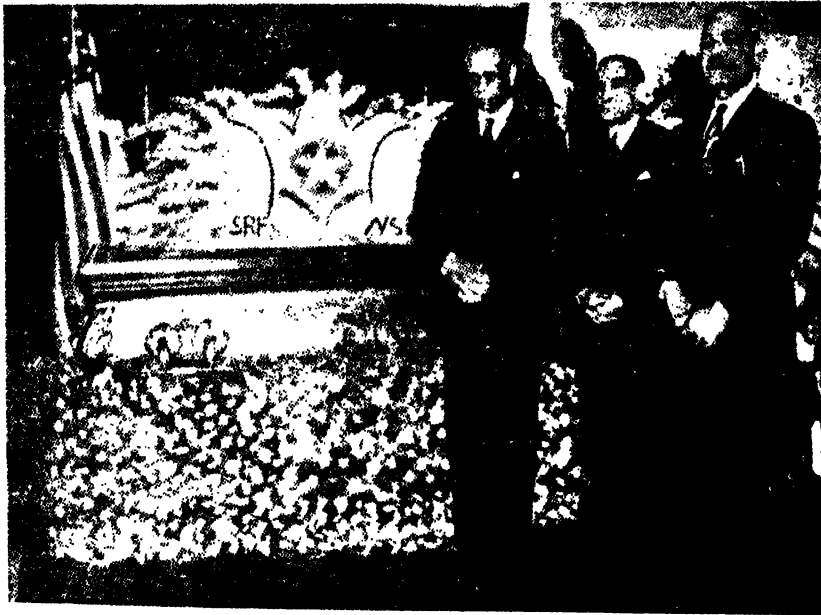
যোগানন্দজীর শবাধার পার্শ্বে শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন, শ্রীএম-আর-আব্বজা—ভারতীয় কন্সাল জেনারেল এবং লস্ এঞ্জেলিসের পুলিশ কমিশনার

"ফরেষ্ট লনের কর্মচারীবৃন্দ ৭ই মার্চ্চ তারিখে পরমহংস যোগানন্দজীর মহাপ্রয়াণের মাত্র একঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁর পুণ্যদেহ দর্শন করিয়াছিলেন।

বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁর বহু অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিষ্যবৃন্দ তাঁর শেষ দর্শন লাভের আশায় তথায় সমবেত হন।

"......ঘরের ভিতরকার স্বাভাবিক উত্তাপে মৃত্যুর প্রায় ছয় ঘণ্টা

মহাসমাধিস্থ পরমহংস যোগানন্দ

(মহাপ্রয়াণের বিশ দিন পরেও দেহ অবিকৃত)

পরে মৃত ব্যক্তির অন্ত্র মধ্যে enzyme ক্রিয়ায় নিম্নোদর প্রদেশের তন্তুগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। পরমহংস যোগানন্দজীর ক্ষেত্রে এরূপ স্ফীতি কোন সময়েই ঘটে নাই।

"......পরমহংস যোগানন্দজীর দেহ কোনও প্রকার দূষ্য পদার্থ—যাহা হইতে পেশীর প্রটীন (protein) টোমেন (ptomaine) এসিডে পরিণত হয়—তাহা হইতে স্পষ্টতঃ মুক্ত ছিল। তাঁর দেহতন্তু-সকল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

"তাঁহার দেহ গ্রহণ করিবার সময় ফরেষ্ট লন শবাগারের কর্ম্মিবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা শবাধারের কাঁচের ঢাকনার ভিতর দিয়া শবদেহের ক্রমবর্দ্ধমান বিকৃতির চিহ্ন সকল দেখিতে পাইবেন। আমাদের বিস্ময় ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যখন দেখিলাম যে দিনের পর দিন যাইতেছে অথচ পর্য্যবেক্ষণ করা সত্ত্বেও শরীরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে না। যোগানন্দের দেহ স্পষ্টতঃ এক অনৈসর্গিক অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রহিয়াছে।

তাঁর শুকান প্রথমে আরম্ভ হয়—সেই আঙ্গুলের প্রান্তভাগ শুষ্ক বা কুঞ্চিত হইবার কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। ঈষৎ হাস্যমণ্ডিত অধর তাহাদের পুষ্টতা বরাবরই বজায় রাখিয়াছে। কোন সময়েই তাঁর দেহ হইতে পচনজনিত কোন প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয় নাই।"

এই সরল নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীটি প্রায় কপর্দ্দকহীন এবং এক ভগবান ব্যতীত বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় আমেরিকায় গমন করিয়া তথায় এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। যে অমূল্য উপদেশ তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, যে অপূর্ব্ব জ্ঞান ও পরমা শান্তির বাণী তিনি তাঁর স্বরচিত পুস্তকের সাহায্যে প্রচার করিয়াছেন, আর যে সব অসংখ্যক মন্দির, মঠ এবং আশ্রম প্রভৃতি লোকহিতার্থে রচনা করিয়া গিয়াছেন সে সমস্ত তাঁর সর্ব্বজনীন মানব হিতৈষণা এবং বিশ্বপ্রেমেরই পরিচায়ক। যদিও তাঁর আন্তরিক অভিলাষ ছিল, পরমার্থ চিন্তায় রত হইয়া গঙ্গাতীরে অথবা হিমালয় প্রদেশে সরল, অনাড়ম্বর ও শান্তিময় জীবন যাপন—তথাপি তিনি গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতীচ্যে ভারতের যোগশিক্ষা প্রদানের গুরুভার স্কন্ধে করিয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁর অনলস কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ।

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর বিদেশে অতিবাহিত হইলেও ভারতবর্ষকে তিনি কখনও ভুলেন নাই। তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর লিখিত ইংরেজী কবিতার ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমি ধন্য যে আমার দেহ ভারতের মৃত্তিকার স্পর্শ লাভ করিয়াছে। মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার মুখে শেষ উচ্চারিত বাণী: "আমার আমেরিকা আমার ভারতবর্ষ।" তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

যোগ ভাস্কর অবদান তব নিখিল ভুবনে রাজে,
মরণ তোমার পাইয়াছে লয় মহাজীবনের মাঝে।

মনস্তত্ত্বে য়ুঙ্গের (Jung) দান

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস্-ই

আজকাল সাধারণ ভদ্রলোকের মুখে মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্তর্বৃত্ত (introvert) বহির্বৃত্ত (extravert) প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত শব্দগুলি যিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া মানুষের চরিত্রের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন সেই য়ুঙ্গ (Jung) এর পরিচয় অনেকেরই হয়ত তেমন জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর মত এক্ষেত্রেও মহাকাল যেন য়ুঙ্গের সাধনার সোনার ফসলটুকুই তাঁর সোনার তরীতে গ্রহণ করিয়াছে, সাধককে তাহার তরীতে স্থান দিতে চাহিতেছেন না। মহাকালের অকৃতজ্ঞতার যুক্তি যাহাই হউক না কেন, আমাদের তরফ হইতে এত শীঘ্র য়ুঙ্গকে ভুলিয়া যাওয়া শোভন নয়। মনস্তত্ত্বের ইতিহাসে তাঁহার অবদান সামান্য নহে। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কিছু কিছু আছে।

এ্যাড্‌লারের মত Jungও প্রথমে ফ্রয়েডের শিষ্য হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন এবং পরে ফ্রয়েড্ হইতে পৃথক দলভুক্ত হইয়া পড়েন। ফ্রয়েডের নির্দ্দেশ অনুসারেই তিনি নিজেকে মনোবিকলকারী মনোবিদ্ (psycho-analyst) না বলিয়া analytical psychologist বৈশ্লেষিক মনোবিদ্ বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন।

নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও য়ুঙ্গ

যৌন-প্রবৃত্তির একজন শক্তিশালী এবং নির্লজ্জ সমর্থক হিসাবেই ফ্রয়েড্ অনেকের নিকট পরিচিত। কিন্তু ইহার চেয়েও তাঁহার বড় পরিচয় হইতেছে তিনিই প্রথম নির্জ্ঞান মনের শক্তি ও লীলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের নির্জ্ঞান মনের প্রভাব সজ্ঞান মনের প্রভাবের চেয়ে কম নহে।

এই ব্যাপারে য়ুঙ্গের মতবাদ আরও উগ্র। তিনি বলেন আমাদের আচরণের উপর নির্জ্ঞান মনের প্রভাব সজ্ঞান মনের চেয়েও বেশী ত বটেই। তিনি বলেন আমাদের মনের অতি সামান্যমাত্র একটা অংশ লইয়া সজ্ঞান মনের কারবার।

ফ্রয়েড্ বলেন—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অপ্রীতিকর বা অসামাজিক চিন্তা বা অভিজ্ঞতাগুলিও অবদমিত হইয়া গূঢ়ৈষা (complex) রূপে মনের গোপন নির্জ্ঞান স্তরে নামিয়া যায় এবং সেই গোপন স্তর হইতে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের কাজকর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। অতএব ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনটি হইতেছে আমাদের জন্মোত্তর যুগের অভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত।

য়ুঙ্গ বলেন এই যে নির্জ্ঞানের প্রেরণা—ইহা জাতকের জন্মের পরবর্তী যুগেরই ঘটনা। জাতকের ব্যক্তিগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা কোনও দিনই অর্জ্জিত হয় নাই এমন সমস্ত প্রাক্জন্মগত অভিজ্ঞতায় সকলও আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং সেই স্থান হইতে আমাদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই য়ুঙ্গের মতে নির্জ্ঞান মনটি জন্মোত্তর যুগের অভিজ্ঞতার ব্যাপারই নহে, ইহার মধ্যে প্রাক্জন্মগত স্মৃতির কথাও আছে।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে Zurich-এর এই টিউটন্ পণ্ডিতটি হিন্দুদিগের মত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন? না প্রাক্জন্মগত স্মৃতি, বলিতে য়ুঙ্গ একই আত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে অভিযান, নব নব

অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বর্ত্তমান জন্মে জাতিস্মরত্ব বুঝেন নাই। ইহা হইতেছে জাতি • বা গোষ্ঠীগত স্মৃতি। য়ুঙের মতে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই জিনিষটিই আমরা আমাদের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে সহজাত সংস্কার বা প্রবণতা হিসাবে বংশগতি (heredity)-র সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে দান করিয়া যাই। ইহাই হইতেছে তথাকথিত প্রাক্‌জন্মগত বা গোষ্ঠীগত নিজ্ঞান স্মৃতি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিজ্ঞান মনটি তৈয়ারি হইতেছে এই গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতা এবং জন্মোত্তর অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা এই উভয়ের সংমিশ্রণে।

"Persona ও anima"

য়ুঙ ব্যক্তিত্বের (personality) একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। রোমক অভিনেতৃগণ অভিনয়ের সময়ে এক জাতীয় মুখোস পরিয়া থাকিতেন। য়ুঙ বলেন—মানুষের persona হইতেছে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় হিসাবে একটি লোকের বাহিরের যে পরিচয়টুকুর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এইটুকুই তাহার চরিত্রের সবটুক নহে। তাহার সমগ্র চরিত্রের পরিচয় হইতেছে তাহার নিজ্ঞান মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবণতা এবং তাহার ব্যবহারিক জীবনের কাজকর্ম্ম এই উভয়ের সমষ্টিগত ফল। আমরা অনেক সময়ই এমন কার্য্য করিয়া বসি যাহাতে আমরা লজ্জিত হই। তাহার কারণ যে ব্যক্তিত্বের মুখোস পরিয়া আমরা জীবনমঞ্চে একটা ভূমিকা অভিনয় করি, তাহার সহিত আমাদের ভিতরের মনের অনেক সময়েই সামঞ্জস্য থাকে না। সেই জন্যই বাহিরের কাজ-কর্ম্মই আমাদের সবটুকু পরিচয় নহে। ইহা হইতেছে আমাদের persona-র পরিচয়। এই persona-র অনুপূরক আর একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নিজ্ঞান মনের মধ্যে আছে। তাহা হইতেছে anima ; ইহা persona-র বিপরীত-ধর্ম্মী। ফলে একজন পুরুষের সজ্ঞান পুরুষত্বের নিজ্ঞান স্তরে যে প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকে, তাহা হইতেছে চিরন্তন নারীত্ব। তেমনই একজন নারীর নিজ্ঞান স্তরের মধ্যেও কাজ করিতেছে তাহার পুরুষত্ব। ফলে সতীত্ব বা একপতিত্ব যদি নারীর persona বা সজ্ঞান মনের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহার নিজ্ঞান anima-র অভিব্যক্তি হইবে পুরুষধর্ম্মী বহু-দয়িত বিলাসিতা।

বস্তুতঃ ফ্রয়েডের সহিত য়ুঙের মনস্তত্ত্বের একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে এই নিজ্ঞান ও সজ্ঞান মনের বিপরীতধর্ম্মিতা লইয়া। য়ুঙের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সজ্ঞান রাজ্যে যে জিনিষটি শক্তিশালী, নিজ্ঞান রাজ্যে সেইটি দুর্ব্বল। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অত্যন্ত সাহসী নিজ্ঞান মনে সে খুব ভীরু, নিজ্ঞান মনে যে খুব সাধু সে হয়ত অসাধুতার আচরণ করে ইত্যাদি। এইভাবে সজ্ঞান ও নিজ্ঞান মন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক অথবা পরস্পরের আতিশয্যের সংশোধক। এই নিয়ম অনুসারে, একজন ব্যক্তি যদি সজ্ঞান ভাবে বহির্বৃত্ত প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে নিজ্ঞান মনে সে অন্তর্বৃত্ত হইবে, সে যদি বাহিরের হিসাবে চিন্তা-পরায়ণ বেশী হয়, ভিতরের দিকে সে হয়ত অনুভূতি-প্রবণ হইবে। Woodworth বলেন—ব্যবহারিক জীবনের কৃতকার্য্যতা আসে এই এক দিকের বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়া ; এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তুলিয়া জীবনের দক্ষতা ও কৃতিত্ব অর্জ্জিত হয়। জীবনের প্রথমার্দ্ধে ৪০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ইহাতে ভাল ভাবেই কাজ হয়। ইহার পর জীবনের উত্তরার্দ্ধে আসে একটা ব্যর্থতা ও রিক্ততার অনুভূতি। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় কি ?—য়ুঙ বলেন, প্রথমে রোগীর নিজ্ঞান মনের মধ্যে রহস্যের সন্ধান করিতে হইবে—প্রথমতঃ ব্যক্তিগত বা জন্মোত্তর যুগের নিজ্ঞানের রাজ্য দেখিতে হইবে, তাহার পর আরও গভীরে ডুব দিয়া গোষ্ঠীগত নিজ্ঞানের সন্ধান করিয়া তাহার "shadow self" বা গোপন ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিতে হইবে। এইভাবে পুরুষের মধ্যে চিরন্তনী নারীত্বের এবং নারীর মধ্যে চিরন্তন পুরুষত্বের উদ্বোধন করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে—মানুষ আবার তাহার জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। অবশ্য মানুষের এই shadow self-এর প্রেরণা যাহা তাহার "ego ideal" বা ব্যক্তিগত আদর্শ হইতে দূরীকৃত হইয়া নিজ্ঞানের রাজ্যে গোপন বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনা সহজ কাজ নহে।

গোষ্ঠীগত নিজ্ঞান, 'লিবিডো' arche type প্রভৃতি—

Collective unconscious অথবা গোষ্ঠীগত নিজ্ঞানের কল্পনা য়ুঙের মনোবিজ্ঞানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই গোষ্ঠীগত নিজ্ঞানের মালমশলাগুলি আহৃত হয় জাতির অতীত ইতিহাসে আমাদের আদিম কামশক্তি বা "লিবিডো" হইতে। তবে এই লিবিডোর সংজ্ঞা লইয়া ফ্রয়েড্ ও য়ুঙের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হইতেছে আদিম কামশক্তি বা যৌনবোধ। য়ুঙ এই লিবিডোর আরও ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ফ্রয়েডের কামশক্তি আছে এবং এ্যাড্‌লারের "ক্ষমতা লিপ্সা" (will to power) আছে। ইহা Schopenhaur এর "will to live" এবং Bergson এর "elan-vital" এর অনুরূপ। অর্থাৎ মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তির প্রেরণা, বৃদ্ধি, পুষ্টি, প্রজনন, জিজীবিষা—সমস্তের মূলেই আছে য়ুঙের "লিবিডো" ; ইহার সহিত ফ্রয়েডের "Eros" বা জীবন-বৃত্তির খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

এই গোষ্ঠীগত নিজ্ঞান জনকের বীজ-পঙ্কের মধ্য দিয়া জাতকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং ইহা অসংখ্য বংশধারার মধ্য দিয়া মানুষের মস্তিষ্কের গঠনকে পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত করে, যাহার ফলে আমরা একটা বিশিষ্টভাবে কার্য্য করিতে বা চিন্তা করিতে প্রবুদ্ধ হই। এই গোষ্ঠীগত নিজ্ঞানের মধ্যে আছে আমাদের সহজাতপ্রবৃত্তি (instincts) এবং তথাকথিত চিন্তার আদিরূপ বা arche types ; প্রবৃত্তি (instincts) হইতেছে 'জন্মোত্তর যুগের শিক্ষা নিরপেক্ষভাবে আদিম আচরণ প্রণালী এবং archetype হইতেছে আদিম এইরূপ নিজ্ঞান চিন্তাপ্রণালী। শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার মধ্যে জন্মোত্তর যুগের বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আদৌ সঞ্চিত থাকে না। তখন

সে এই গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের সঞ্চয় লইয়াই পৃথিবীতে আসে। তখন এই নির্জ্ঞানের মধ্যে থাকে (১) প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়া (২) গোষ্ঠীগত আচরণ প্রণালী এবং (৩) গোষ্ঠীগত প্রণালীতে অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা বা archetype.

এই archetypesগুলি আমাদের পিতৃপুরুষের বহুদূরাগত অতীতের ধারা বহিয়া আমাদের জীবনযাত্রার অত্যন্ত গভীর স্তরে অবস্থান করে। সেই জন্য সভ্য জীবনের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মধ্যে এইগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে স্বপ্নের মধ্য দিয়া, উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, রূপকথা বা পৌরাণিক গল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভূত-প্রেত তন্ত্র-মন্ত্র প্রভৃতির বিশ্বাসের মধ্য দিয়া এইগুলির অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

নির্জ্ঞান মন লইয়া য়ুঙ্গের এই সমস্ত তত্ত্বগুলি মনোবিজ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া প্রায় তত্ত্বদর্শনের পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় এইগুলির সহিত জনসাধারণ ততটা পরিচিত নহে। যেজন্য য়ুঙ্গ জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত,তাহা হইতেছে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার শ্রেণী-বিভাগ।

মনুষ্য-চরিত্রের শ্রেণী-বিভাগ ; অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে সর্ব্বাধিক পরিচিত শ্রেণী-বিভাগটি হইতেছে বহির্বৃত (extravert) ও অন্তর্বৃত (introvert) ; তাঁহার মতে বহির্বৃত ব্যক্তির আগ্রহ ও ক্রিয়াকলাপ বাহিরের সমাজকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকে, আর অন্তর্বৃত ব্যক্তির আগ্রহ এবং ক্রিয়াকলাপ নিজেকে কেন্দ্র করিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। অন্তর্বৃত ব্যক্তি চিন্তা-প্রবণ ও আত্ম-বিশ্লেষণ-পরায়ণ হইয়া থাকে, আর বহির্বৃত ব্যক্তি সমর্থভাবে জগতের সহিত কারবার করিতে ভালবাসে। অন্তর্বৃত ব্যক্তির 'লিবিডো' নিজের দিকে এবং বহির্বৃত ব্যক্তির 'লিবিডো' বহির্জগতের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। বহির্বৃত ব্যক্তি আত্ম-প্রচার চায়, কর্ত্তৃত্ব চায়, বাহিরের লোকের উপস্থিতিতে কর্ম্মে উত্তেজনা ও উৎসাহ পায়, আর অন্তর্বৃত ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চায়, বাহিরের দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে তাহার দক্ষতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ; তাই তাহার শ্রেষ্ঠ সফলতা তখনই আসে যখন সে একলা নিরিবিলি ভাবে কাজ করিতে পারে। বহির্বৃত লোক সামাজিক জীব, সে লোকজনের সঙ্গ ভালবাসে, অন্তর্বৃত লোক একলা থাকিতে ভালবাসে। বহির্বৃত ব্যক্তির আত্ম-প্রত্যয় বেশী, কিন্তু অন্তর্বৃত ব্যক্তি এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে দুই পদ পিছাইবে কিনা ভাবিয়া দেখে। একজন হইতেছে সাহসী কাজের লোক, আর একজন হইতেছে হিসাবী সাবধানী লোক।

মনুষ্য-চরিত্রের অন্যান্য বিভাগ ও উপবিভাগ

অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত এই দুইটি প্রধান বিভাগ ছাড়া য়ুঙ্গ মানুষের প্রকৃতি অনুসারে আরও কয়েকটি উপবিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের মনের চারটি প্রধান কাজ আছে, যথা (১) চিন্তা (thinking) (২) সংবেদন (sensation) (৩) অনুভূতি (feeling) এবং (৪) সংজ্ঞা (intuition)। ইহাদের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ-বিপরীত-ধর্ম্মী গুণ, সেইরূপ সংবেদন ও সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী গুণ। এই বিপরীত-ধর্ম্মী গুণগুলির জন্য একটি ব্যঞ্জনা আছে। ধরা যাইতে পারে একজন ব্যক্তির সংবেদনপ্রবণতা খুব বেশী। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তির সংবেদনের বিপরীত গুণটি অর্থাৎ সংজ্ঞা (intuition) খুব কম হইবে এবং বাকী গুণ দুইটি অর্থাৎ চিন্তা-প্রবণতা এবং অনুভূতি-প্রবণতা সংজ্ঞার (intuition) চেয়ে তীব্রতর হইবে। এইজাতীয় ব্যক্তির মনোজগৎকে নিম্নের চিত্রের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।
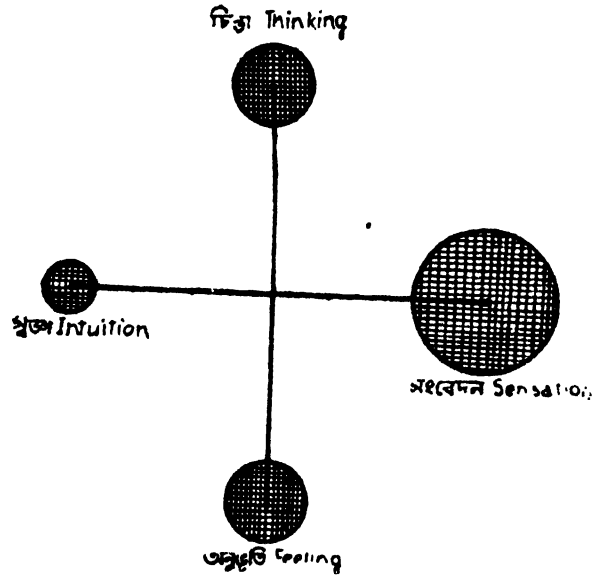
দেখা যাইতেছে এই ব্যক্তিটির সংবেদন খুব প্রবল বলিয়া সংজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি খুব দুর্ব্বল—তবে সংজ্ঞার তুলনায় তাহার চিন্তা ও অনুভূতির শক্তি পরিপুষ্টতর।

চিন্তা সংবেদন, অনুভূতি ও সংজ্ঞা এই চারটি মনোবৈশিষ্ট্যের সহিত অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত মনের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় করিয়া সর্ব্বসাকল্যে আট শ্রেণীর মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া (১) চিন্তা ও সংবেদন (২) সংবেদন ও অনুভূতি (৩) অনুভূতি ও সংজ্ঞা এবং (৪) সংজ্ঞা ও চিন্তার মধ্যবর্ত্তী চারটি বিভাগের কল্পনা করিলে মূল চার শ্রেণীর সহিত মিশ্র চার শ্রেণী—মোট আট শ্রেণীর মানুষের সন্ধান অন্য আর একটি ভাবেও হইতে পারে। যথা—পর পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেখুন—

উপস্থিত শেষোক্ত এই আটটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা না করিয়া চিন্তা সংবেদন প্রভৃতির সহিত অন্তর্বৃত বহির্বৃত মনের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে যে আট প্রকার শ্রেণী বিভাগ হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব—

(১) অন্তর্বৃত চিন্তাশীল—এই জাতীয় ব্যক্তিরা বাস্তব জগতের চেয়ে ব্যক্তিগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়। ফলে বুদ্ধির বাহাদুরিতে

ইহারা খানিকটা দম্ভ দেখায়, অথচ সংজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টির অভাবে হয়ত নির্ব্বোধের কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহারা অন্তর্বৃত বলিয়াই সাধারণের সম্মুখে যাইতে সাহস করে না এবং সাধারণের সমালোচনার ভয়ে অনেক কাজ আরম্ভ করিতেও পারে না। ফলে ইহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়।
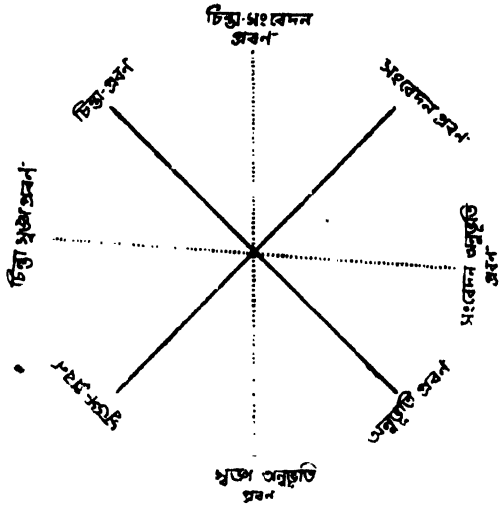
(২) বহির্বৃত চিন্তাশীল—ইহারা নিজের মতামতকে জোর গলায় সাধারণের মধ্যে প্রচার করে, ফলে রাজনীতি, ব্যবসা, ধর্ম্ম প্রভৃতিতে ইহারা মতবাদ ও বাণী প্রচারের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। ইহাদের মতের সহিত যাহাদের মতের মিল হয় না তাহাদিগকে ইহারা হয় জুয়াচোর অথবা মূর্খ বলিয়া সম্বোধন করিবে। ইহারা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলিয়া ভাবে এবং সেই বুদ্ধির অহঙ্কারে হৃদয় ধর্ম্মকে তাহার কর্ম্মপন্থা হইতে অনেক সময় অৰ্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করে।

(৩) অন্তর্বৃত অনুভূতিপ্রবণ—ইহারা প্রীতি ও বিদ্বেষকে অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করে—কিন্তু অন্তর্বৃত বলিয়া নিজের মনোভাবকে তেমন সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। ফলে সাধারণ লোকে প্রায়ই ইহাদের ভুল বুঝে এবং ভুল বুঝে বলিয়াই লোকে অনেক সময় ইহাদের স্বার্থপর বা ক্রূর বলিয়া ভাবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হয়ত তাহা নহে। সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যেই এই জাতীয় লোক বেশী দৃষ্ট হয়।

(৪) বহির্বৃত অনুভূতিপ্রবণ—ইহারা সামাজিক জীব সমাজের নেমিথিন্ন পথে ইহারা বিচরণ করিতে ভালবাসে। ফলে ইহাদের জীবনে আদর্শগত সমস্যার সংঘাতের ভয় বিশেষ থাকে না। অপরের যুক্তির প্রভাবে ইহারা সহজেই অভিভূত হয়—অনুকরণ ও অনুভাবন-(suggestion) প্রবণতা ইহাদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য।

(৫) অন্তর্বৃত সংবেদনপ্রবণ—ইহারা শিল্পকলার সূক্ষ্ম বিচারে সমর্থ। ছবি হইতে সুর তাল লয় সব বিষয়েই হয়ত ইহারা দক্ষতা দেখাইতে পারে, তবে সাধারণের সহিত এই সমস্ত বিচারে ইহাদের মতের মিল যে হইবেই তাহা নহে। অনেক সময় ইহারা হয়ত অপ্রচলিত উপমা বা রূপকের প্রয়োগ করিয়া বন্ধুদের চমকিত করিয়া দিতে পারে।

(৬) বহির্বৃত সংবেদনপ্রবণ—বাহিরের জগতের "দৃশ্য গন্ধ গানে" ইহারা সব সময়েই আকৃষ্ট হয় বলিয়া সূক্ষ্ম চিন্তা বা সূক্ষ্ম অনুভূতির আদর ইহাদের নাই—হয়ত সামর্থ্যও নাই। প্রকৃত মন্দ লোক না হইলেও সংজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টির অভাবে নিছক আনন্দের সন্ধানে ইহারা হয়ত অনেক সময়ে হৃদয়হীনতার পরিচয়ও দিয়া ফেলে।

(৭) অন্তর্বৃত সংজ্ঞাপ্রবণ—ইহারা বহির্বৃত সংবেদনপ্রবণ ব্যক্তিদের ঠিক বিপরীতধর্ম্মী। বাহিরের জগতের আবেদন ইহাদিগকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই ইহারা নিরিবিলিভাবে সব জিনিষের তত্ত্বকথাটির সন্ধান করিতে চায়। বাস্তবের চেয়ে অন্তর্দৃষ্টির প্রতি ইহাদের প্রবণতা বেশী বলিয়াই ইহারা বাস্তব প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবেই লোকের প্রতি প্রীতি বিরক্তি অনুভব করে। ফলে আত্মীয়ের প্রতি বিশ্বাসহীনতা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। আবার ইহাদের মধ্য হইতেই ধর্ম্মগুরু (prophet) দার্শনিক তত্ত্ব-আবিষ্কারক প্রভৃতির উদ্ভব হইতে পারে।

(৭) বহির্বৃত সংজ্ঞাপ্রবণ—বহির্বৃত বলিয়া ইহারা প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন চায় এবং বুদ্ধিগত বা অনুভূতিগত আবেদন না থাকিলেও যে কোনও একটা নূতন কিছুকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়া বসে। ফলে অহেতুক আশায় পরিচালিত হওয়া ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। কাজেই জুয়াখেলা প্রভৃতি ইহাদের আকৃষ্ট করে। বিবাহ, প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে ইহারা হঠাৎ কিছু একটা পছন্দ করিয়া ভুল করিয়া বসিতে পারে। ইহারা স্বভাবতঃ আশাবাদী বলিয়া দুঃসাহসিকতার কাজে ইহাদের সহজেই নিযুক্ত করিতে পারা যায়। সৈনিক, অগ্নি-যোদ্ধা প্রভৃতি কার্য্যে ইহাদের নিযুক্ত করা ভাল, কিন্তু জীবনের দয়িত বা দয়িতা হিসাবে ইহাদের নির্ব্বাচন করার মধ্যে বিপদ আছে।

য়ুঙের মতে মনুষ্যপ্রকৃতির এই সমস্ত শ্রেণীবিভাগগুলি হইতেছে বংশগতির (heredity) ফল, অর্জ্জিত (acquired) বৈশিষ্ট্যের ফল নহে। তবে কখন কখন এমনও হইতে পারে যে একটি বালক হয়ত একটি বিশেষ প্রকার বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার জীবন-পরিবেশ বা শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ত তাহার নিকট হইতে বিপরীত-ধর্ম্মী গুণ বা আচরণের দাবী করিল। ইহার ফলে অনেক সময় অবাঞ্ছিত বা অনুপযুক্ত কর্ত্তব্যের দাবীতে জাতকের মধ্যে একটা nurotic mal-adjustment বা উন্মায়ুজাতীয় মনোবৈকল্য থাকিতে পারে।

মনোবৈকল্যের নিদান সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও য়ুঙ

এই প্রসঙ্গে মনোবৈকল্যের নিদান লইয়া ফ্রয়েড, এ্যাড্লার ও য়ুঙের মধ্যে যে মত-বিরোধ আছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

ফ্রয়েড বলেন—অধিশাস্তা মনের (super-ege) শাসনে "ইদ্" (id)এর যৌনকামনা অবদমিত (repressed) হইয়া পুষ্টৈষা

(complex) সৃষ্টি করে এবং এই গূঢ়ৈষা হইতেই মনোবৈকল্য সৃষ্ট হয়।

এ্যাড্‌লার বলেন—প্রতিকূল জীবন-পরিবেশে আমাদের আদিম শক্তির আকাঙ্ক্ষার (will to power) পরিতৃপ্তিতে যখন ব্যর্থতা আসে তখন সেই ব্যর্থতাজনিত হীনমন্যতার অনুভূতি (inferiority complex) আমাদের মনের উপর গুরুভার হিসাবে চাপিয়া বসে এবং এই হীনমন্যতার অনুভূতি হইতেই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

যুঙ্গ বলেন—জগতের যে বিভিন্ন অবস্থার সহিত মানুষকে কারবার করিতে হয় তাহার মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার চেয়ে কাজ বেশী করিতে হয়, আবার অন্য কোনও ক্ষেত্রে হয়ত কাজের চেয়ে চিন্তা বেশী করিতে হয়। এখন এমনও হইতে পারে যে হয়ত তীব্র অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইল—যাহাতে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যায় না, যাহাতে ক্ষিপ্রভাবে কাজ করিতে হয়, বহু লোকের সম্মুখে কৃতিত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। এই জাতীয় কর্ত্তব্য তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অনুকূল নহে। আবার একজন বহির্বৃত্ত স্বভাবের ব্যক্তিকে যদি প্রচুর চিন্তার কাজ দেওয়া হয়, বিশ্লেষণ ও আত্ম-বিশ্লেষণের ভার দেওয়া হয়, বাহিরের সমাজ ও প্রকৃতির সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যেও একটা ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বের উপযুক্ত মীমাংসা না হইলেই শেষ পর্যন্ত মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

এই মনোবৈকল্যের নিদানের ব্যাখ্যা হইতেই যুঙ্গ তাঁহার গুরু ফ্রয়েড্‌ হইতে পৃথক দলভুক্ত হইয়া পড়েন। শৈশবের ঈডিপাস্‌ গূঢ়ৈষা (Oedipus complex) কেই ফ্রয়েড্‌ মনোবৈকল্যের predisposing cause বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুঙ্গ দেখিলেন—আমাদের অনেকের মধ্যেই অনুপপন্ন (unadjusted) গূঢ়ৈষা (complex) থাকা সত্ত্বেও ঠিক মনোবৈকল্যটা প্রকাশ পায় না। তখন তাঁহার মনে হইল মনোবৈকল্যের জন্য ফ্রয়েড্‌ নির্দ্দিষ্ট "pre-disposing cause"টাই বড় কথা নহে, বরং তাহা অপেক্ষা আরও বড় কথা হইতেছে exciting cause; কিন্তু এই exciting cause এর মূল অতীতের মধ্যে নাই, তাহা বর্ত্তমানের জীবন-সংস্থানের মধ্যে নিহিত থাকে। এই নূতন জীবন-সংস্থানে যে ভাবে সাড়া-দেওয়া প্রয়োজন, তাহা করিতে সমর্থ না হওয়ার জন্যই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান জীবন-সংস্থান হয়ত একজন অন্তর্বৃত্ত লোকের নিকট হইতে নানা প্রকার বহির্মুখী কর্ত্তব্যের দাবী করিল। অন্তর্বৃত্ত লোকের পক্ষে হয়ত তাহা করা সম্ভব হইল না। তখন সে পরাজয়-তাড়িত সৈন্য দলের মত বর্ত্তমান জগত হইতে পশ্চাৎমুখী হইয়া শৈশবের অলীক কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে; কারণ শৈশবের যুগে অলীক কল্পনার মধ্যে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের তেমন ভাবে অনুভূত হয় নাই। কিন্তু এই যে অলীক জগতের দিকে পলায়ন প্রচেষ্টা—ইহাও সমাধানের পথ নহে। প্রাপ্তবয়সে শৈশবের অলীক কল্পনা-বিলাসকেই ত আমরা উন্মাদ মনোবৈকল্য বলিয়া থাকি।

এই জন্যই যুঙ্গ বর্ত্তমানের exciting cause টিকেই মনোবৈকল্যের বড় কারণ বলিয়া মনে করেন, অতীতের অতৃপ্ত কামনা-জনিত গূঢ়ৈষা জটের predisposing causeটা যে বড় বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন "Take away the obstacle in the path of life and this whole system of infinite phantasies at once breaks down and becomes as inactive and ineffective as before......Therefore I no longer find cause in the past, but in the present".

বহির্বৃত্ত অন্তর্বৃত্ত ভেদে বিভিন্নরূপ মনোবৈকল্য

চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত বর্ত্তমান জীবন-সংস্থানের অসামঞ্জস্যই মনোবৈকল্যের কারণ বটে, তবে এই মনোবৈকল্যের রূপ সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এক প্রকার নহে। বর্ত্তমান জীবন-সংস্থানের অনুপপন্ন সমাধান প্রচেষ্টা মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্নরূপ উপসর্গের সৃষ্টি করে। হিষ্টিরিয়া হইতেছে বহির্বৃত্ত লোকের উপসর্গ; ইহাতে রোগী তাহার জীবন সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতাকে অঙ্গাদি আক্ষেপ বিক্ষেপ করিয়া জয় করিবার জন্য অভিনয় করিতে থাকে। বিপরীত পক্ষে একজন অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তি অনুপপন্ন সমস্যাকে জয় করিতে যাইয়া anxiety nurosis রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

স্বপ্নতত্ত্বে ফ্রয়েড্‌ ও যুঙ্গ

এই সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য যুঙ্গ ও ফ্রয়েডের মত মুক্ত অনুসঙ্গ (free association) এবং স্বপ্ন বিকলন প্রভৃতি করিয়া থাকেন; তবে এই স্বপ্নের কারণ ও ব্যাপার দিক দিয়া ফ্রয়েডের সহিত তাঁহার কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

ফ্রয়েডের মতে সমস্ত স্বপ্নের মধ্যেই আছে অতীতের অতৃপ্ত কামনার রূপক বা রূপান্তরিত অভিব্যক্তি। তবে স্বপ্নকে তিনি যে সমস্ত অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি বলিয়া মনে করেন, সেগুলি হইতেছে অনীতিমূলক বা অসামাজিক। কাজেই সেই কামনাগুলি সরাসরি স্বপ্নের রাজ্যে আসিতে পারে না। স্বপ্নের দ্বারদেশে প্রহরী বসিয়া থাকে। সে কোনও অনীতি-মূলক কামনাকে স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। কাজেই সেই প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া কামনাগুলিকে ছদ্মবেশে স্বপ্নের দরবারে প্রবেশ করিতে হয়।

যুঙ্গ কিন্তু তাঁহার স্বপ্নতত্ত্বে এই প্রহরীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে ফ্রয়েডের মত তিনি ও স্বপ্নের দেখা জিনিসগুলির রূপক বা প্রতীক ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে এই প্রতীকগুলি প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হয় না। তাঁহার মতে নির্জ্ঞান মনের ভাষাই হইতেছে archetype—সেই জন্যই যে স্বপ্নের মধ্যে নির্জ্ঞান মনের লীলাই প্রধান ভূমিকার কাজ করে সেই স্বপ্নের ভাষাও হইবে archetype এর প্রতীক ভাষা। এই হিসাবে ফ্রয়েড যেমন স্বপ্নে দেখা আলোকস্তম্ভ, ছড়ি প্রভৃতিকে যৌন পদার্থের প্রতীক বলিয়া মনে করেন, যুঙ্গও তেমনই মনে করেন। তবে ফ্রয়েড্‌ যে সমস্ত কাজগুলিকে যৌন ক্রিয়া বা প্রজননের প্রতীক বলিয়া

মনে করেন, য়ুঙ্গ সেগুলিকে আধ্যাত্মিক শক্তি ও উন্নতির রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

শুধু তাহাই নহে ; য়ুঙ্গের মতে সমস্ত মানসিক কার্য্যের মধ্যেই আছে একটা উদ্দেশ্যমূলক ব্যঞ্জনা, স্বপ্নের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যমূলক ব্যঞ্জনাটি বর্ত্তমান। তাঁহার মতে স্বপ্নের ভিতর দিয়া আমাদের নির্জ্ঞান মন বর্ত্তমানের জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য একটা সক্রিয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, ইহা ভবিষ্যতের দিকেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। এখানেই ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের সহিত য়ুঙ্গের স্বপ্নতত্ত্বের একটি বিরাট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে স্বপ্ন হইতেছে অতীতের অতৃপ্ত অন্যায় কামনায় প্রতীক পরিতৃপ্তি, আর য়ুঙ্গের মনস্তত্ত্বে স্বপ্ন হইতেছে বর্ত্তমান সমস্যাকে সমাধান করিবার জন্য নির্জ্ঞান মনের অভিযান।

একটি যুবক তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিবার পর তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণের পথ খুঁজিয়া পাইতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এই সময় সে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, স্বপ্নটি এইরূপ—

"আমি আমার মাতা ও ভগিনীর সহিত সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে ছিলাম—যখন আমি উপরে উঠিলাম তখন শুনিলাম যে আমার ভগিনী শীঘ্রই একটি পুত্র লাভ করিবে"—

এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সঙ্গে য়ুঙ্গ-এর পার্থক্য কোথায় তাহা য়ুঙ্গ দেখাইয়াছেন।

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্ এই স্বপ্নটির মধ্যে সিঁড়ি বহিয়া উঠার মধ্যে হয়ত যৌন-ক্রিয়ার প্রতীক দেখিতে পাইবেন এবং মাতা ও ভগিনীর মধ্যে শৈশবের (যৌন) কামনার ঈপ্সিত বস্তুর প্রতীক দেখিতে পাইবেন।

য়ুঙ্গ কিন্তু এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার মতে মাতা হইতেছে যে কর্ত্তব্য কার্য্যে যুবকটি অবহেলা করিয়া আসিয়াছে সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতীক, ভগিনী হইতেছে নারীর প্রতি অকপট প্রেমের প্রতীক এবং সিঁড়ি বহিয়া উঠা হইতেছে জীবনে কৃতকার্য্যতা এবং শিশুর জন্ম হইতেছে আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভের প্রতীক। এই স্বপ্নের মোটামুটি ব্যঞ্জনাটি হইতেছে যুবকটির বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে তাহার নির্জ্ঞান মনের সক্রিয় অভিযানের প্রারম্ভ ঘোষণা।

Woodworth তাঁহার Contemporary Schools of Psychology গ্রন্থে এই স্বপ্নটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং টিপ্পনী হিসাবে বলিয়াছেন যে এই স্বপ্নটিকেই এ্যাড্লার হয়ত অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবেন। যুবকটি যে তাহার মাতা ও ভগিনীর সহিত সিঁড়ি বহিয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে তাহার পরনির্ভরশীল জীবনের প্রতিচ্ছায়া ছিল। এই পরনির্ভরতা ও পরাধীনতার গ্লানি তাহার মনের মধ্যে না থাকিলে সে হয়ত একলাই সিঁড়ি বহিয়া উঠিত—মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গী হিসাবে সঙ্গে লইত না।

মনোবৈকল্যের চিকিৎসা-তত্ত্বে ফ্রয়েড্ ও য়ুঙ্গ

এখন স্বপ্নতত্ত্ব ছাড়িয়া রোগের চিকিৎসা-তত্ত্বের দিক দিয়াও য়ুঙ্গের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনোবৈকল্য চিকিৎসার মূল কথাটি হইতেছে রোগীর সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে প্রাণখোলা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া—মুক্ত অনুসঙ্গ ও স্বপ্ন বিকলনের সাহায্যে রোগীর নির্জ্ঞান মনের মধ্যে অবস্থিত জটপাকান অতৃপ্ত অন্যায় কামনাগুলিকে মনের সংজ্ঞান স্তরের উপরে ভাসাইয়া তুলা। তাহা হইলেই আলোকের সংস্পর্শে অন্ধকার যেমন স্বতঃই বিনষ্ট হয় সেইভাবে সংজ্ঞান মনের সংস্পর্শে অবদমিত অন্যায় কামনাগুলির দাবী আপনা-আপনিই কাটিয়া যাইবে। ফলে রোগীর মনোব্যাধি দূর হইয়া যাইয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিবে।

য়ুঙ্গ ফ্রয়েডের এই মুক্ত অনুসঙ্গ ও স্বপ্ন বিকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি রোগীর অতীতের অতৃপ্ত যৌন কামনার জটের সন্ধান না করিয়া বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের প্রতিকূলতার কারণটি অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন। ইহার জন্য ফ্রয়েডের মত রোগীর ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সন্ধান তিনিও করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইখানেই তাঁহার কাষ্য শেষ হয় না। ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সন্ধান হইল তাঁহার চিকিৎসার প্রথম পর্ব্ব মাত্র। ইহার পর গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের রাজ্যে ডুব দিতে হইবে এবং সেই স্থান হইতে তথ্যের সন্ধান করিয়া রোগীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অহম্ বা গোপন ব্যক্তিত্বটির (shadow self) পরিচয় তাহাকে জানাইয়া দিয়া পুরুষের মধ্যে তাহার চিরন্তনী নারী প্রকৃতির এবং নারীর মধ্যে চিরন্তনী পুরুষ প্রকৃতির উদ্বোধন করিয়া তাহার জীবনের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং তাহাকে জীবন-সমস্যার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

এই উপযুক্ততার জন্য রোগীকে ধর্ম্ম ও পুরাণের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলা এবং তাহার শিল্প-কলার নৈপুণ্যকে উৎসাহ দেওয়া য়ুঙ্গের মতে একটা খুব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক মনোচিকিৎসার ব্যাপারে ঈশ্বর পুরাণ প্রভৃতির প্রসঙ্গকে অনেকে ধান ভানিতে শিবের গীত বলিয়া ভাবিতে পারেন। কিন্তু য়ুঙ্গ তাহাতে নিরস্ত হইবেন না। তিনি হয়ত বলিবেন গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের স্তরে যখন দেবতা পুরাণ প্রভৃতির বিশ্বাস বাসা বাঁধিয়া আছে তখন নির্জ্জলা বিজ্ঞানের অজুহাতে সেগুলিকে অস্বীকার করার প্রয়োজন কি? রোগী যাহাতে ভাল হইবে তাহাই সার্থক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, শুধু ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইলেই তাহা সার্থক হইবে না।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভগবতীর বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধে শতাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। অনেকেই প্রখ্যাত পণ্ডিত,—তাহাদের অভ্যর্থনান্তর বৃহৎ সদর-দালানে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতগণ নানারূপ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন,—কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ভগবতী এতক্ষণ মন্ত্রপাঠে ব্যস্ত ছিলেন তিনি আসিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে কহিলেন,—আপনাদের পদধূলিতে আজ আমার কুটীর পবিত্র হ'ল। আমার মাতার স্বর্গার্থে আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমি প্রার্থনা করি—

বৃদ্ধ বাচস্পতি কহিলেন,—জয়োস্তু, দানই পরম ধর্ম্ম, তোমার দান ও কর্ম্ম দেশ বিশ্রুত, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক্। ধর্ম্ম রক্ষার্থই রাজার ধন ও শক্তি—

অন্যান্য পণ্ডিতগণ কথাটা সমর্থন করিলেন। মতিঠাকুর মহাশয় এতক্ষণে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সভায় আসিয়া কহিলেন,—ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ!

সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মতিঠাকুর কহিলেন—আপনাদের মত পণ্ডিতগণের দেখা পাওয়া ভাগ্য, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনাদের কাছে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে,—আশা করি আপনারা আমার কথা বিবেচনা করবেন, প্রণিধান করে মীমাংসা করবেন—

মতিঠাকুর সংক্ষেপে জানাইলেন দেশে বিলাতী কাপড় প্রভৃতির আমদানী হওয়ায় দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, সমাজ রক্ষার্থে সমাজ কল্যাণে দৈবকার্য্য বা প্রেতকার্য্যে বর্জ্জন করাই আজ একান্ত প্রয়োজন—

জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রের তর্ক তুলিয়া কহিলেন,—শাস্ত্রে এমন কোন বিধি নেই,—যাতে যজমানকে এমন ব্যবস্থা বলা যায়। তিনি পণ্ডিত মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কেমন আপনারা বলুন,—শাস্ত্রে এমন কোন বিধি আছে—

শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে কি না এই লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি হইল এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল—কোলাহল যখন প্রায় চরমে উঠিয়াছে এবং মতিঠাকুর মহাশয় একটু বিপন্নভাবে সমবেত জনতাকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছেন তখন হঠাৎ গোপাল উঠিয়া উদাত্তকণ্ঠে সম্বোধন করিল,—সমবেত বিদ্বৎমণ্ডলি—

গোপালের কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য ও উত্তেজিত উদাত্ততায় কোলাহল প্রশমিত হইয়া আসিলে গোপাল বলিতে আরম্ভ করিল,—

আজকার সভায় বিদেশীবর্জ্জনের প্রস্তাব যিনি করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এবং শিক্ষাগুরু। তাঁর প্রস্তাব শাস্ত্র সম্মত কিনা সে সিদ্ধান্ত করবার পূর্ব্বে আমার কিছু নিবেদন আছে। আপনারা অনুমতি ক'রলে আমি নিবেদন করতে পারি—

বালক গোপালের কথা শুনিয়া কেহ হাসিল কেহ কহিল,—বলুক,—বলুক,—শুনি না, ছেলেমানুষ ব'লতে দাও—

গোপাল পুনরায় আরম্ভ করিল,—আমরা ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, সমাজের সকলের দানগ্রহণ করেই আমরা বেঁচে থাকি। সমাজ আমাদের এই দান করে কারণ ব্রাহ্মণ-গণই বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। তার পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মত সমাজকে সেবা করা, যাতে দেশের সমাজের কল্যাণ হয়—আমাদের প্রাথমিক ভাবে সেই কথাটাই বিচার করা দরকার। জমিদার যেমন তাঁর খাজনা এবং সেলামী নেন কেবলমাত্র নিজের জন্য নয়, সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে শাসন করে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাওয়াই তার কর্ম্ম। দানই তাই তার ধর্ম্ম। আমাদের তেমনি এই সমাজের মঙ্গলের গুরুকর্ত্তব্য রয়েছে, আমরা যদি সমাজের দান গ্রহণ করি তবে সেবাও আমাদের করা কর্ত্তব্য, তা না হ'লে আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসাবে দান গ্রহণের অধিকারী নয়, আমরা পতিত। আর শাস্ত্র পরিবর্ত্তনশীল। মনুর স্মৃতি প্রয়োজনবোধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরিবর্ত্তন করেছিলেন,—সমাজের প্রয়োজনে ও কল্যাণে। কাজেই আমরা আজ দেখবো, সমাজের কল্যাণ কোনটি।

বিলাতি কাপড়, হাঁড়ি কলসী, কেরোসিনের তেল যদি আজ চলে তবে আমাদের প্রত্যেক গ্রামের তাঁতি, কুমার, কলুর ব্যবসায় যাবে, তাদের অন্ন সংস্থান কঠিন হবে। দেশে নতুন রাজা হ'য়েছে—বিদেশী ম্লেচ্ছ যবন, তাদের এই কৌশলকে আমাদের বাধা দিতে হবে এবং সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র—যা আজ আমাদের এই শিল্পীগণকে রক্ষা করতে পারবে—

উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ গোপালের কথা কয়েকটির তারিফ করিলেন এবং সকলেই বলিলেন—শাস্ত্রের মূলভাষ্যই গোপাল করিয়াছে; অতএব আজ হইতে দৈব বা প্রেতকার্য্য কোনটিতেই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না।

ভগবতীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলে একমত হইয়া বলিয়াছেন পূজাদি কার্য্যে বিদেশী বস্ত্র চলিবে না—

নব তাঁতি উল্লাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল—আপনারাই বর্ণশ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ দেবতা। আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন আপনাদের পায়ের ধূলোর আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকতে পারি।

কিন্তু তথাপি এ প্লাবন রুদ্ধ হইল না—

ভগবতী সেদিন দ্বিতলের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—চৈত্রের মাঝামাঝি, গ্রামে চৈত্র-সংক্রান্তি উৎসবে গাজনের তোড়জোড় চলিতেছে। একটানা একটা দক্ষিণা হাওয়া সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যায় মন্দীভূত হয়, আবার সন্ধ্যার পরে পশ্চিমের একটা হাওয়া দুরন্ত বেগে ধূলি উড়াইয়া, গাছের শুষ্কপত্র উড়াইয়া বহিয়া যায়—দিনে প্রখর সূর্য্যতাপে জলাশয়ের জলও গরম হইয়া যায়—ধূসর মৃত্তিকা ফাটিয়া ফুটি ফাটা হইয়াছে—গ্রামের কয়েকটি কূপ ইতিমধ্যে শূন্যোদক হইয়াছে। খড়ের ঘরের খড়গুলি শুকাইয়া এমন হইয়াছে যে ধরিলে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। সন্ধ্যার পরে উষ্ণ মৃত্তিকা হইতে একটা তাপ বিচ্ছুরিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করিয়া তুলে—তাই গভীর রাত্রের পূর্ব্বে নিদ্রা আসেনা—

জোছনারাত্রি—দ্বিতল হইতে দেখা যায় দূরে ডোমপাড়া, তাহার পর কুর্ম্মী, বাগ্দী, বাউরী পাড়া সারি সারি একটানা ঘর চলিয়াছে। মাদল ও ঘুঙুরের আওয়াজ ভাসিয়া আসে। ভগবতী ভাবিতেছিলেন;—কি উপায়? তাঁতির তাঁত বন্ধ হইতে চলিয়াছে, কলুর ঘানি বন্ধ হইতেছে, এ বছর না হয় ধান ধার দিয়া বা দান করিয়া তাহাদিগকে বাঁচান যাইবে, কিন্তু চিরদিন বৎসরের পর বৎসর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার সাধ্য ত তাঁহার নাই—কি হইবে? এই সমাজকে তিনি কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন—প্রতাপশালী ভগবতী মনে করিলেন, তিনি সত্যই দুর্ব্বল, সত্যই অসহায়—

নিবিষ্ট মনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—অস্পষ্ট একটা ধারণা হইতেছিল, তাঁহার নব, গোবিন্দ প্রভৃতি প্রজা ও বন্ধুগণ ধীরে ধীরে সপরিবারে অনাহারে মরিতেছে, কিন্তু তিনি কেবল দর্শক হিসাবে দেখিতেছেন।

ঝড়ের মত এক ঝলক হাওয়া আসিয়া জানালাটাকে ঝড়াৎ করিয়া আছাড় দিয়া গেল—দূর-দিগন্তে একাদশীর চাঁদ ধূসর বিবর্ণ—তালগাছের মাঝে বাতাস খড় খড় শড় শড় শব্দ করিয়া উঠিল—

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা সোরগোল—চিৎকার—ভগবতী চাহিয়া দেখিলেন—ডোমপাড়ায় একখানা ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং বারুদের মত চালের খড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া তুবড়ীর মত মধ্য আকাশে উঠিয়াছে—চারিধারে হৈ-হৈ শব্দ হইতেছে—আগুন আগুন—

গৃহে গৃহে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, গৃহবধূগণ তাড়াতাড়ি বাস্তুতে জল দিলেন। ভগবতী ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন—হায় হায় সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সারাবৎসরের শ্রমলব্ধ ধান, সারাবৎসরের আহার্য্য নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া সমস্ত প্রজাকে পথের ভিখারী করিয়া দিবে—

ভগবতী চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত হাঁকিলেন—আগুন, আগুন—চলে আয় সব—চলে আয়—কে আসিল কে না আসিল তিনি ফিরিয়াও দেখিলেন না, ঊর্দ্ধশ্বাসে তিনি ছুটিলেন তথাকথিত ছোটলোকের পাড়ায়।

আগুনের লেলিহান জিহ্বা একটির পর একটি গৃহকে ভস্মীভূত করিয়া চলিয়াছে—সঙ্গে ঝড়ের মত হাওয়া আগুনের ফুলকি বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, দূরে—মাঝে মাঝে বাঁশের গিট ফাটিয়া প্রচণ্ড শব্দে আগুন ছিটকাইয়া দিতেছে—

ভগবতী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সামনে কম্পমান ক্রন্দনরত শিশু ও নারীর দল তাঁহাকে চিনিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—কি হ'ল কর্ত্তা, কি হ'ল রে—

ভগবতী কহিলেন—কাঁদিস্ না—জল, জল আন তাড়াতাড়ি জল আন—কাঁদবার সময় নেই—

সামনে ভরত প্রভৃতি কয়েকজন বাগ্‌দী ছিল, তাহাদিগকে ধমক দিয়া কহিলেন—শিগ্‌গির কাঁথা ভিজিয়ে নিয়ে চালে ওঠ—শিগ্‌গির—

মতিঠাকুর মহাশয় পিছন হইতে কহিলেন—গোহাল থেকে গরু ছেড়ে দে, গরু ছেড়ে দে—

আগুনের শব্দে সকলেই বিভ্রান্ত হইয়া কি করিবে তাহাই ঠিক করিতে পারে নাই, হঠাৎ একটা আদেশ পাইয়া তাহারা সেই কাজেই ছুটিল। ভগবতী তারস্বরে কহিলেন—নীলমণি যা—শিগ্‌গির যা—কামিনদের জল আনতে বল দিঘি থেকে—

মুহূর্ত্তে নারীকুল কলসী লইয়া ছুটিল দিঘিতে জল আনিতে, কাঁথা ভিজাইয়া অনেকেই উঠিল ঘরের চালে। বাঁশের গিট ফাটিয়া ফুলকি উড়িয়া আসিতেছে, ভিজা কাঁথা দিয়া চালের উপর তাহাকে নিভাইয়া দিতেছে।

ভগবতী আরও আগাইলেন—ডোমেদের বড় ঘরখানি তখন জ্বলিতেছে। তিনি সেখানে যাইয়া হাঁকিলেন—এই ঘর ঠেকাতে হবে নইলে সব যাবে, ওঠ সকলে ওঠ—

কয়েকজন যুবক মুহূর্ত্তে ভিজা কাঁথা লইয়া চালে উঠিল—বৃহৎ ঘর, সমগ্র পাড়ায় মধ্যে অন্তত তিন হাত মাথা উঁচু করিয়া এতদিন গৃহস্থের আভিজাত্য সপ্রমাণ করিয়াছে—

ভগবতী কহিলেন—এ ঘরে আগুন লাগলে রক্ষে নেই, পাড়া সাফ হয়ে যাবে। যেমন করে হোক্ ঠেকাতেই হবে—

অসহ্য গরম, পাশের ঘরখানি পুড়িয়া মাটিতে পড়িয়া ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, আগুনের আঁচে নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় না। বড় ঘরখানির চালের উপরও থাকা যাইতেছে না। কামিনগণ প্রায় পঞ্চাশ কলসী জল লইয়া আসিয়াছে।

ভগবতী কহিলেন—বড়ঘরের চাল থেকে জল ঢেলেদে এইদিকে, দক্ষিণে—যাতে হাওয়ায় আগুন না নিতে পারে—ঢাল জল—ঢাল—

মুহুর্মুহুঃ জল ঢালিয়া দক্ষিণ দিকের আগুনটা প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল এবং পশ্চিমদিক হইতে আগুনের হল্কা এমন জোরে আসিতে লাগিল যে চাল হইতে যুদ্ধরত যুবকগণ "পুড়ে গেলাম পুড়ে গেলাম" বলিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে অরক্ষিত পাড়ার বৃহত্তম ঘরে আগুন লাগিয়া গেল এবং শুষ্ক ঘরের চাল বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল—আকাশ জুড়িয়া উঠিল তাহার লেলিহান শিখা—গ্রামান্তর হইতে ছুটিয়া আসিল কত লোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাতাসের মাতামাতি—

লাফাইয়া লাফাইয়া আগুন চলিল—ঘরের পর ঘর, জ্বালাইয়া—মানুষের গৃহ, বৎসরের খাদ্য, বৎসরের রোদে-জলে পোড়া সমস্ত শ্রমকে ভস্মীভূত করিয়া—চারিপাশে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার চলিল—নারী ও শিশুগণ কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া দিল—মানুষের চোখের জল, আর্ত্তকণ্ঠের আকুল আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখা পাড়ার প্রায় সবকয়খানি ঘর নিমেষে নিঃশেষ করিয়া দিল। মানুষের শ্রম, দিঘির জল, করুণ আর্ত্তনাদ, ক্রুদ্ধ লেলিহান শিখাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না—তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, আপনার গৃহ, জন্মজন্মান্তরের অতি পরিচিত গৃহ আগুনে পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

সমস্ত পাড়াখানিকে নিঃশেষ করিয়া অগ্নি স্তিমিত হইয়া আসিল—গৃহের কাষ্ঠ বাঁশ অসবাব ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুপূর্ণ চোখে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অসহায় লোকগুলি—

ভগবতী কহিলেন—জল—জল আন্। এখনও যদি ধানের গোলা কটা রক্ষা করা যায়—

ভীত ব্যাকুল অসহায় লোকগুলি আবার ছুটিল জল আনিতে। আগুনের মাঝে মাঝে জল ঢালিয়া পথ করিয়া ধানের গোলায় বহ্নিমান ধানের উপর জল ছিটাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোথায় প্রচুর জল? দিঘি বহুদূর—কূপ তিনটি ইতিমধ্যেই বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে—

ভগবতী, মতিঠাকুর, গোপাল, সারদা প্রভৃতি গ্রামের সকল লোকের চেষ্টায় এবং নারীপুরুষের সমবেত চেষ্টায় সারারাত্রি ধরিয়া জল আনিয়া দগ্ধ ধানের গোলায় ঢালা হইল, কিন্তু সে চেষ্টা বিরাট এই নৈসর্গিক দুর্ভাগ্যের নিকট অতি তুচ্ছ—

ধীরে ধীরে আগুন নিভিয়া আসিল—কেবলমাত্র কুণ্ডলীকৃত ধূম বাহির হইতেছে—দগ্ধ ধান ও কাষ্ঠের নির্গত ধূম হইতে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। জনকোলাহলমুখরিত পাড়াটা মুহূর্তে ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

সারারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রমে সামান্য ধানই রক্ষা পাইল—

তাহার পর ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফরসা হইল... দিনের সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

ভগবতী সারারাত্রি কর্ম্মাবসানে ফিরিতেছিলেন—তাঁহার সামনে পাড়ার নারীপুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি হবে আমাদের—শিশু কোলে করিয়া নারী কাঁদিতেছে, যুবকগণ কালি ও ছাই মাখিয়া সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। শিশুগণ কাঁদিতেছে—হয়ত ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, বা না বুঝিয়াই—

ভগবতী মুখ তুলিয়া চাহিলেন—সামনে দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারই প্রজাকুল—নীলমণি, ভরত, নটবর, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র—পিছনে মতিঠাকুর—গ্রামের ইতর ভদ্র—

নটবর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িয়া কহিল—আমার কি হবে কর্ত্তা—আমার যে সব গেছে—সব গেছে—

নটবর হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে রোরুদ্যমান নারীকুল আর একবার আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

নটবর কহিল—ছেলেমেয়েকে কেমন করে বাঁচাবো কর্ত্তা—

ভগবতী মুখ তুলিয়া দেখিলেন—এই নিদারুণ বিষণ্ণ মুখগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় মুচড়াইয়া উঠিল। তাঁহার শশধর চাঁদুকে লইয়া আজ যদি এমনি গৃহহীন হইতে হইত! তাহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই নটবর। ভগবান দিয়েছিলেন তিনি নিয়েছেন—আবার দেবেন—

ভগবতীর সান্ত্বনা বাক্যে কেহই আশ্বস্ত হইল না—আজ তাহারা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া কোথায় দাঁড়াইবে, কি খাইবে?

নীলমণির স্ত্রী কহিল—কি খাবো, কোথায় দাঁড়াবো আজ ওদের মুখে কি দেব—

ভগবতী কহিলেন—কোন ভয় নেই, আমি আছি। আমার ধানের গোলা, আমার বাড়ী সব তোদের জন্যে, কোন ভয় নেই—তোরা চণ্ডীমণ্ডপে যা—

ভগবতী চলিয়া আসিলেন। ভগবতীর কথায় সকলে আশ্বস্ত হইল—নারীকুল ক্রন্দন ছাড়িয়া চুপ করিল।

(ক্রমশঃ)

নমস্কার

নিশিকান্ত

ধীরে ধীরে খুলে যায় স্বপ্নময় শর্বরীর দিগন্ত মঞ্জুষা,
বাঞ্ছিত মণির মত মূর্ত হয় উষা
উদয় তোরণ হতে সে মণির স্বচ্ছ কান্তি আলো
নিখিলের মর্মে মর্মে পবনের বীজনে ছড়ানো।
সেই সমীরণ স্পর্শে মুঞ্জরিত শেফালি জীবন
নির্ঝরিয়া পুষ্পতনু আপনারে করে নিবেদন
তেমনই প্রস্ফুট প্রাণে অনমিত জীবন আমার
তোমাদের দুজনের চরণ প্রভাত প্রান্তে রাখে নমস্কার।
অম্বরের মেঘে মেঘে গম্ভীর ধ্বনিতে বাজে বিজয় বিষাণ
কণ্ঠে ধরি কল্পান্তের বজ্রময় গান;
বহি যায় প্রভঞ্জন ভুবনেরে সন্ত্রাসিত করি
অরণ্যের তরুদল প্রাণভয়ে শিহরি শিহরি
শিকড়ে আঁকড়ি ধরে ধরিত্রীর মাটীর বন্ধন
সে প্রণয়ে ছিন্ন বৃন্ত শঙ্কাহীন পাতার মতন
মুক্তির আনন্দ ভরে উর্দ্ধে ওড়া জীবন আমার
তোমাদের দুজনের তাণ্ডব চরণ রঙ্গে রাখে নমস্কার।

মেদিনীর সরোবরে পঙ্কিল শাসন-টুটি বিদ্রোহী কমল
মেলিয়াছে প্রকাশের প্রস্ফুটিত দল,
পাংশুল সলিল রাশি নিবিচল মৃণালে তাহার
আবর্তিয়া আবর্তিয়া পরাজয় আনে বার বার।
সে শুধু বৃন্তের পরে পুষ্প বৈজয়ন্তী সম দোলে
রূপের গন্ধের গানে আকাশ বাতাস ভরি তোলে,
তেমতি করিয়া আজি এ মর্ত্যের জীবন আমার
তোমাদের দুজনের চরণ স্বর্গের পরে রাখে নমস্কার।
বাঞ্ছিত গোধুলি লগ্নে যেদিন দোঁহারে লভে শশী আর রবি,
পৃথিবীর মুগ্ধ চক্ষে দোলে দীপচ্ছবি,
স্ফটিক আদিত্য হয় অনুরাগে আরক্ত কাঞ্চন
রজত চন্দ্রিকা হয় অনুরাগে আরক্ত কাঞ্চন
অম্বরের ইন্দ্রনীল সে মিলনে আরক্ত কাঞ্চন
সে অম্বর বক্ষে ধরি শ্যামসিন্ধু আরক্ত কাঞ্চন
সে সিন্ধুর বিন্দুসম বিচ্ছুরিত জীবন আমার
তোমাদের দুজনের ভাস্বর চরণ তলে রাখে নমস্কার।

কার্ল মার্ক্‌স্

(১৮১৮-১৮৮৩)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

১৮১৮ সালে জার্ম্মাণির ট্রিভ্‌স্ নগরে মার্কস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ইহুদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী ইহুদীবংশীয়া ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, মার্কস্ হেগেলের দর্শনের সহিত পরিচিত এবং তাহাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ফিউয়ারব্যাক্ক কর্ত্তৃক হেগেলের দর্শনকে জড়বাদে পরিণত করিবার চেষ্টাদ্বারাও তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্রিকার বিপ্লব-মূলক মতের জন্য সরকার কর্ত্তৃক তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। ১৮৪৩ সালে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে এনজেল্‌স্‌এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এনজেল্‌স্ মানচেষ্টারের এক কারখানার ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার নিকট মার্ক্‌স্ ইংলণ্ডের শ্রমিকদিগের অবস্থা এবং ইংরেজদিগের অর্থনীতির বিষয় অবগত হন। জার্ম্মাণিতে জন্ম হইলেও কোন জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি লক্ষিত হয় নাই। তবে প্লাভ্ জাতি সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার সহিত মার্কসের সক্রিয় সহানুভূতি ছিল। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে তিনি পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত হয়। লণ্ডনে তাঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং কয়েকটি সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁহাকে মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয় নাই। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইতে বিলম্ব নাই, তাঁহার জীবিতকালে না হইলেও অনতিকাল মধ্যেই সংঘটিত হইবে, এই আশায় তিনি কর্ম্ম করিয়া যাইতেছিলেন।

মার্ক্‌স্ রোমাণ্টিকদিগের মত দরিদ্রের দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য লেখনী চালনা করেন নাই। ইংলণ্ডের অর্থনীতির উদ্দেশ্য ছিল মূলধনীদিগের মঙ্গল। মূলধনীদিগের স্বার্থ যেমন শ্রমিকদিগের স্বার্থের বিরোধী, তেমনি ভূস্বামীদিগের স্বার্থেরও বিরোধী ছিল। মার্ক্‌স্ শ্রমিকদিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বকীয় লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য কিছুর ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক; ভাবাবেগের প্রাবল্য তাঁহার রচনায় কোথাও নাই।

১৮৮৩ সালে মার্ক্‌স্ পরলোক গমন করেন। মার্ক্‌সের দর্শন ত্রিভঙ্গীবাদ নামে খ্যাত। ইহা জড়বাদ হইলেও এই জড়বাদের বিশেষত্ব আছে। মার্ক্‌সের মতে প্রাণ ও চিন্তা নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থ নহে; জড়ের মধ্যে প্রাণ ও চিন্তা নাই, ইহা সত্য। কিন্তু জড়পদার্থ হইতে প্রাণ ও চিন্তার উদ্ভব হয়। ডিমের মধ্য হইতে পক্ষী-শাবক বাহির হয়, কিন্তু ডিমের মধ্যে শাবকের কোনও ধর্ম্মই নাই। তেমনি প্রাণ ও মনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জড়ের মধ্যে প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব ছিল না। তাহারা সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ, কিন্তু বিশেষ অবস্থা-প্রাপ্ত জড় পদার্থ হইতে তাহারা উদ্ভূত হয়। এই নূতন পদার্থ মানুষের মধ্যে মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকরূপে প্রকাশিত হয়। জড় পদার্থে গঠিত মানুষ চিন্তা করে, ভালবাসে, মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে। মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতিও আছে। জড়ের মধ্যে আছে কেবল রাসায়নিক শক্তি, প্রাণ-শক্তি তাহার মধ্যে নাই। রাসায়নিক শক্তি-সম্পন্ন জড়ের এক বিশেষ অবস্থায় প্রাণের আধার প্রোটোপ্লাজম্ উদ্ভূত হয়। প্রোটোপ্লাজম্ হইতে বিবিধ জীবদেহের উৎপত্তি এবং জীবদেহেরই এক বিশেষ অবস্থায় মনের উদ্ভব হয়। প্রাণ অথবা মনের কোনও গুণই জড়ের মধ্যে ছিল না। জীবদেহে যেমন রাসায়নিক শক্তির অতিরিক্ত প্রাণশক্তি আছে, তেমনি মানুষের মধ্যে প্রাণের অতিরিক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই প্রাণ ও মনঃ যে জড়ের মধ্যে অথবা জড়ের বাহিরে অন্য কোথাও ছিল এবং পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নহে। জড়ের মধ্যে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। তাহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল অচেতন জড়েরই কেবল অস্তিত্ব ছিল, প্রাণ অথবা মনের অস্তিত্ব ছিল না। কালক্রমে প্রাণ ও মনের যে ধর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই, জড় তাহা লাভ করিয়াছে। জড় নিশ্চেষ্ট নহে। তাহা চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল, তাহা নিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। পরিবর্ত্তন অথবা গতি জড়ের ধর্ম্ম। প্রাণ গতিরই এক বিশেষ জটিল রূপ। যত প্রকার গতির সহিত আমাদের পরিচয় আছে, চিন্তা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। ইহা হইতে যদি মনে করা যায়, যে চিন্তা এক প্রকার আণবিক গতি, তাহা হইলে ভুল হইবে। চিন্তার সহিত আণবিক গতির কোনও সাদৃশ্য নাই। জড়ের গতি নানাবিধ। তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ উচ্চশ্রেণীর বানর ও মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যে মানসিক ক্রিয়া "চিন্তা" নামে অভিহিত হয়, তাহাই সেই গতি।

জড় নানা ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যেক ক্রম পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রম হইতে উদ্ভূত হয়। সেই উদ্ভবের মধ্যে কোনও অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নাই। বাহির হইতেও জড়ের উপর কোনও শক্তির ক্রিয়া নাই। তবুও যে ক্রম উদ্ভূত হয়, তাহা সম্পূর্ণই নূতন, তাহাতে যে গুণ আবির্ভূত হয়, পূর্ব্বে

তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীতে ছিল না, বিশ্বের অন্য কোথায়ও ছিল না। "পরিমাণের গুণে পরিণতি" হইতে এই নূতনত্ব উদ্ভূত হয়। যেখানে পরিমাণের ভেদ ভিন্ন অন্য কোনও ভেদ ছিল না, সেখানে পরিমাণের বৃদ্ধি নূতন গুণের আকার ধারণ করে। জলে তাপ দিতে দিতে তাপ যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করে, তখন হঠাৎ জল বাষ্পে পরিণত হয়। তেমনি ডিমের মধ্যে ক্রমশঃ যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার ফলে এক সময় হঠাৎ তাহার মধ্যে প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়। এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্প অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। বহুকালসঞ্চিত পরিবর্ত্তনের ফলে হঠাৎ একদিন নূতন গুণের আবির্ভাব হয়। জল উত্তপ্ত হইবার সময় বহুক্ষণ তাহাতে তাপ সঞ্চিত হইতে থাকে, তারপর হঠাৎ বাষ্পের উৎপত্তি হয়। তেমনি যুগযুগান্তরসঞ্চিত পরিবর্ত্তন একদিন হঠাৎ এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে তখন হঠাৎ নূতন গুণ আবির্ভূত হয়। যে নূতন আবির্ভূত হয়, তাহা পুরাতনের সন্ততি নহে, পুরাতনের নূতন রূপ নহে। তাহা দ্বারা পুরাতনের বিনাশই সূচিত হয়। কেননা জড়ের এই বিকাশ ত্রিভঙ্গীমূলক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া সংসাধিত হয়। মার্ক্স্ এই মত অনুসারে মানব সমাজের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সামাজিক বিপ্লবও এই নিয়মে সংঘটিত হয় বলিয়াছেন।

এই জগৎ অপূর্ণ। ইহার নানা ত্রুটি দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন, জগদ্ব্যাপারে যুক্তির কোন স্থান নাই; অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা যদৃচ্ছাবশে প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু হেগেল জগৎকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লজিকে তিনি জগতের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জগৎ যে সেই পরিকল্পনা-অনুসারেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। মার্কস্ জগতের এইরূপ কোনও প্রজ্ঞামূলক পরিকল্পনা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জগৎ অপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা যে যুক্তিহীন, তাহাও সত্য। কিন্তু জগৎ গতিশীল এবং নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষের আবির্ভাবের পরে, মানুষের ইচ্ছাদ্বারা প্রকৃতি জগতের বহু পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছে। সুতরাং জগৎ যদিও বর্ত্তমানে অপূর্ণ ও অযৌক্তিক, এই অবস্থা চিরকাল থাকিবে না। কোন নিয়মানুসারে জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, মার্ক্স্ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী।

ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী অনুসারে জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহার অর্থ বিরোধের ভিতর দিয়া জগৎ অগ্রসর হইতেছে। জগতের এই অগ্রগতি বিশৃঙ্খলা হইতে শৃঙ্খলার অভিমুখে গতি, অযৌক্তিক অবস্থা হইতে যুক্তিযুক্ত অবস্থার দিকে গতি। এই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণতির পূর্ব্বে, সেই অবস্থার বিরুদ্ধে এক শক্তির আবির্ভাব হয়; এই বিরোধের ফল সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব এবং প্রাচীন অবস্থার বিনাশ। হেগেলের সমন্বয়ের মধ্যে নয় এবং প্রতিনয় উভয়েরই স্থান আছে, প্রত্যেক ক্যাটেগরির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল ক্যাটেগরিই আছে। কিন্তু মার্ক্সের মতে বিরোধকালে যে নূতনের উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে পুরাতনের স্থান নাই। ইতর জীব-জগতে কোনও জীবের পারিপার্শ্বিকের সহিত যখন তাহার অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয়, তখন যদি সেই জীব পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিতে পারে, তবেই রক্ষা পায়, নতুবা তাহার বিনাশ হয়। মানুষ চালিত হয় প্রত্যয়দ্বারা। মানসিক হইলেও প্রত্যয়সকল বাহ্য জগতেরই প্রত্যয়। বাহ্য জগতে যে সকল পরস্পরবিরোধী অবস্থার উদ্ভব হয়, মানুষের মনে তাহারা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহার ফল হয় অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অন্নকষ্ট। প্রচুর উৎপাদন এবং অন্নকষ্ট এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, মানুষের মনের মধ্যে তাহার প্রতিফলনের ফলে মানুষের মনেও পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়। এই পরস্পর-বিরোধী প্রত্যয়ের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বাহ্য জগতে কর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। সামন্ততন্ত্র যখন প্রচলিত ছিল, তখন তাহার "প্রত্যয়" এবং তাহার অনিষ্টকর ফলের "প্রত্যয়ের" মধ্যে মানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব উত্থিত হইয়াছিল, কর্ম্মরূপে তাহা বাহ্যজগতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সামন্ততন্ত্র এবং তাহার বিরোধী কর্ম্ম হইতে ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব এবং সামন্ততন্ত্রের বিনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। ধনিকতন্ত্রের অনিষ্টকারিতার প্রত্যয় হইতে বাহ্যজগতে যে কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সহিত ধনিকতন্ত্রের বিরোধের ফল সাম্যবাদের আবির্ভাব। সাম্যবাদের আবির্ভাবের ফলে ধনিকতন্ত্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ প্রকৃতির একটা অংশ এবং এই বিরোধের উৎপত্তি জড় প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে বিপ্লবমূলক পরিবর্ত্তন আদিকাল হইতে যুগে যুগে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, সামাজিক বিপ্লব তাহারই একটা বিশেষ রূপ। সাম্যবাদ দোষবর্জ্জিত ধনিকতন্ত্র নহে; ধনিকতন্ত্রের সংশোধিত রূপ নহে, তাহা এক সম্পূর্ণ নূতন সমাজের রূপ, যাহা পূর্ব্বে কখনও মানবের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় নাই। তাহা শ্রেণীবিহীন সমাজের রূপ। ধনিকতন্ত্রে মানব-সমাজের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনি সাম্যবাদ সেই শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবির্ভূত হয়।

ধনিকতন্ত্র প্রথমে আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং এই সকল পরিবর্ত্তন সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহার "মুনাফার" লোভ অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং এক চেটিয়া ব্যবসায়, কার্টেল প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। অবশেষে ইহার অনিষ্টকারিতা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে তখন সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তখন সমাজ-বিজ্ঞানে পারদর্শী লোকদিগের চেষ্টায় ধনিকতন্ত্র সাম্যতন্ত্রে পরিণত হয়। মুনাফার জন্য যাহারা উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহারা যে ক্রমে ক্রমে মুনাফার লোভ বর্জ্জন করিয়া সাধারণের অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। স্বার্থপর লোক কখনও স্বার্থপর কর্ম্ম করিতে করিতে পরার্থপর হইয়া উঠে না। সুতরাং উৎপাদনের লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে বিপ্লবের প্রয়োজন। কিন্তু কাল পূর্ণ না হইলে এই বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না। ধনিকতন্ত্র পূর্ণ পরিণতি লাভ না করিলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। আবার ধনিকতন্ত্র যতদিন ধনিকতন্ত্র থাকিবে, ততদিন তাহার অনিষ্টকারিতা

বিদূরিত করাও সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ ধনিকতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ ব্যতীত তাহার কুফল হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ধনিকতন্ত্রের গর্ভেই সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করে এবং পরিপুষ্ট হয়; অবশেষে জননীর গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়া আবির্ভূত হয়। যে শ্রমিক শ্রেণী একদিন ধনিকতন্ত্রের বিনাশ সাধন করিবে, তাহা ধনিকতন্ত্র কর্ত্তৃকই সৃষ্ট ও প্রতিপালিত হয়। যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানই তাহাদের ধ্বংসের অস্ত্র আপনারাই নির্ম্মাণ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মার্ক্সের মতে নূতনের উদ্ভবের সঙ্গে পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে যত কিছু পুরাতন, সকলেরই ধ্বংস হয়। প্রাচীনের অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনের সহিত সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন দর্শন, বিজ্ঞান ও কলা পরিবর্ত্তিত আকারে নূতনের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহাদের যে অংশ নূতনের বিরোধী ছিল তাহার বিনাশ হয়, অবশিষ্ট অংশ নূতনের সহিত সমঞ্জসীকৃত হইয়া নূতনের মধ্যে গৃহীত হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না।

সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন পূর্ব্বোল্লিখিতভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন মানুষের প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা না বলিলেও চলে। মানব-প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় নহে। বর্ত্তমানে স্বার্থপর মানব-প্রকৃতি যে চিরকালই স্বার্থপর থাকিবে, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে, ইহা সত্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে সমাজের ভিত্তি, সে সমাজে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আত্মরক্ষার জন্যই সে সমাজে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে মানুষের প্রকৃতিই সংগ্রাম-মূলক। বর্ত্তমান অবস্থায় সংগ্রাম ভিন্ন তাহার আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু সমবায়ের ভিত্তির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজে জনগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা না করিলে, যেমন সে সমাজ টিকিতে পারে না, তেমনি সেই সমাজভুক্ত জনগণের কেহই টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের সেবাদ্বারাই স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর। মানবের ইতিহাসে মানব-প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। নূতন প্রতিষ্ঠান যখন পুরাতনের স্থান গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়।

মানুষ প্রকৃতির অধীন। কিন্তু এই অধীনতা চিরস্থায়ী নহে। অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার উপায়—প্রকৃতিকে ভাল করিয়া জানা, প্রকৃতির নিয়ম-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। আমাদের চিন্তা যদি বাস্তব জগতের অনুরূপ হয়, বাস্তব জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যদি ভ্রান্ত না হয়, প্রকৃতি কোন্ প্রণালীতে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করে, তাহা যদি আমরা অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে প্রকৃতিকে শাসন করিবার ক্ষমতাও আমরা লাভ করিতে পারি। প্রকৃতি-সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করিলে আমরা আমাদের শক্তির সীমা অবগত হই; কি সাধ্য, কি অসাধ্য, তাহা বুঝিতে পারি এবং পরিজ্ঞাত সীমার মধ্যে কি করা যাইতে পারে, তাহা আমরা জানিতে পারি। মার্ক্স্ বলেন, যাহার সম্পাদন আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা করা সম্ভবপর। মানুষের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহাদের সমাধানের উপায়ও মানুষের সাধ্যায়ত্ত। তাই মার্ক্স্ বলিয়াছেন, "অবশ্যকতার[1] জ্ঞানই স্বাধীনতা"। অস্ত্রোপচারকালে অস্ত্রচিকিৎসককে যাহা করিতে হইবে এবং যাহা করিতে হইবে না, তাহা তিনি জানেন। যাহা অবশ্যক, তাহার জ্ঞান তাঁহার থাকে। সুতরাং তখন তিনি স্বাধীন। মানুষ যখন পরিবর্ত্তনের নিয়ম অবগত হয়, তখন সমাজের পরিবর্ত্তন-সাধনে মানুষ স্বাধীন। মানুষই ইতিহাস গঠন করে, কিন্তু কল্পনা-সাহায্যে নহে। প্রত্যেক যুগই বিশেষ বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হয়। এই সকল অবস্থার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি তাহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা যায় বুঝিতে পারেন, তিনিই সমাজের মঙ্গল-বিধান করিতে সমর্থ।

মার্ক্সের ইতিহাসের দর্শন "ইতিহাসের জড়বাদ-মূলক[2] ধারণা" নামে পরিচিত। জগতের বিকাশ যে ত্রিভঙ্গী-নয় প্রণালীতে হয়, সে বিষয়ে হেগেলের সহিত তাঁহার মতভেদ নাই। কিন্তু হেগেল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে তাঁহার লজিকে বিবৃত ডায়ালেক্টিক্ অনুসারে আত্মার অভিব্যক্তি-ক্রমেই মানবীয় ইতিহাসের বিকাশ সংঘটিত হয়। মার্ক্স্ এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে শক্তি অভিব্যক্তি সাধন করে, তাহা জড় শক্তি। মানুষের আবির্ভাবের পরে মানুষ ও জড় প্রকৃতির মধ্যগত সম্বন্ধ দ্বারা মানবীয় ইতিহাসের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে পণ্য উৎপাদন প্রণালীই ইতিহাসের বিকাশে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্সের জড়বাদ অর্থনীতিতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ-প্রণালী-কর্ত্তৃক প্রত্যেক যুগের রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন এবং কলা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। মার্ক্সের এই মতের মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত তাহার সভ্যতারও তদ্রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সত্য। কিন্তু যুক্তি এবং ভাবাবেগের প্রভাবে মানুষ যে তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে এবং বহুবার অতিক্রম করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কৃষি-জীবী প্রাচীন ভারতে কৃষিকার্য্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিত, তজ্জন্য বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু উপনিষদে যে দর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উদ্ভব হইল কোন্ উৎপাদন-প্রণালীর ফলে? ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, "ষড় দর্শনে যে দার্শনিক চিন্তার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল ভারতের মত দেশেই সম্ভবপর ছিল। প্রাচীন ভারতে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ছিল না। জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিত। লোকের অভাব ছিল সামান্য, সুতরাং তাহারা বনের পাখীর মতো বাস করিতে এবং পাখীর মতই আকাশের মুক্ত বায়ু,

1 Necessity

2 Materialistic Conception of History

আলোক ও সত্যের সনাতন উৎসের অভিমুখে উড্ডীন হইতে পারিত। নিরক্ষ রেখার উপরিস্থ সূর্য্যের তাপ হইতে পলায়ন করিয়া যাহারা বনকুঞ্জের ছায়ায় অথবা পর্ব্বত গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে জগতে তাহাদের স্থান, তথায় কেন অথবা কিরূপে তাহারা আসিয়াছে, যাহারা তাহার কিছুই জানিত না, সেই জগতের সম্বন্ধে চিন্তা করা ভিন্ন তাহাদের আর কি কাজ ছিল?" ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের ফলে যে অবসর প্রাচীন ভারতীয়দিগের অধিগত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা তাহাদিগের দর্শন প্রিয়তার ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু সেই দর্শন যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা হয় না। ভোগ্যবস্তুর যেখানে অভাব ছিল না, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের মত বৈরাগ্য প্রবণ ধর্ম্মের উদ্ভবই বা কেন হইল? আর্য্য জাতির অন্য কোনও শাখার মধ্যে যে চাতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব হয় নাই, ভারতীয় আর্য্য সমাজ তাহার উপরই বা কেন প্রতিষ্ঠিত হইল? খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ যে ভাবের উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে আরবীয় সমাজ নূতনভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহারও কোনও অর্থনৈতিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বর্ব্বরদিগের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশে ধন প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না, তখন ঐহিক সুখে নিরাশ হইয়া লোকে পরলোকে সুখের সন্ধান করিয়াছিল এবং নব্যপ্লেটনিক দর্শনের মত গুহ্য দর্শনের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা যদিও স্বীকার করা যায়, তথাপি খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে দলে দলে লোক কেন বুদ্ধের অনুসরণ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য প্রাণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোনও অর্থনৈতিক কারণ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। কেহ কেহ বলেন, সনাতনের প্রতি আসক্তি যাহাদের প্রচুর অবসর আছে, তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাহা স্বীকার করেন নাই। এপিকটেটাস্ ও স্পিনোজা উভয়ের কাহারও অবসরের প্রাচুর্য্য ছিল না। বরং বলা যাইতে পারে, যাহারা কর্ম্মক্লান্ত, সেই শ্রমিকদিগেরই কর্ম্ম বিহীন অবসর ভূয়িষ্ঠ স্বর্গের কল্পনা করা অধিকতর সম্ভবপর।

মার্কস্ যে শ্রমিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মূলে মানব মঙ্গলের ইচ্ছা ছিল না, বলিয়াছিলেন। নীতির দিক হইতে সাম্যবাদী সমাজ যে ধনিকতন্ত্র হইতে উৎকৃষ্টতর, তাহাও তিনি বলেন নাই। ত্রিভঙ্গী নয় অনুসারে সাম্যবাদী সমাজ যে ধনিকতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিবে, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষের সুখ যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও কিন্তু ত্রিভঙ্গী নয় অনুসারে তাহাও স্থায়ী হইবে না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্ক্‌সের দর্শনের সমালোচনায় তাহার কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—মার্কস্ অত্যধিক কর্ম্মমুখী। তাঁহার সময়ের সমস্যার সমাধানের জন্যই তিনি উৎসুক, তাঁহার দৃষ্টি কেবল পৃথিবীতেই নিবদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে আবার মানুষেই তাহা কেন্দ্রীভূত। কিন্তু কোপার্ণিকাসের সময় হইতে মানুষের মর্য্যাদার অনেক লাঘব হইয়াছে, পূর্ব্বে বিশ্ব ব্যাপারের আলোচনায় তাহার যে গুরুত্ব ছিল, তাহা আর নাই। সুতরাং মার্কসের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—মার্কস্ প্রগতিকে সার্ব্বিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। প্রগতিকে অপরিহার্য্য সার্ব্বিক নিয়ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তিনি কর্ম্মনীতির আলোচনা করেন নাই। সাম্যবাদ যদি আসে, তবে নিশ্চয়ই তাহা পূর্ব্ব অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মার্কস্ আপনাকে "নাস্তিক" বলিতেন, কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাস কেবল ঈশ্বরবাদের সঙ্গেই সামঞ্জস্যযুক্ত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে হেগেলের নিকট হইতে মার্কস্ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সকলই অবৈজ্ঞানিক। কেননা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণের অভাব।

মার্কস তাঁহার মতকে যে দার্শনিক পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তাহার ডায়ালেকটিক অবলম্বন না করিয়াও মুখ্যতঃ তাঁহার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারা যাইত। ইংলণ্ডের তদানীন্তন উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে শ্রমিকদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিয়া মার্কসের মনে হইয়াছিল, যে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হইবে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের কুফল হইতে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব উৎপন্ন হইবে। তাঁহার মতে শিল্পপ্রধান দেশে ধনিক শিল্প ব্যবসায়ের একমাত্র বিকল্প হইতেছে রাষ্ট্রকর্তৃক জমি ও মূলধনের স্বামিত্ব গ্রহণ করা। ইহার সহিত দর্শনের কোনও সম্পর্ক নাই।

মার্কসের মত প্রচারের ফলে জার্ম্মানীতে Social Democratic Partyর উদ্ভব হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দলই জার্ম্মানিতে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। উইমার সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট এই দলের সভ্য ছিলেন। ক্রমে দিনে এই দলের উপর মার্কসের মতবাদের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রুসিয়া এবং পূর্ব্ব ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে এবং চীনদেশে মার্কসের অনুবর্ত্তিগণ দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যবাদী সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অনেক শিক্ষিত লোক মার্কসের মত অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রমিক আন্দোলন সর্ব্বত্রই মার্কসের মতাবলম্বী। ভারতবর্ষেও মার্কসপন্থী দলের আবির্ভাব হইয়াছে।

মার্কসের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার দ্বন্দ্বমূলক ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চান। ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী চিন্তার প্রণালী। প্রকৃতির অভিব্যক্তিও এই প্রণালীতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও ন্যায় সংবেদ সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান মানুষকেও কর্ম্মক্ষেত্রে এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। প্রকৃতি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলে, মানব সমাজে অভিপ্রেত পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু মানব সমাজের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য এইরূপ রক্তাক্ত পন্থা অবলম্বন করা উচিত কিনা, তাহা বিবেচ্য। যে যে দেশে সমাজ-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় তাহা রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতার খর্ব্বতা সাধন করিতে হইয়াছে। এই খর্ব্বতা সাময়িক হইলেও, কতদিনে তাহার দূরীকরণ সম্ভবপর হইবে, তাহা অনিশ্চিত। যে ধনবৈষম্য দূরীকরণের জন্য সাম্যবাদ সচেষ্ট, সে বৈষম্য মানব-সমাজে চিরকালই আছে এবং তাহার বিরুদ্ধে মহাপুরুষগণ চিরকাল প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাবতীয় ধর্ম্মে দরিদ্রের সেবা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বৈষম্য বিদূরিত হয় নাই সত্য। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিয়া সে বৈষম্য বিদূরিত করিলেও তাহা নূতন রূপে আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে। ফলকথা যতদিন মানুষে মানুষে বুদ্ধি ও ক্ষমতার তারতম্য থাকিবে, ততদিন পূর্ণ সমাজতন্ত্র অসম্ভবই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষে ইন্ধন-প্রদান দ্বারা পরিণামে মানবমঙ্গল সাধিত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

থাইল্যাণ্ড

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পূর্বে ছিল শ্যাম—আজ ওদেশের লোক শ্যাম ত্যজে, নিজেদের নাম-করণ করেছে—থাই। পথ, ঘাট, লোক-জন, মন্দির ও বিহার—সবার মাঝে ভারতীয় নামের বহুল প্রচলন। হঠাৎ দেশের সংস্কৃত নামটা বদলে ইন্দোচীনের অধিবাসী আপনাদের পরিচয়ের প্রথা পরিবর্তন করলে কেন? ভারতের প্রভাব ...র জন্য? এ প্রশ্ন আমি বহুদিন বহুজনকে জিজ্ঞাসা ...রছি এদেশে। বছর দুই পূর্বে একবার মহাবোধি ...ইটিতে ওদেশের এক বিশিষ্ট রাজবালা রাণী

মন্দির

...ভাবতীকে অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু ...কথা তাঁকে বা কুমার রণজিতকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, ...সৌজন্য প্রকাশ পাবে এ আশঙ্কায়।

এবার গত পূজার ছুটিতে জাপান যাবার পথে ব্যাঙ্কক ...লাম। অভিভূত হ'লাম ওদের অনাবিল সৌজন্যে। ...ত্যেকেই ভারতবাসী বিদেশীকে সহায়তা করতে উৎসাহ ...খালো। এক ইংরাজি দৈনিক ব্যাঙ্কক পোষ্টের সাংবাদিক সাক্ষাৎ করলেন, আমার প্রথম ধারণার আভাসের জন্য। আমি ভরসা করে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা আমাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার গর্ব করেন, আমাদের ভাষার শ্যাম বদলে থাই করলেন কেন নিজের দেশের নাম? আবার অন্তে ইংরাজি বা মার্কিনী ল্যাণ্ড যোগ করে দিলেন কেন?

ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লেন—শী-আম আপনাদের নাম হবে কেন? শী-আম ছিল মালাই শব্দ। তাতে আমাদের পরিচয় পাওয়া যেতো না। আমরা থাই জাতি—মৌঙ্গ থাই—চির স্বাধীন। তাই এটা থাইদেশ—থাইল্যাণ্ড।

—থাই কি স্থবীর পালি প্রতিশব্দ?

তিনি হেসে বল্লেন—অত বিদ্যা নাই। সম্ভব।

তারপর ভরসা করে থেরা, ভিক্ষু, সমনেরা প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছি। শ্যাম নাম যে শ্যাম-অবতার বা শ্যামা-মা হতে হয়েছিল এ সিদ্ধান্তের কোনো যুক্তি নাই। কারণ ওদের শিল্প ও সংস্কৃতিতে শ্যাম বা শ্যামার স্থান নাই। বিষ্ণুর গরুড় আছে। বিশ বছরের মধ্যে নির্মিত প্রকাণ্ড সুদর্শন পোষ্ট অফিসের অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারে দুটি বৃহদাকার গরুড়ের মূর্তি আছে। ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর বজ্রপানি মূর্তি নাচের ভঙ্গিমায় বহুস্থলে চোখে পড়ে। তাদের ধড়াচূড়া দেখে রাস-লীলার শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু অবতারের মধ্যে—শ্রীরামচন্দ্র এবং বুদ্ধ ভগবানের কীর্তিময় জীবন-চরিত প্রধানতঃ থাই শিল্পের আখ্যান বস্তু।

আমাদের দেশে, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যায়িকাকে স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করেছে, প্রাদেশিক রুচি এবং কৃষ্টির বিভিন্নতা অনুসারে। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং ভক্ত তুলসীদাসের রামমানসচরিত মূল ইতিহাসের ভিত্তি এবং শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কথা গ্রহণ করেছে কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণ হতে। কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং চরিত্রের বিকাশভঙ্গী পৃথক। মাইকেল মধুসূদনের ইন্দ্রজিতের চরিত্র শৌর্য্যে,

বীর্য্যে এবং বাক্যে রামলক্ষ্মণের চরিত্রকে অতিক্রম করেছে।

ইন্দো-চীন বা ইন্দোনেশিয়া তেমনি নিজেদের ভাবে ও কল্পনায় রাঙিয়েছে রামায়ণ। মূল আখ্যায়িকা এক হ'লেও—দারুণ বিভিন্ন এবং জটিল। ব্যাঙ্ককে মরকত-বুদ্ধের মন্দিরের সীমানা জুড়ে চারিদিকে প্রকাণ্ড দালান আছে। তাদের দেওয়ালে রামায়ণের ঘটনাবলী এবং এক অংশে বুদ্ধদেবের জীবনের ইতিহাস অপূর্ব সুন্দর রঙীন চিত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। একটু মনোনিবেশ করে ছবির ভঙ্গিমা ও মাধুরী দেখতে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা লাগে। তার পর বাসনা হয় আর একদিন দেখবার। এ চিত্রে রাম-রাবণের যুদ্ধ, বানর-রাক্ষসের লড়াই আছেই—উপরন্তু আছে রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় যাত্রাপথে—একাধিক বিবাহ।

এ চিত্রে মানুষ, রাক্ষস, বানর, হনুমান প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে আঁকা। তাদের ভঙ্গী, গতি এবং প্রত্যেক খণ্ড-চিত্রে বর্ণিত বহু যোদ্ধা, বক্তা প্রভৃতির সংযোজন এবং সমীকরণ প্রমাণ করে থাই-শিল্পীর দক্ষতা। এ নিপুণ চিত্রসম্ভারের রাজ-পুত্র ও রাজন্য-বর্গের বস্ত্রে ও সজ্জায় ভাঁজে ভাঁজে পাড়ে ও ধারে সোনার রেখা। কিন্তু কাপড় পরবার প্রথা বাঙ্গালী ধরণের। আমরা বিবাহে যেমন টোপর মাথায় দিই—তেমনি টোপর রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, ইন্দ্র প্রভৃতির শিরে। অবশ্য সোলার টোপর নয়, টোপর রঙের বিন্যাসে মনে হয় সূক্ষ্ম সোনারূপার তারের ও পাতের। অবশ্য এ চিত্রাবলী দুইশত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। বাঙলার লম্বা কোঁচা থাই ও বর্মী শিল্পে প্রচুর। কেন?

যে কথা বলছিলাম—শ্যাম ও থাই সম্বন্ধে—তার পূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম এই প্রাচীর-চিত্রের একটি ছবি হ'তে। এক সুন্দর রথে শ্বেত-বর্ণের হয়-সংযুক্ত। উপরে দুই যোদ্ধা। অশ্ব-চালকের বর্ণ শ্যাম, ধনুর্ধারীর বর্ণ গৌর। এ চিত্র দেখে কুরুক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি ভাবা স্বাভাবিক।

এক ভদ্রলোক শুনে বল্লেন—আপনি ভুল করেছেন। ওঁরা কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন নন। ওঁরা রাম লক্ষ্মণ। পরে টোকিওতে থাইল্যাণ্ডের মিসেস জানক (জাতক) সুপ্রভাতানন্দের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি বল্লেন—হ্যাঁ মিষ্টার গুপ্ত ভুল আপনার, ও চিত্র রাম-লক্ষ্মণের।

এর পর আমার আর সন্দেহ রহিলনা যে শ্যাম মালাই শী-আম, আমাদের শ্যামের নামের দেশ নয়।

থাই ভাষার মধ্যে রূপ বদলে বহু সংস্কৃত বা শব্দ মিশে আছে। কারণ পালিভাষার অনুশীলন থাইল্যাণ্ডে যথেষ্ট। হেথায় দু হাজার মন্দির, বিহার, বাত প্রভৃতি আছে। ভিক্ষু ও থেরার সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজারের উপর। সমনেরা প্রায় ষাট হাজার। পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থের পুত্র যৌবনে পদার্পণ করলে এক বৎসর ব্রহ্মচারী রূপে ভিক্ষু হতে হত। আজ এ প্রথা প্রায় লুপ্ত হচ্ছে। আমরাও তারুণ্যে যজ্ঞোপবীতের পর এক বৎসর ব্রহ্ম নিয়ম পালন করতাম। আমাদের পুত্রেরা সে নিয়ম
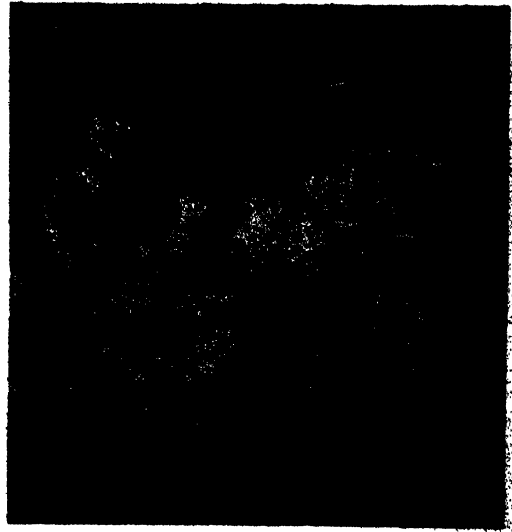
শ্যামের রাজা ও রাণী

মানেনি, আর আমাদের নাতিরা তাকে ভাবে কুসংস্কার। সুতরাং থাইল্যাণ্ড বা অন্য বৌদ্ধ দেশকে দোষী করা অসমীচীন।

কিন্তু এই পালিভাষার পলীমাটিই শ্যামের পথ-ঘাটে ভারতবাসীর পক্ষে এক অপূর্ব আত্মীয়তার সন্ধান দেয়। সূর্যবংশী রোড্, রাম রোড্, রাজবংশী রোড্ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে চলবার সময় মনে হয় একদিন আমাদের কৃষ্টি ছিল বহুদূরব্যাপী। মন্দিরের মাঝে যখন ভিক্ষুর ভাষা কানে প্রবেশ করে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ... পাণাতিপাত বেরামনি শিক্ষাপদং সমাদীয়ামি—তখন প্রথমে হয় আনন্দ, পরে আসে আক্ষেপ, দারুণ দুঃখ, হাহাকার

করলে এরা ফিরে আসতে পারে আমাদের বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতির মাঝে। কিন্তু মনে পড়ে ঘরের অবস্থা—প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হ'তে দূরে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কেহ কারও সুখ্যাতি করেনা, একজন অন্যের সদ্‌গুণের সন্ধান পায়না। নিরাশার দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে নিয়ে যায় বিস্তারের বিলাস-বাসনা, ব্যাপ্তির আনন্দের সুখস্বপ্ন।

যাক শুভ ইচ্ছা রসাতলে। ভূতলে দেখি থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় নামের ছড়াছড়ি। দুজন চিকিৎসকের দ্বারে দেখলাম লেখা—Dr. Ella Viravaithaya এবং Dr. Samak Viravaithyaya।

ডাঃ আনন্দসেন, ডাঃ বীরবৈদ্যেরা দন্ত-চিকিৎসক। শ্রী-

মন্দির পথে

শ্রীরীসিংহ (শ্রী-শ্রীসিংহ?) দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এক সম্পর্কের মাধ্যম ওদের বর্ণমালা। পাঞ্জাব হ'তে ত্রিবাঙ্কুর অবধি একই বর্ণমালার বহুরূপ দেখা যায়। তেমনি এ বর্ণমালার ভিন্নরূপ লঙ্কা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে। চীনার সংস্কৃতি যথেষ্ট বিদ্যমান ওদেশে। কিন্তু চীনাদের দোকান ভিন্ন কোথাও উপর নীচ লেখা চীনা অক্ষরের প্রচলন নাই শ্যামে। যেখানে চীনারা নিজের ভাষায় দোকানের পরিচয় লিখেছে, সেথারও থাই অক্ষরে লেখা আছে বিপণী-স্বামীর নাম। ট্রাম, বাস, রাস্তার নাম প্রভৃতি থাই ভাষায় লেখা। ইংরাজি অতি অল্পস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

মন বেগ-ধারণ করে বিদেশ যাত্রার। সে মন অভিজ্ঞতা, জন-শ্রুতি, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি মিশিয়ে কল্পনার ছবি আঁকে গন্তব্য দেশের। অনেকে স্বীকার করেছে—যে তাজ-মহলের কল্পিত চিত্র তাদের নিরাশ করেছে তাজের প্রথম দৃশ্য। অবশ্য সত্য সুন্দর। কিন্তু সুন্দরও সত্য। তাই পরে তাজমহল সেই নিরাশ ভ্রমণকারীকে উল্লসিত করেছে। থাইল্যাণ্ড সম্বন্ধে আমারও বহু কল্পিত ধারণা আঘাত পেলে প্রথম দর্শনে।

পূর্বে মলয়ে থাই-নারী দেখেছি—অবশ্য শেষ দেখা হ'য়েছিল চৌদ্দ বছর পূর্বে। তার পর বহু চিত্র দেখেছি। কিন্তু সর্বত্র দেখেছি সারঙ্—খুব রংচং করা লুঙ্গির মত সাড়ি। এবার ব্যাঙ্কক্ যাবার পূর্বেও রেঙ্গুনে এক রাত্রি ছিলাম। সেখানেও বর্মা নারীকে দেখলাম—লুঙ্গীও ইঙ্গি-ভূষিতা, মথে তানাথা মাখা, দু চারজন অতি-আধুনিকার ঠোঁটে ওষ্ঠ-ছড়ির লাল। থাইল্যাণ্ডে নেমে দেখলাম—ঘাগড়া ও গাউন। অতি দরিদ্র ঘাগড়া পরে বাস করছে, কাজ করছে নৌকায় ও ঘাটে। আর সহরের মেয়ে গাউন-শোভিতা মেম। ওরা সবাই খুব গৌর বা হরিদ্রা-বরণা নয়। কাজেই য়ুরোপীয় বা আধুনিক জাপানী মহিলা ব'লে ভ্রম হয় না। আমি সমালোচনা করছি না, বর্ণনা করছি। যা' তাদের প্রধানেরা মিলে দেশের লোকের জন্য বিধান করেছে, তার বিরুদ্ধে কথা কহা অভদ্রতা। মোট কথা আমার মনের ছবির রেখা মুছে নতুন রেখা টানতে হ'ল মানসপটে। মেয়েরা যখন মেম হ'য়েছে; বলা বাহুল্য, পুরুষেরা সাহেব—রাজা হ'তে সামলোর বা সাইকেল-রিক্সা শ্রমিক অবধি।

মীনাম নদীর আত্মা বা জননী—বহু শাখা-প্রশাখা নিয়ে বহু দিকে ভেদ ক'রে গেছে সহরকে। বহু সাঁকো যোগ করেছে সহরের বিভিন্ন অংশকে। ডাবলিনের তিত

প্যারিসের সেন, লণ্ডনের টেমস প্রভৃতির সঙ্গে সহরের ঘনিষ্ঠতা ঐ রকম। কিন্তু ব্যাঙ্কক বহু স্রোতস্বিনীতে নিজের দেহকে খণ্ড করেছে। শাখানদী মাত্র পথ নয়। তার উপর দিয়ে সদাই নৌকা ও ডিঙ্গি চলাচল করছে। আর সেই নৌকার মধ্যে অনেকগুলি দরিদ্র পরিবারের বাসস্থান। পোষ্ট অফিসের কিছুদূরে এক সেতুর ধারে দেখলাম এক মস্ত জল-বাজার। টাট্‌কা তরী-তরকারী কেনবার জন্য লোকে ছুটাছুটি করছে, দরদস্তুর করছে।

দরদস্তুর প্রথা প্রাচ্যে সর্বত্র। মিশর থেকে জাপান অবধি সব দেশে হাটে ও বাজারে দর করা চলে—অতি বড় দোকান ছাড়া। একবার রোমে একটি ছোটো চায়ের দোকানে চা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সরবরাহ করে যখন বিল দিলে হোটেলের লোক—আমার পুত্র বল্লে—হাঁ! এত দাম। আমরা বিদেশী।

খুব মোটা লোক। ইতালীয় হাত নেড়ে বল্লে—ওঃ। বিদেশী—ইন্দো—আ চ্ছা কিছু কম দাও।

সেটা দর করা—না বিদেশীর প্রতি সম্মান, বুঝিনি। কিন্তু এসিয়ার দর কষাকষি ব্যবসার রীতি।

বর্তমান রাজবংশের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

বিগত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও স্পেনের নৌ-বাহিনী দক্ষিণ-এসিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিল। ইন্দোচীনে ও লাওস, ক্যাম্বোদিয় প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত আজিও। লঙ্কায় পর্তুগীজরা যথেষ্ট প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করেছিল, যার ফলে আজিও সিলোনের বহু বৌদ্ধ অধিবাসীর য়ুরোপীয় নাম। ফরাসী-সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই ফরাসী ও পর্তুগীজ বন্ধুত্বের আধিক্যের ফলরূপে অযোধ্যার রাজা নারায়ণকে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম ছিল লোকের প্রাণের ধর্ম। খৃষ্টীয় ১৬৯২ সালে রাজাকে হত্যা করে বিদ্রোহী শ্যাম-বাসী। ফলে পাশ্চাত্যের শুভ-সংকল্প বিনষ্ট হ'ল।

কলিকাতায় ধর্মরাজিকা বিহারে শ্যামের রাজা ও রাণী

ব্যাঙ্কক্ প্রাসাদ য়ুরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে গড়া ভবন। এখন রাজত্ব করেন রাজা ফুমিফল (ভূমিবল?) অতুলদেজ (অতুল-তেজ?)। তিনি এবং রাজমহিষী শিরিকীত (শ্রীকৃত?) জন-প্রিয়। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের মুণ্ডন উৎসব হবার সাতদিন পূর্বে আমাকে জাপানে রওয়ানা হ'তে হ'য়েছিল—তাই ধুমধামের কথা পড়লাম কাগজে।

শ্যামের প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ নাই। অধিবাসীরা ব্যাঙ্ককে ধান, চাল, মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতি বিক্রয় করে। বহুপূর্বে বর্মীরা সে দেশ ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপর বীর যোদ্ধা ছয়ফিয়

বর্ত্তমান রাজ-বংশেও পাশ্চাত্য প্রভাব অল্প নয়। মাঝে এক রাজা ছিলেন যাঁর নাম ছিল জর্জ ওয়াসিংটন। বর্ত্তমান রাজা-রাণী য়ুরোপে শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৩২ সালে রাজা প্রজাধিপক্ কিয়দ্ পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দান করেন শ্যামকে। এক পার্লামেণ্ট প্রবর্ত্তিত হয়—যার অর্দ্ধেক-সংখ্যক প্রতিনিধির নির্বাচন-ভার পায় প্রজা—বাকী অর্দ্ধেক রাজার মনোনীত সদস্য। কিন্তু তাতে উভয় পক্ষের কেহই

তুষ্ট হ'ল না। ফলে ১৯৩৫ সালে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন।

রাজা প্রজাধিপকের পুত্র আমন্দ মহীদলও বর্ত্তমান যুগ-ধর্মের সঙ্গে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেন না। ১৯৪৭ সালে তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ী খুন করলে। তারপর সিংহাসন অধিকার করলেন বর্ত্তমান ভূপতি। এখন পূর্ণ মাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসিত না হলেও, থাই রাজা ইংলণ্ডের নরপতির মত—কনষ্টিটিউসান্যাল কিং। ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর স্থান উচ্চ। রাজবংশের সাথে বৌদ্ধ-বিহারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ধর্মের প্রধান রূপে পরিগণিত হন থাই-ভূপতি।

থাইল্যাণ্ডের জনসংখ্যা মোট প্রায় এক কোটি আশী লক্ষ। তার মধ্যে ব্যাঙ্ককে বাস করে দ্বাদশ লক্ষ। সহর বেশ বড়। বহু অট্টালিকা ও সৌধের সাথে কাঠের বাড়ী বহু। কলিকাতার মত এত পাকা বাড়ি টোকিওতেও নাই—যদিও আয়তনে জাপানের রাজধানী কলিকাতা হ'তে বৃহৎ। ব্যাঙ্ককেরও সমৃদ্ধি সহরের কতকাংশ জুড়ে—বড় রাস্তার ধারে। কিন্তু গলির মধ্যে প্রায়ই সব কাঠের বাড়ি। সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপরীত ভাব সহজেই চোখে পড়ে। কলিকাতার বস্তীগুলোর মধ্যে এক একটি যেমন মানুষের বাসের অযোগ্য—লোকের পোষাকপরিচ্ছদ, ময়লা, আবর্জনা প্রভৃতি বিচার করলে, তেমন দুর্দশার বিজ্ঞাপন ভারতের বাহিরে বিরল। তা'হলেও ধনীর প্রাসাদ এবং দরিদ্রের কুটীরের বিভিন্নতা সর্বত্র বিদ্যমান। মোঙ্গলীয় জাতি পরিশ্রমী। ওরা নিজ নিজ গৃহ পরিষ্কার করে এবং পরিচ্ছদ ভালবাসে। কিন্তু ওদের শুক্‌নো মাছের প্রীতি গলিগুলিতে এবং বাজারে যে গন্ধ পরিবেশন করে, তেমন গন্ধ কলিকাতার চীনাপাড়ার স্থান-বিশেষ ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্ককের বাত বা মন্দিরের তথা বহু গৃহের প্রবেশ পথের বারান্দার ছাদের গড়ন বড় সুন্দর। লম্বা-কোণা চালা আমরা টানা এক গড়নে গড়ি। ওরা গড়ে খণ্ডে খণ্ডে। চালার এক অংশ অন্য হ'তে কিছু উঁচু, পরের অংশটি তা হ'তে উঁচু। টালির কোণগুলি একটু মুড়ে দেয়। প্রত্যেক স্তরের তিন কোণা ফাঁক করবার জন্য বাহারি ত্রিকোণ কাঠে নক্সা করে। কোথাও প্রতি স্তরের উপর নিশান দেয়। চিত্র হ'তে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

সহরের নদীর ধারের বাড়িগুলি নির্মিত হয় মাচার 'পরে। সহরতলী এবং গ্রামের নাবাল জমিতে তেমন কুটীর বহুল-পরিমাণে নজরে পড়ে। মলয় দেশে এ কুটীর সর্বত্র। নিচের তলা খালি থাকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। নদীর দিকে বারান্দায় বসে গৃহস্থ হাওয়া খায়, নদীতে নৌকা দেখে, ডিঙ্গি হ'তে সব্জী কেনে। কাও পাত—বা ভাজা ভাত খায়।

কাটি বা চপস্টিক দিয়ে খাওয়া সকল জাতির সুলভ—যার মাঝে মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ আছে। এ একটা শিল্প। একটি চীনা-মাটির বাটিতে ভাত রাখে। তাতে ব্যঞ্জন মেশায়। মুখের কাছে সেটিকে ধরে। দুটি কাটি দিয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে ভাতের শোভাযাত্রা চালায় যে একটির পর একটি ভাত সুড় সুড় করে মুখে যায়—সঙ্গে নিয়ে যায় মাছ, শূকর, হাঁস, মোরগ বা গো-মাংসের টুকরা।

নিরামিষ-ভোজীর কথা ভিন্ন। কিন্তু লঙ্কা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান, লুচুদ্বীপ, ফিলিপিন, মালয় প্রভৃতি সকল দেশের মাংসাশীকে দেখেছি গো-মাংস ও শূকর-মাংস ভক্ষণ করতে। তাদের দেশাচার—এর বিরুদ্ধে বলবার কি আছে? শ্যামের দেশপ্রথায় সেথায় ভক্ষ্য পরিবেশন হয়, সেথায় প্রথমেই পরিচারক লোভ দেখিয়ে বলে—খুব ভালো প্রিয় বানসুয়া—আছে।

—ব্যাপারটা বুঝি না। সে কি?

—আজ্ঞে স্যার টক মিষ্টি গো-মাংস।

যখন বলি—না আমরা প্রিয় গরু খাই না—তখন সে দুঃখ-প্রকাশ করে বলে—কায়েং পেড্‌কাই আছে।

কায়েং পেড্‌কাই মোরগের ঝোল।

থাই বাঙালীর মত আমোদ-প্রিয়। যে ক্ষেত্রে শিক্ষা বা কৃষ্টির আদর আছে, তার কর্ম সেথায়। কিন্তু পৃথিবী ধনীর ভোগক্ষেত্র। কৃষি থাইদের হাতে। সারা শ্যাম শস্যপূ[illegible] দেখলাম, দুবার দেশের উপর দিয়ে ওড়বার সময়। কিন্তু মা লক্ষ্মী বসতি করেন বাণিজ্যে। বাঙালী একদিন ব্যবসাকে অবহেলা করে দারিদ্র্যকে ঘরে ডেকে এনেছে। থাই অধিবাসীও ব্যবসাক্ষেত্রে নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'য়ে আছে। ব্যাঙ্ককের দোকানগুলোর প্রায় শতকরা ৮০টি চীনাদের। বাণিজ্যে চীনা, মার্কিনী, মাত্র কয়েকটি ভারতীয় এবং অতি অল্প থাই। প্রধান ব্যাঙ্ক এখন বোধহয় ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা—নবনির্মিত পোষ্টাফিস-সৌধের সম্মুখে প্রকা[illegible]

ভাঙ্গিয়ে থাই টিকল্ সংগ্রহ করলাম ভারতীয় এক ভদ্রলোকের দোকানে। ইনি উত্তরপ্রদেশের লোক। কিন্তু সোনা, রূপা, রেশম প্রভৃতির শিল্পী থাই। কী সূক্ষ্ম কারুকার্য। দামও সস্তা। কিন্তু নিজের দেশের কাষ্টম্‌সের ভয়ে নাতি, নাতিনী বা কন্যাদের জন্য কিছু উপহার আনতে পারলাম না।

ব্যাঙ্ককের প্রত্যেক ফায়া বা বাতের পরিচয় দেওয়া যায় না স্থানাভাবে। প্রত্যেকটিই সুরক্ষিত, সুসজ্জিত এবং সুদৃশ্য।

বাতপোত নামক মন্দিরে একটি অতি সুন্দর পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। মরকত-বুদ্ধের মন্দিরের শোভা ও বিস্তৃতি অপূর্ব। বাত রাজপোবিতের কতকগুলি দরজা মতি-খচিত। শিল্প-নিপুণতা অতি উচ্চদরের।

বাত ইন্দ্র-বিহারে এক দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। অতি সৌম্য-মূর্ত্তি। বাত অরুণ—বিস্তৃত বাগানের মাঝে।

দীনতা আনে নিজেদের মন্দিরের হৈ হৈ ব্যাপার—হৈ হৈ কাণ্ড স্মরণ ক'রে। তর্ক ক'রে অনেকে আমাকে বলেছেন—কেন? বিশ্বনাথের মন্দিরের চীৎকার, ধাক্কা, পকেটের থলি বাঁচানো—এ সব বাবার পরীক্ষা। মন্দিরে মন থাকলে সত্য শিব-সুন্দরে, ওসব তুচ্ছ ভাবনা এড়াতে হ'বে। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ সে মন আমাকে দান করেননি। কোনো বৌদ্ধ খৃষ্টীয় বা মুস্লিম মন্দিরে গির্জায় বা মসজিদে ভক্তের অমন প্রবেশিকা-পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। হাজার লোক ঘুরছে বাতে, কিন্তু কারও মুখে বাক্য নাই।

থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীর ধমনীতে মোঙ্গলীয় রক্ত আছে অন্য রক্তের সাথে মিলেমিশে। কিন্তু সে চীনার মত গর্ব নয়। সে সরল, হাস্য-মুখ এবং সামাজিক। বিদেশীর প্রতি আদর তার যথেষ্ট, বিশেষ ভারতীয়ের প্রতি।

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা তাঁদের গল্প উপন্যাসে কাহিনীকে মুখ্য এবং চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ মনে করেন। অপর শ্রেণীর সাহিত্যিকরা আবার চরিত্রসৃষ্টিকে প্রধান এবং আখ্যান ভাগকেই অপ্রধান ভাবেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর কোনও গ্রন্থ রচনার আগে কাহিনীর কথা চিন্তা না করে, প্রথমে কেবল কয়েকটি চরিত্রের কথাই চিন্তা করতেন। তারপর সেই চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কাহিনী যোজনা করতেন।

কাহিনীর উপর বেশি জোর না দিয়ে চরিত্রসৃষ্টির দিকেই যে আগে লক্ষ্য রাখা দরকার, এ নীতি শরৎচন্দ্র নিজে যেমন মেনে চলতেন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যাস্থানীয়দেরও এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি উপদেশ দিতেন।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের দিকে চাইলেই দেখা যায় যে, কাহিনী হয়ত অতি সামান্য এবং অতি পরিচিতও। তার মধ্যে তেমন নূতনত্ব নেই বা চমকও নেই, কিন্তু এই সব সাধারণ কাহিনীর মধ্যেই তিনি যে সব চরিত্র এঁকেছেন, সেগুলি তাঁর নিপুণ তুলির আঁচড়ে অপরূপ হয়েছে। মানব মনের নিগূঢ় রহস্য—তার জটিলতা ও দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের রচনার একটি বড় গুণ, তাঁর লেখার মধ্যে অসাধারণ সংযম। তাঁর সাহিত্যে কোথাও অবান্তর বা বাহুল্য আদৌ নেই। যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই তিনি কেবল বলেছেন, তার বেশি বলেন নি। কোনো ঘটনাকে অহেতুক ফেনিয়ে বড় করার চেষ্টা তিনি মোটে করেন নি। কি প্রকৃতির বর্ণনায়, কি নরনারীর রূপ বর্ণনায়, আর কি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের সময় তিনি কোথাও উচ্ছ্বাসের বশীভূত হন নি। সর্বত্রই তাঁর রচনা সংযত ও পরিমিত। তিনি মনে করতেন, কোন কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে বা সামান্য খুঁটিনাটি ঘটনারও উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়ের সমস্ত ফাঁককে লেখকই যদি ভরাট করে দেন, তাহলে তাতে করে রচনার মাধুর্য অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের সবটাই বলে শেষ করে দিতেন না, পাঠক-পাঠিকাদের জন্যও কিছুটা রেখে দিতেন। এই অ-লিখিত অংশ তাদের নিজেদের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে পূরণ করে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়। লেখার মধ্যে কোথায় কতটা বলতে হবে, কোথায় কতটা না বলতে হবে, এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন থাকতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের লেখায় সংযমের কথা বলতে গিয়ে "রামের সুমতি" গল্পের এক জায়গার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

"নারায়ণীকে তাঁহার মাতা যখন দুধ লইয়া খাইবার জন্য সাধাসাধি, অনুরোধ ও গঞ্জনামূলক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, নারায়ণী তখন দু-এক চুমুক দুধ খাইলেন। সাধারণ গল্প লেখকেরা নিশ্চয়ই এ জায়গায় লিখিতেন, নারায়ণী কিছুতেই দুধ খাইতে রাজী হইলেন না। কিন্তু লেখক শুধু বলিলেন, নারায়ণীর কথা কাটাকাটি করিতে ভাল লাগিল না, এজন্য তিনি দুধ খাইলেন ; দুধ নিশ্চয়ই তাঁহার বিসের মত ঠেকিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে খাইতে হইয়াছিল, বিষ হইতে তিক্ত মায়ের কথার জ্বালা এড়াইতে। যখন তিনি রামের অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছিলেন, তখন হৃদয়হীনা মায়ের নিকট সেকথা শুনিলেন না, যাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল সেই কথা দর্প করিয়া তাঁহার মাতা তাঁহার কাণে বিজয়-ভেরীর মত বাজাইতে আসিয়াছিলেন। নারায়ণী তাঁহার প্রাণান্ত কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া অন্যদিক হইতে রামের সংবাদ জানিতে চেষ্টা পাইলেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এত বড় সংযম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।"

শরৎচন্দ্র একজন নিপুণ শিল্পীর ন্যায় চরিত্রচিত্রণের ফলে, তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলি সজীব ও সত্য হয়ে ওঠায়, একদিকে যেমন তিনি তাঁর পাঠকপাঠিকাদের মুগ্ধ করেছেন, অপর দিকে তেমনি তিনি তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলী বা রচনারীতির মাধ্যমে তাঁর পাঠকপাঠিকাদের হৃদয়ও জয় করেছেন। তাঁর শব্দসম্পদ, ভাষা, বর্ণনা, উপমা ও প্রকাশভঙ্গী সবকিছু মিলে তাঁর রচনায় যেন এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। গদ্য যেন কাব্য হয়ে উঠেছে। ভাষার মধ্যে যে কতখানি শক্তি ও যাদু থাকতে পারে এবং এই ভাষা যে মানুষের হৃদয়কে কিভাবে স্পর্শ করতে পারে ও তাকে আকর্ষণ করতে পারে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় তাই দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের ভাষা যেমনি সহজ ও প্রাঞ্জল, তেমনি সুন্দর ও অভিনব। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মতো বা তাঁর সমসাময়িক বহু সাহিত্যিকের ন্যায় বেশি সংস্কৃত শব্দ বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার ক'রে তাঁর রচনাকে কোথাও কষ্টবোধ্য করে তোলেন নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দই বেশি ব্যবহার করেছেন। এই প্রচলিত শব্দের ব্যবহারেই তিনি এক অপূর্ব প্রাণময় ভাষার সৃষ্টি করেছেন। একজন দক্ষ কারিকর যেমন সাধারণ কাদামাটি থেকে অতি সুন্দর প্রতিমা গড়ে তোলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি সাধারণ বাঙ্গালীর মুখের প্রচলিত শব্দসম্ভার নিয়েই এক মনোহর "ভাষার তাজমহল" তৈরী করেছেন।

গদ্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, একটা সুর আছে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় এইটাকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচনায় এক একটি বাক্যের মধ্যে মনে হয় কোথাও যেন একটি অযথা শব্দ বা বাড়তি অক্ষর পর্যন্তও নেই। যেটির যেখানে প্রয়োজন, বাছাই করে যেন ঠিক সেইটিকেই তিনি সেইখানে বসিয়ে দিয়েছেন। একটু এদিক ওদিক হ'লে হবে। শরৎচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগের এই নিপুণতার গুণেই তাঁর ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল গতিতে চলে, শান্ত স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দের ন্যায় যেন এক মনোরম সুরের সৃষ্টি করেছে।

শরৎচন্দ্রের এই ভাষা সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

"শরৎচন্দ্র তাঁহার এই ভাষা নির্মাণে এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ তিনি স্ব-সমাজের নর নারীর একেবারে বুকের নিকটে কান পাতিয়াছিলেন—তাহাদের মুখের বুলিই শুধু শোনেন নাই, সেই বুলির প্রাণসঞ্চারী রসধ্বনিও শুনিয়াছিলেন ; তাই কথ্যভাষার রূপ, তাহার accent বা স্বরবৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতম ধ্বনি আর কেহ এমন করিয়া কানে ও প্রাণে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই।"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে প্রধানতঃ সহজ, সরল ও মানুষের মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করলেও, তাই বলে তাঁর ভাষা যে অলঙ্কারবর্জিত, তা নয়। তিনি তাঁর ভাষা-সুন্দরীকে পরিমিত ও যথাযথ অলঙ্কারে সাজিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, নারীদেহে যেমন পরিমিত অলঙ্কার ব্যবহার না করে কেবল অলঙ্কারের 'পর অলঙ্কার চাপালে বা অলঙ্কারের বাহুল্য দেখালে তাতে সৌন্দর্য ফোটে না, তেমনি ভাষাকেও উপমা, রূপক প্রভৃতির যথাযথ অলঙ্কারে না সাজালেও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না। তাই তিনি তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও অলঙ্কারের আড়ম্বর দেখান নি। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেইখানেই কেবল উপমা, রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন।

কোনও বক্তব্য বিষয়কে সুপরিস্ফুট ও সুন্দর করে তুলবার জন্যই সাধারণতঃ সাহিত্যিকরা উপমা বা রূপকের ব্যবহার করে থাকেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের উপমাগুলিও লক্ষ্য করার মতো। তিনি সাধারণ লেখকদের মতো উপমা দেওয়ার জন্য আকাশের চাঁদ, সূর্য প্রভৃতির সাহায্য নেন নি, বা দূরে কোথাও হাতড়াতে যান নি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশপাশের জিনিষ নিয়েই তিনি সাধারণতঃ উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে।" (শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব)

এখানে সকলেরই দেখা ও পরিচিত মেয়েদের বাটনাবাটার উপমাটি দেওয়ায় কথাটি সহজ ও সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে।

মানুষের দৈহিক রূপের বর্ণনায় কিংবা প্রাকৃতিক বর্ণনায়ও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শরৎচন্দ্রের বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অল্প কথায় যেন অনেকখানিই ব'লে দিতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তার নাক, কান, চোখ, মুখ

কোন কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে বর্ণনাকেও তেমন ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। অল্প কথায় সহজ ও সুন্দর ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

যুবতী নারীর দৈহিক রূপ বর্ণনার সময়ও তিনি অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও বর্ণনার মধ্যে তাঁর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি বর্ণনার মধ্যে কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাস বা আদৌ বাড়াবাড়ি নেই। পাঠকের সামনে তাকে আনবার জন্য যেটুকু বর্ণনা না দিলে নয়, শুধু সেই বর্ণনাটুকুই দিয়েছেন। তবে এই বর্ণনা পরিমিত হলেও, শরৎচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কিন্তু নিজস্ব এক অভিনবত্ব রয়েছে।

শরৎচন্দ্র অচলার দৈহিক বর্ণনায় বলেছেন—"মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই অতিশয় শ্রী এবং সুকুমার। চোখ দুটির দৃষ্টিতে স্থির-বুদ্ধির আভা।"

শরৎচন্দ্র এইভাবে অল্প কথায় তাঁর নিজস্ব প্রকাশরীতিতে নারীর দৈহিক রূপের বর্ণনা করেছেন। সাধারণ লেখকদের ন্যায় এই নারীদেহ বর্ণনায় তিনি কোথাও উচ্ছ্বাস বা অসংযমের পরিচয় দেন নি।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসসমূহে মানুষের হাসিকান্না ও তাদের সুখদুঃখময় জীবনের কথা বললেও, তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতিও অনেকটা স্থান নিয়েছে। সমুদ্র, নদী, মাঠ, আকাশ, বাতাস, মেঘ, গাছপালা প্রভৃতির বহু বর্ণনা তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি একদিকে যেমন শান্ত প্রকৃতির বহু বর্ণনা দিয়েছেন, অপর দিকে তেমনি আবার অনেক দুর্যোগময় প্রাকৃতিক বর্ণনাও করেছেন। শরৎচন্দ্রের এই প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলি তাঁর শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যে, ভাষার লালিত্যে ও ভঙ্গীর অভিনবত্বে পাঠকের চোখের সামনে যেন ছবির মত হয়ে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নৈসর্গিক বর্ণনাই শুধু দেন নি। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনেরও যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে, এ বিষয়েও তাঁর কবিমন বিশেষভাবেই অবহিত ছিল। তাই তিনি অনেক জায়গায় মানবমনের উপর প্রকৃতির যে প্রভাব পড়ে, তারও উল্লেখ করে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। গ্রীষ্মের রৌদ্রময় মধ্যাহ্ন, বর্ষার সজল আবহাওয়া, শীতের অপরাহ্ণবেলা, বসন্তের মলয়ানিল প্রভৃতি মানুষের মনের উপরে কিরূপ রেখাপাত করে, তিনি তাঁর সাহিত্যে বহু জায়গায় তা দেখিয়েছেন। মানবমনের সঙ্গে সম্পর্ক দেখিয়ে একটি শীতের দিনের অপরাহ্ণের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

"শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটীর উপর ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল।" (গৃহদাহ—পৃঃ ১৮৭)

শরৎচন্দ্রের কবিচিত্ত প্রকৃতিরও যে কতখানি উপাসক ছিল, তা তাঁর গ্রন্থের প্রাকৃতিক বর্ণনার চিত্রগুলি থেকেই বেশ বোঝা যায়। [illegible] প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনেরও যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, এটাও তিনি দেখাতে ভোলেন নি।

ভাষা, উপমা, বর্ণনা প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনগুলিও লক্ষণীয়। তাদের সংলাপ একদিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে, অপরদিকে তেমনি নাট্যরস সমৃদ্ধও হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসসমূহে নাটকীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণেই বাঙ্গলার ব[illegible] শৌখীন ও পেশাদার নাট্য-সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলিকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করেছে এবং আজও করছে।

শরৎচন্দ্র নিজে কোন পৃথক নাটক রচনা না করলেও কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, তিনি নিজে তাঁর তিনখানি উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই উপন্যাসগুলি হ'ল—দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ ও দত্তা। এই উপন্যাসগুলি নাটকে রূপান্তরিত হলে, তখ[illegible] এগুলির নাম হয়, যথাক্রমে—ষোড়শী, রমা ও বিজয়া। শরৎচন্দ্রের এ[illegible] উপন্যাসগুলি নাটকে রূপান্তরিত হয়ে উপন্যাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট ত হয়ই নি বরং আরও বাস্তবধর্মী হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসগুলি শুধু নাট্যাভিনয়েই নয়, চিত্রেও একে পর এক করে অভিনীত হয়েছে ও হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাই এ কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—"শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে—তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে।"

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসসমূহের অনেক জায়গায় নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। কুশলী শিল্পীর ন্যায় তাঁর এই হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা এমনি সহজ ও স্বাভাবিক যে, কোথাও কাতুকুতু দিয়ে বা জোর করে হাসাবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। আর তাঁর এই সহজ প্রচেষ্টার মধ্যে কোথাও কোন বিদ্রূপ বা শ্লেষের গন্ধও নেই এবং কোথাও ভাঁড়ামীর স্থান নেই। তিনি স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাস্যরসেরই সৃষ্টি করেছেন। তাঁ[illegible] পরিবেশন নৈপুণ্যে এই রস স্থানে স্থানে এমনি আকার নিয়েছে যে, অনে[ক] সময় পাঠক-পাঠিকাদের পড়তে পড়তে হেসে খুন হবার উপক্রমও হয়। উদাহরণ হিসাবে—স্টেজের উপর মেঘনাদের বীরত্বময় যু[দ্ধ] শ্রীকান্তের মেজদা, ইন্দ্রনাথের নতুনদা, 'ছিনাথ বহুরূপী' প্রভৃতির [illegible] বলা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে মাঝে মাঝে যেমন হাস্যরস পরিবেশন করেছেন অনেক জায়গায় তেমনি তিনি করুণ রসেরও সৃষ্টি করেছেন। এই করুণ রসের চিত্রের অনেকগুলিই আবার পড়বার সময় আপনা হতে পাঠকপাঠিকাদের চোখে জল নেমে আসে এবং বুকও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে এবং দরদী মন দিয়ে [illegible] ধরেছিলেন বলেই তাঁর করুণ রসের চিত্রগুলি তাঁর পাঠকপাঠিকাদে[র]

...কে এমনি করে স্পর্শ করতে পেরেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের ... করুণ রসসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ "রামের সুমতি" ...র আলোচনা করে বলেছেন—

"...বউদিদিকে সে পেয়ারা ছুঁড়িয়া ব্যথা দিয়াছিল, এ কষ্ট তাহার ...খিবার জায়গা ছিল না। সে নিজের কপালে পেয়ারা ঠুকিয়া বুঝিতে ...া পাইতেছিল, সে আঘাতের পরিমাণ কত। সে নিজেকে কত মিথ্যা ...া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; বাহিরে নিজের তেজ বজায় রাখিবার ... কত বিফল চেষ্টা পাইয়াছিল;—কিন্তু যেদিন বৌদি তাহাকে ডাকেন ...ই, খাইতে দেন নাই, সেদিন তাহার উদ্দামভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রেণু ...া গিয়াছিল। অত অল্প জায়গায় এরূপ প্রবলভাবের করুণরস সৃষ্টি ...তে বঙ্গীয় অন্য কোন আধুনিক লেখক পারিয়াছেন বলিয়া ...মি জানি না।"

আর নারায়ণী যেদিন তাঁর স্বামীর দেওয়া শপথ উপেক্ষা করে রামের ... রাঁধতে বসেছিলেন, সেদিনকার কথাপ্রসঙ্গে দীনেশবাবু লিখেছেন— ...ই রান্না, সেই পরিবেশনের কথা চক্ষের জলে পড়া যায় না। প্রাচীন ...লোচক অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়কে উহা পড়িয়া শুনাইতে ...াম, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনি আমার চক্ষুর পীড়া ...াইয়া দিলেন'।"

শরৎচন্দ্র করুণরসের সৃষ্টিতে যে আশ্চর্যরূপ সাফল্যলাভ করেছেন, ...দ্ধ সাহিত্য-সমালোচক অক্ষয়কুমার সরকারের এই উক্তিটিই তার ...ষ্ট প্রমাণ।

কেউ কেউ বলেন যে, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী (Idealistic) সাহিত্যিক ...ন না, তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী (Realistic) সাহিত্যিক। ...র যুক্তি এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে কোনও আদর্শ প্রচারের ... উঠে পড়ে লাগেন নি, বরং সমাজের বাস্তব ও সত্য ঘটনাকেই তিনি ... সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাই এই দিক থেকে তাঁকে আদর্শবাদী ...লে বাস্তববাদীই বলা যেতে পারে।

কিন্তু আসলে শরৎচন্দ্র সমাজের বাস্তব ও সত্যঘটনাসমূহের দিকে ... দিলেও, ঠিক সেই ঘটনাগুলিকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে হুবহু তুলে ... নি। এই সব সত্য ও বাস্তব ঘটনার উপরে কল্পনার রং ...য়ে সেগুলিকে সাহিত্যের উপযোগী করে তবেই তিনি প্রকাশ ...ছেন। এই আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী কথার উত্থাপন করে তিনি ...ই এক জায়গায় বলেছেন—

"গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and ...alistic, আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই ...র সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা ... আমার অজ্ঞাত। Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। ...য়ে যা কিছু ঘটে এবং অনেক নোংরা জিনিষই ঘটে—তা কিছুতেই ...ত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা— ...tography হতে পারে, কিন্তু সেকি ছবি হবে? দৈনিক খবরের ... অনেক কিছু লোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি ...? চরিত্রসৃষ্টি কি এতই সহজ? আমি ত জানি, কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করছি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে, তা আমি ত জানি।"

শরৎচন্দ্র তাই সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে প্রয়োজন বোধে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে সেগুলিকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করবার চেষ্টা করেছেন, আর এই প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষভাবে সাফল্যলাভও করেছেন।

কিন্তু এই কল্পনার তুলি বোলাবার আগে সাহিত্যের যেটা আসল "বনেদ"—সেই সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই সংগ্রহ করতে হয়। যে সাহিত্যিকের এই ঘটনা বা কাহিনী সম্বন্ধে যত বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিও তত বেশি সার্থক ও সফল হয়। শরৎচন্দ্রের রচনা যে এতখানি সাফল্যলাভ করেছে, তার কারণ হচ্ছে ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্যই মূলতঃ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা, বিহার ও ব্রহ্মদেশে একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরে কাটিয়েছেন এবং সর্বত্রই তিনি ব্যাপকভাবে লোকের সঙ্গে মিশেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা যে সকল অপূর্ব চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই, তা তাঁর সেই অভিজ্ঞতা প্রসূত সৃষ্টি। শরৎচন্দ্র এ কথার উল্লেখ করে তাঁর বন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার লিখেছিলেন—"চারু, আমার মত করে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত, তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তাঁরা ভদ্রলোক। কত হাড়ী বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।"

("শরৎ-স্মৃতি" প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫)

শরৎচন্দ্রের একদিকে এই স্বচক্ষে দেখা চরিত্র ও ঘটনা, অপরদিকে তাঁর অপূর্ব ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, বর্ণনা, উপমা প্রভৃতি, এই উভয়ের সংযোগে তাঁর সাহিত্য মনোহর ও অপরূপভাবে দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক, পরিচয়পুষ্ট কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের একেবারে হৃদয়কে গিয়ে স্পর্শ করেছে। তাঁরা তাঁর এই সাহিত্য পাঠে যেমনি খুশি হয়েছেন, তেমনি মুগ্ধও হয়েছেন। এই কারণেই তাঁরা এই সাহিত্যরথীকে তাঁদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁকে "সাহিত্য সম্রাট" "অপরাজেয় কথাশিল্পী" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। বাঙ্গলা দেশের আর কোন ঔপন্যাসিকই তাঁর পাঠকপাঠিকাদের কাছ থেকে এতখানি শ্রদ্ধালাভ করতে সক্ষম হন নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি।"

১৭

কবি পুনরায় লিখিতেছিলেন।

“শিখর সেনের যে ডায়েরিটা আমি চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেয়েছি, যার থেকে দু'একটি অংশ উদ্ধৃতও করেছি ইতিপূর্ব্বে সেই ডায়েরিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে।

১৯-৮-৩৭

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে আজ বকুনি খেয়েছি। বকুনির জন্য তত দুঃখ হয়নি, ‘হোম্‌টাসক্’ করে' না নিয়ে গেলে বকুনি তো খেতেই হবে, আমার দুঃখ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলেছি বলে। আমি টাস্‌ক্ করতে পারিনি আমার মাথা ধরেছিল বলে' নয়, আমি টাস্‌ক্ করতে পারি নি অবুর জন্যে। আমার পড়ার ঘরের জানলায় ও রোজ আসবে লুকিয়ে—আর খালি বকর বকর করে' সময় নষ্ট করে' দেবে আমার। আমি কাল বলেছিলাম, তুই এমনভাবে বকর বকর করলে আমি ‘হোম্‌টাস্‌ক’ করব কি করে’। তার উত্তরে ও বললে, তোমার জানলার নীচে তো একদল ছাতারে পাখীও সব সময় কচর-বচর করছে তাতে তো তোমার পড়ার বাধা হয় না। আমি কি ছাতারে পাখীরও অধম না কি! যাও আর আসব না। ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফের এল একটু পরে। আমি জিগ্যেস করলাম, ফের আবার এলি যে। বললে আমার কান্না পাচ্ছে। বল, তুমি আমার ওপর রাগ কর নি। বলেই ফিক করে' হেসে ফেললে। এরকম জ্বালাতন করলে কি হোম্‌টাস্‌ক্ করা যায়?

এর থেকে মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার আগেই শিখর অবন্ধনার প্রেমে পড়েছিল। ডায়েরির আরও দু'একটা জায়গা থেকে তা বেশ বোঝা যায়। আলেয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নানাবর্ণে রঙীন হয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে পরিপ্লুত করে' রেখেছিল বলে' ব্যাপারটা টের পাই নি। অথচ প্রত্যহই তখন ওর দেখা হ'ত। একটা কথা আমি আবিষ্কার সম্প্রতি। আমরা যখন চোখ খুলে থাকি তখন বহুবিধ জিনিস আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু আমাদের নিবাসী দ্রষ্টা দর্শন করেন শুধু একটি জিনিসকেই। তিনি শুধু দর্শনই করেন না তিনি তন্ময়ও হয়ে য তিনি যখন যা দেখেন তখন তা তাঁর অখণ্ড মনো আকর্ষণ করে, তা যেন অশেষ হয়ে ওঠে, কিছুতেই মহিমা শেষ হ'তে চায় না, নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে' যেন অনন্ত রূপের আকর হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিতে তখন আলেয়ার নিত্য নূতন মহিমা প্রত্যক্ষ করছিলাম, প্রত্যক্ষ করছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করছি তাই শিখর সেনের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করতে পারি শিখর সেনের ডায়েরি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট উঠেছে, সে অবন্ধনা ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসে অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও আসে নি। ঘটনাটা আমার মনে হিংসার উদ্রেক করেছে মাঝে মা মনে হয়েছে তার প্রেম আমার প্রেমের চেয়ে পবিত্র আবার বিয়ে করে' হয়তো আমি আমার প্রেমের ক্ষুণ্ণ করেছি। কিন্তু ক্ষুণ্ণ যে করি নি, তা অ অন্তর্যামী জানেন। আলেয়াকে ভালবাসবার পরও অপর একজনকে বিয়ে করেছিলাম কেন—এ প্রশ্ন নিজেকে করেছি অনেকবার। আগে করেছি, এখন করি না। এখন বুঝেছি, কিছু করবার বা না-কর মালিক আমি নই। যে শক্তি পাহাড়কে সমুদ্রে রূপান্ত করে, কুসুমের কোমল হৃদয়ে কীটের সংস্থান করতে করে না, দেবতাকে পিশাচ এবং পিশাচকে দেবতায় পা করতে যার এতটুকু দ্বিধা নেই, যে শক্তি এক বৃন্তে

ল ফুটিয়ে রূপ-সৃষ্টি করে, একাধিক ফুল ফুটিয়েও রূপ সৃষ্টি করে, ফুলকে ফলে উত্তীর্ণ করে' বা অকালে ঝরিয়ে দিয়ে যে সমান কৃতিত্ব এবং রসবোধের পরিচয় দেয়—আমি সেই শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তারই প্রেরণায় আমি আলেয়াকে ভালবেসেছি, বিয়েও করেছি আর একজনকে। দুটো কাজই আমি করেছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছি, তবু কিন্তু কোনটার উপরই আমার হাত ছিল না যেন। গাছের শাখায় কুসুমের সূচনা যে স্রষ্টার খেয়ালে হয়, সেই স্রষ্টাই সেই কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। কুসুমের হয়তো মনে হয় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সজ্ঞানে ফুটছে। শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানীরা যাকে অদৃষ্টবাদী বা ভগবৎবিশ্বাসী বলেন আমি ঠিক সে জাতীয় লোকও নই, কারণ জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আমি নির্ভর করেছি নিজের চেষ্টার এবং বুদ্ধির উপর। নিজের আচরণের স্বপক্ষে ওকালতি করবার জন্যও আমি এসব যুক্তির অবতারণা করি নি—সত্যি সত্যি আমার যা মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। বিয়ে করেছিলাম আমি মায়ের অনুরোধে, মায়ের কথা রাখবার জন্য। বাবা আমার শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন, আমি মানুষ হয়েছিলাম মায়ের কাছে। সুনন্দার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের আলাপ হয়েছিল কাশীতে এবং আমার বয়স যখন দশ বছর এবং সুনন্দার তিন বছর তখনই মা সেই তীর্থস্থানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সুনন্দাকে পুত্রবধূ করবেন। মায়ের এ প্রতিশ্রুতির উপর আমার কোনও হাত ছিল না, এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা লঙ্ঘন করে' শত্রু বিদ্রোহের নিশান ওড়াবার প্রবৃত্তিও আমার হয় নি। আলেয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে বলে' তাকে অপমানের কালিমায় লাঞ্ছিত করতে হবে, এ যুক্তি আমার মনে স্থান পায় নি। মাকেও আমি কম ভালবাসতাম না। তা ছাড়া আর একটা কথাও তখন মনে হয়েছিল। আলেয়াকে বিয়ে করে' কাছে পাবার কোন আশাই আমার ছিল না, সুনন্দাকে বিয়ে না করলে আমাকে মায়ের মনস্তাপের কারণ হয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হত। সে শক্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম—স্বপ্নলোকের প্রিয়াকে বাস্তবের ধূলিধূমের মধ্যে ঠিক মতো পাওয়া যায় না, স্বপ্নলোকের নিষ্কলুষ বর্ণ-বিচিত্রার মধ্যেই তাকে মানায় ভালো, তার সঙ্গে কল্পনা-বিহার করেই তৃপ্তি পেতে হবে বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগই থাকবে না—এসব যদি মানতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে বাস্তবের জন্য বাস্তবিক-সঙ্গিনীও একজন চাই। যেমন আমার কোথাও যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সঙ্গতি বা উপায় যদি না থাকে, তাহলে নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী অন্য কোনও শ্রেণীর টিকিট কিনতে হয়। আমি যে টিকিট কিনেছি তা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। সুনন্দাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না। আমি যদি আলেয়াকে না দেখতাম হয়তো তাকে প্রথম শ্রেণীতেই ফেলতাম। ভেবেছিলাম কোন বিরোধ বাধবে না। কল্পলোকে থাকবে আলেয়া আর মর্ত্যলোকে সুনন্দা। কেউ কারও আভাসটুকু পর্য্যন্ত জানতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। আজ এক নূতন দৃষ্টি লাভ করে অনুভব করছি যে মর্ত্যলোক আর কল্পলোক অভিন্ন নয়। শতদল কমলের মূল যেমন আলোকহীন পঙ্কস্তরে কল্পলোকের মূলও তেমনি মর্ত্যের মৃত্তিকায়। শুধু তাই নয়, এক লোকের বার্ত্তা রহস্যময় বেতার-যোগে বাহিত ও হয় অমরলোকে। সুনন্দা কেমন করে' জানি না টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমার মন তাকে নিয়েই কৃতার্থ নয়, অন্য কোথাও সে আশ্রয় খুঁজছে। লাটাইটা তার হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘুড়িটা উড়ছে আকাশে। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হত সুতোটা যদি কেটে যায়! তার এই আশঙ্কা বাঙ্ময় হয়ে আমাকেও চঞ্চল করে' তুলত। আমি তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারি নি যে তার সন্দেহটা অলীক। তার বাঁকা হাসি, তির্য্যক চাহনি, তার নানাবিধ কুটিল প্রশ্ন আমাকে যেন একটা অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিত অহরহ। শেষে একদিন সে আমাকে বললে, "আলেয়া বুঝি মেয়েটির নাম?" আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"তুমি কি করে' জানলে!" মুচকি হেসে সুনন্দা বললে, "কাল স্বপ্নে সোহাগ করছিলে যে তাকে। সব শুনেছি আমি!" আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। ভয়ে নয়, আনন্দে। স্বপ্নের কথা আমার মনে ছিল না। স্বপ্নে যে আলেয়াকে আমি কাছে পেয়েছিলাম, আদর করেছিলাম—এর এ অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দিত হয়ে উঠল।

সুনন্দাকে বোঝালাম যে আলেয়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, তাই বোধহয় স্বপ্নের ঘোরে এলোমেলো কিছু বলে' থাকব। তারপর মুচকি হেসে বললাম, "তোমাকেই বারবার মনে পড়ছিল প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে। তোমার চাল-চলন, ধরণ-ধারণ আলেয়ারই মতন তো। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দাও না!—যদি সোহাগ করে থাকি, তোমাকেই করেছি!" মেয়েরা কত সহজে ভোলে! আমার এই কথায় সুনন্দার চোখে-মুখে হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় পড়েছিলে প্রবন্ধটা আমাকে দেখিও তো"

"লাইব্রেরিতে। আচ্ছা, নিয়ে আসব আজ—"

কথাটা মিছে নয়। সত্যিই লাইব্রেরিতে একখানা মাসিকপত্র ওলটাতে ওলটাতে 'আলেয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ একটা নজরে পড়েছিল একদিন। 'আলেয়া' নাম দেখে প্রবন্ধটা পড়েও ফেলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি। সেই প্রবন্ধটা এনে দেখিয়ে দিলাম সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা এতে উচ্ছ্বসিত হল না, মুচকি হেসে চুপ করে' রইল। বুঝতে পারলাম যে এতবড় বিশ্বাস-যোগ্য একটা প্রমাণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না যদিও সে, কিন্তু মনের অবিশ্বাস তার ঘোচে নি। যে প্রমাণ অন্তর্যামীর বিশ্বাস-যোগ্য, সে প্রমাণ আমি হাজির করতে পারি নি। এইভাবেই চলছিল। আমি সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে স্বপ্নের ঘোরে আবার কিছু বেফাঁস বলে' ফেলি, মনে হচ্ছিল কোনও উপায়ে যদি সুনন্দার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারি তাহলে হয়তো এই অস্বস্তিকর পরি-স্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ একটা। বাড়িতেই বসেছিলাম এতদিন, কোনও চাকরি কিম্বা ব্যবসাতে ঢুকতে পারি নি। ভাল চাকরি পাওয়ার মতো ডিগ্রি বা মুরুব্বির জোর ছিল না, ব্যবসা করবার মতো টাকাও ছিল না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করা, আর বন্ধু বান্ধবদের কিছু একটা জোগাড় করে' দেবার জন্যে চিঠি লেখা ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য আর কোন সজ্ঞান চেষ্টা করি নি। প্রয়োজনও হয় নি, কারণ মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান ছিল বাড়িতে। হঠাৎ বাল্যবন্ধু চন্দ্র-মোহনের চিঠি পেলাম একটা। আমার চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল, ভাই কমল-কিশোর, তুমি যদি কোলকাতায় এসে থাক তাহলে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমি নিজে যে ব্যবসাটা বছর কয়েক আগে ফেঁদেছিলাম সেটার উন্নতি হয়েছে কিছু। আমি একা আর সেটাকে সামলাতে পারছি না, আমাকে প্রায়ই বাইরে বেরুতে হয়। কোল-কাতার কাজ কর্ম দেখবার জন্য আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক খুঁজছি। তুমি যদি এসে সে ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। দেনা-পাওনার কথা সাক্ষাতে আলোচনা করব। তুমি একবার পার তো চলে এস। আমি অবিলম্বে চলে গেলাম। চন্দ্রমোহন আমাকে মাসিক দেড়শ' টাকা বেতন দিয়ে কর্মচারী বাহাল করতে চেয়েছিল। আমি তাতে রাজি হই নি। মনে হল—বন্ধুর অধীনে চাকরি করলে বন্ধুত্বও থাকে না, চাকরিও থাকে না। আমি তাকে বললাম, তোমার ব্যবসা আমি যথাসাধ্য দেখব, কিন্তু তার জন্যে মাইনে নেব না। তুমি যদি আমাকে রোজকারের অন্য কোনও উপায় দেখিয়ে দিতে পার তাহলেই যথেষ্ট হবে। চন্দ্রমোহন তাতেই রাজি হল, তারই সুপারিশে এবং চেষ্টায় অনেক দালালির কাজ পেয়েছি, ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইনস্পেক্টার হয়েছি। চন্দ্রমোহনই আমাকে বউবাজারের এই বাসাটা দেখে দিয়েছে। সুনন্দার সান্নিধ্য ত্যাগ করে' নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে' বিস্মিতও হয়েছি একটু। কোলকাতায় এসেই সুনন্দাকে লিখেছিলাম—"মানুষের প্রতিভাকে যদি সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে এই কোলকাতা শহরকে সেই ব্রহ্মার একটা সেরা সৃষ্টি বলতে হবে। সেই সেরা সৃষ্টির মাঝখানে বসে' সেই সৃষ্টিকর্তাকে আমার অন্ত-রাত্মা যে প্রশ্ন করতে চাইছে তা যদি তোমাকে লিখে জানাই তুমি হেসে ঠিক উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বিশ্বাস কর সত্যিই আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—'আমার সুনন্দা কি রূপে গুণে কোনও নারীর চেয়ে কম? তা' যদি না হয় তাহলে তোমার সেরা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী বলে' সে অভিনন্দিত হচ্ছে না কেন! কেন সে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে?' সেই সৃষ্টি-প্রতিভাকে যদি সামনে পেতাম ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করতাম তাকে। এই জন্যেই তার এই সেরা সৃষ্টিটির মধ্যে তাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি অহরহ। আমি রোজকার করবার জন্যে এখানে এসেছি বটে, আপাতদৃষ্টিতে ওইটেই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু

আসলে আমি সন্ধান করছি সেই স্রষ্টাকে—যিনি যোগ্য-তমকে তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদা দেন নি। দেখা পেলে আমি তাঁর জবাবদিহি চাইব। একটা মুশকিলে পড়েছি কিন্তু। তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে বসেও সে সৃষ্টির মর্ম্মলোকে পৌছতে পারছি না আমি। একটা অদৃশ্য নদী এসে যেন উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে' আমার পথরোধ করছে। আমি কিছুতেই ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে পৌছতে পারছি না, যেখানে পৌছলে আমার আশা আছে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার দেখা পাব। আধুনিক যুগে সৃষ্টিকর্ত্তা কারা জান? আধুনিক যুগের মনীষীরা। পৌরাণিক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এ যুগে লক্ষ-মুখ হয়ে বহুধা হয়েছেন। তাই এ যুগের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে যেতে হবে সেই সব মনীষীদের কাছে। কিন্তু আমি যেতে পারছি না। আমার দ্বিধা, আমার সঙ্কোচ, আমার মানসিক দৈন্য, এক কথায় আমার সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য এক বিরাট নদী-রূপে এসে আমার পথরোধ করছে। আমি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভীষণ নদীর তীরে। জানি না কোন-দিন এ নদী পার হ'তে পারব কি না……। যে মনোভাব আমাকে এই চিঠি লিখতে প্রণোদিত করেছিল তা যদি কেউ প্রতারকের মনোভাব বলে' মনে করেন আমি আপত্তি করব না। তাঁকে শুধু একটি জিনিস মনে রাখতে অনুরোধ করব যে পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু ও ভাব যেমন একাধিক উপা-দানের সমন্বয়লীলা, আমার এই মনোভাবটিও তেমনি। আমি কথার পরে কথা গেঁথে সুনন্দাকে ঠকাতেই চাই নি কেবল, আমার অন্তরের একটা সত্য উপলব্ধিকেও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। বিচিত্র কোলকাতা শহরের বৃহত্ত্ব আমাকে শুধু অভিভূতই করে নি, কৌতূহলীও করেছে, লজ্জিতও করেছে। কৌতূহলী হয়েছি এ যুগের স্রষ্টাদের—ব্রহ্মাদের—পরিচয় লাভ করবার জন্য। বারম্বার মনে হয়েছে এই শহরের বিশালত্বের মধ্যেই আছেন তাঁরা। আমার সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য-জনিত অযোগ্যতাই তফাত করে' রেখেছে আমাকে তাঁদের সান্নিধ্য থেকে। আমি যেন একটা দুস্তর নদীর এক তীরে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি অপর তীরের। পার হতে পারছি না। আমার এই সত্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ওই চিঠির ভাষায়। তবে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য কথা যে যদি কোন-দিন আমি নদী পার হয়ে স্রষ্টাদের দেখা পাই তাহলে তাদের সুনন্দার কথা জিজ্ঞাসা করব না। আমি জিজ্ঞাসা করব, যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম তাকে পেলাম না কেন? তোমাদের চক্রান্তেই কি এই নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে? এ অন্যায়ের সুবিচার কি কোথাও আছে? আমার আলেয়া কি চিরকালই অন্ধকারের বুক আলো করবে? সত্যের দিবালোকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ কি কোনদিনই সে পাবে না? হে আধুনিক যুগের সৃষ্টিকর্ত্তারা, সত্যিই কি এর কোন প্রতিকার নেই? তোমাদের যদি কোনও ক্ষমতা থাকে, আলেয়াকে আমার কাছে এনে দাও। এর জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে প্রস্তুত আছি আমি…।

বিস্মিত হলাম যখন আমার শ্যালক পণ্টু এসে হাজির হ'ল একদিন। বলল, "দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে-ছিলাম। তিনি আপনাকে এই চিঠিটা আর এই পার্শেলটা দিয়েছেন"

"পার্শেলে কি আছে?"

মুচকি হেসে পণ্টু বললে, "কোন খাবার-টাবার করে' পাঠিয়েছেন বোধহয়। আমি কোলকাতা হয়ে কাশী যাব শুনে বললে তোর জামাইবাবুকে এটা দিয়ে যাস তাহলে। আমি আর দাঁড়াব না। আমার ট্রেন একটু পরেই"

পণ্টু আর দাঁড়াল না।

চিঠিটা খুলে দেখলাম সুনন্দা লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি লিখেছ, ভাল করে' বুঝতে পারি নি সবটা। 'দারিদ্র্য' কথাটা অবশ্য বুঝেছি। আমার সোনার হারটা আর অনন্ত দুটো তাই পাঠালাম পণ্টুর হাতে। ওসব পরবার শখ আমার মিটে গেছে। তোমার যদি উপকার হয়ে বিক্রি করে দিও…"

চিঠিটা পড়ে আর গয়নাগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সুনন্দা আমার চেয়ে অনেক বড়। মনে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তার গয়নাগুলো বিক্রি করেছি; সেদিন যে অত টাকা দিয়ে দূরবীণটা কিনে আনলাম তা ওই গয়না বিক্রির টাকাতেই! (ক্রমশঃ)

বাংলা প্রবাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

হেরি তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনত শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী
ভগ্ন স্তূপে শিলাখণ্ডে বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি অতীত কাহিনী 'বঙ্গভূমি'
(৺ অক্ষয় বড়াল)

অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিঞ্চিদধিক প্রায় পাদ-শতাব্দ পূর্ব্বে কবি বঙ্গজননীকে যেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মা আমার আজিও তেমনই কাঙ্গালিনী বেশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাজসাহী ও ঢাকার সংগ্রহশালার কি দশা হইবে কে জানে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগারের প্রাচীন বাঙ্গালা হাতের-লেখা পুঁথিগুলি কেমন অবস্থায় আছে, কে সংবাদ আনিয়া দিবে? দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তরুণতরুণীগণ শ্লোগানে মাতিয়াছেন, মানুষের জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে জানিবার চিনিবার কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। নলিনী ভট্টশালী অকালে পরলোকগত। শ্রীসুরেন সেন ও শ্রীরমেশ মজুমদার দিল্লীপ্রবাসী, একমাত্র ডক্টর শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র সরকার মৃন্ময় দীপালোকে অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু মাত্র তাম্রপট্ট, শিলাখণ্ড ও মুদ্রাতত্ত্ব বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর অতীত পরিচয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অনুসন্ধানে ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতার আশু প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসের উপকরণ আজি যাহা অবশিষ্ট আছে, দুইদিন পরে আর তাহা থাকিবে না। বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের দিনে অতি দ্রুত উপকরণ অনুসন্ধান ও সংগ্রহের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। আমি এই দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একদিকে প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ" এবং মহামহোপাধ্যায়কল্প পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "বাঙ্গালার সারস্বত অবদান" উপেক্ষিত হয়, অন্যদিকে সমস্ত নিয়মকানুন পদদলিত করিয়া মৃত গ্রন্থকারের পুরানো পুস্তক লইয়া মাতামাতি চলে। বিচিত্র এই দেশ।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে জানিবার ও চিনিবার কত যে উপকরণ পল্লীতে পল্লীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তরুণতরুণীরা তাহার সন্ধান রাখে না। বীরভূমে দুইটী ছড়া চলিত আছে, যাহার মধ্যে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ভগ্নাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। একটী ছড়া—

আলিনকী বাহাদুর পাগড়ীমে বাঁধে তলোয়ার।
এক ঘড়িমে লুট লিয়া কলকাত্তা বাজার॥

বীরভূমের রাজধানী প্রাচীন লক্ষুর অধুনাতন রাজনগরে রাজা বাদিওজ্জমানের জ্যেষ্ঠপুত্র আলিনকী নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সেনাদলে যোগ দিয়া কলিকাতা যুদ্ধে সিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলিনকীর অনুরোধেই বাদিওজ্জমানের জীবদ্দশায় কনিষ্ঠ পুত্র আসাদ ওজ্জমান রাজনগরের তক্ত প্রাপ্ত হন। আলিনকী কনিষ্ঠকে রাজ্য দিয়া নিজে চিরকাল সেনাধ্যক্ষরূপে রাজ্যরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মহরম পর্ব্বে তাজিয়ার সঙ্গে একখণ্ড স্বর্ণখচিত জীর্ণ বস্ত্র দিয়া রাজনগরের রাজবংশধর এই সেদিনও আলিনকীর কলিকাতা বিজয়ের গৌরব স্মরণ করিতেন। বস্ত্রখানি কলিকাতার লুণ্ঠিত বস্ত্র—"লুটের কাপড়"রূপে পরিচিত ছিল।

আর একটী প্রবাদ—

মুলুকে অপরাজিতা মঙ্গলডিহে রাস।
ভুরকুণ্ডায় ডেঙ্গো ঠাকুর শুনতে উপহাস॥

বীরভূম জেলায় বোলপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে মুলুক নামে একটী গ্রাম। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পরিবার সঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর যদুচৈতন্য ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র কানুরাম (রামকানাই ঠাকুর) পিতার উপর রাগ করিয়া মুলুকে চলিয়া আসেন। পরমবৈষ্ণব রামকানাই মুলুকে শ্রীরাধাবল্লভ যুগলবিগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, শ্রীগোপাল বিগ্রহ ও কয়েকটী শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। মন্দির নির্ম্মাণের জন্য মাটী খুঁড়িতে গিয়া কানুরাম একটী দেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। দেবী দ্বিভুজা, হস্তদ্বয়ে অভয় ও বরমুদ্রা, তিনি উৎকুটুকাসনে বসিয়া আছেন, ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি। রামকানাই অপরাজিতা নামকরণ করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজিও দেবীর নিত্যপূজা হয়। শরতের নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন হইতে দেবীর নিকট চণ্ডীপাঠ হয় এবং সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী দুর্গাপূজা বিধানে তাঁহার বিশেষ পূজা হয়। শাক্ত বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব নিরসনে ইহার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ইতিহাস ঐ ক্ষুদ্র ছড়ায় নিহিত রহিয়াছে। গোষ্ঠযাত্রা মুলুকে বিশেষ উৎসব। মঙ্গলডিহিতে শ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মঙ্গলডিহির ঠাকুরগণ সখ্যরসের উপাসক। কিন্তু রাসযাত্রাই এখানে বিশেষ পর্ব্বরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ভুরকুণ্ডা গ্রামে শ্রীবিগ্রহের বামে শ্রীমতী নাই। তাই এই শ্রীবিগ্রহ ডেঙ্গো বা আইবুড় ঠাকুর নামে পরিচিত। যাহার বিবাহ হয় নাই, রাঢ়দেশে তাহাকে ডেঙ্গো বলে।

প্রবাদের ছোট এক একটী কথার মধ্যে সমগ্র রামায়ণ মহাভারত অনুস্যূত রহিয়াছে। জীবনসংগ্রামে পরাজিত বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ-হতাশাস বক্ষে বহিয়া জীবন সায়াহ্নে যখন পরিচয় দেয়—"বাবা আমার কথা জিজ্ঞাসা করো না—আমার জীবন "যাবৎ সীতে তাবৎ পরীক্ষে"—সেই মুহূর্ত্তেই হরধনু ভঙ্গ হইতে পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত জানকী জীবনের মহনীয় চিত্রাবলী একের পর এক নয়ন সমক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিয়া ক্ষত বিক্ষত দেহ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্বাস-নির্ভর কণ্ঠে যখন উচ্চারণ করে—

ধর্ম্ম করে মরে যদি পাণ্ডুর নন্দন।
তবে ধর্ম্ম করে লোক কিসের কারণ॥

সমগ্র মহাভারত ঐ দুইটী মাত্র ছত্রে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর পরিচয়ের এইরূপ বহু উপকরণ—অজস্র স্বর্ণকণা—কালপ্রবাহের বালুবেলায় আজিও সংগ্রাহকের প্রতীক্ষা করিতেছে। আনন্দের বিষয়—একজন প্রখ্যাতনামা মনীষীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বানগণের অন্যতম, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে অতিশয় যত্নসহকারে প্রায় দশ সহস্রাধিক প্রবাদ সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও প্রয়োগসহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থপতির প্রাসাদ-সৌধ নির্ম্মাণের যোগ্যতা রহিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার পরিচয়ও পাইয়াছি—তিনিই মজুরের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা প্রবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সুশীলকুমারের সাহিত্য ও রসবোধ লইয়া গর্ব্ব করিতাম, এর সঙ্গে আর একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিলাম—তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য। এক একটী করিয়া প্রবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন—প্রায় দশসহস্রাধিক প্রবাদ, সেগুলি অকারাদি ক্রমে সাজাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগপদ্ধতি নির্ণয় করিয়াছেন, আকরের অনুসন্ধান করিয়াছেন—সে-যে কি বিরাট কাণ্ড, কি বিস্ময়কর কীর্ত্তি, বাংলা প্রবাদ না দেখিলে বুঝানো যায় না। বাংলা প্রবাদ গ্রন্থের সঙ্গে একটী বহুমূল্য ভূমিকা সংযোজিত রহিয়াছে। ডক্টর দে বাঙ্গালা প্রবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ধাতু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন, বাঙ্গালীর সেকাল ও একালের কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের যাত্রাপথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আত্মোপলব্ধির সহায়ক হইয়াছেন। আমি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে, ছাত্র অধ্যাপক, লেখক পাঠক নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই বাঙ্গালা প্রবাদের ভূমিকাটী পড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

ডাঃ সুশীল কুমার ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"অসংখ্য বাংলা প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা আমরা এখন জানি না বা বুঝিতে পারি না। তাহার একটী কারণ হইতেছে, যে আমরা শিক্ষায় ভাবে ও চিন্তায় বাঙ্গালী হইয়াও অবাঙ্গালী হইতে বসিয়াছি। আমরা নূতন আদব কায়দায় অভ্যস্ত হইয়াছি, নূতন ধরণের ভদ্রতা শিখিয়াছি, চাপা হাসি ও চাপা কথার কৃত্রিম সৌকর্য্যে আমরা সুস্থ ভাব ও সবল ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা স্বীকার করিনা। নিছক মনোবিলাসের মোহে প্রাণের সবুজ অনুভূতি ও আনন্দটুকু প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। তাই একদিন বিদেশী কেতায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু করিয়া বিজাতীয়ভাবে স্বজাতিকে ভালবাসিবার ভান করিয়াছি। ইহার ফলে যে দেশে সৌখীন দেশকালনিরপেক্ষ কালচার-বিলাসী মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা নবশিক্ষিত বাঙ্গালীর রস ও রুচির অনুভবকে জনসাধারণের জীবন হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক, যত আন্তরিক হউক না কেন, আধুনিক সভ্যতার ভদ্র সমাজে তাহার গ্রাম্যতা ও অন্ধ নগ্নতার স্থান নাই। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জামা কাপড় পরিয়া তবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আধুনিক ড্রয়িং রুমের আবহাওয়াতে যাহা কথাবার্ত্তায় বেশভূষায় কেতাদুরস্ত নয়, তাহার অসভ্য উপস্থিতিতে যে রুচিবিলাসী বাঙ্গালী শিহরিয়া উঠিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়।

* * * * *

যেমন গানে উপাখ্যানে ও মঙ্গলকাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানা নানারূপে নানা ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে।

* ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে সম্পাদিত (ছড়া চল্তি ও কথা) প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এ মুখাৰ্জ্জী এণ্ড কোং, ২নং কলেজ স্কোয়ার, মূল্য ২০৲ টাকা।

রেলপথ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সহরের বুক চিরে এই রেলপথ
আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে চলিয়া দূরে;
কত নদী—বনভূমি—প্রান্তর—পর্ব্বত
পার হ'য়ে আসিয়াছে; কত পল্লী ঘুরে
দুরন্ত গতির বেগে ছুটিছে উদ্দাম;
'ষ্টেশনে' 'ষ্টেশনে' তা'রে বাঁধিবার তরে
ব্যর্থ আয়োজন কত; বিনোদ বিরাম
বাহু-পাশ বাড়ায়েছে লুব্ধ লীলাভরে;
রেলপথ চলিয়াছে তবু গতিহারা—
মানবের বাস্তবিত প্রাণ-বন্যা-ধারা
দুর্ব্বার তিয়াসা বুকে অসীমের পানে
সীমা হ'তে বুঝি নিজ দোসর-সন্ধানে।
স্থিরীভূত এই গতি অন্তর-ভিতর
মোরেও আকুল করি' তোলে নিরন্তর।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

(ত্রয়াঙ্ক নাটক)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

জয়ন্তর উপবেশন কক্ষ। অপরাহ্ণ।

ব্যস্তসমস্ত জয়ন্ত। সম্মুখে ভোলা

ভোলা॥ 'যা' বললেই—যা! এখন বিকেল চারটে। তারকেশ্বরে পৌছতে রাত হয়ে যাবে। রাত-বেরাতে কোথায় গিয়ে উঠবো?

জয়ন্ত॥ বাবার পায়ে পড়ে থাকবি। তা নইলে আর ভক্ত কি! ওরে—বাবা ভক্তিটাই দেখেন। কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মেলে না, ভোলা!

ভোলা॥ তা তোমারি বা এত তাড়া কেন বাপু? এ যেন—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে! আমি যে যাব—একটা লোক এখানে দিয়ে যাব তো! নইলে তোমাকে দেখবে শুনবেই বা কে—দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়েই বা দেবে কে?

জয়ন্ত॥ সে হবে—সে হবে। সেজন্যে তুই কিছু ভাবিসনে ভোলা। তিন-চারটে দিন আমি মাসীমার বাড়ী গিয়ে খাব। কত খুশী হবে বুড়ী—ভেবে দেখ! নে—নে—আর দেরী করিসনে। মাহেন্দ্রযোগটা আবার পেরিয়ে যাবে।

ভোলা॥ কি যোগ?

জয়ন্ত॥ মাহেন্দ্রযোগ। এই তো পাঁজি দেখলুম। সওয়া চারটে পর্যন্ত রয়েছে। বাবা তারকনাথের কাছে যাচ্ছিস—মাহেন্দ্রযোগে যদি বেরুতে পারিস ভোলা, যে মনস্কামনা করে বেরুবি—আঠারো আনা ফলবে, ভোলা, আঠারো আনা ফলবে!

ভোলা॥ তা বলছ—যাচ্ছি। বাবার ওপর এত ভক্তি হঠাৎ যে কেন তোমার গজাল—

জয়ন্ত॥ গজাবে না? কি বিপদে পড়েছি—ভেবে দেখ! বাবার পায়ে গিয়ে—এখন তুই যদি উদ্ধার করতে পারিস ভোলা।

আবেগে ভোলার হাত ধরিল

ভোলা॥ ঠিক বলেছ। তুমি কিছু ভেবো না, দাদাবাবু, বাবার দয়ায় সব উদ্ধার হবে। আমি গিয়ে তোমার কল্যাণে পূজো দিচ্ছি।

জয়ন্ত॥ (পকেট হইতে দশটাকার নোট বাহির করিয়া ভোলার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল) দিস্-দিস্। এই নে দশটা টাকা।

ভোলা॥ এ কি—আবার টাকা পেলে কোত্থেকে?

জয়ন্ত॥ পেয়েছি রে! পেয়েছি। বাবাই দিয়েছেন! (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) ভোলা—মাহেন্দ্রযোগ আর পাঁচ মিনিট!

ভোলা॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি!

ভোলার অন্য ঘরে প্রস্থান

জয়ন্ত পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া গুণিতে লাগিল।

এমন সময় অনাদির প্রবেশ

অনাদি॥ ওরে বাবা—এ যে দেখছি টাঁকশাল!

জয়ন্ত॥ (নোটগুলি পকেটে পুরিয়া) খুব লোক বা লোক! কখন খবর পাঠিয়েছি এখন এলে! মানুষের বিপদ-আপদ যদি কিছু বোঝ! (চীৎকার করিয়া) ভোলা—আর তিন মিনিট।

কাপড় গামছা একটি পুঁটুলীতে বাঁধিয়া ভোলার প্রবেশ

ভোলা॥ জয় বাবা—তারকনাথ। চল্লুম।

জয়ন্ত॥ জয় বাবা—তারকনাথ।

ভোলার প্রস্থান

জয়ন্ত॥ (বাবা তারকনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া) জয় বাবা—তারকনাথ। শেষ রক্ষা কর—শেষ রক্ষা কর

অনাদি॥ ব্যাপার কি?

জয়ন্ত॥ আর ব্যাপার! সর্বনেশে ব্যাপার! পড়—
পকেট হইতে টেলিগ্রাম মনি অর্ডারের কুপন অনাদির
তে দিল)।

অনাদি॥ (বিস্ফারিত নেত্রে পড়িয়া)—"ব্রেভো মাই
!! রিচিং টো-মরো ইভ্‌নিং—ফাদার।"
জয়ন্তর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া) মানে?

জয়ন্ত॥ মানে বুঝছ না! পাঁচশ টাকা টেলিগ্রাম
করে পাঠিয়েছেন। পিছু পিছু নিজেও এসে পৌঁচচ্ছেন—
আজই সন্ধ্যায়। মানে—কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়েছে।
মানে—আগুন নিয়ে খেলতে গেলে যা হয়—তাই। তখন
তো সবাই খুব "হাঁ হাঁ" করলে! এখন ঠেলা সামলাও!
স্বর কর বৌ।

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল

অনাদি॥ আহা-হা, অমন করে ভেঙে পড়লে তো
চলবে না। যা হোক—উপায় একটা কিছু করতেই হবে।
বিমান কোথায়?

জয়ন্ত॥ খবর দিতেই সে ছুটে এসেছে। তোমার
ত দু' ঘণ্টা দেরী করে নি।

অনাদি॥ কিন্তু কোথায় সে?

জয়ন্ত॥ বৌ খুঁজতে বেরিয়েছে। তা ছাড়া এখন
আর করবার কি আছে!

অনাদি॥ বৌ খুঁজতে গেছে! বৌ আবার খুঁজে
পাওয়া যায় নাকি!

জয়ন্ত॥ পেতেই হবে। অন্তত একটা রাতের জন্যে—
বৌ একটা পেতেই হবে। নইলে বাবা ছাড়বেন কেন!
আধা বাবা! বৌ দেখাতে না পারলে আমার পিঠের চামড়া
আর থাকবে না।

অনাদি॥ কলকাতা শহরে বৌবাজার যখন একটা
রাস্তার নাম রয়েছে—কোনো কালে হয়তো বৌএর বাজার
বসতো। নাম থেকে মালুম হয় বটে। কিন্তু সে সব দিন
কি আর আছে রে ভাই!

জয়ন্ত॥ বিমান যা হোক একটু আশা দিয়ে গেছে।
এখন বিমানই ভরসা! তাও তো দেরী হচ্ছে! হবে
কিনা—কে জানে!

অনাদি॥ বিমানের খোঁজে বুঝি এমন মেয়ে আছে?

জয়ন্ত॥ তিনখানা বাড়ী ছাড়িয়ে ঐ যে পাঁচতলা লাল
বাড়ীটা—স্বপ্নসদন না কি নাম—তারই একতলার ফ্ল্যাটে···

অনাদি॥ ও—মিলিটারী মেজাজের সেই মেয়েটা!
সিনেমায় কি পার্ট-টার্ট করে! বেণী দুলিয়ে ভ্যানিটী
ব্যাগ হাতে নিয়ে হন হন করে যায়—পাড়ার ছেলেরা
সব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জয়া মিত্র—
নাকি নাম?

জয়ন্ত॥ ও বাবা! দেখছি, বিমানের চেয়েও মেয়েটার
খোঁজ তুই-ই বেশী রাখিস। দেখছি তুই গেলেই
ভালো হ'ত।

অনাদি॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না—না, বিমানই বেশী
জানে। ও ঘোল গিয়ে গভীর জলের মাছ। তা ধরো—
বৌ এলো, কিন্তু চাকর? ভোলাকে তো তারকেশ্বরে
পাঠালে। এখন উপায়?

জয়ন্ত॥ তারকেশ্বরে কি সাধে পাঠালুম! ভোলার
পেটে কি এসব জাল-জোচ্চুরী কথা থাকত! এখন
শিগ্‌গির যাতো ভাই অনাদি—শিয়ালদা ইস্টিশন থেকে অন্ততঃ
দু একদিনের জন্য একটা চাকর ধরে আন। যা মাইনে
চায়—দেবো।

অনাদি॥ আরে, তোমার বৌ আসবে—তবে তো
চাকর!

বাহিরে বিমানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আসুন, আসুন"

জয়ন্ত॥ চুপ! বোধহয় এসেছে।

অনাদি-বর্ণিত জয়া মিত্রকে লইয়া বিমানের প্রবেশ। জয়া মিত্র—তন্বী,
সুদর্শনা, অষ্টাদশী তরুণী। দেখিলেই মনে হয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না
বিমান তাহার হাতের ছোট সুটকেসটী নামাইয়া রাখিয়া সকলের
সঙ্গে জয়ার পরিচয় করাইয়া দিল

বিমান॥ জয়ন্ত চৌধুরী। জয়া মিত্র।

উভয়ে নমস্কার বিনিময় করিল। অনাদি জয়ার সহিত পরিচিত
হইবার জন্য বিমানকে ইংগিত করিল

ও। আর ইনি অনাদি দত্ত। আমরা তিনজনই হোমিও-
প্যাথী কলেজে পড়ি। আর জয়া মিত্রের খানিকটা পরিচয়
দু-একটা ছবিতে তোমরা এর আগেই হয়ত পেয়েছ।
ছোটখাটো পার্ট হলেও—অনেকেই বলেছে—ছাইচাপা
আগুন। বেশী দিন চেপে রাখা যাবে না।

জয়া॥ ওসব কথা থাক। এবার কাজের কথা বলুন।

বিমান॥ ব্যাপারটা আপনাকে সবই খুলে বলেছি—জয়াদেবী।

জয়া॥ এক রাত্রির জন্য বৌ সাজতে হবে। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। (বিমানকে) আপনার মাসতুত বোন। হার্ট আগেই খারাপ ছিল—বিয়ের রাতের এই সব ব্যাপারে হার্টের ব্যারাম বেড়েছে। জয়ন্তবাবুর বাবা—মানে শ্বশুর দেখতে আসছেন। বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে সেটা যেমন করেই ঠেকাতে হবে। কেমন এই তো?

জয়ন্ত॥ মনের কথাটা হুবহু বুঝে নিয়েছেন। আপনি যে দয়া করে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন—কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছিনা!

জয়া॥ না, না—এতে কৃতজ্ঞতার কি আছে! অভিনয়কেই পেশা বলেও নিয়েছি। অভিনয় করে টাকা রোজগার করতে এসেছি। টাকাকড়ির ব্যাপারটা কিন্তু এখনো ঠিক হয় নি। ওটা আগেই মিটিয়ে ফেলুন।

জয়ন্ত॥ বিমান!

বিমান॥ আমি পঞ্চাশ টাকা বলেছি—তা উনি একশ' টাকার কমে রাজী হচ্ছেন না। আর সে টাকাটাও আগাম চাইছেন।

জয়ন্ত॥ আমি কিছুতেই 'না' বলব না—জয়াদেবী। এই নিন। (একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া জয়ার হাতে দিল।) আপনি যে দয়া করে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন—এর দাম অবশ্যি আমি কোন দিনই দিতে পারবো না।

জয়া॥ আগাম টাকাটা নেওয়া অশোভন হলো—বুঝছি। কিন্তু জীবনে এত ঘা খেয়েছি যে—মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না, জয়ন্তবাবু। সিনেমায় নির্ঘাত নামিয়ে দেবে—কথা দিয়ে আপনাদের মতই ভদ্রবেশী কত দালাল—আমার মতো অনাথা মেয়েরও টাকা-কড়ি খেয়ে পালিয়েছে। কত ফিল্ম কোম্পানী যদিও বা কাজ দিয়েছে—কিন্তু টাকা দেয় নি। এই বয়সেই জীবনে অনেক ঘা খেয়েছি, জয়ন্তবাবু। যাক্ সে কথা। তাহলে, সাজতে হবে এখুনি?

জয়ন্ত॥ (ঘড়ি দেখিয়া) এই যা! তাই তো! আর তো সময় নেই। অনাদি, তুমি তো চাকর আনলে না। ভোলা তারকেশ্বর গেছে বেশ বলা যাবে। কিন্তু চাকর তো একটি চাই। না—না, তুমি যাও অনাদি। যাকে পাও অন্ততঃ এক রাতের জন্য নিয়ে এসো।

অনাদি॥ কোথায় যাব—কাকেই বা আনবো এক রাত্রির জন্য ওঁর চাকর—সে না হয় আমি হব। তোমার বাবা তো আর আমাদের দেখেন নি। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।

জয়ন্ত॥ করে নেবো নয় ভাই, করো। (তাহার পোষাক লক্ষ্যে) ওসব ছেড়ে-ছুড়ে—

অনাদি॥ সে যা করবো, সে দেখতে হবে না।

পাশের ঘরে প্রস্থান

জয়া॥ আমি তো এক রকম মোটামুটি তৈরী হয়েই এসেছি। এখন বলুন—এই সাজ চলবে কিনা। আপনাদের রুচি তো আমি জানিনা।

বিমান॥ আপনাকে যখন বলে কয়ে ধরে এনেছি—তাতেও কি আমাদের রুচির পরিচয় পান নি? আর শাঁখা সিঁদুর আলতা যা কিনে আনতে বলেছিলেন—এনেছি।

সুটকেশ খুলিয়া বিমান তাহা এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী বাহির করিল

জয়া। বাজারশুদ্ধ কিনে এনেছেন দেখছি! কিন্তু আমি তো রোগী—এখন-তখন। ওষুধ কই—থার্মোমিটার কোথায়?

বিমান॥ এই যা!

জয়ন্ত॥ আমি আবার অক্সিজেনের কথা লিখেছি, নার্সের কথাও বলেছি।

বিমান॥ অক্সিজেন! নার্স! সে যখন যায় যায় অবস্থা, তখন আনা হয়েছিল। আবার যখন দরকার হবে—আনা হবে। কিন্তু ওষুধপত্র, থার্মোমিটার—সে তো চাইই। আমি এখনই যাচ্ছি।

জয়ন্ত একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল

বিমান॥ ঠিক আছে।

জয়া॥ আর একটা আইস্-ব্যাগ—পারেন তো আনবেন।

বিমান॥ ঠিক আছে।

প্রস্থান

জয়া॥ জানেন, জয়ন্তবাবু, এমন দিন গেছে মার অসুখের সময় একটা আইস্-ব্যাগও আমি জোটাতে পারিনি।

চাকর সাজিয়া অনাদির প্রবেশ

অনাদি॥ দিদিমণি, দাদাবাবু, চায়ের জল চাপিয়ে দেব?

জয়ন্ত॥ এ কি? এ যে একেবারে চেনা যায় না অনাদি!

অনাদি॥ আরে থিয়েটার কি আমিও করিনি! নেহাত হোমিওপ্যাথী পড়তে এলাম—তাই।

জয়া॥ কিন্তু চাকরের নাম—অনাদি—বড় একটা শুনিনি।

জয়ন্ত॥ তা বটে! তা বটে! অনাদি, আজ থেকে তোমার নাম—বলুন, আপনি একটা বলুন…

জয়া॥ ভোম্বল। আমাদের চাকরের নাম। সহজে মনে থাকবে।

জয়ন্ত॥ বেশ—বেশ! বেশ নাম—ভোম্বল।

অনাদি॥ ভোম্বল! না—না—

জয়ন্ত॥ না, না, আর কিন্তু নেই। কথার সময় আর নেই।

জয়া॥ কিছু খাবার-টাবার আনা উচিত। বিশেষ বাবা আসছেন।

জয়ন্ত॥ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। অনাদি!

জয়া॥ (সংশোধন করিয়া) ভোম্বল।

জয়ন্ত॥ হাঁ—হাঁ—ভোম্বল। যা তো। এই নে। (দশ-টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। অনাদি যাইতেছিল) দাঁড়াও। (জয়াকে) আপনার জন্যে কিছু পথ্যিটথ্যি…

জয়া॥ আমি তো রুগী—সাগু বার্লি বোধহয় খেতে হবে।

জয়ন্ত॥ না, না, না। হার্টের অসুখ। হার্টকে সবল করার জন্ম আপনাকে খাওয়াতে হবে—পেস্তা, বাদাম, বেদানা, আঙুর—মাংসের সুপ, চিকেন ব্রথ্—

জয়া॥ আনুন। আমি অবশ্য ওসব খাবো না। সাজানো থাকবে।

জয়ন্ত॥ কিন্তু কি খাবেন বলুন। সন্দেশ—রাজভোগ -কিছু লজেন্স—কিছু ডালমুট—

অনাদি॥ আর কিছু তেঁতুলের আচার।

জয়ন্ত॥ ঠিক। ঠিক বলেছিস। (আরেকটি নোট বাহির করিয়া দিয়া) যা অনাদি—

জয়া॥ ভোম্বল॥

জয়ন্ত॥ ও। হ্যাঁ—ভোম্বল। যাও ভাই ভোম্বল—শীগ্‌গির যাও।

অনাদির প্রস্থান

জয়া॥ এক রাত্রির জন্যে কেন মিছিমিছি এত সব—

জয়ন্ত॥ এক রাত্রি বলেই তো জয়াদেবী। না—না, বাধা দেবেন না। বরং বলুন আর কি বাকী রইল?

জয়া॥ তা যদি বলেন—অনেক কিছুই বাকী রয়েছে। শাঁখা—সিঁদুর—আলতা—

জয়ন্ত॥ পরে নিন—পরে নিন্। আর সময় নেই।

জয়া॥ সিঁদুর না হয় আমি পরছি। আপনি ততক্ষণ টয়লেটের জিনিষগুলো সাজিয়ে ফেলুন।

এই বলিয়া চট্ করিয়া আলমারিতে সেট করা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সিঁদুর পরিল। জয়ন্ত প্রসাধন-উপকরণগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল

জয়া॥ সিঁদুর তো পরা হোলো। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে!

জয়ন্ত॥ না, না—বেশ মানিয়েছে! সুন্দর মানিয়েছে।

জয়া॥ কিন্তু শাঁখা! সে তো একা পরতে পারবো না। আপনাকে পরিয়ে দিতে হবে।

জয়ন্ত॥ অ্যাঁ—আমাকে পরিয়ে দিতে হবে! পারবো?

জয়া॥ দিতেই হবে। নতুন বউ! শাঁখা না হলে তো আর চলবে না।

জয়ন্ত॥ তাই তো। তা—আসুন। (শাঁখা পরাইতে চেষ্টা করিল।) ওরে বাবা! ভেঙে যাবে না তো! হাতটা আরেকটু নরম করুন দয়া করে।

জয়া। আর কত নরম করব, বলুন! হাত তুলো তো আর নয়।

জয়ন্ত॥ এই, এই যা—গেছে। (এক হাতে শাঁখা পরানো হইল) ও হাত দিন।

অন্য হাতে শাঁখা পরাইবার চেষ্টা

জয়া॥ (চীৎকার করিয়া) উঃ।

জয়ন্ত ॥ থাক, থাক—তবে থাক।

জয়া ॥ না—না তা কি হয়? এক হাত কি খালি থাকবে।

জয়ন্ত ॥ তবে আপনি চীৎকার করবেন না। একটু সয়ে থাকুন।

জয়ন্ত যতদূর সম্ভব সাবধানে শাঁখা পরাইতে লাগিল

জয়া ॥ (হাসিয়া উঠিল) আপনি ঘেমে উঠলেন যে!

জয়ন্ত ॥ (রাগিয়া) না, না, আপনি হাসবেন না। হাসছেন—হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

জয়া ॥ (হাসি চাপিয়া) না, না,—হাসব না।

জয়ন্ত ॥ (সফল হইয়া) নিন। কেমন, হোল তো! (ঘাম মুছিতে মুছিতে) এ যা হোল, এর চেয়ে সত্যিকার বিয়ে করা ছিল ঢের সোজা।

জয়া ॥ কেন বলুন তো?

জয়ন্ত ॥ সত্যিকার বউকে এত ভয় করতাম? আর এ হাঙ্গামাতেও পড়তাম না। বাড়ীতে কত লোক ছিল —তারাই এসব করত।

জয়া ॥ বউএর হয়ত তা আবার পছন্দ হ'ত না। কিন্তু আলতা? আলতা পরিয়ে দিন।

জয়ন্ত ॥ ও বাবা! আবার আলতা!

জয়া ॥ আমি তো আলতা জীবনে পরিনি। কেমন করে পরতে হয়—তাও জানিনা। আপনাদের বাড়ীতে যদি আলতার চল না থাকে—থাক্।

জয়ন্ত ॥ (বিপন্ন বোধ করিয়া) না, না—খুব আছে। বাবার ওসব দিকে খুব নজর। মার ফটোতেও দেখেছি পায়ে আলতা এঁকে দিতেন বাবা। হাল-ফ্যাশান বাবা একেবারেই সইতে পারেন না। দিন পা এগিয়ে দিন।

জয়া ॥ না, না—থাক।

জয়ন্ত ॥ না, না—তা চলবে না। আসুন, আসুন—পা আসুন। বাবা এলেন বলে।

জয়ন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া জয়ার পা টানিয়া আনিয়া আলতা পরাইতে লাগিল। জয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল। ক্ষণপরে অনাদির প্রবেশ। দরজায় অপেক্ষমান ঝাঁকামুটেকে আহ্বান

অনাদি ॥ (ঝাঁকা মুটেকে লক্ষ্য করিয়া) আয়—আয় —ভেতরে আয়।

জয়ন্ত লজ্জা পাইয়া চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝাঁকামুটে নানাবিধ জিনিষ লইয়া প্রবেশ করিল

নামা—সব নামা।

ঝাঁকামুটে নির্দেশমত কাজ করিতে লাগিল

(জয়ন্তকে) না, না—থামলে কেন? ওটা সেরে নাও—সেরে নাও।

জয়ন্ত ॥ ও হয়ে গেছে। ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছিলাম। কিন্তু বিমান তো এখনও এলো না অনাদি।

জয়া ॥ ভোম্বল।

জয়ন্ত ॥ ও হাঁ—ভোম্বল।

অনাদি ॥ কি লগ্নে জন্মেছিলাম রে বাবা! ছিলাম অনাদি—হলাম ভোম্বল। তা ভোম্বল—ভোম্বলই সই। এত সব খাবার-দাবার আমারই চার্জে তো?

জয়া হাসিয়া উঠিল

জয়ন্ত ॥ (জয়াকে) ভারী পেটুক, জানেন!

অনাদি ॥ Fools give feasts: wise men eat them! জানেন তো। (মুটেকে) নাও বাবা। (মুটেকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিল)। দেখি—এখন লক্ষীর ভাণ্ডার গুছিয়ে ফেলি।

খাদ্যাদি যথাস্থানে রাখিতে গিয়া মাঝে দু একটা মুখেও ফেলিতে লাগিল। এমন সময় ওষুধ-পত্র, আইস-ব্যাগ ইত্যাদি লইয়া হন্তদন্ত বিমানের প্রবেশ

বিমান ॥ এ কি! রুগী এখনও শুয়ে পড়েনি? শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন। বাড়ীতে ঢুকতেই একটা ট্যাক্সীর আওয়াজ পেলুম মনে হোল।

ভীষণ চাঞ্চল্য এবং কর্মব্যস্ততা

জয়ন্ত ॥ শোবার ঘরে চলুন।

বিমান ॥ সময় নেই। সোফা—সোফা!

সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সোফাটাকে একটা রোগশয্যায় পরিণত করিল। তাহার আশেপাশে ওষুধপত্রের সমাবেশ হইল

জয়ন্ত ॥ শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন।

জয়া ॥ আপনি নয়—তুমি।

জয়া শুইয়া পড়িল। জয়ন্ত অস্থির হইয়া একটা ব্যাগ আনিয়া জয়ার উপরে চাপা দিল

জয়ন্ত ॥ আইস ব্যাগটা। অনাদি, অনাদি...

জয়া ॥ (শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া) আঃ—ভোম্বল।

জয়ন্ত ॥ হাঁ—ভোম্বল। কিন্তু আপনি উঠবেন না।

জয়া ॥ আপনি নয়—তুমি। (ক্রমশঃ)

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্লেন থেকে মস্কোর সুবিশাল এরোড্রোমের জনাকীর্ণ-প্রাঙ্গণে নামতেই আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি দলকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জানাতে বিপুল জনতার পুরোভাগে এগিয়ে এলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুত নিকোলাই সিমিয়োনোভ্, ভুবন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক এবং চলচ্চিত্র শিল্পগুরু শ্রীযুত সুভেভোলোড্ পুডোভ্কিন্, সোভিয়েট রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র পরিবেশনা বিভাগ—'সোভ্এক্সপোর্ট' ফিল্মসের (Sovexport Films) ভাইস্ প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত প্যান্ডেল মস্কোভ্স্কী, ওদেশের প্রধান 'প্রামাণ্য-চিত্র' প্রতিষ্ঠান মস্কোর Central Documentary Studioর ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক শ্রীযুত লিওনিড্ ভার্লামভ্, প্রথিতযশা সোভিয়েট চিত্র-পরিচালিকা মাদাম্ ষ্ট্রোইভা, প্রখ্যাতনাম্নী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাদাম্ তামারা মাকারোভা, মাদাম্ আলিসোভা প্রভৃতি সোভিয়েট চলচ্চিত্র ও নাট্য-জগতের আরো অনেক কৃতী শিল্পী এবং কর্ম্মীরা। এঁদের মধ্যে শ্রীযুত পুডোভ্কিনের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল—আমাদের সোভিয়েট সফরের কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি যখন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাভিনেতা শ্রীযুত চের্কাসভের সঙ্গে ভারত-পরিভ্রমণে এসেছিলেন—সেই সময়ে। তা ছাড়া চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার শ্রীযুত সিমিয়োনোভ্ এবং চিত্র-পরিচালক শ্রীযুত ভার্লামভের নামও আমাদের দেশের চলচ্চিত্রানুরাগীদের অনেকের কাছেই বিশেষ সুপরিচিত, কারণ—গত ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত International Film Festival বা আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েট দেশের চলচ্চিত্র প্রতিনিধি হিসাবে এঁরা সদলে এসেছিলেন ভারতবর্ষ পরিক্রমণে। ওদেশী রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র শিল্পের কর্ম্মী-শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও বহু সোভিয়েট সাংবাদিক ও অনুসন্ধিৎসু কলারসিকও এসে জড় হয়েছিলেন সেদিন মস্কোর বিমানবন্দরের বিরাট আঙ্গিনায়। এমন কি মস্কোস্থিত আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের ভারত-বাসী বন্ধুরাও সবাই হাজির ছিলেন,—বিদেশের মাটিতে তাঁদের স্বদেশী দলকে সানন্দ-অভিবাদন জানাতে। সোভিয়েট দেশে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ মহাশয় অবশ্য কর্ম্মোপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ইচ্ছা-সত্ত্বেও স্বয়ং সেদিন বিমান-বন্দরে উপস্থিত থাকতে পারেন নি—কিন্তু তাঁর দূতাবাসের কর্ম্মীদের মারফৎ আমাদের দলকে সাদর-আহ্বান জানিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাতকারের জন্যে।

মস্কো নদীর তীরে—ক্রেমলিন্ প্রাসাদ

প্লেন থেকে জমীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘাচ্ছন্ন এরোড্রোমের চারিদিকেই আমাদের দলটিকে ঘিরে জ্বলে উঠলো হাজার বাতির আলো…অসংখ্য 'আর্ক-ল্যাম্প' আর 'ফ্ল্যাশ-বাল্বের' চোখ-ঝলসানো রোশনি। চেয়ে দেখি—আশে পাশে চারিদিকে ছোট বড় নানান্ ছাঁদের অসংখ্য 'Movie' আর 'Still' ক্যামেরার ভীড়…ওদেশের সৌখিন এবং পেশাদারী ফটোগ্রাফারের দল সোৎসাহে একের পর এক অবিরাম তুলে চলেছেন আমাদের সব প্রতিলিপি! শ্রীযুত সিমিয়োনোভ সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং

জানালেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র মন্ত্রী শ্রীযুত বোল্‌শাকভ্‌ মহাশয় সম্প্রতি রাজধানী মস্কোর বাইরে দূর পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিরালায় তাঁর বার্ষিক ছুটিতে রয়েছেন বলে তিনি বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে ভারতীয় অতিথিদের সমাদরসম্বর্দ্ধনাদি জানাতে না পারার দরুণ বিশেষ দুঃখিত। তবে অচিরে দু'একদিনের মধ্যেই তিনি মস্কোয় ফিরে আসছেন—ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য। শ্রীযুত পুডোভকিনও তাঁর দেশের মাটিতে পূর্ব্ব-পরিচিত বিদেশী ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গলাভ করে পরম উৎসাহে মেতে উঠলেন পুরোনো আলাপের আলোচনায়। তাঁর ভারত-প্রবাসকালীন পরিচিত কোলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মঞ্চ, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত, শিল্পকলাসেবী অনেকের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি···আর সেই সঙ্গে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র তথা নাট্যকলা-কৃষ্টির প্রসার কি ভাবে চলেছে তারও সব খবরাখবর নিলেন পরম আগ্রহে। ভারতের শিল্পকলা-কৃষ্টির প্রতি শ্রীযুত পুডোভকিনের শ্রদ্ধা অপরিসীম···আমাদের দেশের প্রাচীন অজন্তা, ইলোরার অপরূপ শিল্প ভাস্কর্য্যের স্মৃতি, ভারতের বিভিন্ন লোক কলাশিল্পের বিচিত্র নিদর্শন এবং নৃত্য, কলা, সঙ্গীতের মনোরম লীলা-ছন্দের লালিত্যে—তাঁর মন আজও ভরে আছে দেখলুম··· ভারতের অভিনব কৃষ্টি কলার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ।

মস্কোর সুবিখ্যাত আধুনিক রাজপথ—গোর্কী ষ্ট্রীট

জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলার পথে মাদাম্ ট্রাইভা, মাকারোভা আর আলিসোভার মতই ওদেশী মহিলারা এসে আমাদের দলের সবাইকে সুমধুর অভিবাদন জানালেন—রাশি রাশি সদ্য-প্রস্ফুটিত ওদেশী ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে। তারপর, বিমান-বন্দরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েই চলচ্চিত্র-সহমন্ত্রী শ্রীযুত সিমিয়োনোফ্‌ মহাশয়—সোভিয়েট দেশে বৈদেশিক কলা-কৃষ্টি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রথম প্রতিনিধি এবং দুই মহান্ দেশের মধ্যে কৃষ্টি-কলা ও সৌহৃদ্য-সম্পর্কের অগ্রদূত বন্ধু হিসাবে সুবিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকে আমাদের ভারতীয় দলের সবাইকে আরও একবার বিশেষ অভিনন্দন জানালেন। প্রত্যুত্তরে, আমাদের দলপতি প্রবীণ 'মহর্ষি' মশাই ওদেশী বন্ধুদের সহৃদয়তা ও সৌজন্যের সুখ্যাতি করে ধন্যবাদ জানালেন। বাস্তবিকই, ভারতের চলচ্চিত্র-সেবী আমাদের মত অতি-সাধারণ ক'জন বিদেশী অতিথিকে সেদিন সোভিয়েটবাসীরা আন্তরিক আগ্রহে যে অপরূপ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—তা সত্যিই অভিনব! তাঁদের মনের এই অকৃত্রিম অনুরাগ অভিব্যক্তি আমাদের প্রত্যেকের মনকেই বিমুগ্ধ এবং অভিভূত করেছিল। বিশাল সোভিয়েট দেশের অধিবাসীদের মনের ব্যাপকতাও দেখলুম বিরাট—বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি—আমাদের সোভিয়েট সফরের সময়। সে সব কথা এখন থাক্···পরে আলোচনা করা যাবে।

'মহর্ষি'র পরে, ভারতীয় নারীর পক্ষ থেকে আমাদের দলের শ্রী পোটে, সোভিয়েট দেশের নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সৌহার্দ্য নিবেদন প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন। বলা বাহুল্য—ভাষার বিভেদ থাকা আমাদের দু'তরফের এই সব আলাপ আলোচনা এবং পরস্পরকে পরস্পরের মনের কথা বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি—ওদের ক'জন 'দোভাষী' বন্ধুরা পাশে থাকার দরুণ।

আদর-আপ্যায়ন আর আলাপ-আলোচনায় সবাই যখন মশ্‌গুল তখন আচমকা নামলো বৃষ্টির ধারা! শীতের প্রারম্ভে ও প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী মেঘলা আবহাওয়া এবং আকাশের ভাব দেখে ওদেশী সোভিয়েট বন্ধুরা অবশ্য আগেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন, কাজেই তাঁদের সুব্যবস্থার গুণে আচম্‌কা বৃষ্টির ছাটে আর ভিজতে হলো না আমাদের। ভুবনবিখ্যাত প্রবীণ চলচ্চিত্রবিদ্ পুডোভ্‌কিন্, প্রখ্যাত পরিচালক ভালমিভ্‌, 'মোভ্‌এক্স্‌পোর্ত্ত ফিল্মমের' বিশিষ্ট কর্মী মস্কোভ্‌স্কীর মত সোভিয়েট-দেশের গণ্য-মান্য-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত আত্মীয়-পরিজনের অনুরূপ নিতান্ত ঘরোয়াভাবে যেচে এগিয়ে এসে স্বহস্তে আমাদের প্রত্যেকের মাথায় ছত্র-ধারণ করে বৃষ্টি বর্ষণ-ধারার জলের ছাট্ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেলেন বিমান-বন্দরের সুসজ্জিত বিরাট 'বিরাম-কক্ষের' অভ্যন্তরে। ঘটনাটি অতি সামান্য কিন্তু ও দেশের অধিবাসীদের অতিথি-সেবার অপরূপ নিদর্শন হিসাবে এ তুচ্ছ ঘটনাটির দাম অসামান্য। অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতি এমনি নজর এঁদের সব বিষয়ে···তার পরিচয়ও আমরা

[illegible]ছি সারা সোভিয়েট দেশের সর্ব্বত্রই ! কিন্তু থাক্‌···সে-কথা পরে [illegible]!

হেমন্তের ক্ষণিক বর্ষণ-ধারা···একটু পরেই থামলো ! বৃষ্টি-অন্তে [illegible]-বন্দরের বিরাম-কক্ষ ছেড়ে সদ্য-লব্ধ ওদেশী বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে [illegible]য়ে এলুম আমরা সদলে। এরোড্রোমের সামনে সারি দিয়ে [illegible]কগুলি সুবৃহৎ সুদৃশ্য সোভিয়েট-দেশের সেরা 'Zim' এবং 'Zis' [illegible]র-গাড়ী দাঁড়িয়েছিল আমাদেরই অপেক্ষায়···সোভিয়েট-বন্ধুদের সঙ্গে [illegible]-একে উঠে পড়লুম আমরা সে-সব গাড়ীতে ! তারপর বিমান-[illegible]র সম্বর্দ্ধনাধ্বনিমুখর জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণ পিছনে ফেলে যাত্রা করলুম [illegible]—মস্কো সহরের বুকে আমাদের আশ্রয়-নীড়, ওদেশের অন্যতম [illegible]—Hotel Savoyএর উদ্দেশে !

এরোড্রোম থেকে মস্কো সহর প্রায় মাইল ত্রিশেক দূরে ! সুন্দর [illegible] কংক্রীটে বাঁধানো সড়ক···পথের দু'ধারে উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তর··· [illegible] ক্ষেত—উঁচু-নীচু তরঙ্গ-ভঙ্গীতে আন্দোলিত হয়ে দূরান্তে আকাশের [illegible] গিয়ে মিশেছে। তার মাঝে-মাঝে ওক্‌, বার্চ্চ্‌, চেনার প্রভৃতি [illegible] সজীব-বিচিত্র বর্ণে রঙীন হয়ে সদীপ্তভঙ্গিতে সারি-সারি মাথা [illegible] দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথের আশে-পাশে চোখে পড়ে বড় বড় চাষ-[illegible]দের ক্ষেত···ফসলে ভরে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় [illegible] বাগবাগিচা—ফলে-ফুলে পত্রগুচ্ছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ! ক্ষেতে-[illegible] ওদেশের নবীন এবং প্রবীণ পুরুষ ও নারীর দল পাশাপাশি [illegible] বেঁধে কাজে হাত লাগিয়েছে—চাষ-বাস আর ফসল-ফলানোর [illegible]! চারিদিকেই যেন উদাত্ত জীবনের হিল্লোল বইছে ! মস্কোর [illegible]থের দৃশ্য, দেখে মনে পড়ে আমাদের দেশের আসানসোল-বরাকর, [illegible] ধানবাদ কিম্বা পাঞ্জাবের শস্য-শ্যামলা পাহাড়ী অঞ্চলের কথা··· [illegible]শের পথের এই শোভা অনেকটা ঠিক সেই ধরণের ! পথের পাশে মাঝে মাঝে দু'একটা ডোবার মত জলাশয় পুকুরেরও দেখা মেলে—তারই জলে ওদেশী হাঁসের দল পরম নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে ! এ-ছাড়াও ক্ষেতের পাশে বেড়া-ঘেরা আঙিনায় বড় বড় মুরগী, গৃহপালিত শুয়োর, গরু, ঘোড়াও চরতে দেখা যায় মাঝে মাঝে···কৃষিপ্রধান জায়গায় যেমন হয় !···

আমাদের মোটরে—অর্থাৎ 'মহর্ষি', নিমাই এবং আমি যে-গাড়ীতে আরোহী ছিলুম—সে-গাড়ীতে সহযাত্রী এবং পথ-প্রদর্শক ছিলেন শ্রীযুক্ত পুডোভকিন্‌। তাঁর মুখেই শুনছিলুম এ-পথের আশে-পাশের এবং এ-দেশের অনেক সব তথ্য-বিবরণী। শুনলুম—মস্কো সহর এবং তার আশ-পাশের অঞ্চল পাহাড়ী ছাঁদের উঁচু-নীচু আলোলনে ভরা···জমী এখানকার বেশ উর্ব্বরা···অনায়াসে ফসলও ফলে প্রচুর। ক্ষেত-খামারে ফসল-ফলানোর দিকে এদেশের লোকজনের বিশেষ ঝোঁক। মস্কো সহরের কল-কারখানার বহু যন্ত্রী-কর্ম্মী এবং সাধারণ চাকুরীজীবীরা নিজেদের চাষ-বাসের সখ মেটাতে এক জোট হয়ে দল বেঁধে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অভিনব ব্যবস্থায় ছোট-ছোট বিভিন্ন সমবায়-কৃষি-সঙ্ঘ রচে তুলে—সহরের বাইরেকার আবাদী জমী ইজারা নিয়ে তাঁদের ছুটি-ছাটার দিনে কাজ-কর্ম্মের অবসরে পালা-পালি করে খেটে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী চাষীদের মত রীতিমত পেশাদারীভাবে চাষ-আবাদ করে থাকেন—এমনই তাঁদের আগ্রহ ! এই সবছোট-ছোট ক্ষেত-খামারে কে বেশী ভালো ফসল-ফলাতে পারে—তাই নিয়ে এ

প্রাচীন লেমানোসভ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়—মস্কো

দেশের এই সব সৌখীন চাষীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয় এবং সে প্রতিযোগিতায় যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেন—তাঁদের সম্মান সোভিয়েট-সমাজের সর্ব্বত্র ! এ-সব সৌখিন কৃষি-সঙ্ঘের যৌথ-ফসল সমবায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের অভিপ্রায় অনুসারে কতক বিক্রী করা হয় সহরের বাজারে, আবার কতক বা সঙ্ঘের সভ্য-সভ্যাদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়ে থাকে—অনেকটা ঠিক আমাদের দেশের ভাগ-চাষীদের ধরণে। ওদেশের এমনি নানান্‌ সব বিচিত্র বিবরণ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি—এমন সময় হঠাৎ পথের ধারে নজরে পড়লো—সোভিয়েট রাজ্যের সুবিখ্যাত Red Army বা 'লাল-ফৌজের' একদল উর্দ্দি-পরা সৈন্য···বন্দুক-কামান-গোলা-গুলি রেখে চাষীদের মত শাবল, গাঁইতি, ঝুড়ি, কোদাল আর চাষ-বাসের সরঞ্জাম নিয়ে মহা-উৎসাহে মেতে গেছে সবাই ক্ষেতের ফসল-ফলানোর কাজে। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ঠেকলো···তাই, সেদিকে শ্রীযুত পুডোভকিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জিজ্ঞেস করলুম—

ব্যাপার কি? ওঁরা সব ট্রেঞ্চ-পরিখা খুঁড়ছেন বুঝি?…যুদ্ধবিদ্যায় ওঁদের পারদর্শী করে তোলার মহড়া চলেছে বুঝি ওখানে?…চলন্ত গাড়ী থেকে কৃষি-ক্ষেত্রের কর্ম্ম-ব্যস্ত 'লাল-ফৌজের' সৈন্যদের পানে দৃষ্টিপাত করে, স্মিতহাস্যে আমাদের দিকে চেয়ে শ্রীযুত পুড়োভ্‌কিন্ শান্তভাবেই জবাব দিলেন—না, না, ওরা সব আলুর চাষ করছে ওখানে!…

…আলুর চাষ!…'লাল-ফৌজের বিজয়ী-বীর-বিক্রমী সেনারা!… এঁদেরই প্রবল-পরাক্রম-প্রতাপে দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বগ্রাসী-রাহু হিট্‌লারের দুর্দ্দমনীয় ঝটিকা-বাহিনী'র উচ্ছেদ-সাধন সম্ভব হয়েছিল…পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের ভয়াবহ মহামারী ধ্বংস-লীলার অবসান ঘটেছিল একদা… আর সেই বীর-পুরুষেরা কিনা শেষে এই আলু-চাষের ক্ষেতে…?… রীতিমত অবাক হয়ে গেলুম আমরা—'লাল-ফৌজের' সেনাদের এ অবস্থা দর্শনে!

আমাদের অবাক-বিস্ময় দেখে—শ্রীযুত পুড়োভকিন ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন অবশেষে! তিনি বললেন—এই হলো সোভিয়েট দেশের 'লাল-ফৌজের' আসল রূপ! এই সব সৈন্যরা যুদ্ধের সময় দেশের বিপদে, বিদেশী শত্রুদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে স্বদেশ এবং দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে রক্ষা করতে যেমন কামান-বন্দুকের গোলাগুলি আগুন তুচ্ছ করে নির্ভীক সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যায় নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে, তেমনি যুদ্ধান্তে, শান্তির সময়ে তারা স্বভাবতঃই এগিয়ে আসে দেশের লোকের পাশে—সহায়ী বন্ধুর মত তাদের চাষ-বাস, দেশ-পুনর্গঠন, দেশের পথ-ঘাট বানানো, নদী-নালার সংস্কার, বাড়ী-ঘর-নগর নির্ম্মাণ এবং সমাজে সুশৃঙ্খল-শান্তিরক্ষার শুভ কাজে সহযোগিতা এবং সহায়তাকল্পে! দ্বিতীয় মহাসমরান্তে সারা সোভিয়েট দেশে আজ শান্তির শান্ত-পরিবেশ…তাই দেশকে শস্য-শ্যামলা করে তোলার সাধনায় লাল-ফৌজের সেনারা কায়মনোবাক্যে সহযোগিতা করছে এই ফসলের ক্ষেতে—সাধারণজনের শ্রমের ভাগ নিয়ে! বিদেশী নাৎসী শত্রুদের বিভ্রান্ত-বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের যে শস্য-শ্যামলা ক্ষেত-খামার একদিন নিজেদের হাতে বিদগ্ধ, বিশুষ্ক, ধ্বংস-ছারখার করে দিয়েছিল এই লাল-ফৌজের সেনারা—আজ শত্রুনিধনান্তে যুদ্ধোত্তর-দেশ-পুনর্গঠনের কালে সোভিয়েট-জনসাধারণের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাই সেই দগ্ধ-দেশমাতৃকার বুকে ফলিয়ে তুলছে শান্তির সোনার ফসল! এই হলো সোভিয়েট-লাল-ফৌজের দেশ-সেবার আসল রীতি!…দেশের সুদিনে-দুর্দ্দিনে সব সময়েই দেশবাসীর পাশে-পাশে থেকে সহায় হয়ে একনিষ্ঠভাবে সেবা করাই এই সব সৈন্যদের কাজ! কথাটা শুনে, দূর থেকে, আলুর ক্ষেতে কর্ম্মরত লাল-সেনাদের প্রতি মৌন-শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা এগিয়ে চললুম মস্কোর দিকে! সহরতলীর কাছাকাছি আসতেই সেকেলে রুশীয় স্থাপত্য-শিল্পের ছাঁদে-গড়া অনেক সব পুরোনো-ধরণের বাড়ী-ঘর, কাঠের-কুটির চোখে পড়লো…তাদের পশ্চাদপটে দূরে ধূম্রাভ-আবছা ছায়ায় মস্ত আধুনিক মস্কো-শহরের সুদৃশ্য উন্নত বিরাটকায় সৌধ-অট্টালিকা-শ্রেণীর দর্শন পাওয়া যায়—। পথের বাঁ-পাশে উঁচু টিলার ওপরে নজরে পড়লো সোভিয়েট-রাজ্যের যুদ্ধোত্তরকালের স্থাপত্য-নিদর্শন—মস্কো ইউনিভার্সিটির নব নির্ম্মীয়মান আধুনিকতম সুউচ্চ-সুবিশাল নুতন গগন-চুম্বী প্রাসাদোপম ভবন! নির্ম্মীয়মান নব বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের শীর্ষে ছোট-বড় নানাকার ক্রেন ঝুলছে…আশে-পাশে বড়-বড় ট্র্যাক্টর প্রভৃতি অতি-আধুনিক
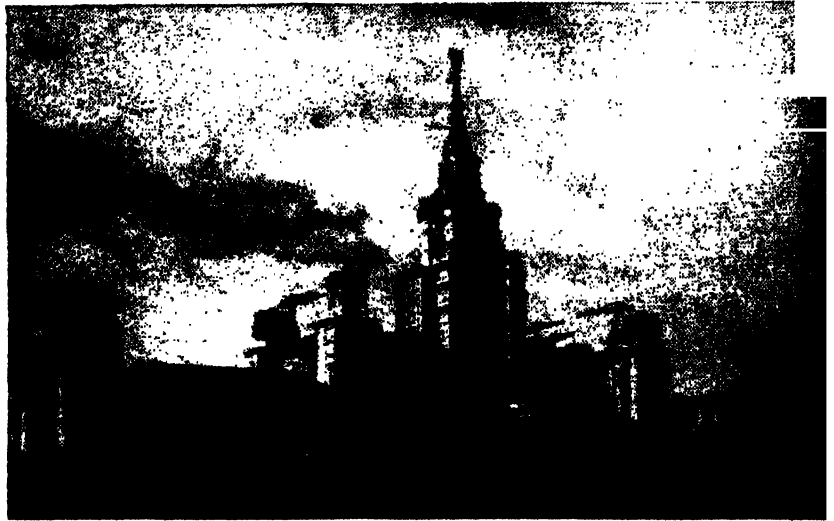
নব-নির্ম্মিত মস্কো স্টেট্ ইউনিভার্সিটি

যন্ত্রের সাহায্যে স্থপতি-কর্ম্মীরা কাজ করে চলেছেন অক্লান্ত-পরিশ্রমে। আমাদের সহযাত্রী শ্রীযুত পুড়োভ্‌কিন জানালেন যে এর নির্ম্মাণ-কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে…১৯৫২ সালের প্রারম্ভেই সোভিয়েট-দেশের জন-সাধারণের উচ্চ-শিক্ষার উদ্দেশ্যে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া হবে এই বিরাট নব-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার! এদেশী জন-সাধারণের মধ্যে বিদ্যার্জ্জনের প্রসার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ মস্কোর পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় লোমোনোসভ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের অসুবিধা এবং স্থানাভাব ঘটছে বলেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগ সেরা আধুনিক-ব্যবস্থায় এই সুবিশাল নব-বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটির স্থাপনা করেছেন সম্প্রতি—কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে! মস্কোর নির্ম্মিত এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে দশহাজার ছাত্রকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার মধ্যে ছয় হাজার ছাত্রের থাকবার আরাম-প্রদ বাসস্থানের বন্দোবস্তও হয়েছে এখানে যথোচিতভাবে

নূতন ইউনিভার্সিটি পিছনে ফেলে গাড়ী আমাদের এগিয়ে চললো সহরের পানে! ক্রমে প্রান্তর-পথ পার হয়ে সহরের বড়-রাস্তায় এসে হাজির হলুম আমরা! সুপ্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ···আশে-পাশে সুসজ্জিত সৌধ-অট্টালিকারাজি···দোকান-পাট-পসরা···আগাগোড়াই বেশ ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে, সাজানো-গোছানো পরিচ্ছন্নতায় ভরা! পথে সুদৃশ্য ট্রাম, বাস্, ট্রলী-বাস, মোটরের ভিড়···ঘোড়ার গাড়ীর দর্শন মেলে খুবই কম!··· লোক-জনেরও বেশ ভীড় পথে—তবে সবাই চলেছে সহজ সরল সুশৃঙ্খলভাবে···এতটুকু হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি বা চীৎকার-গণ্ডগোল নেই কোথাও···চারিদিকে সুন্দর স্বচ্ছন্দ শান্তির অপরূপ পরিবেশ! হোটেলে যাবার পথে পড়ে লেলিন হিলস্ টিলা এবং মস্কোর-সরকারী হাসপাতালের সুবিস্তৃত অট্টালিকা-অঙ্গন—গাড়ীতে যেতে যেতে শ্রীযুত পুতোভকিন প্রসঙ্গক্রমে সে-সবেরই পরিচয় আমাদের জানালেন। তারপর সহরের বহু পথ মাড়িয়ে মস্কো নদীর সুপ্রশস্ত সেতু পার হতেই চোখে পড়লো সোভিয়েট-রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ সুবিশাল ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদ! ১৯১৯ সালের রুশ-বিপ্লবের আগে এ-প্রাসাদ ছিল রুশীয় জার-সম্রাটদের আবাস ভবন, কিন্তু এখন সোভিয়েট-আমলে এখানে হয়েছে রাষ্ট্রের প্রধান সরকারী-দপ্তর। সোভিয়েট-দেশ নায়ক মার্শাল স্তালিন এই প্রাসাদেরই একাংশে বসবাস করেন এবং এই প্রধান সরকারী-দপ্তরশালা থেকেই সদা-নিয়ন্ত্রিত হয় সারা সোভিয়েট-রাষ্ট্রের শাসন এবং কর্মপদ্ধতির সব কিছুই। যাই হোক্, তখনকার মত ক্রেমলিন প্রাসাদ-দুর্গ ডাইনে রেখে—মস্কোর সেরা আধুনিক-সড়ক গোর্কী ষ্ট্রিট পার হয়ে, সোভিয়েট দেশের সর্বপ্রধান রঙ্গালয় বোল্‌শই থিয়েটার (Bolshoi Theatre) পিছনে ফেলে আমাদের গাড়ী অবশেষে এসে থামলে সুদৃশ্য সজ্জিত বিরাট চারতলা ভবন—'হোটেল স্যাভয়'এর সামনে! দলের বাকী সবাই আমাদের অল্প আগেই এসে পৌঁচেছিলেন! শ্রীযুত পুতোভকিনের সঙ্গে আমরাও গাড়ী থেকে নেমে হোটেলে প্রবেশ করলুম!

হোটেলটির বন্দোবস্ত সুন্দর···আগাগোড়া সুদৃশ্য মার্বেল, বহুমূল্য আসবাবপত্র, দামী কার্পেট আর রেশমের পর্দ্দায় পরিচ্ছন্ন রুচি-সম্মতভাবে সাজানো···কোথাও খুঁত নেই এতটুকু! এঁদের সুষ্ঠু-সুন্দর ব্যবস্থার কাছে আমাদের দেশের সেরা হোটেলও হার মানবে মনে হয়!

স্যাভয় হোটেলের দোতলায় আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকের বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র একটি দু'কামরাওয়ালা আরামপ্রদ Suite (নিজস্ব বাথ্‌রুম সমেত) ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই! শ্রীযুত সিমিয়োনোভ, পুড়োভকিন, নস্কোভ্‌স্কী প্রত্যেকেই আমাদের পরিচর্য্যার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বন্দোবস্ত নিজেরা স্বয়ং দাঁড়িয়ে দেখে ব্যবস্থা করে—তখনকার মত বিদায় নিলেন আমাদের কাছে। ভারতীয় দলের সোভিয়েট-সহচর-দোভাষী শ্রীযুত আব্রাহামভ তখনও বিমান-বন্দর থেকে আমাদের মাল-পত্রাদি নিয়ে এসে পৌঁছননি হোটেলে—কাজেই শ্রীযুত পুড়োভকিন ওদেশেরই ইংরাজীভাষিণী বিংশ-বর্ষীয়া তরুণী কুমারী আলেকজান্দ্রোভা ফিওডোরোভ্‌নাকে ও সপ্তবিংশ বর্ষ-বয়স্ক হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা-ভাষী শ্রীমান্ আনাতোলী জুভ্‌কভ্‌কে পরিচিত করিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে···এখন থেকে এঁরা দু'জনেই সোভিয়েট-সফরকালে সর্ব্বদা আমাদের পাশে-পাশে থেকে দোভাষী-সহচর এবং দেখাশোনা পরিচর্য্যার ভার নেবেন! সোভিয়েট দেশের নবীন-এই তরুণ তরুণী সঙ্গী দুটি ভারী মিশুক ও সদালাপী··· অবিলম্বেই তাঁরা দুজনেই হয়ে উঠলেন আমাদের পরম-বন্ধু! আমাদের সুখ-সুবিধা এবং আরাম-পরিচর্য্যার দিকে এঁদের অক্লান্ত আন্তরিক-প্রয়াসের কথা—বলে বোঝানো যাবে না!

আমার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল স্যাভয় হোটেলের ২২০ নম্বর Suite খানি···এতে ব্যবস্থা ছিল একখানি সুপ্রশস্ত ড্রইং-রুম—বাঁধানো ছবি, সোফা কৌচ, কার্পেট, পর্দ্দা দিয়ে সাজানো, তার পাশেই বিরাট শয়ন-কক্ষে পাতা রয়েছে আরামপ্রদ স্প্রিংয়ের খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ নরম তুলতুলে শয্যা, পালখভরা রঙীন সিল্কের লেপ! সে-ঘরের পাশেই নিজস্ব বড় বাথরুম···বাথ্ টব, হাত ধোবার 'বেসিন', আয়না, 'ফ্লাশিং-কমোড'এর ব্যবস্থা রয়েছে···কল খুললেই, ঠাণ্ডা এবং গরম জল মেলে সর্ব্বদা!···তা ছাড়া হোটেলের প্রত্যেক কামরাতেই Central Heating system এর কল্যাণে উষ্ণতার বন্দোবস্ত রয়েছে এখানে—শীতের কন্‌কনে ভাব কাটাবার উদ্দেশ্যে—উপরন্তু আরো একটি করে ইলেক্‌ট্রিক Heater এর ব্যবস্থাও ছিল আমাদের প্রত্যেকের ঘরে!

ঘরে বসে দেহ এলিয়ে মাল-পত্রের অপেক্ষায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছি এমন সময় আমাদের ব্যাগ-সুটকেশ নিয়ে শ্রীযুত আব্রাহামফ্ এসে হাজির হলেন বিমান-বন্দর থেকে। (ক্রমশঃ)

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—

দীর্ঘবিতর্কের পর ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংসদের উভয় দল কর্তৃকই অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যেখানে পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোক্তা এবং সমর্থক, সেখানে ইহা যে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সংসদের সমর্থন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথা? দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর একদল বিশেষজ্ঞ মিলিয়া যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সংসদে হইবে ইহা প্রত্যাশা করাই ভুল। লোকসভার সম্মুখে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গণতন্ত্রের প্রশংসায় তিনি একটু অতিশয়োক্তি করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার মতে A democratic set up properly worked should permit of anything that was desired to be done...' কিন্তু ইহাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা পারি না। ইহা সত্যও নয়। মানুষ যদি দেশাত্মবোধ ও চরিত্রকে আদর্শস্থানে উন্নীত করিতে না পারে তাহা হইলে গণতান্ত্রিক দেশে কোনো এক বিশেষ দলের পক্ষে বৃহৎ এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুরূপে কার্যকরী করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—বিলাতের শ্রমিক সরকার কর্তৃক ইস্পাত-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রয়াস। বহু আয়াসে যাহা হইয়াছিল চার্চিল গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

কিন্তু সে যাহাই হউক, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়িয়াছে বলিয়া কোনো কোনো সংসদ-সদস্য ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমালোচনা উপযুক্ত হইয়াছে। গঙ্গানদীর উপর বাঁধ নির্মাণ-প্রস্তাব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় আসে নাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সংসদ-সদস্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজন হিসাবে বিচার করিলে ইহা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই গৃহীত হওয়া একান্তভাবে উচিত ছিল। স্থানীয় আরো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো অংশ পরিকল্পনায় বাদ পড়িয়াছে ইহাও অনস্বীকার্য। সরকার পক্ষও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে কৈফিয়ৎ হিসাবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহাই শেষ এবং চূড়ান্ত পরিকল্পনা নয়—ইহা সূচনা মাত্র। ভবিষ্যতে ইহাও রদবদল হইবে। আমাদের অভিমত—যে স্থানে অতিশয় জরুরী বিষয়সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পরিকল্পনা-রচয়িতারা সেগুলি যথাসম্ভব বর্তমান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করিলে সুবিবেচনার পরিচায়ক হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। পরিকল্পনায় কৃষি, বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ, সমাজকল্যাণকার্য প্রভৃতিতে ব্যয় হইবে ৯২২ কোটি টাকা, শিল্প সংগঠনে (Industry) ব্যয় হইবে ১৭৩ কোটি টাকা, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজকল্যাণে ব্যয় হইবে ৩৪০ কোটি টাকা এবং পুনর্বাসন ব্যাপারে ৫১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

এই বিরাট পরিকল্পনা কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যাপারে হয়তো বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। আমেরিকা হইতে গম বিক্রয়লব্ধ ৯০ কোটি টাকা, কলম্বো প্লানের ১২ কোটি টাকা, বিদেশী কমিউনিটি প্লানের ৪৩ কোটি টাকা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৯ কোটি টাকা—ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ কোটি টাকা প্রভৃতি মিলাইয়া ১৫৬ কোটি টাকা মিলিয়াছে। বাকী টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রীয় সরকারকে সরবরাহ করিতে হইবে। অর্থাৎ আগামী ৫ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে ৭৩০ কোটি টাকা দিতে হইবে। বাকী টাকা ঋণ করিয়া এবং লগ্নী হইতে খরচা হইবে। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কোনোরূপ ব্যয় সংকোচ করিবেন এমনও মনে হয় না। সুতরাং আশঙ্কা হয়—জনসাধারণের উপরই হয়তো আরো চাপ পড়িবে। যে স্থলে জনসাধারণের করভার লাঘব করা প্রয়োজন, সেস্থলে যদি উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া চলে তবে কল্যাণের নামে জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার করাই হইবে। এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কিন্তু এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করি—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটি যাহাই থাকুক, জাতি-সংগঠনের পক্ষে এই জাতীয় প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমাদের সরকারের বহুবিধ গলদ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকাও ঠিক নয়। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করা সম্ভবপর—তাহাই জাতির পক্ষে পরম লাভ। দেশ এই ভাবেই ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

সাহিত্য সম্মেলন—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন গত কটক অধিবেশনে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন নামে নামান্তরিত হইয়াছে। ইহা এই সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। এই নামান্তরের কল্পনা বিগত বার্ষিক অধিবেশনেই দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু কার্যকরী হইল এইবার। স্বাধীন ভারতে নিখিল ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির নব সংগঠনে বাংলা ভাষার বিশেষ স্থান এবং বিশেষ দান আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সেইজন্য এইরূপ বিরাট সাহিত্য সম্মেলনকে একটা বিশেষ নামে আবদ্ধ রাখিয়া বাংলা ভাষাকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীনও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের জাতীয় কবি হন, তাহা হইলে বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয় ভাষা। তাহার স্বরূপ এবং মর্যাদা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি সংবিধানে স্বীকৃত অন্যতম ভাষারূপে অনুমোদন পাইয়াছে। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে বাংলার প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি এইরূপে সীমাবদ্ধ হইলেও ভারতের সামাজিক জীবনে কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা এমন সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে তাহার মর্যাদা সার্বজনীনভাবেই স্বীকৃত। বাংলা ভাষার এই সার্বজনীন মর্যাদাকে লোক-ব্যবহারে রূপ দিতে হইলে যে প্রকার সংস্থা ও সংগঠনের প্রয়োজন 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন' নামধারী প্রতিষ্ঠানই ঠিক সেই প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। আজ নূতন অবস্থায়, নূতন পরিবেশে এবং নূতন প্রয়োজনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নূতন আহ্বান আসিয়াছে। আমরা যদি এই আহ্বানে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন না হই তবে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন: "...বাঙালী আপন ঘরেই এই নূতন আলোকের দ্যুতিকে ধরিয়া রাখে নাই। অসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রদেশে প্রদেশে তাহার দিব্যচ্ছটা পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার সুযোগ সে গ্রহণ করিয়াছিল। সংকীর্ণ মনোভাব বাঙালীর কোনোদিন ছিল না, পরকে সে আপন করিয়াছে, দূরকে নিকট করিয়াছে এবং বাহিরকে ঘর করিয়াছে। তাহার সাহিত্যে বৃহত্তর ভারতের রূপ সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব গীতি-কবিতার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা কিছু ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দে বাঙালী গাঁথিয়া তুলিয়াছে, তাহার সব কিছুই সে বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে।"

আজ স্বাধীন ভারতে বাঙালীর সেই আরব্ধ ব্রতকে পরিপূর্ণ করিবার সময়, অবসর এবং আহ্বান আসিয়াছে।

ইতিহাসের সহিত, যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া না চলিতে পারিলেই জীবনের গতির ছন্দভঙ্গ হয়। সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে আপন অনড়তায় প্রাণহীন প্রথার দাস হইয়া পড়িতে হয়। যাঁহারা ভারতের নানাপ্রান্তে বিষয়কর্ম উপলক্ষে বৃহৎ বাঙালী সমাজ হইতে এবং পরস্পরের নৈকট্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংবৎসরে একবার মিলিত করিয়া সামাজিকতার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদানের অভিপ্রায় হইতেই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উৎপত্তি। জাতিভেদ লোকাচার, দেশাচারের গণ্ডীবদ্ধ যে সমাজ-প্রথায় নিষেধের দ্বারা প্রহত হইয়া মানুষের সহজ প্রীতিসম্পর্কের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহাকে কৃত্রিম ও আবিল করিয়া রাখে, তাহা মনুষ্য প্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই মাঝে মাঝে বন্যার জলের ন্যায় বৃহৎ সম্মেলনের আহ্বান আসে। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাতেও একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মানব মিলনের মহাতীর্থে মিলিত হইবার আহ্বান আসিয়াছিল। তাহাতে বাংলার কবিরা ভাব বিভোল হইয়া প্রেমধর্ম, প্রাণধর্মের রসে পরিপূর্ণ এক অপরূপ গীতিকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ রচিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যাসাগর বঙ্কিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র-যুগে আসিয়া বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে সগৌরবে আপন স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্যে রস আস্বাদন করিবার জন্য আজ বৃটেন, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েট রাশিয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও আলোচনা চলিতেছে। যাহা বিদেশীরা গ্রহণ করিতেছে তাহা কেবলমাত্র বাঙালীর সম্পদ হইতে পারে না, তাহা সর্ব-ভারতের সম্পদ।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাব-ধারার পুণ্যপীযুষপায়ী বাঙালী মহাভারতের সেবা ও গঠনের কাজেই তাহার চিন্তা ও চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নিয়োগ করিবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অপরিচয়ের ব্যবধান লুপ্ত করিয়া ভারতবাসীর মিলনকে সহজ ও সুন্দর করিয়া তুলিবে ইহা সুনিশ্চিত।

স্বতন্ত্র অন্ধ্র—

স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে অন্ধ্রনেতা শ্রীরামলু মাদ্রাজে ৫৮ দিন অনশন করিয়া গত ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবীতে এই অন্ধ্রনেতার স্বেচ্ছায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ গভীর পরিতাপের বিষয় এবং এই দুঃখময় পরিণতির জন্য ভারতসরকারসহ সমগ্র অন্ধ্র ও মাদ্রাজঅধিবাসীরাও দায়ী। স্বাধীন ভারতে এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেওয়া কাহারও উচিত হয় নাই। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠন একরূপ স্থির হইয়াই ছিল এবং পণ্ডিত নেহেরুর ইতঃপূর্বেকার বিবৃতির পর ইহা নিশ্চিত বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তবুও শ্রীরামলু অনশন ত্যাগ করেন নাই। তাঁর দাবী ছিল মাদ্রাজ শহরকেও অন্ধ্ররাজ্যভুক্ত করা। এই মাদ্রাজ শহরকে লইয়াই ঘটিতেছিল মতান্তর। মাদ্রাজ শহরকে অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী করা ঠিক সরকারের ইচ্ছাধীন নহে। অন্ধ্রের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলেন। মাদ্রাজ শহরে তেলেগুভাষী লোকের সংখ্যা কম—তামিল-ভাষী লোকের সংখ্যাই বেশী। সেইজন্য তামিলভাষী লোকেরা মাদ্রাজকে অন্ধ্রের রাজধানী করিবার একান্ত বিরোধী। সংখ্যাগরিষ্ঠ তামিলভাষী লোকেদের সম্পূর্ণ অমতে মাদ্রাজকে অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী করায় অনেক বাধা রহিয়াছে। মাদ্রাজ শহরকে অন্ধ্ররাজ্যভুক্ত করিতে হইলে তামিল ও তেলেগুভাষী লোকেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং তাহার চরম পরিণতি হইতেছে

শ্রীরামুলুর অনশন মৃত্যু। শ্রীরামুলুর এই শোচনীয় মৃত্যুঘটিত না—যদি তামিল ও তেলেগুভাষী লোকেরা আপোষ মীমাংসার দ্বারা মাদ্রাজ শহরের ভাগ্যনিরূপণ করিতেন। মাদ্রাজ শহরকে কেন্দ্র করিয়া এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী মাদ্রাজকে কেন্দ্র-শাসিত রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর ১৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, 'জে-ভি-পি' অর্থাৎ জহরলাল-বল্লভভাই-পট্টভী রিপোর্ট অনুযায়ী মাদ্রাজ প্রদেশের অবিসম্বাদিত তেলেগুভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে। তবে মাদ্রাজ শহরের উপর দাবী ছাড়িতে হইবে। মাদ্রাজ শহরের ভাগ্য সম্ভবত পরে নির্দ্ধারিত হইবে।

স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে ইহা নিশ্চিত এবং মাদ্রাজ শহরকে বাদ দিয়াই হইবে তাহাও প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু মধ্য হইতে গান্ধীজীর শিষ্য অন্ধ্রের বরেণ্য নেতার এইরূপ শোচনীয়ভাবে জীবনাবসান হইল—ইহাই সব চেয়ে পরিতাপের বিষয়। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৯ সালে প্রায় অনুরূপ ভাবে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে সময় যতীন দাস লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর মারা যান। পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেই সময় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতারূপে যতীন দাসের মৃত্যু প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যাহা ঘটিয়াছিল আজিকার স্বাধীন ভারতে তাহা ঘটিতে দেওয়া কাহারও উচিত হয় নাই। এইরূপ একটি জরুরী ব্যাপারের মীমাংসায় ভারত-সরকারের যেমন ত্বরান্বিত হওয়া উচিত ছিল, মাদ্রাজ প্রদেশের তামিল ও তেলেগুভাষী লোকেদেরও তেমনি—আপোসে এই ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া শ্রীরামুলুর মূল্যবান জীবনকে রক্ষা করা সমধিক উচিত ছিল।

শ্রীরামুলুর মৃত্যুতে আর একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব প্রদেশের নেতারা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়া আসিতেছেন শ্রীরামুলুর মৃত্যু তাঁহাদের মনে প্রেরণা যোগাইবে এবং সরকারকে চাপ দিবার জন্য হয়তো কেহ কেহ অনশনও আরম্ভ করিবেন বা অন্য কোনও প্রকার চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন বা কোনও নীতি অনুসরণের পূর্ব্বে তার যৌক্তিকতা বা প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। কারণ সুযোগ-সন্ধানী ও প্রতিক্রিয়া-শীল দল বা লোকের অভাব আজকাল কোন দেশেই নাই। শ্রীরামুলুর মৃত্যুর পর অন্ধ্রের নানা স্থানে ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাই তার প্রমাণ। সুতরাং যেখানে মীমাংসা সম্ভব, সেখানে আপোষে মীমাংসা করিয়া নেওয়াই দরকার। জাতীয় সরকারেরও এই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনঃ বিভাগের মতন জরুরী ব্যাপারের যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা উচিত। কারণ ইহা হইতে নানা অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সে সম্ভাবনার অগ্রেই তাহার বিনাশ দরকার।

অসংখ্য উদ্বাস্তু আগমনে অতিভারাক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ আজ তার পূর্ব্বেকার খণ্ডিত অঙ্গ অধুনা বিহারভুক্ত বাঙ্গালাভাষী মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ণিয়া জেলাগুলি লইয়া পশ্চিমবঙ্গকে পুনর্গঠন করিবার দাবী জানাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই দাবী যে অতিশয় যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু বিহার নেতৃবৃন্দ এই দাবী মানিয়া লইয়া কোনও আপোষ মীমাংসাতেই রাজী নন। তাঁহাদের এই আপোষহীন মনোবৃত্তির ব্যাপারটিকে ক্রমশই ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে।

আশা করি, অন্ধ্র নেতা মহাপ্রাণ শ্রীরামুলুর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবীতে তাঁর মহান জীবন উৎসর্গের পর, জাতীয় সরকার ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া, অন্ধ্রের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের দাবীও মানিয়া লইয়া শীঘ্রই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবেন।

কোরিয়ার যুদ্ধবিরতিতে ভারতীয় প্রস্তাব—

কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জপ্রতিষ্ঠানে যে প্রস্তাব উপস্থিত করে তাহা সামান্য অদল বদলের পর রাষ্ট্রপুঞ্জ রাজনৈতিক কমিটিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৫৩ এবং বিপক্ষে সোভিয়েট গোষ্ঠির ৫টি ভোট প্রদত্ত হয়। জাতীয়তাবাদী চীন ভোটদানে বিরত থাকে এবং লেবানন অনুপস্থিত ছিল। সোভিয়েট প্রতিনিধির অনুরোধে সমগ্র ভারতীয় প্রস্তাবটি ভোটে না দিয়া প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক অনুচ্ছেদটিই বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা অপরিহার্য্য সর্ত্ত বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তা ৫-৪৬ ভোটে অগ্রাহ্য হয়, ৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল।

যুদ্ধবন্দীগণকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করতে বা যুদ্ধবন্দীগণের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যাহাতে কোনরূপ বলপ্রয়োগ না করা হয়—এই প্রস্তাবটি বিপুলসংখ্যক ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে ৫০টি ভোট প্রদত্ত হয়, আর সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী বিপক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে কোন রাষ্ট্রই বিরত ছিল না।

ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান বক্তব্য হইতেছে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ কমিশনের উপর দেওয়া হইবে এবং ইহাতেও যদি মতানৈক্যের কোন প্রশ্ন দেখা দেয় তবে ৯০ দিন পরে তাহাদিগকে রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে দেওয়া হইবে। ভারতীয় পরিকল্পনায় আরও বলা হইয়াছে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিন পরেও যদি যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ কমিশন সমস্ত যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারেন তবে তাহাদের বিষয় একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে পেশ করা হইবে।

প্রতি-প্রস্তাব রূপে রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় সংশোধিত সোভিয়েট যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই প্রস্তাবে অবিলম্বে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রশ্নসহ সমগ্র কোরিয়া সমস্যার সমাধানের ভার এগারটি দেশ লইয়া গঠিত একটি কমিশনের উপর অর্পণ করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। কিন্তু

বিপুল ভোটাধিক্যে সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৫ ভোট এবং বিপক্ষে ৪১ ভোট প্রদত্ত হয়। ভারত ও পাকিস্থানসহ আরব-এশিয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠী ভোটদানে বিরত ছিল।

ভারতীয় প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতির কোন পরিকল্পনা নাই বলিয়া সোভিয়েট-প্রতিনিধি অভিযোগ করায় ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন জানান যে প্রস্তাবটি যুদ্ধবিরতিরই প্রস্তাব। যুদ্ধবিরতি-চুক্তি সম্পাদিত হইলে বার ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধবিরতি হইবে। যুদ্ধবন্দীদের সমস্যার সমাধান হইলেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি মঃ ভিসিনস্কি ভারতীয় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যে সব অপমানকর ও অভিসন্ধিমূলক মিথ্যা অভিযোগ উচ্চারণ করেন তাহা কোন সভ্য জাতির প্রতিনিধির নিকটে আশা করা যায় না।

সোভিয়েট সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীমেননের 'করুণ আবেদনের' উল্লেখ করিয়া মঃ ভিসিনস্কি বলেন যে আমরা এই সব আবেদনে সায় দিতে পারি না। করুণ-রসাত্মক নাটকীয় ভাবের এই সব আবেদন নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অতঃপর তিনি বলেন, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে আপনারা ভারতীয়েরা কল্পনাবিলাসী ও আদর্শবাদী মাত্র। বক্তৃতার শেষভাগে মঃ ভিসিনস্কি বলেন যে সমগ্র এসিয়াবাসীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের কথা বলিবার অধিকার আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কে সমগ্র এসিয়াবাসীর স্বার্থরক্ষা করিতেছে ভবিষ্যতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মঃ ভিসিনস্কি ভারতীয় প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলেন, আপনারা যুদ্ধের অবসান চাহেন না। আমাদের দাবী মানিয়া লইবার অভিপ্রায়ও পোষণ করেন না। ভারতীয় প্রস্তাবে উৎকট মার্কিন-নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াও মঃ ভিসিনস্কি ভারতকে আক্রমণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব মানিয়া লইয়া ভারতীয় প্রস্তাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংশোধন করা হইয়াছিল সত্য। সোভিয়েট রাশিয়ার কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইলে নিরপেক্ষ ভারত তাহার প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে দ্বিধা করিত না। যে চীনকে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন দেবার জন্য বরাবর ওকালতী করিয়াছে সেই চীনও সোভিয়েট রাশিয়ার সুরে সুর মিলাইয়া ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে। ভারতের প্রতি রাশিয়া ও চীনের সত্য মনোভাব কিরূপ, তাহা তাহাদের অসঙ্গত ও অপমানসূচক উক্তিগুলি হইতে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

অহিংসা ও শান্তির ঋষি বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশ নিরপেক্ষ ভারতকে কোরিয়া যুদ্ধের অবসানকল্পে শান্তি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার ভার দিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ উপযুক্ত কাজই করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্ত্তৃক বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত এই ভারতীয় শান্তি প্রস্তাব সোভিয়েট ও চৈনিক প্রত্যাখ্যানের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যকরী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয় না। যতদিন না এই উৎকট সমর-সাধ শক্তিমত্ত জাতিগুলির মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে, ততদিন জগতে প্রকৃত শান্তি আসিবে না। অতীতে ধর্মান্ধ মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়া পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত করাইয়াছে। আজ ধর্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে 'ইসম্' বাদ। আর এই 'ইসম্'বাদের বর্মের আড়ালে বর্ত্তমানের সুসভ্য আধুনিক মানব সেই অতীতের অনুকরণে করিয়া চলিয়াছে সমগ্র বিশ্বে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। আজ তার হস্তে রহিয়াছে অত্যাধুনিক বিশ্ব-ধ্বংসী মারণাস্ত্রসমূহ—যা স্তম্ভিত করিয়াছে মানুষের জিজ্ঞাসাকে।

অতীতের ধর্মোন্মত্ততার আঘাত কাটাইয়া, বর্ত্তমানের সর্ব্বনাশা 'ইসম্'-বাদের সংঘাত এড়াইয়া ভবিষ্যতে বিশ্ব-মানব প্রকৃত শান্তির সন্ধান লাভ করিবে কিনা তাহাও এক পরম জিজ্ঞাসা। ১৫ই পৌষ, ১৩৫৯

পিরিনিজ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শীত-সন্ধ্যার ভীত পাখী তুমি মেয়ে
আর আমি পর্বতমালা পিরিনিজ
কত তুষারের কঠিন সোপান বেয়ে
কাছে এলে তুমি ছড়ালে ফুলের বীজ।

পাহাড় পেয়েছে প্রাণ তাই আসে ঝড়
হর-পার্বতী বিস্মিত ক্ষণকাল
তুমিই বোঝালে যৌবন দুর্মর
আর দু'জনেই পৃথিবীর জঞ্জাল।

পাহাড়—পাহাড় পাচ পাহাড়ের ভীড়
প্রতি পিরিনিজে সংকেত ঝঞ্ঝার
জ্বলে তলোয়ার যেন দিগ্বিজয়ীর
চরণে তোমার পিরিনিজ চুরমার।

ছোট পাখী তুমি এইখানে বাঁধো ঘর
কত নেপোলিঁও পাবে না পালাতে পথ
আমার ভূমিতে খোল অভ্যন্তর,
আমি পিরিনিজ—প্রাণময় পর্বত।

—দুই—

Os mares são azues. Quanto mais vivo, melhor.

গভীর নীল সমুদ্র। আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর।

মার্টিম অ্যাফোন্সো ডি-মেলোর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের সৌন্দর্যে। সপ্ত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা মানুষটির কাছে নীল জল নতুন কথা নয়। কিন্তু আজকের এই সকালের মধ্যে মিশেছে একটা অদ্ভুত মাটির গন্ধ—একটা অপরিচিত পৃথিবীর সংবাদ।

তার স্বপ্ন বার বার দেখেছেন ডা গামা, দেখেছেন কোয়েল্হো। বেঙ্গালা। মাটিতে সোনার খনি আছে সেখানে। অথবা তাও নয়। বেঙ্গালায় খনি খুঁড়বার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না। পথে পথেই তা ছড়িয়ে আছে—শুধু মুঠিভরে সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে নিলেই চলে।

আর সেই স্বর্ণভূমির তোরণদ্বার চট্টগ্রাম। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি। শুধু গ্র্যাণ্ডিই নয়। কোয়েল্হো বলেছিল, সিডাডি গ্র্যাণ্ডি ই বনিটা। শুধু বিরাট নয়—সুন্দর, মনোরম শহর। কোচিন, কালিকটের চাইতেও মনোরম, এমন কি সে রূপ মাতৃভূমি লিস্‌বনেও বুঝি দেখতে পাওয়া যায়না।

পোর্টো গ্র্যাণ্ডি! সিডাডি বনিটা।

বেশি আশা পর্তুগীজের ছিলনা। জমি চাই না, অধিকার চাই না—কামানের মুখে দখল রাখতে চাই না সিংহলের মতো। শুধু দাও বাণিজ্যের অধিকার। রাজার পায়ে ধরে দেব আমাদের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন, এনে দেব তাঁর প্রাপ্য রাজকর। বিদ্রোহ নিয়ে আসিনি আমরা, ঔদ্ধত্য নিয়েও না। কোচিন-কালিকটে যা করেছি তা নিরুপায় হয়ে—শুধু ভারতবর্ষের মাটিতে একটুখানি পা রাখবার জন্যে। কিন্তু আর রক্তপাত নয়, আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। শান্তি চাই আমরা, চাই মৈত্রীর সহজ সম্বন্ধ।

শত্রু আমাদের নেই তা নয়। সে হল কালো মুরের দল—অর্ধেক ইয়োরোপ জুড়ে যারা একদিন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল ঘোড়ায় আর তলোয়ারে। তাদের সেই প্রতাপের ওপর আমরা শেষ যবনিকা টেনে দিয়েছি কিউটার দুর্গে। হিস্‌পানিয়ার তাড়া খেয়ে ইয়োরোপার দরজা থেকে কুকুরের মতো পালিয়েছে তারা। এইবারে সে শত্রুদের আমরা পূর্ব পৃথিবী থেকেও দূর করে দেব। তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেব যেমন করে হোক। এবং তারপরে vamos ester muito bem aqui—এইখানে আমরা আরামে বসব হাত পা ছড়িয়ে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ফল পাওয়া গেল না। বার বার চেষ্টা করেছে সিল্‌ভিরা—চট্টগ্রামের সুলতানের কাছে বার বার মাথা খুঁড়েছে কোয়েল্হো। কিন্তু ওই শয়তান করম আলী! তার জাহাজগুলোকে ক্যাম্বেতে যেতে না দিয়ে সিল্‌ভিরা পাঠিয়েছিল কোচিনের বন্দরে—আশা ছিল, এই ভাবে ব্যবসার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠবে পর্তুগীজদের সঙ্গে। কিন্তু করম আলী সমস্ত ব্যাপারটা ভুল বুঝিয়েছিল সুলতানকে। সেই জন্যেই সুলতান হয়ে উঠলেন খড়্গহস্ত। ব্যর্থ নিরাশ সিল্‌ভিরার সঙ্গে দিনের পর দিন বেড়ে চলল তিক্ততার সম্পর্ক, পর্তুগীজের জাহাজ পোর্টো গ্র্যাণ্ডিতে এসে নোঙর পর্যন্ত ফেলতে পারলনা। ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগের মধ্যে অসহায় সিল্‌ভিরা মাঝ সমুদ্রে

ভেসে বেড়াতে লাগল। তারপর আরাকানের বিশ্বাসঘাতক রাজার হাত থেকে কোনো মতে মৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে সিল্‌ভিরা ফিরে চলে গেছে। ভারতবর্ষের স্বর্ণভূমি—বেঙ্গালার মাটিতে আজও পর্তুগীজের পদসঞ্চার ঘটল না।

কিন্তু মনের মধ্যে স্বপ্ন ভাসে। গ্র্যাণ্ডি! বনিটা!

সেই সুযোগ বুঝি এসেছে ডি-মেলোর হাতে। নিতান্ত দৈববশেই ঘটতে পেরেছে এমন অনুকূল অবসর। তাই সমুদ্রের নীলিমাকে আরো বেশি নীল মনে হচ্ছে, আরো বেশি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশের দৃষ্টি।

—অ্যাগ্রাডাভেল্!—আনন্দের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল ডি-মেলোর মুখ দিয়ে।

এই সময় দূর সমুদ্রে দেখা গেল ছোট একটি বাণিজ্য বহর, বেঙ্গালাদের বহর। শাদা পাল তুলে একরাশ রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে দক্ষিণে। চোখ-ভরা ঔৎসুক্য নিয়ে বহরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। মুঠো মুঠো সোনা নিয়ে চলেছে—নিয়ে চলেছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। যদি কোনো মতে ওদের সঙ্গে একবার মিত্রতা করা যেত, যদি হাতের মধ্যে আসত বাঙালি বণিকের দল—

শঙ্খদন্তের সপ্ত ডিঙার দিকে যতক্ষণ চোখ চলে, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। তারপরে আস্তে আস্তে বহরটা অদৃশ্য হয়ে গেল চক্ররেখার ওপারে, রাজহাঁসের মতো পালগুলো পেট্রেলের পাখার চাইতেও ছোট হয়ে এল। কিন্তু আর কত দূরে বাংলার মাটি? আরাকান নদীর শুভ্র জলের কোলে কোথায় সেই শ্যামলে-সুনীলে একাকার দেশ? যেখানকার মস্‌লিন পরে রোমার সেরা সুন্দরীদের যৌবনমত্ত রূপ রেখায় রেখায় ফুটে উঠত, অ্যাফ্রোদিতের উৎসবের দিনে যেখানকার মশ্‌লা-সুরভিত ব্যঞ্জনের গন্ধে আকীর্ণ হয়ে উঠত অ্যালেক্‌জাণ্ড্রিয়ার আকাশ-বাতাস?

—কাকা!

ডি-মেলো ফিরে তাকালেন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁরই কিশোর ভাইপো। গঞ্জালো।

—কী হয়েছে গঞ্জালো?

—আর কত দূর? কবে আমরা পৌঁছোবো?

ডি-মেলো হেসে উঠলেন: সে খবরটা জানবার জন্যে আমার মনেও তোমার চাইতে কম ব্যস্ততা নেই আমা মন বলছে, আর বেশি দেরি নেই—আমি যেন বাতাসে বাংলার মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

—ওরা কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কাকা?

আশঙ্কাটা নিজের মনেও একেবারে নেই তা নয়। যে অভ্যর্থনা সিল্‌ভার অদৃষ্টে জুটেছিল, তাঁর জন্যেও তা অপেক্ষা করছে কিনা বলা শক্ত। অবশ্য, সে জন্য ডি-মেলোও পিছপা হবেন না। পর্তুগীজের সন্তান তিনি—যুদ্ধের দোলা তাঁর রক্তে রক্তে। ঝড়ের মুখে জাহাজের পাল উড়লে, শত্রু সামনে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলে, সমস্ত চেতনা একটা অদ্ভুত আনন্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। দুর্গমের ডাক জাগিয়ে দেয় দুঃসাহসের ঘুমন্ত মত্ততাকে। কিন্তু তবুও যুদ্ধ চান না ডি-মেলো। ডামা—কাব্‌রাল—আল্‌মীডার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর রক্তপাত নয়—তলোয়ারে তলোয়ারে বিরোধকে জাগিয়ে রাখাও নয়। শান্তি চাই—চাই মিত্রতা। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো ডি-কুন্‌হারও সেই নির্দেশ।

—না, না—যুদ্ধ করবে কেন? বেঙ্গালারা লোক খারাপ নয়। তারা মুরদের চাইতে অনেক ভালো।

—কিন্তু সিল্‌ভিরা—

—করম আলীর সঙ্গে বিরোধ করে ভুল করেছিল সিল্‌ভিরা। তা ছাড়া সুলতানের একটা চালের জাহাজও লুট করেছিল সে। আমরা ও সব গণ্ডগোলের দিকে তো পা বাড়াবনা।

—কিন্তু সিল্‌ভিরার ওপর রাগ থেকে যদি ওরা আমাদের আনক্রমণ করে?—উৎসুক চোখ মেলে আবার জানতে চাইল গঞ্জালো।

—তা হলে আর আমরাও কি পিছিয়ে যাব? রাজা ম্যানোয়েলের নামে, মা মেরীর নামে আমরাও রুখে দাঁড়াব। কী বলো, পারবনা?

—নিশ্চয় পারব।—কিশোরের দৃষ্টি ঝলমল করে উঠল—গর্বে, উত্তেজনায়।

মুগ্ধভাবে কিছুক্ষণ ডি-মেলো তাকিয়ে রইলেন গঞ্জালোর দিকে। পর্তুগালের নির্ভীক বীর সন্তান। সারা পৃথিবীতে যারা বয়ে নিয়ে যাবে রাজা ম্যানোয়েলের পতাকা—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে গড়ে তুলবে এক অখণ্ড বিশাল ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য—যাদের আকাশ-ছোঁয়া 'ইগ্রেঝা'র

(গীর্জার) চূড়োয় চূড়োয় ঝরে পড়বে খ্রীস্টের প্রসন্ন আশীর্বাদ—তাদেরই একজন নির্ভুল প্রতিনিধি।

তবু কোথায় যেন সায় দেয়না ডি-মেলোর মন। পর্তুগীজের সন্তান, তলোয়ার হাতে বীরের মৃত্যুই সব চেয়ে বড় কামনার জিনিস। কিন্তু কিশোর গঞ্জালোর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা কিছুতেই ভাবতে পারেন না ডি-মেলো। বড় বেশি সুন্দর সে—বড় বেশি সুকুমার। কেমন যেন মনে হয়, এমন করে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ানো তার কাজ নয়—এমন করে তাকে টেনে আনা উচিত নয় প্রতিদিনের কঠিন মৃত্যুর মধ্যে; তার চাইতে ঢের ভালো হত—তাকে 'সুন্দা'র দুর্গে রেখে এলে, সমুদ্রের ধারে, নারকেল বনের স্নিগ্ধ ছায়ার ভেতরে। হাতে তলোয়ার নয়—বীণাই মানায় ভালো; রক্তের অর্ঘ্য দেওয়া নয়—তার জন্যে কবিতার অক্ষর।

কিন্তু ডি-মেলো তাকে ছাড়তে পারেন না—এক মুহূর্ত রাখতে পারেন না দৃষ্টির অন্তরালে। ডি-মেলো আবার তাকালেন গঞ্জালোর দিকে। সোনালি চুলের ভেতরে শান্ত সুকুমার মুখ। সৈনিকের কঠোরতা নেই—আছে কবির কারুণ্য।

স্নিগ্ধ স্বরে ডি-মেলো বললেন, থুন্দ্ সানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

গঞ্জালো চলে গেল। আবার দিনের উজ্জ্বল আলো—অপরূপ নীল সমুদ্র। Os mares sao azues! কতদূরে বেঙ্গালা—আরাকান নদীর ধারে সেই স্বর্ণতট?

একটা অনিশ্চিত উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। সরকারী দৌত্য নিয়ে আসেননি ডি-মেলো, নিতান্তই যোগাযোগ—নিতান্তই মেরীর আশীর্বাদ। কালিকটের সঙ্গে সিংহলের একটা ঘরোয়া বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল ডি-মেলোকে। কালিকটের সেনাপতি নৌবহর নিয়ে কলম্বো আক্রমণ করতে আসছে এই খবর পেয়ে তিনি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আসছিলেন আশ্রিত সিংহলের রাজাকে রক্ষা করতে। তাঁর বহর দেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচল কালিকটের সেনাপতি প্যাটে মার্কার। কিন্তু ডি-মেলো আর ফিরে যেতে পারলেন না সুন্দার দুর্গে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা উন্মত্ত ঝড় উঠল সমুদ্রে। দু-খানা জাহাজ সেই ঝড়ের হাওয়ায় কোথায় ভেসে গেল, তার সন্ধানও করতে পারলেন না ডি-মেলো। বাকী খানতিনেক জাহাজ নিয়ে তিনি আটকে পড়লেন এক বালির চড়ায়।

কোথায় এসেছেন—কোথায় পৌছবেন, কিছুই অনুমান করা সম্ভব ছিলনা ডি-মেলোর পক্ষে। দিন দুই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটাবার পরে একটা নতুন ঘটনা ঘটল। সমুদ্রে নৌকোডুবি হয়ে জনতিনেক জেলে ভাসতে ভাসতে এসে হাজির হল সেই চরে। তারা আরাকানী।

তাদের কাছ থেকে ডি-মেলো জানলেন, কিছুদূরে তাঁর স্বপ্নভূমি চট্টগ্রাম। যার নাম, যার কথা বহুবার শুনেছেন তিনি, অথচ যেখানে পৌছুবার কোনো সুযোগই এতদিন তাঁর ঘটেনি।

মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সমস্ত চেতনা। চেষ্টা করবেন একবার? এতদিন ধরে অনেক দুঃখেও যে স্বর্ণপুরীর দরজা খোলেনি, তিনি কি পারবেন সে কাজ করতে? অসম্ভব নয়—কিছুই বলা যায়না। হয়তো জননী মেরীর আশীর্বাদেই এমন যোগাযোগ ঘটেছে। নইলে সিংহলের উপকূল থেকে একটা ঝড়ের তরঙ্গ এমন করে তাঁকে চট্টগ্রামের সীমান্তে এনে দেবে—স্বপ্নেও কি এমন সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন কখনো?

কোয়েল্হো এখন তাঁরই সেনানী। সিল্ভারার সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি শুনেছেন তারই কাছ থেকে। তবু আশা ছাড়তে পারেননি ডি-মেলো। কোথা থেকে যে কী হয়, কিছুই বলা যায়না। এ সুযোগ তিনি গ্রহণ করবেন—পরিণামে যা হওয়ার তাই হোক।

তিনজন জেলের মধ্যে যে লোকটি সব চেয়ে বিচক্ষণ, তার নাম থুন্দ্ সান। লোকটার চুলে পাক ধরেছে—চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, রেখাঙ্কিত মুখ, চাপা ঠোঁট; দেখলেই বুঝতে পারা যায় লোকটা স্বল্পভাষী। কিন্তু একটুখানি আলাপ করতে গিয়েই ডি-মেলো বুঝলেন—তিনি যা ভেবেছিলেন, তার চাইতেও ঢের বেশি অভিজ্ঞ থুন্দ্ সান। বহুদিন সে জাহাজে জাহাজে ঘুরেছে—ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের ভাষা তার জানা—পর্তুগীজ সে বুঝতে পারে, এমনকি, বলতেও পারে কিছু কিছু। আগ্রহভরে তাকে আশ্রয় করলেন ডি-মেলো।

—আমি চট্টগ্রামের বন্দরে যেতে চাই—ডি-মেলো জানালেন।

থুন্দ্ সান একবার মাথা হেলাল কিনা বোঝা গেলনা। পাঁ ঠোঁট দুটো তার খুললনা—প্রায় ভ্রু রেখাহীন চোখ টা সামান্য কুঞ্চিত হয়ে এল মাত্র।

—পথ চেনো তুমি ?

—চিনি।—থুন্দ্ শান সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে।

—নিয়ে যেতে পারবে সেখানে ?

—কেন পারব না ?—তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—বেশ, তবে তুমিই পথ দেখাও। বক্‌শিস দেব খুশি।—ডি-মেলো আশ্বাস দিলেন।

তারপর থেকেই অনিশ্চিত দিনগুলো কাটছে আশায়-উত্তেজনায়। প্রত্যেকটি সকালে ঘুম ভেঙেই ডি-মেলো সে দাঁড়ান জাহাজের মাথার ওপর—ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে খতে চান, বাংলার তটভূমির সোনালি-শ্যামলতা একটা পক্ষপ হাতছানি নিয়ে ভেসে উঠল কিনা দিগন্ত-রেখায়। শুধু নীল আর নীল জল। আকাশ ফুরোয়না—সমুদ্র ফুরন্ত। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি ক্রমশ একটা সুদূর মরীচিকার তাই পেছনে সরে যাচ্ছে !

থুন্দ্ সানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো স্পষ্ট জবাব মেলনা। শুধু মাথা নাড়ে।

—আমরা পথ ভুল করিনি তো ?

—না—না।

—তবে দেরী হচ্ছে কেন ?—নিজের অধৈর্য আর চেপে থতে পারেন না ডি-মেলো।

—সময় হলেই পৌঁছুব।—এর বেশি আর কিছু বলতে মনা থুন্দ্ সান।

আশ্চর্য স্বল্পভাষী এই আরাকানীরা। কথা বলেনা—মন অদ্ভুত শাণিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে স্থির ষ্টিতে। লোকগুলোকে কেমন যেন ডি-মেলো বিশ্বাস রতে পারেন না—থেকে থেকে অনুভব করেন একটা স্বস্তির অন্তর্জ্বালা।

কিন্তু কাল আশ্বাস দিয়েছে থুন্দ্ সান। ভরসা য়েছে, সমুদ্র এই রকম স্থির থাকলে হয়তো পরের নই—

তাই হয়তো আজ থেকে থেকেই বাংলার মাটির গন্ধ চ্ছেন ডি-মেলো। অনুভব করছেন নিজের প্রতিটি রক্তে। কিন্তু কোথায়—কতদূরে ?

চমকে উঠলেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে থুন্দ্ সান। জানিয়েছে অভিবাদন।

—চট্টগ্রাম কই থুন্দ্ সান ? কূল কোথায় ?

তামাটে রঙের কয়েকগাছা সংক্ষিপ্ত দাড়ি হাওয়ায় দুলে উঠল থুন্দ্ সানের। এতদিন পরে—এই প্রথম যেন তার মুখে হাসি দেখলেন ডি-মেলো। কিন্তু তার মুখের কথার মতোই সে হাসি বিদ্যুৎ চমকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—হাসছ কেন ?—হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে ডি-মেলোর মনটা জ্বালা করে উঠল। হাতখানা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়ল কোমরের তলোয়ারের বাঁটের ওপর।

থুন্দ্ সান আঙুল বাড়িয়ে দিলে উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে।—ওইতো দেখা যাচ্ছে !

—দেখা যাচ্ছে !—অদ্ভুত গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ডি-মেলো।

—ওই নদীর মোহানা—উত্তর এল থুন্দ্ সানের।

তার আঙুল লক্ষ্য করে চোখ দুটোকে যেন চক্ররেখার পারে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন ডি-মেলো। সামনে সূর্যের বাধা ছিলনা, তবু হাতখানাকে বাঁকিয়ে ধরলেন কপালের ওপর। দেখা যায়—সত্যিই দেখা যায় ! অত্যন্ত ক্ষীণ—অত্যন্ত আবছা, তবু যেন চোখে পড়ছে তীরতরুর সুস্পষ্ট একটা কৃষ্ণরেখা, আর তারই পাশ দিয়ে বিস্তীর্ণ মোহানায় একরাশ শুভ্র জল এসে নীল সমুদ্রের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে !

বিশ্বাস হয়না—ভরসা হয়না বিশ্বাস করতে। হয়তো এখনি দিবাস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে ! মরীচিকা ! মরুভূমির মতো কখনো কখনো সমুদ্রেও যে মরীচিকা দেখা দেয়—এ অভিজ্ঞতা আছে দুঃসাহসী নাবিক ডি-মেলোর। কত সুদূর তট, কত দূরান্তের জাহাজ সমুদ্রের ওপরে এসে ছায়া ফেলে, ভৌতিক ব্যাপার মনে করে কত মানুষ ভয় পেয়েছে তাতে। এও কি তাই ?

স্পন্দিত বুকে—রক্ত-তরঙ্গিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। না—মরীচিকা নয়। ওই তো দুধের মতো সাদা জল—ওই তো তটতরুর কৃষ্ণরেখা ! ওই তো তাঁর সেই স্বপ্নস্বর্গের হাতছানি !

—ওই—ওই ওদিকে ! ঘুরিয়ে দাও জাহাজের মুখ—কূল দেখা যাচ্ছে—

অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো। সমুদ্রের কলধ্বনি ছাপিয়ে তাঁর সে চিৎকার যেন মহা-শূন্যতায় ফেটে পড়ল। শুধু তাঁর নিজের জাহাজই নয়—পেছনের জাহাজ দুখানিও যেন উচ্চকিত হয়ে উঠল সেই চিৎকারে!

—কাকা!—

কোথা থেকে ছুটে এল গঞ্জালো। তার তরুণ সুন্দর মুখ উত্তেজনায় টকটক করছে।

—গঞ্জালো!—দু হাত দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ডি-মেলো। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, কূল দেখা যাচ্ছে গঞ্জালো—বেঙ্গালার কূল। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—সিডাডি বনিটা!

কিন্তু ওই উপকূলে যে ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তা কি ভুলেও ভাবতে পেরেছিলেন ডি-মেলো? যদি ভাবতে পারতেন, তা হলে আরো জোরে—আরো কঠিন বন্ধনে গঞ্জালোকে তিনি বুকের পাঁজরে আঁকড়ে ধরতেন, আর্তনাদ করে উঠতেন: এখানে নয়, এখানে নয়। পালাও—পালাও—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাও। ওই খুন্দ্‌ সানকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও যতদূরে হয়—

কিন্তু!

* * * *

সোমদেব ঠিক লোকালয়ে বাস করেননা। সাধারণ মানুষকে সহ্যই করতে পারেন না তিনি। সাংসারিক জীব-গুলোর প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত ঘৃণা দিনের পর দিন দহন করে তাঁকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন শান্ত নির্বোধের দল দিনগত পাপক্ষয় করে কোনোমতে কাটিয়ে চলেছে—অভিযোগ নেই, প্রতিবাদ নেই! এই দেশ একদিন হিন্দুরই ছিল—শক্তি থাকলে, সাধনা থাকলে আবার তা হিন্দুর হবে। আজকের বিধর্মী শাসন থেকে আবার মুক্তি হবে তার, জ্বলবে হোমের অগ্নি, উঠবে বেদমন্ত্রের সুর, আবার আর্যধর্ম ফিরে আসবে তার সগৌরব মর্যাদায়।

কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বাস? কোথায় সেই সাধনা?

শান্তিপ্রিয় নিশ্চিন্ত মানুষের দল। আঘাত পেলে দেবতার দরজায় এসে মাথা খোঁড়ে, অন্যায় অত্যাচারকে মেনে নেয় ভগবানের দান বলে। মূর্খেরা জানেনা, পঙ্গু—দুর্বলচিত্তদের ভগবানও কখনো করুণা করেন না!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে সোমদেবের। চন্দ্রনাথের মন্দিরে সুপ্ত হয়ে আছেন মহারুদ্র। তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, শোনো—শোনো। আর কতদিন তুমি এমন করে ঘুমোবে? এখনো কি তোমার লগ্ন আসেনি? তোমার ভৈরব-সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করার মুহূর্ত কি আসন্ন হয়নি এখনো? আর যদি তুমি চিরমৃত্যুর মধ্যেই ডুবে গিয়ে থাকো, তাহলে তো এমন করে বসে বসে পুজো পাওয়ার অধিকার তোমার নেই। তার চেয়ে তোমার বিসর্জনই ভালো—পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে মহাসমুদ্রের অতলে তোমার চিরবিরাম!

এই তীক্ষ্ণ মর্মজ্বালা সোমদেবের দুটো রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর চোখের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে বেরুতে থাকে। মানুষ তাঁকে সভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, তাঁর সামনে পড়লে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় ছেলেমেয়েরা। নিজের চারদিকে যেন কতগুলো অশুভ-অপার্থিব প্রেত-ছায়াকে বহন করে চলেন সোমদেব।

চন্দ্রনাথ থেকে আরো খানিক দূরে—পাহাড়ের কোলে বাস করেন তিনি। সামনের দিকে একটুখানি কুটীরের ছাউনি—তার পেছনে অন্ধকার একটা কালো গুহা! সেই গুহাতেই সোমদেবের আশ্রয়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বন্ধুর পাহাড়ী পথে এগিয়ে চললেন তিনি। শীতের কুয়াশায় থমথমে অন্ধকার চারদিকে। পা ফেলে ফেলে সোমদেব চলতে লাগলেন। একটা শুকনো কাঁটা-গাছের আঁচড়ে বাঁ পায়ের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল—ভ্রূক্ষেপও করলেন না তিনি।

থেমে দাঁড়ালেন একবার। কুয়াশাঘেরা স্তব্ধ অন্ধকারে একটা ঘনীভূত দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ। চারদিকের তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে একটা প্রেতকণ্ঠ কান্না বেজে উঠল: ফেউ—ফেউ—উ—

কাছাকাছি বাঘ আছে। সোমদেব জানেন। দু একবার এ পথে তাদের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছে। কিন্তু তারাও তাঁকে চেনে। সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে।

সোমদেব আবার পথ চললেন। পেছনে ফেউয়ের সতর্ক বাণী। কিন্তু তাঁকে নয়। তিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর। এই পাহাড়—এই অরণ্য তাঁকে ভয় করে।

একটা উৎরাই নেমে আবার থেমে দাঁড়ালেন সোমদেব। তাঁর রক্তাভ চোখ এবার সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে। কী যেন একটা দেখতে পেয়েছেন সম্মুখে।

একটু দূরেই তাঁর কুটির। তার সামনে দুটো জ্বলন্ত মশাল—অন্ধকারের বুকে উছ্‌লে-ওঠা রক্তের মতো দপ্‌দপ্‌ করেছে তারা।

কে এল? আজ রাত্রে কারা তাঁর অতিথি?

উদ্গত প্রশ্নটার তাড়নায় এবার দ্রুত গতিতে নিচের দিকে নেমে চললেন সোমদেব। তাঁর কঠিন পায়ের আঘাতে আঘাতে পাথরের টুকরোগুলো আছড়ে পড়তে লাগল ঢালু পথ বেয়ে। পেছনে পাহাড়ের ভয়ার্ত প্রতিহারী সমানে ডেকে চলল: ফেউ—ফেউ—উ— (ক্রমশঃ)

বৃহত্তর বঙ্গ সমস্যা—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনে গত ২৫শে ডিসেম্বর বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিরূপে শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয় কতকগুলি কঠোর সত্য কথা বলিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি যে বাঙ্গালী জাতি ও সমাজকে ভালবাসেন এবং সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাহা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"ভারতে ইউরোপ ও বাহিরের অন্যান্য মহাদেশের নানা বিদ্যা, নানা ভাবধারা আসার বহন, সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের যুগে বাঙ্গালী নিজের ঘরে নিজে লাভবান হয়ে মনের মণিকোঠার সিন্দুকে চাবি লাগিয়ে বসে থাকেনি। সে ভারতের জন্য বিশ্বকে আবিষ্কার করেছে—জগৎ-পথিক হয়েছে। আধুনিক যুগের তথাকথিত প্রবাসী বাঙ্গালীর উৎপত্তি এখানেই। কিন্তু বাঙ্গালী কোন দিন প্রবাসী ছিল না। কারণ সে কখনো নিজের চারদিকে কোন ভৌগোলিক সীমা ছড়িয়ে রাখেনি। শুধু বাংলার বাইরে নয়, ভারতেরও বাইরে সে মানসিক ঐশ্বর্য্য বিলাতে বের হয়েছে সর্ব্বদা।" * * * "বাঙ্গালীর নানামুখী অসামান্য প্রতিভাকে ভূগোলের কোন প্রান্তসীমা বাধা দেয় নি। সত্যকথা বলতে কি—রাজনীতিক সীমান্তরেখা মানুষের হাতে পড়ে বার বার বদলিয়ে গিয়েছে। এই ত মাত্র গত ৫০ বছরের মধ্যে তিন তিন বার বদলিয়ে গেল। কিন্তু মণীষার সীমান্তরেখা কেহ বদলাতে পারে না বা তাকে গণ্ডী এঁকে বেঁধে রাখতে পারবে না। সে যুগের এই মণীষীরা নিজেদের বাঙ্গালী বলে মনে করে ভারতের এক প্রান্তে কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত হয়ে থেকে বিড়ম্বিত বোধ করে নি। ভারত ও বৃহত্তর ভারত বা কোন নদীর তীরে তাদের জন্ম—সে বিচার করে বাগ বিতণ্ডা করে নি।" * * * দেবেশবাবু বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মনোভাবের নিন্দা করিয়া তাই বলিয়াছেন—"আমরা যখন বৃহত্তর বঙ্গ কথাটি ব্যবহার করি, তার মধ্যে কোন প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা বা পরধন আহরণের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আমরা যেখানে গিয়াছি, ট্রেড ইউনিয়ন করি নি, কাউকে বঞ্চিত করি নি, কিছু সঞ্চয় করি নি। আমরা গড়ি নি কোন বেড়া-জাল নিজেদের চার পাশে, তৈরী করি নি নূতন সমাজ-সমস্যা, রচি নি নূতন রাজনীতিক বা অর্থ-নৈতিক গণ্ডী, বানাইনি কোন উপনিবেশ।" তার ফলে প্রবাসী বাঙ্গালী কোন দিন কোন প্রদেশের অবাঙ্গালীদের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয় নি। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালীর ব্যর্থ বেকার জীবন এমনভাবে চাকরীর সন্ধানে পথে পথে ঘুরে আত্ম-হত্যার দিকে এগিয়ে যায় কেন? তার উত্তরে দেবেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন—"আমরা তৈরী করলাম স্বদেশী মন্ত্র, গড়লাম ভুখা মিছিল, ছুটলাম বিশ্বময় ছড়ানো শ্লোগানের ঝাণ্ডা নিয়ে। কিন্তু বাস্তব জীবনে গেলাম না তৈরী করতে স্বদেশী কলকারখানা, ছোটাতে চারদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া। * * * পূর্ব পুরুষের গৌরবের ক্যাস-সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে আর কতদিন এরকম ভাবে দিনগত পাপক্ষয় করা চলবে আমাদের? * * * গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের মধ্যে শ্রমজীবী, এমন কি সাধারণ ঘরকন্নার কাজ করবার লোক পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে এসেছে। কিন্তু শুধু মস্তিষ্কজীবী দিয়ে একটা জাতি হয় না। শুধু মেজর জেনারেল দিয়ে সৈন্যদল গড়া যায় না। * * * বাংলার মধ্যে যদি ঘর ভেঙ্গে থাকে, বাংলার বাইরে যদি প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় টিকে থাকার জায়গা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, তা' হলে প্রতীকার হচ্ছে—নিজেকে আরও যোগ্য করে তোলা। মনে রাখা—যে মণীষা সীমান্ত স্বীকার করে না।"

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝা যায়, শ্রীযুত দাশ তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালী জীবনের সমস্যার কথাই বলিয়াছেন ও তাহার সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। আজও যে সকল বাঙ্গালী মনের বল লইয়া বাংলার বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছেন বা যাইতেছেন—তাঁহাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একদল ভীরুতা ও

কাপুরুষতার জন্য বাংলার বাহিরে যাইতে ভয় পান—সে মনোভাব ত্যাগ করিতে পারিলে বাঙ্গালী সারা ভারতের নানা রাজ্যে আবার তাহার কর্মস্থান করিয়া লইতে পারিবে। দেবেশবাবু তাহাকেই বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে চাহেন। শুধু কিছু জমী লইয়া বৃহত্তর বঙ্গ করা যাইবে না—নিজ প্রতিভা ও মনীষার দ্বারা যদি বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে অকুতোভয় হইয়া বিচরণ করে, তবেই তাহাকে বৃহত্তর বঙ্গ বলা চলিবে। আজ আমাদিগকে সেই বৃহত্তর বঙ্গের কথা চিন্তা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

এঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউসন—

গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় এঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) ইনিষ্টিটিউসনের বেঙ্গল কেন্দ্রের বার্ষিক সাধারণসভায় কেন্দ্রের সভাপতি শ্রীভূপতি নাথ চৌধুরী যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—এ দেশ হইতে বহু এঞ্জিনিয়ারকে বিদেশে প্রেরণ করিয়া কোন বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া আনা হয়। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টই গত কয়েক বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ অর্থ এদেশে ঐরূপ শিক্ষাদান ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হইলে আরও অনেক বেশী এঞ্জিনিয়ারকে বিশেষজ্ঞ করা যাইত। বিদেশ ঘুরিয়া বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিলেই যে কোন লোককে এদেশে অধিক মর্য্যাদা দান করা হয়—অথচ তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের—শুধু তাঁহারা বিদেশে যান নাই বলিয়া—উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় না। ইহা পরিতাপের বিষয়, সত্বর এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। বহু বড় বড় কারখানায় বিদেশ-প্রত্যাগত বা বিদেশী এঞ্জিনিয়ারগণকে প্রথম হইতে এত অধিক অর্থ ও মর্য্যাদা দেওয়া হয়, যাহা এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শেষ জীবনে লাভ করাও সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারা যে গুণের সমাদর করা হয়, তাহা নহে। অনর্থক বিকৃত মনোভাবের জন্য এইভাবে অর্থ-অপচয় হয় ও প্রকৃত গুণী ব্যক্তি অনাদৃত হন। স্বাধীনতা লাভের পর—ইংরাজের শাসনের অবসানের পর এইরূপ মনোবৃত্তি থাকা প্রকৃতই জাতির পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী প্রভৃতির যেমন রেজিষ্ট্রেসনের ব্যবস্থা আছে, এঞ্জিনিয়ারগণেরও তেমনই নাম রেজেষ্ট্রী করার ব্যবস্থা হইলে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক নিজেকে এঞ্জিনিয়ার বলিয়া অভিহিত করিতে সমর্থ হইবে না। নূতন নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সঙ্গে এ ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন।" শ্রীযুত চৌধুরী তাঁহার ভাষণ শুধু উপরোক্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। যে সকল নূতন সরকারী পরিকল্পনায় দেশের গঠনমূলক কার্য্য করা হইতেছে—সেগুলিতে এঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের জন্য শাসনকর্তাদের মনোযোগ অকৃষ্ট আকর্ষণ করিয়াছেন। এঞ্জিনিয়ারগণের ও তাঁহাদের কার্য্যের সুসংবদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি নূতন আইন প্রণয়নেরও প্রস্তাব করিয়াছেন। এঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউসন এ বিষয়ে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে—শুধু তাঁহারাই লাভবান হইবেন না—সকল কার্য্যে তাঁহাদের সুচিন্তিত পরামর্শ লাভ করিয়া দেশবাসীও উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত চৌধুরী এ সকল বিষয়ে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনে গত ২৫শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা পরিষদ বাংলার

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিগত কটক অধিবেশনে গম্ভীরার শিল্পীবৃন্দ

লোক-সংস্কৃতি-মূলক নৃত্য-গীতের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাংলার পল্লী-জীবনের পাল-পার্বণ, উৎসব আনন্দ, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিখুঁত ব্যঞ্জনামুখর

হইয়া ওঠে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। বাংলার কীর্তন, বাউল, উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা—পশ্চিমবঙ্গের গাজন, ঝুমুর, পূর্ববঙ্গের নীলপূজা, খারি, জারি প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব সংগীত এবং নৃত্যের বৈশিষ্ট্যকে গম্ভীরা পরিষদের শিল্পীবৃন্দ রূপদান করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীতারাপদ লাহিড়ী। সাহিত্যিক অনিলকুমার ভট্টাচার্য বাংলার লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যের ভাবধারার একটি ধারাবাহিক বিবরণী প্রদান করেন। উড়িষ্যায় বাঙ্গলার ভাবধারাকে পরিবহন করিয়া গম্ভীরা-পরিষদ সাংস্কৃতিক মিলনের শুভ উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা পরিষদের সাংস্কৃতিক প্রচারের এই শুভ-উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানাইতেছি।

মহামণ্ডলে রাষ্ট্রপতি—

গত ২৫শে ডিসেম্বর বিকাল ৪টার সময় রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের
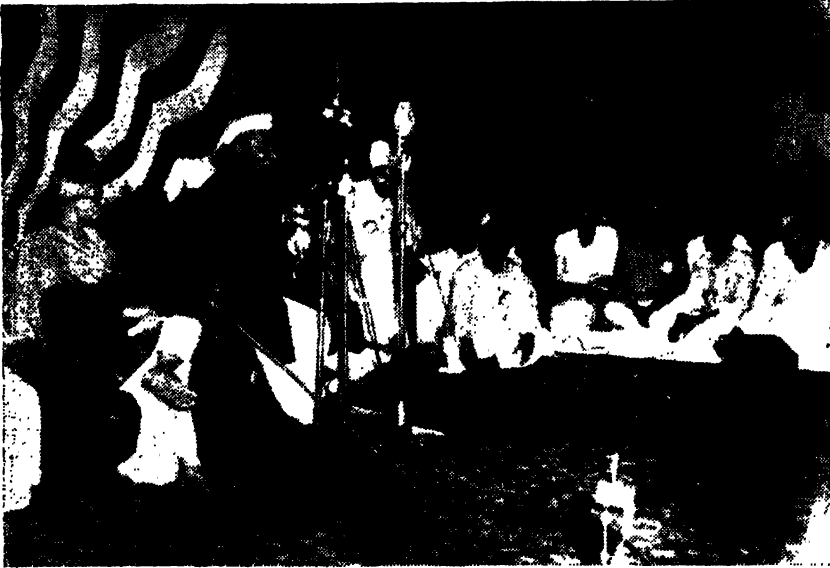
রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

আন্তর্জাতিক অতিথিশালা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তথায় মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় সেদিন লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছিল—কর্তৃপক্ষের সুচারু ব্যবস্থায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি ছিল না। ঐ উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসোহনলাল দুগার রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কালে ঘোষণা করেন যে তিনি অতিথিশালার সম্প্রসারণের জন্য নিজে ১০ হাজার টাকা দান করিবেন ও তথায় 'রাজেন্দ্র-জ্ঞান-ভবন' নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। রাষ্ট্রপতি তথায় বর্তমান জীবনে ধর্মস্থানের অভাব ও নব্য মানুষের দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ অতিথিশালা দর্শনের পর রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাসগৃহাদিও দর্শন করিয়াছিলেন।

গো-পালন ও দুগ্ধ সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে গো-পালন ও দুগ্ধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর ২ দিন কলিকাতার নিকট দমদমে এক সম্মেলন হইয়াছিল। উহাতে বাংলা দেশের বহু স্থানের বহু পল্লী-সেবক সমবেত হইয়াছিলেন। কৃষি-মন্ত্রী ডক্টর আর-আহমদ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। উভয় বক্তাই পশ্চিমবঙ্গে গো-জাতির উন্নয়নের জন্য নানা উপায়ের কথা বিবৃত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়—বাঙ্গালী আর গো-জাতিকে সম্মান করে না—শ্রদ্ধার মনোভাব লইয়া গো-পালন করে না—সে জন্য তাহার স্বাস্থ্য ও শ্রী নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি এ বিষয়ে বাঙ্গালীকে অবহিত করা যায়, তবেই জাতিহিসাবে বাঙ্গালী আবার উন্নত হইবে।

মহামণ্ডলে কল্পতরু উৎসব—

গত ১লা জানুয়ারী বিকাল ৩টায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের আন্তর্জাতিক অতিথিশালার প্রাঙ্গণে ঠাকুর

রামকৃষ্ণের স্মরণে 'কল্পতরু উৎসব' হইয়াছিল। ঐ দিন ঠাকুর শিষ্যগণের নিকট কল্পতরু হইয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। সেদিন উৎসবে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন ও পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সেদিন উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল—খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত এক ঘণ্টারও অধিককাল ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে সাবলীল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। ঠাকুর সম্বন্ধে এমন ভাব ও ভক্তিপূর্ণ ভাষণ সচরাচর শুনা যায় না। ঐ দিন উৎসবে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল এবং সভারম্ভের পূর্বে কয়েক সহস্র ভক্তকে প্রসাদে তৃপ্ত করা হইয়াছিল।

কল্পতরু উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবী সম্মিলন—

গত ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডস্থ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবীসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভাষণ দান করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে যাহারা সমাজ সেবার কাজ করিতেছেন, তাহাদের কাজের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দান করাই সমাজসেবী-পরিষদের উদ্দেশ্য। সম্মিলনেও বহু সমাজসেবীকে মানপত্র দান করা হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল মানপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী ডাক্তারের সম্মান—

ডাক্তার শ্রীশৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার রিষড়ার

ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবাসী—১৯৩৫ সালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি পাশ করিয়া তিনি ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮ সাল

পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া এল-এম (রোট) ডি-জি-ও (ডাব) ও এফ-আর-এফ-পি-এস (গ্লাস) উপাধি লাভ করেন। তিনি সম্প্রতি জার্ডিন হেণ্ডার্সন জুট মিল গ্রুপের চিফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা সমাজ-সেবী, বয়স মাত্র ৪২ বৎসর। তাঁহার পূর্বে কোন ভারতীয় এই পদ লাভ করেন নাই।

পরলোকে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

নদীয়া রাণাঘাটনিবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার ও সমাজ-সেবক সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্প্রতি ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গমন করিয়াছেন। সুচিকিৎসক হিসাবে যেমন, সাধারণের কার্য্যে উৎসাহী বলিয়া তেমনই তিনি ঐ অঞ্চলে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত খ্যাতনামা কবি, নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক এবং তৃতীয় ডাঃ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান।

শ্রীআর-জি-মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গের নর্দার্ন ইলেক্‌ট্রিক ডিভিসনের এক-জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার শ্রীআর-জি-মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি লণ্ডনের ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউসনের সম্মানিত সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস্‌সি পাশ করিয়া তিনি লণ্ডনে ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন। বিলাতে তিনি বহু কোম্পানীর অধীনে কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাউন্সিলেরও সদস্য।

পরলোকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়—

বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডনিবাসী হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি এক সময়ে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের সহকারী উকীল ছিলেন ও পরে

হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

কাশিমবাজারের মহারাজার বাহারবন্দের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। হরেন্দ্রবাবু বহু বৎসর তথায় সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁহার ভগিনীপতি।

শ্রীমতিলাল রায়ের জন্মোৎসব—

প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা সাধক ও গঠনকর্মী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের ৭১তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চন্দননগরস্থ প্রবর্তক আশ্রম প্রাঙ্গণে এক বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে উৎসব হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক দানবীর শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান ও শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সভা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রায় মহাশয় তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বাবলম্বী স্বার্থত্যাগী জীবন লইয়া এক প্রকাণ্ড কর্মীর দল রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে দেশ-সেবার গঠনমূলক যে কাজ করিতেছেন, তাহা অসাধারণই বলিতে হয়। প্রবর্তক সংঘের দান জাতির সংগঠনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

পাকিস্তান ঃ ২৫৭ (ইমতিয়াজ ৫৭, হানিফ ৫৬, নাজার ৫৫। ফাদকার ৭২ রানে ৫ এবং রামচাঁদ ২০ রানে ৩ উইকেট) ও **২৩৬** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াকার ৯৭, নজর ৪৭। গুলাম আমেদ ৫৬ রানে ৩, রামচাঁদ ৪৩ রানে ২, মানকড় ৬৮ রানে ২ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ৩৯৭ (সোধন ১১০, ফাদকার ৫৭, মানকড় ৩৫। ফজল ১৪১ রানে ৪, মাহ্‌মুদ হোসেন ১১৪ রানে ৩) ও **২৮** (কোন উইকেট না পড়ে)

ক'লকাতায় রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের ৫ম টেষ্ট ম্যাচ ড্র গেছে। টসে জয়লাভ করেও ভারতবর্ষের অধিনায়ক লালা অমরনাথ প্রথম ব্যাট করার সুযোগ না নিয়ে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। খেলায় তাঁর এ সিদ্ধান্ত পাকিস্তান দলের পক্ষে খেলা ড্র করার অনুকূলে যায়। প্রতিকূল অবস্থা না হ'লে টেষ্ট ম্যাচে টসে জয়লাভ ক'রে কোন দল কখনও তার বিপক্ষ দলকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেয় না। লালা অমরনাথের অধিনায়কত্বে খেলার প্রচলিত রীতিনীতির ব্যতিক্রম দেখলাম। তিনি যদি খেলায় কোন সুযোগ লাভের আশায় এ নীতি গ্রহণ ক'রে থাকেন তাহ'লে তা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলতে হয়। খেলার গোড়ার দিকে পাকিস্তান দলের পতনের যে সম্ভাবনা তিনি অনুমান ক'রে-ছিলেন তা শেষ পর্য্যন্ত হয়নি। পীচ থেকে বোলাররা কোন সাড়া পাননি ; একমাত্র ফাদকার যা বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেছিলেন, গঙ্গার বাতাস থেকে তাও অনেক দেরীতে।

পাকিস্তান দলের অধিনায়ক—হাফিজ কারদার (বাম দিকে) এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক লালা অমরনাথ (ডানদিকে) ছবি—ডি রতন

প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তানের ৫ উইকেট পড়ে

২৩০ রান দাঁড়ায়—খেলায় জয়লাভের পক্ষে মোটেই বেশী রান নয়। দ্বিতীয় দিনে প্রথম একঘণ্টার খেলায় মাত্র ২১ রান উঠে পাকিস্তানের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে যায়। ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসে নির্দ্ধারিত সময়ে পাঁচটা উইকেট পড়ে, রান ওঠে ১৭৩। ঐ দিনের ৫½ ঘণ্টার খেলায় দুই দলের নিয়ে ২০০ রান হয়, ১০ উইকেট পড়ে।

তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২৬৫ রানে ৭টা উইকেট পড়ে যায়। এর পর ফাদকার ও নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় দীপক সোধন খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। ফাদকার ৫৭ রান ক'রে আউট হন আর সোধন, সেন এবং গুলাম আমেদের সঙ্গে জুটি বেঁধে তাঁর নিজস্ব ১১০ রান করেন। ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচ উইকেটে ১৫৭ রান ওঠে এবং শেষের পাঁচ উইকেটে ২৪০ রান যোগ হয়—মোট ৩৯৭ রান। নির্দ্ধারিত সময়ে ১ উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ২য় ইনিংসে রান ওঠে ৩৮।

৪র্থ দিনে অর্থাৎ টেষ্ট খেলার শেষ দিনে পাকিস্তান ২৩৬ রান ক'রে ৭ উইকেটে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়াকার হোসেন মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। লাঞ্চ এবং চা-পানের মাঝখানে খেলার গতি দেখে মনে হয়েছিল খেলার ফলাফল ভারতবর্ষের অনুকূলে যাবে। কারণ ৫টা উইকেট পড়ে পাকিস্তানের তখন ১৪১ রান, ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রান সংখ্যা থেকে মাত্র ১ রানে পাকিস্তান এগিয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের শেষ ৫টা উইকেটে মাত্র ২১ রান উঠেছিল—২য় ইনিংসে যদি শেষ পাঁচটা উইকেটে ৭০।৮০ রান ওঠে এবং ভারতবর্ষ যদি একঘণ্টার মত ব্যাট করতে পায় তাহ'লে জয়লাভের একটা সম্ভাবনা থাকে। ১৫২ রানে আনওয়ার হোসেনের উইকেট পড়ে যাওয়াতে ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ওয়াকার হোসেন এবং ফজল মহম্মদের জুটী ৬৪ রান তুললে সে সম্ভাবনায় মাটি চাপা পড়ে। চা-পানের পর আধঘণ্টা খেলা দেখে দর্শকরা জয়ের আশা ছেড়েই দিলেন। ভারতবর্ষকে ২০ মিনিট খেলার সময় দিয়ে পাকিস্তান ২য় ইনিংস ২৩৬ রানে ডিক্লেয়ার্ড করে। নির্দ্ধারিত সময়ে কোন উইকেট না পড়ে ভারতবর্ষের ২৮ রান হয়। ২য় ইনিংসে রামচাঁদ পাকিস্তান দলের হানিফ এবং ওয়াকার হোসেনকে বোল্ড-আউট ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়াকার হোসেনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ৫ম টেষ্ট খেলায় পাকিস্তানদল পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়। ভারতবর্ষ এই টেষ্ট সিরিজে ২—১ খেলায় জয়ী হয়ে সরকারী টেষ্ট সিরিজে এই সর্ব্বপ্রথম 'রাবার' সম্মান লাভ করল।

সাহিত্য-সংবাদ

যামিনীকান্ত সেন প্রণীত "আর্ট ও আহিতাগ্নি" (২য় সং)—১২৲
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "নিশাচর বাজ"—৪॥০
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দুর্গরহস্য"—৩॥০
শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গানে রামপ্রসাদ"—১৲
স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত "প্রেমানন্দ জীবন চরিত"—৪৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন ও মানসিংহ"—২৲, "মোহন ও প্রেতাত্মা"—২৲
তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত নাটক "ছেঁড়া তার"—২৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "ভীষ্ম" (৪র্থ সং)—২॥০
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "আলিবাবা" (১৫শ সং)—১৲, "আলমগীর" (৭ম সং)—২॥০
নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "[illegible]দেবী" (২০শ সং)—২॥০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" (২য় সং)—৫৲
স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীমা সারদা"—১৲
শ্রীপ্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত "কৃষ্ণের আহ্বান"—।০
ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সুন্দরবনে সাত বৎসর"—৩॥০
শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "মহারাজ"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিল্পী- শচীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ　　চিত্রাঙ্কন　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞানে সেণ্ট-টমাস অ্যাকুইনাসের প্রভাব

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম-এস্‌সি

খৃষ্টীয় যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ও সমগ্র মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দার্শনিক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের আলোচনার যথার্থ স্থান ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে। কিন্তু সে যুগে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। বিজ্ঞান তখন ছিল একান্তই দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানের জীবন স্পন্দিত হইত। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের স্বরূপকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিলেও মোটামুটিভাবে তাহার অধোগতি, অগ্রগতি বা প্রসার প্রচলিত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বীয় মতবাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হইয়াছে। এজন্য মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের প্রভাব বড় সামান্য নহে। নিছক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রোসেটেষ্ট, অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্‌নাস বা রজার বেকনের মত অ্যাকুইনাসের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান না থাকিলেও বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতে তাহার রুচি ছিল এবং এই দুই বিজ্ঞানে তাহার অধিকার বেকনের সমতুল্য না হইলেও তাহার শিক্ষক ও গুরু অ্যাল্‌বার্টাসের অপেক্ষা বেশি ছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে অ্যাকুইনাসের গুরুত্ব অন্য কারণে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরিষ্টটেলীয় দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নূতন জ্ঞান ও উৎসাহ ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে অ্যাকুইনাসের রচনাবলীর মধ্যে। অ্যাকুইনাস আরিষ্টটলের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত। সমগ্র জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর এই অলোকসামান্য গ্রীক মহামনীষী যে চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে অ্যাকুইনাসের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তাঁহার মতে আরিষ্টটলই হইলেন সকল জ্ঞানের উৎস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও দর্শনচর্চার একমাত্র লক্ষ্য হয় খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সহিত আরিষ্টটেলীয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা। অ্যাকুইনাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয় 'Summa Theologica' ও 'Summa Philosophica contra Gentiles' এই সমন্বয় সাধনের অপূর্ব প্রয়াস। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এক দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যজনক বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এবং মূলতঃ এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত খৃষ্টধর্মের আদি-প্রচারকেরা জড়, প্রাণী, মানুষ ও বিশ্ব চরাচর সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানের সন্ধান দিয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে কোন প্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া শুধু প্রজ্ঞার দ্বারা, যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির দ্বারা প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রমুখ প্রাচীন অখৃষ্টীয় গ্রীক দার্শনিকগণ জড়, প্রাণী, মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যে

উপনীত হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারাই হোক, অথবা প্রজ্ঞার দ্বারাই হোক—এই দ্বিবিধ উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সত্যকার কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ থাকা উচিত নয়; কারণ শেষ পর্যন্ত সকল জ্ঞানের উৎসই ভগবান। সুতরাং ধর্মের সহিত দর্শনের সামঞ্জস্যবিধান সর্বতোভাবে সম্ভবপর। অ্যাকুইনাসের পূর্বে এরিগেনা, আনস্লেম প্রমুখ খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ নিও-প্লেটোনিজ্‌মের মরমীবাদের ভিত্তিতে এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ট্রিনিটি বা ত্রিতত্ত্ব ও ভগবানের অবতারবাদের মরমীবাদী ব্যাখ্যায় ইঁহারা যথেষ্ট রচনাচাতুর্য দেখাইয়াছেন। অ্যারিষ্টটল-পন্থী যুক্তিবাদী অ্যাকুইনাস দেখাইলেন, এই সব মৌলিক রহস্যের সমাধান যুক্তি সাপেক্ষ নহে, যদিও যুক্তির সাহায্যে ইহা অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টায় কোন বাধা নাই। তিনি সুকৌশলে এই সকল বিষয় দর্শনের আওতা হইতে পৃথক করিয়া বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত করেন।

অ্যাকুইনাস প্রধানতঃ অ্যারিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র, সিল্‌জিম্‌স্ ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার দর্শনের কাঠামো রচনা করেন। আত্মপ্রত্যয়জাত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চিরন্তন ও অভ্রান্ত সত্য ধরিয়া লইয়া যুক্তি তর্কের দ্বারা অন্যান্য সকল বিষয়ের মীমাংসায় তিনি প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পরিকল্পনায় মানুষই হইল সৃষ্টির কেন্দ্র ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সুতরাং জড়, ইতর, প্রাণী ও বিশ্বচরাচরের অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল; মনুষ্য সৃষ্টিকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই সব শেষোক্ত সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রণিধান করিতে হইবে মানুষের অনুভূতি ও তাহার বিচিত্র মানসিক জটিলতার মাধ্যমে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভূকেন্দ্রীয় বিশ্ব পরিকল্পনা অপরিহার্য। সৃষ্টির কেন্দ্রই যখন মানুষ তখন তাহার আবাসভূমি পৃথিবী অকাট্য যুক্তিতে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থল হইতে বাধ্য। এইভাবে ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ পরিকল্পনা টমিষ্ট দর্শনের (সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদকে 'টমিজ্‌ম্', বা 'টমিষ্ট' দর্শন বলা হয়) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, অ্যাকুইনাস নিজে টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ সমর্থন করিয়াছিলেন কার্যকরী একটি মতবাদ হিসাবে মাত্র—"non est demonstratio sed suppositio quaedam" তাঁহাকে এই সম্বন্ধে সাবধানে মতামত ব্যক্ত করিতে দেখা যায়।* টমিজ্‌মের সহিত ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইবার দায়িত্ব অ্যাকুইনাসের শিষ্যবর্গের।

অ্যাকুইনাস অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে পুরোপুরি গ্রহণ করিয়াও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহার সহিত আপোষ রফা করিতে পারেন নাই। অ্যারিষ্টটলের মতে বিশ্ব ও বস্তুজগৎ নিত্য ও শাশ্বত, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। তারপর আত্মা ও দেহ একই বস্তু; সুতরাং দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসারে কালচক্রে বস্তু ও বিশ্বজগতের একদা সৃষ্টি হইয়াছিল; বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করিতে গেলে সৃষ্টি পরিকল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। আত্মার নশ্বরত্ব সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের মতবাদ অ্যাকুইনাসকে আরও বেশি বিব্রত করে। ইহা খৃষ্টীয় বিশ্বাস ও মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অ্যারিষ্টটল শিক্ষা দেন যে, আত্মা ও দেহ একই বস্তু হইতে উদ্ভূত এবং আত্মা দেহবস্তুর আকৃতি বিশেষ (form)! মৃত্যুতে বস্তু ও তাহার আকৃতির বিনাশপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিরও চিরকালের জন্য বিনাশ ঘটে।

অ্যাকুইনাসের পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ইবন্ রুস্‌দ্ বা আভেরস্ (১১২৬—১১৯৮) অ্যারিষ্টটলের এইরূপ দার্শনিক মতবাদ সমর্থন করিয়া বস্তুর নিত্যতা ও ব্যক্তিগত আত্মার নশ্বরতা প্রচার করেন। তাঁহার মতে বস্তু নিত্য এবং সৃষ্টিবাদ সর্বৈব মিথ্যা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সুসংবদ্ধ নীতি ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। ইহার একটী নীতি হইল সক্রিয় বুদ্ধি (Active Intelligence)। এই বুদ্ধি মানুষের সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে ক্রমাগতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে অবিনশ্বর। মানুষের আত্মা এই সক্রিয় বুদ্ধির বা চেতনার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; সাময়িকভাবে মূল উৎস হইতে এই বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া জড়দেহকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলে; মৃত্যুতে এই চেতনা আবার মূল উৎসে আসিয়া মিলিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে আত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নাই বা অমরত্ব নাই। জীবিতাবস্থায় ইহার যে সব অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে, দেহান্তরের পর এইরূপ কোন অভিজ্ঞতা আত্মার থাকা অসম্ভব। ইহা তখন সর্বপ্রকার স্মৃতি বা অনুভূতির বহির্ভূত। এইরূপ অবস্থায় আত্মার পুরস্কার বা শাস্তির প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিষ্টটলপন্থী আভেরসের সুচিন্তিত ও যুক্তিবাদী দর্শন খৃষ্টান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের রীতিমত শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজে আভেরসের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মাইকেল স্কট টলেডো হইতে আভেরসের গ্রন্থাবলীর তর্জমা সিসিলিতে আনিবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার ও সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের চেষ্টায় আভেরসের দর্শন ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গোঁড়া অধিনায়করা ইহাতে যে শঙ্কিত হইয়া উঠিবে তাহা বলা বাহুল্য এবং আভেরইজ্‌মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে খৃষ্টানরাও চেষ্টার কসুর করে নাই। ১২১০ খৃঃ অব্দে প্যারীতে ধর্মযাজকদের এক প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধিবেশনে আভেরইজ্‌মের চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়; ১২১৫ খৃঃ অব্দে এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে তাহার অধিবিদ্যা (metaphysics) সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির উপর প্রযুক্ত হয় এবং ১২৩১ খৃঃ অব্দে স্বয়ং পোপের নির্দেশে আভেরসের গ্রন্থপাঠ সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু বলপ্রয়োগে কোন দার্শনিক মতবাদের প্রচার বন্ধ করা এক জিনিষ এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া সেই মতবাদের প্রচার আপনা হইতেই সঙ্কুচিত করা আর এক জিনিষ। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা সর্বদাই দুর্বল; শেষোক্তটি সম্ভবপর না হওয়া পর্যন্ত চিরস্থায়ী ফললাভের আশা বৃথা। এই কারণেই সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস্ কোমর বাঁধিয়া আভেরইজ্‌মের

* A History of Science—William Cecil Dampier. পৃঃ ৮৮।

বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আভেরস অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁহার দর্শনের বুনিয়াদ গড়িয়াছিলেন। অ্যাকুইনাসও ঠিক সেই পন্থাই অবলম্বন করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্যক্তিগত আত্মার অবিনশ্বরত্ববাদ অটুট রাখিয়া তিনি অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা মতবাদের সহিত খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মূল উপদেশ ও ধারণার সঙ্গতি বজায় রাখিলেন। সুতরাং যুক্তিতর্কের বিচারে খৃষ্টানদের পক্ষে আভেরইজম্‌কে ঠেকানো এখন অনেক সহজ হইল। কোন কোন উৎসাহী টমিষ্ট দার্শনিক এ কথাও বলিয়াছেন যে, অ্যাকুইনাস এইভাবে আভেরইজ্‌মকে নিরস্ত্র করিয়া খৃষ্টধর্মকে মুসলিম পাণ্ডিত্যের নিকট নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন।

প্রথম প্রথম খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে টমিজ্‌ম্‌-বিরোধী পণ্ডিতদের অবশ্য অভাব ছিল না। অ্যারিষ্টটলের উপর গুরুত্ব আরোপই ছিল এই সব পণ্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান কারণ। অ্যাকুইনাসের জীবিত-কালেই প্যারীর বিশপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি অনুসারে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মতবাদের বিরাট সম্ভাবনার কথা প্রধানরা বুঝিতে পারে এবং ধর্মতত্ত্বের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় তাঁহার প্রচেষ্টা সত্যই যে অতুলনীয়, সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে আরম্ভ করে। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে ট্রেণ্টে বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের এক অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে বেদীর উপর পবিত্র বাইবেলের পাশে "Summa Theologica"র একটি প্রতিলিপি সংরক্ষিত হয়। পোপ পঞ্চম পায়াস্‌ (১৫৬৬-৭২) অ্যাকুইনাসকে সমগ্র খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার পঞ্চম শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে অভিহিত করেন—অপর চারিজন হইলেন অ্যাম্ব্রোজ, অগাস্টিন, জেরোম ও গ্রেগরি।

অ্যাকুইনাসের দার্শনিক প্রতিভার স্পর্শে খৃষ্টধর্ম উপকৃত হইলেও বিজ্ঞান তাঁহার প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়। যুক্তিবাদের দ্বারা সুনিপুণভাবে টমিষ্ট দার্শনিকেরা বিজ্ঞানকে এমন কঠিনভাবেই বাঁধিয়া ফেলিলেন যে, তাহার আর নড়িবার চড়িবার উপায় বা পৃথক সত্তা বলিয়া কিছু রহিল না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, অ্যারিষ্টটলীয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধতা করিবার অর্থ-ই হইল সমগ্র খৃষ্টীয় দর্শনের ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা করা। বিজ্ঞানীর পক্ষে, প্রকৃত সত্য-সন্ধানীর পক্ষে ইহা বড় অস্বস্তিকর অবস্থা। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া এই কাঠামোর অভ্রান্তত্ব সম্বন্ধে নানা বিতর্কের ও সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কায় পণ্ডিতরা প্রথম হইতেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধতায় যত্নবান হইলেন। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির বশবর্তী; প্রাচীন-কালের মণীষী, দার্শনিক ও সর্বোপরি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া সংঘটিত ঘটনাপরম্পরার বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা এই নিয়ম ও নীতিগুলির স্বরূপ সর্বকালের জন্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; বিজ্ঞানের রাজ্যে ইহার পর যাহা ঘটিবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির সহিত সংহতি রক্ষা করিবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সহিত একান্তভাবে খাপ খাইবে। বিজ্ঞানে নূতন তথ্য আবিষ্কারের যে সম্ভাবনা নাই তাহা নহে; তবে এই সব আবিষ্কারের উদ্দেশ্যই হইবে পূর্বোক্ত শাশ্বত ও অভ্রান্ত নীতিগুলির নূতন সমর্থন জোগান ও নূতনভাবে তাহাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা। এই বিশ্বাস লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইলে বিজ্ঞানীর সকল প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র এবং পদে পদে তাহাকে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বরণ করিতে হইবে। এ, এন, হোয়াইটহেড তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "Science & the Modern World"-এ এ-বিষয়ে লিখিয়াছেন, "—Every detailed occurrence can be co-related with its antecedents in a perfectly definite manner, exemplifying general principles. Without this belief the incredible labours of scientists would be without hope." এইরূপ আপোষহীন পণ্ডিতীয় মনোভাবের প্রধান উদ্গাতা সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস খৃষ্টীয় ধর্মদর্শনের বুনিয়াদ যত পাকা করিয়াই গড়িয়া থাকুন না কেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ সঙ্কুচিত করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করিলেন। প্রায় দুই শত বৎসর এই পণ্ডিতীয় মনোভাবের জগদ্দল পাষাণ ভারে বিজ্ঞানের আর কোন নূতন বাকস্ফূর্তি হইল না। এই আবহাওয়ায় রজার বেকনের সুর বেসুরে বাজিয়াছিল এবং তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে উপহাসের পাত্র হইতে ও কর্তৃপক্ষের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেতসকুঞ্জ

পূর্ণ দুগ্ধপাত্র লইয়া রঙ্গনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, আকাশে শুক্লা নবমীর চন্দ্র কিরণজাল প্রস্ফুটিত করিয়া সূর্যের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশ বনের মধ্যে আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা।

রঙ্গনা দুগ্ধপাত্র মানবের সম্মুখে ধরিল; মানব দুই হাতে পাত্র লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার কাণায় ওষ্ঠ-সংযোগ করিল। পাত্রটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, একটা ছোট খাটো কলসী বলা চলে। মানব এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া রঙ্গনাকে ফিরাইয়া দিল।

রঙ্গনা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল—'আর কিছু খাবে?'

মানব হাসিয়া বলিল—'ক্ষুধার কি শেষ আছে? কিন্তু যাক, আপাতত এই যথেষ্ট। তোমাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব?'

মানব হাত ধরিয়া রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইল। রঙ্গনার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল। মানব গাঢ় স্বরে বলিল—'আমার আজ কিছু নেই, আমি পলাতক। দু'দিন আগে যদি তোমার দেখা পেতাম, প্রাণভরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতাম।'

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, অধোমুখে রহিল। মুগ্ধা পল্লীযুবতী নাগরিক সভ্য-সৌজন্য কোথায় শিখিবে? কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ নীরবতা মানবের বড় মিষ্ট লাগিল। সে ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে রঙ্গনাকে বাক-চাতুর্যে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিল না। বরং একটি সমধর্মী মানুষ পাইয়া তাহার অন্তরের সরলতা যেন সাগ্রহে বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে বৃক্ষশাখায় হেলান দিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতে লাগিল। মানব অধিকাংশ কথা বলিল, রঙ্গনা তন্ময় হইয়া শুনিল। মানব যে-যে প্রশ্ন করিল, রঙ্গনা সরলভাবে তাহার উত্তর দিল।

এইভাবে এক দণ্ড অতীত হইবার পর মানব চকিত হইয়া বলিল—'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, তুমি গৃহে যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব।'

রঙ্গনা আঙ্গুলে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতে লাগিল।

'তুমি আমাদের কুটীরে চল না কেন? রাত্রে সেখানেই থাকবে।'

মানব একটু ইতস্তত করিয়া শেষে মাথা নাড়িল।

'না। আমার পিছনে শত্রু আসছে, হয়তো আজ রাত্রেই গ্রামে এসে পৌঁছবে। আমি গ্রামে থাকলে ধরা পড়বার ভয় আছে।'

রঙ্গনা তর্জনী দংশন করিল, তারপর চকিত উৎফুল্ল চক্ষু তুলিল।

'তুমি আমার কুঞ্জে থাকবে? আমার কুঞ্জের কথা কেউ জানেনা।'

'তোমার কুঞ্জ!'

রঙ্গনা তাহার নিভৃত বেতসকুঞ্জের কথা বলিল। শুনিয়া মানব বলিল—'এ ভাল। চল তোমার কুঞ্জে রাত কাটাব।'

রঙ্গনা মানবকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পলাশ বনের বাহিরে অনিমেষ জ্যোৎস্না; দুজনে মৌরীর তীরে উপস্থিত হইল। মানব বলিল—'এ কি, এ যে নদী! আমি স্নান করব। কিন্তু আগে তোমার কুঞ্জ দেখি।'

কুঞ্জ দেখিয়া মানব দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

'কি সুন্দর তোমাদের জীবন! কেন আমরা নগরে থাকি, রাজ্যের জন্য কাড়াকাড়ি করি? মানুষের যত অনিষ্টের মূল নাগরিক জীবন। ইচ্ছা করে চিরদিন তোমার এই কুঞ্জে কাটাই।'

অস্ফুটস্বরে রঙ্গনা বলিল—'কাটাও না কেন ?'

মানব বলিল—'উপায় নেই, কর্মফল ভোগ করতে হবে।—কিন্তু আবার আমি আসব। তোমাকে ভুলতে পারব না।'

রঙ্গনাও বলিতে চাহিল, আমিও তোমাকে ভুলতে পারব না'—কিন্তু লজ্জায় তাহা বলিতে পারিল না। বলিল—'তোমার কপাল কেটে গেছে—লাগছে না ? এস, বেঁধে দিই।'

মানব বলিল—'ও কিছু নয়, তলোয়ারের আঁচড় লেগেছিল। আপনি সেরে যাবে।'

'তবে তুমি স্নান করে এস।'

'তুমি চলে যাবে না ?'

'না।'

মানব অল্পকাল মধ্যেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল; বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণ কুঞ্জের বাহিরে নামাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে রঙ্গনা কুঞ্জতলে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, কুঞ্জদ্বারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মানব চারিদিকে চাহিল। আকাশে জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে; সুদূর-প্রসারিত বেতস-বনের শাখাপত্র মৃদু মর্মর-ধ্বনি করিয়া কাঁপিতেছে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। মানবের মনে হইল, ইহজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কোন্ এক অর্ধ-বাস্তব মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছে। এখানে আর কেহ নাই, শুধু সে আর রঙ্গনা।

মানব রঙ্গনার হাত ধরিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিল—'রঙ্গনা— !'

'কি বলছ ?'

'না, কিছু না—' মানব নিশ্বাস ফেলিল—'তুমি এবার ঘরে যাও। কাল সকালে একবার তোমার দেখা পাব কি ?'

রঙ্গনা বলিল—'আজ রাত্রেই আমি আবার আসব।—তোমার খাবার নিয়ে আসব।'

সহসা রঙ্গনার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া মানব নত হইয়া তাহার চোখের মধ্যে চাহিল—

'রঙ্গনা, তুমি আমার বৌ হবে ?'

রঙ্গনা তাহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

* * * *

গ্রামের কুটীরগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে; দিনের মাতামাতির পর গ্রামবাসীরা ক্লান্তদেহে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। কেবল গোপা আপন কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠা-ভরা চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার উৎকণ্ঠা ক্রমে আশঙ্কায় পরিণত হইতেছিল, এমন সময় রঙ্গনা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; গোপা কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই একবার 'মা—' বলিয়া ডাকিয়া মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের মধ্যে মুখ লুকাইল।

গোপা অনুভব করিল রঙ্গনার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে রঙ্গনাকে লইয়া মেঝেয় বসিল। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে; উনানের উপর ভাত চড়ানো রহিয়াছে। গোপা কন্যার চিবুক ধরিয়া মুখ দেখিল, তারপর বলিল—'এবার বল কি হয়েছে।'

রঙ্গনা কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মুখ নীচু করিয়া ভয়-ভঙ্গুর হাসিতে লাগিল। গোপা তখন একটি একটি প্রশ্ন করিয়া সব কথা বুঝিয়া লইল।

সব শুনিয়া গোপা কিছুক্ষণ বিভ্রান্তভাবে উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কী করিবে সে এখন ? এমন অচিন্তনীয় অবস্থা যে কল্পনা করাও যায়না। চাতক ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিবে ? কিন্তু তিনি যদি বাধা দেন ! রাজপুত্র যদি আসিল, এমনভাবে আসিল ?

ভাবিতে ভাবিতে গোপা যন্ত্রবৎ বলিল—'রাঙা, দ্যাখ্ ভাত হল কিনা।'

রঙ্গনা উঠিয়া গেল। গোপা মৃন্ময় মূর্তির মত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাহিরে সে নিশ্চল, কিন্তু ভিতরে যেন আগ্নেয়গিরির আন্দোলন চলিতেছে।

রঙ্গনা ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেন গালিল।

সহসা গোপা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না না, সময় নাই, অধিক চিন্তা করিবার সময় নাই। রঙ্গনার জীবনে যে শুভলগ্ন আসিয়াছে তাহা ভ্রষ্ট হইয়া না যায়। আজিকার রাত্রি আর ফিরিয়া আসিবে না, রাজপুত্র চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না—

ঘরের কোণে একটি পুরাতন বেত্রনির্মিত পেটরা ছিল। গোপা তাহার তলদেশ হইতে দুইটি শোলার মালা বাহির করিল। তুচ্ছ শোলার টুক্‌রা দিয়া গাঁথা দুটি মালা;

গোপার নিভিয়া যাওয়া যৌবনের স্মৃতি। এক রাত্রির স্মৃতি। গোপার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। কিন্তু সময় নাই; স্মৃতির মালা গলায় পরিয়া কাঁদিবার সময় নাই। আর একটি অভাবনীয় রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। হয়তো আজিকার রাত্রি উনিশ বছর আগের আর একটি রাত্রির সমাবর্তন তিথি—কালচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে!

গোপা রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কানে কানে দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে উপদেশ দিতে লাগিল; যে-সকল কথা মেয়েকে আজ পর্যন্ত বলে নাই তাহা বলিল। লজ্জা করিল না, লজ্জার সময় কৈ? তারপর ছুটিয়া গিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

দুপুরের রান্না মৌরলা মাছ ছিল। তপ্ত ভাতে ঘি ঢালিয়া গোপা পাত্র রঙ্গনার হাতে দিল। রঙ্গনার মণিবন্ধ হইতে শোলার মালা দুটি ঝুলিতেছে; সে দুই হাতে আহার্যের পাত্র লইয়া চুপিচুপি কুটীর হইতে বাহির হইল।—

বিচিত্র অভিসার যাত্রা। কাব্যে পুরাণে এরূপ অভিসারের কথা লেখেনা। কিন্তু ইহাই হয়তো সত্যকার অভিসার।

* * * *

বেতসকুঞ্জে তৃণশয্যায় মানব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর চাঁদ বেতসকুঞ্জের বিরলপত্র শীর্ষ হইতে ভিতরে উঁকি দিতেছিল। মানবের ঘুমন্ত মুখও প্রশস্ত নগ্ন বক্ষের উপর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহার বাহুতে সোনার অঙ্গদের উপর ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

রঙ্গনা নিঃশব্দে কুঞ্জে প্রবেশ করিল, মানবের পাশে বসিয়া তাহার জ্যোৎস্না-নিষিক্ত সুপ্ত মুখ দেখিতে লাগিল। রাজপুত্র—আমার রাজপুত্র! রঙ্গনার বুকের মধ্যে শোণিত-নৃত্যের উন্মাদনা, রোমে রোমে হর্ষোল্লাস; মাথার কবরী আপনি শিথিল হইয়া পিঠের উপর এলাইয়া পড়িল। সে সন্তর্পণে অতি লঘুভাবে একটি আতপ্ত করতল মানবের বুকের উপর রাখিল।

মানব চমকিয়া উঠিয়া বসিল। রঙ্গনাকে দেখিয়া তাহার মুখে একটি তন্দ্রামুগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকে টানিয়া লইয়া জড়িত স্বরে বলিল—'আমার বৌ!'

চক্ষু মুদিয়া রঙ্গনা নিস্পন্দ হইয়া রহিল; বিপুল রভস-রসের প্লাবনে তাহার সম্বিৎ ডুবিয়া গেল। লজ্জার বাহ্য-বিভ্রম-বিলাস সে শেখে নাই, শিথিলদেহে অনুভব করিল মানব তাহার অধরে চুম্বন করিতেছে। আতপ-তাপিতা ধরণী যেমন ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বৃষ্টির চুম্বন গ্রহণ করে তেমনিভাবে রঙ্গনা মানবের চুম্বন গ্রহণ করিল।

মানব চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্‌গদ কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ক্রমে রঙ্গনার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল; সহজ অশিক্ষিত লজ্জাও জাগরূক হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'ছেড়ে দাও।'

মানব বলিল—'না, ছাড়ব না। তুমি আমার বৌ।'

বৌ! রঙ্গনার মনে পড়িল, মা শিখাইয়া দিয়াছিল কি কি বলিতে হইবে। সে চোখ খুলিয়া মানবের মুখের পানে চাহিল। মানবের মুখ দেখিয়া আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু না, মা বলিয়া দিয়াছে, কথাগুলা বলিতেই হইবে।

রঙ্গনা চুপিচুপি বলিল—'তোমার তো আরও বৌ আছে।'

মানব রঙ্গনাকে ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর চক্ষে তাহার পানে চাহিল। শেষে বলিল—'আছে। কিন্তু তারা আমার রাণী, মনের মানুষ নয়।'

'মনের মানুষ কে?'

'তুমি। তোমাকেই এতদিন খুঁজেছি, পাইনি।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'না। এখন কোথায় নিয়ে যাব? যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি, ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। শপথ করছি।'

অতঃপর রঙ্গনার শেখানো বুলি ফুরাইয়া গেল। মা আরও অনেক কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর সে মনে করিতে পারিল না। কি হইবে মনে করিয়া? তাহার রাজপুত্র ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যাকুল অনুরাগে রঙ্গনার নিশ্বাস দ্রুত বহিল। সে কম্পিতহস্তে একটি শোলার মালা রাজপুত্রের গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য মালাটি মানব রঙ্গনার গলায় দিল।—

মোহ-বিহ্বল রাত্রি; নব-অনুভবের বিস্ময়-পুলক-ভরা

বাসক রজনী। দুজনে দু'জনের মুখে অন্ন দিল, চুম্বন দিল। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। একসঙ্গে আকুলতা ও চটুলতা; লজ্জা ও প্রগল্‌ভতা। তন্দ্রা ও প্রমীলার মেশামেশি, ঘুমে জাগরণে জড়াজড়ি।

রাত্রি নিবিড় হইল। চাঁদ অস্ত গেল।

* * *

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া মানব ও রঙ্গনা কুঞ্জের বাহিরে আসিল। পূর্বাকাশে উষা ঝলমল করিতেছে। পাখী ডাকিতেছে।

মানব দেখিল অদূরে নদীতীরে তাহার অশ্ব শষ্পাহরণ করিতেছে; তাহার পৃষ্ঠে কম্বলাসন, মুখে বল্গা যেমন ছিল তেমনি আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া জয়ন্ত মৃদু হ্রেষাধ্বনি করিল।

মানব ম্লান হাসিয়া বলিল—'আমার বাহনও উপস্থিত। তবে যাই, রাঙা-বৌ।'

রঙ্গনা তাহার বাহু জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'কবে ফিরে আসবে?'

মানব রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইল, মুখে মুখ রাখিয়া বলিল—'যেদিন শত্রুকে রাজ্য থেকে দূর করব, সেদিন তোমাকে নিতে আসব। যদি রাজ্য যায় আর বেঁচে থাকি, তাহলেও তোমার কাছে ফিরে আসব।'

কণ্ঠলগ্না রঙ্গনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আসবে?'

'আসব। শপথ করছি।'

রঙ্গনাকে নামাইয়া দিয়া মানব নিজ বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া তাহার বাহুতে পরাইয়া দিল, বলিল—'এই অঙ্গদ নাও। যতদিন না ফিরে আসি, এটিকে দেখো; আমায় মনে পড়বে।'

তারপর রঙ্গনার সোনাপোকা উড়িয়া গেল। জয়ন্তের পৃষ্ঠে চড়িয়া মানব চলিয়া গেল। রঙ্গনা অশ্রুবিধৌত মুখে দাঁড়াইয়া বিলীয়মান অশ্বারোহীর পথের পানে চাহিয়া রহিল, মানবের বৃহৎ অঙ্গদ তাহার বাহু হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা খুলিয়া একবার বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর আঁচলে বাঁধিয়া ঘরের দিকে চলিল।

নিশান্তের পাণ্ডুর চন্দ্রমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গসন্তান

দিবা অনুমান এক প্রহর সময়ে ইক্ষুযন্ত্রে আখ মাড়াই কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একদল সৈন্য হুম্ হুম্ শব্দ করিয়া বেতসগ্রামে ঢুকিয়া পড়িল। গ্রামের পুরুষেরা ভয় পাইল বটে, কিন্তু পলায়ন করিল না। যুবতী মেয়েরা কতক আখের ক্ষেতে, কতক বেতসবনে লুকাইল। গত ত্রিশ বছর ধরিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে তাহাতে শত্রুসৈন্য একবারও গৌড়ের মাটিতে পদার্পণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নানা লোকের মুখে নানা লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীদের মনে বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদলের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাপূর্ণ ধারণা জন্মিয়াছিল।

সৈন্যদল কিন্তু সংখ্যায় বেশী নয়; মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন পদাতিক, হাতে ঢাল সড়্‌কি। ইহারা ভাস্করবর্মার দলের সৈন্য। গতকল্য যুদ্ধ জিতিয়া ভাস্করবর্মা সদলবলে কর্ণ-সুবর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহারা সেই বিশাল বাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন প্রশাখা।

সৈন্যদল প্রথমেই জানিতে চাহিল, গৌড়ের রাজা বা তৎস্থানীয় কেহ গ্রামে লুকাইয়া আছে কিনা। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলিল, রাজা-গজা কেহ এখানে নাই। অনুসন্ধান করিবার ছুতায় কিছু লুঠপাট করিবার ইচ্ছা সৈনিকদের ছিল; কিন্তু তাহারা দলে ভারী নয়। গ্রামবাসীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ তো বটেই, উপরন্তু বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট। সৈনিকদের অস্ত্র আছে সত্য, কিন্তু অমন দুই চারিটা শড়্‌কি বল্লম গ্রামেও আছে। সুতরাং তাহারা কোনও প্রকার উপদ্রব করিতে সাহস করিল না, প্রত্যেকে একটি একটি ইক্ষুদণ্ড লইয়া চিবাইতে চিবাইতে প্রস্থান করিল।

সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর গুড়নির্মাণ কার্য স্বভাবতই শ্লথ হইয়া পড়িল। সকলে জটলা করিয়া জল্পনা করিতে লাগিল; কোথায় যুদ্ধ হইয়াছে? ইহারা কোন্ রাজার সৈন্য? বাহিরের শত্রু ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখন আত্মরক্ষার উপায় কি? গৌড়ের রাজা কি রাজ্য ছাড়িয়া পলাতক?

মধ্যাহ্নকালে গোপা অলক্ষিতে দেবস্থানে গেল। কুটীর

র বাহিরে নির্জন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেবস্থান, পাশেই ক ঠাকুরের একচালা। গোপা দেখিল, ঠাকুর অশ্বত্থ র একটি উদ্‌গত শিকড়ে মাথা রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখে শয়ান াছেন, তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

গোপা আসিলে চাতক ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। দুই া অন্য কথার পর গোপা গত রাত্রির ঘটনা বলিল।

চাতক ঠাকুর অবহিত হইয়া শুনিলেন। গোপা নীরব া তিনি একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ক্ষ করিলেন। গোপা তাঁহার চোখের প্রশ্ন বুঝিয়া র সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

ঠাকুর তখন দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'একথা া রাখা চলবে না। গাঁয়ের সকলকে জানিয়ে দেওয়া ।'

গোপা বুঝিল, ঠাকুর কী ভাবিয়া এ কথা বলিলেন। লিল—'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

ঠাকুর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আমি যা দেখেছিলাম মিথ্যে নয়। কিন্তু ভেবেছিলাম একরকম, হল আর কম। যাক, যা হবার তাই হয়েছে। সব তো মনের হয় না গোপা-বৌ। হয়তো ভালই হবে, রাঙার ঠুর ফিরে আসবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ঠাকুর?'

'আমার মন বলছে, বড় দুঃসময় আসছে। শুধু তোমার র নয়; আমরা তো খড়-কুটো। সারা দেশের য়। ঝড় উঠেছে; রাজার সিংহাসন ভেঙে পড়বে, রের চূড়া খসে পড়বে। সব ওলট-পালট হয়ে যাবে—'

ভীত হইয়া গোপা বলিল—'দীনদুঃখীদের কি হবে র?'

ঠাকুর বলিলেন—'যদি কেউ রক্ষে পায়, দীনদুঃখীরাই । জানো গোপা-বৌ, যখন কালবোশেখী আসে তালগাছ শালগাছ ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু বেতস লতার ারা নুয়ে পড়ে তারা বেঁচে যায়।'—

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধ মহত্তর মহাশয়ের -মণ্ডপে পাটি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের শ্মিক সৈন্য-সমাগমের আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। আলাপ াচনা চলিতে লাগিল।—আজ শশাঙ্কদেব বাঁচিয়া নাই, তাই শত্রুর এত সাহস।…মানব কি সত্যই যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিয়াছে?…কোথায় লুকাইয়া আছে?—

চাতক ঠাকুর একটু কাশিয়া বলিলেন—'মানবদেব কাল রাত্রে আমাদের গ্রামেই লুকিয়েছিলেন।'

সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে চাতক ঠাকুর সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন—'কাল রাত্রে রাঙার সঙ্গে মানবদেবের বিয়ে হয়েছে। আজ ভোরে তিনি কানসোনায় ফিরে গেছেন।'

আবার তুমুল তর্ক উঠিল। চাতক ঠাকুর স্মিতমুখে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন-'তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে ঠাকুর? রাজা রাঙাকে বিয়ে করেছে তুমি চোখে দেখেছ?'

চাতক ঠাকুর শান্তস্বরে একটি মিথ্যা কথা বলিলেন—'আমিই বিয়ে দিয়েছি।'

সেরাত্রে দেবস্থানে ফিরিবার পথে ঠাকুর গোপাকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন—'গোপা-বৌ, রাঙার সিঁথেয় সিঁদুর দিও। আর যদি কেউ জানতে চায়, বোলো আমি রাঙার বিয়ে দিয়েছি।'

রঙ্গনা সীমন্তে সিন্দুর পরিল। যেন সোনার কমলে রক্ত-চন্দনের ছিটা। রঙ্গনাকে কেন্দ্র করিয়া সারা গ্রামে উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্ত বহিয়া গেল। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি রঙ্গনার দিকে, সকলের চটুল রসনায় রঙ্গনার কথা। কিন্তু রঙ্গনার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বরং গোপা গ্রামীণ-গ্রামীণাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল দেখিয়া গর্বিত অবজ্ঞায় ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূকুটি করে; কিন্তু রঙ্গনার গর্বও নাই, অভিমানও নাই। সে তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় নদীতে স্নান করিতে যায়; অন্য মেয়েদের কৌতুক-কানাকানি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু অন্তর স্পর্শ করে না। তাহার সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রকৃতি যেন গ্রামের পরিবেশ ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, জড় দেহটাই পিছনে পড়িয়া আছে।

একটি একটি করিয়া দিন কাটে, পক্ষ কাটে, মাস কাটিয়া যায়। হেমন্ত গিয়া হিম আসে, হিমের শেষে বসন্ত। রঙ্গনা নিজ দেহের অভ্যন্তরে নূতন জীবনের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করে। তাহার দেহ-মন ভরিয়া বিপুল

হৃদয়াবেগ উথলিয়া উঠে। সে চুপি চুপি মানবের অঙ্গদটি পেটরা হইতে বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

কিন্তু মানব ফিরিয়া আসে না; তাহার কোনও সংবাদও নাই। বহির্জগতের সহিত বেতসগ্রামের যোগাযোগ অতি অল্প; সেই যে একদল শত্রু-সৈন্য আসিয়াছিল, তার পর বাহির হইতে আর কেহ আসে নাই। গ্রামিকেরা কেহ কেহ কদাচ বাহিরে গিয়া কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে। সে সংবাদও পাকা খবর নয়, জনশ্রুতি মাত্র। কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত যাইবার সাহস কাহারও নাই; সেখানে নাকি মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, রক্তের স্রোত বহিতেছে। কোন এক ভাস্করবর্মা নাকি গৌড়দেশ গ্রাস করিয়াছে। মানবদেবের কথা কেহ জানে না; সে মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে তাহাও অজ্ঞাত।

এ সকল কথা রঙ্গনার কানে পৌছায় না; কে পৌছাইবে? চাতক ঠাকুর জানেন, কিন্তু তিনি নীরব থাকেন। মাঝে মাঝে গোপা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়, ঠাকুর তাঁহার প্রশ্ন এড়াইয়া যান। গোপার বুক দমিয়া যায়। কিন্তু সে নিজের আশঙ্কার কথা রঙ্গনাকে বলেনা, আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে।

রঙ্গনা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বেতসকুঞ্জে গিয়া শুইয়া থাকে। স্বপ্নালসার কল্পনায় নানা ক্রীড়া চলিতে থাকে। সে কল্পনায় শুনিতে পায়, বহু দূর হইতে জয়ন্তের ক্ষুরধ্বনি আসিতেছে··· শাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘকান্তি আরোহী···দূর্বা-হরিৎ প্রান্তরের উপর দিয়া অশ্বের মৃদু ক্ষুরধ্বনি ক্রমে কাছে আসিতেছে··· ঐ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া থামিল!—রঙ্গনা চমকিয়া উঠিয়া বসে; বেতস-শাখার ফাঁক বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করে; আবার নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করে।

বেতসকুঞ্জে মন যখন বড় অধীর হয় তখন রঙ্গনা মৌরীর কিনারা ধরিয়া দক্ষিণদিকে যায়। দক্ষিণে গ্রামের সীমান্তে একটি বৃদ্ধ জটিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ঘন-শীতল ছায়াতলে বসিয়া অপলক নেত্রে দূরের পানে চাহিয়া থাকে—দূরে মাঠের শেষে বন আরম্ভ হইয়াছে; বনের শেষে নাকি আবার মাঠ আছে, তারপর কর্ণসুবর্ণ নগর। কত বিস্তীর্ণা এই পৃথিবী! এই পৃথিবীর অন্য প্রান্ত হইতে একটি মানুষ কি আসিবে? কিন্তু সে যে আসিবে বলিয়া গিয়াছিল! কেন আসিবে না? কবে আসিবে?

এই ভাবে বসন্তও ফুরাইয়া গেল। রঙ্গনা যখন প্রায় পূর্ণগর্ভা তখন একটি ঘটনা ঘটিল; রঙ্গনার জীবনের যাহা দৃঢ়তম অবলম্বন ছিল তাহা হঠাৎ খসিয়া গেল।

গোপা একদিন অপরাহ্ণে শিকড়-বাকড়ের অন্বেষণে গ্রামের বাহিরে মাঠের দিকে গিয়াছিল। মাঠে এক বেদিয়া রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বেদিয়ারা সাপ ধরে, যত্রতত্র সাপের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়, জাঙ্গলিক বিষবৈদ্যদের কাছে সাপের বিষ বিক্রয় করে; আবার তুক-তাক মন্ত্রৌষধি জানে, গুপ্তচরের কাজও করে। বেদেনীর সহিত গোপার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। কি কথা হইল তাহা কেহ জানিল না। সন্ধ্যার সময় গোপা কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

রঙ্গনা লক্ষ্য করিল না, তাহার মায়ের মুখ কালীবর্ণ, হাত-পা কাঁপিতেছে। গোপা আহার না করিয়াই শুইয়া পড়িল। স্বভাবতই সে আজকাল কম কথা বলে, আজ একটিও কথা বলিল না।

গভীর রাত্রে গোপার ত্রাস দিয়া জ্বর আসিল। প্রচণ্ড তাপ, গা পুড়িয়া যাইতেছে, চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এই মরণান্তক জ্বর আর নামিল না। দুইদিন অঘোর অচৈতন্য থাকিবার পর গোপার প্রাণবিয়োগ হইল। মরণের পূর্বে কিন্তু সে একবার মুখ খুলিল না, একটি বাক্য নিঃসরণ করিল না। বেদেনীর মুখে যে ভয়ঙ্কর সংবাদ সে শুনিয়াছে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত দিল না।

গ্রামবাসীরা মৃত্যু-মুহূর্তে বিবাদ-বিসংবাদ মনে রাখিল না। মৌরীর তীরে লইয়া গিয়া গোপার অন্ত্যেষ্টি করিল। তাহার দেহ ভস্ম হইয়া মৌরীর জলে মিশিল। গোপার জীবন-জ্বালা জুড়াইল।

গ্রামের কেহ কেহ গোপাকে বেদেনীর সহিত মাঠে কথা কহিতে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল— বেদেনীই তুক্‌তাক করিয়া গোপাকে মারিয়াছে। মৃত্যুর যে অন্য কারণ থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিল না। গোপার জন্য অবশ্য কেহ শোক করিল না, কিন্তু রঙ্গনার প্রতি অনেকেরই মন সদয় হইল। গ্রামের বিবাদ ছিল গোপার সঙ্গে, কারণ গোপা ছিল মুখরা-প্রখরা। রঙ্গনার স্বভাব মায়ের মত নয়; সে নমনীয়া, মৃদু-স্বভাবা। সে অপরূপ রূপসী, তার উপর রাজবধূ। হোক এক রাত্রির

বধূ, তবু রাজবধূ। কে বলিতে পারে, হয়তো মানবদেব কোন্ দিন ফিরিয়া আসিবে, রঙ্গনাকে চতুর্দোলায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। গ্রামবাসীদের মন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল। গোপা যেন মরিয়া তাহাকে জাতে তুলিয়া দিয়া গেল।

মাতার মৃত্যুর পর দুই দিন রঙ্গনা ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। চাতক ঠাকুর আসিলেন; স্বয়ং রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। স্নিগ্ধস্বরে দুই চারিটি কথা বলিলেন।

'মা কারও চিরকাল থাকেনা রাঙা। স্বামীর কথা ভাব। তোর পেটে যে আছে তার কথা ভাব।'

রঙ্গনা মনে বল পাইল। মা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঠাকুর আছেন। না, সে সাহস হারাইবে না, হাল ছাড়িয়া দিবে না। যে-জন আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। অনাগত জীবন-কণিকার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

রঙ্গনার জীবন-যাত্রা আবার পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কুটীরে সে একা। কিন্তু ক্রমে তাহাও অভ্যাস হইয়া গেল। পূর্বে মাতার আদেশে কাজ করিত; এখন নিজেই রন্ধন করে, নদীতে জল আনিতে যায়; সন্ধ্যায় চুল বাঁধে, সিঁথি ভরিয়া সিঁদুর পরে। আর প্রতীক্ষা করে—

চাতক ঠাকুর সময়ে অসময়ে আসিয়া তাহার দেখাশুনা করেন, গল্প করেন, জাতক-পুরাণের উপাখ্যান বলেন। রাত্রে তাহার দেহলীতে আসিয়া শয়ন করেন।

এই ভাবে নিদাঘও শেষ হইতে চলিল।

সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে সংক্রমণ করিলে, একদিন সায়াহ্নে আকাশের দক্ষিণ দিক হইতে কালো কালো মেঘ উঠিয়া আসিল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দ্রুত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। কুটীর দেহলীতে রঙ্গনা তখন চুল বাঁধিয়া পিত্তলের থালিকা মুখের কাছে ধরিয়া সীমন্তে সিন্দূর পরিতেছে, চাতক ঠাকুর অদূরে বসিয়া এক কৌতুককর কাহিনী বলিতেছেন, এমন সময় দশদিক বাঁধিয়া নীল বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই বিকট বজ্রনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িল। রঙ্গনা হঠাৎ ভয় পাইয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

বজ্রের হুঙ্কারধ্বনি প্রশমিত হইলে তীব্র ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল; তখন রঙ্গনা মাটি হইতে পাংশু-পাণ্ডুর মুখ তুলিল, একবার ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে ঠাকুরের পানে চাহিল, তারপর টলিতে টলিতে উঠিয়া কুটীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

ঠাকুর তাহার ভয়-বিস্ফারিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি বৃষ্টির মধ্যে ছুটিয়া গিয়া আশপাশের কুটীর হইতে দুই-জন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিলেন।

দুইদণ্ড মধ্যে রঙ্গনা সন্তান প্রসব করিল; বজ্র-বিদ্যুতের হুড়ুকধ্বনির মধ্যে শিশু কণ্ঠের ক্ষীণ কাকুতি শুনা গেল। ঠাকুর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কী হল, ছেলে না মেয়ে?'

বদ্ধ দ্বারের ওপার হইতে একটি স্ত্রীলোক বলিল—'ছেলে!'

আহ্লাদে ঠাকুরের মন ভরিয়া উঠিল। তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘর্ষণ করিতে করিতে নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন —'ভাল ভাল! আহা ভাল হয়েছে। রাজার ছেলে, বজ্রের ভেরী বাজিয়ে এসেছে। ওর নাম রাখলাম—বজ্র। শশাঙ্ক-দেবের পৌত্র, মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব। ওর মায়েরও নাম রেখেছিলাম, আবার ওর নামও রাখলাম। আহা বেঁচে থাক, মা'র কোল জুড়ে থাক।'

আকাশে ঘন দুর্যোগ; ধরণীপৃষ্ঠে বৃষ্টির লাজাঞ্জলি বর্ষণ। মেঘের বিতানতলে মর্দল-ঝল্লরীর রণবাদ্য বাজিতেছে, আবার তড়িল্লতার নৃত্যবিলাস চলিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর অদৃষ্ট-দেবতা যেন জন্মকালেই তাহার ললাটে ভবিতব্যের তিলক পরাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়-দৌর্ব্বল্য

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বিরাট উদ্যোগ। অপূর্ব্ব সৈন্য-সমাবেশ। অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ উভয়পক্ষে। ক্ষাত্র-ধর্ম্মের স্মরণীয় দিন যুগ-যুগান্তরের, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ সশস্ত্র। বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আশা সকল প্রাণে। সমর-প্রাঙ্গণে ভাগ্যনিয়ন্তার মুখে সবাই দেখছে প্রসন্নতা। রণে বিজয়লাভ করলে পৃথিবী-পতি হবে কেহ, কেহ হবে তার দোসর। বিজয়ীর মিত্র, সম্রাটের সহায়ক, বলীর বল—মহীপতিদের প্রাণে এ বিরাট সৌভাগ্যের পূর্ব্বাভাস। যশসৌরভে দিক্‌দিগন্ত হবে ভরপুর—বিক্রমের খ্যাতি, বীরত্বের যশোগানে, শৌর্য্যের জয়ডঙ্কায় ঘোষিত হবে বিজয়ের অমর কীর্ত্তি।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। ভীষণ পরীক্ষার দিন—জয় পরাজয়ের, বীরত্ব ও দৌর্ব্বল্যের। পরীক্ষা-ক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র।

শঙ্খধ্বনি হ'চ্চে। নিজ নিজ শঙ্খের, ভেরীর ও তূর্য্যের নিনাদে রণস্থল মুখরিত। নিজ নিজ ক্ষাত্রশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তীর উদাত্ত শব্দের, শ্রুতিমধুর ধ্বনির পূর্ব্বাধ্যায়। আদর্শবাদী সবাই, সবাই স্থির জানে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র—যে আদর্শের হবে জয়, শ্রেষ্ঠ তারই অন্তর্নিহিত নীতি।

তারা কেহ তো কাপুরুষ নয়, দুর্ব্বল-মতি, অব্যবস্থ-চিত্ত নয়। প্রত্যেকেই নর-শার্দ্দূল। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে ক্ষত্রিয় লাভ করে অক্ষয় স্বর্গ। রাজসিক মনোবৃত্তির বন্যা বহিছে কুরুক্ষেত্রে যেন খরস্রোত ভাগীরথীর প্রবাহ। কূল-প্লাবিনী শক্তি যশোসাগরের উদ্দেশ্যে ধাবিত। সে প্লাবনের মাঝে আছে মহাপুণ্যের ইঙ্গিত—সত্ত্বগুণের পটভূমি। প্লাবনে মুক্তি ও মৃত্যু উভয়েরই ভিতর দিয়ে অমৃতলাভের দুর্দ্দম গতি-শ্রোত। যুদ্ধক্ষেত্রই তো ধর্ম্মক্ষেত্র—তার উপর এ যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-কুল কুরুবংশের নামে খ্যাত। জীবন-দেবতার মহাতীর্থ। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত। অকীর্ত্তিকর জীবনের মোহ নাই। বীর্য্য, শৌর্য প্রচার করছে শস্ত্রের ঝনঝনা। রাজন্যবর্গের আবেগময় প্রাণে রাজসিক প্রবৃত্তির অবাধ বন্যায় তমোভাবের চিহ্ন নাই।

বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। চারিদিকে বেজে উঠ্‌লো শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনব, গোমুখ। শব্দ হল তুমুল, সব্যসাচী পার্থের কর্ণে পৌছিল সে করালনিনাদ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথী। রথ শ্বেতঅশ্বযুক্ত। গাণ্ডীব হস্তে অর্জ্জুন। হৃষীকেশ বাজালেন পাঞ্চজন্য শাঁক, অর্জ্জুন নিজে বাজালেন দেবদত্ত শঙ্খ। তাঁর হৃদয়ে শক্তির লহর পৌছিল, কারণ মূর্ত্তিমান বিভীষিকা বৃকোদর ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ। অর্জ্জুনের পক্ষে বীর মহারথ, মহাবীর—সবাই নিজ নিজ বিক্রম বিঘোষিত করলেন। সবার হৃদয় চঞ্চল—কিন্তু সবার মাঝে আশা—ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়লাভের।

অর্জ্জুনের বীরত্বের খ্যাতি সেদিনের ভারত জুড়ে ভীরুতা ও ধনঞ্জয়, দৌর্ব্বল্য ও অর্জ্জুন—পরস্পরবিরোধী শব্দ, এত উৎসাহ,এত সহায়,তবু এ কি কাণ্ড! প্রিয়সখা সারথিকে বল্লেন বীর অর্জ্জুন—উভয় সেনার মাঝে রথ স্থাপন কর।

তিনি উভয় পক্ষের যুদ্ধকামীদের পর্য্যবেক্ষণ করলেন। কিন্তু সেই রাজসিক বন্যার মাঝে তমোভাবের কৃষ্ণ যবনিকা তাঁর অন্তরের শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম ও বিজয়ের দীপ্ত চিত্রকে আঁধারে ঘিরলে। মুখে ধ্বংসের কথা নাই, ভাবীকালের সুখ-সৌধের রূপের নাই ইঙ্গিত বাণীতে। ভীষণ বিপরীত ভাব—ক্ষত্রিয় বীরের অশোভন কথা মুখে, বিস্ময়কর বিরাট দৌর্ব্বল্যের স্বীকারোক্তি—

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধকামী আত্মীয়স্বজনকে সমবেত দেখে—আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন। মুখ হচ্চে পরিশুষ্ক। আমার শরীর কাঁপছে। রোমাঞ্চিত মোর দেহ, হাত হতে ধনুক খসে পড়ছে। গায়ের ত্বক জ্বলে যাচ্চে।

প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বীরের এ হতে দুর্দ্দশা কি হতে পারে? বিশেষ রণাঙ্গনে—যেথায় ভাগ্যলক্ষ্মী নিজেই চঞ্চলা, কার কণ্ঠে জয়মালা দেবেন সেই ভাবনায়। সেদিনের আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করবে কে—সেই প্রশ্ন উগ্রমূর্ত্তিতে সবার চিত্তকে করছে অস্থির।

এই বিষাদ-যোগই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার প্রগাঢ় রহস্য-কথার উদ্বোধক। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা সে জীবন-রহস্যের উদ্বোধন ও মীমাংসার সার বাণী। সত্য-ভাণ্ডারের দ্বারোন্মোচন তো হয় না—সমস্যা নিরাকরণে হতাশ্বাসের বিশাল বিষাদ না জাগলে বীরের চিত্তে। দুর্ব্বলের নিরাশা অকেজো করে মানবকে, বীরের বিষাদ নূতন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বীরকে কুহেলিকা-অপসারণের কর্ম্ম-প্রেরণায়। তবু বিষাদ, মোহ, দুঃখ নিষ্পেষক।

বিষাদের ভিতর দিয়ে মানুষকে জাগতে হয় অনন্ত সুখের উষায়। দুঃখের বিভীষিকার অন্তরে লুকানো থাকে আনন্দের উজ্জ্বল ক্ষেত্র। অশান্তির অন্তরে থাকে শান্তি সুমহান। সেই প্রভাত ক্ষেত্রের সন্ধানই তো জীবনের সাধনা—চোখে ঠুলি বাঁধা রাজপুত্রের সন্ধান ভূমি। দুঃখ এ জীবনের মূলসাথী আর্য্য সত্য। যে সেই দুঃখের মোহকে জয় করতে পারে, ধর্ম্মক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রে বিজয়-লক্ষ্মী তো তারই তরে সদা অপেক্ষা করছেন মালা হাতে। দুঃখ আর্য্য। কিন্তু মোহ—অনার্য্য বৃত্তির সেবা। এতে স্বর্গের পথ হয় রুদ্ধ, ইহজগতে কীর্ত্তির দ্বার হয় বন্ধ।

অর্জ্জুনের এই বিষাদ-যোগই তো সখা-গুরু ভগবান মুখে এনেছিল—চিরজনের, চিরদিনের, মানব-জীবনের সার-মন্ত্র—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যম্ ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ ক'রে উত্থান কর। তুমি যে বিপক্ষের দলনকারী। সেই তোমার ধর্ম্ম।

এ জীবন তো সংগ্রাম-ক্ষেত্র। প্রতিনিয়ত আমরা যে যুঝছি রণক্ষেত্রে—একথা বুঝেও বুঝি না। সু-প্রবৃত্তি কু-প্রবৃত্তি সদাই যুঝছে মনের গহনে। তাকে ধর্মক্ষেত্র ভাবলে তবে জয়ী হতে পারে, সেই কর্মের প্রেরণা যে প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করতে পারে চিরমুহূর্ত্তের দ্বন্দ্ব। কিন্তু অর্জ্জুনের মত বীরেরও যখন হৃদয় দুর্ব্বল হয়, তখন সাধারণের চিত্ত-চাঞ্চল্যে নিরাশ হবার অবকাশ কোথা। তাই মনের গভীরে, জীবনের সারথিকে বলতে হবে—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যম ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

এই মন্ত্র মনুষ্য-ধর্মের সার। এ মন্ত্র জীবন-কুরুক্ষেত্রের দীক্ষা-মন্ত্র। কারণ দৌর্ব্বল্য জীবনের দোসর—যেমন দোসর সাহস। অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। তখন জাগতে হলে এই মন্ত্রে। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে বর্জ্জন করে উঠে বসতে পারলে তবে কর্মের পথ, জ্ঞানের পথ, কর্ম-সন্ন্যাসের পথ, ধ্যানের পথ ও পরা-ভক্তির পথ উন্মুক্ত করবেন সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সবার হৃদংশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। অর্জ্জুনকে ঐ সব পথ দিয়ে তিনি চির সত্যের সিংহাসনের রূপ দেখিয়েছিলেন—যার ফলে সেই অর্জ্জুন—যিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে গাণ্ডীব ছেড়েছিলেন—সেই অর্জ্জুন শিক্ষার শেষে বলেছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।

হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হল আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতিলাভ করলাম। আমি এখন স্থিতচিত্ত। আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়েছে। এখন তোমারই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করব।

সংসারের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দুর্ব্বলের বিজয়-প্রয়াস বাতুলতা। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার যে জীবনের উদ্দেশ্য, সে জীবনকে বীর-প্রাণ হতে হয়।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

বলহীন এ আত্মা লাভ করতে পারে না। একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করতে হয় ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করবার জন্য। সদা জপতে হয় মন্ত্র—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥

তুমি তেজ, আমাতে তেজ স্থাপন কর। তুমি বীর্য্য, আমাতে বীর্য্য স্থাপন কর। তুমি বল, আমাতে বল স্থাপন কর। তুমি শক্তি, আমাতে শক্তি স্থাপন কর। তুমি মানসিক তেজ, আমাতে মানসিক তেজ স্থাপন কর। তুমি সাহস, আমাতে সাহস স্থাপন কর।

অন্তরের শক্তিতে বাহ্য-প্রকৃতির বা মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করা যেতে পারে সদুপদেশে। কিন্তু উপদেষ্টার বাক্যে ও মনে ঐক্য হওয়া চাই এবং সেই

ঐক্যতার মাঝে ডোবা চাই শিষ্যের। একতার মাধুরী শব্দকে মধুর করে। অরণ্যানীর নিঝুম শব্দহীনতাতেও বিক্ষিপ্ত মন উপদেশ লাভ করতে পারে না। অথচ শিক্ষা মর্ম্মস্পর্শী হ'লে রণক্ষেত্রের অস্ত্রের ঝনঝনা, শঙ্খ, ভেরী, পনবানক, গোমুখের তুমুল শব্দেও শিক্ষা হয় সফল। সে সত্য লাভ করেছিলেন অর্জ্জুন—যার ফলে তিনি হয়েছিলেন—নষ্ট মোহ।

গীতা শাস্ত্রের সার। এই বিষাদ-যোগের শিক্ষা অপরূপ। অন্তর-বৃত্তির দ্বারা বাহিরের প্রকৃতির পরাজয় এ শিক্ষার উদ্বোধন পর্ব। গুরুর প্রতি অনুরাগে দিব্য-জ্ঞান জন্মে—বাহিরের করাল শব্দ পরিপন্থী হয় না দিব্য জ্যোতি দর্শনের, কুহেলিকা অপসারণের শুভ কার্যে। জ্ঞানের তৃষা গভীর হ'লে প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণ জগতের বাস্তব রূপ হ'তে শিষ্যের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে উপদেশ দেননি। সংসার যাঁর কল্পনা, মুক্তিও তাঁর বিধান। তাই গী শিক্ষা সংসার ত্যাগের নয়। এদেশের এ যুগের মহা বলেছিলেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃদু ভাষায় ভয় ত্যাগ কর কঠিন উপদেশ দিতেন সদাই। নির্ভীক হবার বাণী ভার কৃষ্টির সার। সকল ঋষি মুনি, মহাত্মা ও মহাপ্রাণ সাধক কবি ভয় লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করেছেন।

বিবেকানন্দ জীমূত-মন্দ্র স্বরে বলেছিলেন—ভয় করিও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়। সকলকে শোনাও "মা মাভৈঃ"—ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই পাপ—ভয়ই নরক—ভয়ই অ —ভয়ই ব্যাভিচার। তাই বলি—"অভিঃ।" অভিঃ।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—বাধার সৃষ্টি হয় লঙ্ঘনের জন্য অতি বড় বাধা পরিণামে লোপ পায় যদি মনন শক্তি অদম্য।

দধীচির হাড়

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গের দুন্দুভি বাজছে। দেবরাজের আদেশে সুরসভার জরুরী অধিবেশন বসবে। সশক্তি অগ্নি বায়ু বরুণ চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও তাঁদের উপদেষ্টা দেবর্ষিগণ দ্রুত চলেছেন। আজ আর উর্ব্বশী রম্ভা মেনকা ঘৃতাচীর নৃত্যের নূপুর নিক্কণে সুরসভাতল ঝঙ্কৃত হবে না, গন্ধর্ব্ব অপ্সরদের গীতবাদ্যে ধ্বনিত রণিত হবেনা দেবায়তন। তিলোত্তমারা অধোবদন,চিত্রসেনের বীণ স্তব্ধ। সোমরস ও মাধ্বীর শূন্য কলসগুলি ভর্ত্তি হোল না। শান্ত কুজন সুরগুরু বৃহস্পতি আর অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য শুধু দৃষ্টি বিনিময় করেই ক্ষান্ত হলেন। স্বর্গরাজ্য ঘিরে একটা থমথমে ভাব।

বিদ্যুৎআয়ুধ মহেন্দ্র বিদ্যুৎগতিতে সভার কার্য্য উদ্বোধন করলেন—ব্যাপার গুরুতর—বিশ্বকর্ম্মা বিবরণী পেশ করেছেন যে সত্যযুগের প্রথমপাদে কল্পান্ত পূর্ব্বে যখন বৃত্রাসুরবধের জন্য দধীচির অস্থি সংগ্রহ হয়েছিল তখন সেই অস্থির সবটা বজ্র নির্ম্মাণের কার্য্যে লাগেনি—কিছুটা রেখে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতের অদল-বদলের জন্য 'অতিরিক্ত' মশলা হিসাবে। এখন ভাণ্ডার শূন্য, বজ্রকে মেরামত ও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষ করতে হলে অবিলম্বে দধীচির হাড় বা তৎশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম তেজপূর্ণ কোন উপাদান চাই। নচেৎ মানুষের পরমানবি অস্ত্রগুলো শীঘ্রই বজ্রকে ছাড়িয়ে যাবে।

দম্ভোলির দম্ভে আঘাত লাগলো—সে কী, আয়ুহী অন্নহীন মৃত্যুক্লিন্ন জৈব মানুষ—যে সেদিনেও কৃমিকীটে সমধর্ম্মী ছিল, বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় লাফ দিয়ে বেড়াতো, আহার-নিদ্রা প্রজনন যার কাজ—

কুবের প্রশ্ন তুললেন—স্বর্গ রাজ্যের হিসাব-পরীক্ষকরা নাকি অনুযোগ করেছেন যে দধীচির অস্থির সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না—তাঁরা কটু মন্তব্য করে দেব-পরিষদে এই ব্যাপারটা উত্থাপন করতে বলেছেন, তাঁদের হিসাব মত এখনও কিছুটা অংশ দেবভাণ্ডারে থাকা উচিত ছিল।

দেবরাজ সহস্রলোচন ঘূর্ণিত করে আদেশ দিলেন—বিশ্বকর্ম্মা, এখনি হিসাব দাখিল কর।

যন্ত্ররাজ বিশ্বকর্ম্মা চতুর দেবতা, কত চতুরাননকে তিনি

ঘুরিয়েছেন, তাঁর সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব, সমস্ত যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র তাঁর অধীনে, তিনি বললেন—শত যুগান্ত আগে এই বজ্র নির্ম্মাণ হয়েছিল আজ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে স্বর্গের খাতায় না থাকলেও বিধাতার সৃষ্ট জীবের মধ্যে মর্ত্যের মানুষকে কিছুটা দেওয়া হয়েছিল সে কথা মনে আছে—

দেবরাজ গর্জ্জন করে বললেন—মানুষকে? ঐ ছোট্ট গ্রহের একটা ছোট্ট জীবকে, জন্মান্তরের আবর্ত্তে কর্ম্মান্তরের নাগপাশে বাঁধা সাতপাক নাড়ীর মলমূত্র কৃমির মন্থনে যার জন্ম, রোমন্থন যার কাজ, স্বপ্ন যে দেখে, ভালবেসে যে মরে, সে ত জাতবিদ্রোহী, দেবতার উপর বিশ্বাস নেই, আবেদন নিবেদনে আস্থা নেই। বলে কিনা—নিজের দেবতা সে নিজে গড়ে নেবে—তাকে, কার আদেশে—

বিশ্বকর্ম্মা উত্তর দিলেন—আপনি ত জানেন দেবরাজ, পৃথিবীর এই ছোট্ট মানুষ একদিন মহাকালের তপস্যায় বসেছিলো, তার মাথার উপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপ্টা, কত রুদ্রদৃষ্টি শেলশল্য চলেছে। তবু সে টলেনি, তবু সে গলেনি। কোন ইন্দ্রত্ব কুবেরত্ব সে কামনা করেনি। নীলকণ্ঠ হয়ে কুণ্ঠাহীন সে উগ্রতপা তপস্বী। সময়ের সীমাহীন সীমানায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অনির্বাণ তার কল্পনা ঘুরেছে কল্প থেকে কল্পান্তের দিকে। মহাকালের বরে সে হয়েছে কালজিৎ। তারই আকর্ষণে দধীচির হাড়ের শেষ অংশগুলো দেবরাজ্য ছেড়ে তারই ভাণ্ডারে জমেছে।

সুরপতি আদেশ দিলেন—তোমার কর্ম্মে শিথিলতা এসেছে বিশ্বকর্ম্মা, স্বর্গের ভাণ্ডার থেকে দধীচির অস্থি মর্ত্যের মানুষের আকর্ষণে চলে যাবে এ অসম্ভব, তবু তুমি দেবকুলোৎপন্ন, মিথ্যাভাষণ তোমার কাজ নয়—তোমার কথাই আমরা মেনে নিলাম, স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই দধীচির অস্থিকণা—তার সামান্যতম অংশও মানুষের কাছে থাকবে এ অসহ্য, এ স্বর্গের অপমান্। অগ্নি বরুণ দেবদেবীগণ সকলেই সন্ধানে যাও।

—কিন্তু দেবরাজ, দধীচি নিজেই যে মানুষ ছিলেন—বায়ু নিবেদন করলেন্।

স্তব্ধ হও প্রভঞ্জন—হুঙ্কার দিলেন মহেন্দ্র।

সাড়া পড়ে গেলো ত্রিদিব রাজ্যে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিদেবতার কাছেও খবর পৌছল। দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু এ কী গোল—

নাগাধিরাজ-দুহিতার দিকে চেয়ে শুধু স্মিতহাস্য করলেন মহাদেবতা।

ময়ূরাসনে দেব-সেনাপতি ষড়ানন, ইন্দুরবাহন গজানন, পাশহস্তে বরুণ, পেচকবাহিনী মহালক্ষ্মী, হংসারূঢ়া সরস্বতী, জলদজ্বালাতিভাস্বৎ জাতবেদ সবাই ত্রিভুবন তোলপাড় করে বেড়ালেন—কিন্তু দধীচির হাড়ের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

যথাসময়ে খবর পৌছলো দেবসভায়। শচীপতি ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন—যমরাজ মর্ত্যের উপর মৃত্যুর খর অঞ্জন বুলিয়ে দাও, মর হয়েও তারা অমর হবার স্পর্দ্ধা রাখে—.

কিন্তু মৃত্যুভয় দেখাবো কাকে, মহামৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক যে তারা, আমি নিজে বরং—

তথাস্তু—

চিত্রগুপ্তের নিকট হিসাবপত্র তথ্যতালিকা নিয়ে যমরাজ নিজেই বেরুলেন সন্ধানে। অযুত দেবতার শক্তি তাঁর সহায়, নিদ্রাহীন চোখে তিনি খোঁজেন। যেখানেই যান সেখানেই স্বার্থ, ক্লেদ গ্লানি, অপমান অত্যাচার, ব্যভিচার। যুগ যুগ ধরে চললো সন্ধান।

তারপর একদিন পাহাড়ের ধারে সমুদ্রের পারে এক অতি ম্লান জীর্ণ কুটীরের সামনে তিনি পৌছলেন। ছোট্ট ধীবর পল্লী। সাধারণ মানুষ হলে তৎক্ষণে তিনি ক্লান্ত তপ্ত শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়তেন আশ্রয়ের আশায়। ভাবলেন কবি, মনীষী, সাধু তপস্বী জ্ঞানী বিজ্ঞানী, দিক্‌পাল লোকপালদের ঘরে ঘরে ঘুরলাম, মন্ত্রের, জ্ঞানের, বিদ্যার, বীর্য্যের আভাস পাইনি যে তা ত নয়, কিন্তু সেই পরেশ-পাথরের সন্ধান ত পেলাম না, আজ না হয় এই জনহীন প্রান্তরে দরিদ্রের ঘরেই কাটাই।

দ্বারের নিকট দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—আমন্তঃ ভোঃ, অতিথি আমি, অতিথিদেবো ভব—

বেরিয়ে এলো কুটীর থেকে দুটি অতি সাধারণ মানুষ, যুবক ও যুবতী। ঠিক বুঝতে পারলে না তারা তাঁর সাধু ভাষা। গদগদ হয়ে বাক্যবিন্যাসে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে অভ্যর্থনা করলে না, কর্কশ ভাষায় বিতাড়িতও করলে না। শুধু বললে—আসুন, আমরা অতি সামান্য লোক, দীনের ঘরে দীন

আয়োজন। মেয়েটি পদপ্রক্ষালনের জন্য আনলে জল, আসন ও কিছু খাদ্য, বিশ্রামের জন্য নিজেদের একমাত্র ঘরটিই ছেড়ে দিয়ে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসলো, ও নিজেদের গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হলো। পুরুষটির নাম কিষণ, স্ত্রীলোকের নাম রোহিণী। কিছুক্ষণ পরে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

কিষণ বললে—তবু ভালো, চাষের খুব সুবিধা হবে, যাদের জমিতে এখনও বীজ বোনা হয়নি তারা একটু সুবিধে পেলে, এই তাদের শেষ ভরসা—

রোহিণী বললে—শম্ভুরাম কিন্তু আজ সাতদিন ধরে অসুস্থ, ওর জমিগুলোতে আর এবারে চাষ হবে না—বীজই বোনা গেল না, সাত সাতটি ছেলেমেয়ে আর রুগ্ন স্বামী নিয়ে লছমী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভগবানের মার! কি অত্যাচারই না করেছে লোকটা! কী শত্রুতা! বদমাইসী মামলামকদ্দমা, জালজুয়াচুরী কী রকম করে বেড়াচ্ছে! আমাদের লাল গাইটাকে বিষ খাইয়ে দিলে ত ওই। আর একদিন তাড়ি খেয়ে আমার হাত ধরে টানেনি?

কিষণ বললে—ঠিক হয়েছে—এবারে সপরিবারে উপোষ করুক! ওর বড় ছেলেটাও কদিন ধরে সমুদ্রে বেরিয়েছে মাছ ধরতে, এই জল-ঝড় বৃষ্টিতে আর ফিরতে হচ্ছে না, সমুদ্রেই হবে সমাধি।

সারাক্ষণ ধরে এই সব বৈষয়িক আলাপ আলোচনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন যমরাজ। ভাবলেন বড় বড় লোকদের ঘরে তবু কিছুক্ষণও বড় বড় কথা শোনা যায়, বেদ উপনিষদ পুরাণের কথা—এখানে সারাদিন এই সব তুচ্ছ আলাপ। বিষয় বিষ বিকারজীর্ণ মানুষগুলোর আর মুক্তি নেই।

সন্ধ্যা না হতেই বাড়ীর ছোট্ট প্রাঙ্গণটায় সে কী হল্লা। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অগ্রপশ্চাতে খাঁটি ধান্যেশ্বরীর সফেন অমৃত ভাণ্ড নিয়ে সুরাবিজড়িত কণ্ঠের সে কী সুরতোৎসব! স্ত্রীপুরুষে মিলে নৃত্যগীত। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, ঘৃণা নেই। যমরাজ ভাবলেন, দধীচির অস্থি সন্ধানে এসে এ একরূপ নরক বাসেরই সামিল হল। এমন কি যাদের গৃহে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, তারা নাকি নিয়মমত বিবাহিতও নয়, শুধু দুজনে দুজনাকে গভীরভাবে অনন্যচিত্তে ভালবাসে! সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন যমরাজ··· তখনি চলে যাবার উদ্দেশ্যে উঠেও ভাবলেন··· রাত্রিটা কাটিয়েই যাওয়া যাক্।

রাত্রে স্বামীস্ত্রী যখন শয়ন করলে তখনও তাদের মুখে অন্য কোন কথা নেই, ভগবানের নাম নেই, দেবতাদের স্তুতি নেই, শুধু প্রতিবেশীর নিন্দা, সুরাউচ্ছল উচ্ছ্বাস আর আজেবাজে কথা। রোহিণী যদি একগুণ বলে—ত কিষণ দ্বিগুণ। তাদের গুঞ্জন আর শেষ হয় না। শেষকালে রোহিণীই কিষণকে ধরে শুইয়ে দিলো বিছানায়। যমরাজের চক্ষে নিদ্রা নেই। আকাশ কালো করে আবার মেঘ ডাকলো, যমরাজ দেখলেন কিষণ উঠলো, চেয়ে দেখলে রোহিণী ঘুমুচ্ছে কিনা—সমুদ্রের দিকে চাইলে—দূরে একটা অস্পষ্ট কি যেন দেখা যাচ্ছে। তারপরে বেরিয়ে পড়লো সমুদ্রের ধারে, জলঝড় বৃষ্টির মধ্যে নিজের নৌকাটা খুলে ফেল্লে—শম্ভুরামের ছেলে আজ সমুদ্রপথে ফিরবে, যদি কোন বিপদ আপদ হয় তারই সাহায্যের জন্য সে বেরিয়ে পড়লো উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে। যমরাজ চোখ মুছলেন—ঠিক দেখছেন ত—শম্ভুরাম তার শত্রু না···

কিছুক্ষণ পরে দেখেন···রোহিণীও চুপি চুপি বেরিয়েছে, কিষণ নেই দেখে সে যেন একটু আশ্বস্ত হলো। ত্রস্তপদে এক ঝুড়ি বীজ তুলে নিলে, তারপর মিলিয়ে গেলো মাঠের দিকে··· শম্ভুরামের ক্ষেতের ভিজে মাটির উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলো শস্যের বীজগুলো। তার সাতসাতটি ছেলে না খেয়ে মরবে। হোক্ না সে নিজে দুশ্চরিত্র, লম্পট লোভী বদমাইস্।

ভোর হবার আগেই দুজনে ফিরে এলো। কিষণ এসে দেখলে··· রোহিণী অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে রোহিণী জেগে দেখলে ·কিষণ পাশে শুয়ে। সকালবেলায় ভোরের একটু আলোর তির্য্যক রেখা তাদের মুখে পড়েছে। সেই গলিত-কাঞ্চনের দীপ্ত আভায় চিক্ চিক্ করছে দধীচির হাড়ের এক টুকরো।
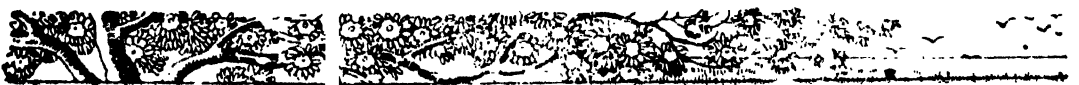
সাঁচীর ডায়েরী

শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য্য

আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান তথাগত ভারতের বুকে আবির্ভূত হন এবং প্রেমের এক নূতন মন্ত্র অনাগতকালের পথিকদের জন্য রেখে যান। সেদিন ভগবান তথাগতের মত ও পথকে যাঁরা অগণিত মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সারিপুত্ত ও মহামোগল্লায়ন তাঁদের অন্যতম। সর্বত্যাগী এই মহামানবের অমর কীর্তিকে কাল-জয়ী করাবার জন্য কোন এক অজ্ঞাত মহাপুরুষ এঁদের জীবনাবসানের পর এঁদের অস্থিকে ভূপাল রাজ্যের এক অন্ত্যদেশে সাঁচীর এক পর্বত-শীর্ষের বিহারে সংস্থাপন করে রেখেছিলেন। সুদীর্ঘ বৎসর পর এই অস্থি পুনরায় আবিষ্কৃত হ'য়ে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটীর প্রচেষ্টায় ও অপর কয়েকটি বহির্ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্থার সহায়তায় এবং ভূপাল সরকারের একান্ত সহযোগিতায় কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অস্থি পুনঃসংস্থাপনের জন্য এক নতুন বিহার নির্মিত হয়। ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটীর হীরক জয়ন্তী ও তদুপলক্ষে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্মেলন এবং সর্বোপরি সারিপুত্ত ও মহামোগল্লায়নার পূতাস্থি সংস্থাপন উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি ২৫শে নভেম্বর সাঁচীর পথে এলাহাবাদ যাত্রা করি। সাঁচী যেতে হলে কলকাতা থেকে বোম্বাই মেলে এসে দিল্লী পাঞ্জাবগামী কোন ট্রেন ধরতে হয় এবং তারই জন্য আমাকেও এখানে অবতরণ করতে হ'ল। ২৮শে তারিখে অতি প্রত্যুষে পাঞ্জাব মেল ধরে যখন সাঁচী পৌঁছালাম তখন মার্তণ্ডদেব প্রায় মধ্যগগনে। সাঁচী ষ্টেশনের বহুদূর থেকেই সাঁচী পাহাড় শীর্ষের পুরাতন স্তূপ ও নবনির্মিত বিহার দেখা যাচ্ছিল। ষ্টেশনে নেমেই প্রত্যক্ষ করলাম ষ্টেশনটির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কয়েকজন রেলকর্মচারী আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন। প্রকৃতির খেলাঘরের এক মধুমাখা পরিবেশের এই ছোট্ট ষ্টেশনটি নব-পায়নে সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল।

সাঁচী—বৌদ্ধ-সম্মেলনে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ

ষ্টেশনের প্লাটফর্মেই মহাবোধি সোসাইটীর সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সংবাদপত্রের কর্মব্যপদেশে এর সঙ্গে আমার ইতিপূর্বেই আলাপ ছিল। তাই তিনি বিশেষ সচেষ্ট হয়ে সরকারী কুলির মারফত আমাকে অনুসন্ধান কার্য্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অনুসন্ধান আপিসের সামনে দাঁড়িয়েই প্রত্যক্ষ করলাম যে সব আয়োজন তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তাঁবুর দড়ি ধরে তখনও 'হেইয়া হো' শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর রাস্তাগুলি নির্মাণে তখনও কুলির কসরৎ চলছিল। দুদিনের জন্য এই পাহাড়তলীকে রীতিমত আধুনিক শহরে পরিণত করবার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। একদা জঙ্গলাবৃত এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে ভূপাল সরকার অপূর্বত্ব দান করেছিলেন মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই। পাহাড়'পরে এক বিরাট ট্যাঙ্ক থেকে এই শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ এখানেই সৃষ্ট হয়ে এখানেই আলোকিত করে রাত্রের শোভা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের একটি বিশেষ কার্য্যালয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেলওয়ে অনুসন্ধান ও বুকিং অফিস প্রভৃতি সব কিছুই এখানে স্থাপন করা হয়েছিল। এই বিরাট অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য ভূপাল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু 'বয়েজ স্কাউট' ও অসংখ্য পুলিশ এখানে নিযুক্ত হয়েছিল। পুলিশদের অপেক্ষা কিশোর বয়েজ স্কাউটদের কর্তব্যপরায়ণতা বিশেষ উপকারী হয়েছিল

বহিরাগতদের পক্ষে। কোন বিশেষ ক্যাম্পে গমনাগমন ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তারা সাহায্য করেছে প্রতিটি লোককে এবং নিজেদের অমায়িক ব্যবহার ও অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা সকলের সন্তুষ্টি সাধন করেছে।

ঐদিন সন্ধ্যায় ভূপালের চীফ্ কমিশনার সাঁচীতে সমবেত ভারত ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। সাংবাদিক সম্মেলনটি সাংস্কৃতিক অধিবেশনের জন্য নির্মিত সুবৃহৎ মণ্ডপেই হয়েছিল। এই মণ্ডপের প্রধান মঞ্চের পশ্চাতে নরমুণ্ডসহ বুদ্ধদেবের একখানি বিরাট তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। নরমুণ্ডসহ বুদ্ধদেবের এই তৈলচিত্রটিকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহলে বেশ আলোচনা শুরু হলো। এ সম্পর্কে চীফ কমিশনার মহাশয়কে প্রশ্ন করা হলে জানান যে জনৈকা শ্বেতকায় শিল্পীর অঙ্কিত কয়েকখানি বুদ্ধ-চিত্র সম্মেলন কক্ষে প্রদর্শিত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাঁর সংগ্রহের অধিকাংশেই নরমুণ্ড ও বুদ্ধদেব বর্তমান। যাই হোক, নানা আলোচনা ও গুঞ্জরণের পর চীফ কমিশনার জানালেন যে চিত্রগুলি আর প্রদর্শিত করা হবে না।

২৯শে—ভূপাল প্রদেশের অভ্যন্তরে সাঁচীতে নিদারুণ শীত থাকাসত্ত্বেও ভোরের আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বার বহুপূর্বেই সাঁচীর এক
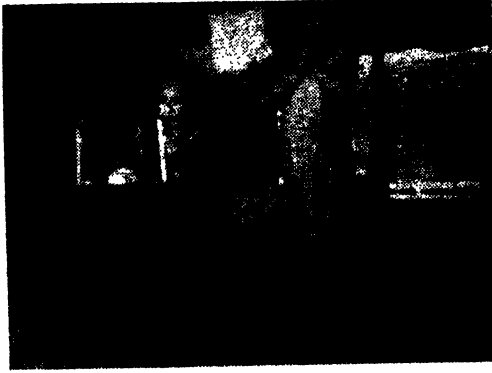
পূজারতা চীনা মেয়ে—সাঁচী

প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাণের বন্যা বইতে শুরু করেছিল। অতি প্রত্যূষে মহাবোধি সোসাইটীর সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্মেলনের জন্য মনোনীত সভাপতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নয়াদিল্লী থেকে ট্রেনযোগে সাঁচী পৌঁছান। এঁদের আগমনের কয়েক ঘণ্টা পরেই বিশেষ ট্রেনযোগে কলকাতা থেকে পূতাস্থি সাঁচী পৌঁছায়। ষ্টেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ পূতাস্থিকে গ্রহণ করেন। অহিংসার অমর সাধক দুজনার পূতাস্থিকে ভূপাল রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী সামরিক অভিবাদনও জ্ঞাপন করে। ষ্টেশনে ডাঃ সর্বপল্লী তিব্বতের অপ্রাপ্তবয়স্ক লামা, সিকিমের মহারাজকুমার, মহারাজকুমারী, ভূপালের নানা মন্ত্রী ডাঃ মুখার্জীর অনুগামী হয়ে বিশেষ সজ্জিত এক গাড়ীতে পূতাস্থি বাহিত স্বর্ণপাত্র স্থাপনা করেন। নানা বর্ণের অসংখ্য পতাকা শোভিত এই শোভাযাত্রা পূতাস্থি রক্ষণের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত এক মণ্ডপের সামনে শেষ হয়। পূতাস্থি বেদীতে রক্ষা করবার পর সমবেত ভিক্ষুগণ তার পূজা অর্চনা করেন, ধূপ গন্ধে সমস্ত স্থানটি আমোদিত করে তুলেন।

প্রাতঃকালে প্রধান অনুষ্ঠান আর বিশেষ কিছু না থাকায় ডাঃ সর্বপল্লী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে ভূপাল রাজ্যের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত কামকাপ্রসাদ ও ভূপাল সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধানসচিব সাঁচী পুরাতন ও নবনির্মিত বিহার দেখাতে যান। আমিও এদের সঙ্গে যাই। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন পুরাতন দুটি স্তূপ ও নবনির্মিত বিহারটি বিশেষ সাগ্রহে পরিদর্শন করেন। দুই লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে নব বিহার নির্মাণের কোন যুক্তি নাই বলেই ডাঃ সর্বপল্লী অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ইতিহাসের কালজয়ী প্রতীক পুরাতন স্তূপেই এই ঐতিহাসিক অস্থি সংস্থাপন করা উচিত ছিল। নবনির্মিত বিহারের শিল্পকলা ও তদুপরি পরিকল্পনাও দার্শনিক উপরাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাধন করতে পারে নি।

মধ্যাহ্নে নেহরুজী বার্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু সহযোগে ভূপাল বিমান ঘাঁটী থেকে ৪৩ মাইল পথ উন্মুক্ত মোটরে করে সাঁচী পৌঁছান। পথে নেহরুজীর প্রতি এত মালা নিক্ষিপ্ত হয় যে তাঁকে সামান্য আহতও হতে হয়েছিল।

অপরাহ্নে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যথানির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বথেকেই উৎসাহী ব্যক্তিদের দ্বারা মণ্ডপটি পরিপূর্ণ হয়েছিল। ডাঃ সর্বপল্লী তাঁর ভাষণে বলেন: ভারতের পুণ্যতীর্থে ভগবান তথাগতের আবির্ভাবে তাঁর কালজয়ী প্রেমের অমর মন্ত্র ভারতের আকাশে বাতাসে মিশ্রিত হয়ে আছে এবং আজ আমাদের দুঃখ দুর্দশা ও অশান্তিময় জীবনে সেই চিরঞ্জয়ী মন্ত্রকে স্মরণ করে মুক্তিলাভ করবার আবেদন জানান।
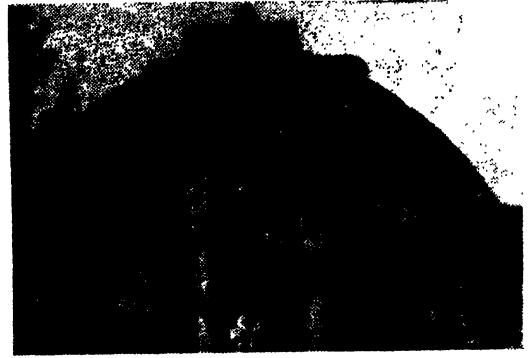
নবনির্মিত বৌদ্ধ-বিহার—সাঁচী

এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায় যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র মণ্ডপটি প্রায় জনশূন্য ছিল। নেহরু আর চিত্রাভিনেতা রাজকাপুরকে কেন্দ্র করেই সাঁচীতে সমবেত অধিকাংশ আবালবৃদ্ধবনিতার মাতামাতি চলছিল এবং ফলে তাঁদের অবর্তমানে সাংস্কৃতিক সম্মেলন শূন্য গৃহেই অনুষ্ঠিত হলো।

বেলা তিনটার সময় পুনরায় পূতাস্থিকে বিশেষ মণ্ডপ থেকে নববিহারের উদ্দেশ্যে আনয়নের শোভাযাত্রা শুরু হলো। 'সাধু' 'সাধু' শব্দে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু ও নরনারী নানা বর্ণরঞ্জিত পতাকা নিয়ে যখন পাহাড়ে উঠতে থাকেন তাহা এক বিচিত্র শোভা ধারণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করবার কোন বাধা না থাকায় অসংখ্য জনসমাগম হয়েছিল সেদিন সাঁচী পাহাড়শীর্ষে। মঞ্চশীর্ষ থেকে সুধীজনের বহুমুখী ভাষণের পর পূতাস্থিকে নব-বিহারে পুনঃ স্থাপনা করা হলো—শত ভিক্ষু করলেন পূজা—লক্ষজনে আত্মনিবেদন করলেন প্রণিপাতের দ্বারা।

এই ভাবেই ভারতের দুটি সুসন্তানের জীবনের শেষ চিহ্ন—অহিংসা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতীক সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ব্যবধানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে আজিকার যুদ্ধাতঙ্ক-সমস্যা-কণ্টকিত পৃথিবীতে অগণিত শান্তিকামী মানবের নূতন আশার ভাস্বর প্রতীক হয়ে রইল।

একাডেমি চারু-কলা প্রদর্শনী

রূপরসিক

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি আর রাজপুত্র শিল্পী—গোপেন রায়

গোপালপুর সমুদ্রতীর শিল্পী—গোপাল ঘোষ

শীতের হাওয়ায় কলিকাতা মহানগরী উৎসব-মুখর হয়ে ওঠে প্রতি বৎসর। গত ১৬ বৎসর যাবৎ একাডেমি অব ফাইন আর্টসের চিত্র প্রদর্শনী সে উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিবারের মত এবারেও বাংলার রাজ্যপাল এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। একাডেমী শিল্প-প্রদর্শনী সারা ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন শিল্পধারার একমাত্র পরিচয় স্থল। দেশের নতুন ও পুরাতন ছোট বড় সব শিল্পীর শিল্প প্রতিভার সঙ্গে এখানেই আমরা পরিচিত হতে পারি। গত ১৬ বৎসর যাবৎ একাডেমি সর্ব্ব ভারতীয় রূপসৃষ্টির পরিচয় বহন করে এসেছেন।

ছ'শো চৌষট্টিটি শিল্প রচনায় একাডেমী প্রদর্শনী সুসজ্জিত। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবারের প্রদর্শনীর পারিপাট্য ও আলোক-সজ্জা লক্ষণীয়। কিন্তু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একাডেমি আমাদের এবারে হতাশ করেছেন। কাঁচা রচনার ভীড়ে সার্থক রচনাগুলি হারিয়ে গেছে। কাঁচা হাতের কাঁচা কাজ তবু সহ্য করা যায়; কারণ তাদের ভবিষ্যৎ আছে; কিন্তু পাকা হাতের কাঁচা কাজ মনে হতাশা এনে দেয়, তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়ে এসেছি তার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তা' ছাড়া দেশের অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্প-সম্ভার থেকে একাডেমী এবার বঞ্চিত হয়েছে। নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, অসিত হালদার,

যামিনী রায় প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্রগুলি একাডেমী প্রদর্শনীতে নাই।

সুনীল পালের 'শ্রীমধুসূদন' মূর্ত্তিটি এবারে একাডেমীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা যেতে পারে। দ্বিগুণ মাপে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি এইবারই একাডেমীতে প্রথম প্রদর্শিত হল। তাঁর শিল্প প্রতিভার সঙ্গে আমরা বহুপূর্ব্বেই পরিচিত। প্রতিবারের মত এবারও তাঁর সৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

কমলারঞ্জন ঠাকুরের 'উমার প্রসাধন' ছবিটি অসমাপ্ত অবস্থায় টাঙ্গান হয়েছে। আর একটু কারু-সাজ করলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হত।

শ্রীসমর ঘোষ কয়েক বছর পর একাডেমীতে হাজির হয়েছেন। তিনি যা হাজির করেছেন তা' সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ও তা'তে তাঁর

গৃহস্থালী　　শিল্পী—সমর ঘোষ

চন্দ্রমল্লিকা　　শিল্পী—বিশ্বরাজ মেহেরা

শকুন্তলা　　শিল্পী—সতীন্দ্র লাহা

শিল্প প্রতিভার ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর 'গৃহস্থালী' ও 'মিলন' ছবি দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
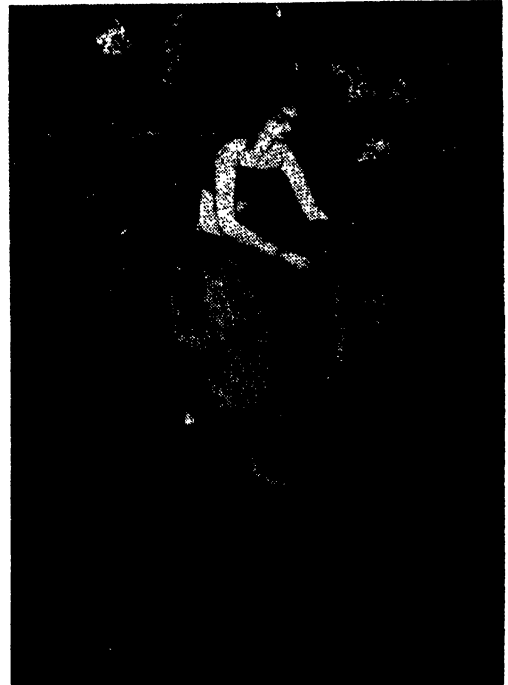
ধীরেন দেববর্ম্মণের 'ছাত্রী' চিত্রটি একটি সার্থক রচনা। ছবিটি তাঁর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতিকৃতি' ছবিটির রংএর জাঁকজমক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্বরাজ মেহেরাকে এই প্রথম আমরা একাডেমীতে পেলাম। তাঁর 'চন্দ্রমল্লিকা' ও 'এষ্টার ফুলের' ছবি দু'খানি প্রশংসা দাবী করতে পারে।

কিশোরী রায় এবার আমাদের কিছুটা হতাশ করেছেন, কারণ তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো বেশী কিছু আশা করেছিলাম।

প্রণব গাঙ্গুলীর 'চোর-কাঁটা' ছবিটি তাঁর শিল্প মনের পরিচয় দেয়।

সতীন্দ্র লাহার শকুন্তলা প্রভৃতি ছবিগুলির সঙ্গে আমরা বহুপূর্ব্বেই পরিচিত। 'মাধবী লতার তলায় শকুন্তলা' চিত্রটি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর 'বনচম্পা' চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য।

চিত্তদাসগুপ্তের 'গুণ্ডা' চিত্রটি সত্যই উপভোগ্য।

গোপাল ঘোষের ছবিগুলি তার পূর্ব্ব গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে, বর্ণের আশ্চর্য্য দীপ্তিতে তাঁর রূপসৃষ্টি উদ্ভাসিত।

গোপেন রায়ের 'রূপকথার' ছবিগুলি এবার একাডেমীর বিশেষ আকর্ষণ বলা যেতে পারে।

প্রদর্শনী দেখে মনে হয় শিল্পীরা নূতন কিছুর সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। পুরাতন পদ্ধতিতে আর যেন তেমন সাড়া নেই। অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলিই প্রদর্শনীতে বেশী স্থান পেয়েছে।

গতি ও গন্তব্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(৪)

কোথায় চলেছি? কোন্ দিকে আমাদের গন্তব্য? মানব-মনের এই চিরন্তন জিজ্ঞাসাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করেছে। জগতে বহু মতবাদের লড়াই চল্‌ছে ও চল্‌বে। নাসৌ মুণির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। তা'তে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? একথা সত্যি যে—সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনাই মানুষের একমাত্র কাম্য। দেশ ও কাল-ভেদে জ্ঞানীদের মধ্যে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। মুশকিল্ বাধিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের যান্ত্রিক কারসাজি আজ অস্বাভাবিক-ভাবে জন-মনকে বহির্ম্মুখী ক'রে তুলেছে। ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা ছিল চিরদিনই অন্তর্ম্মুখী। একথা আজ অসঙ্কোচে বলা যায়—বৈষয়িক সুখ-সুবিধা হারানোর মধ্যে আমাদের পরাধীনতার গ্লানি ছিল যতখানি—তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল ভারতীয় ভাবধারা কবরস্থ হওয়ার মধ্যে। স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের রাষ্ট্র-নেতারা বাইরের হারাধন হাতড়াচ্ছেন খুব! ঘুণ-ধরা অন্তরটিকে দেখ্‌ছেন না কেন?

সামান্য চরকা-হাতে গান্ধীজীর আবির্ভাব, এই যন্ত্রযুগে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর কল্যাণকর ইঙ্গিতও সুদূরপ্রসারী। মহাত্মা গান্ধীকে এক কথায় বলা যায়—প্রাচ্য ভাবাদর্শের বিদ্যুৎ-চমক! বিশ্বশান্তির পথ-নির্দ্দেশক। তিনি চেয়েছিলেন—ভারতের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আন্‌তে। যন্ত্র-দানবের প্রাধান্য খর্ব্ব করতে। ভারতের মরু-মৃত্তিকায় তার সে ফসল-ফলানোর চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়নি?

গান্ধী-নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দেশ-নেতারা আজ সেই জাতির জনকের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য দান করছেন। কিন্তু বুকে হাত রেখে একথা কি বল্‌তে পারছেন—মূলে তাঁর আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন না? বৃটিশ-আমলে নির্দ্দিষ্ট পথেই তো ধনী-তোষণের ও দরিদ্র-শোষণের বিধি-ব্যবস্থা ঠিক আছে? গান্ধী-প্রীতির সুযোগ নিয়ে জনমত গঠন করছেন বটে, সেই জনগণের স্থায়ী কল্যাণ-কামনায় আত্মনিয়োগ করছেন না—এ অভিযোগ মিথ্যা নয়।

অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা-সমাধানই তো ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল। যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, সেখানে গণতন্ত্র একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্যতাগর্ব্বী মানুষের প্রথম ও প্রধান অপরিহার্য্য উদ্‌ভাবন, ঢেঁকি আর চরকা অতি আদি ও অকৃত্রিম দুইটি যান্ত্রিক কেরামতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যুৎগতি মিলকে অস্বীকার ক'রে এ যুগে মৃদু ও মন্থরগতি চরকার পুনরাবৃত্তির জন্য গান্ধীজীর আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সত্যিকার চরকা-প্রেমে ক'জন গান্ধীভক্ত মেতেছিলেন তা' ঠিক বোঝা যায় না। তবে, শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরে অনেকেই নেচেছিলেন, এবং 'গোলে-হরিবোল' দিয়েছিলেন লুটের লোভে—এরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে। কুঁড়োজালির মধ্যে ম্যাও-ম্যাও-

শব্দ কি মার্জ্জারের অস্তিত্বই প্রমাণ করে না? অনেকেই তখন চরকার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন—মহাত্মাজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে। আবার কোনো মহাত্মা আসবেন কিনা ঢেঁকি-গিল্‌বার অনুরোধ নিয়ে তাই বা কে জানে? বিনোবাজীর ভাবখানা দেখে সেই কথাই তো ভাব্‌ছি।

শুনতে পাই ব্রহ্মর্ষি নারদ ছিলেন ঢেঁকি-বাহন। সুতরাং ঢেঁকির পৌরাণিকত্বে সন্দেহের কারণ নেই। সঙ্গীতজ্ঞরা স্বীকার করবেন—চরকার আছে সুর, আর ঢেঁকির আছে তাল। কোন্ সুপ্রভাতে এই দু'টি সুরে ও তালে মানব সভ্যতার জয়গান প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—তা' ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। তবে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বাহাদুরীর যুগে চরকার মত ঢেঁকিকেও কোণ-ঠাসা করে দেশে দেশে স্থাপিত হয়েছে—প্রচণ্ড গতি-বিশিষ্ট ধান-ছাঁটাই কল। এখন স্বর্গের ঢেঁকিকে পৃথক্ করে স্বর্গে ফেরৎ পাঠালেই লেঠা চুকে যায়। কিন্তু একদল স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিৎ চিৎকার সুরু করেছেন—সাবধান! ও কার্য্যটি করো না। সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে···

এখন নাকি দেখা যাচ্ছে—উন্নততর যন্ত্র-কৌশলে তণ্ডুল-সরবরাহের গতি বাড়লেও, তার খাদ্যপ্রাণ উবে যাচ্ছে শতকরা পঁচাশি-ভাগ! যার ফলে বেরিবেরি নামে একটি অভিনব হৃদ্-রোগের একটি ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে চারিদিকে। কী সর্ব্বনাশ! গতি বাড়ানোর ফলে গন্তব্যই ভেস্তে গেল যে?

একজন বহুদর্শী ডাক্তার বলেছেন—এক গ্রাস অন্ন-প্রস্তুতির মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম আছে—অর্থাৎ তাকে ধান্য-রূপ থেকে অন্ন-রূপে পরিবর্ত্তিত করতে হ'লে যতখানি শ্রম-স্বীকারের প্রয়োজন হয়, তা' যে না করে—সেই অন্ন-গ্রাস গলাধঃকরণের অধিকারী সে নয়। তাকে অসুস্থ হতেই হবে। মনে হয়—গান্ধীজীর চরকা চালনার মত, মুনিবরও তাঁর নিজের ঢেঁকি নিজেই চালাতেন। তাঁর খাদ্যে স্বাস্থ্যের অনুকূল খাদ্যপ্রাণের অপ্রাচুর্য্য ঘটতো না। স্বর্গমর্ত্ত-পাতাল পরিভ্রমণেও ক্লান্তিবোধ করতেন না।

কৃষিজীবীদের মধ্যে জমি-বণ্টন এবং ঘরে ঘরে ঢেঁকি ও চরকা প্রচলনের চেষ্টা এখন আর গান্ধী-শিষ্যদের চিন্তার বিষয় নয়। পাশ্চাত্য ধরণের সহর-সমৃদ্ধ রাজ্য-গঠনের পরিকল্পনাই আজ তাঁদের কার্য্যতালিকা ব[illegible] মনে হয়। কিন্তু বৈদেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের যত অভিযোগ ছিল, সহরের বিরুদ্ধে পল্লী অভিযোগগুলি বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়।

কুটীর-শিল্পে সমৃদ্ধ পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছে কে? সভ্যতার গতিবৃদ্ধির অজুহাতে সহরের যন্ত্র-কৌশল কি ভাবে জন-কোলাহলে মুখরিত পল্লীগুলির শান্তি ও সু[illegible] নষ্ট করেছে—তার প্রমাণ গত অর্দ্ধশতাব্দীর জমা খরচে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রমাপনোদনের জন্য পল্লীতে ছিল হুঁকো আর গড়গড়া। হুঁকোর রাঙা জল দেখ্‌লেই বোঝা যায়, কতখানি নিকোটিন দূরে রাখার ফলে পল্লীর লাঙলগুলি থাক্‌তো রোগমুক্ত। সহরের পথে এলো বিড়ি আর সিগারেট। শ্রমাপনোদনে গতি বাড়লো। অবশ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত থাকলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-নালীর প্রদাহ-জনিত ব্যাধি-উপশমের জন্য ঔষধ আবিষ্কার করলেন—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রভৃতি কত-কি! জল-নিকাশের গতি রোধ ক'রে দেশটাকে ছেয়ে ফেল্‌লো রেলরাস্তার মাকড়সা জাল। আরম্ভ হলো ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব! সঙ্গে সঙ্গে আমদানি হ'লো—টন্-টন্ কুইনাইন ও পেলুড্রিন্। খাও যে যত পারো। সুলভ ভেজিটেবল্-ঘী এসে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতকে পরিহাস করতে লাগলো। কলুর ঘানি সরষেকেও পেল ভূতে। নানাবিধ রাসায়নিক ও খনিজ তেলের সস্তা-সরবরাহের ফলে। হারমোনিয়াম এসে ক'রে দিল পল্লীর একতারা আর বাঁশের বাঁশীকে। ও রেডিও মারফৎ 'যেইসা-তেইসা আর লারে লাপ্পা' এসে হাজির হলো পল্লী-মজলিসে! থেমে গেল স্থানীয় গায় কণ্ঠসঙ্গীত। সারভাইব্যাল অব্ দি ফিটেষ্ট-নীতির জয় পতাকা উড়িয়ে সর্ব্বত্রই সহর করলো দুর্ব্বল পল্লী শ্বাস-বোধ। পল্লীর এই পরাজয়ের মূলে অর্থকরী যন্ত্র-কৌশল ছাড়া আর কি আছে? যে মাতালটা পুলীশকে বলেছিল—'বাবা! মদ বেচেই যদি পয়সা লও, মাতালকে আর জরিমানা করো না। অধর্ম্ম হবে···একমাত্র সেই বোধ হয় বুঝেছিল—এই পশ্চিমী যন্ত্র-কৌশলের গূঢ়-তত্ত্ব।

জন-সমৃদ্ধ পল্লীর মর্ম্মস্থলে যে আঘাত করেছিল, সহরের আপাত-মধুর শিক্ষা ও সভ্যতা, তার ফলেই ভেঙে

ভারতীয় জীবনাদর্শের মেরুদণ্ড। রুচি-বিকারের ফলে ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ সহরাভিমুখী। বহু সৌধ-সমন্বিত গ্রামও এখন জনশূন্য। অনেক নূতন নূতন সহর-তৈরির পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। কিন্তু, এই সব পরিত্যক্ত পল্লীকে আবার জন-সমৃদ্ধ করার কোন উপায় কি নেই? কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে?

(৫)

অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে গতি-বাড়ানো অনেক সময় বিপজ্জনক। কপালে দু'টো চোখ আছে বলেই—যা-কিছু সবই আমি ঠিক্ দেখতে পাচ্ছি—এ ধারণা ভুল।

'ক' বেজায় লাভবান হলো, 'খ'য়ের কাছ থেকে খুব অল্প-মূল্যে একতাল সোনা কিনে। ঘরে এসে কষ্টিপাথরে সে দেখ্‌লো—সোনা নয় পিতল। ক ও খ দুজনাই রুগ্নমান। একজন অতিলোভী, আর একজন প্রতারক। সর্বনাশ ও মনস্তাপের জন্য অতি-লোভীর শাস্তি হাতে-হাতেই ভোগ হয়ে গেল। প্রতারকের শাস্তি শিঁকেয় তোলা থাক্‌লো, জল না-খাটা পর্য্যন্ত। দু'দিকেই রিপুর তাড়না। রিপু বশীভূত মন শুধু ব্যক্তিকেই বিপন্ন করে না, জাতিকেও করে। এই যন্ত্রযুগে ষড়-রিপু-কাল্‌চারের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে—তার ফলেই কি বিশ্ব-শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে না?

বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রত্যেকটি ঘটনার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ খোঁজে। তার সব কিছু ধ্যান-ধারণা মস্তিষ্ক-চালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্তরের প্রেরণাকে আমল দিতে চায়না সে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য যতদিন কালো যবনিকার আড়ালে লুকানো থাক্‌বে—ততদিন মানুষের পক্ষে সংস্কার-মুক্ত হওয়া কি সম্ভব? এই সংস্কার বা স্বকীয়তাই গড়ে তোলে তাদের রুচি ও প্রবৃত্তি। দেশ-ভেদে রুচি-প্রবৃত্তির বৈষম্য চিরদিনই আছে ও থাক্‌বে। জল-বায়ু ও খাদ্য-বিচারের উপর নির্ভরশীল জাতিগত বৈশিষ্ট্য-রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণই বিশ্ব-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র পন্থা।

মানুষের সংস্কার কোনো যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা রাখে না। ভাল-লাগার আর মন্দ-লাগার বিচারেই রুচিপ্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—কিন্তু নির্মূল করতে পারে না। এ সম্বন্ধে উদ্ভটের একটি চমৎকার শ্লোক আছে।

এক পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন—

তিলঞ্চ সর্ষপঞ্চ উভয়ে তৈল-দায়ক—
তর্পণে তিল দরকারং—ভূতে সর্ষপ কি-কারণে?

প্রশ্নটির জবাবে আর-এক পণ্ডিত বল্‌লেন—

ঢাকঞ্চ ঢোলঞ্চ উভয়ে বাদ্যকারক—
বিবাহে ঢোল দরকারং—ঢাক নাস্তি যে-কারণে!

প্রাচ্য পণ্ডিতরা এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা লোক-রুচিকে কখনই অস্বীকার করেন নি। জন-কল্যাণের দাবীতে মিথ্যা বা চাতুর্য্যকেও তারা প্রশ্রয় দিয়েছেন। বলেছেন—'যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী—চাতুরী!' সমাজ-বিজ্ঞানীরা মদ্যমাংসও নিষিদ্ধ করেন নি। তার জন্যে জরিমানা আদায় করেছেন একটি কালী-পূজা দাবি ক'রে। পূজার ট্যাক্স্ না দিয়ে মাংস আহারের উপায় ছিল না। আজ পথে-ঘাটে যদিচ্ছা ও বৃথা মদ্য-মাংসের ছড়াছড়ি। প্রগতির এই রুচি-বিকার জাতির পক্ষে কখনই কল্যাণকর হতে পারে না।

মানুষের মনের গতি বিচিত্র। এই গতি-নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিজ্ঞানীকে হাতে-হাত মেলাতে হবে দার্শনিকের সঙ্গে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধির জাগরণই ছিল একমাত্র কাম্য। তা' তো হ'ল না? গান্ধী-শিষ্যরা আজ পশ্চিমী রংয়ে ও ঢংয়ে মশগুল হয়ে উঠেছেন—এ অভিযোগ কি অস্বীকার করা চলে?

এই যন্ত্রযুগে সভ্যতাগর্ব্বী মানুষ আজ প্রধানত দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে সমবেত হয়েছে—যুদ্ধং দেহি মন-ভাব নিয়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হলেও, যান্ত্রিক কেরামতিতে এ বলে আমাকে দেখ্! ও বলে আমাকে দেখ্! দেখার চোখ যদি কারো থাকে, তাহলে সে উভয়কে দেখেই বহু শিক্ষালাভ করতে পারে।

একটি সংবাদ উদ্ধৃত করতে চাই। "কয়েক দিন পূর্ব্বে ওয়াশিংটন-নগরে যন্ত্রশিল্পীদের নিরাপত্তা-বিধানের উপায় আলোচনার জন্য যে সম্মেলন আহুত হইয়াছিল, প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যান সেখানে বলিয়াছেন—গত বৎসর অমেরিকার শিল্প-কারখানাগুলিতে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে ১৬ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ২০ লক্ষ শ্রমিক কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়াছে এবং এই সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দিতে ৫ শত কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছে।"

এই সংবাদ-পরিবেশনের সঙ্গে সাংবাদিক যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—তাও প্রণিধান-যোগ্য।

"যন্ত্র-দানবকে খুশী করিবার জন্য মানুষ তাহাকে যত রকমে পূজা দিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে বর অপেক্ষা অভিশাপই যেন বেশী পরিমাণে পাইতেছে।"

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে হিসাব দাখিল করেছেন—সে তো সুদের পট্‌পটি। আসলের জন্যে অনেক হিরোশিমা ও নাগাসাকির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে লৌহ যবনিকার অন্তরালে চলেছে মারণ-যজ্ঞের বিরাট ব্যবস্থা ঘৃত ও সমিধ-সংগ্রহের অক্লান্ত চেষ্টা। এ প্রস্তুতির মূলে কি আছে? (১) যন্ত্রকৌশলে জাগতিক সুখ-সম্ভোগে অত্যুগ্র লালসা (২) অন্তরের দৈন্য-প্রসূত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভয়-বিহ্বলতা। বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-কামনা প্রেম-ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছাড়া, এ দুর্দ্দৈবের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নাই। ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতার লক্ষ্যই ছিল তাই।

প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

রেখা-শিল্পী—ম্যালকম ম্যাসন

বিয়ে আর ক্রিকেট খেলা যে একই জিনিস সে আবিষ্কারটা হল হঠাৎ।

জ্ঞাননেত্র অবশ্য এরকম হঠাৎই খুলে যায়। বাদলা দিনের শ্যাওলা ছাতা থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কারের মতই আকস্মিক ভাবে।

তা পেনিসিলিনের মত বিষয়বুদ্ধিঘটিত বস্তুতন্ত্রের আবিষ্কার আমাদের অধ্যাত্মবাদের দেশে শোভা পায় না। তাই আমাদের পরমার্থ প্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া যাতে সহজ হয়, এমন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই আপনাদের আজ পরিবেষণ করছি।

কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে বসে টেষ্ট ম্যাচ দেখছি। সারা সকাল "কিউয়ে" দাঁড়িয়ে কয় বন্ধুতে মিলে অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকেছিলাম। সেই কষ্টের উপর সারাদিন বিদেশী দলের ব্যাটসম্যানদের ভুড়ুং ঠোকা সহ্য করে যাচ্ছি।

তাতেও শেষ নেই। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা টপাটপ গোল-গাল রসগোল্লা মুখে ফেলে দেওয়ার মত করে রসাল ক্যাচগুলো মাটিতে ফেলে দিচ্ছে।

সান্ত্বনা দিল নীহার। বলল—এতে দুঃখ করছ কেন। আমরা সনাতন অতিথি সৎকারই ত করে যাচ্ছি খেলার মধ্যে দিয়েও। সবগুলো ক্যাচ ধরে ফেলা, চট করে আউট করে দেওয়া, দেশে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে হারানর চেষ্টা করা—এগুলি ত শত্রুতার কাজ হত। বোঝ না কেন তোমরা।

শুকনো স্বরে বললাম—ঠিকই বলেছ। যতদূর মনে পড়ছে বছরের পর বছর আমরা এই ধরণের বন্ধুত্বের কাজই করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্ববন্ধু, তাই বিদেশে গিয়েও এই রকমই করে আসি।

নীহার হেসে ফেলল—নাঃ, তোমাকে দিয়ে আশা নেই। তোমার স্মৃতিশক্তি বড় খারাপ।

কেন? কোন্ বছরের খেলার ফল ভুলে গেছি দেখিয়ে দাও। গুলোই মনে আছে—প্রতিবাদ করে বললাম আমি।

ঠিক সেই জন্যই ত বলছি যে তোমার স্মৃতিশক্তি খারাপ। বি সুবিধাজনক ভাবে ভুলে যেতে পার না।

নীহারের উত্তরের মধ্যে এই যুযুৎসুর প্যাঁচ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলা

ইতিমধ্যে আমাদের ফিল্ডারদের নন্দদুলালের মত হেলে দুলে যে ধেনু চরাবার ভঙ্গিতে বিচরণ করতে দেখে গদাধর গাইতে সুরু ক গুণ গুণ করে,—

"কানু কহে রাই
কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই"

ভাবের আবেগে সে—আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি—এই মো লাইনটাতে পৌছান মাত্র আবার একটা হৃদয়-বিদারক ব্যাপার হয়ে গে আমাদের একজন নন্দদুলাল ননীমাখান হাত দিয়ে আকাশের দেখবার জন্য উপরে মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু হায় হায় ওটা চাঁদ সূয্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামান্য খেলার একটা বল। I দুলাল তখন বোধহয় ননীচোরার বাল্যাবস্থা কাটিয়ে কিশোর প্রেমি দশা প্রাপ্ত হয়েছে। গদাধরের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেও ভাবা আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি। বল ধরার আমি কিবা জা আমি ছেলেবেলায় বালগোপাল সেজে উদুখল নিয়ে খেলেছি। কিম বলে বল? এমন অশাস্ত্রীয় কথা?

নৈব নৈব চ।

বল ততক্ষণে বাউণ্ডারীর কাছে দাঁড়ান ফিল্ডারের কাছে এসে বি অন্যায়ভাবে একটা প্রতারণা করল। আমাদের খেলোয়াড় ফুটবলের

ই জন্য হাত দুখানা তৈরী করে রেখেছিল ; কিন্তু মায়াবী বলটা টের বল সেজে নাড়ুগোপালের ভঙ্গিতে দাঁড়ান শ্রীমানের দু হাতের ান দিয়ে একান্ত অন্যায় করে মর্ত্যে অবতরণ করল। শুধু তাই অত্যন্ত unsportsman like ভাবে অখেলোয়াড়ী মনোভাব য় গড়াতে গড়াতে বাউণ্ডারী পার হয়ে ওদের খেলোয়াড়কে চার াইয়ে দিল।

র পর আর সহ্য করতে না পেরে গদাধর গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে । ওই গানেরই উপযুক্ত গলা উচিয়ে হেঁকে বলল—বেরিয়ে যাও খকে।

বাই বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল—সম্ভবত মনে মনে সায় দিলেও কান রকম অখেলোয়াড়ী ভাব দেখাতে রাজী নয়।

ন্ত পাশের দু ছোকরার চোখে রাগ ফুটে উঠল। ওদের কিস ন্তব্যে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওরা পরার্থে প্রাণ পর্যন্ত দিতে আর বিদেশীদের শুধু বিনা খরচে কিছু 'রাণ' পাইয়ে দেওয়া অতি ব্যাপার।

ত্তেজনায় গদাধর দাঁড়িয়ে উঠেছিল। পদ্মার ওপারের গরম ভাবটা ওর কেটে যায় নি। তাই হার মানতে ও রাজী হয় না । ব্যাপার বেগতিক হতে পারে দেখে হাত ধরে টেনে বসিয়ে ।

লাম—করছ কি ? চুপ করে বসে খেলা দেখে যাও।

রাতে গজরাতে বলল—কি ? এই খেলা দেখার জন্য পয়সা খরচ কিউএতে দাঁড়িয়ে দণ্ডভোগ করতে এসেছি ?

হার লড়াই করতে রাজী নয়। শান্তি স্থাপন করবার আশায় —আঃ ও বেচারারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কেন চটছ উপর ?

ই দু ছোকরার মধ্যে একজন ঝালছোলা চিবাতে চিবাতে চোখের ত ঝাল ছড়াতে ছড়াতে বলল—মশায়, ওরা খেলতে নেমে দের কৃতার্থ করেছে সেটা মনে রেখে কথা কইবেন। ওরা যদি ন্দোর বোম্বাই থেকে না খেলতে আসত দয়া করে—তাহলে কি এমন টেষ্ট ম্যাচটা হত কলকাতায় ? চেপে যান মশায়। আর ট নট।

হার বলল—ঠিক বলেছ ভাই, আমরা শুধু খেলা দেখতে আসি খরচ করে, নিজেরা খেলবার মত হাঙ্গামে আমরা নেই। সারাদিন রহনত করা, রোদে পোড়া, অসভ্য দৌড়-ঝাঁপ। ছ্যাঃ, ওসব কি কের কাজ ?

তে ছোকরারা না শুনতে পায় সেজন্য গদাধর আমার কানে কানে শীহার একটা কথার মত কথা বলছে। কিন্তু ভেবে দেখ, ই আসল খেলোয়াড়। কেমন বুদ্ধি করে সেই পেশোয়ার থেকে র পর্যন্ত সব জায়গার লোকদের জড়ো করে এনে কিষ্কিন্ধ্যা রেছি, আর নিজেরা তোফা আরামসে পায়ের উপর পা তুলে বসে খেলা দেখছি।

ওর মনের রাগটা অন্যদিকে সরে না গেলে আবার দু চারবার দাঁড়িয়ে উঠে সবার নেক নজরে পড়তে পারে এ ভয় আমার ছিল। তাই অন্য কথায় ওকে ভুলাবার চেষ্টা করলাম। বললাম—জানই ত আমাদের দৌড় কতদুর। কেন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাও। এই কালই দেখলাম ছাদে উঠে গত দশ বার দিন যে দুই ছোকরা একসারসাইজ করছে বলে মনে করত—ওরা রাস্তায় নেমে সবার সামনে নিজের হাতের প্যাকাটি দেখিয়ে দেখিয়ে হাকছে—দেখ হরে, আমার আজীবন সাধনা।

আর আজ ওরা কি করছে ?
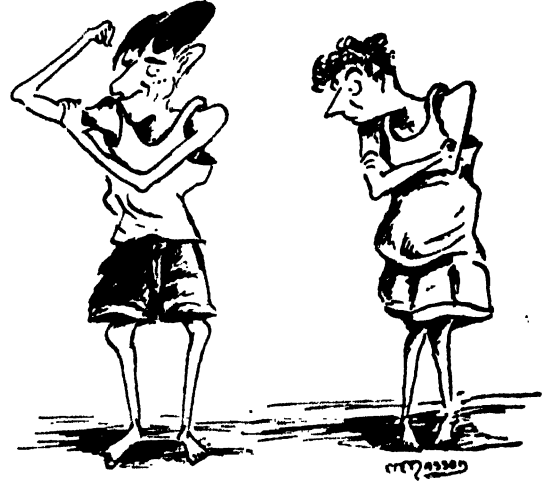
আমার আজীবন সাধনা

বুঝে নিতে কোন কষ্ট হল না। এরই মধ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে। আজ ছাদে উঠে সাধনার সময় ওদের টিকির পাত্তা পেলাম না। ভাবলাম বোধ হয় এগজামিনের তাগিদ এসে গেছে। কিন্তু হরি হরি। দেখি সেই গলির মোড়ে কোন্ ইনকিলাবের দলে ভিড়ে সেই প্যাকাটি হাত দুলিয়ে ঝাণ্ডা কাঁধে চলেছে। সাধনার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমাদের অতিথিরা তাদের ভানুমতীর খেল সাঙ্গ করে ভারতীয় দলকে মাঠে নামিয়েছেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধে এগিয়ে আসা ইংরেজ জাহাজের মত হেলতে দুলতে নেমে এল আমাদের দুই ধুরন্ধর। কিন্তু ওরা মোটেই স্বার্থপরের মত মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকার লোক নন। অন্য সঙ্গী খেলোয়াড়দেরও ত নিজেদের লোকের চোখে তুলে ধরার সুযোগ দিতে হবে। তাই টপাটপ তারা পরের জন্যই প্রাণ দিতে লাগল।

আমরা বসে দেখতে লাগলাম। এইটুকু খেলাই বা আমাদের দেখাচ্ছে কে ? ভাগ্যিস, ওরা নানা দূর প্রদেশ থেকে এসেছে খেলতে।

পিছন থেকে ফিস ফিস করে কথা এল। সামনে দেখার মত কিছু নেই দেখে পিছনের কথাই শুনতে লাগলাম।

ভাই, চাকরীটা এবার নির্ঘাৎ যাবে। খেলাটা দেখার জন্য 'সিক লিভের' দরখাস্ত দিয়ে এসেছি কিন্তু বড়সায়েব ব্যাটা কি আর বিশ্বাস করবে ? এ খেলাটা না দেখতে আসাই উচিত ছিল।

তা, চাকরীটার মুরুব্বী ছিল কে? তাকে ধরলেই ত এবারকার মত বেঁচে যেতে পার।

কথাটায় কোন ভরসা পেল না অফিস-পালানো লোকটি। বলল—মুরুব্বী একজন নিশ্চয়ই ছিল তখন। না হলে দোরে দোরে ধর্ণা দিয়ে চাকরী পাওয়া কি আর আমার কাজ? বুড়ো বাবা নিজেরই গরজে ছুটো-ছুটি করে একজন মুরুব্বী জোগাড় করেছিলেন। তা বাবা ত আর কারো চিরকাল থাকে না।

তবে ত মুস্কিলই হল। আর চাকরীর যা বাজার। উমেদারেরও লেখা-জোখা নেই। একটা চাকরীর জন্য হাজারটা উমেদার।

নীহার চুপি চুপি মন্তব্য করল অর্থাৎ এ যুগের উমার তপস্যা।

এ যুগের উমার তপস্যা

মহাদেবের অর্থাৎ মহানায়কদের ধ্যানভঙ্গ করতে পারবে তার জন্য সাধনা।

হঠাৎ পিছনের আর একটা টেবিল থেকে ফিসফিসানি কানে এল। "বেড়ে আছে বাড়ি, একটা ভাল চাকরী বাগিয়েছে ও হাতে স্বর্গলাভ হয়েছে। চায়ের আসর মাৎ করে বেড়াচ্ছে ছোকরা। আজ এখানে, কাল ওখানে। মেয়েদের মায়েদেরও নয়নলোভা।"

নীহার কানে কানে বলল—চুপ করে শুনে যাও। একটা মজার কিছু বের হবে মনে হচ্ছে।

আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। কার দিকে লক্ষ্য করে কথাটা আসছে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে লোক যাচাই সুরু করলাম।

চিনতে বেশী দেরী হল না। চেকনাই মারা তরুণ, হালেই চাকরী পেয়েছে মনে হচ্ছে। মুখে একটা পরম সুপ্রসন্ন ভাব। একেই নিশ্চয় মেয়ের মায়েরা চায়ের আসরে ডাকাডাকি করে থাকে।

তরুণের চেহারা দেখে চরিত্র যাচাই করতে সুরু করলাম আমরা। শার্লক হোমস্ কি এত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ধার কাছ দিয়েও গিয়েছিল কখনো?

আমি বললাম—মনে হচ্ছে শ্রীমান একটি আসল রাজহংস। ঘাটে ঘাটে পাখা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভিড়বার নামটি নেই।

কন্যাকর্তাদের ঘাটে ঘাটে রাজহংস

হরিহরও সায় দিল। বলল—ঠিক বলেছ, একেবারে ঠে... এরা হচ্ছে খেলোয়াড়, যদিও স্পোর্ট নয়। নীর থেকে ... এ পড়বার তালে থাকে।

হরিহর এতক্ষণ খেলার মধ্যে আর কোন মজা না পেয়ে একটা দিকে বেরিয়েছিল। এক প্যাকেট চানাচুর হাতে নিয়ে আমাদের আসরে ফিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে যোগ দিল। বলল—ঠিক বলেছ আ... এই নটবরটিকে লক্ষ্য করছি অনেকক্ষণ থেকে। মনে হচ্ছে ওই কোন বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়। আমায় দেখে রেখো হে—এমনি ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে যেখানে যেখানে মেয়েরা সেখানে ঘুরছে।

বললাম—সার্থক নাম এ চায়ের পার্টির—গার্ডেন অব ইডেন। বাগান নিশ্চয়ই।

একটু নড়ে চড়ে বসল নীহার। বুঝলাম যে একটা আইডিয়া ওর মাথায়। এদিকে আমাদের খেলোয়াড়দের পদার্পণে প্রাণ উ... করবার উৎকট বাসনা আর সহ্য হচ্ছিল না। তাই ক্রিকেটের চেয়ে আ... কিছু সময় কাটানোর পথের অত্যন্ত দরকার পড়ে গেল।

প্রজাপতির ক্রিকেট।

নীহার বলল—ভাই, এই তরুণকে দেখে দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল আমার। এই দেবতাদের বাগানে যে ক্রিকেট খেলা হয় তা হচ্ছে পতির ক্রিকেট। ধরে নাও ওই নিটোল নিভাঁজ পুরুষ, নবচাকুরে এ ব্যাটসম্যান। আমাদের কীর্তিমানদের জায়গায় যদি ওকে দাঁড় দাও নেহাৎ বেমানান হবে না। তবে বেচারা চিরকালই যে এমন নটবর ছিল তা নাও হতে পারে।

ঠাট্টা করে বললাম—অর্থাৎ নাথ প্রথম থেকেই ত আর সাধক হয় নি।

ঠিক বলেছ ভায়া—সমর্থন করল হরিহর ও চানাচুরের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু শোনই না কথাটা আমার।

নীহারের কণ্ঠে তাড়া দেবার সুর পেয়ে আমরা চুপ করে গেলাম।

াটা মাঠই চুপ করে আছে মা বলভারতীর অবলা অবস্থার সঙ্গে বেদনায়। গীত-ভারতী নৃত্য-ভারতী মায় বিশ্বভারতী পর্য্যন্ত হল গিয়ে

প্রেমারণ্যে হরিণ শাবক

ব অবদান বিশ্বের প্রতি আমাদের। কিন্তু বলভারতীর সেবায় আমরা শুধু দর্শক, স্পর্শদোষ আমাদের হয় নি।

বেচারা তরুণ প্রথমে সম্ভবত প্রেমারণ্যে নিরীহ হরিণ শাবকের মতই প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদারা—

বাধা দিয়ে বললাম—সে কি? এ যুগে চিত্রাঙ্গদা?

অবশ্য—গম্ভীরভাবে বলল নীহার। অবশ্য, চিত্রাঙ্গদারা—আহা স্নো পাউডার রুজ লিপষ্টিকে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—শিকারে বেরিয়ে এদিক ওদিক শর নিক্ষেপ করতে সুরু করলেন।

কিন্তু গাঁথেন করতে পারলেন না—টিপ্পনী কাটল গদাধর।

আহা চুপ কর না গদাই। বেচারা হরিণশাবক শিকারের সন্ধানে প্রেমারণ্যে চারদিক থেকে বাণ খেতে খেতে অস্থির হয়ে পড়ল। শেষে যেন দিন এল যখন তার বন্ধুরাও আর চায় না যে সত্যি সত্যি ওর বিয়ে ামক কাণ্ডটা ঘটে যায়। একদিন একজন বন্ধু ওকে জিজ্ঞেস করল—হে ভায়া, শুনছি কুমারী মৃগয়া মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তরুণ।—না, তা হয় নি। তবে এই কানাঘুষোটার জন্যও আমি তজ্ঞ।

বন্ধু। শুনে বড় দুঃখিত হলাম।

তরুণ। সে কি? তুমি আমার এমনি বন্ধু যে আমার শুভবিবাহ, তাও তুমি চাও না?

বন্ধু। না হলেই সুখী হব। কারণ বিয়ে হলেই যে ফুরিয়ে গেল। এত মুখরোচক খবর আর খাবার দুই-ই যে, বন্ধ হয়ে যাবে তার পর থেকে।

তরুণ। অর্থাৎ গুড-নাইট ভিয়েনা?

বন্ধু। এগ্‌জাকটলি সো। অতএব বুঝেছ—ভায়া—কখনই বিয়ে না, কারণ তাহলেই ভিয়েনা বন্ধ হয়ে যাবে। ছাদনা-তলায় একবার গেলেই এ জীবনের মত বাড়ী বাড়ী মগাসে ছানার ডালনা মারা বন্ধ হয়ে যাবে।

তরুণের মনে কথাটা এমন ভাবে গেথে গেল যে কোন তরুণীর কথা সে রকম ভাবে ওর মনে ঢুকলে ওর আগেরের বন্দোবস্ত হয়ে যেত। যাই হোক, শিক্ষা বেচারার খুব ভাল করেই হয়ে গেল। এখন থেকে সুরু হল ক্রিকেট খেলা। পঞ্চশরের লক্ষ্যভেদ যখন ব্যর্থ হল, এগিয়ে এল প্রজাপতির ক্রিকেট।

আর প্রত্যেক ম্যাচই হচ্ছে এক একটা টেষ্ট ম্যাচ।

এই শীতের পড়ন্ত দিনেও আমরা একটু গরম আমেজ বোধ করতে লাগলাম।

ইডেন গার্ডেনের বদলে খেলার আসর হবে চায়ের বৈঠকে। অবশ্য ব্যাটসম্যান বরের গ্লাভস (দস্তানা), নাগরার প্যাড—এসব দরকারী সাজ সেজে কাউন্টি ক্যাপের বদলে কাঁধির পাঞ্জাবি চশমা পরে নিজের উইকেট রক্ষা করতে রঙ্গভূমিতে নামবে। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে মেয়ের একাদশ ফিল্ডসম্যানেরা। যথা কনের বোন, বৌদি, পাড়াতুতো সখী প্রভৃতিরা। তাদের ফিসফাস কথা উসখুস কানাঘুষো এনে ব্যাটমোসফিয়ারে একটা আবেশ বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাউণ্ডারীর পাশে পাশে, উইকেট থেকে দূরে দিনের আবরণের পিছনে দর্শক হচ্ছে প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়ারা। কখনো বাজান হয় না এমন একটা কটেজ পিয়ানো বা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বইও ছড়ান আছে।

কেন আমরা? নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল হরিহর। কেন আমরা দর্শক হব না কেন? বন্ধুরা কি খেলেনা?

না হে না, তোমরাও খেলনা না- হেসে উত্তর দিল নীহার। তোমরা হচ্ছ বদলী অর্থাৎ সাবষ্টিটিউট। অথবা 'টুড নট ব্যাট' সেই দলে। যদি খেলা শুরু হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আর মাঠে নামবার সুযোগ পেলে না। তবে তোমাদের দিকেও নজর আছে জেনে রেখো। বিশেষ করে ওই সব বাড়'তি (একস্ট্রা) ফিলডারদের। ওদের মধ্যে আজকাল বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য টেষ্ট ম্যাচে ভাগ্য পরীক্ষা করবার সুযোগ আর পায় না এমন কয়েকজন খেলোয়াড়ও থাকতে পারে।

আচ্ছা এখন খেলাটা সুরু করে দাও। মনে হচ্ছে এই টেষ্ট ম্যাচের চেয়ে ওই টেষ্ট ম্যাচটাই বেশী মজার হবে।—বললাম আমি।

কোন তুলনাই হয় না এই দুটোতে। পাত্র উইকেটের সামনে এসেই মাপ জোক সুরু করল অবস্থাটার। এক চোখে দেখেই বুঝে নিল যে টিপয়ে যে কেকটা সাজান আছে সেটি হচ্ছে কনের নিজের হাতে তৈরী বলে পরিচিত ফারপোর কেক। যে কটেজ পিয়ানোটি সাজান আছে

সেটি শুধু একটা আসবাব হিসাবেই শোভা পায়। ওই রাজ্যান সাহিত্যের বইগুলি শুধু কথাবার্তায় রসান যোগায়; ভেতরের পাতাগুলিও কাটা হয় নি। কনের হাতের সূচিশিল্পের নমুনাগুলো কমরেডীভাবে সব •হবু-কনে মেয়ের চায়ের আসরে কুটীরশিল্প-বিপণি থেকে এসে হাজিরা দেয়।

আমিও একটু একটু প্রেরণা পেতে আরম্ভ করেছিলাম। বলে ফেললাম—যাদের বিয়ের উপক্রমণিকাতেই এত, তাদের উপসংহারে না জানি কেমন হবে।

কেন? তোমার এ সন্দেহের কারণ কি?—গল্পের স্রোত থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল নীহার।

বললাম খুলে কারণটা। মাত্র গত কালই আমাদের পাশের বাড়ীতে দেখেছিলাম। অনেক দিন পূর্বরাগ করে দুজনে বিয়ে হয়েছিল। কাল স্বকর্ণে শুনলাম ওদের অনুরাগের কথাবার্তা। সেদিনের ষোড়শী এদিনের ধাঁড়াণী হয়ে জিভ চালাচ্ছে ছুরীর মত। মনের মানুষটিরও রঙের ফানুস চুপসিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য।

সেদিনের মানসী মনসার মত বলছে—আমি যদি তোমার স্বামী হতাম, তোমায় বিষ দিতাম।

প্রজাপতির ক্রিকেট খেলা

সেদিনের প্রিয়তমা ফণা তুলে বলল—আর আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম, সে বিষ আমি খেতাম।

সান্ত্বনা দিয়ে নীহার বলল—না, না; এত নিরাশ হবার কারণ নেই।• আর এটা হচ্ছে বিয়ের আগের অবস্থা। দিল্লীর লাড্ডু পরে কি জিনিষে দাঁড়াবে সেটা এখন না ভেবে—

দুর্গা বলে ঝুলে পড়াই ভাল—ফোড়ন কাটলাম আমি।

না, না, ঝুলেই যে পড়তে হবে তেমন কাঁচা ছেলে আমাদের ব্যাটসম্যান নয়—বলল নীহার। সে চারদিকে নজর রেখে নিজের উইকেট সামলাতে লাগল। এমন সময় খেলার মাঠে নামল ভাবী শাশুড়ী—উইকেট কিপিং করবার জন্য।

ওঃ, সেই ইংরেজীতে যাকে বলে মাদার-ইন-ল! বাব্‌বাঃ। সেই ভয়ে ওরা বিয়ে করতেই চায় না। মনে পড়ল সেই মর্মান্তিক কথাটা। জান, খৃষ্টানদের বিগামির (দুই বিয়ের) শাস্তি কি?—প্রশ্ন করলাম আমি।

হরিহর বলল—জেল।

মাথা নাড়লাম। উঁহু, হল না।

গদাধর বলল—জেলের উপর সমাজে নিন্দা।

তবু হল না। উঁহুঃ, অত সহজ শাস্তি নয়।

নীহার বলল—বলছি। দু দুখানা শাশুড়ী।

সাবাস। ঠিক বলেছ। আমেরিকাতে নাকি আজকাল গুণ্ডারা বৌয়ের বদলে শাশুড়ীকে কিডন্যাপ করে লোপাট করে নিয়ে যায়। তার পর চিঠি লিখে শাসায়—দাও পাঠিয়ে পাঁচ হাজার ডলার জলদি; না হলে এই পাঠালাম শাশুড়িকে ফেরৎ।

আবার ক্রিকেটের কাহিনী সুরু হল। • শাশুড়ী ঘরে ঢুকে ব্যাটসম্যানের গতিগতি হাব-ভাব স্বভাব এসব তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল। কখনো মাথা উঁচুতে তুলে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে দেখার মত পাত্রের পা থেকে মাথা আর মতিগতি পর্য্যন্ত বাচাই করতে লাগল। তারপর খেলাতে নামল কনে। চারদিকে চোখে চোখে হাত-তালি পড়ে গেল। পাত্রের চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পাত্র ব্যাটের মত করে হাত তুলে একটি একটু নমস্কার জানাবে। মেয়ে তখন দেখাবে করপদ্মের একটু নাচন। তার ভিতরে যে বল আছে সেটাকে পাত্র ছিটকে ছুঁড়ে বাউণ্ডারী করে বেরিয়ে যাবে, না কট-আউট বা ক্লিন-বোল্ড হবে জানা নেই কারো। কনে বল ছুড়ল, কিন্তু প্রতি-বেশিনী বা আত্মীয়া অন্য কেউ সে বলে ক্যাচ ধরে ব্যাটসম্যানকে সাবাড় করে দিল এমন অঘটনও ঘটতে পারে কখনো কখনো।

তা, কনে খেলতে নামার পর অন্য ফিল্ডাররা কি তখনো সমান দরকারী নাকি?—প্রশ্ন করল হরিহর।

অবশ্য জরুরী দরকারী। ওরা আরো বেশী হুসিয়ার হয়ে মাথামাথি হয়ে কাছাকাছি এগিয়ে আসবে—যাতে কনের সঙ্গে বা ওদের সঙ্গে সব কথাবার্তাতেই এক আধটা ক্যাচের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দরকার মত

পিছিয়ে গিয়ে মাঝের মাঠটা খালি করে দিতেও আপত্তি নেই। যাতে রান করতে করতে বাউণ্ডারী হয়ে বল না বেরিয়ে যায় সেজন্য সতর্ক পাহারা।

বেচারা! দুঃখ হচ্ছে ওর অবস্থা ভেবে—বললাম আমি।

কেন, আমার ত একটু হিংসাই হচ্ছে—প্রতিবাদ করল হরিহর।

তবে শোন বলছি। সেদিন আমি তিন জন পোষ্ট গ্রাজুয়েটের পাকা ছাত্রের কথাবার্তা শুনছিলাম। সত্যি সত্যিই পাকা অর্থাৎ আশুতোষ বিল্ডিংএর বেঞ্চিতে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করেছে।

একজন বলল—দেখ ভাই, আমাদের সুখেন্দুর বরাত বড় ভাল। প্রেমের ব্যাপারে খুব ভাগ্যবান্।

অন্য একজন বলল—কেন? ও বুঝি সর্বদাই ওর 'লেডি-লভকে পেয়ে যায়।

উত্তর হল—না, ও এখনো অবিবাহিত রয়ে যেতে পেরেছে। প্রেমে ড়ে, কিন্তু পাকড়াও হয় না।

হো হো করে হাসিতে সবাই গড়িয়ে পড়ল। এক নীহার বাদে।

সে বলল—সেটা দুর্ভাগ্যও হতে পারে। কারণ ভেবে দেখ, তার ধন শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাবে তখন ধর সে একদিন ইষ্টবেঙ্গল াহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে—এমন সময় যদি কোন াগেকার বান্ধবী এসে বলে হ্যালো—তখন কেমন হবে?

বললাম—এমন আর কি? তার চেয়ে ভেবে দেখ—সে তার াগেকার বান্ধবীকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছে, এমন সময় তার স্ত্রী এসে াল—হ্যালো। তখন কেমন হবে?

নীহার হার স্বীকার করল সবিনয়ে।

কিন্তু তা বলে তার ক্রিকেটের গল্প শোনানর দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেল না। আবার সুরু করল।

মেয়ে দেয় বল, ছেলে ঠেকায় ব্যাট, মেয়ের মা রাখে উইকেট, আর পাত্রীপক্ষ করে ফিল্ডিং। তবে প্রত্যেক ওভারে ছটির বদলে মাত্র পাঁচটি বল। পঞ্চশরের কারবার কিনা।

আর আম্পায়ার?

আম্পায়ার হচ্ছে ঘটক ঠাকুর, অথবা কনের পক্ষের কোন হিতৈষী বা বরের কোন বন্ধু। মোট কথা খেলার মাঠে তাকে থাকতে হয় অলক্ষিতে। অবশ্য আসলে অলক্ষিত আম্পায়ার হচ্ছে পঞ্চশর। চট করে হৃদয়ে আহত হয়ে হিট-উইকেট হবে না, সোজাসুজি ভদ্রলোকের মত বোলড্-আউট হবে, না বেকায়দায় পড়ে এল-বি-ডবলিউ হবে এ সম্বন্ধে এক আম্পায়ারই রায় দিতে পারে। মোট কথা নট-আউট হয়ে মাঠ থেকে বাঁধনছেঁড়া গরুর মত বেরিয়ে যেতে না দেওয়ার দিকে সবাই কড়া লক্ষ্য রাখে।

ঠিক বলেছ ভাই; সে খেলাই আসল খেলা। ইংরেজরা তাই বলেছে যে নেপোলিয়নের সঙ্গে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ওরা ইটন স্কুলের খেলার মাঠেই জিতেছিল।

আমার কথার ভাবে কোন যুদ্ধং দেহি ভাব আর ছিল না; কারণ টেষ্ট ম্যাচের যুদ্ধও ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। চারদিকে লোক গুটি গুটি উঠে সরে পড়তে আরম্ভ করেছে।

শুধু গদাধর বলল—চল আমরাও ইটনের খেলার মাঠের মহড়াটা ইডেন গার্ডেনের বাইরে গিয়ে দিতে সুরু করি। প্রজাপতির ক্রিকেট থাকতে ভাবনা কি। আমাদের খেলার সুযোগের অভাব হবে না।

সাবিত্রী

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

ত্যবান প্রাণহীন—প্রাত্যহিক মৃত্যুতে শীতল!
সাবিত্রী, প্রাণ আনো—জীবন ফিরায়ে আনো
মৃত্যুলোক হ'তে।
গ্রগামী মহাকাল, চরণ মিলাও তব তারি পদক্ষেপে,
আলোক—এ বাতাস—এই মাটি পার হ'য়ে যাও।

প্রাণহীন সত্যবান নিশ্চেতন ধূলির শয্যায়,
এখনো সময় আছে, মহাকালে অনুসর সতী।

যতই দুস্তর হোক—দীর্ঘ হোক এ চলা তোমার,
তবু অতিক্রম কর ক্ষুরধার-নিশিত এ পথ।

জ্যহারা কত অন্ধ কাঁদে!
দের দৃষ্টির তরে হে সাবিত্রী, তোমার সাধনা
মের যাত্রাপথে সুরু হোক তবে।
্যায়, স্বার্থের আর অজ্ঞানের যত অন্ধত্বেরে
সাবিত্রী, হানো হানো তোমার ও লব্ধ বর দিয়ে।

জীবন ফিরায়ে আনো—আলো প্রাণ প্রদীপের মত,
অমৃতের মন্ত্র আনো মৃত্যুর আঁধার ছিন্ন করে।

এ মর-জগতে জাগো, হে সাবিত্রী, তুমি চিরন্তনী,
হে চির-অপরাজিতা, বার বার তোমায় প্রণাম।

চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের এক পত্রের উত্তরে একবার লিখেছিলেন—"আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে, তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না—আমি এমনি অগাধ কুঁড়ে।"

এই চিঠির জবাব না দেওয়ার কথা নিয়ে সাহিত্যিক শ্রীচরণদাস ঘোষকেও শরৎচন্দ্র একবার লিখেছিলেন—"চিঠির জবাব না দেওয়াটাই যেন আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই কত আত্মীয় বন্ধুই না পর হয়ে গেল।"

শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি যে একেবারে মিথ্যা, তা নয়। সত্যই তিনি কুঁড়েমির জন্য বহু চিঠির যথাসময়ে, আবার কখনও বা আদৌ জবাব দিতেন না। কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের লেখা অসংখ্য চিঠির উত্তর দিয়েছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে আপনা হ'তে আগেই পত্র লিখেছেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন আজীবন সাহিত্য-ব্রতী। সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর একরূপ নেশা ও পেশা। তাই শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর অধিকাংশই মূলতঃ এই সাহিত্য সম্পর্কীয়। তিনি এই পত্রগুলি তাঁর বহু সাহিত্যিক বন্ধু, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী, পুস্তকপ্রকাশক প্রভৃতির কাছেই লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশেষভাবে পত্র বিনিময় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের কোন কোন চিঠিতে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কিছু কথা থাকলেও পত্রগুলির বেশির ভাগই সাহিত্য-সম্বন্ধীয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠিগুলিতেই শরৎচন্দ্র তাঁদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁদের শুধু প্রশংসাই করেছেন এবং নিজেকে সর্বত্রই বিনীতভাবে প্রকাশ করেছেন। অপর সাহিত্যিকদের বেলায় কিন্তু শরৎচন্দ্র যেমন তাঁদের লেখার প্রশংসা করেছেন, আবার তেমনি তাঁদের লেখায় কোথাও ত্রুটি থাকলে সেগুলিরও উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে এঁদের নানা উপদেশও দিয়েছেন। যেমন সাহিত্য-রচনায় সংযম যে একটা বড়গুণ, এ কথার উল্লেখ করে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যন্ত একবার লিখেছিলেন—"...কোষ্ঠীর ফলাফল আজ সকালে শেষ হ'ল।...চমৎকার লাগ্‌লো।...লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন।...বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।"

শরৎচন্দ্র তাঁর শিষ্যস্থানীয় দিলীপকুমার রায়কেও লেখার এই সংযম সম্বন্ধে এক পত্রে লিখেছিলেন—"কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে আয়ত্ত করতে হবে। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে।...পাঠকের দল এমনি কুঁড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না, যদি একটুখানিমাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই তত্ত্বটুকুই মনে রাখা রচনার সব চেয়ে বড় কৌশল।"

এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে আর একবার লিখেছিলেন—"তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেচি যে, কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধরদা তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপমায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।...কিম্বা প্রভাত মুখুজ্যের বর্ণনায় নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের হিসেব গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে, ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।"

শরৎচন্দ্র এইভাবে সাহিত্যে শুধু যে সংযম সম্পর্কেই অনেককে উপদেশ দিতেন তা নয়, সাহিত্য রচনার অন্যান্য কৌশল বা রীতি সম্বন্ধেও তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের পথনির্দেশ করে দিতেন। গল্প-উপন্যাস লিখতে গিয়ে কাহিনীর চেয়ে চরিত্র সৃষ্টির দিকেই যে বেশি নজর দিতে

ত্র, শরৎচন্দ্র এই মত পোষণ করতেন। তাই তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদেরও এই পথ অবলম্বন করতেই উপদেশ দিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার লিখেছিলেন—"...গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতি অতিরিক্ত মন দিবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।......তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত, নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।"

শরৎচন্দ্র সাহিত্যসেবীদের কাছে পত্র লেখা ছাড়াও বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকার সম্পাদক এবং পুস্তক-প্রকাশকদের কাছেও বহু চিঠিপত্র লিখেছিলেন। যে সব পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পত্র বিনিময় হ'ত, তাঁদের মধ্যে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল, প্রবর্তক-সম্পাদক মতিলাল রায়, বেণু-সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, স্বদেশ-সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক, নাচঘর-সম্পাদক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাছে লেখা পত্রগুলিতেও শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন কখন কখন এঁদের কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, আবার মাঝে মাঝে তেমনি সাধারণ-ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয় যমুনায়; সেই কারণে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি পত্র বিনিময় হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন যমুনার প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক, তাই এই যমুনার কথা নিয়ে শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও তখন কয়েকটি পত্র লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ লেখাই কিন্তু প্রকাশিত হয় "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায়। এই ভারতবর্ষের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। প্রমথবাবু আবার ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম হিতৈষী। সেই জন্য "ভারতবর্ষের" সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের সময় এই পত্রিকায় লেখার ব্যাপার নিয়ে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি পত্রালাপও হয়েছিল।

"ভারতবর্ষে"র স্বত্বাধিকারী হলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। এই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সই আবার শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল সব চেয়ে বেশি। এই হরিদাসবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এত বেশি হৃদ্যতা ছিল যে, তিনি লোকের কাছে বলতেন—"হরিদাস আমার Publisher নয়, সে আমার ভাইয়ের মত স্নেহের বস্তু এবং হিতৈষী।"

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে যে কিরূপ স্নেহ করতেন, তা বেশ বোঝা যায়, হরিদাসবাবুকে তাঁর শ্রীকান্ত গ্রন্থের উৎসর্গ থেকেই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্ব প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই পুস্তকখানি হরিদাসবাবুকে উৎসর্গ করেন। ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের আরও ১০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, তিনি তাঁর কোন গ্রন্থ কাকেও উৎসর্গ করেন নি। পরে শ্রীকান্তের অন্য পর্বগুলি প্রকাশিত হ'লে শরৎচন্দ্র সেগুলিও হরিদাসবাবুকেই উৎসর্গ করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র তাঁর দত্তা উপন্যাসখানি মাত্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এ ছাড়া আর কাকেও তিনি তাঁর কোন বই উৎসর্গ করেন নি।

হরিদাসবাবু নিজে সাহিত্যিক না হলেও, একজন উঁচুদরের সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-বোদ্ধা। শরৎচন্দ্রের বইয়ের কপিতে কোথাও একটু অসংলগ্ন ভাব বা সামান্য কোনও ত্রুটি থাকলে তিনি তা দেখিয়ে দিতেন। অনেক সময় আবার হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের কোন অনুমতি না নিয়েও সেই সব ছোটখাট জায়গাগুলির পরিবর্তন করে দিতেন। এতে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর উপর বিরূপ ত হতেনই না, বরং অত্যন্ত খুশিই হতেন। এরূপ খুশি হয়ে তিনি হরিদাসবাবুকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। দু'একটা পত্র, যেমন—

শরৎচন্দ্রের একটি বইয়ের কপিতে কয়েকটি জায়গায় হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই বদলে দিয়েছিলেন। পরে জানালে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—"ভায়া, কাল রাত্রে বাড়ী থেকে এসে পৌঁচেছি, প্রুফ দেখা শেষ হলো। আপনি যে সব ছোটখাটো পরিবর্তন এতে করেছেন বেশ হয়েছে।"

শরৎচন্দ্রের একখানি উপন্যাসে বড্ড বেশি 'বড়দা' 'বড়দা' ছিল। হরিদাসবাবু এই 'বড়দা' বেশি থাকার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"দাদা, অনেকবার 'বড়দা' 'বড়দা' বলেছে, গোটা কতক কেটে দিন না।"

এর উত্তরে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লেখেন—"ভায়া, আপনার এই সব ছোটখাটো ইঙ্গিতগুলিকে শ্রদ্ধা করি। ঠিক কথা, এ পড়বার সময় আমারও চোখে ঠেকেছে। বড়দা কথাটা কয়েকবার কেটে দিয়েছি। আরও দিতে চেষ্টা করবো।"

এর পর এই প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আবার লিখেছিলেন—"'বড়দা' অনেকগুলো কেটে দিয়েছি। আমার নিজেরই এই দোষটা চোখে পড়েছিল। thanks"

হরিদাসবাবুর কথামত শরৎচন্দ্র একবার তাঁর একটি বইয়ের উপসংহারটি বদলে দেওয়ায় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা গেল—

অরক্ষণীয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ অংশটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হবার জন্য এলে হরিদাসবাবু এই পরিচ্ছেদটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—"দাদা, যেভাবে বিয়োগান্ত করে বই শেষ করেছেন, ঐ ভাবে না করে এই ভাবে করলে কি রকম হয় দেখুন ত?" বলে তিনি একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। হরিদাসবাবুর নির্দেশটি শরৎচন্দ্রের মনোমত হওয়ায় তিনি বইয়ের উপসংহারটি বদলে দেন এবং ঐ ভাবেই বইও ছাপা হয়। অরক্ষণীয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে মফঃস্বলের এক ক্লাব থেকে হরিদাসবাবুর কাছে এক চিঠি আসে। চিঠিতে তারা

লেখে—অরক্ষণীয়ার উপসংহার নিয়ে আমাদের ক্লাবে সেদিন এক তুমুল তর্ক, এমন কি বাজী রাখা পর্যন্তও হয়েছে। আমাদের একদলের মত—"জ্ঞানদাকে শ্মশান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর অতুল তাকে বিয়ে করবে, শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন।" অপর দল বলছে—"না, তা কখনোই নয়।" আপনি যদি দয়া করে শরৎবাবুর কাছ থেকে তাঁর অভিমতটি জেনে দেন ত বড় ভাল হয়।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে এই চিঠির কথা শোনাতে, তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন—আপনার কথা শুনেই ত এই বিপদ। বেশ ত আমি জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে দিয়েছিলাম। তাতে অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, আর লেখক এবং প্রকাশকও বাঁচত। এখন কি জবাব দিই বলুন ত? এইভাবে আরও চিঠি এলেই ত গেছি আর কি? আচ্ছা, ওরা ত জানতে চেয়েছে—জ্ঞানদা আর অতুল শ্মশান থেকে যাবার পর কি হ'ল? ঠিক আছে, আপনি লিখে দিন—শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, তারপর অতুল কি জ্ঞানদা কারও সঙ্গে শরৎবাবুর আর দেখা হয় নি। সুতরাং তাদের কি হ'ল তিনি আর বলতে পারেন না।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের প্রকাশক বলেই শুধু নয়, তিনি তাঁর একজন "হিতৈষী বন্ধু" ব'লেও শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছে বহু চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে অনেকগুলিতে "ভারতবর্ষে" লেখার কথা এবং তাঁর পুস্তক প্রকাশের ব্যাপার থাকলেও, বহু চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাও রয়েছে। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েন, তখন এই হরিদাসবাবুই শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকেই শরৎচন্দ্রকে মাসে ১০০৲ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন, এই আশ্বাস দিয়ে কলকাতায় এনেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে এই টাকার কথা শুনিয়ে এবং রেঙ্গুন থেকে কলকাতা আসার জন্য পথখরচ বাবদ কত চাই, জানতে চেয়ে হরিদাসবাবু চিঠি দিলে, শরৎচন্দ্র তার উত্তরে লিখেছিলেন—'আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন্।···আমার এখানে কত টাকা চাই আপনি সহস্রবার ভরসা দেওয়া সত্বেও আমার সঙ্কোচ হইতেছে—অথচ আপনি ছাড়া আমার আপনার কেহও নাই। আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি। যা কিছু নিজের সঞ্চিত ছিল, এই দুই মাসের অসুখে সব ত গিয়াছেই, বরং কিছু ওদিকেও হেলিয়াছে। আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করিতে চাই না বলিয়াই এরূপ লিখিলাম।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে এসেও যখনই অভাবে পড়েছেন, তখনই এই হরিদাসবাবুর কাছে সমস্ত কথা অকপটে বলে অর্থ চেয়েছেন। অবশ্য এই অর্থ তিনি তাঁর পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব থেকে অগ্রিম হিসাবেই নিতেন এবং ক্রমে তাঁর পুস্তক বিক্রয়ের টাকা থেকেই তা শোধ দিতেন। এইরূপ অর্থাভাবে পড়ে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে একবার লিখছেন—"ভায়া,···জানেন বোধ হয়, আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবারে। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলি নি যে, দেশে আমি "একঘরে"। আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সেজন্যেও ভাবিনি, কিন্তু টাকা দেওয়া চাই। অথচ আমি না যাই, এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চার শ' টাকার অকুলান। এটা আমার চাই। কিন্তু আপনার কাছে ধার করার একটা ভাবনা এই যে, আমার শরীরের অবস্থায় সব রকম সম্ভব। যে দেনা পূর্বে থেকেই আছে, সেইটাই যে কতদিনে শোধ যাবে জানি নে, তার ওপর এ দেনা শোধ যাওয়া সম্ভবও খুব, অসম্ভবও খুব।"

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে হরিদাসবাবুকে আর একবার লিখেছিলেন—"আমার কলকাতার বাড়ীটা শেষ হয়ে এলো। এ সময়ে আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে আমার দুর্ভাবনা ঘোচে।··· বাড়ীটার এষ্টিমেট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা···কিন্তু পাকেচক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশি। নইলে টাকার আবশ্যক হতো না, ধার না করেও নিজেই দিতে পারতাম।

এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত বোধ করি হাজার ষোল সতেরো নষ্ট করলুম। কলকাতার বাড়ীতেও বোধ করি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে। এমনি কোরেই জীবন কাটলো।

অভাবে পড়লেই আপনাকে জানাই—এই অভাবটাও জানালুম।"

অর্থাভাবে পড়ে হরিদাসবাবুর কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের এই রকমের আরও অনেকগুলি চিঠি রয়েছে। শরৎচন্দ্র অভাবে পড়লেই ধার চেয়ে হরিদাসবাবুর কাছে চিঠি লিখতেন। আর হরিদাসবাবুও নির্বিবাদে টাকা দিয়ে যেতেন। কি বিদেশে, আর কি এদেশে শরৎচন্দ্রের অভাবের সময় হরিদাসবাবুই অর্থ সাহায্য করে তাঁর সাহিত্য-সাধনার পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক হরিদাসবাবুর ন্যায় একজন "হিতৈষী" বন্ধুর এই আর্থিক সাহায্য না পেলে দারিদ্র্যের চাপে প'ড়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এতখানি স্ফুরণ হ'ত কিনা বলা কঠিন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্ব নিয়ে বহু চিঠিপত্র লিখলেও, অনেক চিঠিপত্রে কিন্তু তিনি হাল্কামিও করেছেন। এই সব চিঠিতে তিনি হাল্কা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। এই চিঠিগুলির লেখার ধরণই এমনি যে, পড়লে না হেসে থাকা যায় না। অথচ হাসাতে গিয়ে তিনি কোথাও কাকেও বিদ্রূপ করেন নি, বা কাকেও আঘাত করেন নি। অত্যন্ত সহজভাবে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। এই ধরণের শরৎচন্দ্রের বহু চিঠি আছে। এখানে এরূপ দু একটা চিঠির উল্লেখ করা গেল—

দিলীপকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমেরই অধিবাসী। দিলীপকুমারের ডাক নাম মণ্টু। এই মণ্টু অর্থাৎ দিলীপকুমারকে শরৎচন্দ্র একবার লিখছেন—

িতে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবামাত্র চ'লে আসবে। যাবার না হয় দিনকতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী…দের পিটের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো।…

আর একটা কথা। বারীন শুনেছি, যে কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগ্‌ড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে, এটা সে কর্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েছে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে এবং এ-বই এতদিন যে পড়ো নি, এই ব'লে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই "বিভূতি"টা হস্তগত করে নিতে পারবে।…

অনিলবরণ শুনেছি নাকি, মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেছ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ, একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত-পেত্নীর গল্প করবে। হলফ ক'রে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাবতে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শেখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট ক'রে থাকবারই বা দরকার কি?…

সন্ন্যাসী হওয়া ভারী খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিছু মজা নেই।…"

অনিলবরণের এই ধুলোকে চিনি করার কথা নিয়ে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে আর একবার লিখেছিলেন—

"তোমাদের অনিলবরণ শুনেছি ধুলোকে চিনি করতে পারেন। আশ্রমের সমস্ত চিনি নাকি তিনিই supply করেন,—এ কি সত্যি? আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নে, কারণ তাহ'লে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্তে? কলকাতায় এসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।

অনিলবরণের চিনি করতে পারার খবরটা নিশ্চয় দিয়ো। পারলে বিলাতী চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।"

শরৎচন্দ্রের আফিংএর নেশা ছিল এবং তিনি একটু বেশি রকমই আফিং খেতেন। শরৎচন্দ্র এই আফিংএর কথা নিয়েও অনেক সময় চিঠিপত্রে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একবার লিখছেন—

"…হাতটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। মধ্যে ঢান পাটাও আগাগোড়া ফুলিয়া-কাঁপিয়া জয়ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা এখন কমিয়াছে এই যা।…আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও মুখে আনিব না। বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল, এইবার আর একটু বেশ করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়।

আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ করি ভাল। আমি ত মনে করি, সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে শরৎচন্দ্র কিছুদিনের জন্ত বারাণসী বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক জ্যোতিষীকে তিনি একদিন তাঁর কুষ্ঠি দেখিয়েছিলেন। এই কুষ্ঠি দেখানোর পর তিনি হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—

"…একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগুসংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন—তিনি ত আমার কুষ্ঠি শুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন, আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম। আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন যে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরও বিভীষণ। তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন মহাযোগীর, না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী। অথচ আমি নিজের identity গোপন করেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারি পশার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন—পারিশ্রমিক ত নিলেনই না—বারম্বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—ইনি কে এবং কোথায় আছেন। ধর্মস্থানে বৃহস্পতি—এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি। আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, এ কি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু ৪৮, কিম্বা বড় জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু বললেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বলতে লাগলেন—এঁর যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয়, ত তার পরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন। তবে রক্ষে এই যে, সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি করে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বলতে পারলেন, আমি ক্রমাগত তখন থেকে তাই ভাবচি। কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের দলে গিয়ে মিশি।

আমাকে আপনারা এখন থেকে "সমীহ" করে চলবেন। নিশ্চয়ই একটা "কেউ-কেটা" নয়—চাই কি শাপ মন্তি দিয়ে ভস্ম করেও দিতে পারি। আবার রাজা করেও দিতে পারি।…"

শরৎচন্দ্র যে কিরূপ পরিহাস-প্রিয় ছিলেন, এই চিঠিগুলি তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠি লিখতে বসে কাজের কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এই ধরণের রসিকতা করতেন। আর শরৎচন্দ্র এত বেশি পরিহাস-প্রিয় ছিলেন যে, সামান্ত ব্যাপার নিয়েও পরিহাস করতে তিনি ছাড়তেন না। যেমন—

ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন সাহিত্যিক মহলে 'দাদা' নামে

পরিচিত ছিলেন। তিনি কানে একটু কম শুনতেন। শেষ বয়সটায় আবার একটু নয়, বেশ ভালরকমই কম শুনতেন। এইজন্তে জলধরবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হ'লে বেশ চেঁচিয়ে কথা বলতে হ'ত। শরৎচন্দ্র একবার কিছুদিন অসুখে ভুগে জলধরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেখা করে গিয়ে জলধরবাবুর এই কানে কম শোনার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—

"দাদার সঙ্গে কতকটা কথাবার্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন মীমাংসা হোল না, একে ত এবার দারজিলিঙ্ থেকে আসার পরে তাঁর কানের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দু চারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে। আমি ত আজকাল জোরে কথা কইতেও পারিনে, পারাও বারণ।"

হরিদাসবাবুর কন্যা শ্রীলাবণ্য দেবী একবার মসৌরী বেড়াতে গিয়ে, সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের জন্ম একটি লাঠি এনেছিলেন। সামান্য এই লাঠি আনার কথায় রসিকতা করে তিনি হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—

"ভায়া, জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করবার জন্তে কন্যা এনেছেন দণ্ড বহুদূর মুসোরি থেকে। শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে, ভবিষ্যতে না লিখলে, কাজকর্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে। যাই হোক্ লাঠিটা চমৎকার। আমার কাজে লাগবে—ঠ্যাং দুটোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।"

সামান্য ছোটখাট ব্যাপার নিয়েও শরৎচন্দ্র কি রকম যে রসিকতা করতেন এগুলি তারই উদাহরণ। তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র এই ধরণের পরিহাসেই ভরা। মানুষটি যে অত্যন্ত পরিহাস-প্রিয় ছিলেন এবং সরস কথা বলে যে লোককে খুব হাসাতে পারতেন, এ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

এইভাবে দেখা যায় যে, চিঠি লেখার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যদিও অত্যন্ত কুড়ে ছিলেন, তবুও তিনি যে সব চিঠিপত্র লিখে গেছেন, তা থেকে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতবাদ, তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তি-জীবনের অনেক অজ্ঞাত সংবাদ, তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধসমূহ থেকে যেমন তাঁর মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর এইসব চিঠিপত্র থেকেও তাঁকে বিশেষভাবে চেনা যায়। চিঠিতে তিনি বন্ধুবান্ধবদের কাছে মনের কথা অকপটে বলে যাওয়ার ফলে, চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে তাঁকে জানার একটা সহজ সুযোগ রয়েছে। তাই কি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, আর কি মানুষ শরৎচন্দ্র—যে ভাবেই তাঁকে জানতে যাওয়া যাক্ না কেন, সব সময়েই তাঁর লেখা এই চিঠিপত্রগুলি বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে যাহাই হইয়া থাকুক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়িবার পর এদেশের নিদারুণ অর্থনৈতিক অসহায়তা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারও সচেতন হইয়া উঠেন। পণ্যাদির দিক হইতে নিম্নতম স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকিলে সঙ্কটকালে অস্তিত্বরক্ষাও যে সম্ভব নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চরম অভাবে তাহা প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের মধ্যেই নানা ওলটপালটের ভিতর দিয়া ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং সরকারী বেসরকারী উভয় সূত্রেই এ সম্পর্কে সক্রিয় একটা আগ্রহ দেখা যায়। কংগ্রেস ইতিপূর্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National planning committee) গঠন করিয়াছিলেন, এই কমিটি কিছু কিছু কাজ করেন। ভারতসরকার কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনায় উৎসাহ দিতে থাকেন। কেন্দ্রে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দপ্তর নামে একটি নূতন দপ্তর খোলা হয় এবং বিখ্যাত শিল্পপতি স্যার আর্দেশির দালাল এই দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। এই দপ্তর হইতে ভারতের বিভিন্ন শিল্পের প্রসার সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য এবং পরামর্শ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতের বড় বড় কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও এদিক হইতে সজাগ হইয়া উঠে। বেসরকারী সূত্রে যুদ্ধের সময় যেসব পরিকল্পনা রচিত ও প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে টাটা, বিড়লা প্রমুখ শিল্পপতিদের রচিত বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay plan), মহাত্মা গান্ধীর উপদেশানুযায়ী এস এন আগরওয়ালা রচিত গান্ধী পরিকল্পনা (Gandhian plan), বিখ্যাত শিল্পনায়ক স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া রচিত যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনা (Reconstruction in post-war India), র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্ণধার মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত জনগণের পরিকল্পনা (People's plan) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আগ্রহ তীব্রতর হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন; ভারতের

টাকার ঘাটতিও পূরণ করিতে পারিবেন। কমিশন নিম্নোক্তভাবে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন :—

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বৃত্ত বাবদ	—	১৬০ কোটি টাকা,
রাজ্য সরকারসমূহের উদ্বৃত্ত বাবদ	—	৪০৮ কোটি টাকা,
রেলপথ সমূহের উদ্বৃত্ত বাবদ	—	১৭০ কোটি টাকা,
সরকারী ঋণপত্র বাবদ	—	১১৫ কোটি টাকা,
জনসাধারণের স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি বাবদ	—	২৭০ কোটি টাকা,
বিভিন্ন তহবিল, আমানত প্রভৃতি বাবদ	—	১৩৫ কোটি টাকা,
বৈদেশিক সাহায্য	—	১৫৬ কোটি টাকা,
		১৪১৪ কোটি টাকা
ঘাটতি		২৯০ কোটি টাকা
এখনও সংগ্রহের সূত্র স্থির হয় নাই		৩৬৫ কোটি টাকা
	মোট	২,০৬৯ কোটি টাকা

কংগ্রেস-সরকার-বিরোধী বামপন্থী কোন কোন দল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে হতাশাপ্রকাশ করিলেও এই উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারত সরকারকে অনেকেই অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বহু বিচিত্র সমস্যা অধ্যুষিত এই বিশাল দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা সুকঠিন কাজ, তাছাড়া যুদ্ধোত্তর চরিত্রহীনতার যুগে এই পরিকল্পনার বাস্তবরূপদান দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার—এ সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ কাজে নামার সময় আতঙ্কিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবু ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সম্ভাবনার বিচারে পরিকল্পনাটির সম্ভাব্যতা আছে বলিয়া এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। অনেকেই আশা করিতেছেন যে, যে ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়ার আগে পরিকল্পনার প্রয়োজন, কার্য্যকালে ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের অবকাশ সেক্ষেত্রে অবশ্যই আছে। তাছাড়া সমস্যা আছে বলিয়া যদি কাজে নামিয়া পড়িবার সাহস না করা যায়, তাহা হইলে কোন কালেই দারিদ্র্য ও ধনবণ্টনের অসমতা কলঙ্কিত ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশের সঙ্কট মোচন হইবে না।*

পরিকল্পনাটি এমনিই ব্যাপক এবং ইহার সাফল্য সার্ব্বজনীন সহৃদয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে বামপন্থীরা যদি হতাশা প্রকাশের সহিত অসহযোগিতা করেন, কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে কঠিনতর হইবে। এই জন্যই কংগ্রেস-সভাপতি ও প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য বামপন্থীদের সাহায্য চাহিয়াছেন। দেশের কল্যাণ যাঁহারা চান, দেশের বর্ত্তমান আর্থিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন তাঁহারা না চাহিয়া পারেন না। সুতরাং পুনর্গঠনের পরিকল্পনা চাই এবং সেদিক হইতে যে পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের সযত্নপ্রয়াসে রচিত হইয়াছে এবং যাহা ইতিমধ্যেই বহুজনের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তৎপ্রতি বামপন্থীদের আগ্রহও স্বতঃই আশা করা যায়। দলগত রাজনীতির ঊর্দ্ধে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে স্থানদানের জন্য সম্প্রতি দেশে আশাপ্রদ আন্দোলন সুরু হইয়াছে এবং ইহাতে কিছুটা সুফলও ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

* চূড়ান্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি এবং দেশের সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার ও বৃদ্ধির উপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছে:—The central objective of planning in India is to raise the standard of living of the people and to open out to them opportunities for a richer and more varied life. It must, therefore, aim both at utilising more effectively the available resources, human and material, so as to obtain from them a larger output of goods and services, and also at reducting inequalities of income, wealth and opportunity.

অপমৃত্যু

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

আমার হ'য়েছে মৃত্যু কাল রাতে তৃতীয় প্রহরে,
যখন নেমেছে ঘুম তোমাদের আঁখির পাতায়,—
গলিত শবের পরে ব'সে ব'সে প্রেত আত্মা মোর
মৃত্যুর কাহিনী আজ, লিখে রাখে খাতার পাতায়।

তখন আকাশে ছিল পূর্ণিমার গোল পূর্ণ চাঁদ,
তারি শুভ্র আলো এসে প'ড়েছিল তার সুপ্ত মুখে;
অপলক হেরিলাম নিঃশ্বাসের স্পন্দিত সমীরে,
তরঙ্গিত সমুদ্রের ক্রুদ্ধশোভা তার স্ফীত বুকে।

উন্মাদ তরঙ্গ মোরে ডাক দিল গভীর অতলে—
মরণ-বিষাক্ত পাত্র ওষ্ঠপুটে ধরিলাম তার!

ভুলিলাম আপনারে। মিথ্যা হ'ল বিবেক বিচার,
বিষাক্ত রক্তের স্রোত, অভিভূত করিল আমায়।

আমার হ'য়েছে মৃত্যু, রজনীর নিঃস্তব্ধ প্রহরে।
সেই অপমৃত্যু কথা লিখে রাখি তপ্ত অশ্রু-ধারে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কল্পলোকের মানসী দূরবীক্ষণের কাচের মধ্যে এসে ধরা দিলে অবশেষে। দূর এবং নিকটের একটা অদ্ভুত সম্মিলন আমাকে দার্শনিক করে তুলল যদি বলি, তাহলে কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার ঠিক বর্ণনা দেওয়া হবে না। কারণ দার্শনিকরা তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যকে যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করেন আমার তা ছিল না। আমি নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করছিলাম, কিন্তু অবিচলিত থাকতে পারছিলাম না। অধীর হয়ে পড়ছিলাম। আলেয়াকে নানারূপে নানাভঙ্গীতে সুখদুঃখের বেশ-বিন্যাসের নানা আবেষ্টনীতে রোজই দেখতাম, আর রোজই মনে হ'ত দূরবীণের মধ্যে দিয়ে যাকে পাচ্ছি সে তো আলেয়া নয়, সে তো আলেয়ার ছবি মাত্র, সিনেমার ছবির মতো আপাত-দৃষ্টিতে জীবন্ত হলেও ওটা ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। একথা মনে হলেই কেমন যেন একটা অতৃপ্তি হ'ত। এই অতৃপ্তিতে হঠাৎ একদিন নূতন রঙ লাগল। মনে হ'ল আমার এই চোখ দুটোও তো দূরবীণের মতই যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্রের মাধ্যমে এতদিন আলেয়ার যে রূপ দেখেছি সেটাও তো ছবি। চক্ষু-দৃষ্ট ছবিটা যদি আমাকে তৃপ্ত করে থাকে দূরবীক্ষণদৃষ্ট ছবিটাই বা করবে না কেন? হঠাৎ মনে হল সত্যিই কি আলেয়াকে দূর থেকে দেখে তৃপ্ত হয়েছিলাম? হই নি। আমি চেয়েছিলাম···যা চেয়েছিলাম তা এতই আদিম কামনা যে আধুনিক সমাজে তা উচ্চারণ করাও পাপ। দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট আলেয়ার ছবিতে আমার এই কামনার রঙ লেগে, আমার অতৃপ্তির সঙ্গে আমার বাসনা যুক্ত হয়ে—আমার কল্পনা আমাকে যে জগতে উত্তীর্ণ করে' দিয়েছিল সেখানে বউবাজার স্ট্রীট ছিল না, ছিল আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, ছিল সোনার-কাঠি রূপোর-কাঠি, ছিল স্বর্ণলঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে সীতার জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ, আরও অনেক কিছু ছিল···।

সুতরাং শিখর সেনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কার মুখে যেন শুনেছিলাম যে সে এম. এস. সি পাশ করেছে। বাল্যবন্ধুদের সম্বন্ধে এই ধরণের টুকরো-টাকরা খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অনেক সময়। শিখরের সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই ছিল না আমার। হঠাৎ চন্দ্রমোহন একদিন এসে বললে, "শিখরকে মনে আছে তোর?"

"আছে বই কি"

"শুনছি তার মামা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে"

"তাই না কি"

"হাঁ। আমি গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গিয়ে দেখলাম, মোহন মুদির দোকানে কেমিস্ট্রির ভাল ভাল বই সাজানো রয়েছে। অবাক হলাম একটু। জিগ্যেস করাতে মোহন মুদিই বললে যে শিখরবাবুকে তার মামা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বইগুলো এবং আরও অনেক খাতাপত্র সব শিখরবাবুর। তাঁর মামা আমাকে পুরাণো কাগজের দরে বিক্রি করে' দিয়েছেন এগুলো। শুনে আমার একটু কৌতূহল হল, আমি তার খাতাপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে তার পুরোণো ডায়েরি পেলাম একখানা। সেইটে নিয়ে এসেছি—"

"শিখরের মামা তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন"

"এ 'কেন'র উত্তর ওই 'ডায়েরি'তেই পাবে। কাল দিয়ে যাব খাতাগুলো তোমাকে"

এর পরের অংশটুকু শিখরের জবানীতেই শুনুন। তার ডায়েরির পাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিকেই আমি জীবন-যাত্রায় বাহন করেছি। পুরোনো সেকেলে নড়বড়ে

কুসংস্কারের গো-শকটে চড়ে' যাঁরা অতি-আধুনিক মডেলের মোটরকারকে গাল পাড়েন, তাঁরাই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছেন আমার জীবনপথের সঙ্গী। তাঁদের গালাগালি স্মিতমুখে আমি সহ্য করে' যেতাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেঙে পড়ল। অবন্ধনাকে আমি কেন ভালবেসেছি এর কোন জবাব নেই। সকালে সূর্য্য ওঠে কেন, গাছে ফুল ফোটে কেন, সূর্য্য-ওঠা বা ফুল-ফোটা আমার মায়ের বা কয়েদী গাঙুলীর সম্মতি অনুসারে হচ্ছে না কেন, এসবেরও কোনও জবাব নেই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর অনিবার্য্য আবির্ভাব মা এবং কয়েদী গাঙুলী মেনে নিয়েছেন, আমার সঙ্গে অবন্ধনার প্রণয় ব্যাপারটা তাঁরা মানতে পারলেন না। যে অবন্ধনার সঙ্গে আমি এক সঙ্গে কুলগাছে উঠেছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, খেয়েছি, শুয়েছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি, সেই অবন্ধনাকে আমি যখন বিয়ে করতে চাইলাম তখন আশ্চর্য্য হয়ে গেল সবাই। জাতের মিল নেই—বিয়ে হবে কি করে'! অবন্ধনার অবশ্য বদনামও ছিল অনেক। কোনও সুন্দরী মেয়ে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁসা হয়, চটকদার শাড়ি পরে' বেহায়া হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় তাহলে তার আর ক্ষমা নেই। অবন্ধনা সত্যিই কাউকে গ্রাহ্য করে না। স্বলীলাক্রমে সে বেড়িয়ে বেড়ায় নবীন ঢুলের সঙ্গে ঘাটে-মাঠে বনে-বাদাড়ে। আমি যখন ছুটিতে বাড়ি আসি, নিত্য নূতন শাড়ি পরে' ঘুরে বেড়ায় আমার চোখের সামনে। আমার শোওয়ার ঘরের কাছে যে বেলগাছটা আছে তার উপর চড়ে' গভীর রাত্রে আমার শোওয়ার ঘরে চলে আসতেও দ্বিধা করে নি সে কখনও। একদিন কানে দুটো অলংকার দুল পরে এসে হাজির। হেসে বললে—"দুল পরে' আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো"

"চমৎকার। কে দিলে দুল—"

"কেউ দেয় নি। আমি পিসিমার দুল জোড়া চুরি করে' পরে এসেছি তোমাকে দেখাব বলে'। বেশ মানিয়েছে, না?"

"চমৎকার মানিয়েছে"

"কাল নবনে পদ্মপাতার পাপড়ি দিয়ে সুন্দর একটা গয়না করে' দিয়েছিল আমাকে। আবার করে' দেবে বলেছে, তুমিও এস না কালিন্দীতে, অজস্র পদ্ম ফুটেছে সেখানে, কাল দুপুরে যেও, কেমন?"

"যাব—"

মাকে একদিন বললাম যে আমি অবন্ধনাকে বিয়ে করতে চাই। সংবাদটা যে তাঁর কর্ণে মধুবর্ষণ করল না, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

বললেন, "ওই ভাবুনে মেয়েকে বিয়ে করবি! বলিহারি তোর পছন্দকে! তা ছাড়া ওরা বামুন—বিয়ে দেবে কেন ওরা!"

"সে আমি ওর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে' ঠিক করে নেব। তুমি মত দাও"

মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে যা নীরব ভাষায় ব্যক্ত হল তা এই—এত কষ্ট করে' তোকে মানুষ করলাম, তুই শেষে আমার বুকে এত বড় শেল হানবি! মায়ের এ দৃষ্টি কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে পারল না। আমি কয়াধুনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। ভাবলাম ওঁকে যদি রাজি করতে পারি, মা-ও রাজি হয়ে যাবেন শেষ পর্য্যন্ত।

আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে কথাটা শুনে কয়াধু বোমার মতো ফেটে পড়বেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না তিনি। আমার সমস্ত কথাগুলি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' আগাগোড়া শুনলেন। তাঁর কটা গোঁফদাড়ির জঙ্গলে সামান্য একটু চাঞ্চল্য জাগল শুধু। তার পর ধীর-কণ্ঠে বললেন, "তোমার মতো সুপাত্রের হাতে ওকে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তুমি অব্রাহ্মণ, অবু কুলীন নীলাম্বর মুকুজ্যের মেয়ে। তোমাদের বিয়ে হওয়া তো সম্ভব নয়—"

বললাম, "আপনি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। শাস্ত্র ঘাঁটলে দেখতে পাবেন শাস্ত্রকাররা যে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমর্থন করেছেন তাতে জাতকুলের বিচার নেই"

কয়েদী-গাঙুলীর গোঁফ-দাড়িতে আর একবার ঢেউ খেলে গেল। বললেন, "আমরা গন্ধর্ব্ব নই, গন্ধর্ব্বলোকে বাসও করছি না, গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা ভাবতেই পারি না আমরা। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের আইন মেনে চলতে হবে আমাদের—শাস্ত্রের এই উপদেশ"।

সবিনয়ে বললাম—"কিন্তু শাস্ত্রের চেয়ে কি মানুষ বড় নয়? আমি যখন অবুকে চাই, আর অবুও যখন আমাকে চায়—"

কয়াধু বাধা দিলেন এইখানে।

বললেন, "তুমি যে অবুকে চাও, তা তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি। কিন্তু অবু যে তোমাকে চায় একথা বুঝব কি করে' ?"

"অবু আমাকে বলেছে। আপনি তাকে জিগ্যেস করে' দেখতে পারেন—"

কয়াধুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হল, গোঁফ-দাড়িগুলো নড়ে' উঠল আর একবার।

বললেন, "বেশ, ভেবে দেখব। তুমি যাও এখন—"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অবু এসে হাজির আমার শোওয়ার ঘরে। রাত্রি তখন দেড়টা। দেখি তার শাড়ি ছিঁড়ে গেছে, গা ছড়ে' গেছে। সম্ভবত বেলের কাঁটায়।

বললাম, "এ কি—!"

"পালাই চল"

"পালাব ? তার মানে—"

"না পালালে পিসেমশাই মেরে ফেলবে আমাকে। এই দেখ—"

পিঠের কাপড় তুলে দেখালে সে। দেখলাম কালো কালো দাগে সমস্ত পিঠটা ভরতি।

"কি এ ?"

"বেত মেরেছে। কাল থেকে আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে বলেছে। পালাই চল"

"কোথায় পালাব এখন"

"যেদিকে দু' চোখ যায়। চল, ওঠ, আর দেরি কোরো না—"

আমি চুপ করে' রইলাম।

"দেরি করছ কেন, ওঠ না"

"এরকম ভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। মানে—"

"আমি তাহলে চললুম"

পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে গেল সে। পরদিন সকালে শোনা গেল নবীন দুলেও অন্তর্দ্ধান করেছে।

১২-৮-৪০

গ্রামে কলেরা লেগেছে। চারদিকে লোক মরছে, মানুষ নয় যেন মাছি। নবীন দুলের মা বাবা ভাই বোন সব মরে গেল। কায়স্থ পাড়াতেও দু'একজনের হয়েছে শুনলাম। আতঙ্কে থম থম করছে চারিদিক। গাঙুলী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন। বিলাসদের অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন শুরু হয়েছে। যেদিন মাকে সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলাম সেদিন থেকে মা বাক্যালাপ করেন নি আমার সঙ্গে। কাল থেকে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কেবল বলছেন, রক্ষা কর" 'মা রক্ষা কর'। আমি কি যে করব পাচ্ছি না। অবু কোথায় গেল ? নবীন দুলের পালিয়ে গেল ? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে পালিয়ে ভালই করেছে। যা কলেরা লেগেছে চারদিকে···। গেল কোথায় সে ! নবীন দুলের সঙ্গে···?

১৪-৮-৪০

কালরাত্রে মা মারা গেলেন। মনে হল, হাতে ইচ্ছে করে' সঁপে দিলেন নিজেকে। নিজে আমি যে খাবার জল রোজ ফুটিয়ে রাখি সে জল এব স্পর্শ করেন নি। পুকুরের জল খেতেন। মৃত্যু তাঁর মুখে জল দিতে গেলাম, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দেশে জন্মেছি। ভালবেসেছি—এই অপরাধে অস্পৃশ্য গেলাম। ভালবাসার চেয়ে এখানে জাত বড়, জা পাচিল মা আর ছেলের মাঝখানেও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান করে। অথচ এই দেশের লোকই আবার রাধার প্রেমে গদগদ। সত্যিই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছি মনে হচ্ছে এ দেশে লেখাপড়া শেখা বৃথা, মনে হচ্ছে আ এদেশের কেউ নই···

২০-৮-৪০

কাল রাত্রে মামা আমার সব সমস্যার সমাধান কে দিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে জন্মের মতো আমাকে চলে' যে হবে। তিনি আর আমাকে বাড়িতে স্থান দিতে পারবে না। বললেন, আমাদের অনাচারেই নাকি গ্রামে ভয়ঙ্কর মহামারী সুরু হয়েছে। এ বিধাতার অভিশাপ অবু গেছে, আমি না গেলে রুষ্ট বিধাতা তুষ্ট হবেন না আজ একটু পরেই চলে যাব। এখান থেকে কিছুই যাব না। এমন কি এই ডায়েরির খাতাখানা পর্য্যন্ত নয় এ খাতা মামার পয়সায় কেনা। একটি জামা,

ই এবং জুতো জোড়াটি পরে' বেরিয়ে যাব শুধু। র্জ্জিত অর্থে নিজের জামা-কাপড়-জুতো যখন কিনতে ? তখন ওগুলোও ফিরিয়ে দেব মামাকে। কোথায় ? কোলকাতাতেই একমাত্র স্থান, যেখানে রোজকার ার সম্ভাবনা। অবুকেও খুঁজব। খুঁজে বার করতেই তাকে। মাপ চাইতে হবে তার কাছে। প্রাণভয়ে হয়ে সে যখন আমার সাহায্য চেয়েছিল আমি তাকে য্য করি নি। ধিক্ আমার পৌরুষকে। অবুকে বার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য হবে এখন। ছি—অবুর সন্ধানের সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টাকে খাওয়াব কি করে'? পুলিশে চাকরির চেষ্টা করলে ন হয়! আমার এক সহপাঠীর দাদা পুলিশের য়েন্দা বিভাগে বড় চাকরি করেন। ভাবছি তার সঙ্গে ই দেখা করব।...

এইখানেই শিখরের ডায়েরি শেষ হয়েছে। কলেরার টা জানতাম। কারণ কলেরা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবার কাশীতে চলে যায়। দার বাপের বাড়ি কাশীতে। শিখরের খবর কিন্তু পাই নি। চেষ্টাও করিনি খবর নেবার। অথচ রের সঙ্গে সত্যিই আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল, 'প্রগাঢ়' ষণ দিয়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। কিন্তু ছেড়ে চলে আসবার পর তার সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহটা ন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মনের স্বভাব অতি ত্র। কত তুচ্ছ জিনিস সে নিজের ভাণ্ডারে সযত্নে করে' রাখে, আবার কত বৃহৎ জিনিসকেও ফেলে । যে মানদণ্ড দিয়ে সে বাছাই করে তা অতি সূক্ষ্ম। ও সব সময়ে বুঝতে পারি না তার মর্ম্ম। আর একটা নসও জীবনে লক্ষ্য করেছি। যাকে ভুলে গেছি সে ত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আবার দেখা দেয়, তার ক্ষিক আবির্ভাবটা যেন মৌন ব্যঙ্গের সুরে নীরব ায় বলতে থাকে, 'এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল!'... য়ে যাওয়াটাই জীবনের ধর্ম্ম। একটা জিনিসকে নিয়ে ক্ষণ সে থাকতে চায় না; কারণ যা সে চায় একটা নসের মধ্যে তাকে পায় না, সে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সন্ধান করে' বেড়ায় তার কাম্যকে, আমরণ চলে এই সন্ধান, মরণের পরও হয়তো চলে। আলেয়াও ফুরিয়ে ব না কি একদিন? মনে হয়, যাবে না। কারণ ার অনুসন্ধানের নাগালের মধ্যে সে ধরাই দেবে না নও। তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল চির-উৎসুক থাকবে, ক্তের যেমন থাকে আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে। শিখরের য়েরিটা যেদিন চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেলাম, সেদিন রই যেন নবরূপে আবির্ভূত হল আবার। তার সঙ্গে টা একাত্মতাও অনুভব করলাম যেন। মনে হল আমরা দু'জনেই একপথের পথিক। একটু লজ্জাও হল। শিখর প্রেমের জন্য গৃহহারা হয়েছে, মায়ের স্নেহ হারিয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে অবন্ধনার খোঁজে...আমি কি করেছি! নিজেকে আমি বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে প্রয়োজন হলে আমি ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম। প্রয়োজন হয় নি, তাই করি নি। কিন্তু আমার যুক্তি আমার কাছেই খেলো মনে হয়েছে বারম্বার। সুনন্দার মুখখানাও মানসপটে ফুটে উঠেছে, তার ভ্রূভঙ্গীতে চোখের চাহনিতে জেগেছে স-বিদ্রূপ প্রশ্ন—"সত্যিই কি পারতে?"...স্বীকার করতে হয়েছে পারতাম না। আমি সুবিধাবাদী; শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখতে চেয়েছি।...আমি শিখর সেনকে এর পর থেকে কিছুদিন যে রূপে কল্পনা করেছি তা সন্ন্যাসীর রূপ। মনে হয়েছে মহাদেবের মতো অদৃশ্য সতীর শব বহন করে' সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষময়। শোকোন্মত্ত দেবতার বেদনায় ত্রিভুবন কেঁপে উঠেছিল, শিখর সেনের শোক কাউকে বিচলিত করবে না। অন্তর্হিতা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করেছে একান্ন পীঠস্থান, অসংখ্য পূজারী আজও অর্ঘ্য বহন করে' নিয়ে চলেছে সতীর স্মৃতি-পূত পুণ্যতীর্থে, তাদের প্রণয়-কাহিনী আজও ধ্বনিত হচ্ছে সাহিত্যে ধর্ম্মে, তর্পণের বিবিধ মন্ত্রগাথায়। অবন্ধনাকে কিন্তু কেউ মনে করে' রাখবে না। বিস্মৃতির অতলে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে, চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। সমাজেও তার স্থান হয় নি, মানুষের মনেও তার স্থান হবে না। তার আত্মীয়স্বজনদের মনে একটা কুৎসিৎ ঘায়ের মতো সে দগদগ করবে কিছুদিন, লজ্জায় সেটাকে ঢেকে রাখবে সবাই, তারপর তা-ও আর থাকবে না। থাকবে শুধু একটা চিহ্ন, গৌরবের নয়, লজ্জার। শিখর সেনের মনের মন্দিরেই হয়তো তা জ্বলছে পবিত্র হোমশিখার মতো। গৃহহারা শিখর সেন কোথায় এখন...? শিখর সেনকে যতটুকু আমি দেখেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে যতটুকু খবর আমি পেয়েছিলাম ততটুকুই আমার সম্বল ছিল। ওই-টুকুকে কেন্দ্র ক'রেই আমার কল্পনা রঙীণ হয়ে উঠছিল। অপ্রত্যাশিত কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। গুটি থেকে প্রজাপতির আবির্ভাব, বা ফুল থেকে ফলের পরিণতি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'ত—যদি না আমরা তা প্রত্যক্ষ করতাম। যে শিখর সেনকে কল্পনায় শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম তার খাকি হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরা মূর্ত্তি দেখে তাই চমকে গেলাম একদিন। আমার এক পিসতুতো ভাই শৈল পুলিশে চাকরি করত, সেই একদিন পরিচয় করিয়ে দিলে রাস্তায় হঠাৎ। শিখর সেন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছে। অবন্ধনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না! সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ঠিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতি প্রবীণ ব্যক্তি ব্যতীত বর্ত্তমানে তাঁহার নাম সাধারণের নিকট সুপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষভাগে তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যে ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেশের নব-জাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবে, ভাষায় ও বর্ণনায় অপূর্ব্ব। পাঠকগণকে সেই অমূল্য রচনা উপহার দেওয়ার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদান করা উচিত বোধ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৫৬ সালে হুগলীজেলার অন্তর্গত গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধুসেবা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা থাকায় তৎকালে অনেক সময়েই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। শ্রীকৃষ্ণ অতি বাল্যকালে হইতেই সাধু দর্শন ও সাধুগণের সদালাপ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা-লাভ করিতেন। তিনি গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গলা পাঠ শেষ করিয়া, স্বগৃহে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অমরকোষাদি পাঠ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কালনা মিশন স্কুলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িবার সুযোগ পান। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন হইয়া পড়ায় পরে তাঁহাকে বহরমপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তিনি সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

বহরমপুরে পাঠকালেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ভাবী জীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দেয়। আত্মজীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। এই কিশোর বয়সেই (১৫ হইতে ১৮) তিনি অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। সেই গুলিই পরে "সঙ্গীত-মঞ্জরী" নামে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতগুলিতে বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রীতি ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই সাংসারিক অনটনের জন্য অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হয়। তিনি জামালপুরে যাইয়া রেলওয়ে অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। অফিসের নিয়মিত কার্য্যের পর অন্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উপনিষদ দর্শন স্মৃতি পুরাণাদির অধ্যয়নে এবং ইংরাজী দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় অতিবাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয় এবং অফিসের কাজকর্ম্মে কর্তৃপক্ষরাও সন্তুষ্ট হন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সাহায্য পাইয়া পিতামাতার অবস্থাও কতকটা পরিবর্ত্তিত হয়।

জামালপুরে কার্য্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিকটস্থ মুঙ্গের সহরে বাস করিতেন। এইখানে সৌভাগ্যক্রমে তিনি পরমহংস-মণ্ডলীসহ সমাগত পরিব্রাজকাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর শুভদর্শন লাভ করেন (১৮৬৯, ডিসেম্বর)। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রদ্ধা ও সদ্‌গুণে কৃপা-পরবশ হইয়া গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণী ঘাটে তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্য বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে। পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের পিতা তাঁহার এই ধর্ম্মভাবের বিষয় অবগত হইয়া পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে সকলে তাঁহাকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নামে অভিহিত করিতে থাকেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অবকাশকালে তীর্থাদি ভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ
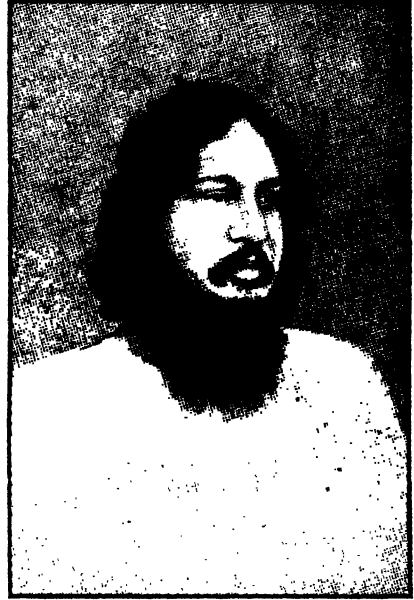
পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

স্থানসমূহ দর্শন করিয়া দেশের অবস্থা অনেকটা অবগত হইয়াছিলেন সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হন

১২৮২ সালে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উদ্যোগে এব স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট বিহারী ও বাঙ্গালী মহোদয়ের সহায়তায় মুঙ্গে "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" স্থাপিত হয়। এই সময় তিনি শিক্ষিত যুবব গণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব দৃঢ় করিবার বাসনায় "সদালোচনা সভা" এ বিদ্যালয়ের বালকগণকে আর্য্যরীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য "সুনী সঞ্চারিণী সভা" স্থাপন করেন

ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিশেষভাবে হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করেন। কোনরূপ অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সুনীতি, স্বধর্ম্ম, সদাচার, সমতা ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন।

মুঙ্গেরে "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১২৮৪ সালের (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় উক্ত পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রচারকের পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" বঙ্গে হিন্দুসমাজের প্রধান মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কিছুদিনের অবকাশ লইয়া ১২৮৫ সালে (১৮৭৮-এপ্রিল) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হরিদ্বারে মহাকুম্ভ মেলায় গমন করেন। তথায় শ্রীগুরুদেব দয়াল দাস স্বামীর পুনর্দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহারই আদেশে স্বদেশবাসীর ধর্ম্মভাব বিকাশের জন্য প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন।

১২৮৫ সালের ১২ই মাঘ (১৮৭৯—জানুয়ারী) তারিখে মুঙ্গের "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" মণ্ডপে এক বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "ভারতীয় ধর্ম্মরক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তা অবশেষে প্রস্তাব করেন যে, ভারতের দিগ্‌দিগন্তে সনাতন আর্য্যধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারক বা উপদেষ্টা নিযুক্ত করা বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। বক্তৃতাবসানে, প্রচার কার্য্যের জন্য সভাপতি কাশীমবাজার নিবাসী জমিদার রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের চারি হাজার টাকা দানের বিষয় সভায় ঘোষিত হয়। এই সময় হইতেই স্থানীয় কার্য্যক্ষেত্রের "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" নামকরণ হয় এবং দেশ বিদেশ হইতে ধন সংগৃহীত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কোথাও স্বতঃপ্রবৃত্ত, কোথাও বা আহূত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন।

১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পরেই তিনি মাতার অনুমতি লইয়া চাকরী ত্যাগ করেন। সে সময় তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর। রেলওয়ে প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে কয়েক শত টাকা পাইয়াছিলেন তাহা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এবং পিতার ঋণ পরিশোধেই ব্যয় হইয়া যায়। একমাত্র "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রের যৎকিঞ্চিৎ আয় তখন মাতৃসেবার সম্বলস্বরূপ থাকে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই সময় এক বৎসরকাল ধরিয়া গয়া, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, কাশী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। বহরমপুরে ছাত্ররূপে বাসকালেই তাঁহার ভগবদ্ভাব বিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে সেখানে ধর্ম্মবক্তারূপে পাইয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী ও পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই এবং অন্যান্য সকলে সবিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তখন মিঃ কে, জি, গুপ্ত আই-সি-এস (পরে স্যার) বহরমপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শ্রবণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বলিয়াছিলেন—"আপনার ন্যায় উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মবক্তার সম্মান করিতে আমাদের দেশের লোক এখনও শিখে নাই। আজ ইউরোপে আপনাকে পাইলে কিরূপে মহাপুরুষদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন।"

ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের ও সাধু মহাত্মার আবাস এবং শাস্ত্রজ্ঞানের আধার কাশীধামেই ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কেন্দ্রস্থান হওয়া উচিত ইহা স্থির করিয়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসে (১৮৮৩, এপ্রিল) "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" কাশীধামে স্থানান্তরিত করেন। পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডের দানে সেখানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভারতের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থে ইংরাজিতে "The Motherland" নামে মাত্র এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বালকগণের জীবন আর্য্যভাবে গঠনের উদ্দেশে "সুনীতি" নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকাও বাহির করা হয়।

ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহোদয়কে সমগ্র বঙ্গে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য প্রচারের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই সময় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ এবং কাশীবাসী পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতিও ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে উৎসাহ দান এবং দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী, জমিদার কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺দীননাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি পুণ্যাত্মাগণ প্রচার কার্য্যের জন্য বিশেষ অর্থসাহায্য করেন।

১২৯১ সালে পূজার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতা কাশীলাভ করেন। মাতৃসেবা হইতে অবসর পাইয়া এখন তিনি নিজ অবশিষ্ট জীবন ভগবৎ সেবায় উৎসর্গ করিবার শুভ সুযোগ উপস্থিত জানিয়া মহাপূজার পরেই ৩৫ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গুরুদত্ত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নামে পরিচিত হন। তিনি কাশীতে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং "যোগাশ্রম" স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণা মাতার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী রচিত ও বহুল প্রচারিত "গীতার্থ সন্দীপনী" এবং "ভক্তি ও ভক্ত," "পঞ্চামৃত," "সঙ্গীত মুঞ্জরী," "শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি," "বেদান্তবিজ্ঞান" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থের আয় হইতেই "যোগাশ্রম" নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সেবাদিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারে উত্তর ভারতের বহু নগরে এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-সীমান্ত শিলং হইতে পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্য্যন্ত তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে তিনি স্বীয় স্বদেশবাসীকে পুনরায় স্বধর্ম্মে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায় সভাপতি মনীষী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গলাভাষায় এরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয় তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভাবস্রোত চলিয়াছিল, তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা

চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত।" কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে বক্তৃতা শুনিয়া তিনি আবার পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন —"আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল স্রোত—সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়।"

পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল—"কিছুদিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটি যুগপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শুভাগমনে আর একবার প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, এবারে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল।"

ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে ভারতের এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা, স্বদেশ ও ভগবৎ সেবায় উৎসর্গপ্রাণ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন এবং পরমহংসদেবের অনুরাগী ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সময়, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে পরমহংসদেব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার সম্পাদিত সুবিখ্যাত "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকায় (৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা—১৮০৬ শকাব্দা, শ্রাবণ-পূর্ণিমা) যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহাত্মা রামকৃষ্ণ

"গহন বনে কত সুন্দর পুষ্প ফুটিয়া থাকে, তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা 'বনজ', বনের শোভা বর্দ্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি আদি যে সকল উপায় দ্বারা লোক-সকলকে পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ স্বপ্নাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।

এই মহাত্মা জিলা হুগলীর অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে (কামারপুকুর) জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় নাই। লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া আপনি বিগলিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় তান্‌সান্ কলাবৎ না হইলেও বর্দ্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন, তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিষয় বিদিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না, সুতরাং ভক্তের ভাব চেষ্টা ও চরিত্র সহজে বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "তুম

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহে)

ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? য়হ কা ভক্তিকা লক্ষণ হায় য়হ রোটী বনানেকী খেল হায়?" রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকা দর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রাণী রাসমণি জাহ্নবীতটে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিলে, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিসহ এই অপূর্ব্ব চিন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, কিন্তু মন খুলিয়া

প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন। রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে। আর কি সাধক বাহ্য জগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, রিপুমদমর্দ্দিনী রণরঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্য তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরেই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জ্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি আদি সকলে একে একে সাধকের সহিত ঘোর-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কাল নিবারণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎপদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তি-সোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কায্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, তিনি বিষ্ঠামূত্র মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উল্লম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্দ্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অটল, অচল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল, সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে মায়ায় বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাট বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল, তাঁহার পাগলামীতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎ-মাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক একদিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, আর বলিতেন, মা! আমাকে ভক্তি দেও! আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ ভক্তির মূল্য বুঝে না, জগতের চক্ষু এ ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে না। ভক্তের মাধুরী তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকট বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তকমুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে, পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহে, কিন্তু কাৰ্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘনঘন প্রণব ধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনালাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনী কাঞ্চনকে বস্তুতঃই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুত তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায়, এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্তগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংশ্রবে ও তাঁহার উপদেশ গুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে। তাঁহার বিষয়ে অনেক বলিবার আছে। সময় সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

* * * * *

একজন ভক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক যে ভাবে আর একজন ভক্তবীরের, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য জীবন-কথা শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। দুই বৎসর পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার সম্বন্ধে "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকায় যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ধর্ম্ম-প্রচারক" (১৮০৮ শকাব্দা ৯ম ভাগ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র-পূর্ণিমা) পত্রিকায় ৬০ পৃষ্ঠার পর একটি 'ব্ল্যাক্বর্ডার'যুক্ত বিবৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল,—"দক্ষিণেশ্বরের পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহান্ত সংবাদে আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি চুপে চুপে কলিকাতা ও

তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সনাতন ধর্ম্মের বিমল কিরণ বিশেষরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার সংস্রবে ও তাঁহার উপদেশের গুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছিল, ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ধর্ম্ম-প্রচারকের পাঠক মহোদয়গণকে ২ বৎসর পূর্ব্বে উপহার দিয়াছি। পরমহংস মহাশয়েরই উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্মের রং ধরিয়াছিল।"

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রথম বয়স হইতেই সুমধুর সঙ্গীত ও সুললিত কবিতা রচনায় দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষালাভের পর হইতেই তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পরে "পরিব্রাজকের সঙ্গীত" নামে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে "দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর।" এবং "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী" সুপ্রসিদ্ধ গানগুলি সর্ব্বজনবিদিত।

ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণানন্দের অতিশয় প্রতিপত্তি ও উচ্চ মর্য্যাদা দেখিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যক্তি ঈর্ষায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁ ষড়যন্ত্রে স্বামীজীকে কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ১৩০৯ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী অবিমুক্তপুরী কাশীধামে মহাসমাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার শবদেহ মহাতীর্থ ... গঙ্গার পবিত্র গর্ভে সমাহিত করা হয়।*

* দক্ষিণেশ্বর—আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় 'রবি-বাসরে'র অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

অনুবাদ-সাহিত্যে কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পর খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম প্রথম পর্য্যায়ে একই সঙ্গে মনে পড়ে এবং যাঁদের জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যকর্ম্মের কথা আজ বাঙালী পাঠকসমাজে সুবিদিত, নরেন্দ্র দেব তাঁদের অন্যতম। পঁচিশ বছর আগে তিনি "রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম" অনুবাদ ক'রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। আজ আবার তিনি "দিওয়ান-ই-হাফিজ"-এর অনুবাদ প্রকাশ করাতে তাঁর সে খ্যাতি যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এ বিষয়ে তিনি অধিকার অর্জ্জন করেছেন নিজের কৃতিত্বে।

যে "দিওয়ান-ই-হাফিজ"-এর গজলগুলির "প্রাণবস্তু হ'ল প্রেম", "অসীম অপরিমিত প্রগাঢ় ভাগবত প্রেম", বয়সের গুণে নরেন্দ্র দেব সে প্রেম সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন; তার মধ্যকার "মহান্ অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রেমের নিগূঢ় রসবোধের" অধিকারী তিনি কিছুতেই হতে পারতেন না যদি না তাঁর পরিণত বয়সের আত্মোপলব্ধি থাকত। অনুবাদগুলি পড়ে' মনে হয়েছে যে তাঁর কবি-মানসে গজলগুলির অনুপম লালিত্য ও সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়েছে অতি সহজেই।—তিনি মুগ্ধ হয়েছেন তাদের রসাত্মক আবেদনে;—এবং মুগ্ধ হয়েছেন বলেই এই আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থে আমরা পাই মূল রচনার "সহজ সরল সাবলীল গতি" এবং তার সুরমাধুর্য্য। সঙ্গীতের রসানুভূতিও অনুবাদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ এই বাংলা অনুবাদে গীতি-কবিতার যে সুরটি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে তাতে করে রসের দিক থেকে তার প্রকৃত মূল্য দিতে বাধে না।

হাফিজের ৫৬৯টি গজলের মধ্যে বেছে বেছে মাত্র ৪০টি অনুবাদ করা হয়েছে এই বইখানিতে; কিন্তু নির্ব্বাচনের গুণে এ কয়টি পড়লেই হাফিজের কাব্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান হয়, গজলের "অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের" সত্যকার পরিচয় এতে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মূল কবিতার যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, অনুবাদে তার স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না; সেজন্য কাব্যধর্ম্মের মূল নীতি যে অনুবাদকালে উপেক্ষিত হয়নি বরং তার যথেষ্ট মর্য্যাদা রাখারই চেষ্টা করা হয়েছে একথা বইখানি যাঁরা পড়বেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। অনুবাদ করার শক্তি সকলের থাকেনা—খুব উঁচু স্তরের সাহিত্যিক বা কবি হলেও তা সম্ভব হয় না—সেজন্য একই সঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেবকে ও অনুবাদক নরেন্দ্র দেবকে অভিনন্দিত করব।

গজলের মূল ছন্দ অনুসৃত হ'বার পথে অনেক বাধা আছে এবং ভাষান্তরে সেটা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই আমরা মনে করি অনুবাদক বাংলা কাব্যের বিভিন্ন ছন্দের সাহায্য নিয়ে ভালই করেছেন—অন্ততঃ তাতে কাব্যের জাতটা অতি সাবধানে তিনি বাঁচিয়ে যেতে পেরেছেন। ছন্দ ব্যতিক্রমেও যে মূল গজলগুলির প্রাণধর্ম্মটি বজায় আছে—এই অনুবাদ কাব্যগ্রন্থের সেইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে আমরা মনে করব। মূল রচনার কথা, সুর ও ব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ না হওয়াতেই আলোচ্য পুস্তকে আমরা একাধিক রসোত্তীর্ণ কবিতাগুচ্ছের সন্ধান পেয়েছি। অনেক উদাহরণ দেওয়া যেত—কিন্তু স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন ব'লে দু' একটি গুচ্ছ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না:

> "বয় মৃগমদ-গন্ধ-মদির শান্ত ভোরের শীতল বায়,
> কুঞ্চিত তার অলকদামের বার্ত্তা-মধুর
> বাড়ায় আয়ু।
> সে সুরভির সোহাগ লুটি
> চিত্ত পাগল বেড়ায় ছুটি
> দুঃখ শোণিত বক্ষে ঝরে, দীর্ণ প্রাণের সকল স্নায়ু।"

অথবা—

> "ওগো সাকি, জীবনের আনন্দ-রূপিণী!
> সুরার সৌন্দর্য্যধারা চন্দ্রালোক জিনি—
> বিজয়িনী দাও দাও ছড়াইয়া আজ—
> দীপ্ত করো পাত্র আমাদের।"

অথবা—

> "তোমার রক্তাভ গণ্ডে উচ্ছ্বসি উঠুক
> গোলাপগুচ্ছের স্মৃতি দখিনা বাতাসে
> তব কুঞ্জবনরেণু এনে দিক প্রিয়
> সুতনু-সুবাস-কান্তি আমার আকাশে।"

পরিচ্ছন্ন ছাপা—সুন্দর পুরু কাগজ এবং সর্ব্বোপরি পারসিক রেখা অঙ্কিত সুন্দর প্রচ্ছদপট এবং ত্রিবর্ণে মুদ্রিত বহু ছবি বইখানিকে সত্যই মনোরম করে তুলেছে। অনুবাদ হলেও এমন কাব্যগ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।*

* দিওয়ান-ই-হাফিজ : অনুবাদক—নরেন্দ্র দেব।
প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
মূল্য : পাঁচ টাকা।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনাদি আইসব্যাগটা আনিয়া জয়ন্তর হাতে দিল। জয়ন্ত আইসব্যাগটা জয়ার মাথায় চাপা দিয়া পাশে বসিল। দীনদয়ালের অপেক্ষা করিয়া বিমান ক্রমাগত থার্মোমিটার ঝাঁকিতে লাগিল, এমন সময় বাহিরে দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ হস্তে তিনি ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সবটি দেখিলেন। ধীরে ধীরে রোগিণীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

জয়ন্ত॥ অনাদি, একটা চেয়ার।

কিন্তু তখনই তাহার ভুল বুঝিয়া জিভ কাটিল। অনাদি ছুটিয়া আসিয়া একটা চেয়ার দিল। দীনদয়াল বসিলেন। রোগিণীকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপর তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—চিন্তিত হইবার কিছু নাই।

দীনদয়াল॥ নাঃ, ভয়ের তো কিছু দেখছি না।

জয়ন্ত॥ হার্ট— হার্টটা বড় দুর্ব্বল, বাবা।

দীনদয়াল॥ তুমি একটি গাধা। হার্টের অবস্থা পাল্‌সেই বোঝা যায়। কি কষ্ট হচ্ছে, মা?

জয়া॥ বুকে একটা ব্যথা। সব সময় নয়। এখন নেই।

দীনদয়াল॥ দেখি। (স্টেথিস্কোপ দ্বারা বুক পরীক্ষা করিয়া) নাঃ, এমন কিছু পাচ্ছি না। বলতেই হবে, অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কে চিকিৎসা করছে?

জয়ন্ত॥ ডাক্তার খাশনবিশ। জরুরী কল পেয়ে মাদ্রাজ চ'লে গেছেন।

দীনদয়াল॥ অ্যালোপ্যাথ?

জয়ন্ত। হাঁ, বাবা।

দীনদয়াল॥ তার মানে, চিকিৎসাই হয় নি। তুমি যে মা একটু ভালো বোধ করছ—ভেবো না ওসব ছাইপাঁশ গিলে। তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে মা, তোমার ভেতরে খুব একটা Vitality আছে—Vitality—যাকে বলে জীবনীশক্তি। (জয়ন্তকে) এই গাধা, ঐসব শিশিপত্র এখান থেকে সরিয়ে ফেল।

জয়া॥ ভোম্বলকে বল।

জয়ন্ত॥ ও—হাঁ—ভোম্বল। ভোম্বল! ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আয় শিশিগুলো।

অনাদি আসিয়া শিশিপত্রগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল

দীনদয়াল॥ নতুন লোক দেখছি। ভোলাকে দেখছি না যে!

জয়ন্ত॥ ভোলা গেছে তারকেশ্বর—কি মানৎ ছিল।

বিমান॥ নতুন হ'লেও এ লোকটি বেশ। নাম বটে ভোম্বল; কিন্তু বেশ কাজের।

দীনদয়াল॥ তুমি কে?

বিমান॥ (চট্ করিয়া দীনদয়ালের কাছে গিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া) আমি ঐ জয়ার দাদা।

দীনদয়াল॥ (জয়ন্তকে) ও, তার মানে তোর শালা! তা ভাই-বোন দেখছি দুইই বেশ! You do not deserve it. (জয়াকে) কি মা, এখন কেমন বোধ করছ?

জয়া॥ শীত করছে। বরফটা আর সইতে পারছি না।

দীনদয়াল॥ (জয়ন্তর হাত হইতে আইসব্যাগটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার উদ্দেশ্যে) যাও—ওটা তোমার মাথায় চাপাও, ইডিয়ট্!

জয়ন্ত সভয়ে সেখান হইতে সরিয়া আসিল। অনাদি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগটা তুলিয়া সকলের অলক্ষ্যে নিজের মাথায় চাপিয়া পাশের ঘরে প্রস্থান

দীনদয়াল॥ (জয়াকে) এখন? ভালো লাগছে?

জয়া॥ ঘুম পাচ্ছে, বাবা।

দীনদয়াল॥ Sleep means half the cure. ঘুমোও মা, ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?

জয়া॥ তার আগে আমায় একটু উঠতে দিন, বাবা।

দীনদয়াল॥ বাবা! বাবা! কি মিষ্টি তোমার কথা মা! উঠবে? ওঠো—ওঠো।

দীনদয়াল তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিলেন। জয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া দীনদয়ালের পায়ে প্রণাম করিল। দীনদয়াল ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন

দীনদয়াল ॥ ওরে—ওরে—এ কি! (জয়াকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিয়া) লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! সুখী হও মা—চিরায়ুষ্মতী হও। কত বুদ্ধি! কত বিবেচনা! এত অসুখেও আমায় প্রণাম করল! আর ঐ গাধা—(জয়ন্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল) থাক—থাক। (জয়াকে) বসো মা, (জয়ন্তকে) বোস্।

দীনদয়াল মাঝখানে বসিয়া জয়া ও জয়ন্তকে তাঁহার দুই পার্শ্বে বসাইলেন। হঠাৎ ঊর্ধ্বে তাকাইলেন। মনে হইল, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিবা স্বর্গতা সহধর্মিণী মমতাকে এই দৃশ্য দেখাইতেছেন

দীনদয়াল ॥ আমার কাছে তুমি অক্ষয়—অমর—চিরজীবন্ত।

সকরুণ নেত্রে চাহিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন—শোনা গেল না—বোঝা গেল না—তাঁহার চোখে জল আসিল। প্রসারিত দুই হস্ত জয়া ও জয়ন্তর মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং রুদ্ধ ক্রন্দন কোনমতে দমন করিয়া নতমুখ হইলেন। হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া জয়াকে বলিলেন—

মা, তুমি শোও। কিন্তু এখানে কেন? (জয়ন্তকে) এই গাধা, খাট বিছানা নেই নাকি?

জয়ন্ত ॥ অনাদি! অনাদি!

দীনদয়াল ॥ সেটা আবার কে?

বিমান ॥ ঐ ভোম্বল। কিন্তু ভোম্বল নামটাতে ওর ভারি আপত্তি, তাই যখন যে নামে ইচ্ছা ডাকি।

দীনদয়াল ॥ তবে তোমার সহস্র নাম হে! যাও তো বাবা সহস্রনাম, ওঘরে বিছানা ঠিক ক'রে দাও।

জয়া ॥ না বাবা—ঘুম আর পাচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছে—আপনার কাছে বসি—আপনার কথা শুনি—(চারিদিকে সকলকে দেখিয়া) একা।

দীনদয়াল ॥ এই—সব যাও।

সকলে যাইতেছিল

জয়া ॥ ভোম্বল, দাঁড়াও।

অনাদি দাঁড়াইল

বাবাকে হাতমুখ ধোয়ার জল দাও।

দীনদয়াল ॥ ঠিক—ঠিক। ভুলেই গিয়েছিলাম।

জয়া ॥ এখন যে কিছু খেতে হবে—তাও তো ভুলে গেছেন বাবা। (অনাদিকে) বাবার জন্য খাবার সাজিয়ে আমার এখানে এনে দাও—সন্দেশ আর ফলমূল।

দীনদয়াল ॥ দু' থালা—একটা আমার, একটা মা'র।

জয়া ॥ আমাকে শুধু সাগুবার্লি খাইয়ে রেখেছে, বাবা

দীনদয়াল ॥ (ক্ষেপিয়া গিয়া) হার্টের অসুখ—সাগু বার্লি খাইয়ে রেখেছে! এই গাধা! কোথায় গেল সব ডাক্তারী পড়ছে সব—ডাক্তার!

দীনদয়াল হাতমুখ ধুইতে গেলেন। পিছনে পিছনে গেল অনাদি। দীনদয়াল চলিয়া গিয়াছেন কিনা—জয়ন্ত তাহা উঁকি মারিয়া দেখিয়া পা টিপিয়া উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিল। পিছনে পিছনে ঐভাবেই আসিল বিমান

জয়ন্ত ॥ আপনি যে রোগী—সেটা বোধহয় ভুলে গেছেন, জয়াদেবী।

প্রস্থানোদ্যত

বিমান ॥ হাঁ, যা ঘরকন্না শুরু ক'রে দিয়েছেন—দেখবি ডোবাবেন।

প্রস্থানোদ্যম, কিন্তু দীনদয়ালের অকস্মাৎ আবির্ভাব

দীনদয়াল ॥ কি—কি বলছিলে সব?

জয়া ॥ বলব বাবা—কি বলছিল?

দীনদয়াল ॥ হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই বলবে? কি আলাপ করছিল ওরা?

জয়া দুইজনের মুখের দিকে তাকাইল। বলি-বলি করিয়াও কিছু বলিল না

দীনদয়াল ॥ বল—বল, ভয় কি! গাধাটা কি বলছিল

জয়া ॥ আমি ঘোমটা দিই নি ব'লে বকছিলেন।

দীনদয়াল ॥ না—না, মা। ঘোমটা কেন! তুমি আমার মা—আমি তোমার বুড়ো ছেলে। আমার কাছে তোমার ঘোমটা দিতে হবে না।

জয়া ॥ (জনান্তিকে—দীনদয়ালকে) আবার হাসছে!

তৎক্ষণাৎ দীনদয়াল মুখ ফিরাইয়া দেখেন, বিমান ও জয়ন্ত মুখ টিপিয়া হাসিতেছে

দীনদয়াল ॥ 'গেট্ আউট্—গেট্ আউট্—ইউ স্কাউন্ড্রেলস্'।

বন্ধুদ্বয়ের পলায়ন। অনাদি খাবার লইয়া সবেমাত্র ঘরে ঢুকিয়াছিল। সেও এই গর্জনে খাবার সহ বাহিরের দরজা দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। জয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে সোফাতে শুইয়া পড়িল

দীনদয়াল ॥ না—না, মা, তুমি ভয় পেয়ো না। আর ওদেরও ভয় পাবার কিছু নেই।

জয়া ॥ (উঠিয়া বসিয়া) তা হ'লে বাবা—ঐ ভোম্বলকেও ডাকুন। ও আবার খাবারের থালা নিয়ে বোধ করি বাড়ী থেকেই পালিয়ে গেল।

দীনদয়াল ॥ আঃ, কি বিপদ! ওহে ভোম্বল! ভয় নেই। এদিকে এসো।

সভয়ে খাবারের থালা হাতে নিয়া অনাদি প্রবেশ করিল এবং উভয়ের সামনে তাহা রাখিল

দীনদয়াল ॥ ...গ্‌গির সেরে ওঠ মা। ভালো রান্না কতকাল খাই না! রাঁধতেন -তিনি—মানে তোমার শাশুড়ী। জান তো তিনি নেই?

জয়া ॥ জানি বাবা।

দীনদয়াল ॥ বিশটি বছর আমি একা। সে যখন গেল, জয়ন্তর বয়স তখন পাঁচ। এই বিশটি বছর ওকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই। আজ তুমি এসেছ—আমি নিশ্চিন্ত হলাম, মা, নিশ্চিন্ত হলাম। জীবনের বাকি দিনগুলো—

জয়া ॥ (অস্ফুট আর্তনাদে) বাবা! (অব্যক্ত যন্ত্রণায়) উঃ...

দীনদয়াল ॥ কি হ'ল মা?

জয়া ॥ আমি বলতে পারছি না—আমি বলতে পারছি না।

দীনদয়াল ॥ ব্যথাটা?

জয়া ॥ না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ হাঁ্যা—হাঁ্যা। তুমি লুকোচ্ছ। কি হয়েছে মা—আমায় তুমি বল! কোথায় ব্যথা?

জয়া ॥ না বাবা, সেরে গেছে।

দীনদয়াল ॥ অ্যাঁ—'বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়'! হুঁ। 'সুকেশী—নীলনয়না—সুদর্শনা—সুকুমার-ত্বকবিশিষ্টা নারী'। হুঁ। আচ্ছা, মা, ব্যথা-বেদনা সব ডানদিকেই বেশি—না?

জয়া ॥ হাঁ্যা—হাঁ্যা, বাবা।

দীনদয়াল ॥ সহজেই সর্দি লাগে? যখন কাশি হয়—তখন ঘং ঘং ক'রে কাশো?

জয়া ॥ হাঁ্যা, বাবা।

দীনদয়াল ॥ কড়া আলো—কড়া শব্দ সইতে পারছ না নিশ্চয়ই?

জয়া ॥ কি ক'রে জানলেন, বাবা?

দীনদয়াল ॥ (গর্বমিশ্রিত হাস্যে) হাঃ হাঃ! আচ্ছা, বিশ্রামকালে, কিংবা সোজা হয়ে বসলে, কিংবা গরমঘরে ভালো বোধ কর?

জয়া ॥ হাঁ্যা, বাবা। আর ওরা আমার মাথায় ঠেসে ধরেছিল বরফ।

দীনদয়াল ॥ আচ্ছা মা, কখনো কি তোমার মনে হয় যে, তোমার চারপাশে যেন ভূতপ্রেত নেচে বেড়াচ্ছে? নানাবিধ কীট কিলবিল করছে? কালো কালো সব জন্তু-জানোয়ার-কুকুর-নেকড়েবাঘ যেন তোমাকে তাড়া করছে?

জয়া ॥ (কপট ভয়ে) উঃ! সত্যি, বাবা, সত্যি।

দীনদয়ালকে জড়াইয়া ধরিল। জয়ার আর্তনাদ শুনিয়া জয়ন্ত, বিমান ও অনাদি ছুটিয়া আসিল

জয়ন্ত ॥ কি হয়েছে?

দীনদয়াল ॥ হয়েছে তোমার মাথা। দেখছ না—'ক্লিয়ার পিক্‌চার অব্‌ বেলেডোনা'। হুবহু বেলেডোনা—পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেলেডোনা। বেলেডোনা ২০০ এক ডোজ, মা আমার লাফিয়ে উঠবে। এই, এর পর মদনপুরের ট্রেণ কখন?

জয়ন্ত ॥ ঠিক জানি নে বাবা, জেনে আসব?

জয়ন্ত ॥ বিমান!

বিমান ॥ যাচ্ছি।

টাইমটেবল আনিতে বিমানের প্রস্থান

দীনদয়াল ॥ তুমি কিচ্ছু ভেবো না, মা, খুব খাবে-দাবে, খুব স্ফূর্তিতে থাকবে। কই—কিছু খেলে না তো?

জয়া ॥ আপনিও তো খেলেন না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ হাঁ্যা—খাচ্ছি। খাও মা, তুমিও খাও।

জয়া জয়ন্তর দিকে তাকাইল। স্বামীর সম্মুখে খাইতে নাই। ইহা জানাইবার জন্য সে সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়া বলিল—

জয়া ॥ আপনি খান বাবা, আমি পরে খাব।

দীনদয়াল পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখেন, জয়ন্ত দাঁড়াইয়া আছে। তিনি স্থিরভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জয়ন্তর দিকে অগ্রসর হইতেই জয়ন্ত চলিয়া যাইতেছিল

দীনদয়াল ॥ না—না, দাঁড়াও।

জয়ন্ত দাঁড়াইল। দীনদয়াল সোজা গিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইলেন

দীনদয়াল ॥ আমাদের হিন্দু মেয়েরা স্বামীর সামনে খায় না—খেতে পারে না। তোমার মা খেতেন না। স্বামীরাও তাই স্ত্রী যখন খাবে তখন সেখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে না। তুমি ছিলে। আর কখনও থাকবে না।

জয়ন্ত ॥ আর থাকব না।

জয়ন্তর প্রস্থান। জয়া হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। কিন্তু দীনদয়াল ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই জয়া চট্ করিয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল

দীনদয়াল ॥ (নিজের আসনে বসিয়া) নাও মা, এবারে খাও। বাপের সামনে খেতে—ছেলের সামনে খেতে লজ্জা নেই।

দুইজনে খাওয়া শুরু করিল

জয়ন্তর চিঠিতে জেনেছি, তোমার বাপ-মা কেউ নেই। থাকার মধ্যে ঐ একটি ভাই। আর আর সব খবরও জয়ন্ত দিয়েছে। মনে হয়তো তোমার অনেক দুঃখই ছিল—কিন্তু আর রেখো না, মা। জগতে একদিক দিয়ে ক্ষতি হয়—আর একদিক দিয়ে পূরণ হয়। অনেক কিছু তুমি হারিয়েছ, আবার অনেক কিছু পেলে—এও যেমন সত্যি—অনেক কিছু আমরাও হারিয়েছি, আবার তোমাকে পেয়ে অনেক কিছু পেলাম—এও তেমনি সত্যি—তেমনি সত্যি মা।...(ডাকিলেন) জয়ন্ত! জয়ন্ত!

জয়ন্তর প্রবেশ

দীনদয়াল ॥ বৌমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দাও।

জয়ন্ত ॥ গুছিয়ে দেব? কেন বাবা?

দীনদয়াল ॥ 'কেন বাবা' মানে? এখানে রেখে ওকে কি মেরে ফেলবে! a clear case of Belladona. মাথায় আইসব্যাগ—গায়ে রাগ চাপিয়ে মেয়েটাকে বধ করেছ। যত সব ইডিয়ট্। বৌমা, পারবে তো যেতে আমার সঙ্গে?

দীনদয়ালের পশ্চাৎ হইতে জয়াকে যাইতে নিষেধ করিয়া বরিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল জয়ন্ত। জয়া তাহা দেখিল এবং নতমুখী হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল

দীনদয়াল ॥ (জয়ার ইতস্তত-ভাব লক্ষ্য করিয়া) অবশ্য দু-চারদিন পরেও যেতে পার মা। বেশ তাই হবে।

জয়ন্ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং বাবা তারকনাথের উদ্দেশ্যে বারে বারে প্রণাম করিল। টাইমটেবল লইয়া বিমানের প্রবেশ

দীনদয়াল ॥ এই যে টাইমটেবল—দাও।

বিমান ॥ (টাইমটেবল হাতে দিয়া) আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন আছে।

দীনদয়াল ॥ তাই নাকি? বেশ বেশ!

টাইমটেবল না দেখিয়াই রাখিয়া দিলেন

বসো বিমান। (জয়ন্তকে) এই হতভাগা, বোস্ না। এখন তো আধ ঘণ্টা বাকি। তোদের সঙ্গে আমার এই আধ ঘণ্টার দাম—আমার জীবনে যে কতটা তা তোরা বুঝবি না। ইচ্ছে হচ্ছে—এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছে যে থেকে যাই। কিন্তু হাসপাতালের অতগুলো অসহায় রোগী—তাদের ছেড়ে থাকতে ভরসা হয় না। একটু সুস্থ-সবল হয়ে বৌমা যখন যাবে, তোমাকে ওদেরও মা হ'তে হবে। দেখবে মা—কত বড় বিরাট সংসার আমি তোমার জন্যে তৈরি ক'রে রেখেছি—কত বড় বিরাট সংসার!

জয়া ॥ (আর্তকণ্ঠে) আপনি সত্যিই কি আজ যাবেন বাবা? একটা রাত—একটা রাত আপনি কোন মতেই থেকে যেতে পারেন না বাবা? আমার অনেক কিছু বলার ছিল...

দীনদয়াল ॥ বুঝছি—তোমার ভেতরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু আর কিছু বলতে হবে না মা, সবকিছু সেরে যাবে—ঐ এক ডোজ বেলেডোনা। (ব্যাগ খুলিয়া বেলেডোনার শিশি হইতে এক ডোজ বেলেডোনা ঢালিয়া পুরিয়া করিয়া তাহা জয়ার হাতে দিলেন) নাও মা, কাল ভোরে খালি পেটে খাবে। আচ্ছা মা, এইবার তবে উঠি।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জয়া ॥ কিন্তু ফিরতে অতটা রাত হবে—আর কিছু খেয়ে যাবেন না বাবা!

দীনদয়াল॥ রাতে আমি কিছু খাই না, মা।

জয়া॥ তা কি করে হয় বাবা! সারাটা রাত—

দীনদয়াল॥ অন্নপূর্ণা ঘরে এলে খাব বইকি, মা। এটা খাবো—সেটা খাবো—দেখো আমার আব্দার! জয়ন্তকে) তুমি থাকো। (বিমানকে) বিমান, তুমি এসো বাবা, আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে। কথাবার্তাও হবে। রোজই একটা চিঠি দিও জয়ন্ত! আসি মা।

সকলে প্রণাম করিল। অনাদি ব্যাগটি মাথায় লইল। কিন্তু দীনদয়াল তাহা তাহার মাথা হইতে টানিয়া লইয়া—

দীনদয়াল॥ থাক—থাক। ভোম্বল-নামটাই তোমার ঠিক। দু'সের ওজনের ব্যাগ—উনি নিচ্ছেন মাথায়। তোমাদের মাথায় চাপানো উচিত আইসব্যাগ।

বিমান। আমি একটা গাড়ি দেখছি।

বিমান বাহির হইয়া গেল

দীনদয়াল॥ দুর্গা! দুর্গা! আসি মা!

সকলের দিকেই একবার চাহিয়া দীনদয়াল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তর সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া নিজের ব্যাগ হইতে নোটখানি বাহির করিয়া আর্তকণ্ঠে জয়ন্তকে কহিল—

জয়া॥ কথা ছিল—আমি যাব না। কথা আমি রাখতে পারলাম না, জয়ন্তবাবু। এই নিন আপনার টাকা। (জয়ন্তর হাতে নোটখানি গুঁজিয়া দিল) আমি যাব—আপনার জন্যে নয়—আমি আমার হারানো বাপ-মা ফিরে পেয়েছি।

জয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

জয়ন্ত॥ শুনুন—শুনুন! কি বিপদ! অনাদি, আমিও চললাম। যে ক'দিন না ফিরি সব ম্যানেজ করবি।

জয়ন্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

অনাদি॥ ওরে বাবা। বৌ-ভাড়া এনে এ যে দেখছি ভরাডুবি হ'ল—ভরা ডুবি!

যবনিকাপতন (ক্রমশঃ)

জর্জ সান্তায়না

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সান্তায়নার জন্ম হইয়াছিল স্পেনে, তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন আমেরিকায়; কিন্তু তাঁহার মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি স্পানিয়ার্ডের মতোও নয়, আমেরিকানের মতোও নয়, তাহা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদিগের মতো।

১৮৬৩ সালে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ নগরে জর্জ সান্তায়না জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মাতার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। যখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতা ও মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ হয় এবং তাঁহার মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকায় বোষ্টনের লাটিন বিদ্যালয়ে সান্তায়নার প্রথম শিক্ষা হয়। পরে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি নিজে ক্রীড়াসক্ত না হইলেও, ফুটবল ক্রীড়া দেখিতে ভালবাসিতেন।

সান্তায়নার পিতা ফিলিপাইন দ্বীপে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তিন বার জাহাজে ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন এবং নানা দেশে নানা-জাতীয় লোক ও তাহাদের বিচিত্র বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখিয়াছিলেন। পিতার নিকট এই সকল দেশের বর্ণনা শুনিয়া সান্তায়নার কল্পনা উত্তেজিত হইত এবং এই সকল দেশের দৃশ্যাবলী ও আচার-ব্যবহারের চিন্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন।

সান্তায়না যখন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, তখন জেমস্ রইস্ ও পামার তথায় অধ্যাপক ছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব ভাল ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন "জেমস্ ও রইসের বক্তৃতা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেও, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল হইত না।" জেমস্, রইস্ ও পামার এই "নিষ্ঠুর ও কুৎসিত" জগৎকে আদর্শ জগৎ বলিয়া গণ্য করিতেন! ইহাই তাহাদের বিরুদ্ধে সান্তায়নার অভিযোগ। সান্তায়না ছিলেন জড়বাদী। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার জড়বাদ যুক্তি হইতে লব্ধ মত নহে। জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমার মনে হয়, যাঁহারা জড়বাদী নহেন, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বেশী নাই।" সান্তায়নার পিতামাতা ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, দেবতার নিকট বলি, উপাসনা, গীর্জা, মরণোত্তর জীবনসম্বন্ধীয় কাহিনী, সকলই ধূর্ত্ত পুরোহিতগণ মূর্খ জনগণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের জন্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। সান্তায়নার মতও ইহাই ছিল।

কিন্তু এই জড়বাদী দার্শনিকের মন ছিল কবির মন। তাঁহার মস্তক ছিল সংশয়বাদী, কিন্তু হৃদয় ছিল বিশ্বাস-প্রবণ। তাঁহার সমগ্র সহানুভূতি ছিল বিশ্বাসী ভক্তদিগের প্রতি। তিনি লিখিয়াছেন "সকল

ধর্ম্মই ধর্ম্মবিবেকের রচিত উপকথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সে উপকথা কি উদ্দীপনাপূর্ণ !" প্রাচীনের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁহার আক্ষেপ ছিল, তিনি কেন প্লেটোর সময়ে জন্মগ্রহণ না করিয়া বোষ্টনের পিউরিটানদিগের মধ্যে জন্মিলেন। অধ্যাপনা তাঁহার প্রীতিকর ছিল না; তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল নির্জ্জনে প্লেটো, আরিষ্টটল, ডেমোক্রিটাস, লুক্রেসিয়াস ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদিগের সাহচর্য্যে জীবন-যাপন করা, কিন্তু অদৃষ্টের তাড়নায় তাঁহাকে হইতে হইয়াছিল অধ্যাপক। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী ছিল মনোহারী। তাঁহার দর্শন ছিল কবিত্বপূর্ণ—প্লেটোর দর্শন, জড়বাদ এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হইত।

১৮৯৬ সালে সান্তায়নার প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ The Sense of Beauty প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান (রস-শাস্ত্রে) আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৯০১ সালে তাঁহার Interpretation of Poetry and Religion (কবিতা ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা) প্রকাশিত হয়। ইহার পরে সাত বৎসর যাবৎ তিনি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Life of Reason (প্রজ্ঞার জীবন) রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত: (১) Reason in Commonsense, (২) Reason in Society, (৩) Reason in Religion, (৪) Reason in Art এবং (৫) Reason in Science। গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সান্তায়নার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কবিত্বের ভাষায় দর্শনের এরূপ প্রকাশ বিরল।

হার্ভার্ড হইতে সান্তায়না ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯২৩ সালে তাঁহার Scepticism and Animal Faith প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল, ইহা এক নূতন দার্শনিক প্রস্থানের উপক্রমণিকা মাত্র।

১৯৫২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৮৮ বৎসর বয়সে সান্তায়না পরলোকগমন করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান

গ্রন্থ-রচনার কারণ নির্দ্দেশের জন্য Sense of Beauty গ্রন্থের উপক্রমণিকায় সান্তায়না লিখিয়াছেন, দর্শনে সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের জীবনে সৌন্দর্য্যানুভূতির স্থান তাহা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পে, যুদ্ধে ও ধর্ম্মে মানুষের যে পরিমাণ বুদ্ধি ও চেষ্টা ব্যয়িত হইয়াছে, ভাস্কর্য্য, কবিতা ও সংগীতের অনুশীলনে তাহা অপেক্ষা কম ব্যয়িত হয় নাই। শিল্পজাত প্রত্যেক দ্রব্যই যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে! গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যাপারেও মানুষ তাহার সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছে। অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক জন্তুর আকৃতি যৌন-নির্ব্বাচনের ফলে সুন্দর রূপ ও বর্ণের অভিবর্দ্ধন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানবের প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য-উপভোগের প্রবৃত্তি যে মনস্তত্ত্বের গবেষণায় মনের এই বৃত্তিকে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত নহে। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্যের মূল্য (value) মানসিক ব্যাপার (Subjective) বলিয়া ইহার আলোচনা বেশী হয় নাই। যাহা তাঁহার মনের সৃষ্ট, মানুষের নিকট তাহা অসত্য এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন বলিয়া প্রতীত হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ বিশ্বের গঠন ও প্রকৃতির গবেষণায় বহুদিন ব্যাপৃত থাকিবার পরে যাবতীয় গবেষণার উৎস মনের পরিচয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধুনিক দার্শনিকগণ যদিও বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করিয়াছেন, তথাপি কল্পনা ও ভাবাবেগ-সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত গবেষণা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্তায়না তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা

"ইন্দ্রিয়ের নিকট ঈশ্বরের প্রকাশই সৌন্দর্য্য"। সৌন্দর্য্যের এই সংজ্ঞার আলোচনা করিয়া সান্তায়না বলিয়াছেন—ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁহার দৃষ্টির (vision) মধ্যে—তাঁহার প্রকৃতি ও তাঁহার জীবনের ঘটনার মধ্যে—কোনও দ্বৈত অথবা বিরোধ নাই। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ঘটে, তাঁহার অন্তর ও বাহিরের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যের চিন্তাতেও আমাদের জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে এই প্রকার পূর্ণতাই দেখিতে পাওয়া যায়—তখন সৌন্দর্য্য ও আনন্দ একসঙ্গে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়। বাহিরে সৌন্দর্য্য, অন্তরে আনন্দ—ভিতরে বাহিরে পূর্ণ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য ঈশ্বরের মধ্যগত সামঞ্জস্যেরই প্রতীক। সুতরাং ইহাকে ইন্দ্রিয়ের নিকট ঈশ্বরের প্রকাশ বলা যায়। কিন্তু ইহা উপমামাত্র। ইহা দ্বারা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ ব্যক্ত হয় না। কেহ বলিয়াছেন "সৌন্দর্য্য ও সত্য অভিন্ন," কেহ বলিয়াছেন "আদর্শের প্রকাশই সৌন্দর্য্য"; কেহ বলিয়াছেন "ঐশ্বরিক পূর্ণতার প্রতীক সৌন্দর্য্য", আবার কেহ বলিয়াছেন "মঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রকাশই সৌন্দর্য্য।" এই সমস্ত বর্ণনা মনোরম ও চিন্তার উত্তেজক বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে বিশেষ সাহায্য করে না। তবে সৌন্দর্য্য কি? সান্তায়না বলিয়াছেন, "ভাবাত্মক (positive) স্বরূপ-গত (intrinsic) এবং বিষয়ীভূত (objectified) মূল্যই (value) সৌন্দর্য্য।" অর্থাৎ বস্তু-বিশেষের গুণ-রূপে পরিগণিত আনন্দই সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য কোনও তথ্যের জ্ঞান নয়। পুষ্পকে বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত শ্বেত, নীল অথবা রক্তবর্ণ বস্তু বিশেষ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা সৌন্দর্য্য নহে। সে জ্ঞান বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। সৌন্দর্য্য মূল্যের জ্ঞান (Judgment of value) নহে। জগতে সকল দ্রব্যে আমরা মূল্যের আরোপ করি না। মূল্যের আরোপও বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় না। কোন বস্তু যে অন্য বস্তু হইতে প্রিয়তর হয়, তাহাতে যুক্তির কোনও ক্রিয়া নাই। রাগ ও দ্বেষ বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নহে। আমাদের প্রকৃতির যুক্তিহীন অংশের প্রতিক্রিয়া হইতেই মূল্যের উদ্ভব হয়। লৌহ আমাদের সাংসারিক প্রয়োজনে লাগে। ফুলের সেরূপ

সৌন্দর্য্য এক প্রকার ভাবাবেগ (Emotion)। যে বস্তু কোনও লোককেই আনন্দ দিতে পারে না, তাহা সুন্দর নহে।

সৌন্দর্য্য ভাবাত্মক অর্থাৎ কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর উপস্থিতি-বোধ। নৈতিক মূল্য সাধারণতঃ অভাবাত্মক এবং ব্যবহিত (remote)। কোনও বস্তুর উপকারিতার অনুভূতি সৌন্দর্য্য নহে। সৌন্দর্য্যের আনন্দ অব্যবহিত। আমাদের মনের এক মৌলিক প্রয়োজন, অথবা সামর্থ্য হইতেই সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়। অমঙ্গল-পরিহারের সহিত সুনীতির সম্পর্ক ; যাহা অমঙ্গল, যাহা অপকৃষ্ট তাহাকে বর্জ্জন এবং যাহা মঙ্গলকর, তাহার অনুসরণই সুনীতি। সুনীতি অভাবাত্মক সৌন্দর্য্যের সহিত সম্পর্ক কেবল আনন্দানুভূতির সৌন্দর্য্য ভাবাত্মক।

ইন্দ্রিয়ের সুখ ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এক নহে। প্রত্যক্ষ প্রতীতি (Perception) ও সংবেদনের (Sensation) মধ্যে যে পার্থক্য, ইন্দ্রিয় সুখ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে সংবেদন বাহ্যবস্তুরূপে প্রতীত হয়, সৌন্দর্য্যানুভূতিতেও তাহার উপাদান বাহ্যবস্তুর গুণরূপে প্রতীত হয় সংবিদের গুণরূপে নহে। বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত সুখই (objectified pleasure) সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্যবোধও দৈহিক সুখের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে সান্তায়না বলিয়াছেন—"সমস্ত সুখেরই স্বরূপগত এবং ভাবাত্মক মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সকল সুখই সৌন্দর্য্যবোধ নহে। সৌন্দর্য্যবোধের সারভাগ যদিও সুখ, তথাপি এই সুখের মধ্যে এমন জটিলতা আছে, যাহা অন্য সুখের মধ্যে নাই।" দৈহিক সুখের সহিত দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। সৌন্দর্য্যবোধের সুখের সহিত যে দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ নাই তাহা নহে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের সময় সে সম্বন্ধ আমাদের মনে উদিত হয় না। যে সমস্ত প্রত্যয়ের (ideas) সহিত সৌন্দর্য্যবোধের সুখ সম্বন্ধ, তাহারা সেই সুখের দৈহিক কারণের প্রত্যয় নহে। যে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয়, অনুভূতিকালে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, আমাদের মনোযোগ অব্যবহিত-ভাবে কোনও বাহ্য বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। সৌন্দর্য্যানুভূতির সময় আত্মা দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিস্মৃত হয় এবং চিন্তার সময় যেমন স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে, তেমনি সর্ব্বত্র বিচরণে সক্ষম বলিয়া আপনাকে মনে করে। সৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের উৎসব-কালের (holiday life) ব্যাপার, তখন আমাদের মন অমঙ্গলের চিন্তা ও ভয় হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দপূর্ণ হয়।

কাজ ও খেলার মধ্যে যে পার্থক্য, নৈতিক মূল্য ও সৌন্দর্য্যমূলক মূল্যের মধ্যেও সেই পার্থক্য। যে সক্রিয়তার কোনও সাংসারিক প্রয়োজন নাই, তাহাকে আমরা খেলা বলিতে পারি। জীবনের প্রয়োজনে যে তৈজস (energy) প্রযুক্ত হয় নাই, দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রেরণার ফলে সেই "তৈজসের" মুক্তিকে খেলা বলা যায়। জীবনের প্রয়োজনে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাজ। এই অর্থে খেলার কোনও মূল্য নাই, ইহা শিশুদিগেরই উপযুক্ত, যুবকের এবং বৃদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে যাহা লাগে না, এরূপ যাবতীয় ব্যাপার যদি বর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে সভ্যতার অনেক মূল্যবান বস্তুই বর্জ্জন করিতে হয়। অভিব্যক্তির গতি হয়তো সেই দিকেই—যাহা জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহারা বর্জ্জনের অভিমুখে, কিন্তু মানুষের সুখ ও সভ্যতা বহুল পরিমাণে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের উপরেই নির্ভর করে। মানুষের বৃত্তিদিগের (faculties) স্বতস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার মধ্যে মানুষ আপনাকে এবং তাহার সুখকে প্রাপ্ত হয়। যখন তাহার সমস্ত শক্তি দুঃখনিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে প্রতিহত করিতে নিযুক্ত হয়, মানুষ তখন দাসের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সৌন্দর্য্যানুভূতির কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহা মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সৌন্দর্য্যের উপাদান

সৌন্দর্য্যের স্বরূপের আলোচনা করিয়া সান্তায়না—সৌন্দর্য্যের উপাদান এবং তাহার রূপ (form) এবং সর্ব্বশেষে তাহার প্রকাশের (Expression) আলোচনা করিয়াছেন। সংবিদের বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সৌন্দর্য্যের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। যখন আমাদের বহির্মুখী বুদ্ধির ক্রিয়ার সহিত সংবিদের কোনও অংশ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়, তখন তাহা হইতে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। "আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বদাই বাহ্যজগৎরূপ যে জাল বয়ন করিতেছে, সুখের স্বর্ণসূত্র যখন সেই জালের মধ্যে প্রবেশ করে," তখন বাহ্যজগৎ আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয়ের সুখ এবং কল্পনা ও স্মৃতির সুখ অতি সহজেই বাহ্য বিষয়রূপে প্রতীত হয়, এবং তাহার প্রত্যয়ের সহিত মিশিয়া যায়। সংবেদন ও মনের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা—ইহারাই কেবল সংবিদের উপাদান নহে। দেহের অভ্যন্তরস্থ রক্তসঞ্চালন, পেশীর পুষ্টি ও ধ্বংস প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারাও সংবিদ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমস্ত দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে গোলমাল ঘটিলে সংবিদের অবস্থান্তরও সময় সময় কষ্টের উৎপত্তি হয়। আমাদের মনের অবস্থা, অনুভূতির তেজ, মনসংযোগের ক্ষমতা, কল্পনার বিলাস প্রভৃতি এই সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। স্বাস্থ্যের উপর সুখ নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য নির্ভর করে উপরোক্ত দৈহিক ক্রিয়াদিগের উপর। যৌন-প্রবৃত্তি (Sexual instinct) ও সন্তান-উৎপাদনের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। দাম্পত্য প্রেম, অপত্য-বাৎসল্য, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তিও সংবিদের উপাদানের অন্তর্গত এবং সৌন্দর্য্যের উপাদান এই সমস্ত হইতেই সংগৃহীত হয়।

সৌন্দর্য্যের অনুভূতির জন্য বাহ্য বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজন। বাহ্য বস্তুর প্রতীতির সঙ্গেই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয়। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। বস্তুর রূপের (form) সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সৌন্দর্য্য বলিতে সাধারণতঃ দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যই বোঝায়। কিন্তু রূপের জ্ঞানের পূর্ব্বেই বর্ণের প্রভাব উপলব্ধ হয়। বর্ণের জ্ঞান ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান। কিন্তু রূপের প্রভাব কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ সৃজন-শীল কল্পনার সৃষ্টি। বর্ণের প্রভাব সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জাত। বাহ্য বস্তুর জ্ঞানের সহিত জড়িত বলিয়া বর্ণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আবদ্ধ।

শব্দের (ধ্বনির) সহিত "দেশে" ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। এই জন্য শ্রুতি-সুখ বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বস্তুর গুণরূপে পরিগণিত হয় না—যেমন দর্শন-সুখ হয়। তাহা হইলেও ধ্বনির মধ্যেও গ্রামের (pitch) ভেদ আছে, এবং সুরের "দৈর্ঘ্য"ও আছে। এই জন্য ধ্বনিও একপ্রকার বাহ্য-বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে সক্ষম। সোপেনহুর বলিয়াছিলেন—সুরের মধ্যে সমগ্র ইন্দ্রিয়-জগৎ পুন প্রকাশিত হয় এবং জগতের তলদেশে যে ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাহার প্রকাশের জন্য "সুর" অন্যতর প্রণালী। সুরের জগতে অসংখ্য বৈচিত্র্য সম্ভবপর। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যথেষ্ট-পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে, ইহা দ্বারাও আমাদের ভাবাবেগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় হইতে যে সংবেদনের উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের বিষয় বাহ্যবস্তু গঠিত হয়। এই সংবেদন হইতে যে সুখের উদ্ভব হয়—তাহা সেই সংবেদনজাত প্রত্যয়ের সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপেই সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যয় সংবিদের একটা অংশমাত্র। সমগ্র সংবিদের এক একটি অংশ এই সকল প্রত্যয় দ্বারা চিহ্নিত হয়; কিন্তু প্রত্যয়দিগের তলদেশে একটি জৈব অনুভূতি (vital feeling) ও বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যয়দিগের সঙ্গে যে সকল সুখের উদ্ভব হয়, তাহারা দৃষ্টি-সুখ, শ্রুতি-সুখ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নামে বিশেষিত হইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে এক জৈব সুখের (vital pleasure) অন্তর্গত। প্রত্যয়সকল যেমন বিভিন্ন বস্তুর উপাদান-রূপে পরিগণিত হয়, তাহাদের অনুসঙ্গী সুখও তেমনি সৌন্দর্য্যের উপাদান বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু জগতের সৌন্দর্য্য কেবল এই ইন্দ্রিয়-সুখ নহে। বস্তুর উপাদানের সংবেদন হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাদের বিন্যাস হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিন্যাস হইতে—রূপ (form) হইতে—যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহার জন্য উপাদানের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। রূপের প্রভাব উপাদানের সৌন্দর্য্যদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পার্থিনন (parthenon) যদি মার্বলনির্ম্মিত না হইত, রাজমুকুট যদি স্বর্ণে নির্ম্মিত না হইত, নক্ষত্রমণ্ডলীর উপাদান যদি অগ্নি না হইত, তাহা হইলে তাহাদের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হইত। রূপের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে উপাদান মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্যকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

স্বতস্ফূর্ত্ত রুচি প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতেই উদ্ভূত হয়। অসভ্যগণ ও ও শিশুগণ উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যযুক্ত বর্ণ ভালবাসে। আদিম জাতির সঙ্গীতে ছন্দের অতিরিক্ত কিছু নাই। ইহা হইতেই রুচির আরম্ভ। যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আছে, তাহার মধ্যে ঐতিহ্যমূলক রূপ (traditional form) সৃষ্ট হয় এবং পুরুষানুক্রমে একই ভাবে জীবনের সুখ দুঃখ প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কপটতা নাই। কিন্তু যখন কপটতা আসে, আপনাকে 'জাহির' করিবার ইচ্ছা (Snobbishness) আসে, তখন রুচি বিকৃত হয়। কাঁচের মালা যাহারা পরিধান করে, তাহারা অসভ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারা তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য বলিয়াই তাহা ভালবাসা নিকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক। ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ সৌন্দর্য্যের (Sensuous beauty) উপভোগে অক্ষমতা তণ্ডামি। প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টদিগের চিত্রে ভিন্ন যাহারা সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, তাঁহাদের প্রকৃত রুচি নাই, তাহারা তোতাপাখীর মতো অন্যের কথার আবৃত্তি করে; প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ তাহাদের নাই। যাহারা উচ্চতর সৌন্দর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইলেও, নিম্নতর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাহাদের রুচির বিকাশ সম্বন্ধে আশা পোষণ করিতে পারা যায়।

সৌন্দর্য্যের রূপ

সৌন্দর্য্যের রূপ-সম্বন্ধে আলোচনায় সান্তায়না সুষমাকে (Symmetry) তাহার প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন। বহুর মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, এক

জর্জ সান্তায়না

প্রকার একত্বই সুষমা। সমগ্রের মধ্যে সদৃশ অংশের ছান্দিক পুনরাবৃত্তি (rhythmic repetition of Similars) ইহার প্রধান লক্ষণ। নক্ষত্রখচিত আকাশে নক্ষত্রগুলি সুন্দর দেখায় কেন? নক্ষত্রগণ ক্ষুদ্র দেখাইলেও বস্তুতঃ তাহারা আয়তনে বিরাট এবং বহুদূরে অবস্থিত। এই জ্ঞান হইতে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি উৎপন্ন হয়—ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর স্থান নগণ্য, এই চিন্তায় যেমন বিরাটের একপ্রকার ধারণার উদ্ভব হয়, তেমনি

প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য নক্ষত্রের এক রূপত্বই (uniformity) সৌন্দর্য্যের অনুভূতির কারণ।

প্রাকৃতিক বস্তু এবং কারু সৃষ্টি দ্বারাই যে কেবল সৌন্দর্য্যের অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। আমাদের মনের প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক ভাবাবেগের সহিত সুখ অথবা দুঃখের সম্বন্ধ আছে। মনে কোনও প্রত্যয়ের উদ্ভব হইলে, তাহার অনুসঙ্গী সুখ তাহার সহিত মিশিয়া যায়, এবং সেই প্রত্যয়ের বিষয় সৌন্দর্য্যের রাগে রঞ্জিত হয়। এই প্রসঙ্গে সান্তায়না গণতন্ত্রের (democracy) সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছেন। মানুষের কল্পনার উপর গণতন্ত্রের প্রত্যয়ের যে প্রভাব, তাহা একরূপত্ব-(multiplicity in uniformity) প্রাপ্ত বস্তুর প্রভাবেরই একটা দৃষ্টান্ত। ফরাসী বিপ্লবের মূলে যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার কোনও প্রভাব ছিল, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ হইতে যে ফরাসী বিপ্লবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলিতে পারা যায় না। অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা হইতেই বিপ্লব উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা সত্য। কিন্তু সুখের উপায় এবং সু-শাসনের যন্ত্র হিসাবেই যদিও গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের অনুরাগ প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের আত্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র নিজের জন্যই কাম্য বলিয়া গৃহীত হইতেছিল, তাহার ফল-নিরপেক্ষ মূল্য স্বীকৃত হইতেছিল। প্রথমে যাহা জনগণের উপকারী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। একরূপত্বের প্রতি অনুরাগ সাধারণতঃ সুনীতির ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। ইহাকে সু-বিচারের প্রতি অনুরাগ বলা হয়। কিন্তু সুবিচারের নিজেরই মূল্য আছে, সে মূল্য সৌন্দর্য্যমূলক।

সৌন্দর্য্যের প্রকাশ

সংবেদনগণ সংহত অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়। এই সকল সংহত সংবেদনের একটি যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন অন্যগুলির স্মৃতি মনে উদিত হয়। এই স্মৃত সংবেদনের সহিত যদি সুখ অথবা দুঃখের অনুভূতি জড়িত থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ সংবেদনের সহিত সেই সুখ বা দুঃখ সংযুক্ত হয়। এইরূপে সংবেদনের সংহতির মাধ্যমে কোনও বস্তু সুখ অথবা দুঃখ উৎপাদক যে গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই "প্রকাশ" (Expression) বলে। সৌন্দর্য্যের রূপ এবং উপাদানের বেলায় শুধু একটি বস্তু ও তাহার ভাবাবেগ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান; কিন্তু "প্রকাশে"র বেলায় প্রত্যক্ষ বস্তু ও তাহার সহিত সংহত দ্বিতীয় বস্তু—এই দুইটি থাকে। প্রত্যক্ষ বস্তুটি নিজে সুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে যে দ্বিতীয় বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাই তাহাকে সুন্দর করে। 'প্রকাশ'কে সকল সময় উপাদান অথবা রূপ হইতে পৃথক করা যায় না। কেননা প্রত্যক্ষের সহিত সংহত বস্তুর স্মৃতি সকল সময় স্পষ্ট থাকে না। যখন স্মৃতি স্পষ্ট থাকে, তখন আমাদের ভাবাবেগ স্মৃত বস্তুতেই আরোপ করি, প্রত্যক্ষ বস্তুতে নহে। যে বাগানে কোনও প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন বেড়াইয়াছি, বহুদিন পরে তাহার দর্শনে প্রিয় বন্ধুর স্মৃতি-জনিত যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তখন সে আনন্দ বন্ধুর স্মৃতিতেই আরোপিত হয়। যখন কোনও প্রিয় জনের কোনও স্মৃতিচিহ্ন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই চিহ্ন প্রিয়জনের স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়া মূল্যবান বিবেচিত হইলেও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় না। এক্ষেত্রেও সমস্ত মূল্য স্মৃতিকেই অর্পিত হয়। সুতরাং উপাদান ও রূপের সৌন্দর্য্য তাহাদের নিজের, কিন্তু প্রকাশ সৌন্দর্য্য স্মৃতি হইতে ধার-করা বলা যায়। প্রকাশের সহিত চিন্তা ও কল্পনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত যে চিন্তা সংহত, তাহা হইতেই সুখের উৎপত্তি হয় এবং সেই সুখই প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সুন্দর করে। দ্রষ্টার বুদ্ধির বৃদ্ধির সহিত প্রত্যেক বস্তুর প্রকাশ-ক্ষমতা (Expressiveness) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ বস্তু দ্বারা স্মৃতি উদ্বোধিত হইলেই সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয় না, সে স্মৃতি হইতে সুখের উদ্ভব হইলেও হয় না, যদি সেই সুখ প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত মিশিয়া তাহার সহিত এক না হইয়া যায়। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত হইতে যে আনন্দের উৎপত্তি হয়, সেই আনন্দ ঐ সঙ্গীতের শব্দাবলীর সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া—সেই শব্দাবলী শ্রুতি-সুখকর বলিয়াই—উক্ত সঙ্গীত সুন্দর। প্রকাশের যে সৌন্দর্য্য তাহা সৌন্দর্য্যের উপাদান এবং রূপের মতোই প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যগত। সুতরাং অভিজ্ঞতার ফলে যখন কোনও মানসিক প্রতিবিম্ব হইতে তাহার সহিত সংহত অন্য মানসিক প্রতিবিম্বের উদ্ভব হয়, তখন প্রথমোক্ত প্রতিবিম্বের দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব-উদ্ভাবনের ক্ষমতাই "প্রকাশ-শক্তি" (Expressiveness) এবং দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব হইতে উদ্ভূত সুখ যখন প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন এই প্রকাশশক্তি সৌন্দর্য্যের মূল্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাই তখন প্রকাশে পরিণত হয়।

প্রত্যক্ষ বস্তু ও তাহার সহিত সংহত প্রত্যয়ের "মূল্য" না থাকিলেও সুখের উদ্ভব হইতে পারে। সেখানে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে সুখের উৎপত্তি হয়। কোনও হেঁয়ালি সমাধান হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহা এই প্রকারের। কিন্তু এই সুখের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ নাই। গণিতের অঙ্কের সমাধান হইতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও এই শ্রেণীর।

সান্তায়না "প্রকাশের" নানা রূপের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থান নাই।

(ক্রমশঃ)

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভগবতী সারারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন, রাত্রি জাগরণে শরীর ক্লান্ত—তিনি গোমস্তাকে কহিলেন—চালের গোলা খুলে আজ সকলের দুবেলার মত চাল আর নুন দিয়ে দাও—

গোলার দ্বার উন্মুক্ত হইল—সব গৃহস্থই সেদিনের মত চাউল লইয়া চলিয়া গেল।

বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে ভগবতী সকাল সকাল খাইয়া শুইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না—বিপদ চারিপাশ হইতে ঘনাইয়া আসিয়াছে। কেমন করিয়া তিনি আজ এই দুর্য্যোগে তাহার গ্রামকে রক্ষা করিবেন। চিন্তা করিতে করিতে মনের মাঝে একটা ভয়াবহ নৈরাশ্য বোধ করিতেছিলেন। একবার ভাবেন—ওদের দেওয়া ধান, অর্থ ও শ্রমেই তাঁহার জমিদারী—না হয় তাহাদের কল্যাণেই যাইবে কিন্তু সকলের জন্যে তাহাত পর্য্যাপ্ত নয়। তিনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজিত হইয়া গোমস্তাকে ডাকিলেন এবং চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া কহিলেন—ঠাকুর মশায়কে ডেকে আন্ শিগ্ গির—

মতিঠাকুর মহাশয় তাহার পুরোহিত, শুভাকাঙ্ক্ষী, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে তাহার উপদেশ একান্তই প্রয়োজন—ভগবতী উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন—

মতিঠাকুর অনতিবিলম্বেই আসিয়া পড়িলেন। ভগবতী কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া অত্যন্ত বিপন্নের মত প্রশ্ন করিলেন—কি করি, ঠাকুর মশায়—চারি পাশে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে—

মতিঠাকুর সহাস্য মুখে কহিলেন—শাস্ত্রের প্রথম উপদেশ—বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। তুমি অধীর হ'য়ো না—

—কিন্তু একটা কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে হবে ত?

—হাঁ৷ শাস্ত্রে কর্ত্তব্যেরও নির্দ্দেশ আছে। রাজার জীবন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। রাজভাণ্ডারের ধন প্রজার জন্য। রামচন্দ্র প্রজাদের জন্য সতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, সেই ধর্ম্ম—তোমার অর্থবিত্ত প্রজাদের জন্য। প্রজা না বাঁচলে রাজার রাজত্ব থাকে না—কাজেই রাজারা পুণ্য কার্য্য করলে তাতে দেশের প্রজা বাঁচতো। শাস্ত্রকার বলেছেন—ব্রতপ্রতিষ্ঠা, উৎসব, ভোজন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য, কারণ তদ্দ্বারা দরিদ্র প্রতিপালিত হয়—

ভগবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। মতিঠাকুর কহিলেন—আমারও নিদ্রা হয় নি। তোমার মায়ের একটা দীঘি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা হয় নি—আমার ইচ্ছা তোমার মায়ের নামে তুমি বসন্ত সায়র আরম্ভ কর। আর গৃহহীন তোমার সমস্ত প্রজা তা'তে কাজ করুক! তোমার মায়ের দীঘি খনন করতে করতে ওরা জীবিকা অর্জ্জন করুক। তারপরেই আষাঢ়ে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধান দাদন নিয়ে ওরা চাষ করুক। আর সমস্ত প্রজাকে বল, যাতে তারা উদ্বৃত্ত খড় ও বাঁশ দিয়ে ওদের সাহায্য করে। তাহ'লে হয়ত এ বিপদ কেটে যেতে পারে—

ভগবতী কহিলেন—হাঁ৷ ঠিক তাই। যে কাজ করবে সে দেড় সের করে চাল পাবে। ঠিক হ'য়েছে। আপনি দিন দেখুন—এমনি না করলে ওরা কাজই বা পাবে কোথায়? আর বেঁচে থাক্‌বেই বা কি ক'রে—

—দিন আমি দেখেছি। পরশু প্রভাতের পরে প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে খনন কার্য্য আরম্ভ করতে হবে। শুভ দিন—তোমার মায়ের নামে, ওই পাড়ারই পূবে ডাঙ্গার নীচে একটা বিরাট জলাশয় কর—যাতে ভবিষ্যতে আগুন লাগলে জলাভাব না হয়।

ভগবতী মতিঠাকুরের কথায় অনেকটা যেন আশ্বস্ত হইলেন—একসঙ্গে পুণ্যকার্য্য ও প্রজাপালন হইবে, মায়ের শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হইবে।

বসন্তসায়রের খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মতিঠাকুর মশায় প্রভাতে আসিয়া পূজার্চ্চনা ও মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

ভরতের গৃহও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল,—পোড়া দেওয়ালের উপর, বাঁশের পাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়া কোনমতে একটা আচ্ছাদন দিয়াছে! ছেলেটা গরু চরাইয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখে। আদুরী ও ভরত যায় মাটি কাটিতে। প্রভাতে যায়—দুপুরে আসিয়া রাঁধিয়া খায়—আবার সূর্য্যাস্তে আসে, সারাদিনের খাটুনির পর বাহিরে খুঁজুরের পাটি পাতিয়া শুইয়া ঘুমায়—আবার সূর্য্যোদয়ে কাজ আরম্ভ করে। ভরত কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দেয়—আদুরী ঝুড়ি বহন করিয়া পাড়ে ফেলিয়া আসে—এমনি করিয়া দুই শতাধিক নারী পুরুষ নিত্য নিয়মিত কাজ করে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে কাজ চলিতেছিল। আদুরী কয়েক বোঝা মাটি বহিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ভাবে বসিয়া পড়িল। আদুরী কহিল—আর পারবেক নাই—তেষ্টা পেয়েছে' বটেক—

তেষ্টা পেয়েছে ; তা জল খা কেনে—

—কোথা জল—গায়ে যাবেক জল খেতে—

ভরত হাসিয়া কহিল—মোরা জল খাবেক, তাই ত কর্ত্তা সায়র কাটছে আদুরী। বসন্তসায়রে কত জল হবে, মোরা খাবেক, হাঁস পুষবেক—

আদুরী কহিল—হু, জল খাবেক, হাঁস পুষবেক—

ভরত কহিল—তবে, কর্ত্তাই বুঝি সব জল খাবেক ওপাড়া থেকে এসে—তু কি রে! কিছু বুঝতে নারলি? মাটি কেটে চালও আমরাই লেবেক, জলও আমরাই খাবেক, মাছও আমরাই লেবেক—

নীলমণি ও তাহার স্ত্রী ভরতের কাছেই কাজ করিতেছিল। তাহাদের কোদালে একখানা বৃহৎপাথর বাধিয়াছে—তাহারা ডাকিল—ভরত, আদুরী—এদিকে আয়। পাথর লাগলেক বটে—

—পাথর কোথা?

—হেথা—

—গাইতি চালা—

—তু আয়, বড় পাথর—মোরা লারবেক—

ভরত ও নীলমণি দুইজনে পাথরখানাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন নীলমণির স্ত্রী কহিল—নীলকুঠির সাহেবের গাড়ী মারলেক—বলন্থ কিছু পুঁতে রাখ, তা সব সেলামী দিলে কর্ত্তাকে—আজ মু মাটি বইতে নারবেক—

নীলমণি মুখ খিঁচাইয়া উঠিল—শালী—দেবেক না? দেবেক না ত কি? সেলামীর পোঁতা টাকায় ত বসন্ত সায়র হইছে শালী—টাকা ত ফেরৎ লিচ্ছিস্ রোজ—কর্ত্তার খাচ্ছিস্—সেলামী না পেলে কোথায় যেতিস্? মেলায় যেয়ে রোজগার কর্‌তিস্ শালী?

—তু মেলায় যা না কেনে—তোর বোনকে—

—বটে। নীলমণি কোদাল উদ্যত করিয়া আসিল। ভরত নীলমণিকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—তু বুঝিস্ না মাসি! মোদের টাকা ত কর্ত্তার কাছে গচ্ছিত ছিল—মাটি কেটে এখুন লিয়ে লেবে তু—বুঝলি? দিঘির জল তু খাবি, তোর বেটা খাবে। কর্ত্তা ত খাবেক নাই মাসি। যা ধর ঝুড়ি ধর—পাথর তুল তু—আদুরী আয় পাথর দুজনে লিবি—আয় তু—

নীলমণির স্ত্রী কথাটা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবে উঠিয়া আসিল এবং আদুরী ওই বৃহৎ পাথর খানা মাথায় তুলিয়া সুউচ্চ পাগাড়ে উঠিতে লাগিল।

ভগবতীর মাতা বসন্তকুমারীর নাম অনুসারে নূতন পুকুরের নাম করণ হইয়াছে বসন্ত সায়র—

জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি সায়রের কার্য্য শেষ হইয়াছে, ঝর্ণার জলে খনন কার্য্যের সময়ই একহাঁটু জল হইয়াছিল—দীঘি উৎসর্গ হইবে, দিনস্থির হইয়া গিয়াছে, সেদিন সমস্ত কর্ম্মী ভগবতীর বাড়ীতে খাইবে। সেজন্যে ভগবতীর বাড়ীতে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

যেদিন সায়র উৎসর্গ হইবে তাহার পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রবল কালবৈশাখী আরম্ভ হইল—দুরন্ত ঝড় সেই সঙ্গে বৃষ্টি। ডাঙ্গার উপর হইতে হাঁটু সমান জল গড়াইয়া পুকুরে নামিতে লাগিল। ভগবতী দ্বিতলের ঘর হইতে দেখিলেন শালবনকে দোলাইয়া, শুষ্ক তালপত্রকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে প্রবল বায়ু—একবার শঙ্কা হইল—হয়ত যাহাদের ঘর আগুনে পুড়িয়াছিল তাহাদেরই ঘর আবার উড়িয়া যাইবে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কম—ঐ পাড়ার উত্তর পশ্চিমে ডাঙ্গার উপর শালবন, ঝড় সেরূপ জোরে লাগেনা—

পরদিন সকালে ভগবতী বাহির হইলেন—ছোটলোকের পাড়া দেখিয়া সায়র দেখিয়া আসিবেন এবং যেখানে পূজা

ও যাগযজ্ঞ হইবে সেস্থান পরিষ্কার করাইয়া একটা চালা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। ভগবতী যাহাকে পাইলেন তাহাকেই বলিলেন—এবার নাঙ্গল-জোয়াল সব ঠিক করে নে। সময়ে বৃষ্টি হ'য়েছে, ভাল করে চাষ কর, দুঃখ দূর হয়ে যাবে—

যাহাদের নাঙ্গল জোয়াল পুড়িয়া গিয়াছিল তাহারা ছুতার মিস্ত্রির নিকট তাহা বাকী পাইয়াছে। পৌষমাসে ধান দিয়া শোধ ক রতে হইবে। ভগবতী আসিয়া সায়রের কুলে দাঁড়াইলেন—জল থৈ থৈ করিতেছে, সুন্দর জল, এক গলা জল হইয়াছে পুকুরে। কতকগুলি দিগম্বর বালক জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ণকুম্ভকক্ষে বাউরী বাগ্দী পাড়ার ঝি বৌরা ফিরিতেছে—

তাহাকে দেখিয়া সকলে সমীহ সহকারে পথের ধারে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ভগবতী চিনিলেন আদুরীকে—প্রশ্ন করিলেন—কিরে আদুরী, কি রকম দীঘিটা হ'ল—জল ভাল হ'য়েছে ত? আজই উৎসর্গ হবে—কাল থেকে জল খাওয়া চল্‌বে—

আদুরী কলসী নামাইয়া কহিল—আপনার দয়া কর্ত্তা, —আপনারই ত খাবেক—আপনি ত মা বাপ—

—তোরাই ত পুকুর খুঁড়েছিল্‌, তোরাই জল খাবি। আমি ত নিমিত্ত মাত্র। যা হোক্‌—পুকুরে কাপড় কেচে, গরু নাইয়ে জল নোংরা করিস্‌ নি—

সকলেই সমবেতভাবে কহিল—না হুজুর—আপনার হুকুম হলে কেউ জলে নাম্‌বে না—

—হ্যাঁ, ভাল করে চাষ আবাদ করবি—ঘরগুলো সব ত আবার করতে হবে?

তাহারা চলিয়া গেল। ভগবতী পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেছিলেন। চমৎকার পুকুর হইয়াছে পশ্চিম পাড়ে যে পাথর উঠিয়াছে তাহাতে সেদিকটা প্রায় পাকা ঘাট হইয়া গিয়াছে। ভগবতী হিসাব করিলেন—পাড়ে তালগাছ দিতে হইবে অন্ততঃ হাজার দেড়, আর জেলেদের পাঠাইয়া মাছের চারা আনিতে হইবে। ভাদ্রের বর্ষায় যখন খাদ্যের অভাব হইবে তখন তাল খাইয়া বহুলোক বাঁচিতে পারিবে—

মতিঠাকুর মশায় আসিয়া কহিলেন—শিগগির জোগাড় কর ভগবতী, এর পরে আবার কাল-বেলা পড়ে যাবে—

—এই ত ওরা এসে গেছে। কয়েকজন বাগ্দী কোদাল লইয়া আসিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। দ্বিপ্রহরের পরে পূজাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল এবং তাহার পরে সমস্ত মজুর কর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ ভগবতীর বাড়ীতে পেট ভরিয়া ভাত ডাল তরকারী খাইয়া ভগবতীর গুণগান করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিল।

বর্ষা আসিয়াছে—

চাষ-আবাদ চলিতেছে দ্রুত। বাগদী ডোম কুর্ম্মী প্রজারা দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আদুরী ও ভরত তাহাদের নূতন গৃহকে সুন্দরতর করিতে চাষের কাজে মন দিয়াছে। ভরত চাষ করিয়া ফিরে—আদুরী তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়, আদুরী মাঝে মাঝে গান করে, ভরত শুনিতে শুনিতে বাহবা দেয়—

সেদিন কুলুরা হঠাৎ আসিয়া জানাইল, তাহাদের যে পাঁচ বিঘা জমি আছে তাহা তাহারা নিজেরাই চাষ করিবে। ভরতকে আর ভাগ চাষ করিতে হইবে না—

ভরতের মাথায় আকাশ ভা ঙ্গয়া পড়িল, সে মাত্র বার বিঘা জমি চাষ করে, তাহাতে তাহার সংসার একরূপ চলে—পাঁচ বিঘা চলিয়া গেলে—সে কি খাইবে? এবং কি দিয়াই বা সে নূতন ঘর বাঁধিবে। ভরত বিমূঢ় হইয়া পড়িল—

ভরত একদিন ধরিয়া ভাবিল কিন্তু কোনই সমাধান করিতে পারিল না; অবশেষে দীনের শরণ ও পরমহিতৈষী ভগবতীর কাছে গিয়া তাহার আবেদন জানাইল—

ভগবতী কাছারীতে বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এবং মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিলেন যে শান্ত সুন্দর গ্রামে তাহার ভাঙ্গন ধরিয়াছে। দূরাগত একটা জলপ্লাবন ধীরে ধীরে নগর প্রাচীরের তলায় খনন কার্য্য করিতেছে এবং এ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে তাহার জীবদ্দশায় তিনি যদি তাহাকে কোন মতে বাঁচাইতে পারেন এই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—

তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ভরত, তোমরা লণ্ঠন কিনেছ, কেরোসিন তেল জ্বালছ—কুলুদের রেড়ির তেলের ঘানি বন্ধ হ'য়ে গেছে। ছুটো গরু বসে আছে—তারাই বা কি করবে? জমি চাষ না ক'রলে খাবে কি?

ভরত অসহায়ের মত কহিল—আমি কি করবো হুজুর। ৭ বিঘ্রা জমি ভাগচাষ, তিনটা পেট, খাবেক কি? তেল নুন কিনবেক কেমনে? ঘর বাঁধবেক কি দিয়ে—

ভগবতী নির্ব্বাক হইলেন, এ প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দিতে পারেন—অসহায় গৃহহীন ভরত তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—হিজলবনের নীচে পশ্চিমে পতিত আছে, সেখানে দু বিঘে জমি তুলে দে। তিন বছর খাজনা দিতে হবে না—

ভরত কহিল—এখন পতিত তুললে পুতবো কবে?

ভগবতী কহিল—তুই মরদ, যা কামিনটাকে নিয়ে আজ থেকে লেগে যা। ভাল না উঠুক—যা হবে তাতেই দু আড়ি ধান ত হবে—যা গাঁইতি চালা—সরকার যেয়ে মেপে দেবে—

আসন্ন বিপদের সমূহ সমাধান না হউক, অন্তত আংশিক সমাধান ত হইয়াছে। ভরত কতকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া আসিল।

ভগবতী কি যেন ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিলেন। খানিক পরে সরকারকে কহিলেন—হাঁ, তার পরে—

আষাঢ়ের বর্ষণে ভরত জমি চাষ করে, উত্তপ্ত উষ্ণ দিবসে ভরত আর আদুরী যায় হিজলবনের ধারে পতিত উঠাইতে। ভরত তাহার বলবান দেহ লইয়া গাঁইতি চালায়, শক্ত করিয়া গাঁইতির বাট ধরিয়া 'হাঁই' করিয়া বন্ধ্যা মৃত্তিকার বুকে আঘাত করে—মাটি পাথর ভাঙ্গিয়া ছিন্নভিন্ন হয়—আদুরী পিছনে পিছনে পাথর ও নুড়ি কুড়াইয়া ঝুড়ি বোঝাই করে, ভরত ঘর্ম্মাক্ত দেহটাকে ঋজু করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দুজনে হাতে-হাতে পাথরের ঝুড়ি আদুরীর মাথায় তুলিয়া দেয়—আদুরী আইলের উপর রাখিয়া বাঁধ দেয়।

দ্বিপ্রহরে দুজনে ক্লান্ত দেহে পাথরের স্তূপের উপর বসিয়া নুন মুড়ি লঙ্কা খায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভরত গাঁইতি কাঁধে ফেলিয়া গান ধরে, আদুরী ঝুড়ি কোদাল মাথায় করিয়া পিছন পিছন আসে, গানের ধুয়া টানিতে টানিতে—তাহার পর রাত্রে ভাত রাঁধিয়া খায়—গরু দুইটিকে জাব মাখিয়া দিয়া অঘোরে ঘুমায়—

বন্ধ্যা মৃত্তিকা ধীরে ধীরে তাহার উবর আবরণ উন্মোচিত করিয়া স্বর্ণপ্রসূ হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তার পরে ভাদ্রের প্রথমে এক বর্ষণে তাহার উপরে জল জমে, ভরত জমি চাষ দিয়া গরু দুইটিকে হিজল বনে ছাড়িয়া দেয়—সে আনিয়া দেয় ধানের চারা, আদুরী উবু হইয়া পুঁতিয়া দেয় শ্রেণীবদ্ধভাবে। কৃশ বিবর্ণ গাছগুলি দেখিতে দেখিতে সবুজ হইয়া উঠে—ভরত ও আদুরী আইলের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখে, স্মিতহাস্যে বলে—ফলবেক, আদুরী ফলবেক—দশ বারো খলি ফলবেক—

আদুরী বলে—দাঁড়া দেখি থোড়াবেক ত?

কিন্তু ভরত যে ধান দাদন লইয়াছে তাহা যদি পরিশোধ করিতে হয়, তবে বৎসরের ধান থাকিবে না। মনিব তাহাদের জন্য বহু দিয়াছেন, দাদনের ধান অবশ্যই দিতে হইবে—তাহা দিলে যদিও চাউলের ধান থাকে, মুড়ি চিড়ার ধান থাকে না। ভরত তাহার সংসার জীবনে আর একবার চিন্তিত হইয়া উঠিল।

আশ্বিনের মাঝামাঝি। ধান রোপণ নিড়ানো সব হইয়া গিয়াছে—এখন কেবল বসিয়া খাওয়া। ভরত একদিন আদুরীকে কহিল—চল্ আদুরী, বসে বসে দাদনের ধান খাবেক কেনে! চল, খাদে কাজ করি—উ খয়রাসোলের বাউরীরা যায়—কত টাকা কামিয়ে আনে—টাকা লিয়ে খাবেক, অঘ্রাণে ফিরে ধান কাটবেক, ঘর বাঁধবেক—

কয়েক দিন ধরিয়া সলাপরামর্শ চলিল, কি করা যায়! ছেলেটাই বা কোথায় থাকে, গরুকটাই বা কে দেখিবে। ভরত আদুরীর বাবার সহিত পরামর্শ করিল—অবশেষে একদিন স্থির হইল—ভরতের ছেলে সেখানেই থাকিয়া উভয়ের গরু চরাইবে এবং গোবর কুড়াইবে। আর দুই মাস পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার ছেলে ঘরে আসিবে। গরু চরাইবার পরিবর্ত্তে ছেলেটা খাইতে পাইবে। এমনি করিয়া কেবলমাত্র দুই মাস সে থাকিবে।

তাহার পর একদিন প্রত্যুষে আদুরী ও ভরত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া রওনা দিল ভাদুলিয়া কলিয়ারীতে—গোপালপুর হইতে ৭ ক্রোশ পথ। সঙ্গে দুজনে তাই সেরখানেক মুড়ি লইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান—

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দিল্লীতে একটি ইংরেজী অধ্যাপক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ছয় বৎসর ইংরেজী শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হউক বা না হউক, ভারতের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজী শিক্ষা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়াই তাঁহারা মত দিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীর স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট করার সঙ্গে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কি হইবে সে প্রশ্নও সম্মেলনের সম্মুখে উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। অথবা ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দি বা কোনো আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবকেও অনুমোদন করেন নাই। মাত্র বলিয়াছেন—শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে যেন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমবেতভাবেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বলিলেও এক্ষেত্রে সম্মেলন পরোক্ষভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজীকেই সমর্থন করিয়াছেন।

শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তিত করিতে হইলে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এক যোগেই তাহা করিতে হইবে এবং তাহাই উচিত। নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম খণ্ডে খণ্ডে পরিবর্তিত হইলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংযোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপনা করিতে মুশকিলে পড়িবেন এবং ছেলেদের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কিছুকাল পূর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণও এইরূপ অভিমত জানাইয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। অকস্মাৎ শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তিত হইলে শিক্ষা-ব্যাপারে কিরূপ বিপদ দেখা দিতে পারে তাহাও তাঁহারা সেই সময় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কোনো কোনো রাজ্যের সরকার অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মাধ্যম যতদিন না পরিবর্তন করা সম্ভব হয় ততদিন বর্তমান ব্যবস্থা চালু রাখাই যুক্তিযুক্ত এবং ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম যদি কোনো দিন পরিবর্তিত হয় তাহা হইলেও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীর যথেষ্ট স্থান রাখিতে হইবে।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সি ভি রমণ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্যদানে বিশেষভাবেই ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন—রাশিয়াতে পর্যন্ত স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের দেশেও ইংরাজীকে উপেক্ষা করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না। বর্তমানে দেশের প্রায় সর্বত্রই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের উদ্যোগ চলিতেছে এবং সেই উদ্যোগ এক লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণের সিদ্ধান্ত ইঁহাদের কার্যে সহায় হইবে আশা করি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ইংরাজীকে মাধ্যমরূপে রাখা হয় তাহা হইলে গোড়া হইতে যেন ছাত্রগণকে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। নচেৎ কাঁচা ভিতে ইমারত টিকিবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাভেদে যেন ছাত্রগণকে বিপন্ন বোধ না করিতে হয়। শাসক ও শিক্ষক সকলেরই এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য এবং ইহা তাঁহাদের গুরুতর দায়িত্বও বটে।

প্রজা-পরিষদ আন্দোলন—

জম্মুর প্রজা-পরিষদের আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। আন্দোলন এখন আর শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, তাহা ধীরে ধীরে শহর অতিক্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রজা-পরিষদের দাবী—কাশ্মীর সম্পূর্ণভাবে ভারতে যোগ দিবে, কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পতাকা থাকিবে না এবং ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সম্পূর্ণ অধিকার কাশ্মীরে প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস এই আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা কমিটির শেষ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। সেই প্রস্তাবে কাশ্মীর প্রসঙ্গে আসিয়া সেখানকার সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সাম্প্রতিক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। এমন কি, যাঁহারা প্রজা-পরিষদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহাদেরও নিন্দা করিয়াছেন এবং

বলিয়াছেন—কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।

প্রজা-পরিষদের আন্দোলন সমর্থন করা ন্যায় কি অন্যায়, তাহা নির্ভর করে মাত্র একটি জিনিসের উপর। তাহা এই যে, প্রজা-পরিষদের দাবী ন্যায়সঙ্গত কিনা এবং তাহা সমর্থনযোগ্য কিনা। যদি তাহাদের দাবী ন্যায্য হয় ও কারণসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমর্থন করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, জম্মুর প্রজা-পরিষদের আন্দোলন সাম্প্রদায়িক। উহাকে মানিলে 'টুনেশন' থিওরী' মানিতে হয় এবং এই আন্দোলনের দ্বারা পাকিস্তানের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কাশ্মীর ভারতে যোগ দিলে পাকিস্তানের সুবিধাটা যে কী হইতে পারে তাহা বুঝিলাম না। শেখ আবদুল্লা ভারতভুক্তি যে চান না, তাহা তাঁহার কার্যকলাপ দর্শনেই বেশ বুঝা যায়। ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক এবং রাশিয়া উভয়ের সমর্থনও তিনি পাইতেছেন। কাশ্মীরে রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও তিব্বত এই পাঁচটি দেশের সীমান্ত আসিয়া মিলিয়াছে। ইংরাজ ও আমেরিকা সেখানে সৈন্য রাখিতে চায় এবং ইউ-এন-ওকে দিয়া তাহার ব্যবস্থাও প্রায় করিয়া আনিয়াছে। এদিকে মুসলমানেরা শেখ আবদুল্লার সমর্থক, জম্মুর হিন্দু ও লাডাখের বৌদ্ধরা উঁহার বিরোধী, জম্মু এবং লাডাখ উভয়েই বিনাসর্তে ভারতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। এই দুইটি প্রদেশ একটি মাত্র অ-মুসলমান অঞ্চলে পরিণত হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই সম্প্রতি জম্মু ও লাডাখের মধ্যবর্তী কয়েকটি জেলার পুনর্গঠন করা হইয়াছে। বড় হিন্দুপ্রধান জেলা ভাঙিয়া তার মধ্য হইতে ছোট মুসলমানপ্রধান জেলার সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং জম্মু ও লাডাখ যে অমুসলমান এলাকা নয় ইহাই প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। জম্মুতে বেপরোয়া মুসলমান উদ্বাস্তু বসাইয়া উহাকে মুসলমানপ্রধান করার চেষ্টাও চলিতেছে। অথচ ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর রক্ষা করিবে, ভারতীয় অর্থে কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট চলিবে, কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন থাকিবে—ভারতবর্ষকে মানিবে না, ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে মানিবে না! ইহাই শেখ আবদুল্লার অভিপ্রায়। আর ইহারই বিরুদ্ধে জম্মুর প্রজা-পরিষদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং আন্দোলন।

ভারতীয় মুসলমানেরা যে থিওরীর বলে একদা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, শেখ আবদুল্লাও যেন সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জম্মুর প্রজা-পরিষদ আন্দোলনকে কোনো মতেই অযৌক্তিক বলা চলে না, সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ইহার গুরুত্বকে অস্বীকার করাও যায় না এবং ইহা সর্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্যও বটে।

নেহরু-আবদুল্লা চুক্তিকে পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তাটুকু অন্তত কংগ্রেসের কার্যপরিচালনা কমিটির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেও দেশবাসী কিছুটা আশ্বস্ত হইতে পারিত।

চা-শ্রমিক—

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক চা-বাগান ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আরো কতকগুলি বাগান কাজ বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহার ফলে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক বেকার হইতে চলিয়াছে; অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চা-ব্যবসা এবং চা-বাগান পরিচালনা লইয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান সমস্যা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দামে চাউল সরবরাহ করা। চা-বাগানের মালিকগণ অনেকেই নির্দিষ্ট অল্পমূল্যে শ্রমিকদের চাল সরবরাহ করা তাঁহাদের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া জানাইয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু এই সম্পর্কে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারের নিকট পত্র লিখিয়া অবস্থা জানিতে চাহিয়াছেন। চা-শ্রমিকদের কমদামে চাল দিতেই হইবে ইহাই প্রধান মন্ত্রীর অভিমত। চা-বাগানের মালিকগণ যাহাতে তাহা করেন বা করিতে সক্ষম হন, তাহারই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার চা-শ্রমিকদের জন্য অল্পমূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে পারেন; তবে সেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্য কতো দাঁড়াইবে এবং মালিকগণই বা কতোটা বহন করিতে রাজি হইবেন তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টায় ব্যাপারটার আশু সমাধান হইলেই আমরা সুখী হইব।

আবার মস্কো বিচার—

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া, 'নূতন সভ্যতা ও বাণী'র বাহক বলিয়া প্রচারিত রাশিয়া! যাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার ক্ষীণতম সুযোগ পর্যন্ত নাই, সেই রাশিয়ার ভয়াবহ সত্যরূপ—নগ্ন বীভৎসরূপ অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো পৃথিবীর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছে। সে বিভীষণ মূর্তি সমগ্র সভ্যজগৎকে ভীত, সন্ত্রস্ত এবং বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদটি এই—গত ১৯৪৮ সালে রাশিয়ার দ্বিতীয় পুরুষ ষ্ট্যালিনের ভাবী উত্তরাধিকারী আঁদ্রে ঝাদনভের মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুকে আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে অকস্মাৎ কবর খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়—সোভিয়েট রাশিয়ার নয়জন বিশিষ্ট চিকিৎসককে সেই মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, চিকিৎসকগণ একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়া ঝাদনভের প্রকৃত রোগকে চাপিয়া এমন ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা ব্যতীত আরো কয়েকজন সর্বোচ্চ সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধেও এইরূপ ডাক্তারী-হত্যার পদ্ধতিটি তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নয়জন ডাক্তারই—তাহার মধ্যে পাঁচজন ইহুদী, স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সজ্ঞানেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁহারা এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

এই স্বীকারোক্তি নূতন নয় এবং ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মৃত নয়জন ডাক্তারই আঁদ্রে ঝাদনভের মৃত্যু ঘটানর দায়ে অভিযুক্ত, কারণ অভিযুক্ত না হইয়া ইঁহাদের উপায় নাই—ইহা যখন মার্শাল ষ্ট্যালিনের অভিপ্রায়, তখন বুঝিতে হইবে হয়তো ইহার অন্তরালে কোনো অভিসন্ধি কার্য করিতেছে। যদিও একজন সুইডিস্ চিকিৎসক সুইডেন হইতে জানাইয়াছেন যে, তিনি ঝাদনভের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ঝাদনভের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু একথা কে শুনিবে?

ষ্ট্যালিনের যখন প্রয়োজন, তখন জনকয়েকের প্রাণবলী দিতেই হইবে। আজ অনেকেরই হয়তো মরিবার দরকার হইয়াছে, তাই এই নয়জন ডাক্তারকে দিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করা হইয়াছে এবং শিখণ্ডীর ন্যায় আসরে আনা হইয়াছে। ক্ষমতা, প্রভুত্ব প্রভৃতি এমনই জিনিস যে, তাহা চারিদিকে কেবল ষড়যন্ত্রের কল্পিত ছায়া আবিষ্কার করিয়া ফিরে—এবং সেই ষড়যন্ত্রের অঙ্কুর বিনষ্ট করিতে গিয়া দেশের দশের, এমন কি নিজেরও সর্বনাশ মোহ ও অহঙ্কারের বশে ঘটাইয়া বসে। সম্প্রতি ক্রেমলিনের কক্ষে কক্ষে সেই ছায়ামূর্তির নিঃশব্দ সঞ্চরণ ষ্ট্যালিন ও তাঁহার অন্তরঙ্গদিগের সম্ভবত নিশীথ নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকিবে; তাই ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া কুটিল হিংস্র মূর্তিতে তাঁহারা নিজেদের শত্রুহীন ও নিষ্কণ্টক করিবার সংকল্পে মাতিয়াছেন।

মনে পড়ে ১৯৩৭-৩৮ সালের বিখ্যাত "মস্কো-বিচার"। সেদিনেও ইহা অপেক্ষা কম ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে নাই। সেদিনেও রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন নায়ক গ্রহের ন্যায় লেনিনকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং যাঁহাদের দান ষ্ট্যালিন অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই বিচারে অভিযুক্ত করিয়া দেশদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী বৃদ্ধ বুখারিণ এবং কামেনভও নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্য, তাঁহারাও এমনি স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আরো আশ্চর্য, সোভিয়েট গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধিনায়ক ইয়েনঝভ—যিনি সেদিন ষ্ট্যালিনের সর্বাপেক্ষা সাহায্যকারী ছিলেন—তিনিই আবার একদিন ষ্ট্যালিনের প্রয়োজনে নিজেকে দেশদ্রোহী স্বীকার করিয়া মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

বিপ্লবের শিক্ষা পাকা করিতে ট্রট্স্কী হইতে আরম্ভ করিয়া এমনিভাবে কতো লোকের জীবনই আহুতি দিতে হইয়াছে। বিপ্লবের চরম পরিণতি ত্বরান্বিত করিবার জন্যই ইহুদীরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাদের ধরা হইতেছে। স্বীকারোক্তি দিতে তাহারা বাধ্য। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা চিরকাল অপরাধ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর হয় প্রাণ দিয়াছে, নয় দাস-শ্রমিক-শিবিরে গিয়াছে। ইহাদের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। ইহাই ষ্ট্যালিন—ইহাই আজিকার সুসভ্য সোভিয়েট রাশিয়া!

দক্ষিণ আফ্রিকা—

গত ২৩শে জানুয়ারী 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্যে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এমন আর কখনো হয় নাই। আগামী এপ্রিলে নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনে বর্তমান জাতীয়তাবাদীদল পরিচালিত সরকার আর একবার ক্ষমতালাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পত্রিকায় বলা হইয়াছে: বিচারমন্ত্রী মিঃ সোয়ার্ট কাফ্রিদের উপদ্রব দমনের জন্য আরো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে একটি বিল রচনায় ব্যাপৃত আছেন। 'শ্বেত-সভ্যতা বিপন্ন' বলিয়া জাতীয়তাবাদীরা যে ধ্বজা ধুয়া তুলিয়া থাকেন তাহা কাজে লাগাইবার পক্ষে তাঁহার এই বিল বিশেষ সহায় হইবে। এদিকের অবস্থা এই, কিন্তু তাঁহার নিজের দিক হইতেই প্রধান বিপদ আসিবার সম্ভাবনা। ভোটদাতারা যদি প্রধান বিরোধী পক্ষ সম্মিলিত দলকে নির্বাচিত করে, তবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পাইলেও একেবারে তিরোহিত হইবে না। প্রগতির ভাগ্যলক্ষ্মীকে বহন করার পক্ষে সম্মিলিত দল দুর্বল হইলেও উহার হাতে যদি পুনরায় ক্ষমতা আসে, তাহা হইলে অন্তত আশার নবীনালোক দেখিতে পাওয়া যাইবে। বর্তমানে সেই আলোকটুকুই অন্তর্হিত।

কাফ্রী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জাতিগত সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিবে বলিয়া সম্মিলিত দল প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অবশ্য এই দলের অধিকাংশ সদস্যই উদার-নৈতিক পথ ধরিয়া বেশি দূর অগ্রসর হইবেন না। তথাপি বর্তমান রেষারেষির যদি কিঞ্চিৎ লাঘবও হয়, তাহাতেই অনেকখানি কাজ হইবে। জাতীয়তাবাদীদের জয় হইলেও উদারপন্থীরা যদি দৃঢ় নীতি অবলম্বন করেন, তাহাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বর্ণসমস্যার সমাধান আর হইতে পারে না বলিয়া নিরাশ হইবারও কোনো কারণ নাই।

মিশর—

মিশরে নগীব সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইবার দায়ে পঁচিশজন সামরিক কর্মচারী কারারুদ্ধ হইয়াছে। উহাদের দলে সেরাগ এল দীন পাশা ও কর্ণেল মেহনা থাকায় মনে হয় ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে রাজা ফারুকের সমর্থনকারীরা আছেন। জেনারেল নগীব এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেগুলির বিরুদ্ধে কিছু তেমন বলা চলে না। কিন্তু চক্রান্ত ধ্বংস করিতে গিয়া তিনি যেন একনায়কত্বের পথে না অগ্রসর হন। তাহা হইলে কেবল মাত্র মিশরেরই গণতন্ত্র অনাবিলতে নিমজ্জিত হইবে না—সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তাহার ভয়াবহ প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবে।

১৫ই মাঘ, ১৩৫৯
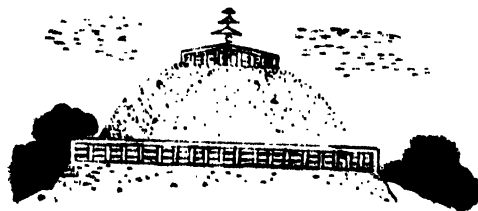
পঞ্জিকার সংস্কার ও সকল পঞ্জিকার ঐক্য বিধান

জ্যোতি বাচস্পতি

বাংলা দেশের পঞ্জিকার সংস্কার সম্বন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে অনেক আন্দোলন আলোচনা হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-বিতণ্ডা হলেও পরে একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, পঞ্জিকার সংস্কার আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বীকার সত্ত্বেও বাংলা দেশে বহুপ্রচলিত পঞ্জিকাগুলি এখনও অসংস্কৃত ও অশুদ্ধ গণনাই প্রকাশ ক'রে চলেছেন। বাজারে এখন পাশাপাশি সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দু'রকম পঞ্জিকাই পাওয়া যায় এবং দু'রকমের পঞ্জিকায় তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি পঞ্জিকার অঙ্গগুলির পার্থক্য দেখে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে। পঞ্জিকা হিন্দু সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস, তার ক্রিয়াকর্ম পূজা-পার্বণ সবই অনুষ্ঠিত হয় পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসারে, কাজেই যাঁদের পঞ্জিকার অঙ্গ তিথি-নক্ষত্রাদি যে কী বস্তু সে সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা নেই, তাঁরা যখন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকায় তাঁদের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন নির্দেশ পান—তখন তাঁদের মন সন্দেহাকুল ও অস্বচ্ছন্দ হ'য়ে উঠলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এতে নানা রকমের বিভ্রাট ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় যা অবাঞ্ছনীয়। এই বছর দুর্গাপূজার ব্যাপারেই তার নমুনা পাওয়া গেছে। একজন অসংস্কৃত পঞ্জিকা অনুসারে চলেন, তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন বিজয়ার কোলাকুলি করতে—কিন্তু বন্ধু তার জন্য প্রস্তুত নন, তিনি সংস্কৃত পঞ্জিকা অনুসরণ করেন, তাঁর মতে পরের দিন বিজয়া। সুতরাং বিজয়ার মিষ্টিমুখ ও প্রীতিকামনার বদলে বন্ধুদের মধ্যে শুরু হ'ল বাক্‌বিতণ্ডা ও কটুকাটব্য। ফল হ'ল বন্ধুবিচ্ছেদ। ভাবুন দেখি!

আসলে পঞ্জিকা কী? আকাশে কতকগুলি ঘটনা ঘটছে, পঞ্জিকা তার টাইম-টেবল ছাড়া আর কিছু নয়। কোন দিন কোন সময়ে আকাশে কী ঘটবে পঞ্জিকার কাজ আগে থেকে তা নির্দেশ করা। কাজেই সব পঞ্জিকা যদি সঠিক গণিত হয় তাহলে সকল পঞ্জিকার গণনা এক হ'তে বাধ্য। পঞ্জিকা ঠিক কিনা তার প্রমাণ পঞ্জিকার পাতা বা শাস্ত্রের নজীরে পাওয়া যাবে না, তার প্রমাণ মিলবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে।

দেশে অব্জার্ভেটারি মানমন্দির বা বীক্ষণশালাও আছে এবং বীক্ষণ-বিশারদ বিজ্ঞানিকেরও অসদ্ভাব নেই। কোন পঞ্জিকাগুলির গণনা ঠিক কোনগুলির ভ্রান্ত তা পর্যবেক্ষণ ক'রে অনায়াসেই নির্ণীত হ'তে পারে। এ সত্ত্বেও যে ভ্রান্ত গণিত সম্বলিত পঞ্জিকার দেশে বহু প্রচলন দেখা যাচ্ছে তার কারণ আমার মনে হয় জনসাধারণ ও গভর্মেণ্ট উভয়ের উদাসীনতা। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, এখন এরকম ভ্রান্ত গণনা প্রচারিত হওয়া দেশের গৌরবের পক্ষে হানিকর। মনে করুন, একজন বিদেশী যদি এই ভ্রান্ত গণিতসম্বলিত পঞ্জিকার বহুল প্রচার দেখেন, তাহলে বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা হবে? এ ব্যাপারে দেশের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই অবহিত হওয়া দরকার। যেখানে পঞ্জিকার কোন তথ্য গ্রহণ করা গভর্মেণ্টের প্রয়োজন হয় সেখানে কর্তৃপক্ষ যদি বিশুদ্ধ পঞ্জিকার তথ্যই গ্রহণ করেন, তাহলে সহজেই এ সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। যেখানে পর্ব উপলক্ষে গভর্মেণ্ট ছুটির দিন ধার্য করেন, সেখানে যদি বিশুদ্ধ পঞ্জিকাগুলিতে নির্দিষ্ট পর্বদিন তাঁরা নেন, তাহ'লে সকলেই বুঝতে পারবে যে কোন্ পঞ্জিকার গণনা দেশের সরকার অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন এবং তখন দেশের জনসাধারণেরও মত পরিবর্তিত হ'তে বিলম্ব হবে না। স্কুল কলেজের ছুটির বেলাতে যদি শিক্ষা পরিষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় এই নীতিই অনুসরণ করেন, তাহ'লে লোকে বুঝবে দেশের সুধীবৃন্দও সরকারের এই মতের সমর্থক। দেশের সরকার এবং দেশের সুধীবৃন্দের দ্বারা বিশুদ্ধ পঞ্জিকার এই সমর্থন প্রকট হ'লে ভ্রান্ত গণনা সম্বলিত পঞ্জিকাগুলিও তখন গণিতাংশ শোধরাতে যত্নবান্ হবেন এবং সহজেই সকল পঞ্জিকার ঐক্য বিধান আপনা আপনিই হ'য়ে যাবে।

পঞ্জিকার ঐক্য বিধান মানে এ নয় যে, সকল পঞ্জিকা একই ধরণে প্রকাশিত হবে। বিষয়বস্তু সন্নিবেশ, শুভাশুভ দিন-নির্ণয় বা জ্যোতিষের ফলিত প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে এক পঞ্জিকার সঙ্গে আর এক পঞ্জিকার পার্থক্য ও মতভেদ

থাকবেই, সেখানে ঐক্য হওয়া সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু যেটা ঐ সকল প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সেই গণিতাংশে সকল পঞ্জিকার ঐক্য থাকা চাই। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—দ্বিতীয়া তিথিতে কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—এ নিয়ে পঞ্জিকায় পঞ্জিকায় মতের মিল নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঐ দ্বিতীয়া তিথির কোন সময় আরম্ভ এবং কোন্ সময় শেষ তা সব পঞ্জিকায় এক হওয়া চাই। অবশ্য নিজের নিজের খুশিমত কেউ বা তা ষ্টাণ্ডার্ড সময় দিয়ে, কেউ বা কলকাতা সময়—কেউ বা অন্য কোন সময় দিয়ে উল্লেখ করতে পারেন কিন্তু সময়টি মূলতঃ এক হ'তে হবে। এই রকম পঞ্জিকার নক্ষত্র, যোগ, করণ ইত্যাদিরও মিল হওয়া চাই।

আশ্চর্যের কথা বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে আকাশ সম্বন্ধে এই রকম ভুল গণনা দেশের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ ও লেখালেখি চলছে। পঞ্জিকার ব্যাপার গণিতের অঙ্গ—তাতে মতভেদ বা দলাদলির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দুই আর দুইয়ে চার হবে কি পাঁচ হবে, তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক যেমন একটা হাস্যকর ব্যাপার—পঞ্জিকার এই বিভিন্ন মতও তেমনি একটা হাসির জিনিষ। আমার মনে হয় স্বাধীন দেশে সরকারের কর্তব্য—যাতে দেশের গৌরবের পক্ষে হানিকর এরকম কোন ব্যাপার ঘটতে না পারে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া। আমি এ বিষয়ে শিক্ষিত সাধারণকে অনুরোধ করছি যেন তাঁরা এ বিষয়ে সরকার ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আদর্শ বাঙ্গালী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

"True to the kindred points of
heaven and home".

যৌবনে দেখেছি তোমা ধীরোদাত্ত নায়কের মত
আকণ্ঠ বিষয়ভোগে রত,
মগ্ন ছিলে বিলাস-ব্যসনে
অর্থ কাম—দ্বিবর্গ সাধনে।
আদর্শ সংসারী ছিলে লোকপাল ছিলে গৃহপতি
লয়ে জ্ঞাতি বন্ধুজন সন্তান সন্ততি
নিজে শুধু কর নাই ভোগ
যোগায়েছ শতেকের তুমি ক্ষেম-যোগ।
পুষ্পিত বকুল বৃক্ষ বিহগকূজিত,
তোমারি সে অঙ্গে ছিল সহস্র আশ্রিত,
পেয়েছিলে মান যশ পদের গৌরব
অঙ্গে আর সঙ্গে ছিল লক্ষ্মীশ্রীবৈভব।
শোক দুঃখলেশ
সুখের সংসারে তব করেনি প্রবেশ।
যত তুমি দূরে গেলে শ্রীহরির শ্রীচরণ হ'তে
ভোগসুখ বিলাসের স্রোতে,
তত আমি ভাবিলাম তুমি ভাগ্যবান্
বিধাতার চিহ্নিত সন্তান।
স্থবির অশীতিপর বৃদ্ধ তুমি, প্রতিক্রিয়া তার
ও জীবনে চলে অনিবার
ধর্ম্মঅর্থ অন্য দুই বর্গ-সাধনার।
পাইয়াছ অবসর ও দীর্ঘ জীবনে,
পরিশুদ্ধি লভিবারে তাপের দহনে।
ক'রে থাক যদি কোন পাপ
করিবারে প্রায়শ্চিত্ত আর অনুতাপ
পাইয়াছ তুমি অবসর,
শোকে তাপে ধ্বস্ত দেহ জরায় জর্জর।
তবু তুমি আজো ভাগ্যবান,
শ্রীহরির চিহ্নিত সন্তান।
একে একে এলো শোক প্রিয়জন বিচ্ছেদ বেদনা
দীর্ঘ জীবনের দণ্ড, বিধির প্রেরণা
কৃতঘ্নতা, স্বজনের শাঠ্য, প্রবঞ্চনা
বিত্তহানি, মনস্তাপ, রোগের যন্ত্রণা
নিজ অনুগৃহীতেরো নিত্য বিমুখতা
কত ক্ষোভ, কত সূক্ষ্ম ব্যথা
একে একে এই সব করিয়া প্রেরণ
শ্রীহরি টানিল কাছে করি তোমা একান্ত আপন।

চর্ম্ম চক্ষু রুদ্ধ করি নারায়ণ দিল দৃষ্টি নব
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় বিকশিয়া মর্ম্ম চক্ষু তব।
নিঃশেষে করিয়া আজি আত্মনিবেদন,
হইয়াছ বিধাতার একান্ত আপন।
অসময়ে ভক্ত সাজি কর' নাই কখনো ভণ্ডামি
ক্রমপরিণতি পথে প্রকৃতির নিয়মানুগামী
প্রবৃত্তির পরিপাক কবে হ'লে সায়
টানিয়া লবেন প্রভু, ছিলে তুমি তারি প্রতীক্ষায়।
দ্বন্দ্বাতীত আজি তুমি, নাহি রাগ দ্বেষ
নাহি শোক অভিমান নাহি লোভলেশ।
প্রাক্তনের কর্ম্মফল ও জীবনে নাহি কিছু জমা।
হাসিমুখে সকলেরে করিয়াছ ক্ষমা।
জীবন্মুক্ত হ'য়ে তুমি বৈতরণী পুলিনের 'পরে
প্রতীক্ষায় আছ খেয়া-কাণ্ডারীর তরে।

—তিন—

"Que Cidade é esta ?"

ার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রসন্ন হয়ে উঠল সোমদেবের । রক্তাভ কঠিন চোখ দুটোয় পড়ল কোমলতার ছায়া— ালের যে রেখাগুলো এতক্ষণ ক্রুদ্ধ সাপের মতো কুণ্ডলী াচ্ছিল, তারা ধীরে ধীরে সরল হয়ে এল।

আগুনের সম্মুখে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তারা াগে থেকেই ছিল উৎকর্ণ হয়ে। জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত ্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘ ছায়া পড়তেই তারা উঠে ালো। এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলে সোমদেবকে। অব্যক্ত ভাষায় কিছু একটা আশীর্বাদ করলেন সোমদেব। ূনে জঙ্গলের ভেতর ফেউয়ের ডাক আর ঝিঁঝিঁর তীব্র ারে সেটা ভাল করে শোনা গেল না। একটি মধ্যবয়সী ুষ, আর একটি তরুণী মেয়ে শঙ্কিতভাবে মাথা নিচু করে ড়িয়ে রইল।

সোমদেব বললেন, বোসো রাজশেখর। এটি কে? ামার মেয়ে বোধ হয়?

—হাঁ গুরুদেব। এর নাম সুপর্ণা। ছেলেবেলায় আপনি নকবার দেখেছেন।

—তাই তো, কত বড় হয়ে গেছে।—ভয়ঙ্কর মুখে ামদেব একটুখানি সস্নেহ হাসি ফোটাতে চাইলেন: িন দেখিনি বোধ হয়।

—তা প্রায় পাঁচ বছর হবে! এর মধ্যে আপনি তো মাদের ওদিকে পায়ের ধুলো দেননি আর।

—হুঁ, তাই বটে। তা তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো—বোসো। বোসো মা সুপর্ণা—

রাজশেখর আর সুপর্ণা একখণ্ড হরিণের ছালের ওপর বসেছিলেন, সেইখানার ওপরেই আবার বসলেন তাঁরা। সোমদেব একখানা বাঘের চামড়ার আসন টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনজন। সুপর্ণা নতদৃষ্টি মেলে রাখল মাটির দিকে, রাজশেখর আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন সোমদেবকে—আর সোমদেব ধ্যানস্থের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালের শীতল অন্ধকারের দিকে। সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রক্তশিখায় চমকে উঠতে লাগল, সেই ক্ষণ-দীপ্তিতে অলৌকিক বোধ হতে লাগল সোমদেবের অস্বাভাবিক মুখ। বাইরের পুঞ্জিত কুয়াশা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরো ঘন হতে লাগল, সমতালে বেজে চলল অরণ্য-ঝিল্লীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। দূরে ফেউটা এখনো বাঘের সঙ্গ ছাড়েনি—থেকে থেকে তার এক একটা বুকফাটা কাতরোক্তি যতিপাত করতে লাগল ঝিঁঝিঁর কলধ্বনির ওপর।

চারদিকের এই জঙ্গল, এই আড়ষ্ট ধূমল সন্ধ্যা। পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে বাঘের স্পষ্ট উপস্থিতি আর সোমদেবের এই অপ্রাকৃত মুখ—রাজশেখরের ভয় করতে লাগল। সামনে ঝুঁকে পড়ে এক মুঠো শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন আগুনটার ওপরে। একবার থমকে গিয়েই আবার লক্লকিয়ে উঠল আগুনটা। পট পট্ করে উঠল পাতা পোড়ার শব্দ, একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারপাশে; পাতার ভেতরে একটা বড় গোছের পোকা ছিল নিশ্চয়।

ওই গন্ধটাতেই বোধ হয় সজাগ হয়ে উঠলেন সোমদেব।

—সঞ্জয়ের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল বোধ হয়?

রাজশেখর বললেন, সেইই আমাদের বসিয়ে, আগুন জেলে দিয়ে গেল। বললে, সন্ধ্যা হলেই আপনি ফিরবেন।

সঞ্জয় সোমদেবের সেবক। কিন্তু এখানে সে থাকে না, আসে পাহাড় পার হয়ে দূরের গ্রাম থেকে। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই এক হাতে একখানা ধারালো বল্লম, আর এক হাতে একটা মশাল জেলে নিয়ে পা বাড়ায় বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যার পরে এই পাহাড়ে একমাত্র সোমদেবই বাস করতে পারেন, সাধারণ মানুষের স্নায়ুর পক্ষে তা দুঃসহ।

সোমদেব বললেন, মন্দিরে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার দেখা পাইনি। তাই অতিথিশালায় জিনিসপত্র রেখে এখানে আপনার খোঁজ করতে এসেছিলাম। সঙ্গে মেয়েটা রয়েছে, ভেবেছিলাম, বেলাবেলিই ফিরে যাব—

—খুব ভয় করছে বুঝি এখানে?—করুণামেশানো ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন সোমদেব।

—ঠিক ভয় নয়—রাজশেখর দ্বিধা করতে লাগলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শীতার্ত অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়-বন নিবিড় ঘন কুয়াশা আর ধোঁয়ার আড়ালে অবগুণ্ঠিত হয়ে গেছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন—হাঁ-করে থাকা রাক্ষসের মতো কালো পাহাড়ের এই রূপটা যেন সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। বললেন, ঠিক ভয় নয়, তবে—

—বাঘ? ভালুক?—তাচ্ছিল্যের স্বরে সোমদেব বললেন, এখানে তারা আসেনা। নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে পারো। আমার কাছে কম্বল আছে, শীতে কষ্ট হবেনা। তবে পেট ভরে খেতে দিতে পারব কিনা সন্দেহ। সঞ্জয় যা সামান্য কিছু রেখে গেছে—

রাজশেখর বাধা দিয়ে বললেন, সে আপনিই গ্রহণ করুন। আমরা আসবার আগেই খেয়ে এসেছি—রাত্রে আর কিছু দরকার হবেনা আমাদের।

—কিন্তু আমার অতিথি হয়ে উপবাসে থাকবে?

—তা হলে আপনার এক কণা প্রসাদ দেবেন, তাতেই হবে। কী বলিস মা?—রাজশেখর সুপর্ণার দিকে তাকালেন, নিঃশব্দ সমর্থনে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

রাজশেখরের সঙ্গে সোমদেবের দৃষ্টিও সরে এল সুপর্ণার ওপর। বাস্তবিক, এই কয়েক বছরের ভেতরেই আশ্চর্য সুন্দরী হয়ে উঠেছে মেয়েটি; উজ্জ্বল দীর্ঘ শরীর, সুলক্ষণা ললাট, খোদাই করা মূর্তির মতো নিখুঁত মুখশ্রী। রাজশেখরের মতো কালো কুরূপ মানুষের ঘরে এমন সুন্দরী শ্রীমতী এই মেয়েকে কেমন প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হল।

নিজের ওপরে সোমদেবের দৃষ্টি অনুভব করে আরো সংকুচিত হয়ে গেল সুপর্ণা। নিঃশব্দে হাতের কঙ্কনের দিকে তাকিয়ে, তার অসংখ্য দর্পণের মধ্যে সে আগুনের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল।

সোমদেব বললেন, কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে কেন যে এলে, সেইটেই এখনো জানতে পারিনি রাজশেখর।

রাজশেখর বললেন, কারণ অনেকগুলো আছে। গত বছর প্রবল জ্বর-বিকার হয়েছিল সুপর্ণার – বেঁচে উঠবে এমন ভরসাই ছিলনা। বৈদ্যেরা সকলেই জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। নিরুপায় হয়ে মানত করলাম চন্দ্রনাথের কাছে। দেবতা দয়া করলেন, সেরে উঠল মেয়েটা। সেইজন্যেই পুজো দিতে এসেছি। তা ছাড়া আপনার কাছেও একটা নিবেদন আছে আমার। ভরসা রাখি, নিরাশ করবেন না।

সোমদেবের কপালে কয়েকটা সংশয়ের রেখা দুলে উঠল।

—আমার কাছে? কী চাও আমার কাছে?

—বহুদিন আপনি আমাদের ওদিকে পদধূলি দেন নি। এইবারে আমি আপনাকে সঙ্গে করে চাকারিয়ায় নিয়ে যাব।

—চাকারিয়ায়?—সোমদেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আমি তো আজকাল আর কোথাও যাই না।

—সে কি কথা!—রাজশেখরের চোখমুখ নৈরাশ্যে কাতর হয়ে উঠল: আমি যে বিশেষ করে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি। আপনি না গেলে ওদিকের সমস্ত আয়োজন যে পণ্ড হয়ে যাবে!

—কিসের আয়োজন?

রাজশেখর বললেন, সেই নিবেদনই করতে যাচ্ছিলাম। অনেক দিন ধরে, বহু অর্থ ব্যয় করে একটি মন্দির গড়ে তুলছি আমি। সেটা শেষ হয়ে এল। আপনি সিদ্ধপুরুষ—আমাদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আপনিই সে মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে আসবেন।

—বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা।—সোমদেব হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন। তাঁর আকস্মিক হুঙ্কারে সমস্ত গুহাটা গমগম করে উঠল, আগুনের শিখাগুলো একরাশ সাপের মতো লকলক করে দুলে গেল, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রাজশেখরের, সুপর্ণা সভয়ে সরে এল বাপের কাছে।

—বিগ্রহ! প্রতিষ্ঠা!—এবার গলার স্বর নামিয়ে পুনরুক্তি করলেন সোমদেব। চোখ দুটোয় যেন দুখণ্ড অঙ্গার জ্বলতে লাগল, মাথার রুক্ষ জটাগুলো যেন ফণা তুলে উঠল সাপের মতো। সোমদেব বললেন, আর প্রতিষ্ঠা নয়—বিসর্জন। হিন্দুর রাজত্ব গেছে, একপাল ভেড়ার মতো দিন কাটাচ্ছে দেশের মানুষ। তার ধর্মকর্ম সব গেছে, সেই সঙ্গে দেবতারও অপমৃত্যু হয়েছে। শোনো রাজশেখর, আর মন্দির প্রতিষ্ঠা নয়! মন্দির যা গড়েছ তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলো, আর প্রকাণ্ড একটা চিতা তৈরী করে সে চিতায় জ্বালিয়ে দাও তোমার বিগ্রহকে।

সভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, সমস্ত গুহাটাও নিস্তব্ধ হয়ে রইল তার সঙ্গে। আচমকা সমস্ত পাহাড় আর শীতার্ত রাত্রির ধূমলকৃষ্ণ অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে পর পর তিনবার বাঘের নাদধ্বনি উঠল। একটা অস্ফুট ভয়াতুর আর্তনাদ করলে সুপর্ণা, কুয়াশা-সরে-যাওয়া গুহার মুখে ধরা পড়ল দূরের একটা নিকষ কালো আকাশ—তার ওপর দিয়ে ছিটকে চলে গেল উল্কার একটা পাণ্ডুর ঝলক। কোথায় একটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে সশব্দে আছড়ে আছড়ে নামতে লাগল কোনো পাহাড়ী খাদের মহাশূন্যতার ভেতর দিয়ে।

রাজশেখরের ঠোঁট কেঁপে উঠল থর থর করে। শিথিল গলায় বললেন, গুরুদেব!

সোমদেবের চোখ দুটো তখনো দপ দপ করে জ্বলছে। বলে উঠলেন, কিসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে চাও তুমি?

তেমনি ভয়ার্ত স্বরে রাজশেখর বললেন, রূপোর একটি শিবলিঙ্গ। রজতেশ্বর।

—রজতেশ্বর!—সোমদেব ভ্রূকুটি করলেন: কিছু হবে না রজতেশ্বরকে দিয়ে। আজ চামুণ্ডাকে চাই। প্রতিষ্ঠা করতে পারো মহাকালীর মূর্তি? হাতে খড়্গ, খর্পরে করে নররক্ত পান করছেন?

রাজশেখর শিউরে উঠলেন।

—একি কথা বলছেন গুরুদেব? আপনি শৈব!

—শিব এবার শব হয়েছেন। তাঁর বুকে মহাকালীকে স্থাপন করতে হবে আজ।

রাজশেখর বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই। আমি যা বলছি তুমি যদি তাতে রাজী থাকো, তবেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি।

রাজশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম—তবে—রাজশেখর বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ: আপনি গুরুদেব, যদি আদেশ করেন—

—শুধু আমার আদেশ বলে নয়। নিজেই ভেবে দেখো ভালো করে। যদি মনঃস্থির করতে পারো, তোমার আহ্বান আমি গ্রহণ করব। কিন্তু সে সব কথা কাল হবে। আপাতত তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই।

সোমদেব আর একবার তাকালেন সুপর্ণার দিকে উজ্জ্বল গৌরকান্তি—আশ্চর্য সুলক্ষণা। বিস্মিত কৌতূহলে সঙ্গে আর একবার মনে হল, রাজশেখরের ঘরে এমন একটি সুন্দরী মেয়ে জন্মালো কী করে?

* * *

কিন্তু এ কোন বন্দরে এসে ভিড়ল ডি-মেলোর জাহাজ?

এই কি চাটিগ্রাম-বহুশ্রুত পোর্টো গ্র্যাণ্ডি? যা কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন সিল্‌ভিরা, বলেছেন কোয়েলহো? যে চট্টগ্রাম স্বপ্নপুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল ডা-গামা দৃষ্টির সামনে, যার স্মৃতি এমনভাবে মুখরিত হয়েছিল ডা-গামার সহযোদ্ধা সৈনিক কবি ক্যামোয়েন্‌সের 'লুসিয়াদাস' কাব্যে?

ডি-মেলোও পড়েছেন 'লুসিয়াদাস্'। বার বার পড়েছে বীরের গর্ব নিয়ে—পড়েছেন মুগ্ধ হৃদয়ে। স্মৃতির মধ্যে পংক্তিগুলো যেন গাঁথা হয়ে গেছে:

"Ve Cathigão, Cidade des melhores
De Bengala, provincia que se preza
De abundante–"

সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই বেঙ্গালা—তার উচ্চতর চূড়োয় আসন এই চট্টগ্রামের। De abundant[illegible] মস্‌লিন, মশলা আর মণিমাণিক্যের কল্পলোক

অপরিমিত ঐশ্বর্যের কাছে লিস্‌বনের সমস্ত রাজভাণ্ডারও তুচ্ছ। এই কি সেই চট্টগ্রাম?

অতি সাধারণ একটি বন্দর। ইতস্তত সামান্য কয়েকটি নৌকো। কয়েকখানি বাড়ী। দূরে একটা মস্‌জিদের আকাশ-ছোঁয়া রক্তবর্ণ মিনার। এখানেও মুরদেরই জয়ধ্বজা উড়ছে! ডি-মেলোর মুখে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল।

—এই পোর্টো গ্রাণ্ডি?

—হাঁ, ক্যাপিটান!—খুন্দ সান জবাব দিলে। অদৃশ্য-প্রায় ভ্রূরেখার নিচে চোখ দুটো মিটমিট করে উঠল তার।

ততক্ষণে নদীর ধারে ধারে কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়েছে একদল। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের মধ্যে মুর আর জেন্টুরের এক বিচিত্র সমাবেশ। এখানেও এত মুর! ডি-মেলোর ভালো লাগল না—কেমন একটা তীব্র অস্বস্তিতে মন তাঁর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

আরাকানী জেলেদের সঙ্গে ডি-মেলো নামলেন বন্দরের মাটিতে। বেঙ্গালার মাটি—পোর্টো গ্রাণ্ডির সুবর্ণ মৃত্তিকা! কিন্তু এই চট্টগ্রাম! এরই এত খ্যাতি—এত প্রতিষ্ঠা! কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আর একবার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তিনি খুন্দ সানের দিকে তাকালেন—কিন্তু তার কঠিন আরাকানী মুখে মনোভাবের এতটুকু প্রতিফলনও কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। একটা তামার মূর্তির মতোই সে নির্বিকল্প।

জনতার বৃত্ত তাঁদের চারদিকে আসতে লাগল সংকীর্ণ হয়ে। উত্তেজিত ভাষায় কী যেন আলোচনা করছে তারা। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। কী করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না।

দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হয়ে তাকালেন ডি-মেলো—দুপাশের জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিলে সশ্রদ্ধ শঙ্কায়।

একজন নয়, দুজন নয়, দশজন অশ্বারোহী পুরুষ। তারা মুর নয়, কিন্তু মুখের কালো দাড়ি আর মাথার পাগড়িতে মুরদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তাদের। পরণে তাদের ঝলমলে জরির পোষাক—কোমরে ঝুলন্ত বক্রফলক তলোয়ার।

আগে আগে যে আসছিল, সে তার শাদা তেজী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। অশান্ত, উত্তেজিত তার চোখমুখ। তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে কী যেন চিৎকার করে বললে দুর্বোধ্য ভাষায়।

যেন আত্মরক্ষার সহজ প্রেরণাতেই ডি-মেলোর হাতও চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে। সঙ্গী সৈনিকেরা একই সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল একটা আসন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনায়।

কিন্তু ভুলটা ভেঙে দিলে খুন্দ্ সান। বললে, ইনি নগরের কোতোয়াল। আপনারা কে এবং কেন এখানে এসেছেন কোতোয়াল সাহেব তা জানতে চান।

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন ডি-মেলো।

—ওঁকে জানাও, আমাদের কোনো দুরভিসন্ধি নেই। আমরা পর্তুগীজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা সুলতানের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

উত্তর শুনে কোতোয়ালের হাত তলোয়ার থেকে সরে এল—কিন্তু তার মুখের মেঘ কাটল না। আবার তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কতগুলো কথা বলে গেল সে।

খুন্দ্ সান জানালো: কোতোয়াল সাহেব ইচ্ছা করেন, তা হলে এখনি পর্তুগীজ ক্যাপিটানকে তাঁর বাছা বাছা কয়েকজন সৈনিক সমেত সুলতানের দরবারে আসতে হবে।

ডি-মেলো বললেন, আমরাও এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তবে কোতোয়াল সাহেব আমাদের একটু সময় দিন। আমরা সুলতানের জন্যে কিছু ভেট নিয়ে যেতে চাই।

কোতোয়ালের চাপদাড়ির আড়ালে হাসি দেখা দিলে এবারে।

খুন্দ্ সান জানালো: কোতোয়াল সাহেব খুশি হয়েছেন, পর্তুগীজদের তিনি খুবই ভালোবাসেন। তবে নতুন পরিচয়ের এই উপলক্ষে ক্যাপিটান যদি তাঁকে কোনো প্রীতির নিদর্শন উপহার দেন, তাহলে এই ভালোবাসা আরো গভীর হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না বিচক্ষণ ডি-মেলোর। কিন্তু বেঙ্গালার মানুষ সম্পর্কে যে মোহ ছিল তাঁর মনে, কোথা থেকে একটা আঘাত এসে পড়ল তার ওপরে। এই স্বর্ণভূমিতে বাস করেও মানুষ এত লোভী—এমন নগ্ন নির্লজ্জভাবে উৎকোচের জন্যে হাত বাড়ায়! এর জন্যে ডি-মেলো যেন প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলা দেশের কাছে আরো বেশি তিনি আশা করেছিলেন। অথবা লোকটা

হয়তো জাতিতে সেই অভিশপ্ত মুর—হিস্‌পানিয়ার মানুষদের সঙ্গে যাদের রক্তে রক্তে চিরকালের শত্রুতা !

কিন্তু এসব নিয়ে দুর্ভাবনা করে লাভ নেই এখন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে এসেছেন ডি-মেলো, এসেছেন প্রীতি আর সংযোগিতার সম্বন্ধ রচনা করতেই। বিরোধ সৃষ্টি করবেন না তিনি, বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে প্রত্যেকটি পা ফেলছেন সতর্ক রাজনীতিজ্ঞের মতো। একদা সিল্‌ভিরা যে ভুল করেছিলেন, তাঁকে দিয়ে আর সে ভুলের পুনরুক্তি ঘটবে না।

আঙ্‌রাখার মধ্যে হাত পুরে দিয়ে ছোট একটি গোলাকার জিনিস বার করে আনলেন ডি-মেলো। মুঠি খুলে এগিয়ে ধরলেন কোতোয়ালের দিকে। রৌদ্রের আলোয় জিনিসটা চোখ ধাঁধানো দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠল। মান্নার উপসাগর থেকে সংগ্রহ করা একটি বহুমূল্য বিশাল মুক্তো !

অপরিসীম লোভে কোতোয়ালের দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল সামনের দিকে। চারদিকের কৌতূহলী মুগ্ধ জনতার মধ্যেও সে দ্রুতবেগে দু পা এগিয়ে এল, তার পর ডি-মেলোর হাতের তালু থেকে থাবা দিয়ে তুলে নিলে মুক্তোটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বার-কয়েক, মুখ দিয়ে বেরুল জন্তুর মতো একটা অব্যক্ত আওয়াজ।

থুন্দ্ সান বললে, কোতোয়াল সাহেব খুবই খুশি হয়েছেন ক্যাপিটান।

কোতোয়াল আর বিলম্ব করলে না। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই মুক্তোটা চলে গেল তার জেবের আড়ালে। যেন সম্পদটাকে নিরাপদ করতে চাইল সমবেত জনতার লুব্ধতা থেকে। তারপর উচ্ছল স্বরে কী কতগুলো কথা বলে গেল অনর্গলভাবে।

থুন্দ্ সান ব্যাখ্যা করে বললে, কোতোয়াল সাহেব বলছেন, এই উপহারের জন্যে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ক্যাপিটানের কাছে তিনি চিরঋণী হয়েই রইলেন। ক্যাপিটানের উদ্দেশ্য যাতে সব রকমে সফল হয়, তার জন্যে বন্ধু হিসাবে তিনি যথাসাধ্য করবেন।

আর একবার মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন ডি-মেলো।

ধূলিধূসর পথ। দুদিকে ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ী—তাদের চেহারায় কোথাও কৌলীন্য নেই কোনো। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বারে বারেই একটা কুটিল জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে লাগল ডি-মেলোর মন। কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে—কোথায় যেন সঙ্গতি মিলছে না। এই পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—এই সিডাডি বনিটা ? এরই প্রশংসায় এমনভাবে পঞ্চমুখ কোয়েল্‌হো-সিল্‌ভিরা ? নাকি আসল শহর আরো দূরে—এ তার সূচনা মাত্র।

নিজের মনের কাছেই তাঁর প্রশ্ন জাগতে লাগল : Que cidade é esta ? এ কোন্ শহরে এলাম ?

থুন্দ্ সান সঙ্গেই চলেছে দ্বিভাষী হয়ে। লোকটাকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথায় একটা গলদ আছে—কী যেন গোপন করে চলেছে ক্রমাগত। আর থাকতে পারলেন না ডি-মেলো।

—এ কোথায় এলাম ?

কিন্তু থুন্দ্ সান জবাব দেবার আগেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সুলতানের প্রাসাদ। প্রকাণ্ড বাড়ি—সামনে মুক্ত সিংহদ্বার। কোতোয়াল আর প্রহরীদের ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে প্রবেশ করলে সেই সিংহদ্বারের ভেতরে।

মিলছে না—কিছুই মিলছে না। চট্টগ্রামের সুলতানের সাতমহলা যে বিরাট বাড়ির বর্ণনা শুনেছিলেন, তার সঙ্গে এর যেন কোথাও মিল নেই। থুন্দ্ সানের দিকে একবার তাকালেন ডি-মেলো। চোখ ফিরিয়ে নিলে থুন্দ্ সান—বেশ বুঝতে পারা গেল, এখন আর একটি শব্দও বেরুবে না, তার চাপা কঠিন ঠোঁটের নেপথ্য থেকে।

যা হবার হবে। নিজের সাতজন সেনানীকে সঙ্গে নিয়ে ডি-মেলো সিংহদ্বার অতিক্রম করলেন। প্রশস্ত চত্বরের দুপাশে সারিবদ্ধ প্রহরীর দল। সামনে শাদা পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ছাড়িয়ে একখানা প্রকাণ্ড ঘর। সুলতানের দরবার।

অনেক লোক জমা হয়েছে দরবারে। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের অধিকাংশই মুর। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করছে পর্তুগীজদের। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক, বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ নেই কোথাও।

ঘরের একদিকে একটা উঁচু বেদী। সেই বেদীর ওপরে জাফ্‌রি-কাটা শ্বেতপাথরের সিংহাসন—মখমল দিয়ে মোড়া। সে আসনে যিনি বসে আছেন নিঃসন্দেহে তিনিই সুলতান—পরণে জরির কাজ করা মস্‌লিনের পোষাক—মাথার পাগড়িতে ঝলমল করছে একখণ্ড কমল হীরা। শাদা দাড়ি জাফ্‌রাণের রঙে রাঙানো। স্ফটিকের তৈরী একটা প্রকাণ্ড আলবোলা থেকে সোনা জড়ানো সুদীর্ঘ নল এসে সুলতানের ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে। দু-পাশে দুজন সমানে ময়ূরের পাখা দুলিয়ে চলেছে—এই শীতের দিনেও গরম কাটানো চাই সুলতানের। একদল মুর সৈনিক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দু-ধারে।

—একদল বিদেশী খ্রীস্টান বণিক চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁর দর্শনপ্রার্থী—

নকীব চীৎকার করে উঠল।

চাকারিয়ার নবাব! এ দেশের ভাষা জানেন না ডি-মেলো, কিন্তু চাকারিয়ার নবাব কথাটা তীরের মতো বিঁধল তাঁর কানে। তবে এ চট্টগ্রাম নয়! খুন্দ সান ঠকিয়েছে তাকে- বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আরাকানী জেলের দল। খর দৃষ্টিতে চারদিকে একবার খুঁজলেন তিনি —কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাওয়া গেলনা খুন্দ সানকে। দরবারের ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সে।

কিন্তু ফেরবার পথ নেই আর। তবুও এ বেঙ্গালার মাটি। এসেই যখন পড়েছেন, সাধ্যমতো এইখানেই ভাগ্য পরীক্ষা করবেন ডি-মেলো। হিস্‌পানিয়ার সন্তান তিনি— কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হলে চলবে না তাঁর।

সুলতানের সম্মুখের আসনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন মুর উঠে দাঁড়ালো। অভিজাত চেহারার লোক দুই চোখে সন্দেহের কুটিলতা। ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সে প্রশ্ন করলে, কী চাও তোমরা- কেন এসেছ এখানে?

অভিবাদন করে পর্তুগীজেরা নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন। ডি-মেলো মাথা তুললেন এবারে।

—জননী মেরীর আশীর্বাদে ধন্য পর্তুগালের প্রজা আমরা। গোয়ার শাসনকর্তা মুনো ডি কুন্‌হা আমাকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। নবাবের জন্যে এই আমাদের সামান্য উপহার।

সম্মুখে এগিয়ে গেলেন ডি-মেলো। নবাবের বেদীর সামনে মেলে দিলেন একখণ্ড মূল্যবান ভেলভেটের কাপড়, একছড়া মুক্তোর মালা, মালদ্বীপের তৈরি হাতীর দাঁতের একটি সুন্দর কৌটো।

প্রহরী অর্ঘ্য তুলে ধরল নবাবের সামনে। নবাব প্রসন্ন মুখে ফিরে তাকালেন। কী যেন বললেন মৃদুকণ্ঠে।

অভিজাত মুরটি পর্তুগীজ ভাষায় নবাবের বক্তব্য অনুবাদ করে চলল।

—মুনো-ডি-কুন্‌হার এই উপহারে আমি প্রীত হলাম। কিন্তু আমার কাছে কী তাঁর বক্তব্য?

—আমরা বেঙ্গালায় বাণিজ্য করতে চাই। এই কারণেই নবাবের সাহায্য এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

নবাব তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলোর দিকে, কয়েকটা রেখা কুণ্ডলিত হয়ে উঠল তাঁর কপালে। হাতের মৃদু ইঙ্গিত করে অভিজাত মুরটিকে কাছে ডাকলেন তিনি, কী যেন আলোচনা করলেন চাপা গলায়।

দ্বিভাষী মুর গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, নবাব জানতে চাইছেন, পর্তুগীজেরা যুদ্ধ করতে পারে কি?

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক যে ডি-মেলো তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি। সন্দেহ-কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, তলোয়ার পর্তুগীজের নিত্য সঙ্গী—যুদ্ধ তার প্রিয়বন্ধু। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন কেন?

মুর বললে, চাকারিয়ার মহামান্য নবাব খান্‌খানান খোদা বক্স খাঁ খ্রীষ্টান বণিকদের সব রকম সুবিধেই করে দিতে রাজী আছেন। কিন্তু একটা সর্ত আছে তাঁর।

—কী সেই সর্ত?

—নবাব সংপ্রতি তাঁর এক শত্রুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পর্তুগীজেরা যদি এই যুদ্ধে নবাবকে যথাযোগ্য সাহায্য করেন—তাঁদের জাহাজ দিয়ে, তাঁদের সৈন্য দিয়ে—তা হলেই খান নবাব এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারেন।

ডি-মেলোর সমগ্র মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

—আমরা এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছি। এখানে সকলেই আমাদের বন্ধু, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা—কারো সঙ্গে শত্রুতা করা আমাদের কাজ নয়। নবাব আমাদের মার্জনা করবেন।

—তা হলে ক্যাপিটান এই সর্ত মেনে নিতে রাজী নন?

—না। এদেশের সব রকম বিরোধ-বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা দূরে সরে থাকব—আমাদের প্রতি মাননীয় মুনো-ডি-কুন্‌হার এই আদেশই রয়েছে।

নবাবের প্রখর চোখ হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ জ্বালায় ধবক্ করে উঠল। তীব্র স্বরে কী একটা কথা উচ্চারণ করলেন তিনি। ভাষা বুঝতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই ডি-মেলো উচ্চকিত হয়ে উঠলেন।

দ্বিভাষী মুরের মুখে একটা অদ্ভুত বাঁকা হাসি দেখা দিল: তা হলে সে-ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিটানকে তাঁর সমস্ত অনুচরসহ বন্দী করা হল। তাঁর জাহাজগুলোও চাকারিয়ার নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তীরগতিতে তলোয়ারের বাঁটে থাবা দিয়ে ধরলেন ডি-মেলো—তাঁকে অনুসরণ করলে তাঁর সাতজন সহচর। কিন্তু তখন আর কিছুই করবার ছিল না। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, খোলা তলোয়ার হাতে তাঁদের ঘিরে ফেলেছে ত্রিশজন সৈনিক এবং তাদের ব্যূহ রচনা করতে উপদেশ দিচ্ছে সেই কোতোয়াল—মান্নার উপসাগরের একখানা বিশাল মুক্তো উৎকোচ নিয়ে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই যে ডি-মেলোর সঙ্গে চির-বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুত আব্রাহামফের সুনিপুণ ব্যবস্থার গুণে ব্যাগ সুটকেশ সবই আমাদের হোটেলে এসে ঠিক পৌঁছুলো বটে—এলো না কেবল আমার সেই সখের Cine-cameraটি। মনটা খুবই মুষড়ে পড়লো এ ব্যাপারে। দেশ ছেড়ে আসবার সময় দু'চারজন শুভানুধ্যায়ী পই-পই বারণ করেছিলেন, ক্যামেরা সঙ্গে আনতে—কারণ, তাঁরা শুনেছেন, সোভিয়েট রাজ্যে কোনো বিদেশীরই নাকি ফটো তোলবার হুকুম নেই…নিজের খুশীমত ওদেশের যত্র-তত্র ঘুরে বিচিত্র দৃশ্যাবলীর প্রতিলিপি তুলে বেড়াবেন—

মস্কোয়া নদীর উপর কামিনি পুল থেকে ক্রেমলিন দুর্গ প্রাসাদ—মস্কো

বিদেশী-জনের পক্ষে সেটা নাকি নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার—এমনই কড়া কানুন ওখানকার। তাছাড়া বিদেশী পর্য্যটকেরা ওদেশের ছবি তুলে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে না পারেন…সে উদ্দেশ্যে তাঁদের ক্যামেরাও নাকি অনেক সময় সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয় সোভিয়েট সরকারের মালখানায়—এমন একটা গুজবও কানে এসেছিল এখানে আসবার আগে। সে সব ক্যামেরা ফেরৎ দেওয়া হয় বিদেশী পর্য্যটকেরা যখন সোভিয়েট সফরান্তে নিজেদের দেশে ফিরে যান—সেই সময়ে। এমনি নানা গুজব কানে এসেছিল বলে দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলো মন। দেশের সুজন বন্ধুদের সুবুদ্ধি না শুনে অর্বাচীনের মত গোঁয়ার্তুমি করে ক্যামেরাটি সঙ্গে বহে এখানে এনে শেষে নিজের লোকশান নিজেই ঘটালুম—ভেবে ভারী আফশোস হতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত জিগ্যেস করে বসলুম শ্রীযুত আব্রাহামফকে। আমার প্রশ্ন শুনে শ্রীযুত আব্রাহামফ স্মিতহাস্যে অভয় দিলেন, এ ব্যাপারে ক্যামেরাটি হারাবার বা বাজেয়াপ্ত হবার আশঙ্কা নেই এতটুকু…সেটি যথাযথ অক্ষত অবস্থাতেই আমার হাতে এসে পৌঁছুবে এবং আমাদের সোভিয়েট রাজ্য সফরের সময় সেটির যথেচ্ছ সদ্ব্যবহারও করতে পারবো আমি নিজের খেয়াল-খুশীমত। কেবল ওদেশের সীমান্ত অঞ্চলের দুর্গ পরিখাদি এবং মস্কো প্রভৃতি বড় বড় সহরের কয়েকটি সংরক্ষিত স্থান আর বিশেষ-বিশেষ কল কারখানাদির ছবি তুলতে গেলে পূর্ব্বাহ্ণে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে—যেমন পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের দেশরক্ষা বিধানে বিধি-ব্যবস্থা আছে। এই হলো ওদেশের নিয়ম…এ ছাড়া সোভিয়েট রাজ্যে ছবি তোলার ব্যাপারে বিদেশীদের পক্ষে আর কোনো প্রতিবন্ধক নেই।

তাছাড়া আমার Cine-cameraটি না আসার জন্য দায়ী—শ্রীযুত আব্রাহামফ নিজে—কারণ মস্কো বিমান বন্দরের ভারপ্রাপ্ত যে কর্ম্মচারীর জিম্মায় ক্যামেরাটি জমা ছিল, তিনি কর্ম্মান্তরে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় বন্ধুবর আব্রাহামফের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে নি। খানিক অপেক্ষা করলে হয়তো তাঁর দেখা মিলতো—কিন্তু ওদিকে ব্যাগ সুটকেশে প্যাক্ করা আমাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র এবং পরিধেয় পোষাক—অবিলম্বে হোটেলে পৌঁছে না দিলে স্নানাহার ও ক্লান্তি-অপনোদনের ব্যাঘাত ঘটবে বিবেচনা করে শ্রীযুত আব্রাহামফ কালক্ষেপ না করে সোজা

চলে এসেছেন এই 'স্যাভয়' পান্থশালায়। ক্যামেরাটি কালই যাতে আমার হাতে এসে পৌঁছোয়, সে ব্যবস্থা তিনি করবেন—আশ্বাস দিলেন।

পথের বন্ধু আব্রাহামফের সঙ্গে আলোচনায় মেতে রয়েছি—এমন সময় আমাদের নবলব্ধা বান্ধবী দোভাষী এবং গাইড্ কুমারী আলেক্‌জান্দ্রোভা ফিওডোরোভনা এসে ঘরের ছোট বোনটির মত সহজ সরল সুমিষ্টভাবে গার্জেনের ভঙ্গীতে স্নানাহার সেরে নেবার জন্য জোর-তাগিদ জানালেন। তাঁর মতে—আমাদের আজ সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন—বিশ্রামে ক্লান্ত শরীরকে জুড়িয়ে সুস্থ করে না নিলে সুবিশাল সোভিয়েট রাজ্য সফরের ধকল সইতে না পেরে, সেজন্য ওদেশের অনেক কিছু দেখার সুযোগও ফস্কে যেতে পারে। বিদেশ-বিভুঁই…এখানকার জল বাতাস খাপ খাইয়ে চলতে গেলে এখন থেকেই খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের ব্যাপারে অনিয়ম করা ঠিক নয়!

অগত্যা আলোচনায় ইস্তফা দিতে হলো। শ্রীযুত আব্রাহামফ বিদায় নিলেন…যাবার সময় ওদেশেরই রুশীয় ভাষায় সম্ভাষণ জানালেন,—জোস্‌ভিদানিয়া (অর্থাৎ আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত বিদায়। ইংরাজীতে অনুবাদ করলে কথাটির আসল মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়…Good bye till we meet again!)…

আমাকে ছাড়া দিয়ে আলেকজান্দ্রোভা ছুটলেন দলের আর সবাইকে তাগাদা দিতে। পরম আরামে স্নানাদি সেরে বেশ পরিবর্তন করে কামরার বাইরে বেরিয়ে দেখি দলের অনেকের তখনও তৈরী হতে দেরী। কাজেই আবার নিজের কামরায় এসে বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখতে বসলুম।

সোভিয়েট রাজ্যের প্রধান রঙ্গালয় বোলশই থিয়েটার—মস্কো

খানকয়েক চিঠি সবে শেষ করেছি, এমন সময় স্নান ও বেশভূষার পালা সেরে শ্রীমতী পোটে, মহলি এবং দলের আরো অনেক এসে একে একে জমায়েৎ হলেন আমার বসবার ঘরটিতে। নতুন দেশে এসে নতুন নতুন জিনিস দেখবার ও জানবার আগ্রহে সকলেই উদ্‌গ্রীব…দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন বা বিশ্রামের কথা কারো মনে জাগেনি এতটুকু—এমনই এক অপরূপ উদ্দীপনায় মেতে উঠেছিলুম তখন আমরা। তাছাড়া মস্কোস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের স্বদেশী বন্ধুরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেছেন—তাঁদের ওখানে যাবার জন্যে…বিশেষ আমাদের শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ও যখন আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ঔৎসুক্য জানিয়েছেন—তখন খাওয়া দাওয়ার পর খানিক বিশ্রামান্তে আজ অপরাহ্নেই দেখা করে আসবো আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের সবাইকার সঙ্গে। সেই ঘরোয়া-বৈঠকে বসে বসে নিজেদের এমনি জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় ঘরের দোর ঠেলে আমাদের দোভাষী সোভিয়েট সহচর বন্ধু শ্রীমান্ আনাতোলী জুভ্‌কভ আর কুমারী আলেক্‌জান্দ্রোভা এসে আমাদের হোটেলের খানা-কামরায় নিয়ে চললেন।

একতলায় প্রশস্ত-সুসজ্জিত খানা-কামরায় এসে দেখি, প্রকাণ্ড 'হলে'র একধারে বিরাট একটি টেবিল ঘিরে আমাদের জন্য বিশেষ-স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা…টেবিলের উপরে ওদেশের বিচিত্র ভোজ্য-সম্ভার সাজানো রয়েছে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে! ভোজ্যের তালিকায় রুশীয় ধরণের মাছ-মাংস-প্রধান আমিষ-আহার্য্যের ব্যবস্থা থাকায় আমাদের দলের নিরামিষভোজী মাদ্রাজী সঙ্গীদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটছে দেখে কুমারী আলেক্‌জান্দ্রোভা তখনি উঠে গিয়ে হোটেলের রান্নাঘর থেকে দুধ, ভাত, আলু ও কড়াইশুঁটি সিদ্ধ এবং মুসুর ডালের সুরুয়ার মত একটি পদার্থের ব্যবস্থা করলেন! ওদেশে ভাত-ডালের চলন দেখে বিস্ময় জাগলো আমাদের! সহচর-বন্ধু আনাতোলী এবং আলেকজান্দ্রোভার মুখে শুনলুম ভাত-খাওয়ার রীতিমত রেওয়াজ আছে সোভিয়েট-দেশে…ওদের দেশে 'রীস্' (Rhys) অর্থাৎ Rice বা চালের চাহিদা আছে সর্ব্বত্র…ওদেশী খাদ্য-তালিকায় ভাত-খাওয়ার বিশিষ্ট একটি স্থান আছে—যেমন আমাদের ভারতবর্ষে! সোভিয়েট-রাজ্যের গ্রীষ্মপ্রধান এবং নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক জায়গায় ধান-চালের চাষ-আবাদ চলে রীতিমত! উজ্‌বেকিস্তানে উৎপন্ন চালের চেহারা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের পেশোয়ারী চালের অনুরূপ…স্বাদেও মন্দ নয়…তবে সরেস নয় ততখানি! সোভিয়েটবাসীদের ভাতের খোরাক মেটাতে দেশের চাল ছাড়াও—চীন প্রভৃতি বহির্দ্দেশ থেকে চাল আমদানী করা হয়! খাদ্যের তালিকায় চালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি ওদেশে ধান্য-উৎপাদনের প্রসার এবং উন্নতির ব্যাপারে আরো বিশেষ নজর দিয়েছেন সোভিয়েট
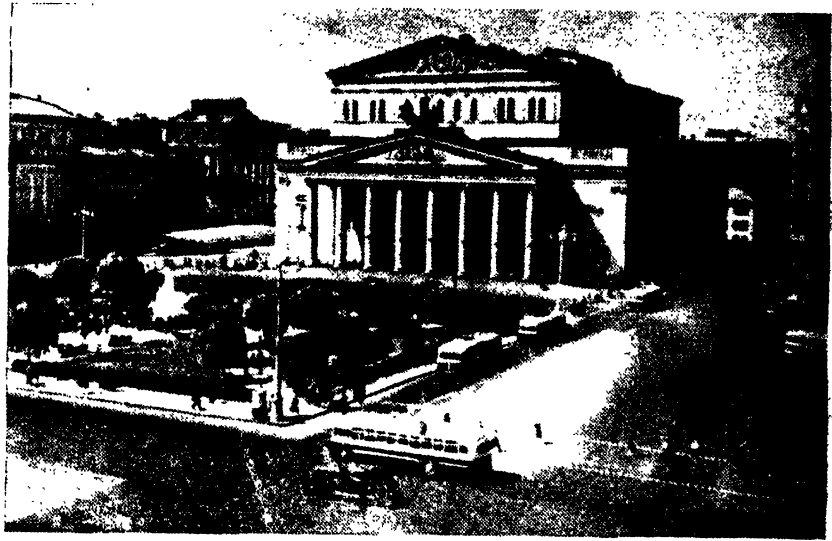
প্রকার···ধান-চাষের উপযোগী ক্ষেত-জমির প্রসার তাঁরা ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছেন।

পরম পরিতৃপ্তি-সহকারে পর্য্যাপ্ত-আহারের পালা শেষ করেছি এমন সময় একরাশ সুন্দর চিত্র-বিচিত্রিত ছোট ছোট কাগজের বাক্সে ভরা সিগারেট নিয়ে খানা-ঘরের প্রবীণ-বৃদ্ধ প্রধান-পরিচারক এসে একগাল হেসে নিতান্ত ঘরোয়া ভঙ্গীতে শুধোলেন,—এবার কি চাই—'কাকাও' (Cocoa), 'কোফি' (Coffee), 'ম্যারোজ্‌নী' (Ice-cream) না 'রুস্কী-চাই' (Russian Tea)···কোনটা কে পছন্দ করি? দলের সকলেই চাইলুম 'রুস্কী-চাই' অর্থাৎ রুশীয় চা। কুমারী আলেকজান্দ্রোভা চাইলেন কিন্তু 'ম্যারোজ্‌নী'! এই আইস্‌-ক্রীম দল! মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সকলে পথে চলেছে আইস-ক্রীম চিবুতে চিবুতে···পার্কে বেড়াতে এসে বেঞ্চে বসে ছোট-বড় সবাই দেখি আইস্‌-ক্রীম খেয়ে চলেছে অবিরাম! ছুটির দিনে আমাদের দেশে খেলার মাঠে চানাচুর-চিনাবাদাম বা আলু-কাবলী খাবার যেমন ধুম পড়ে দর্শক-সাধারণের মধ্যে—অনেকটা ঠিক তেমনি! এমন কি ওদেশের বড়-বড় 'ম্যাগাজিন্‌' বা Departmental Stores-এও আইস-ক্রীম বিক্রী হচ্ছে অফুরন্ত ভাবে!—দেখলে মনে হবে, সারা সোভিয়েট-দেশটা যেন একজোটে আইস্‌-ক্রীম-পাগল হয়ে উঠেছে! শীত-গ্রীষ্ম কোন কালেই ওদেশে এই খাওয়ার কামাই নেই এতটুকু। ওদেশের ঐ দারুণ শীতের সময় চারিদিক যখন তুষারে আচ্ছন্ন থাকে—তখনও সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও এই আইস্‌-ক্রীম খাবার আগ্রহ কম্‌তি নেই, বরং আরো বেড়ে যায় এর মাত্রা! ঠাণ্ডা যত বেশী কড়া এবং কন্‌কনে হয়ে ওঠে···আইস্‌ক্রীম খাবার উৎসাহও তত বেড়ে চলে। এমনি অদ্ভুত ব্যাপার! ওঁরা বলেন, শীতের দাপটে শরীরের কাঁপুনী ঘোচাতে হলে যত বেশী আইস্‌-ক্রীম খাওয়া যায়—ততই নাকি দেহ-মন তাজা এবং গরম থাকে! সোভিয়েট-দেশের বরফ-কন্‌কনে শীতের অভিজ্ঞতা আমরা কিছু-কিছু পেয়েছিলুম আমাদের সফরের সময়ে কিন্তু পাছে 'ডবল-নিউমোনিয়ায়' কাবু করে, এই আশঙ্কায় ওদেশের এই অপরূপ-বিচিত্র আইস্‌ক্রীম-সেবনে শৈত্য নাশনের বিধান পরখ করে দেখবার দুঃসাহস হয়নি!

মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ রেড্‌ স্কোয়ার—ছবির বাম কোণে পতাকা শোভিত ক্রেমলিন প্রাসাদের চূড়া, পথের পাশে দুর্গ-প্রাচীরের কোল ঘেঁষে যে চৌকানো পাথরের তৈরী অভিনব ভবনটি চোখে পড়ে—সেটি হ'ল পরলোকগত সোভিয়েট জননায়ক কমিউনিজমের মন্ত্রগুরু লেনিনের সমাধি সৌধ। তারই অনতিদূরে যে উঁচু চূড়াওআলা গির্জার মতো সৌধ গৃহটি দেখা যায়—সেটি হ'ল রুশীয় 'জার'দের আমলের ডুমা (Duma) বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ ভবন। এখন এটি ঐতিহাসিক যাদুঘর

'রুস্কী-চাই'য়ের ব্যাপারটিও বেশ অভিনব! জাপানী চা-পানের মতই রুশীয় চা-সেবনের বিধি অপরূপ-বিচিত্র! আমাদের দেশে যেমন গরম চায়ের জলে দুধ এবং চিনি মিশিয়ে চা তৈরী করা হয়—ওদেশের প্রথা তেমন নয়! দুধ এবং চিনি না মিশিয়ে গরম চায়ের জলে এক-টুকরো পাতি লেবুর রস নিঙড়ে সেবন করাই হলো রুস্কী চা-পানের রীতি। এই চায়ের জল বানানোর ব্যাপারটিও আমাদের চায়ের জল গরম করার থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ আমাদের দেশে যেমন কেৎলীর ফুটন্ত জলে চায়ের শুকনো পাতাগুলোকে ঢেলে দিয়ে ভেজানো হয়—তারপর সেই পাতাগুলো গরম জলে খানিক ভেজবার পর কেৎলী থেকে চায়ের কাপে ঢেলে দুধ এবং চিনি সহযোগে সেবন

খাওয়াটা হলো সোভিয়েট-দেশের লোক-জনের এক আজব বাতিক! ওদেশের মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, তাশ্‌কান্দ, তিবিলিসি প্রভৃতি বড়-বড় সহরে, গ্রামাঞ্চলের পথে-ঘাটে, এবং সমুদ্র-তীরে Health-resort সোচী, গাগ্‌রী, সুমুখী প্রভৃতি স্বাস্থ্য-অঞ্চলে—যেখানেই গেছি, সর্ব্বত্রই চোখে পড়েছে এদেশী ছেলে-বুড়ো নর-নারীর আইস্‌-ক্রীম খাবার আজব-উৎসাহ! পথের ধারে হামেশা নজরে পড়ে ছোট-বড় আইস্‌-ক্রীমের দোকান···তাছাড়া রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ফুটপাথের উপর কাঁচের আবরণে ঢাকা পরিচ্ছন্ন ঠেলাগাড়ীতে বিচিত্র আইস্‌-ক্রীমের পণ্য-পশরা সাজিয়ে পথ-চারীদের রসনা-তৃপ্তির সহায়তা করছে পুরুষ ও নারী ফেরিওয়ালার

করার বিধি—এদেশে তা কেউ করেন না। এঁদের রীতি হলো—তলায় জ্বলন্ত উনান-সমেত ধাতু নির্ম্মিত বড় একটি মুখ-বন্ধ এবং জল-নিষ্কাশনের কল-বসানো 'সামোভার' (Samovar) পাত্রে দিবারাত্র সদাই মজুত থাকে গরম জল আর তার পাশে থাকে চায়ের পাতা ভরাট ছাঁক্‌নীর মত আর একটি ছোট পাত্র ! চা-পানের বাসনা হলে চায়ের পাতা ভরা এই ছাঁক্‌নীটিকে কাপের উপর ধরে 'সামোভারের' কল খুলে ফুটন্ত জলে প্রয়োজনমত চায়ের বাটি ভরে নিতে হয়। তারপর কেউ বা শুধুই এ-চা পান করেন—আবার কেউ বা 'সামোভারের' পাশে-রাখা পাতি-লেবুর টুকরো নিঙড়ে পছন্দমত 'রুস্কী-চাই' বানিয়ে নেন—এই হলো ওদেশের চা-তৈরীর রীতি ! রুশীয় ভাষায় পাতি-লেবুর রস মিশ্রিত এই চায়ের আরো একটি নাম হলো—'চ্যায়েস্-লিমোনোম্' অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে—"Tea with lemon' !

খাওয়া-দ য়ার পালা চুকিয়ে আমরা দল বেঁধে গেলুম মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। হোটেলের দ্বারদেশেই আমাদের জন্য মোতায়েন ছিল দু'খানি সুদৃশ্য বিরাট ওদেশী 'Zis' মোটর-যান…তাতে চড়ে সহরের পথ মাড়িয়ে বেরুলুম ভারতীয় দূতাবাসের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে 'গাইড' হয়ে চললেন আমাদের দুই দোভাষী বন্ধু শ্রীমান্ আনাতোলী আর কুমারী আলেকজান্দ্রোভা !

মস্কো সহরের কেন্দ্রস্থলের কাছেই সুদৃশ্য-বিরাট প্রাসাদোপম ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাস…ফটকে দুজন ওদেশী শাস্ত্রী পাহারাদার। দূতাবাসের দ্বার-প্রান্তে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আনাতোলী এবং আলেকজান্দ্রোভা কর্ম্মান্তরে অন্যত্র গেলেন…ফেরবার পথে আবার আমাদের তুলে নিয়ে আসবেন হো হলো ব্যবস্থা !

দূতাবাসের স্বদেশী-বন্ধুরা আমাদের অপেক্ষায় দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়িয়ে ছিলেন…পরিজনের মত সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের সুসজ্জিত বসবার কামরায়। দূর-বিদেশে স্বদেশের এতগুলি লোককে পেয়ে পরম আগ্রহে প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন আমাদের প্রবীণ রাষ্ট্রদূত ! দলের মধ্যে মাদ্রাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের পরিচয় ছিল এবং ওঁর কলিকাতা-প্রবাসকালে আমার সঙ্গেও অল্প একটু আলাপের সুযোগ ঘটেছিল কোনো এক বিশিষ্ট বন্ধুর গৃহে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হবার দরুণ ! প্রসঙ্গক্রমে সেই স্বল্প-পরিচয়ের ক্ষীণ-সূত্রটি ধরিয়ে দিতেই আবার ঘনিষ্ঠ-আলাপ জমে উঠলো আমাদের এবং দলের অপরিচিত বাকী ক'জনের সঙ্গেও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ তাঁর অমায়িক-আচরণের গুণে রীতিমত আলাপ জমিয়ে তুললেন অল্পক্ষণের মধ্যে ! এত বড় মনীষী…অমন বিরাট পাণ্ডিত্য-প্রতিভা…অথচ এমন সরল, সহৃদ্‌, স্বাভাবিক, সুন্দর তাঁর ব্যবহার !

কথা-প্রসঙ্গে সোভিয়েট দেশের বাসিন্দা এবং ব্যবস্থা বিধির বিষয়ে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান দিলেন আমাদের ! সোভিয়েট-দেশবাসীদের বিশেষ প্রশংসা করলেন তিনি—দেশোন্নতির সর্ব্ববিধ ব্যাপারে…সুপ্রসিদ্ধা সোভিয়েট নৃত্যশিল্পী ব্যালেরিনা উলানোভা থেকে সুরু করে রাষ্ট্রীয় জন-নায়ক মার্শাল স্তালিনের সুদক্ষ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার সুখ্যাতি—কোনো কিছুই বাদ দিলেন না ! শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের মত মনীষীর পক্ষপাতহীন উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সূক্ষ্ম-বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষে জাচাই করে দেখা—সোভিয়েট-রাজ্যের অনেক কিছু আজব রহস্য আমাদের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল ! আমাদের প্রত্যেককে তিনি উপদেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ-দেশে যখন এসেছি তখন এখানকার অপরূপ বিচিত্র শিল্প-কলা, নৃত্য-গীত, অভিনয়, নগর-উন্নয়ন, লোক-শিক্ষা, কৃষি-প্রচেষ্টাদি এবং সামাজিক উন্নতির প্রভৃতি ব্যাপার তন্ন-তন্ন করে যেন লক্ষ্য করে যাই…তার ফলে, আমরা হয়তো অনেকখানি জ্ঞান-সঞ্চয় করতে পারবো !…যে-অভিজ্ঞতার খানিকটা অন্ততঃ কাজে লাগাতে পারবো দেশে ফিরে আমাদের নিজেদের দেশ-উন্নয়নের সাধনায় !

আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল।—এক ফাঁকে ভারতীয় দূতাবাসের দু'জন রুশীয়-পরিচারিকা এসে চায়ের বাটি এবং মিষ্টান্নের থালা পরিবেশণ করে গেলেন। দূতাবাসের তরুণ বন্ধুরা নিয়ে এলেন সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ, মৌরি মশলার থালা ! দেশ ছেড়ে ইস্তক পাণ এবং দেশীয় মশলার অভাবে দলের অনেকেরই বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল…এখানে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এই সব মশলার স্বাদ পেয়ে—মুঠো-মুঠো পকেটে ভরে নিলেন অনেকে। দেশের মশলার অভাবে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে দেখে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ সোৎসাহে প্রায় উজাড় করে দিলেন তাঁর মশলার ভাঁড়ার !

শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের মুখে শুনলুম—দূতাবাস-ভবনটি নাকি আগে ছিল 'জার আমলের' মস্কোবাসী রুশীয় কোন্ এক বিপুল-ধনী ব্যবসায়ীর রক্ষিতার প্রাসাদ…'বল্‌শেভিক' বিপ্লবের পর এটি এসেছে সোভিয়েট সরকারের অধিকারে। তাঁরা এটি ইজারা দিয়েছেন ভারত-সরকারকে—এদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাস-ভবন ও দপ্তর হিসাবে ব্যবহারের জন্য ! ভারতীয় দূতাবাসটি প্রথমে ছিল কাছে আর একটি নাতি-বৃহৎ বাড়ীতে…কিছুকাল হলো স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে এই প্রাসাদোপম ভবনে ! তবে সোভিয়েট সরকারের নাকি সঙ্কল্প আছে ইজারার সময় শেষ হলে এ-বাড়ীটি ভেঙ্গে এরই জায়গায় আর একটি বিরাট ইমারৎ গড়বেন অচিরেই—তখন ভারতীয় দূতাবাসের জন্য তাঁরা নাকি অন্য আর একখানি বাড়ীর ব্যবস্থা করবেন।

গল্প-সল্প এমন জমে উঠেছে যে, কখন অপরাহ্ন গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—খেয়াল হয়নি কারো। এমন সময় খপর এলো—দূতাবাসের ফটকে সোভিয়েট-সহচর বন্ধু-দুজন গাড়ী নিয়ে এসে বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায় ! তখনকার মত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ এবং ভারতীয় দূতাবাসের বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলুম।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি শ্রীযুত মস্কোভস্কী এবং তাঁর সহকর্ম্মী শ্রীযুত আভিটিসভ্ বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায় ! আমাদের দেখে শ্রীযুত মস্কোভস্কী জানালেন, কাল অপরাহ্নে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি শ্রীযুত অশোককুমার (গঙ্গোপাধ্যায়) বিমান-যোগে লণ্ডন থেকে এসে পৌঁছুবেন মস্কোয়—আমাদের দলে যোগ দিতে। অতি সুসংবাদ…সকলেই খুশী হলুম। শ্রীযুত আভিটিসভ আরো জানালেন—আমাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তিনি আজ সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় বোল্‌শই থিয়েটারে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় কবি পুশ্‌কিনের রচিত 'রুশ্‌লান্ ও উদ্‌মিলা' গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখার ব্যবস্থা করেছেন !

তাশ্‌কান্দে গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখার পর আমরা সকলেই উৎসুক ছিলুম—মস্কোতে এসে সোভিয়েট-দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় সুপ্রসিদ্ধ 'বোল্‌শই থিয়েটারে' রঙ্গাভিনয় দেখবার জন্য—কাজেই সানন্দে শ্রীযুত অভিটিশভের এ-প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে আমরা চটপট তৈরী হয়ে নিলুম হাত-মুখ ধুয়ে বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করে। তারপর রাত প্রায় আটটা নাগাদ দল বেঁধে আমরা গেলুম 'বোল্‌শই থিয়েটারে'—অমর কবি পুশ্‌কিনের রচিত 'রুশ্‌লান্ উদ্‌মিলা' গীতি-নাটিকার অভিনয় দেখতে !

(ক্রমশঃ)

নলিনীরঞ্জন সরকার—

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্পপতি, স্বনামধন্য নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় গত ২৫শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ দিনই সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে তাঁহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মৃত্যুকালে নলিনীরঞ্জনের বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে, অবিভক্ত বাংলা ও স্বাধীন পশ্চিম বাংলার অন্যতম মন্ত্রীরূপে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রূপে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের

নলিনীরঞ্জন সরকার

প্রো-চ্যান্সেলার রূপে, প্রথম স্বরাজ্য দলের প্রধান হুইপ রূপে, সর্বোপরি কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর প্রধান কর্মীরূপে তিনি দেশের আপামর সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। মৈমনসিংহের এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নানা কারণে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীতে অতি নগণ্য কেরাণীরূপে যোগদান করিয়া তিনি তাহার সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন এবং দীর্ঘকাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার কর্ণধার হইয়াছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ্ কমার্সের সভাপতিরূপে তিনি দেশের দারুণ দুর্দ্দিনে বহু শিল্পবাণিজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি সারাজীবন ছাত্ররূপে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহা নানা কাজে নিয়োগ করিয়া তাঁহার অসাধারণ কর্মপ্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি গত ২ বৎসর কাল পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়াও তিনি দেশের সকল আন্দোলনের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিতেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং যে ৫জন সহকর্মী লইয়া দেশবন্ধু জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিতেন, নলিনীরঞ্জন সেই বিগ্ ফাইভের অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্প মিশনের অন্যতম সদস্যরূপে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মানুষ সকল প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও কি ভাবে নিজের অদম্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা জীবনে উন্নতি লাভে সমর্থ হয়, নলিনীরঞ্জনের জীবন তাহার একটি উদাহরণ। তিনি বিপত্নীক ও সন্তানহীন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

বিজ্ঞানীদের পরিচয়—

গত ২রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৪০তম অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু। তিনি ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যায় এম-এ পাশ

করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণা করেন। তিনি কিছুকাল সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। গত বৎসরও একজন বাঙ্গালী বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন—তিনি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এবার রসায়ন শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন—ডাঃ ইউ-পি-বসু ১৯০৩ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯২৬ সালে এম-এস্‌সি পাশ করেন ও পরে গবেষণা দ্বারা ডি-এসসি হন। তিনি পি-আর-এস বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন—ডাঃ বসু দীর্ঘকাল বেঙ্গল ইমিউনিটী কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন এবার ডাঃ এস-কে-সরকার। কলিকাতা হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ভূতত্ত্বে এম-এস্‌সি পাশ করেন ও পরে কয়লার খনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তিনি বিলাতে যাইয়া ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ারী পাশ করিয়াছেন। বর্তমানেও তিনি কয়লার ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইনি বারাকপুরের সরকার বংশের সন্তান। সংখ্যাতত্ত্ব শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ। ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি গণিতে এম-এস্‌সি পাশ করেন। পঠদ্দশায় তিনি রাজনীতিক কাজের জন্য ৩ বৎসর আটক ছিলেন। ১৯২৭ সালে পি-এচ্‌ডি হইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। বিজ্ঞান চর্চায় এতগুলি বাঙ্গালীর সম্মান বাঙ্গালী যুবকগণকে অবশ্যই উৎসাহ দান করিবে।

বিজ্ঞানীদের প্রতি শ্রীনেহরু—

গত ২রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশনের উদ্বোধনকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—"আজ পৃথিবীব্যাপী শুধু সন্দেহ, শঙ্কা ও ক্রোধের প্রাধান্য চলিতেছে, উহারাই শুদ্ধ বিচার বুদ্ধির প্রকাশ পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে বিচার বুদ্ধির স্থান নাই, সেখানে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বা বিকাশের কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছেন এবং তাঁহাদের হস্তে ক্রমে সমগ্র সমাজের সজীব প্রাণসত্তা রক্ষা করা ও তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিবার গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।" শ্রীনেহরু নিজে একজন বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিকগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

রাণাঘাট পৌরসভা কর্তৃক নেতাজীর একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং গত ২৩শে জানুয়ারী প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উক্ত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ফটো—শ্রীসনৎ চৌধুরী

পাটনায় চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ২৬শে ডিসেম্বর পাটনায় মেডিকেল কলেজের মাঠে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন হইয়াছিল। উহা সম্মেলনের ২৯শ অধিবেশন। শোলাপুরের ডাক্তার বি-ভি-মুনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, বিহারের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ডাক্তার ত্রিদিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি ডাঃ মুনে তাঁহার অভিভাষণে কেন্দ্রীয় সরকার ও সকল রাজ্য সরকারকে চিকিৎসার জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য সরকার বহু আইন করিয়াছেন, কাউন্সিল ও কমিটী গঠন করিয়াছেন

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ—ওয়েষ্টইণ্ডিজ
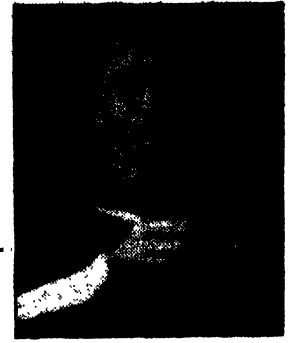
প্রথম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪১৭ (উমরীগড় ১৩০, আপ্তে ৬৪, রামচাঁদ ৬১, সোধন ৪৫ ; গোমেজ ৮৪ রাণে ৩ উইকেট) ও **২৯৪** (উমরীগড় ৬৯, ফাদকার ৬৫, আপ্তে ৫২)

ওয়েষ্টইণ্ডিজ ঃ ৪৩৮ (উইকস ২০৭, পেয়ারোড ১১৫। গুপ্তে ১৬২ রাণে ৭ উইকেট) ও **১৪২** (কোন উইকেট না পড়ে)

খেলার ফলাফল ড্র গেছে।

২১শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ—ওয়েষ্টইণ্ডিজের ছ' দিন ব্যাপী প্রথম টেষ্ট ম্যাচ সুরু হয় কুইন্স পার্ক ওভালে জুট ম্যাটিং উইকেটে। ভারতীয় দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে। সূচনাতেই ভাঙ্গন দেখা গেল, মানকড় মাত্র ২ রাণ ক'রে কিংয়ের বলে দলের ১৬ রাণে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হলেন। এর আগে মানকড় দু'বার আউট হ'বার সুযোগ দিয়েছিলেন। মানকড়ের জায়গায় রামচাঁদ আপ্তের জুটি হয়ে খেলার মোড়টা ঘুরিয়ে দেন।

চা-পানের সময় ৩ উইকেট পড়ে ১৫৮ রাণ দাঁড়ায়। আপ্তে ৬৪ এবং রামচাঁদ ৬১ রাণ ক'রে আউট হ'ন। উভয়ের জুটিতে ৯০ রাণ হয়। আপ্তের খেলাই দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়—আপ্তে ১১টা বাউণ্ডারী করেন। প্রথমদিনের খেলায় ভারতীয় দল ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রাণ করে। হাজারে নিজস্ব ২৯ রাণে ভ্যালেনটাইনের বলে ক্যাচ তুলে ওরেলের হাতে ধরা পড়েন। ওরেল যে অবস্থায় হাজারের ক্যাচ লুফেছেন তা স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, খেলার পূর্ব্বদিন ওয়েষ্টইণ্ডিজদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে নাকি এক ঘরোয়া বৈঠক বসেছিল, ভারতীয়দলের দুর্ভেদ্য দুর্গ-হাজারেকে আউট করার উপায় স্থির করা নিয়ে। ওরেলের ওপর এই দায়িত্বভার পড়ে। বোলার এবং ওরেলের বুঝা-পড়ার ওপরই ওরেল শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'ন। ভ্যালেনটাইনের বলে হাজারের ফরওয়ার্ড খেলা আগে থেকে অনুমান করেই ওরেল লম্বাভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিলি মিড-অনে হাজারের ব্যাটের মুখ থেকে বল লুফেন—এক হাতে ক্যাচ নিতে গিয়ে ওরেল ভূতলশায়ী হ'লেও হাজারে ধরাশায়ী হ'ন। নিজেকে বিপন্ন ক'রে দলের স্বার্থের জন্যে ওরেলের এই প্রচেষ্টা ক্রিকেট মহলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমদিনের খেলায় দর্শক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০,০০০ হাজার, টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৪২,০০০ হাজার। কুইন্সপার্ক ওভালে ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত যে কোন এক দিনের টেষ্ট খেলায় সংগ্রহীত অর্থের দ্বিগুণ।

খেলার ২য় দিনের দশ মিনিটের মধ্যে ফাদকার নিজস্ব ৩০ রাণে আউট হ'ন। দলের রাণ ২১০, উইকেট পড়েছে ৫টা। উমরীগড়ের সঙ্গে গাইকোয়াড় জুটি বাঁধেন। লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে রাণ ওঠে ২৬০। লাঞ্চের পর থেকে চা-পানের বিরতি পর্য্যন্ত, উমরীগড়ের খেলা প্রাধান্য লাভ করে। তাঁর বিভিন্নমার দেখে দর্শকসাধারণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন। গাইকোয়াড় ৪৩ রাণ ক'রে আউট হন। দলের রাণ তখন ৩২৮। উমরীগড় ও গাইকোয়াড়ের জুটিতে ১১৮ রাণ ওঠে। চা-পানের সময় ভারতীয়দলের রাণ দাঁড়ায় ৩৬০, উইকেট পড়ে ৬টা। উমরীগড় এবং সোধন যথাক্রমে ১২১ এবং ১৬ রাণ করে নট আউট থাকেন। উমরীগড় নিজস্ব ১৩০ রাণ ক'রে আউট হ'ন। টেষ্ট ক্রিকেটে উমরীগড়ের এই ৩য় সেঞ্চুরী। পূর্ব্ববর্ত্তী

সেঞ্চুরী—১৩০ রাণ, ইংলণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজে ১৯৫১-৫২ সালে এবং ১০২, পাকিস্তানের বিপক্ষে বোম্বাইয়ে ১৯৫২ সালে। দ্বিতীয় দিনেই ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৪১৭ রাণে, ৫৯১ মিনিটের খেলায়।

খেলার তৃতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের খেলা সুরু করে। দলের ৩৬ রানে ২টো উইকেট পড়ে যায়। রে ১ রান ক'রে রামচাঁদের বলে এবং ওরেল ১৮ রান ক'রে গুপ্তের বলে বোল্ড আউট হ'ন। খেলার সূচনায় ভারতীয় দলের এ সাফল্য কম নয়!

লাঞ্চের সময় ২ উইকেটে ৪৫ রান দাঁড়ায়। ৩য় দিনের খেলার শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেট গিয়ে ২০৫ রান ওঠে। এভার্টনউইকস ৯২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৪৩৮ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষের থেকে মাত্র ২১ রান এগিয়ে যায়। উইকস ২০৭ রান ক'রে ডবল সেঞ্চুরী করেন। টেষ্টে এই তাঁর সর্ব্বোচ্চ রান। ১৯ রানের মাথায় মানকড়ের বলে ষ্টাম্প আউট হবার একবার সুযোগ দেওয়া ছাড়া তাঁর খেলা নিখুঁত হয়েছিল। ৭½ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে বাউণ্ডারী করেছিলেন ২০টা। সরকারী টেষ্ট খেলায় উইকসের এই ১ম সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫টা এবং ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২টো। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ভারত সফরে উইকস ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় পর পর চার ইনিংসে ৪টে সেঞ্চুরী করেছিলেন। বৃটিশ গায়নার চশমাধারী তরুণ খেলোয়াড় ব্রুস পেয়ারোড্ তাঁর জীবনের এই প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলতে নেমেই ১১৫ রান ক'রে সেঞ্চুরী করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদের ৪র্থ উইকেটে উইকস-ওয়ালকটের জুটিতে ১০১ রান এবং ৫ম উইকেটে উইকস-পেয়ারোডের জুটিতে ২১৯ রান ওঠে। উইকসের খেলাই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে এত অধিক রান করতে সহায়তা করেছে এবং তাঁর খেলার গুণেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলার মোড় ঘুরিয়েছে। চতুর্থ দিনে চা-পানের বিরতির আগে পর্য্যন্ত খেলার গতি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের অনুকূলে ছিল। সে সময় খেলার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল ১ম ইনিংসে ভারতীয় দলের থেকে অনেক বেশীরান করবে। এই অবস্থায় ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন সুভাষ গুপ্তে।

চা-পানের পর ৬টা উইকেটের মধ্যে ৩২টা বল ক'রে এবং তার বিনিময়ে মাত্র ১২টা রান দিয়ে গুপ্তে ৫টা উইকেট পেলেন। উইকস এবং পেয়ারোড তাঁরই বলে বিদায় নিলেন। গুপ্তে মোট ৭টা উইকেট পেলেন ১৬২ রানে। বেলে মাটির ওপর জুট ম্যাটিং উইকেটে মানকড়, রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন এই তিনজন খ্যাতনামা বোলার মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যেখানে জালে শিকার ধরতে পারেন নি সেখানে গুপ্তের ঝুলি ভরে গেল ৭টা উইকেটে—এ কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়! চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দিকে ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, দশ মিনিটের বেশী খেলার সময় ছিল না। কোন রান ওঠে না বা উইকেট পড়ে না।

এর পর ২দিন খেলা বন্ধ ছিল। ২৫শে রবিবার পড়ায় এবং ২৬শে ভারতীয় সাধারণ তন্ত্র দিবস থাকার দরুণ।

২৭শে জানুয়ারী, খেলার ৫ম দিনে লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতবর্ষ ২৭ রানে এগিয়ে যায়। চায়ের সময় রান দাঁড়ায় ১৩১, উইকেট পড়ে ৪টে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে মাত্র ১১০ রান এগিয়ে থাকে।

ফাদকার এবং উমরীগড় যথাক্রমে ৪৬ এবং ৩০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। উভয়ের জুটিতে তখন ৭৩ রান উঠেছে, ১২০ মিনিটের খেলায়।

ফাদকার-উমরীগড়ের ৫ম উইকেটের জুটিই ভারতবর্ষকে পরাজয়ের হাত থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই জুটিতে ১৩১ উঠে, ১৭২ মিনিটের খেলায়। সব থেকে দুঃখের কথা যে, এঁরা দু'জন যখন হাত জমিয়ে ফেলেছেন সেই সময়েই খুব তাড়াতাড়ি দু'জনে আউট হ'ন। খেলার ৬ষ্ঠ দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে, লাঞ্চের আগের ৯০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ আরও ৩টে উইকেট হারিয়ে পূর্ব্ব দিনের ১৭৯ রানের সঙ্গে ৭৮ রান যোগ করলো—ফলে ভারতবর্ষ ২৩৬ রানে এগিয়ে রইলো। লাঞ্চের পর ভারতীয় দলের ২য় ইনিংস ৪০ মিনিট স্থায়ী ছিল, রান উঠেছিল ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসে ২৯৪ রান ওঠে, ৪৫০ মি ভারতীয় দল ২৭৩ রানে এগিয়ে

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল হাতে ১৬০ মিনিট খেলার সময় নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই সময়ের মধ্যে

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৭৪ রান করা অসম্ভব ব্যাপার জেনে তারা পিটিয়ে খেলে নি। আত্মরক্ষামূলক নীতি নিয়ে খেলেছে। দলের এ খেলা দর্শকরা চিৎকার ধ্বনি দিয়ে সমর্থন করে। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ১৪২ রান হয়।

ভারতবর্ষ ঃ বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), ভিনু মানকড়, আপ্তে, যোশী, রামচাঁদ, উমরীগড়, ফাদকার, সোহেন, গাইকোয়াড়, গাদকারী এবং গুপ্তে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ জে বি ষ্টলমেয়ার (অধিনায়ক), ওয়েল, উইকস, ওয়ালকট, রে, পেয়ারোড, গোমেজ, বিন্স, কিং, রামাধীন, ভ্যালেনটাইন।

সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলার ফলাফল

	মোট খেলা	জয়	হার	ড্র
ভারতবর্ষের পক্ষে	৩৫	৩	১৬	১৬
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪৩	১২	১৭	১৯

ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত ৩৫টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এ পর্য্যন্ত ৪৩টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২৫, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৬ এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২।

ডেভিস কাপ ঃ

অন্তঃর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত দু' বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া ৪-১ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে পর্য্যায়ক্রমে তিনবার ডেভিস কাপ বিজয়ী হয়েছে। ৫টি খেলার মধ্যে (৪টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডবলস) অষ্ট্রেলিয়া ৩টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডবলসে বিজয়ী হয়। আমেরিকার ভিক্ সিক্সাস অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাক্ গ্রিগরকে হারিয়ে আমেরিকার পক্ষে ১টি খেলায় জয়লাভ করে।

ওয়েষ্টইণ্ডিজে ভারতীয় দল ঃ

ওয়েষ্টইণ্ডিজে ভারতীয়দল প্রথম সফরে গিয়ে এ পর্য্যন্ত তিনটি দলের বিপক্ষে খেলেছে; প্রত্যেকটি খেলার ফলাফল ড্র গেছে। ইষ্টইণ্ডিয়া দলের বিপক্ষে দু'দিনের প্রথম খেলায় ভারতীয়দলের লেগ ব্রেক এবং গুগলী বোলার সুভাষ গুপ্তে ৫৫ রাণে ৮টা উইকেট পান। ত্রিনিদাদের বিপক্ষে পাঁচ-দিনের ২য় খেলায় ৯টি উইকেট ৯৯ রাণে পেয়ে তিনি বোলিংয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলগুলির ব্যাটসম্যানদের কাছে গুপ্তে বর্ত্তমানে 'জুজু' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ত্রিনিদাদের বিপক্ষে পাঁচদিনের খেলায় বৃষ্টির দরুণ খেলার ৯ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় কোন খেলা ড্র যাওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হাজারে ত্রিনিদাদের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে নট আউট ১৫৩ রাণ করেন—ভারতীয় দলের পক্ষে আলোচ্য সফরে এই প্রথম সেঞ্চুরী। ভিজে উইকেটে শতাধিক রাণ এবং শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থেকে হাজারে তাঁর আত্মরক্ষামূলক খেলায় ব্যাটিং চাতুর্য্যের যে পরিচয় দিয়েছেন ওয়েষ্টইণ্ডিজদলের অধিনায়ক ষ্টলমেয়ার তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন, বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট মহলে আত্মরক্ষামূলক খেলায় যে তিনজন খেলোয়াড় ব্যাটিং চাতুর্য্যে সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের মধ্যে হাজারে অন্যতম—অপর দু'জনের নাম ইংলণ্ডের অধিনায়ক লেন্ হাটন এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হাসেট।

সাহিত্য-সংবাদ

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "লণ্ডনের নরক" (২য় সং)—২॥০
মনোমোহন রায় প্রণীত নাটক "রিজিয়া" (১০ম সং)—১॥০
শশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী" (১৪শ সং)—২॥০, "পথের শেষে" (১৫শ সং)—২,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নিষ্কৃতি" (১৯শ সং)—১॥০, "স্বামী" (২৬শ সং)—১॥০, "পরিণীতা" (৩৬শ সং)—১॥০, নারীর মূল্য (৩য় সং)—২,
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্রোপন্যাস "পর্ণ বেঁধে দিল" (৩য় সং)—২॥০
শ্রীমিহিরকুমার দাস সংকলিত "নাম চয়নিকা"—৬০
শ্রীআদিনাথ সেন প্রণীত "সৃষ্টিতত্ত্ব"—॥০
শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "জীবন-সঙ্গিনী" (২য় সং)—৫,
রমাপতি বসু প্রণীত উপন্যাস "মলী সেনের প্রেম"—১৬০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাট্য-কাব্য "সীতা" (৩য় সং)—২,

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পতি-গৃহে যাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বর্ষফল ১৩৬০ সাল

জ্যোতি বাচস্পাতি

গত ৬ই চৈত্র ইংরাজী ২০শে মার্চ ১৯৫৩ (সিভিল ২১শে) রাত্রি ৩টা ৩১ মিনিট ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড সময় সূর্য বিষুব রেখার উপর এসেছিলেন। সূর্যের এই বিষুব সংক্রমণের মুহূর্তের যে গ্রহ সংস্থান ছিল তার প্রভাব এক বৎসরের মত পৃথিবীর উপর অভিব্যক্ত হবে। পঞ্জিকাগুলিতে ভুলক্রমে ৩১শে চৈত্র মহাবিষুবসংক্রান্তি বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুবসংক্রান্তি ৬ই, ৭ই চৈত্র হয়ে থাকে। এই বিষুব সংক্রান্তির মুহূর্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বৎসর বিষুব সংক্রান্তির সময় এই রকম গ্রহ সংস্থান ছিল।

চ ১৯।৫২ / প্র ২১।১৪ বং	ম ৭।১৫ শু ৮।২ বৃ ২৫।৫৯	বু ২।১৮ বং র ৬।৫৭
ক্র ২৭।৫৭ বং কে ১৮।৯		রা ১৮।৯
ব ২৯।৫৫ বং	শ ২।৩১ বং	

গ্রহ সংস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই বৎসর রবির সঙ্গে নীচস্থ ও বক্রী বুধ যুক্ত হয়ে আছে এবং তা বরুণের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছে, রবির সংগে কোন গ্রহেরই গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রেক্ষা নেই ; কেবল মাত্র রাহুর সংগে তাঁর একটা সেমিস্কোয়ার প্রেক্ষা আছে। কিন্তু তাও সংযোগী প্রেক্ষা নয়। চন্দ্রের সংগে রাহুর একটা ট্রাইন প্রেক্ষা আছে।

কিন্তু তা শনি, মঙ্গল ও শুক্রের অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। চন্দ্র রাহুর প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষায় সংযুক্ত হচ্ছে। চন্দ্র ও রবি উভয়েই রাহুর দ্বারা প্রেক্ষিত হওয়ায় এবং রাহু মকরে থাকায় এ বৎসর পৃথিবীর সর্বত্র রাহুর প্রভাব প্রকট হ'বে। পৃথিবীর সব দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা পরিবর্তনপ্রিয়তা লক্ষিত হ'বে, কিন্তু তার মধ্যে কোন রকম শৃঙ্খলা বা নির্দিষ্ট ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টকে নানা রকম গোলমেলে সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। বিপরীত স্বার্থের সংঘাত, দলাদলি প্রভৃতিতে শাসন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত হ'তে হবে এবং শাসন কর্তৃপক্ষের কোন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত করা কঠিন হ'য়ে উঠবে। এ বছরও প্রজা-সাধারণের নানা রকম দুর্ভোগ উপস্থিত হবে। তাঁদের মধ্যে নীতি জ্ঞানের অভাব, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকট হ'বে। এ বছর সর্বত্র শাসন ব্যাপারে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি লক্ষিত হবে। অনেক দেশেই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নীতির স্থিরতা থাকবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিরোধী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হ'বে। অনেক জায়গায় গভর্ণমেণ্টের একটা অপ্রত্যাশিত ওলট-পালট হ'বে। কোন কোন জায়গায় প্রজাসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে বিরোধীপক্ষ গভর্ণমেণ্টের সংগে যোগ দেবে। এবং শাসন ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিগত মত ও স্বার্থের খাতিরে প্রজাসাধারণের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষিত হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে শান্তি-কামনা এবং যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হলেও অনেক স্থলে মিথ্যা প্রচার ও প্রপাগাণ্ডার দ্বারা সাধারণকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা হ'বে। সর্বত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে গভর্ণমেণ্টের একটা ঝোঁক দেখা যাবে এবং অনেক জায়গায় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা এমন সব আইন বিধিবদ্ধ হ'বে—যা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। অনেক দেশেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নির্লজ্জভাবে সঙ্কুচিত হ'বে। অনেক স্থলেই শাসন কর্তৃপক্ষ সামরিক শাসন বা পুলিশী শাসনের পক্ষপাতী হয়ে উঠবেন। অনেক দেশেই বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে প্রজা-সাধারণের মধ্যে একটা অবসাদ ও অসারতা দেখা যাবে। নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদের দিকে ঝোঁক, দুর্নীতিমূলক কাজ এবং অভাব, দুর্দশা, স্ত্রীলোকের দুর্গতি এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর উপর অত্যাচার অনেক জায়গায় লক্ষিত হ'বে। মোট কথা এ বৎসরও দু-একটি দেশছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র একটা অশান্তি ও বিভ্রাটের প্রবাহ চলবে।

ইংলাণ্ডের পক্ষে এটি দুর্বৎসর, তার লগ্ন হয়েছে কন্যা। বৈদেশিক নীতি নিয়ে তাকে যথেষ্ট বিব্রত হ'তে হবে। আর্থিক ব্যাপারেও তার যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট যাবে। বৈদেশিক নীতি নিয়ে তার প্রতিষ্ঠা হ্রাসের আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ বিদেশী শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক সময় ভ্রান্ত নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ে বিরোধ হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বৈদেশিক নীতিতে তার একটা দ্বিধাপূর্ণভাব লক্ষিত হ'বে। রাজনীতিক মহলে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। রাণীর অভিষেকের ব্যাপারে কোন ঝঞ্ঝাট অথবা অভিষেক উপলক্ষে উৎসবাদিতে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইংলাণ্ডে কোন বিশিষ্ট মহিলার মৃত্যুর সম্ভাবনাও আছে। বস্তুতঃ ইংলাণ্ডের পক্ষে বছরটি খুব ভাল নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লগ্ন হয়েছে সিংহ। সংক্রমণের সময় অষ্টমে রবি বুধ যুক্ত হয়ে আছে এবং এ বৎসর তার উপর নবমস্থ মঙ্গলের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। এতে বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক ব্যাপারে নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে এবং তার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি নির্মাণ ইত্যাদির ব্যাপারে কার্য-কারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সে বিষয়ে দেশে একটা উত্তেজনা চলবে। এই ব্যাপার নিয়ে তার মন্ত্রিসভায় কোন রকম পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা আছে। বৈদেশিক ব্যাপারের জন্য তার বহু ব্যয় হ'বে এবং ঋণ দান করে কোনরকম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তথাপি তার শাসন কর্তৃপক্ষ দেশে খুব জনপ্রিয় হবে না। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার লগ্ন হয়েছে বৃশ্চিক, তার পঞ্চমে রবি বুধ এবং তার উপর বৃহস্পতির প্রভাব খুব বেশী। এর ফলে এ বৎসরও তার দেশ উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার যথেষ্ট চেষ্টা হবে। কিন্তু যুদ্ধের সরঞ্জাম ও নৌবল বৃদ্ধির জন্য তার যথেষ্ট ব্যয় বাহুল্য ঘটবে। তা সত্ত্বেও তার শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হওয়া সম্ভব। শিক্ষা ও শিল্পের ব্যাপারে অনেক নতুনতর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার

চেষ্টা হবে। সে কিন্তু কমবেশী আত্মস্থ হয়ে থাকার চেষ্টা করবে এবং তার প্রকৃত মনোভাব বাইরে প্রকাশ পাবে না। নিজের বিষয়ে প্রচার কার্যে তার যথেষ্ট ব্যয় হবে—যদিও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নানারকম অপবাদ রটান হ'তে পারে, তবুও বৈদেশিক ব্যাপারে তার একটা উদাসীন ভাব প্রকট হবে। তবে পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোন বিরোধ ঘটতে পারে—তবুও এ বৎসর সে প্রকাশ্য শত্রুতার চেয়ে স্নায়বিক যুদ্ধেরই পক্ষপাতী হবে বেশী।

পাকিস্তানের লগ্ন হয়েছে ধনু রবি, বুধ আছে তার চতুর্থ রাশিতে—তাতে বোঝা যায় যে ভূমির ব্যাপার নিয়ে সরকারকে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং দলাদলিতে সরকারের মর্যাদা হানির আশঙ্কা আছে। তার কৃষিজীবীদের পক্ষে এটি একটি দুর্বৎসর। তাদের মধ্যে একটা অশান্তি লক্ষিত হ'বে। তার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা গণ্ডগোল হ'তে পারে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা প্রচার কার্য প্রবল হ'য়ে উঠতে পারে। উচ্চ প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিদের সংশ্রবে কোনরকম কেলেঙ্কারী ঘটাও বিচিত্র নয়। আর্থিক ব্যাপারে তার একটা অনিশ্চয়তা লক্ষিত হবে এবং তার বৈদেশিক নীতিতে একটা অদ্ভুত ও বিচিত্র মনোভাব লক্ষিত হবে।

এই সব রাষ্ট্র সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ নেই। এ বৎসর ভারতের ভাগ্যে কি আছে সেই বিচারই আমাদের প্রয়োজন। এ বৎসর বিষুব-সংক্রমণের সময় ভারতের যা রাশিচক্র হয়েছে তাতে রবি আছে তৃতীয়ে এবং রুদ্র ও চন্দ্রের প্রভাব ভারতের উপর খুব বেশী অভিব্যক্ত হবে। রুদ্র আছে সপ্তমে এবং চন্দ্র আছে পঞ্চমে। তৃতীয়ে স্থান থেকে অপর দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, স্থলপথ, রেলওয়ে, যানবাহন ডাক টেলিগ্রাম টেলিফোন খবরের কাগজ ষ্টক শেয়ার প্রচারকার্য প্রভৃতি বিচার করতে হয়। তৃতীয়ে রবি বুধ যুক্ত হয়ে থাকায় এই সকল ব্যাপার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। রবি কোন গ্রহের দ্বারা সুপ্রেক্ষিত হয়নি, রাহু ও কেতুর সঙ্গে তার সামান্য অশুভ প্রেক্ষা আছে। বুধ ও রাহু কেতুর দ্বারা কুপ্রেক্ষিত। সুতরাং পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্র নিয়ে দেশের সরকারকে বিশেষ বিব্রত হ'তে হবে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি ও বাক্‌বিতণ্ডা চলবে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের দ্বারা ভারতের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা প্রচার কার্য চলবে—যার জন্য সরকারকে বিব্রত হ'তে হবে। অনেক সময় খবরের কাগজে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে এবং সরকারের বিরোধী পক্ষের দ্বারা সে সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনায় কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তুলবে। ভারতের লগ্ন হয়েছে মকরের নবম অংশ। (অর্থাৎ মীনের নবাংশে) মকরে আছে রাহু—রাহু লগ্নস্থ হওয়ায় এ বৎসরও ভারতকে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। লগ্নপতি শনি দশমে থাকায় অবশ্য সরকারের দেশের শৃঙ্খলা আনার জন্য তা কাজে পরিণত হয়ে উঠবে না। দেশের লোকের মধ্যে এ বৎসর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটবে এবং আধিব্যাধির প্রকোপ যথেষ্ট দেখা যাবে।

তৃতীয়ে রবি ও বুধ থাকায় রাস্তাঘাট রেলওয়ে নৌবল ইত্যাদির ব্যাপারে নানারকম অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে। এ সম্বন্ধে কোন নতুন বন্দোবস্ত বা নতুন আইন বিধিবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তা জনপ্রিয় না হওয়াই সম্ভব। খবরের কাগজের ব্যাপার নিয়েও এমন কোন বিধান হতে পারে, যা জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখবে না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এবং দেশের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি নিয়েও গভর্ণমেণ্টকে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এবছরও হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ এবং ভাষার ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের আন্দোলন অনেক জায়গায় প্রবল হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া সরকারকে বাধ্য হয়ে অপর দেশের সঙ্গে এমন কোন চুক্তিপত্র করতে হবে যা দেশের স্বার্থের পক্ষেও অনুকূল নয়। সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, প্রকাশক, দালাল প্রভৃতির পক্ষে এ বৎসরটি বিশেষ শুভ নয়। তাঁদের মধ্যে অনেককে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে।

চতুর্থে মঙ্গল শুক্র ও বৃহস্পতি থাকায় দেশের কৃষি ও ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের বহু পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার চেষ্টা হবে। কিন্তু নানারকম গণ্ডগোলের জন্য তা সুশৃঙ্খলে হয়ে উঠা শক্ত হবে। ভূমি উন্নয়ন, বাগ্‌-নির্মাণ ইত্যাদিতে সরকারের কার্য্যকারিতা খুব বেশী দেখা যাবে এবং তাতে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে। বর্দ্ধিত করভারের জন্য দেশের মধ্যে একটা অশান্তি প্রকাশ পাবে। সরকারকে নানারকম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। সীমানা

নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া বেকার ও বাস্তহারার সমস্যাও নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করবে। পার্লামেণ্টে গভর্ণমেণ্টের বিরোধী দল ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠতে পারে এবং তার জন্য গভর্ণমেণ্টকে নানারকম বিব্রত হ'তে হবে।

চন্দ্র পঞ্চমে থেকে রাহু কেতুর দ্বারা সুপ্রেক্ষিত, কিন্তু তার উপর শনি মঙ্গল ও শুক্রের অশুভ প্রেক্ষা আছে। এতে বোঝা যায় যে শিক্ষার ব্যাপারে নানারকম পরিকল্পনা হবে এবং তার জন্য যথেষ্ট ব্যয়বৃদ্ধিও হবে। কিন্তু সব পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত হওয়া কঠিন হবে। এই যোগ স্ত্রীলোক এবং শিশুদের পক্ষে অনুকূল নয়। শিশুমৃত্যুহার বর্ধিত হ'তে পারে এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর উপর অনেক অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদির সম্বন্ধেও অনেক নতুন পরিকল্পনা হ'তে পারে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের speculation ব্যাপারে অনেক প্রতিষ্ঠানকে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। স্কুল কলেজ বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেও নানারকম গণ্ডগোল দেখা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরোধ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া শিক্ষার অনেক পরিকল্পনা অর্থাভাবে কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

প্রজাপতি ষষ্ঠে থাকায় এবৎসর যানবাহনের দুর্ঘটনায় বহু জীবনহানির আশঙ্কা আছে। ডাক টেলিগ্রাফ রেলওয়ে ইত্যাদির কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষিত হবে এবং কোথাও কোথাও ধর্মঘট ইত্যাদির চেষ্টা হতে পারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার বর্ধিত হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে নানারকম বিচিত্র ব্যাধির বহু প্রাচুর্য দেখা যাবে। দেশে ভূমিকম্প, বিস্ফোরণ এবং অন্য দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি ও প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা আছে।

সপ্তমে রুদ্র ও কেতু থাকায় ভারতের সঙ্গে অন্যান্য শক্তির সম্বন্ধ খুব সোজা ভাবে চলবে না। ভারত সরকার নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নীতির পক্ষপাতী হবেন, কিন্তু সে নিরপেক্ষতাকে কোন কোন বিদেশী শক্তি ভুল বুঝবে এবং তার অপব্যাখ্যা প্রচার করবে। ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশী শক্তির দ্বারা ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা নিন্দা-প্রচার প্রভৃতিতে সরকারকে বিশেষ বিব্রত হতে হবে। অবশ্য রুদ্র সুপ্রেক্ষিত হয়েছে বরুণ ও শনির দ্বারা এবং কেতু সুপ্রেক্ষিত হয়েছে চন্দ্রের দ্বারা—তাতে করে বৈদেশিক শক্তির কাছ থেকে সাহায্য লাভও সম্ভব—বিশেষতঃ আর্থিক ব্যাপারে বিদেশ থেকে ঋণপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সাহায্য স্বার্থপ্রণোদিত হবে। বিদেশীর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি অনেক ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। সপ্তমে রুদ্র থাকায় বিবাহের ব্যাপারে নতুন আইন সাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি করবে; তাছাড়া দেশের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে নানারকম কেলেঙ্কারী, মামলা-মকর্দমা ইত্যাদির সম্ভাবনাও আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, অসামাজিক বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে।

নবমে বরুণ থাকায় এবং তা বুধের সঙ্গে সম্বন্ধ করায় দেশের নৌবল বৃদ্ধি হ'বে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার দেখা যাবে। এ সম্বন্ধে সরকার বিশেষ অবহিত হবেন এবং তাঁদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আলোচনা বৃদ্ধি পাবে এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অনেক প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দেশের তন্ত্র যোগ জ্যোতিষ সম্মোহন প্রেততত্ত্ব ইত্যাদির অনুশীলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং সে ব্যাপারে অনেক আন্দোলন আলোচনা সভা প্রভৃতিও হওয়া সম্ভব। সংবাদপত্রাদিতেও এ সকল সম্বন্ধে আলোচনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

দশমে শনি তুঙ্গী হয়ে থাকায় বিপক্ষ দল যথেষ্ট বলবান হলেও সরকার পক্ষ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করবেন এবং তাতে কতকটা কৃতকার্যতাও লাভ করবেন, কিন্তু অনেক সময় অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট বা দুর্ঘটনায় তাঁদের চেষ্টা ব্যাহত হবে। আর্থিক সমস্যা তাঁদের একটা প্রধান সমস্যা হবে। সরকারী মহলে কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ প্রচার হতে পারে। তাছাড়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধানও হওয়া সম্ভব। তবে এটা ঠিক যে সরকারের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবার চেষ্টার অন্ত থাকবে না।

মোট কথা এ বৎসরও ভারতের জনগণকে একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু আশার কথা এই যে—দেশের সরকার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হবেন এবং একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসার জন্য ও দুর্নীতি দূর করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করবেন।

শেষ দিবসের যাত্রী

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন-মরণ নদীর মোহনায় তরী ভিড়িয়ে কর্ণধার হাঁকে : লগ্ন বয়ে যায়, চলে এস শান্তি পারাবারের যাত্রী।

ওপারে যাত্রা করার যে যাত্রীর সময় হয়েছে উপস্থিত, কর্ণধারের এই আহ্বান শুনে সেই যাত্রীর দেহের মধ্যে জীবাত্মা শিউরে ওঠে। চলে যেতে হবে, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে!

সংসারের গভীরে সহস্র শিকড় প্রথিত হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলতে হবে এই কামনার ও মায়ার সহস্র শিকড়ের বন্ধন? না, না, এ অসম্ভব! জানাকে ছেড়ে অজানার পথে কোন বুদ্ধিমান করবে যাত্রা সুরু!

আবার মধুর কণ্ঠে কর্ণধার ডাক দেয় : চলে এস অমৃত-পথ-যাত্রী; অন্ধকারের দেশ ছেড়ে যাত্রা সুরু কর জ্যোতির দেশে।

আতঙ্কে শিহরিত জীবাত্মা প্রাণপণে আঁখি মেলতে চায়। একটা স্বপ্নভরা অন্ধকার, কে যেন চির-ঘুমের তন্দ্রার—কাজল মাখিয়ে দিয়েছে তার নয়নে।

তার আধ-নিমীলিত আঁখি খুঁজে ফেরে প্রিয়জনদের, ভাল করে দেখে নিতে চায় তার প্রিয়বস্তুকে। তার মনে হয়, এই পৃথিবীর বাতাস আজ বুঝি করেছে ধর্মঘট; নাসা বিস্ফারিত করে সে বাতাসকে বুকের মাঝে গ্রহণ করবার জন্যে চেষ্টা করে আপ্রাণ : কিন্তু তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট এই ধরণীর বাতাসের তহবীল বুঝি ফুরিয়েছে—তাই বাতাস আর প্রবেশ করতে চায় না তার নাসারন্ধ্রে।

ভয়ার্ত্ত যাত্রী কর্ণধারকে শুধায় : কোথায় নিয়ে যাবে মোরে?

জবাব দেয় কর্ণধার : আঁধার থেকে আলোকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কান্নার সরোবর হ'তে হাসির তীরে। একটু ছেদ টেনে কর্ণধার আবার বলে : ভয় থেকে অভয়ে, শোক থেকে অশোকে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে।

যাত্রীর ভাল লাগে না এই সব কথার মর্ম্মার্থ। এই সুন্দর দেহটা, যাকে প্রতিদিন কত যত্নে পালিত করা হয়েছে, কত সুগন্ধী প্রলেপে করা হয়েছে সুরভিত, তাকে ছেড়ে যেতে হবে?......এই পরিজন, যারা রোরুদ্যমান হয়ে অপলক চোখে চেয়ে রয়েছে তার মুখপানে, যাদের মুখের একটু হাসি ফোটাবার জন্যে কোন পরিশ্রমকেই সে জীবনে গ্রাহ্য করেনি, আজ এই মুহূর্তে ছেড়ে যেতে হবে তাদের?...আর এই গৃহটা, যেটার অণুপরমাণুতে মিশে রয়েছে সে—এই গৃহকে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে চির-দিবসের জন্যে? না, না, সে পারবে না, যাত্রী কর্ণধারকে বলে : ফিরে যাও তুমি কর্ণধার, তুমি ফিরে যাও।

জীবনের এক মহা সত্য এই শেষদিনের কথা—মানুষ ভুলে থাকে প্রতিদিন, এই কথা ভেবে কর্ণধারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হাসি-মাখান সুরে কর্ণধার বলে : যাত্রী, ভয় পেও না। স্মরণে আন তোমাদের এক মহাপুরুষের বাণী, "যেদিন তুমি এই সংসারে এসে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে, সেই জন্ম-মুহূর্তে তুমি কেবল একা কেঁদেছিলে, আর সকলে আনন্দে হেসেছিল। আর যেদিন তুমি চলে যাবে সেদিন সকলেই কাঁদবে, একমাত্র তুমিই হাসবে"। সেই হাসবার লগ্ন আজ এসে উপস্থিত হয়েছে। আর দেরী নয়, চলে এস চির-তীর্থ-পথের যাত্রী।

যাত্রীর চোখে নেমে আসছে অন্ধকার—শত অমাবস্যা-রজনীর জমাট অন্ধকার। মাটীর পৃথিবীর আলো অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; বাতাস কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে সে জানে। যাত্রী ককিয়ে কেঁদে উঠে বলে : তুমি ফিরে যাও কর্ণধার, আমি যাব না।

আবার শুচিশুভ্র হাসি ফুটে ওঠে কর্ণধারের ওষ্ঠাগ্রে। হাসির ভাষায় বলে : প্রকৃতির আইনে কোন নিয়ম ভঙ্গ নেই। যাত্রী না নিয়ে আমার তরী কোন দিন ফেরেনি, কোন দিন ফিরবে না। যে জমাট অন্ধকার নেমে এসেছে যাত্রী তোমার নয়নে, ওর পিছনেই ঘুমিয়ে রয়েছে অনন্ত আলো। এই লহমার কান্না পরমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হবে হাসিতে। এস যাত্রী, এস।

যাত্রীর নয়নের অন্ধকার আরও বেড়ে ওঠে। তন্দ্রার ঘোর আবেশে আরও ঘনিয়ে। চৈতন্য শক্তি ডুব দেয় কোন এক অচৈতন্য সাগরে। আঁখিকে সে আর মেলে রাখতে পারে না; রাজ্যের ঘুম ঘনীভূত হয়ে এসে চেপে বসে তার আঁখির পাতায়। তন্দ্রালস একটা আবেশের মধ্যে সব বুঝি হারিয়ে যায়।

কোথা দিয়ে সময়ের কিছু ভগ্নাংশ চলে গেল, যাত্রী তার হদিস পেল না।

...হঠাৎ তার দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল সহস্র শারদ-পূর্ণিমার আলো। অবাক বিস্ময়ে সে চেয়ে দেখে নিজের অলক্ষিতে কখন সে এসে উঠেছে কর্ণধারের তরণীতে!

জীবন নদীর তটের পানে চেয়ে সে দেখলে, ছেড়ে ফেলা কাপড়ের মত তার দেহটাকে ঘিরে পরিজনেরা—বিলাপ করছে। যাত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে সুরু করে শান্তির হাসি, সুখের হাসি, আলোর হাসি......

কূল ছেড়ে তরী এগিয়ে চলে গভীরে। যাত্রীর শ্রবণে প্রবেশ করে না-শোনা মধুর বাঁশীর সুর; আঘ্রাণে অনুভব করে নাম-না-জানা সুগন্ধী কুসুমের সুরভি!

আলোর দেশের পথিক মহানন্দে স্মরণ করে মহাকালকে, জানায় তাঁর চরণে ভক্তিপূত একটী প্রণাম।

দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাফ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম আদান প্রদানের জন্য যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ভারতীয় তারবিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি যে "হিন্দী মর্স কোড" প্রচলিত হইয়াছে তাহার তুলনায় অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কোড বহু গুণে সরল, ব্যবহারিকতার দিক দিয়াও তাহা হিন্দী কোডের অপেক্ষা অনেক উপযোগী—অধ্যাপক বসু এবং অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় উভয়েই ইহা সমর্থন করেন। তথাপি ভারতীয় তারবিভাগ এ সম্পর্কে অনুসন্ধান না করিয়া, ইহার প্রয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নীরব রহিয়াছেন কেন, বুঝা যাইতেছে না।

বিজনবাবুর পদ্ধতি নিতান্ত নূতন নহে, অন্ততঃ সরকার প্রবর্তিত নূতন হিন্দী টেলিগ্রাফ পদ্ধতি হইতে পুরাতন। এই হিন্দী টেলিগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বিজনবাবু তাঁহার প্রণালী ভারত-সরকারের নিকট পেশ করেন। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। তখন এবং তাহারও কিছু পূর্ব হইতে বিভিন্ন সভাসমিতিতে এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিয়া আসিতেছেন, একাধিক স্থলে তিনি যন্ত্র সাহায্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশলও প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৯৫৮ এর ১৯শে আগষ্ট তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তদানীন্তন এ. পি. আই. প্রেরিত একটি সংবাদে বিজনবাবুর উদ্ভাবনের কথা বঙ্গের বাহিরের জনসাধারণ প্রথম জানিতে পারেন। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াও যেন মনে হইতেছে।

১৯৫৮ সালের ১৭ই নভেম্বর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত ইউ. পি. আই. প্রেরিত একটি সংবাদে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের উদ্ভাবন সম্পর্কে তিনটি প্যারাগ্রাফ ব্যাপী বিবরণ দেওয়া হয়। তাহাতে একথা পরিষ্কার মুদ্রিত ছিল যে, "Prof. Bhattacharjee's Scheme for accurate transmission of all messages written in Indian languages through morse code, it is reported, is under consideration of the Government of India.—অর্থাৎ "প্রকাশ যে, ভারতীয় ভাষায় লিখিত যে কোনো সংবাদই মর্স সংকেতের সাহায্যে নির্ভুল ভাবে প্রেরণ করিবার যে পদ্ধতি অধ্যাপক ভট্টাচার্য উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা বর্তমানে ভারতসরকারের বিবেচনাধীন আছে।" বিবেচনা এতদিনে শেষ হইয়াছে আশা করা যায়। সে বিবেচনার ফল কি হইল?

ভারত-সরকার যখন নূতন একটি কোড চালু করিয়াছেন, তখন এই অনুমানই করিতে হয় যে বিজনবাবুর পদ্ধতি কার্যোপযোগী প্রমাণিত হয় নাই। যদি সত্যই তাহা হইয়া থাকে—তো সে কথা ভারত-সরকারের জানানো আবশ্যক। আমরা ভারত সরকারের নিকট এ কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিতে চাই—ভারতসরকার কি অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রণালী বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন তো তাহার ফল কি হইল? ভারতসরকার প্রবর্তিত নূতন হিন্দী টেলিগ্রাফ পদ্ধতির সহিত কি ঐ প্রণালীর তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছে?

তাঁহারা তুলনা করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের দুই একজনের মত উদ্ধৃত করি :

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হিন্দী মর্সকোডের সংকেত সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় উহা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ...ভারতীয় ভাষায় এবং লিপিতে দূরবার্তা আদান প্রদান অবিলম্বে প্রবর্তিত করিতে হইলে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের পক্ষে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রস্তাবিত প্রণালীটি পরীক্ষা করা কর্তব্য। এ প্রণালীর সহিত আন্তর্জাতিক মর্সপ্রণালীর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ, তাহা ছাড়া এই পদ্ধতির আর এক সুবিধা এই যে ইহার সাহায্যে বর্তমান কী-বোর্ড কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়াই ভারতীয় ভাষার সংবাদ টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে আদান প্রদান করা সম্ভব হইবে।"—২২. ৮. ৫২ তারিখে রাষ্ট্রভাষা পরিষদের বক্তৃতায় সভাপতির ভাষণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য টেলিপ্রিন্টার এবং মর্স যন্ত্রসহযোগে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োগ-কৌশল নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি প্রদর্শনী ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার অফিসেই সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র মাসখানেক আগে কটকে (২৩. ১২. ৫২) অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে বহুজনের সম্মুখে মর্সযন্ত্র যোগে ওড়িয়া ভাষায় সংবাদ আদান প্রদান করিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এই পরীক্ষা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ওড়িষ্যার ডাইরেক্টর অফ টেলিগ্রাফ্‌স্ শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক বসু হিন্দী মর্সকোডের নানাবিধ অসুবিধার উল্লেখ করিয়া বলেন যে আন্তর্জাতিক মর্সকোডে, মাত্র ২৬টি সংকেত, আর হিন্দী মর্সকোডে সংকেতের সংখ্যা ১০০। ইহা এই জন্য অস্বাভাবিক রকম জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এ কোড যে ব্যবহার করিবে তাহার পক্ষে আন্তর্জাতিক মর্স কোড ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না। তাহার ফলে হিন্দী মর্স কোডের জন্য এক দল অতিরিক্ত সিগন্যালার নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি হিন্দী মর্সকোডের সহিত তুলনা করিয়া বিজন-বাবুর কোডকে অনেকাংশে অধিকতর উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

১৯৪৯ সালের ২রা মে তারিখে আলিপুর টেলিগ্রাফ স্টোরস্ অ্যাণ্ড ওআর্কশপ্‌স্-এর ডাইরেক্টর শ্রী এস কে কাঞ্জীলাল বিজনবাবুর পদ্ধতি সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও অবধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "...it would mean enhancement of staff and expenditure in case a code is taken up for international communication and another for communication in Indian languages within the dominions of India and as such it would be wise and economical too, if the scheme of Dr. Bhattacharjea was given full consideration.

"আন্তর্জাতিক সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য একটি কোড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় ভাষায় সংবাদ আদান প্রদানের জন্য আর একটি কোড যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে কর্মীর সংখ্যা ও খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এ অবস্থায় ডাঃ ভট্টাচার্যের পদ্ধতির যথাযথ পরীক্ষা করিয়া দেখাই বিজ্ঞোচিত কাজ হইবে, ইহাতে ব্যয় লাঘবও হইবে।"

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা পুনরায় ভারতসরকারকে অনুরোধ করিতেছি।

ডাক ও তার বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নহে সত্য, কিন্তু প্রাদেশিক সরকার আর কিছু না পারিলেও ভারত সরকারকে এই পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গুণের আদর জানেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই উদ্‌ভাবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

(কটক—১৯৫২)

—'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে
দিক-দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে শান্তি-সংগীত বাজে !'—

রৌদ্র-করোজ্জ্বল ৯ই পৌষের সেই পুণ্য-প্রভাতে মেঘ-চিহ্ন-লেশহীন প্রসন্ন আকাশের প্রশান্ত চন্দ্রাতপ-তলে ধ্বনিত হ'ল আহ্বান, অপরূপ সুর-মূর্চ্ছনায় ছড়িয়ে গেল আকাশে-বাতাসে সেই চির-কল্যাণ-মন্ত্র,—

—'কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্ম্মল হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হ'ক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ-কাজে।
স্বরতরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্ব্ব পশ্চিম বন্ধু-সংগম
মৈত্রীবন্ধন-পুণ্য-মন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে !'—

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব উৎকল্প রাজ্যের রাজধানী কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ-প্রাঙ্গণে একদল কিশোরীর কণ্ঠ-নিঃসৃত এই আহ্বান-বাণীর মন্ত্রে সূচিত, হ'ল প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টবিংশতি অধিবেশন। সৌন্দর্য্যের রসরুচি ও সুচারু কারু-নৈপুণ্যে উৎকলবাসীর যে দক্ষতা পাষাণ-শিল্পে একদিন মূর্ত্ত হ'য়ে

...ছিল, আজও তার ধারা যে অব্যাহত আছে তার অন্যতম নিদর্শন ...রের অধিবেশন-মণ্ডপ, প্রবেশ তোরণ এবং সর্বোপরি মঙ্গল ঘট-...নের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত আলপনা বেদীটি। অনাড়ম্বর এই ...বিন্যাসের মধ্যে যে শিল্প সৃষ্টি ও রসচেতনার প্রকাশ আছে, সত্যই ...কথায় তা অপূর্ব্ব! শান্তি-নিকেতন ফেরত এই শিল্প স্রষ্টার প্রতি ...মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই।

ভোরের আলোয় বুক ভ'রে ট্রেণখানা যখন কটক ষ্টেশনে পৌঁচেছিল, ...এই অপরিচিত স্থান সম্বন্ধে মনে কেমন শঙ্কা ছিল। সম্মেলনের ...অতিথির মধ্যে তখনও আমি একা। 'জিপে' ক'রে প্রতিনিধি ...শিবিরে নীত হ'যে সামনেই যাঁর স্বাগত সম্ভাষণ পেলুম, তাঁরই সাহচর্য ...প্রচেষ্টায় আমার কটকে আসা—তিনি আমাদের সদাহাস্যমুখর ...দালাপী সুরেনদা—একবোঝা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকার ...ভারে পীড়িত-হস্ত নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্র সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীসুরেন ...নিয়োগী। মনের মেঘ কাটল এবং তা স্বচ্ছতর হ'ল যখন বন্ধুবর শিল্পী ...দেবজ্যোতিভূষণকে পেলুম প্রতিবেশীরূপে—মানে একহাত তফাতের খাটে।

সময় বেশী ছিল না, তাই সম্মেলনের প্রতিনিধিত্বের অবশ্য করণীয়টুকু ...রে তাড়াতাড়ি তৈরী হ'যে ছুটলুম অধিবেশন মণ্ডপে। সকালের প্রধান আকর্ষণ সংস্কৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন! যথারীতি পরিচিতি-বক্তৃতার পর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীভি. ভি. গিরি উদ্বোধন করলেন প্রদর্শনীটির। মণ্ডপের কাছেই কলেজের একটি প্রশস্ত হলে প্রদর্শনীর আয়োজন—এই পথটুকুতে একটি আনুষ্ঠানিক মঙ্গলযাত্রার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। ভাললাগা চোখে তখন সবই অপূর্ব্ব। অঙ্গাবরণের বাসন্তী রঙের বসনে নৃত্যচ্ছন্দে সুরের হিল্লোল তুলে একদল কিশোরী চলেছে এগিয়ে—ফুল ছড়িয়ে পথে পথে, তারই পেছনে শ্বেত বসনা গীতিমুখর তরুণীর দল—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দকে যেন নিয়ে চলেছে প্রাচীন ও আধুনিক উড়িষ্যার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির নিদর্শন দেখাতে। পথ ভর' শুধু ক্যামেরার ঝিলিক।

শ্রীগিরি আহ্বান জানালেন সমস্ত সম্প্রদায়কে—যাতে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান ...ই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র ...ঠনের কাজে কুটীর শিল্প ও চারু কলার উন্নতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

প্রদর্শনী-হলে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে ছোটদের হাতে আঁকা ছবিতে ...ঙের খেয়ালী খেলা! পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত যে অনুভূতি রেখায়—আবার কোথাও বা ছোট্ট লেখায়—ধরা পড়েছে সত্যই অপূর্ব্ব! বিচিত্র শিশুরাজ্যের ভাবের চেতনার সে এক অভিনব অভিব্যক্তি।

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের ও প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্প নিদর্শনের ফটো-...গ্রাফটিও মনোরম। তার পরেই হলের বিস্তৃত দেয়াল জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিভাবান শিল্পীর বিভিন্ন ভাবধারায় আঁকা শতাধিক চিত্র। রঙ ও তুলির মাধ্যমে অন্তরের গভীর শিল্প চেতনা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির যে পরিচয় এতে প্রকাশিত, তা খুবই চিত্তগ্রাহী।

উড়িষ্যার আদিবাসীদের নিত্য-ব্যবহৃত খাদ্যবস্তু, উৎসবাদিতে ব্যবহৃত অলঙ্কার, শিরস্ত্রাণ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সম্ভার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সত্যই মুগ্ধ করে মাটিতে গড়া কয়েকটা মনুষ্য মূর্ত্তি! তাদের জীবন্ত ভঙ্গিমা সকলেরই মনে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। এছাড়াও উড়িষ্যার বিভিন্ন কবির হস্তলিখিত কয়েকটা প্রাচীন পুঁথিতে যে সূক্ষ্ম কলা নৈপুণ্যের পরিচয় আছে তাহাও দর্শনীয় বস্তু।

কিন্তু এবারের সম্মেলনে সবচেয়ে যা অভিনবত্ব দাবী করতে পারে তা নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সঙ্ঘের উদ্যোগে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী আয়োজন। সাপ্তাহিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পত্রিকায় প্রায় দুই শতাধিক পত্রিকার সমাবেশ এভাবে আর কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই। মূলতঃ এই প্রদর্শনীটিই দর্শক বৃন্দের সশ্রদ্ধ ও কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবার বেশী। নবীন ও প্রবীণ এখানে এক আসরে সমমর্যাদা লাভ করেছে! কিন্তু একটা ত্রুটি বড় চোখে পড়েছে—কয়েকটা নামকরা পত্রিকার অনুপস্থিতি। খোঁজ নিয়ে জানলুম, তাঁরা নাকি এই সঙ্ঘের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন মনে করেন না। অথবা এই সব তাঁরা আমলেও আনতে চান না। ঘটনাটি দুঃখের। তাঁদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও রসপিপাসুদের প্রয়োজনে অন্ততঃ তাঁদের এতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। আশা কর্ছি, পরবর্তী সম্মেলনে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন দেখতে পাব।

দুপুরে ছিল মূল অধিবেশনের আয়োজন। সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিরাট মণ্ডপ গমগম কর্ছে, নানা রাজ্যের নানা জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশে সেই শুচিশুদ্ধ পরিবেশে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করলেন জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করতে, বলশালী করতে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা। দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে এক সূত্রে গাঁথতে ভাষাই যুগে যুগে বাহনের কাজ করে। এই ভাষার সর্ব্বভারতীয় রূপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ক'রে তিনি আহ্বান জানালেন সাহিত্যিকদের জনমনের সংস্পর্শে সাহিত্যের নবরূপায়ণে ব্রতী হ'তে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে গণ সংযোগ না গড়ে তুলতে পারলে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়।

প্রাণবন্ত সে বক্তৃতায় যে একটা সর্বভারতীয় আদর্শের মনোভাব ও প্রাদেশিক ভাষাগত প্রীতির স্বচ্ছ সুর ছিল, তা শুধু সমাগত বাঙালীদেরই নয়, উপস্থিত নেতৃস্থানীয় উড়িষ্যাবাসীদেরও মুগ্ধ করে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের এটাই বোধহয় মধ্য আদর্শ।

রাতে ছিল 'ছউ' নৃত্যের আসর। উড়িষ্যার এই প্রাচীন সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানটির সঙ্গে অনেকেরই পরিচয়লাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। এই নৃত্যে শারীরিক পটুতার যে কতখানি প্রয়োজন, তা দেখে সকলেই বিস্মিত হয়। কিন্তু একটা জিনিস বড় বিশ্রী লেগেছে। এই প্রাচীন নৃত্যছন্দের সঙ্গে আধুনিক গানের সুর নিয়ে যে 'পিচুড়ী-পাকানো' হয়েছে তা রসিকজনের চিত্তে স্বভাবতই আঘাত দেয়। তাই, ঐ অনুষ্ঠানের সংযোজনায় যাঁরা হিন্দী ফিল্মের চলতি সুর আশা করেননি, তাঁরা কিন্তু হতাশ হয়েছেন। তবে মোটের ওপর এ আসর সবাইকে তৃপ্তি দিয়েছে বলা যায়।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি 'বনফুলের' বক্তৃতাই একমাত্র কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে মনে হয়।

বাঙালীর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যও যে আজ হতশ্রী হয়েছে, অসত্য, অশিব ও অসুন্দরের যে ছায়াপাত হয়েছে সেখানে, তাঁর এ অনুভূত বেদনার বাণী সবাই মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকার করে। কিন্তু আলো কোথায়? কৈ সে পথ, যে পথ আবার আমাদের সত্য শিব ও সুন্দরের সন্ধান দেবে? তাঁর দীর্ঘতম বক্তৃতা সমস্যার গুরুভারে পীড়িত, নেই কোন সমাধানের ইঙ্গিত—আমার ধারণা সেই হতাশাই এই বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ।

ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি আমাদের খুব বেশী যে আগ্রহ নেই, এ কথা সত্য। ঐ দিনই ভারতীয় সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীচিন্তামণি আচার্য্য যে ছোট্ট মন্তব্য করেন, তা লজ্জারই কারণ। তিনি বলেন, অনেক ওড়িয়াবাসী বাংলা ভাষা নিয়ে এম-এ পাশ করেছেন, কিন্তু কোন বাঙালী আজ পর্য্যন্ত ওড়িয়া-সাহিত্যে এম-এ পড়েছেন বলে শোনা যায় নি।

কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যের যে সামান্যতম পরিচয় সেদিন সাহিত্য সভায় পণ্ডিত আর্ত্তবল্লভ মহান্তির বক্তৃতায় পাওয়া গেল, তাতে ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, ওড়িয়া ভাষায় তাঁর বক্তৃতা বুঝতে কোনই কষ্ট হয়নি। ওড়িয়া ও বাংলা সাহিত্যের ভাবগত ও ভাষাগত ঐক্য, বিশেষ করে ওড়িয়া কাব্যে মৈথিলীছন্দের প্রবর্তনা তাঁর ললিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে বেশ একটা ভাবের আবেশই গড়ে তোলেনি শুধু, তরুণ সাহিত্যিকদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। ভাললাগা-চোখই শুধু নয়, ভাল-লাগা মনও ভরপুর হয়ে উঠল। এবারের সম্মেলনে এটাই আমার দুর্লভ প্রাপ্তি বলা যায়।

এদিনের মধ্যাহ্নে মুখর হয়ে উঠল প্রতিনিধি শিবির। সমাগত সভাপতিদের সঙ্গে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের পংক্তি ভোজনের আয়োজন হয়েছিল, তাই সভা ভাঙতে সকলেই এসে উঠলেন সেখানে। প্রতি ঘরেই টুকটাক একটা আলোচনা-সভা বসে গেল, আর অনুসন্ধিৎসু তথ্যলিপ্সুর দল ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরে, ও বৈঠকে।

কথায় কথায় আলোচনা পৌঁছল প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে। ক্ষণিক উত্তেজনার ও মোহের স্থায়িত্ব নিয়ে! ভারী সুন্দর একটা গল্প বললেন সুরে শ্রীদেবেশ দাশ এই প্রসঙ্গে। একবার তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে সুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি দেখতে যান। অগ্ন্যুৎপাতের সময় উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা কাছে যেতে বাধা পান। তাঁরা জোর করেই এগিয়ে যেন ঐ অগ্নিস্রাবের মুখের কাছে। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু লাভার তাপে ফিরতে বাধ্য হন। ঐ সময় রুমাল দিয়ে খানিকটা গরম লাভাকে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর, অগ্নিস্রাব বন্ধ হল, সে লাভাপিণ্ডটুকুও ঠাণ্ডা হল—কিন্তু তার অস্তিত্বকে ঠিক বজায় রাখল ঐ পিণ্ডতে—প্রেমেরও চরম পরিণতি।

সুদীর্ঘ দালানের এপাশ ওপাশে প্রায় ছুশো পাতা পড়ে গেছে, হাস্য ও ব্যঙ্গ-গুঞ্জনে সরস হয়ে উঠেছে সমস্ত পরিবেশ,—ক্যামেরার ক্লিক ধ্বনি এখানেও অপ্রতিহত। আসর কিন্তু মাত্ করে রেখেছেন একা লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্যাল। কি গানে, কি কথায়, কি ব্যঙ্গ টিপ্পনিতে কৌতুক রস-বিতরণে—একাই একশ যেন তিনি। বৈঠকি মানুষ বলতে যে কি বলে, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। শুধু সেদিনই নয়, প্রতিদিনের প্রতিটী ভোজনপর্ব্বে তাঁর অনুপস্থিতি যেন কল্পনা করাও যায় না। রাত্রে যেদিন তিনি বসতেন না, দালানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি সবায়ের খাওয়া তদারক করে বেড়াতেন—খাদ্য-পরিবেশনে কেউ যেন না ফাঁক যায় এও যেমন দেখতেন, রস-পরিবেশনও যাতে সকলের ভাগ্যে সমান হয় এতেও তাঁর দৃষ্টি সমান জাগ্রত থাকত। এক একবার মনে হত, আমরা যেন তাঁরই অতিথি হ'য়ে এসেছি।

সেদিন খাওয়ার পর বনফুলের কাছে তিনি দাবী জানালেন ভাল নাটক লেখার। সময়ের অপ্রচুরতা ছাড়াও 'বনফুল' এ সম্বন্ধে যা মন্তব্য কর্লেন তা সত্যই দুঃখের। তিনি অনুযোগ কর্লেন—নাটক ত লেখা হ'ল, কিন্তু তার যদি ডালপালা ছেঁটে, নামটার একটু অদল-বদল করে, নাট্যকারকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়ে কেউ নিজের নামে সেটা বেমালুম চালিয়ে দেয়, তখন মনের অবস্থা কি সুস্থ থাকে, না পরবর্ত্তী নাট্য-রচনার প্রবৃত্তি জাগে?

অভিযোগ নতুন না হ'লেও, গুরুতর এবং সাহিত্য সমাজে দুর্ভাবনারও। এর কোন বিহিত সত্যিই কি নেই?—বনফুল যে 'রয়ালটী এসোসিয়েশনের' কথা বললেন, যাঁদের দ্বারা লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে সেটার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

আমার কিন্তু তাঁর কাছে দাবী ছিল 'স্থাবরের' পরবর্তী খণ্ডের। বইটা অদ্ভুত ভাল লেগেছিল, তাই তার উৎপত্তি সম্বন্ধেও কৌতূহল মেটালেন তিনি। ডাক্তারী পড়ার সময় 'এনথ্রপলজী'তে এই মানব জগতের ক্রম বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত পান তিনি, যা তাঁকে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু পড়তে প্রবুদ্ধ করে। তাঁ, পাঁচের খণ্ড লেখার মালমশলা সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু সময়াভাব। আশা কর্চ্ছি শীঘ্রই আশা আমার মিটবে।

দুপুরে ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমহতাব মন্তব্য করলেন—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিদেশী ভাষার পরিবর্ত্তে যত অধিক সম্ভব ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত।

বিজ্ঞান শাখার উদ্বোধন ক'রে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ পরিজা বলেন, কেবল আবিষ্ক্রিয়াই বিজ্ঞান-সাধনার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, সেই আবিষ্ক্রিয়ালব্ধ জ্ঞান-বিস্তার তাঁর কর্ত্তব্য। আর সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান-বিস্তারের জন্য বিজ্ঞানের শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত।

অধ্যাপক বসুও এই ঔচিত্যের প্রতি বিশেষ ভাবে জোর দিলেন। তিনি অভিযোগ কর্লেন—পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু বড় বড় জিনিষ স্থানলাভ করেছে, কিন্তু সেখানে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের নেই কোন বিশেষ ব্যবস্থা। বাইরে থেকে আমরা টাকা দিয়ে যন্ত্র আনি, কিন্তু তা দিয়ে মানুষ তৈরী করা যায় না, শিক্ষাই মানুষ তৈরী করে।

এ অভিযোগ যে শোভন, সঙ্গত ও সর্বোপরি স্থানোপযোগী হ'য়েছে, এতে আর কারো দ্বিমত নেই।

সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে আমন্ত্রণ ছিল চা-পানের। এবারের সম্মেলনের সাফল্যের মূলে উড়িষ্যা সরকারের সাহায্য ও প্রেরণা যে কতখানি প্রয়োজন মিটিয়েছে তা সত্যিই হিসেব করা যায় না। অর্থ-সাহায্য ত গৌণ, সম্মেলনের আগের দিন রাতে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী খবর নিয়ে গেছেন—আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কি না। তা ছাড়াও প্রতি অধিবেশনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মালতী চৌধুরী উপস্থিত থেকে যে প্রেরণা জুগিয়েছেন, তা সত্যিই মহার্ঘ। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়েই মানুষের আসল বিচার হয়। একদিন দেখা গেল, তাঁর ব্যবহৃত গাড়ীগুলি সম্মেলনের কাজে লেগেছে, তিনি রিকশায় মেয়েকে নিয়ে চলেছেন। 'ছউ' নাচের আসরে হঠাৎ একটা আলোর 'বাল্ব' ভেঙে পড়ল, কাঁচের খণ্ড ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—নাচ চলেছে, অথচ কেউই এগোয় না সেগুলো সরাতে। তখন তিনি আসন থেকে উঠে ছড়ানো কাঁচগুলো খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগলেন। এত সুন্দর ও সহজ মানুষ তিনি।

ঐতিহাসিক বড়বাটী কেল্লার মধ্যে শ্রীচৌধুরীর প্রাসাদ-অঙ্গনে বিশাল মাঠে চা-পানের আয়োজন হয়েছে। সকলকেই যুক্তকরে ও সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পত্নী। সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভাবে আলাপ কচ্ছেন তাঁরা—কিন্তু এ শুধু মামুলীপনা নয়, অন্তরেরও যেন যোগ রয়েছে। সন্দেহের অবকাশ নেই তাঁদের আন্তরিকতায়। একপাশে রয়েছে পাঁচশ বছর আগেকার রাজা মুকুন্দ দেওয়ের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, তার রাণীর স্নানের জন্য নির্মিত সংলগ্ন জলাশয়টি এখনও বর্তমান। সামান্য অবকাশে যেটুকু দেখা যায় দেখলুম।

খোলা মাঠের মধ্যেই সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে সমাগত অতিথিবৃন্দের অভ্যর্থনায় নাচ গানের আয়োজন কর্তেও ত্রুটি হয় নি। ছোট্ট মেয়ে সাধুজার নাচ সত্যিই বড় ভাল লাগল। উপমন্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তীমঞ্জরী দেবীর কাছে শুনলুম, এ নাচ তাকে কেউ শেখায় নি, আপনিই শিখেছে। মেয়েটির এ নাচ শেখার ইচ্ছে, কিন্তু—

কিন্তুর পর তিনি যা বললেন তা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। যে ঘটনায় আমাদের দেশে বহু প্রতিভাই প্রকাশের আগে বিলুপ্ত হয়েছে। অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী শুনে ঘাড় ফিরিয়েই দেখি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। শুধু তিনিই ত নন, প্রত্যেকেই স্বীকার কর্লেন মেয়েটির অদ্ভুত প্রতিভা।

ওখান থেকে সোজা যেখানে যাত্রা—সেখানে কলকাতার 'অঙ্গীরা পরিষদ' কর্তৃক বাংলার সংস্কৃতিমূলক নাচ গানের আয়োজন ছিল।

প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধা দেখার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছিল, তাঁরা যে তা যথাযথ পালন করেছেন, এ অভিমত প্রায় সকলেরই। যখনই যে ভাবে যা কিছুর প্রয়োজন হয়েছে, তা মেটাতে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে এসেছেন। সত্যিই এ আতিথেয়তা ভোলার নয়। এর জন্যে শুধু কার্যকরী সমিতিই নয়, প্রতিটি কর্মী প্রশংসার দাবী রাখেন।

প্রতিদিনের প্রতিটী অধিবেশনে যাঁরা সঙ্গীতের ছন্দে বক্তৃতার একঘেয়েমীত্ব দূর করার প্রয়াসী ছিলেন তাঁদের কাজও সুচারু হয়েছে। শুধু সঙ্গীতের সুরই নয়, বিভিন্ন শাখায় তার মনোনয়নও উচ্চস্তরের। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী কবিদের রচিত সঙ্গীতলহরী অনুষ্ঠানের মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এই সব কারণেই কি, অথবা দর্শনের কঠিন তত্ত্বে মনঃসন্নিবেশ করা কঠিন বলে সেদিনকার প্রথম অধিবেশন দর্শনশাখায় লোকসমাগম অত্যন্ত কম হ'ল। 'মাইক' এসে পৌঁছয় নি তখনও, প্রয়োজনও ছিল না তার তেমন, সামনে চেয়ার পেতে বসে সভাপতি ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র তাঁর অভিভাষণ পাঠ কর্লেন। বর্তমান বিশ্বে ভারতীয় দর্শনের স্থান যে কত উচ্চে—এটাই তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাঁর মতে আজকের জগতে বিজ্ঞান যদিও সমস্ত শক্তির উৎস, তবুও তার আধিপত্যই। তাঁর কথায়, 'বিজ্ঞান খুব ভাল ভৃত্য, কিন্তু মনের হিসাবে মোটেই ভাল নহে'—। মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট কচ্ছে, আর তাই বিশ্ব-মানবতা আজ আর্ত, মুমূর্ষু; এখন ভারতীয় দর্শনকেই এই শক্তি-চালনার ভার গ্রহণ করতে হবে।

ঠিকই। প্রতিদিন রাশি রাশি এটম ও হাইড্রোজেন বোমা গোপনে তৈরী করে মুখে যাঁরা শান্তির বাণী কপচাচ্ছেন, তাঁদের মর্মান্তিক দেওয়া দরকার যে জগতে একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদই পারে পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি আনতে।— যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

বৃহত্তর বঙ্গশাখায় শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশ সভাপতিত্ব করলেন। ছোট্ট খাট্টো নিটোল মানুষটি সহজ যখন বক্তৃতার মধ্যে আবেগের উচ্ছ্বাসে গর্জে উঠছিলেন, মুগ্ধ হবার ওতে কারণ ছিল এই যে—তিনি যা বলছিলেন তা শুধু বাণী নয়, অন্তরের অনুভূত বেদনা। শুধু পাণ্ডিত্যের ঝাঁজে আড়ষ্ট নয়, অন্তরের নিগূঢ় অভিব্যক্তি। তিনি ঘোষণা কর্লেন—বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় বাঙালী কোথাও প্রবাসী নয়; যেখানে বাঙালী আছে, সেটাই তার আপন ঠাঁই। যোধপুরের শাখা নিখুঁতে বোঝাতে হ'য়ে প্রবাসী হ'য়ে যায় নি—সেখানের মাটিই সে আপন করে নিয়ে ছড়িয়েছে কবিতাশুর আশা, বিশ্বাসের ভাষা। সিংহল ও ভারত উভ জায়গারই সে হয়েছে আপনজন।

বৃহত্তর বঙ্গের সাধনায় এর চেয়ে বড় উপমা আর কি আছে?—বর্তমান যুগসঙ্কটে বাঙালীর এই দুরবস্থার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। এই যুগসমস্যাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানিয়ে বলেন—'বৃহত্তর বঙ্গ একটা ভৌগলিক সীমা নয়, বৃহত্তর বাঙালী একটা মনীষার প্রতীক। সে প্রতীক আজ আমাদের হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। যাতে সেই পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সম্পদ ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে দেউলিয়া করে না—দেখ সে দায়িত্ব আজ নিখিল ভারতীয় পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের।'

মহিলা শাখার সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীমতী লীলা মজুমদার ভারতের মেয়েদের পুরোপুরি ভারতীয় হ'য়ে উঠতে উপদেশ দেন, বেশভূষা, রুচি

সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্যে কোন কিছুতেই যেন আপন ঐতিহ্য না হারায়। আমাদের দেশের নারীচরিত্রের আদর্শকেও না ভুলতে অনুরোধ করেন।

মহিলা অধিবেশনে স্থানীয় বহু মহিলা এসেছিলেন, হঠাৎ দেখি তার পরেই ছোট ছেলেদের ভীড়। স্বপনবুড়োর কথা তারা শুনতে চায়। শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) জানালেন, শিশুসাহিত্য রচনা করতে হ'লে তাদের সঙ্গে আগে মিশে তাদের মনের কথা ঠিক জেনে তাদেরই কথা লিখতে হবে। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, অথচ তাদের গড়ে তুলতে যে সাহিত্যের প্রয়োজন, তাই রয়েছে উপেক্ষিত হ'য়ে।

এই শাখা-অধিবেশনের সময়টুকুর মধ্যে কয়েকটি ছেলেমেয়ের গান ও আবৃত্তির ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

এরপর একেবারে সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সঙ্গীতশাখার সভানেত্রী হলেন ডাঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়। তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবন গঠনে সঙ্গীতের ব্যাপক উপযোগিতার কথা বললেন। ভাষণের মধ্যে মধ্যে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যাও করছিলেন।

কিন্তু আগেও বলেছি, এবারও বলছি—বক্তৃতা যত দীর্ঘ হবে, শ্রোতারা গ্রহণ করবে তত কম। পরবর্তী সম্মেলনে প্রত্যেকেরই বক্তৃতার আগে থেকে একটা সময় বেঁধে দেওয়া উচিত। নইলে ভাল জিনিসও একঘেয়ে হওয়ায় গ্রহণ করা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্ন্যাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসপরিবেশনায় সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন ও সুললিত কণ্ঠের গানে সব মুগ্ধ করেন।

সাহিত্য সম্মেলনের মিলন-উৎসব এখানেই শেষ। পরের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত ও মামুলী। সেই অনুষ্ঠানে মূল সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সম্মেলন হ'ল। কার্য্যকরী সমিতি গঠন, আগামী বছরের জন্য শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশকে সভাপতি মনোনয়ন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এলাহাবাদ থেকে দিল্লীতে সম্মেলনের স্থায়ী কার্য্যালয় অপসারণ। 'প্রবাসী' নাম বদলে 'নিখিল ভারত' নাম দেওয়া আগেই হয়েছে—আসছে বছর থেকে তা কায়েমী হবে।

সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে সকলে বললেন, যদিও শেষ করার সময় চলে গেছে, কিন্তু শেষ করতে যেন ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ যেন ধরে রাখি, আরো কিছু মুহূর্ত কাটাই এমনি সবার মাঝে।

এ শুধু তাঁরই নয়, সমাগত সকলেরই বোধহয় মনের কথা।

পরদিন প্রতিনিধিদের উটির কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যাত্রীদের মধ্যে এক দলের উদ্যোগ আয়োজন এবং অন্যদের যাত্রা হবে ভিন্নমুখী, তাঁরাও তা নিয়ে ব্যস্ত হলেন।

একা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্ধুর লাগি' আজি ঘুরে' সারা দেশটা
হায় গো সন্ধ্যায় গৃহে ঘরে ফিরলাম,
দেখিলাম—মর্ত্ত্যের স্বার্থের ভালবাসা
এরি লাগি' বৃথা হায় নিজ বুক চিরলাম!
সঙ্গীর লাগি আমি ঘুরে' সারা সংসার
বন্ধুর বেশে হায় দেখিলাম খল গো,
নির্জন বনপথে জীবনের সন্ধ্যায়
ঝর্ঝরি একা তাই চলি কলকল গো।
লাখ লাখ কোটি নর আছে বটে মর্ত্ত্যে
ভদ্রের বেশে তারা ছদ্ম যে দুর্জন,
তাহাদের কাছে হায় হৃদয়ের ভিক্ষায়
বঞ্চিত হয়ে—শেষে বরিয়াছি নির্জন।
জনমহারণ্যেতে ঘুরে' ঘুরে' দেখলাম
লক্ষেতে আছে নর, হয়তো বা একটি,
এসেছিল পৃথিবীতে যারা সব মহাজন
মুছে' গেছে তাহাদের পদাঙ্ক-রেখ্‌টি।

মানুষ যে কেহ নাই কারে ভালোবাসবে
হৃদি দিয়ে কেবা আজ হৃদয়কে বাঁধবে?
প্রেম দিয়ে কেবা হায় আজি প্রেমভিক্ষুকে
দরদী যে কেউ নাই দরদে কে কাঁদবে?
তাই আজ নির্জনে চলি নিঃসঙ্গ
ডুবে' দেখিয়াছি এই সংসার-তলরে,
জীবনের যাত্রাতে কেউ কারো সাথী নয়
ওরে মন নির্জনে একা তুই চল্‌রে।
নির্জন-যাত্রাতে আগে ধ্রুব প্রহ্লাদ
সিদ্ধিতে যাত্রার পথ গেছে রঙ্গি',
বক্ষেতে তুলে নেরে সব লাভ লোক্‌সান
নেই কোনো দুঃখরে ভগবান সঙ্গী।
ঐ দেখ্‌ নির্ঝর—কেউ তার সাথী নাই
ছুটিয়াছে একমনে গান গেয়ে চঞ্চল,
তারি মত বাঁধ্‌ ভেঙ্গে আজি এই সন্ধ্যাতে
কেহ নাই—একা তুই—চল্‌ চল্‌—ছল্‌ ছল্‌।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধুমথন
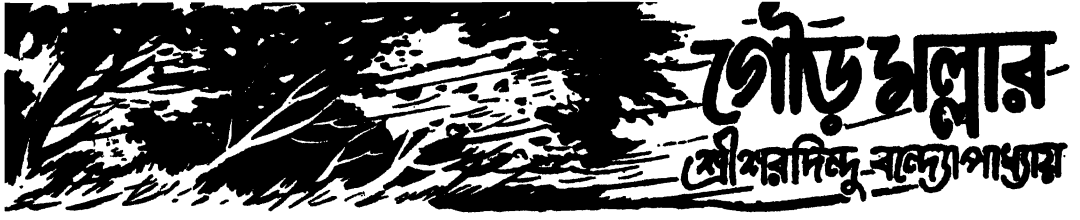
স্থির জলাশয়ের মাঝখানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গচক্র উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; শৈবালদল তালে তালে নাচিতে থাকে, কুমুদ কহ্লার দুলিয়া দুলিয়া হাসে। তারপর আবার শান্ত হয়।

বজ্রের জন্ম-সংবাদ তেমনি ক্ষুদ্র বেতসগ্রামে আন্দোলন তুলিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। রাজ-সমাগম এবং রঙ্গনার বিবাহের ইতিহাস ইতিপূর্বেই পুরাণো হইয়া গিয়াছে, বজ্রের জন্মেও অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব কিছু নাই। তাই এই ঘটনা লইয়া গ্রামের জল্পনা-কল্পনা শীঘ্রই শান্ত হইল।

গোপার মৃত্যুর পর গ্রামরমণীদের মন রঙ্গনার প্রতি অনুকূল হইয়াছিল; কিন্তু একটি কারণে এই অনুকূলতা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল না। যে মেয়েরা রঙ্গনার সঙ্গে সখিত্ব স্থাপন করিতে আসিল, রঙ্গনা তাহাদের সহিত সরলভাবে হাসিয়া কথা কহিল, তাহাদের ছেলে দেখাইল, লজ্জিত নতমুখে তাহাদের রঙ্গ-পরিহাস গ্রহণ করিল; কিন্তু তবু গ্রামের মেয়েরা অনুভব করিল রঙ্গনার গোটা মনটা যেন উপস্থিত নাই; যেন প্রত্যক্ষ জগতের সহিত তাহার নাড়ীর যোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সর্বদাই যেন সে অন্যমনস্ক হইয়া আছে, উৎকর্ণ হইয়া আছে, দূরাগত পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন সে একাগ্র তন্ময় হইয়া ছেলের পানে চাহিয়া থাকে তখনও মনে হয় সে ছেলেকে দেখিতেছে না, ছেলের মুখে চোখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর একজনের পরিচয়-চিহ্ন খুঁজিতেছে। গ্রামের মেয়েরা বুঝিল, রঙ্গনা থাকিয়াও নাই। রঙ্গনার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল। পূর্বেকার বিদ্বেষভাব ফিরিয়া আসিল না বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টাও আর রহিল না। হংসী যেমন জলে বাস করিয়াও জলের নয়, রঙ্গনা তেমনি নির্লিপ্তভাবে গ্রামে রহিল।

বজ্র বড় হইতে লাগিল। মাতৃক্রোড় হইতে কুটীর-কুট্টিমে নামিল, সেখান হইতে প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ হইতে গ্রামের মাঠে-ঘাটে। মাতৃস্তন ছাড়িয়া গো-দুগ্ধ, তারপর অন্ন। বজ্রের প্রকৃতি যে সাধারণ শিশু হইতে পৃথক, তাহা তাহার জন্মকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল। সে বেশী কাঁদে না, আঘাত লাগিলে বা ক্ষুধা পাইলেও কাঁদে না। যখন কথা বলিতে শিখিল তখনও অধিক কথা বলে না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে। সে চঞ্চল নয়, চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে এবং অন্য শিশুদের ছুটাছুটি লক্ষ্য করে, কিন্তু অকারণে ছুটাছুটি করে না। যখন একাকী থাকে তখন একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, কি চিন্তা করে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না।

অথচ সে মেধাবী; তাহার মন সর্ববিষয়ে সজাগ ও সচেতন। দেহের দিক দিয়া যেমন সমবয়স্ক বালকদের তুলনায় অধিক বৃদ্ধিশীল, মনের দিক দিয়াও তেমনি। বজ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স, চাতক ঠাকুর তখন তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। গ্রামের কেহই লিখিতে পড়িতে জানিত না, চাতক ঠাকুরও না। মুখে মুখে শিক্ষা। চাতক ঠাকুর তাহাকে মুখে মুখে অঙ্ক শিখাইলেন; কড়া গণ্ডা পণ, যোগ বিয়োগ হরণ পূরণ। বজ্র দ্রুত শিখিল এবং যাহা শিখিল তাহা মনে করিয়া রাখিল।

চাতক ঠাকুর যখন বজ্রকে শিক্ষা দিতেন রঙ্গনা কাছে বসিয়া থাকিত। কখনও গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর মন দিয়া শুনিত, কখনও সব ভুলিয়া তন্ময় দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত।

বজ্রের বয়স সাত-আট বছর হইলে চাতক ঠাকুর তাহাকে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে শিখাইলেন। বজ্র একেই আত্ম-সমাহিত শান্তস্বভাব বালক, সে ছিপ লইয়া সারাদিন ময়ূরীর তীরে বসিয়া থাকিত; সন্ধ্যার সময় মাছ লইয়া হাসিমুখে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইত। ইহার পর এমন একদিনও

যাইত না যেদিন রঞ্জনাকে নিরামিষ খাইতে হইত। কোনও দিন পুঁটি-খয়রা, কোনও দিন শোলের পোনা, কোনও দিন মৌরলা।

মাছ ধরা ছাড়া আর একটি কাজ বজ্র ভালবাসিত, সাঁতার কাটা। সাঁতার কাটিতে কেহ তাহাকে শিখায় নাই, সে নিজেই শিখিয়াছিল। একদিন সে মৌরীর তীরে একাকী খেলা করিতে করিতে উঁচু পাড় হইতে জলে পড়িয়া যায়। সাহায্য করিবার কেহ নাই, সে নিজেই হাত-পা ছুঁড়িয়া তীরে উঠিয়াছিল। তারপর সাঁতার শেখা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। ইচ্ছা হইলেই সে সাঁতার কাটিয়া মৌরী এপার ওপার হইত, বলিষ্ঠ বাহুর তাড়নে নদীর জল তোলপাড় করিত।

ভিল্ল জাতীয় এক বনচর মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। উত্তরের জঙ্গল হইতে হরিণ বা ময়ূর মারিয়া গ্রামে লইয়া আসিত; মাংসের বিনিময়ে গুড় ও তণ্ডুল লইয়া যাইত। মসীকৃষ্ণ দেহের বর্ণ, পরিধানে পশুচর্ম, কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, মুখে সরল হাসি। ধনুক কাঁধে লইয়া সে যেদিন বজ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল, বজ্র অপলক-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বজ্রের বয়স তখন নয় দশ বৎসর, ভিল্লকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।

ভিল একটি হরিণ মারিয়া আনিয়াছিল। গ্রামের কয়েকজন হরিণ কিনিয়া লইল, পরিবর্তে ভিল্লকে গুড় ও শস্য দিল।

ভিল যখন ফিরিয়া চলিল বজ্রও তাহার পিছন পিছন চলিল। গ্রামের উত্তরে বাথান পার হইয়া ভিল পলাশবনে প্রবেশ করিল, তখনও বজ্র তাহার পিছন ছাড়িল না। ভিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'কি চাও?'

বজ্র বলিল—'তুমি কি করে হরিণ মারো?'

ভিল হাসিয়া উঠিল—'এই তীর-ধনুক দিয়ে।'

তীর-ধনুক কিছুক্ষণ উৎসুক চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বজ্র বলিল—'ও দিয়ে হরিণ মারা যায়?'

ভিল আবার হাসিল। শুভ্রকান্তি বলিষ্ঠ দেহ বালককে তাহার ভাল লাগিল। সে বলিল—'মারা যায়। দেখবে?'

অদূরে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়া ছিল। ভিল ধনুতে তীর সংযোগ করিয়া পুষ্পগুচ্ছের প্রতি লক্ষ্য করিল; আকৃষ্ট ধনু হইতে টঙ্কার শব্দে তীর ছুটিয়া গেল। র[illegible] কিংশুকগুচ্ছ মাটিতে পড়িল।

ভিল ফুলের গুচ্ছটি বজ্রের হাতে দিল, তারপর ফি[illegible] তীর তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বনের পথে চলি[illegible] কিছুদূর গিয়া ভিল দেখিল তখনও বজ্র তাহার পশ্[illegible] আসিতেছে। সে বলিল—'আবার কি?'

বজ্র বলিল—'আমাকে শেখাবে?'

ভিল বলিল—'শেখাতে পারি। কিন্তু তুমি আ[illegible] কি শেখাবে?'

বজ্র চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি তোমাকে বঁড়শি [illegible] মাছ ধরতে শেখাব।'

ভিল হৃষ্ট হইয়া বলিল—'আচ্ছা। এবার [illegible] তাড়াতাড়ি আসব। তোমার জন্যে নতুন তীর ধনুক [illegible] করে আনব।'

কিংশুক গুচ্ছটি লইয়া বজ্র ছুটিতে ছুটিতে কুটীরে ফি[illegible] আসিল। এত আহ্লাদ ও উত্তেজনা তাহার জীবনে প্রথম। মা'কে সম্মুখে পাইয়া সে দুই বাহু দিয়া মা[illegible] গলা জড়াইয়া ধরিল। রঞ্জনা তাহার মুখ তুলিয়া ধ[illegible] বলিল—'কি রে!'

লজ্জা পাইয়া বজ্র একটু শান্ত হইল; মায়ের চুলে[illegible] ফুলগুলি গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—'আমি তীর[illegible] শিখব।'

রঞ্জনা ছেলের মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া বি[illegible] বেদনানন্দভরা চোখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। [illegible] চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু যেন সম্পূর্ণ চলিয়া যায় ন[illegible] নিজের খানিকটা রঞ্জনার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়া[illegible] আবার সে আসিবে, যত বিলম্বেই হোক আবার সে ফি[illegible] আসিবে। রঞ্জনার প্রতীক্ষা বিফল হইবে না।

যারা সংসারী তাহাদের যৌবন অধিক দিন থাকে[illegible] কিন্তু রঞ্জনা সংসারের ফাঁদে ধরা দেয় নাই, [illegible] অন্তরের কল্পলোকে বাস করিয়াছে; তাই ব[illegible] নখরাঘাত তাহার অঙ্গে লাগে নাই। এখনও তা[illegible] দেখিলে মনে হয়, সে নববধূ; অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বা[illegible] মধু। দশ বৎসর পূর্বের সেই একটি হৈমন্তী-রজনী তাহার রূপ-যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, [illegible] সে আর একটি দিনও বাড়ে নাই।

কিন্তু কালচক্র ঘুরিতেছে। কাহারও পক্ষে মন্থর, কাহারও পক্ষে দ্রুত। রঙ্গনার প্রতীক্ষায় এখন আর ত্বরা নাই, অধীরতা নাই। কিন্তু বজ্রের জীবনে এই প্রথম এক নূতন আকর্ষণ আসিয়াছে, তাহার স্থির স্বভাবকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কৈশোরের স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতায় সে সারাদিন বনের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ায়; মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভাবে, কাল নিশ্চয় ভিল আসিবে।

প্রায় এক মাস পরে ভিল আসিল। নূতন তীরধনুক পাইয়া বজ্রের আনন্দের সীমা নাই। ভিল তাহাকে হাতে ধরিয়া তীর ছুঁড়িতে শিখাইল; কি করিয়া তীরের পিছনে পুঙ্খ লাগাইয়া তীরের গতি সিধা করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিল। পরিবর্তে বজ্র ভিলকে বড়শি দিল এবং নদীতে মাছ ধরিবার কৌশল শিখাইল। দিনের শেষে বিদ্যার আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হইলে ভীল মহামূল্য বড়্‌শি লইয়া চলিয়া গেল। আর বজ্র সে-রাত্রে তীর ধনুক পাশে লইয়া শয়ন করিল।

অতঃপর বজ্র উত্তরের বনে মৃগ অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমে তাহার লক্ষ্য স্থির হইল; সে ময়ূর মারিল, হরিণ মারিল, উড়ন্ত পাখী তীর দিয়া মাটিতে ফেলিতে সমর্থ হইল। তারপর ভিল যখন মাঝে মাঝে আসিত, বজ্রের অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ দেখিয়া প্রশংসা করিত, আরও নূতন কৌশল শিখাইয়া দিত।

এইরূপ বিচিত্র পথে বজ্রের শিক্ষাদীক্ষা অগ্রসর হইল। দেহ ও মন দ্রুত পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ঈষদ্‌গম্ভীর সঙ্গাকাঙ্ক্ষাহীন শান্ত স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

বজ্রের যখন বারো বছর বয়স তখন একটি ব্যাপার ঘটিল। গ্রামে মধু নামে এক বালক ছিল; কুঞ্চিতশির বৃহৎমুণ্ড কৃষ্ণকায় বালক, বয়সে বজ্র অপেক্ষা দুই এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। মধু'র স্বভাব অতিশয় দুরন্ত ও কলহপ্রিয়; তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিতে পারিত না। মধু তাহার সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠ বালক-বালিকাদের উপর অশেষ দৌরাত্ম্য করিত। তাহার দেহও বয়সের অনুপাতে বলিষ্ঠ, কেহ তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিত না।

বজ্রের সহিত গ্রামের কোনও বালকেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মধু'রও ছিল না। মধু মনে মনে বজ্রকে ঈর্ষা করিত, কিন্তু তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না। দূর হইতে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে বজ্রকে ব্যঙ্গভরে 'রাজপুত্তুর' বলিয়া উল্লেখ করিত। বজ্র কদাচিৎ শুনিতে পাইলেও তাহা গায়ে মাখিত না। রাজপুত্র সম্বোধনে কোনও গ্লানির ইঙ্গিত আছে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

মধু'র অত্যাচার উৎপীড়নের বিশেষ পাত্রী একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম গুঞ্জা। গুঞ্জা মধু'র দূরসম্পর্কের ভগিনী, শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া সে মধুদের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিল। গুঞ্জার বয়স সাত বৎসর, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আরও অল্পবয়স্ক মনে হইত। ক্ষীণাঙ্গী, মলিন তামার ন্যায় বর্ণ; মুখখানি তরতরে, চোখ দুটি বড় বড় ভাসা-ভাসা। কিন্তু চোখে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। এই পর-পালিতা অনাদৃতা মেয়েটিকে মধু নানাভাবে নিগ্রহ করিত। সে ছিল মধু'র আজ্ঞাকারিণী দাসী; রাগ হইলে মধু তাহাকে মারিত, চুল ছিঁড়িয়া দিত। গুঞ্জা নীরবে সব সহ্য করিত; মধু'র ক্রোধ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মধু তাহার অনুচর বালকবালিকাদের লইয়া মোরীর উঁচু পাড়ের উপর খেলা করিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে ঝগড়া হইল; মধু গুঞ্জাকে সম্মুখে পাইয়া মারিতে আরম্ভ করিল, তারপর তাহার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাড়ের কিনারায় লইয়া গিয়া ঠেলা দিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল।

বজ্র অদূরে মোরীর জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া ছিল। সে জলে লাফাইয়া পড়িয়া গুঞ্জাকে টানিয়া তুলিল। গুঞ্জার একটা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে; ভয়ে ও যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থা। সে এক হাতে বজ্রের গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্র তাহাকে তুলিয়া লইয়া পাড়ের উপর উঠিয়া আসিল। দলের ছেলেমেয়ে অধিকাংশই পালাইয়াছিল, দুই একজন মাত্র ছিল। বজ্র গুঞ্জাকে মাটিতে নামাইয়া মধু'র দিকে অগ্রসর হইল। তাহার গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন। সে মধু'র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মধু হটিল না, ক্ষুদ্র আরক্ত চোখে হিংস্রতা ভরিয়া বিদ্রূপ করিল—'রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর!'

বজ্র মধু'র গালে একটি বজ্রসম চড় মারিল।

তারপর যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাকে মল্লযুদ্ধ বলা চলে, আবার ষাঁড়ের লড়াই বলিলেও অন্যায় হয় না। মধু বয়সে বড়, তার উপর বন্য স্বভাব; সে নখদন্ত দিয়া শ্বাপদের ন্যায় লড়াই করিল, বজ্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজ্রের সহিত পারিল না। বজ্রের দেহে পিতৃদত্ত অটল শক্তি ছিল, তাহাই জয়ী হইল। একদণ্ড যুদ্ধের পর মধু ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া আর উঠিল না, তাহার দেহে আর নড়িবার শক্তি নাই। বজ্র তখন যুদ্ধের মদান্ধতায় জ্ঞানশূন্য, সে মধু'র একটা পা ধরিয়া টানিতে টানিতে নদীর পাড়ের দিকে লইয়া চলিল। উদ্দেশ্য, জলে ফেলিয়া দিবে।

ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল,চাতক ঠাকুরও আসিয়াছিলেন। তিনি গিয়া বজ্রের হাত ধরিলেন। বলিলেন—ছেড়ে দাও। যথেষ্ট হয়েছে।

বজ্র মধুকে ছাড়িয়া দিল। চাতক ঠাকুর তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া গেলেন। গুঞ্জা অদূরে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হয়েছিল?'

বজ্র ও গুঞ্জা ঘটনা বিবৃত করিল। সকলে শুনিয়া বজ্রের সাধুবাদ করিল। মধু'র উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য কেহই তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তাহার শাস্তিতে সকলে সন্তুষ্ট হইল।

গুঞ্জার কান্না কিন্তু থামে না। চাতক ঠাকুর তাহাকে ও বজ্রকে লইয়া দেবস্থানে গেলেন; বুড়ীর গুয়া পান পাতা দিয়া গুঞ্জার ভাঙ্গা হাত বাঁধিয়া দিলেন। হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন—'মধুমথন'। বজ্র, আজ থেকে তোমার একটা নাম হল মধুমথন।

বজ্র কিন্তু হাসিল না। তাহার রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে কিন্তু মনের উষ্ণতা দূর হয় নাই। সে বলিল—'ও আমাকে রাজপুত্তুর বলে কেন?'

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন, তারপর সহজ সুরে বলিলেন,—'তুমি রাজার ছেলে, তাই রাজপুত্র বলে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বজ্র প্রশ্ন করিল—'আমার পিতা কোথায়?'

চাতক ঠাকুর তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন 'বজ্র, তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমার পিতৃপরি এখন জানতে চেও না। যখন বড় হবে, জান পারবে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল,—'কবে বড় হব? কত জানতে পারব?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন—'তোমার যখন কুড়ি বছর ব হবে তখন জানতে পারবে। তোমার মা তোম বলবেন।'

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না: কথাটি মনের মধ্যে স করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর বজ্র গুঞ্জার হাত ধরিয়া নিজ কুটীরে লই গেল: মা'কে বলিল—'মা, আজ থেকে গুঞ্জা আমাদে কাছে থাকবে।'

রঙ্গনা দুই হাত বাড়াইয়া গুঞ্জাকে কোলে টানিয়া লইল সে-রাত্রে রঙ্গনার এক পাশে বজ্র, অন্য পাশে গুঞ্জা শ করিয়া ঘুমাইল।

গুঞ্জা বজ্রের গৃহেই রহিয়া গেল। তাহার মাতুল আপ করিল না: চাতক ঠাকুর ব্যাপারটিকে সহজ ও স্বাভাবি করিয়া দিলেন।

আদর যত্ন ও ভালবাসা পাইয়া গুঞ্জার শ্রী দিনে দি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগি মলিন তামার মত বর্ণ উজ্জ্বল মার্জিত তাম্রবর্ণে পরিণত হই চোখের শঙ্কাকাতর দৃষ্টি দূর হইল।

একদিন কুটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া বজ্র ধনুকে নূতন ছি পরাইতেছিল, গুঞ্জা আসিয়া পিছন হইতে তাহার গ জড়াইয়া ধরিল; কানে কানে বলিল—'মধুমথন।'

বজ্র তাহাকে টানিয়া সম্মুখে আনিল—'কি বললে?'

গুঞ্জা বলিল—'আমি তোমাকে মধুমথন ব ডাকব।'

বজ্র হাসিল। বলিল—'আমিও তোমাকে অন্য ডাকবো, গুঞ্জা বলে ডাকব না।'

উৎসুক চক্ষে চাহিয়া গুঞ্জা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ডাকবে?'

গুঞ্জার মেঘবরণ চুল ধরিয়া টানিয়া বজ্র তাহার ক কানে বলিল—'কুঁচবরণ কন্যা।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যকাম

বজ্র যখন তীরধনুক লইয়া উত্তরের বনে শিকার করিতে ইত যখন গুঞ্জাও কদাচ তাহার সঙ্গে থাকিত। দুইজনে াধরি করিয়া অরণ্যের রৌদ্র ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, াছুটি করিয়া খেলা করিত। গুঞ্জা সঙ্গে থাকিলে শিকার হইত না। গুঞ্জা শিকারে যাইতে ভালবাসে কিন্তু মৃত পক্ষী দেখিলে তাহার কান্না আসে। তাহার কান্না দেখিয়া প্রথম প্রথম হাসিত ; কিন্তু তারপর তাহার সম্মুখে প্রাণী া করিতে আর তাহার মন সরিত না।

এইভাবে কৌমার অতিক্রম করিয়া তাহারা একসঙ্গে বনে পদার্পণ করিল। বজ্রের যৌবন-পরিণত দেহ হইল াহার পিতার দেহের প্রতিকৃতি। তেমনই দীর্ঘ প্রাংসার ; বং সাবলীল। হয়তো আরও একটু সুকুমার ; পিতার ৌরুষের উপর মাতার লাবণ্য যেন স্নেহের প্রলেপ দিয়াছে। ার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ স্কন্ধ পর্যন্ত নামিয়াছে ; মুখে গুম্ফের রোমরাজি কজ্জলরেখার ন্যায় মুখের শ্রীবর্ধন করিয়াছে। যখন ধনু স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে দেখিয়া নে হইত সে মহাভারতের অর্জুন, যে অর্জুন পাঞ্চাল রাজ-ায় মৎস্য চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছিল সেই ভস্মাচ্ছাদিত তরুণ ি।

বজ্রের পাশে গুঞ্জাকে দেখাইত- শুভ্র রাজহংসের পাশে বরণী চক্রবাকীর ন্যায়। শুধু নব যৌবনের শ্রী নয়, মনের ও ভালবাসা গুঞ্জাকে লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। শোরের নিত্য সাহচর্য যে স্নেহ-প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি িয়াছিল, যৌবনের অভ্যুদয়ে তাহাই নিবিড় আসক্তিতে ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই আসক্তির বাহ্য প্রকাশ কিছু া না। দুইজনে প্রায় সর্বদা এক সঙ্গে থাকিত, দুইজনেই নিত তাহাদের জীবন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া াছে ; কিন্তু তবু কোনও দিন তাহাদের আচরণে নও বিহ্বলতা প্রকাশ পায় নাই। একটিবার কেহ মুখ টয়া বলে নাই। আমি তোমায় ভালবাসি।

কেবল একবার নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহারা িতে পারিয়াছিল যে আর তাহারা বালক-বালিকা নয়। কস্মাৎ তাহারা যৌবনের তীক্ষ্ণ-তপ্ত মাদকতার স্বাদ িয়াছিল।

যৌবন প্রাপ্তির পরেও তাহারা একসঙ্গে শিকার করিতে যাইত। একদিন চৈত্র মাসে তাহারা কিরাতবেশী দেব-মিথুনের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের মন্থর বাতাস তরুচ্ছায়াতলে শীতল আবার আতপতাপে উষ্ণ হইয়া বহিতেছে ; পক্ক মধুকের গুরু সুগন্ধ বনভূমিকে আমোদিত করিয়াছে। পত্রান্তরাল হইতে বন-কপোতের ভীরু কূজন বৃন্তচ্যুত পুষ্পদলের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে। মদালস মধ্যাহ্নে বনপ্রকৃতি যেন তন্দ্রাতুরা।

একটি উচ্চ বৃক্ষতলে আসিয়া বজ্র ও গুঞ্জা দাঁড়াইল। ঊর্ধ্ব হইতে ঘন গুঞ্জন ধ্বনি আসিতেছে ; উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রায় বিশ হাত উচ্চে একটি শাখা হইতে মধুচক্র ঝুলিতেছে ; মৌমাছিরা অনবরত মহুয়াগাছ হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, তাহারই গুঞ্জরণ।

বজ্র সপ্রশ্ন নেত্রে গুঞ্জার পানে চাহিল, গুঞ্জা স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল। তখন বজ্র তীর ধনুক লইয়া মৌচাক লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীর মৌচাক বিদ্ধ করিয়া মধুলিপ্ত দেহে মাটিতে পড়িল। মৌমাছিরা বহু ঊর্ধ্বে হইতে আত-তায়ীকে লক্ষ্য করিল না, তাই বিশেষ বিচলিত হইল না। গুঞ্জা গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পর্ণপুট রচনা করিয়া মাটিতে রাখিল। চাক হইতে বিন্দু বিন্দু গাঢ় মধু ক্ষরিত হইয়া তাহাতে পড়িতে লাগিল।

পর্ণপুটে মধু সঞ্চিত হইলে দুইজনে তাহা ভাগ করিয়া পান করিল, তারপর তৃপ্ত মনে আবার একদিকে চলিল। শিকার সন্ধানের কোনও ব্যগ্রতা নাই, এক সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানোই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন-ভাবে ভ্রমণ করিবার পর গুঞ্জা বলিল- 'এস, কোথাও বসি।'

একটি ময়ূর ও দুই তিনটি ময়ূরী এক বৃক্ষের ঘনপল্লব ছায়াতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাদের আসিতে দেখিয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর রুষ্ট কেকাধ্বনি করিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। বজ্র দ্রুত ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছিল, কিন্তু গুঞ্জা তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল- 'না'।

গাছের তলায় দুটি সুন্দর ময়ূর পুচ্ছ পড়িয়াছিল, গুঞ্জা তাহা তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে বজ্রের হাতে দিল ; বজ্র সেইদুটি হইতে চন্দ্রক অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া গুঞ্জার দুই কানে দুল

দুলাইয়া দিল। স্মিতমুখে বলিল—'কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, তোমার কানেতে কন্যা পিঞ্জের দুল!'

কতদিনের পুরানো ছড়া, কাহার জন্য কে রচনা করিয়াছিল কে জানে। কিন্তু মধুমথনের মুখে ঐ ছড়াটি শুনিলে মনে হয় যেন গুঞ্জাকে লক্ষ্য করিয়াই উহা রচিত হইয়াছিল। গুঞ্জা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুতলে বসিল, সম্মুখে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠভার এলাইয়া দিল। কুঁচবরণ কন্যা! আর মধুমথন? মধুমথন নামটির স্বাদ যেন চাক্-ভাঙা মধু'র মত মিষ্ট, মধু'র মাদকতার ন্যায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া অনুরণিত হয়! মধুমথন!—

বজ্র ধনুর্বাণ মাটিতে ফেলিয়া আলস্য ভাঙিল, তারপর গুঞ্জার উরুর উপর মাথা রাখিয়া তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ দুইজনে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল। শান্ত নিরুদ্বেগ দৃষ্টি, নিস্তরঙ্গ মনের প্রতিবিম্ব। গুঞ্জার একটি হাত বজ্রের কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতেছে; এক বার গণ্ডে হাত বুলাইয়া একটি ইন্দ্রতুলক মুছিয়া লইল। ক্রমে বজ্রের চক্ষু তন্দ্রায় মুদিয়া আসিল।

গুঞ্জা অর্ধনিমীলিত নেত্র তাহার মুখের পানে নত করিয়া রহিল। সাত বছর ধরিয়া ওই মুখখানি সে অহরহ দেখিয়াছে, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত হয় নাই। আজ চৈত্রের কবোষ্ণ মধ্যাহ্নে নির্জন বনের ছায়াম্বরালে বসিয়া একটি কুশাগ্রতুল্য বাসনা তাহার মনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মধুমথন বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ধীর নিশ্বাসের ছন্দে তাহার বক্ষ উঠিতেছে নড়িতেছে; রক্তিম অধরে যেন মধুসিক্ত সরসতা লাগিয়া আছে। গুঞ্জা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সন্তর্পণে মুখের দিকে নত হইল; নিজ অধর দিয়া অতি লঘুভাবে তাহার অধর স্পর্শ করিল।

বজ্র হয়তো জাগিয়াছিল, হয়তো অস্পষ্ট তন্দ্রালোকে স্বপ্ন দেখিতেছিল; নিমেষ মধ্যে তাহার দুই বাহু গুঞ্জার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল। দীর্ঘকাল তাহাদের অধর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া রহিল। তারপর বজ্র চক্ষু মেলিয়া গুঞ্জাকে ছাড়িয়া দিল।

গুঞ্জার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, অধর পাণ্ডুবর্ণ। সে মুদিত চক্ষে মাথাটি বৃক্ষকাণ্ডে রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখীন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

'কুঁচবরণ কন্যা!'

গুঞ্জা চক্ষু খুলিল না, কিন্তু তাহার মুখখানি ধীরে ধীরে আরক্তিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় একটা কোকিল গাছে আসিয়া বসিল এবং বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—কু কু কু!

বজ্র তীরবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গুঞ্জাকে পরম বিস্ময়ে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। গুঞ্জা একবার বজ্রের চোখের পানে চোখ তুলিয়াই আবার নতমুখে বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তাহার মনে হইল তাহার দেহের অস্থিগুলা সব দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বজ্র তাহার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে আকর্ষণ করিয়া তরুতল হইতে লইয়া চলিল, ঈষৎ শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—'চল, মা'র কাছে ফিরে যাই।'

এই ঘটনার পর দু'জনের মাঝখানে যেন সূক্ষ্ম অথচ রহস্য-মধুর লজ্জার একটি আবরণ পড়িয়া গেল, কিন্তু এই আবরণ তাহাদের মাঝে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল না, বরং আরও নিবিড়-ভাবে উভয়ের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ঢাকাগ্য গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল।

বজ্র ও গুঞ্জার অনুরাগ, প্রকাশ্য না হইলেও, গ্রামের কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু দুইজনেই প্রাপ্ত-যৌবন, অথচ বিবাহের কোনও উদ্যোগ নাই। রঙ্গনা জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইলে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিত—'হ্যাঁ বাছা, বেটার বিয়ে না দিয়েই তো ঘরে বৌ পেয়েছ। তা এবার বিয়ে দাও। আর কবে দেবে?'

রঙ্গনা হাসিয়া বলিত—আমি জানি না, ঠাকুর জানেন। তিনি বললেই বিয়ে দেব।

ঠাকুরকে বলিলে তিনি কিছুক্ষণ অন্য মনে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন, বলিতেন—'আর দু'দিন যাক্।'

এইভাবে বজ্রের জন্মের পর উনিশ বছর কাটিয়া গেল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বজ্র যে কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত তাহা নয়। প্রয়োজন কালে গ্রামের যৌথ কাজকর্মেও যোগ দিত। নিজের সহজাত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিত, মাঠে গিয়া একসঙ্গে কাজ করিত। ধানের সময় ধান রোপণ করিত, আখের সময় আখ মাড়াই কার্যে সহযোগিতা করিত। কিন্তু এই উনিশ বছরে গ্রামের

অবস্থা অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতেছিল। শুধু গ্রাম নয়, সমস্ত দেশের অবস্থাই বন্যা নদীর ন্যায় ক্রমশ নিম্নগামী হইয়াছিল।

কোনও দেশের অবস্থাই চিরদিন সমান থাকে না; কালভেদে তাহার পতন-অভ্যুদয় আছে। শশাঙ্কদেবের দীর্ঘ রাজত্বকালে গৌড়দেশে যে সম্পদ-শ্রীর জোয়ার আসিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গৌড়রাজ্য লইয়া বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি চলিতেছিল। তাহাতেও হয়তো সামগ্রিক-ভাবে দেশের জনগণের অধিক ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে বাহির হইতেও এক প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছিল। সে সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল গৌড়-বঙ্গের প্রাণ; এই সাগর-সম্ভবা বাণিজ্য-লক্ষ্মী সাগরে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাতক ঠাকুর দেবাবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নয়, আরব দেশের মরুভূমিতে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল এবং সেই বাত্যাবিক্ষিপ্ত বালুকণা সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া আসিয়া গৌড়দেশের আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

সমগ্র দেশের সহিত ক্ষুদ্র বেতসগ্রামও এই ঘনায়মান দুরদৃষ্টের অংশভোগী হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা আর গ্রামের বাহিরে যায় না। কি জন্য যাইবে? গ্রামের গুড় বাহিরে বিক্রয় হয় না। স্বর্ণ রৌপ্যের প্রচলন দেশ হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে; দ্রম্ম কার্ষাপণ দিয়া কেহ আর সহজে পণ্য কেনে না; কড়ি এখন প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে লক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ আসিয়াছিলেন তিনি আবার গজভুক্ত কপিত্থবৎ অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছেন।

যেদিন বজ্রের বয়স উনিশ পূর্ণ হইল সেদিন সায়ংকালে অকস্মাৎ নিদাঘের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীল ঘনঘটার আবির্ভাব হইল। অশনি ও প্রভঞ্জনের রুদ্রতাণ্ডব সুরু হইয়া গেল; যেমন বজ্রের জন্মদিনে হইয়াছিল।

গুঞ্জা সায়ংদোহ করিতে বাথানে গিয়াছিল, সে সেই খানেই আটক পড়িল। বজ্র গিয়াছিল দেবস্থানে- চাতক ঠাকুরের একচালায়। বজ্র ঠাকুরের জন্য কৃষ্ণসারের চর্ম হইতে অজিন প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাই ভক্তিভরে ঠাকুরকে দিতে গিয়াছিল। তারপর উভয়ে বসিয়া লঘু জল্পনা চলিতেছিল; দিনে দিনে দেশের অবস্থা কিরূপ দুর্গতির পথে চলিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আকাশে দৈত্য-দানবের মালসাট্ আরম্ভ হইল।

বৎসরের এই সময় ঝড়-ঝাপটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এ বছর এই প্রথম। চাতক ঠাকুর চকিতে বজ্রের পানে চাহিলেন, মনে মনে কি গণনা করিলেন, তারপর বলিলেন —'দিন যায় না ক্ষণ যায়। বজ্র, আজ তোমার উনিশ বছর বয়স পূর্ণ হল।'

বজ্র ভুলে নাই। সে ঋজু হইয়া বসিয়া ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—'তাহলে কুড়ি বছর বয়স হয়েছে?'

'হাঁ, হয়েছে।'

'তাহলে মা'কে জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'পারো। কিন্তু জেনে কোনও লাভ নেই বজ্র। বরং—'

বজ্র তর্ক করিল না; উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল— 'আমি জানতে চাই।'

বৃষ্টিবাত্যা ভেদ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

* * *

বর্ষণ থামিয়াছে, বায়ু শান্ত হইয়াছে। সিক্ত প্রকৃতির সর্বাঙ্গে চন্দন-শীতল সরসতা। গুঞ্জা বাথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মা ও ছেলে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে; মায়ের চোখে জল। মা ছেলের বাহুতে একটি সোনার অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছে। অপূর্ব সুন্দর অঙ্গদ, বজ্রের বাহুতে এমন সুষ্ঠুভাবে লগ্ন হইল যেন তাহার বাহুর পরিমাপেই নির্মিত। রঙ্গনা দরদর-ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মস্তক বুকে টানিয়া লইল।

বজ্র অবরুদ্ধ স্বরে বলিল—'মা, আমি কালই পিতার সন্ধানে বেরুব। যেখান থেকে পারি সংবাদ নিয়ে আসব।'

এই দৃশ্য দেখিয়া গুঞ্জার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে দুগ্ধকলস নামাইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। স্খলিত স্বরে বলিল—'মা, কি হয়েছে?'

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, গুঞ্জাকেও বাহু বন্ধনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

সে-রাত্রে তিনজনের কেহই ঘুমাইল না; অতীত ও ভবিষ্যতের দুরন্ত দুর্গম ভাবনায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল; প্রাতঃসূর্যের উদয়ে সদ্যস্নাতা

ধরণীরও বিস্মিত রূপ প্রকাশ পাইল। স্নিগ্ধ বাতাস, প্রসন্ন আকাশ; শুভযাত্রার অনুকূল মুহূর্ত। বজ্র মাতাকে লইয়া দেবস্থানে উপস্থিত হইল; যুগল দেবতার সম্মুখে দণ্ডবৎ; চাতক ঠাকুরের পদধূলি মাথায় লইল। রঙ্গনা পুত্রের কপালে চুম্বন দিল, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দংশন করিল, তারপর তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্র মায়ের কানে কানে বলিল—'মা, কেঁদ না। যদি পিতার সন্ধান না পাই—আমি একা তোমার কাছে ফিরে আসব।'

এমনই আশ্বাস দিয়া আর একজন চলিয়া গিয়াছিল। বিপুল সংসার তাহাকে ফিরাইয়া দেয় নাই। এবার দিবে কি?

রঙ্গনা ও চাতক-ঠাকুর মৌরীর ঘাট পর্যন্ত বজ্রের সঙ্গে আসিলেন। তারপর বজ্র নদীর তীর ধরিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মাথায় বাঁধা উত্তরীয়, স্কন্ধে একটি বংশদণ্ড, দণ্ডের প্রান্তে একটি পুঁটুলি বাঁধা। প্রগণ্ডে পিতার অভিজ্ঞান—সোনার অঙ্গদ।

যতক্ষণ দেখা গেল গলদশ্রুনেত্রা রঙ্গনা সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইল না। তারপর চাতক ঠাকুর হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কিন্তু গুঞ্জা কোথায়? অতি প্রত্যূষে সে কলস লইয়া ঘাটে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। কোথায় গেল সে? ঘাটেও তো নাই!

বজ্র হেঁটমুখে চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছে। কত বিচিত্র চিন্তা, কোনও চিন্তাই মনের মধ্যে স্থায়ী হইতেছে না, চঞ্চল জলের উপর সূর্যকিরণের ন্যায় ক্ষণেক নৃত্য করিয়া অদৃশ্য হইতেছে। কাল রাত্রে বজ্র মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পিতার আকৃতি কেমন ছিল? উত্তরে মা একটি পিত্তলের থালিকা তাহার মুখের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন; সেই থালিকার মার্জিত আদর্শে সে নিজের মুখ দেখিয়াছিল। কুড়ি বছর পূর্বে তাহার পিতার মুখও এমনি ছিল…গৌড়রাজ মানবদেব—তিনি কি জীবিত আছেন?…কর্ণসুবর্ণ কেমন নগর? বজ্র পূর্বে কখনও গ্রামের বাহিরে যায় নাই—

বেতসবন পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। বৃদ্ধ জটীল ন্যগ্রোধবৃক্ষ গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষটি অধিক উচ্চ নয়, কিন্তু বহু স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপের ন্যায় জটস্তম্ভ রচনা করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঘন শাখাপত্রের নিম্নে নিবিড় ছায়া।

ন্যগ্রোধের ছায়াচ্ছত্র প্রান্তে আসিয়া বজ্র দাঁড়াইল, একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। দূরে বেতসলতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামটি দেখা যাইতেছে! ঐ গ্রামে তাহার মা আছেন, চাতক ঠাকুর আছেন, গুঞ্জা আছে—

বিদায়কালে গুঞ্জার সহিত দেখা হইল না। কোথায় গেল কুঁচবরণ কন্যা! সে কি অভিমান করিয়াছে—তাই বিদায়কালে সরিয়া রহিল?

'মধুমথন!'

বিদ্যুদ্বৎ ফিরিয়া বজ্র দেখিল ন্যগ্রোধ-বিতানের ভিতর হইতে গুঞ্জা বাহির হইয়া আসিতেছে। সে আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল। গুঞ্জার চোখদুটি যেন আরও বড় হইয়াছে, ঈষৎ রক্তিমাভ। মুখের ব্যঞ্জনা দৃঢ়, সংহৃত। বজ্রের হাত ধরিয়া গুঞ্জা তাহাকে বৃক্ষের ছায়ান্তরালে লইয়া গেল।

আজ গুঞ্জার সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই। বজ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সে বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, তুরন্ত আবেগে তাহার চক্ষে গ্রীবায় অধরে চুম্বন করিতে লাগিল। বজ্র প্রথমে গুঞ্জার এই আবেগ-প্রগল্ভতায় বিমূঢ় হইয়াছিল, তারপর সেও চুম্বনে চুম্বনে তাহার প্রতিদান দিল।

কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া গুঞ্জা বলিল—'তুমি কবে ফিরে আসবে?'

বজ্র বলিল—'তা জানি না। কিন্তু ফিরে আসব।'

'আসবে? আসবে? আমাকে মনে থাকবে?'

বজ্র একটু হাসিল—'থাকবে।'

'নগরের মেয়েরা শুনেছি মোহিনী হয়। তাদের দেখে আমাকে ভুলে যাবে না?'

'না, কুঁচবরণ কন্যা, তোমাকে ভুলে যাব না।'

গুঞ্জা একাগ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে বজ্রের মুখের পানে চাহিল, যেন তাহার অন্তরের মর্মস্থল পর্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর নিজের বুক হইতে বস্ত্র সরাইয়া বজ্রের একটা হাত নগ্ন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

'আমার বুকে হাত দিয়ে বলো—আর কোনও মেয়ের গায়ে হাত দেবে না?'

বজ্রের মেরুমজ্জার ভিতর দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া গেল, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

'গুঞ্জা! কুঁচবরণ কন্যা!'

'না, বলো। শপথ কর।'

'শপথ করছি।'

'তুমি আমার? শুধু আমার?'

'হাঁ তোমার। শুধু তোমার।'

তারপর—ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের ছায়ান্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিল। গুঞ্জা চোখ বুজিয়া বলিল 'মনে থাকে যেন। সব দিয়ে তোমাকে নিজের করে নিলাম।'

(ক্রমশঃ)

ণীত হয়। নির্দোষদিগের অনন্তশাস্তি এবং সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় ধরের সৃষ্ট জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নিতান্তই যুক্তিবিরোধী। প্রত্যেকে য় জ্ঞান ও বুদ্ধি মত বাইবেলের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী, এই মতের লে সাধারণের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায়ের এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক-কার সর্বেশ্বরবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সর্বেশ্বরবাদ যে কবির ভাষায় র্ত প্রকৃতিবাদের (naturalism) অতিরিক্ত কিছু নয়! লেসিং, টে, কার্লাইল এবং এমার্সন ইহার উদাহরণ।

ইহুদীদিগের দেবতা জিহোবা ছিলেন সমরপ্রিয়। পয়গম্বরগণ ও ঃ ছিলেন শান্তিপ্রিয়। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে এই জিহোবার প্রবেশ তিহাসের এক বিদ্বেষমূলক আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু যীশু-প্রচারিত ক্তি দ্বারা জিহোবার সমরপ্রিয়তা অপনোদিত হইয়াছিল।

প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মের প্রতি সান্তায়নার কোনও আকর্ষণ ছিল না। ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসকল তাঁহার প্রীতিকর ছিল। মধ্যযুগের পৌরাণিক কাহিনী সকল বর্জন এবং কুমারী মেরীকে অবজ্ঞা করিবার য় তিনি প্রটেষ্ট্যান্টদিগের নিন্দা করিয়াছেন। মেরীকে তিনি কবিতার সুন্দরতম পুষ্প" নামে অভিহিত করিয়াছেন (fairest ower of poetry)। পরিহাস-রসিক এক লেখক বলিয়াছিলেন, সান্তায়না বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এবং মেরী ঈশ্বরের তা"। তাঁহার গৃহ কুমারী মেরী এবং সন্তদিগের চিত্রাবলী দ্বারা শোভিত ছিল। শিল্প অপেক্ষা কলা যেমন সান্তায়নার অধিকতর প্রিয় ল, ক্যাথলিকধর্ম্মের সৌন্দর্য্যও তেমনি তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি বলিয়াছেন--পৌরাণিক কাহিনীর সমালোচনার দুইটি ক্রম। প্রথম ক্রমে কুসংস্কার বলিয়া তাহারা ঘৃণার সহিত বর্জিত হয়। দ্বিতীয় ক্রমে কবিতা বলিয়া তাহারা সস্মিত সমাদর প্রাপ্ত হয়। মানবীয় কল্পনার সাহায্যে ব্যাখ্যাত মানবীয় অভিজ্ঞতাই ধর্ম্ম।…ধর্ম্ম যে আক্ষরিক অর্থে সত্য এবং ইহা যে সত্যের এবং জীবনের প্রতীকমূলক বর্ণনা নহে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। যাহার বিশ্বাস এইরূপ, তিনি এই বিষয়ের দার্শনিক আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।…ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কখনও তর্ক করা উচিত নহে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে যে কবিত্ব আছে, তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা এবং তাহার মধ্যে যে ধর্ম্মভাব নিহিত আছে, তাহার সম্মান করাই কর্ত্তব্য।

যে সকল পৌরাণিক কাহিনী হইতে সাধারণ লোকে সান্ত্বনা এবং উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়, সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। বরঞ্চ এই সকল কাহিনীতে বিশ্বাসের ফলে সাধারণ লোকের মনে ভবিষ্যতের যে আশা উদ্রিক্ত হয়, তাঁহাদের পক্ষে তাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু পরলোকে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। জন্ম হওয়াই যে অমরতার বিঘাতক। যে অমরতায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহার বর্ণনা স্পিনোজা করিয়াছেন। প্রত্যয় জগতে অর্থাৎ আদর্শের জগতে যিনি বাস করেন, এবং সমাজে এবং কলার মধ্যে তাঁহার আদর্শ রূপায়িত করেন, তিনি দ্বিবিধ অমরতা প্রাপ্ত হন। যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, ততদিন তিনি অমর জগতের অংশীভূত থাকেন, মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অপরেও সেই অমর জগতের অংশীভূত হয়, এবং তাঁহার মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ছিল তাহার সহিত একীভূত হইয়া তাঁহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে।

(ক্রমশঃ)

করুণা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চরণে তোমার শরণ নিয়েছি—
আর কারে ভয় করি ?
পুষ্পবিহীন শুষ্কলতিকা
উঠিবে গো মুঞ্জরি !

তরিতে তোমার মায়া-পারাবার
বিফল হয়েছি, প্রভু, বারবার,
এবার জেনেছি ঠিক হবো পার—
পেয়েছি যে কৃপা-তরী।

আপনার 'পরে যত বিশ্বাস
ভেঙে হোলো চুরমার।
আজ বুঝিয়াছি, তুমি ছাড়া মোর
নাই, নাই গতি আর।

তুমি ধরিয়াছ হাতখানি প্রভু,
তাই জানি পথ হারাবোনা কভু—
বিশ্বাস দাও-পরশে তাহার
পর্ব্বত যাবে সরি।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভাগবতে আছে নারদকে ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিলেন : "যাযাবর হও।" "দি ওয়াণ্ডারিং জু" ব'লে একটা কথা বাইরের সময় থেকে কালাপাণির ওপারের লোকেরা শুনে আসছে। "কপালং কপালং কপালং মূলম্" ব'লে একটা সংস্কৃত প্রবাদও না শুনেছে কে? তাই উনিশ শো সাতাশ সালে য়ুরোপযাত্রার পথে দিলীপকুমার যখন স্থাণুধর্মী হ'তে গেয়ে ফিরে এলেন আশ্রমবাসী হ'তে, তখন মহাকাল নিশ্চয় অলক্ষ্যে মুচকে হেসেছিলেন তাঁর নিরাকার ওষ্ঠাধরে। পরিণাম—এ-চির ভ্রাম্যমাণের পুনরায় স্থিতি ছেড়ে গতির চরণে আত্মসমর্পণ—ফের সুরু হওয়া ভ্রমণ—৮ই জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে নিশুত রাতে যাকে বলে—এবং সে কী সাহসিক ভ্রমণ দৈত্যপ্রতিম প্যান আমেরিকান আকাশ বিহঙ্গমের ডানায়! রোমহর্ষক নয়?

কিন্তু সুরুরও আগে থাকে উপক্রমণিকা—যাকে সাহেব-পুরাণে বলে প্রোলোগ। বৎসরাধিক আগে একদিন কন্যোপমা শিষ্যা ইন্দিরার একটি দর্শন হয়। তিনি দেখেন আমি আমেরিকায় একটি প্রকাণ্ড হলে বক্তৃতা করছি—বহু শ্রোতা—অগণ্য দীপমালা ইত্যাদি। দর্শনান্তে ধ্যানভঙ্গের পরে শিষ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : "গুরু! তোমাকে যেতেই হবে আমেরিকা। বিধিলিপি।"

"বলো কি বৎসে! অমন অলুক্ষুণে কথা!"

"ভবিতব্য। তাছাড়া অলুক্ষুণে কেন? যখন বিধিলিপি?"

ইত্যাদি নানা তকরারের পর স্থির করলাম ইন্দিরার দর্শন ভ্রান্ত। কারণ ১৯২৭শে আমার আমেরিকা-প্রয়াণ যখন বিধিলিপির চেয়েও অবধারিত থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয় নি সে-দেশে—যখন বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে এক জাহাজে আসন পেয়েও টিকিট না কিনে "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ঘরের ছেলে এলাম ঘরে ফিরে—তখন কেমন ক'রে মানা যেতে পারে যে এবার (যখন আমেরিকা যাত্রার না ছিল সঙ্কল্প, না পাথেয়) অনিশ্চিতের ললাটে বিধি লিপিবদ্ধ করবেন এ হেন অকল্পনীয় নিশ্চিতকে? ইন্দিরা হার মানলে না তবু—বললে : "আচ্ছা, দেখো!"

অতঃপর আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ—"আমেরিকান আকাডেমি অফ এশিয়ান স্টাডিস্"-এর নিয়ন্তার সঙ্গে হ'য়ে গেল পাকা কথা—তাঁদের ওখানে দক্ষিণা বিনিময়ে বক্তৃতা দিতে হবে কয়েকমাস। আমি লিখলাম বেলা যায়—এ শেষ বয়সে আর চাকরি করা সম্ভব নয়—তবে তাঁ[illegible] অতিথি হ'য়ে মাস দুই ভারতীয় সঙ্গীত তথা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা [illegible] রাজি আছি। পাকা কথা হ'য়ে গেল।

কিন্তু সপ্ত সাগর ত্রয়োদশ নদীর পারে যাওয়া এ-যুগে একদিক [illegible] সুসাধ্যতর হ'লেও আমার পক্ষে পাথেয় সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্যের [illegible] মনে হ'ল। ঠিক হ'ল কন্সার্ট দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। ইন্দি[illegible] নৃত্য সঙ্গতে গান গেয়ে আমি সব জড়িয়ে পনের হাজার মুদ্রা তুললা[illegible] কিন্তু বৈমানিকদের বিল ষোলো হাজার সতের হাজারের ধাক্কা—[illegible] আকাশপথে জাপান হনোলুলু দিয়ে আমেরিকা গিয়ে ইংলণ্ড ফ্রান্স ই[illegible] মিশর হ'য়ে ফিরতে হ'লে এর চেয়ে কমে শুভকর্ম সম্পাদন অসম্ভব[illegible]

হ্যাপি ভ্যালী—হংকং

এ ছাড়া আর এক মুস্কিল—মার্কিন মুদ্রা, ডলার জোগাড় ক[illegible] ইন্দিরাকে বললাম : "দেখলে?" ইন্দিরা বললে : "দেখো হবেই।" ঐ এক কথা—"বিধিলিপি, আমি দেখেছি যে!"

হঠাৎ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, দিল্লির সদাশয় সদস্য, এলেন এগি[illegible] বললেন—আজাদ সাহেবের সঙ্গে কথা। আমি তাঁকে লিখলাম [illegible] প্রশ্নের উত্তরে যে, আমেরিকা যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয় [illegible] দু হাজার ডলার সরকার দেন আমাদের সাংস্কৃতিক ভ্রমণে" (Cultu[illegible] tour)। "আজাদ সাহেব অনুকূল মনে হচ্ছে—আসুন চ'লে দিল্লি[illegible]" লিখলেন বন্ধুবর সুরেন্দ্রমোহন। অথ ১৩ই জানুয়ারী পৌছলাম দিল্লি[illegible] ১৫ই গাইলাম গান রাষ্ট্রপতি-ভবনে। পণ্ডিতজি, রাষ্ট্রপতি, আজা[illegible] কাটজুজি প্রমুখ সবাই ছিলেন। বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদ তথা সুরেন্দ্রমোহন[illegible]

থেকে। কবুল করলাম। তৎক্ষণাৎ: "Please stand still!" ঝিক্—ক'লে উঠল শাদা আলো! ছবি উঠে গেল। পরদিন জাপানী কাগজে বেরুল—"বিখ্যাত সঙ্গীতকার দিলীপকুমার ও তৎশিষ্যা প্রসিদ্ধা নাটানৃত্যনিপুণা ইন্দিরা দেবী…" ইত্যাদি। ধুমধামের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ নয়। নিচে নামতেই ওভারকোট-পরা রাজদূত (Ambassador) ডাক্তার মহম্মদ আবদুল রাউফ সাহেব বললেন: "I am Dr. Rauf, Mr. Roy!" অথ করমর্দন পর্ব। তৎক্ষণাৎ ছবিওয়ালা পুনরায় তারস্বরে: "করমর্দন করতে থাকুন।" আবার সেই হঠাৎ আলোর ঝলক—ফের ছবি! কাগজে বেরুবে শুনলাম (একটি এখনো চোখে দেখি নি নিজে): "Dr. Rauf greeting Mr. Dilip Roy" এই জাতীয় শিরোনামা।

আমেরিকা আরম্ভ হ'ল প্রথম জাপানে। (ক্রমশঃ)

রূপ-শিল্পের দার্শনিক তত্ত্ব

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

লঘু সাহিত্যের বন্যায় প্লাবিত বাংলার পুস্তক-জগতের একটী স্মরণীয় ঘটনা—৺যামিনীকান্ত সেনের "আর্ট ও আহিতাগ্নি"র নূতন সংস্করণ। বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়—১৩২৮ সালে। ৩২ বৎসর পরে, দ্বিতীয় সংস্করণের আবির্ভাব, নানা কারণে বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। যাঁহারা মনে করেন—উপন্যাস ও ছোট গল্পের ভেলায় চড়িয়া এবং চলৎচিত্রের প্রেক্ষাগারে ভিড় করিয়া,—ভারতের উন্নতির পাঁচ-সালা পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবেন—তাঁহাদের অসমসাহসিক বাতুলতা তামাসার যোগ্য,—কিন্তু অনুকরণীয় নহে। একজন চিন্তানায়ক বলিয়াছিলেন,—যে কেবল চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কায সম্পন্ন করা যায় না। উপন্যাসের চটুল চালাকীর দ্বারা—ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের রথ—অশোক-চক্রে চিহ্নিত হইলেও—একপদ অগ্রসর হইতে পারিবে না। গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল সাহিত্যের প্রচলন না হইলে,—দেশে উচ্চ চিন্তার ভাবুক শ্রেণী—এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্মীদের আবির্ভাব হইবে না।

কিছুদিন পূর্বে একদল প্রকাশকের হরতাল পালনে—একটা অতি নিদারুণ সত্য পরিস্ফুট হইয়াছিল,—যে প্রকাশকরা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিবার সুযোগ না পাইলে,—উপন্যাসের পরিধি অতিক্রম করিয়া—জীবন চরিত, ইতিহাস, দর্শন, ভাষা-তত্ত্ব, কলাবিদ্যা ও অন্যান্য জাতীয়তার উন্নতির সহায়ক—গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের প্রকাশের কথা চিন্তা করিতেও পারিবেন না। বাংলাদেশ দ্বি-খণ্ডিত হইবার পর—এই সমস্যা আরও ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রকাশকদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অনেক প্রকাশকদের মুখে শুনিয়াছি—যে লঘু সাহিত্যের পরিধির বাহিরে—কোনওরূপ উচ্চ চিন্তার প্রেরণামূলক যে কোনও পুস্তক প্রকাশ করিলে—অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়,—কারণ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল সাহিত্যের গ্রাহক বাংলাদেশে দুর্লভ। ব্যবসায়ী প্রকাশকদের—এইরূপ চিন্তামূলক পুস্তকের প্রকাশ করা—নিঃস্বার্থ সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবার প্রশংসনীয় পরিচয় হইলেও—ব্যবসার পক্ষে আত্মঘাতী ব্যাপার।

কেবল এই কথা স্মরণ করিয়াই—আমরা "আর্ট ও আহিতাগ্নির" নূতন সংস্করণের প্রকাশকদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

নানা কারণে প্রকাশকদের এই ক্ষতিপূর্ণ বিরাট ব্যয়সাধ্য পুস্তকের প্রকাশ অনেক দিক হইতে অত্যন্ত বরণীয় ও প্রশংসনীয় চেষ্টা—এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটী স্মরণীয় ও বহুমূল্য দান। এ ক্ষেত্রে লেখক অপেক্ষা প্রকাশকদের প্রচেষ্টা অধিকতর অভিনন্দনের যোগ্য।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের" নিবন্ধের পর এবং আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের "বাগীশ্বরী বক্তৃতার" পূর্ব্বে,—কেবল একটী মাত্র রূপতত্ত্বের সমালোচনা গ্রন্থ বাংলাদেশে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেটী হইল যামিনীকান্ত সেনের আলোচ্য পুস্তকখানি। এই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস সরকার মহাশয়ের সুবৃহৎ পুস্তক 'মন্দিরের কথা' স্মরণ করিতে হয়। কিন্তু সে পুস্তকখানি রূপতত্ত্বের দার্শনিক সমালোচনা নহে,—মন্দির নির্ম্মাণ ও মন্দিরের পুরাতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য বিচারের সহায়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যামিনীকান্ত সেনের তত্ত্বমূলক পুস্তকের এক পর্য্যায়ে পড়ে না। "আর্ট ও আহিতাগ্নি"র প্রকাশের পর কয়েকটী রূপবিদ্যার তত্ত্ব-আলোচনা-মূলক পুস্তক বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে—(১) আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের "বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলী" (প্রকাশক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ও ইংরাজী অনুবাদ যন্ত্রস্থ), (২) নলিনীকান্ত গুপ্তের রূপদর্শনের উপাদেয় নিবন্ধ, (৩) অসিতকুমার হালদারের "রূপ-রুচি" (১৩৪৮), (৪) আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" (১৩৫৭) (৫) সু[...] বসু প্রণীত; "ছয়খানি সেরা ছবি" (১৩৫৭) এবং (৬) প্রভাতকুমার দত্ত রচিত "শিল্পধারা" (১৩৫৮)—এই ছয়খানি গ্রন্থ বিশেষ রূ[...] উল্লেখযোগ্য। সুতরাং, দেখা যাইতেছে—রূপতত্ত্বের আলোচনামূলক সাহিত্য বাংলা ভাষায় বেশী প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কারণ আমাদে[র] বেশীর ভাগ শিক্ষায়তনে রূপবিদ্যা এখনও নিষিদ্ধ ফল—এবং জ্ঞানের রা[জ্যে] এখনও 'হরিজন' রূপে হেয় বলিয়া, জ্ঞানের মন্দিরে এই বিদ্যার প্রবেশ-দ্বা[র] অর্গল দ্বারা নিবারিত। অথচ, জাতীয়তা ও সমাজ-গোষ্ঠীর আধ্যাত্মি[ক]

উন্নতির দিক হইতে নিরক্ষরের রূপবিদ্যা লিখিৎ-পড়িৎ বিদ্যা হইতে কোনও রূপে হীন নহে। সমাজে রূপ-শিল্পীর আদর না হইলে—শিল্পীদের মধ্যে কে আসল, কে মেকী, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সৃষ্টির মধ্যে—কোনটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার আস্বাদন ও বিচারবোধ জাগ্রত না হইলে,—সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি অগ্রসর লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপে রূপবিদ্যার সাহিত্য বিপুল আকারে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের লোকের সৌন্দর্য্যবোধ, সৌন্দর্য্যের আস্বাদন ও তারতম্যের নির্ণয়ের শক্তি সুশিক্ষিত করিয়া,—রূপ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যাচাই ও আদর করিবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া রূপবিদ্যাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের দেশে, আমরা এখনও দেশের শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টির মূল্য কি—তাহা নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারি নাই। দেশে রূপদক্ষ, শিক্ষিত শিল্প সমালোচকের এখনও আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং উপযুক্ত জহুরীর অভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ সৃষ্টির "হীরা জহরত" ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। যে দেশের মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক রত্নের মূল্য নির্দ্ধারণে অক্ষম—তাহার মত দুর্ভাগা জগতে আর নাই।

রূপতত্ত্বের সমালোচনা-সাহিত্য,—আমাদের রূপ সৃষ্টির আদর্শ কি—তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষাদান করে। য়ুরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখিতে পাই—যে ইংলণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশে রূপ-শিল্পের সাহিত্য বিরাট রূপ লইয়া ইংরাজী জ্ঞানরাজ্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। যোস্থুয়া রেনল্ড্ থেকে শুরু করিয়া এরিক নিউটন পর্য্যন্ত—প্রায় ২৫।২৬ জন প্রতিভাশালী উচ্চশিক্ষিত শিল্প-সমালোচক *—ইংরাজী সাহিত্যের একটী বিরাট অধ্যায় বিজ্ঞানসম্মত রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক সমালোচনাপরম্পরা সৃষ্টি করিয়া—সৌন্দর্য্য দৃষ্টির পথ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কেবল টর্ণরের ছবিদের রহস্যের ব্যাখ্যায়,…জন্ রস্কিন্ সাতটি বৃহদাকার সমালোচনা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—যাহা রূপ বিদ্যার কথা বাদ দিলেও—কেবল সাহিত্য হিসাবে ইংলণ্ডের গর্ব্বের বস্তু। রূপ-বিদ্যার ক্ষেত্রে কেবল ইংরাজী সাহিত্যিকরা, (ফরাসী, জার্ম্মান ও ইতালীর সাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র),—যে দীপ্যমান বিশাল মশাল-শ্রেণী জ্বালিয়া দিয়াছেন—তাহার তুলনায় বাংলার রূপ-শিল্পের ক্ষেত্রে মাত্র ছয়টী ক্ষীণ প্রদীপ আমাদের রূপের রাজ্যের অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। রূপ-সৃষ্টির রহস্যের অনুসন্ধানে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে।

কিন্তু, আমাদের শিল্প-সমালোচনার করুণ ও শীর্ণ ইতিহাস স্মরণ করিয়া—যামিনীকান্ত সেনের রচিত বইখানির বিচার করিলে অবিচার করা হইবে। নিরস্ত পাদপ দেশে বৃক্ষ বিশেষ কৃত্রিম সমাদর লাভ করে; কিন্তু, "আর্ট ও আহিতাগ্নি"—আমাদের সেই নেই-মামার দেশের কাণা মামা নহে। সেন মহাশয়ের কেতাবে রূপতত্ত্বের নানা দিক দিয়া এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বিচার আছে—যাহার দ্বারা অনেক লোচন-হীন মানুষ…রূপদৃষ্টির লোচন লাভ করিবেন। এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে সৌন্দর্য্য দেখিবার শক্তি অক্ষরে লিখিত পুঁথির পাতায় পাওয়া যায় না; তাহার জন্য চাই—শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টির সহিত অবিশ্রান্ত চাক্ষুষ পরিচয়। এই কথা স্মরণ করিয়া—প্রকাশক ও সম্পাদক বইখানিতে—৪ খানি তিন রঙের এবং ২০ খানি এক রঙের ছবি জুড়ে দিয়ে—তাহার আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। রঙীন প্রতিলিপিগুলি খুব সঠিক না হইলেও—দেশ বিদেশের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ মাষ্টার-পীস—বইখানির সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে—চিত্রগুলি—যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই, এবং অনেক সময়ে—সমালোচিত কথা-বস্তুর সহিত—চিত্রগুলির কোনও বিশেষ যোগ নাই। ৬২ পাতার সম্মুখে সংযোজিত, বরবুদরের 'ধ্যানী-বুদ্ধের' ছবিটী ২১২ পাতার কাছে সন্নিবেশিত হওয়া উচিৎ ছিল। মূর্ত্তিটীর উপর লেখক যে মনোরম টীকাটি রচনা করিয়াছেন—তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য এবং নিশ্চয়ই অনেক পাঠকের চিত্ত জয় করিবে :—

> "ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির সম্বন্ধে বিশেষ বলবার কথা হচ্ছে যে, তাঁতে মানুষের শরীর সীমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। দেহ-সীমার মধ্যে দেহাতীতের অপরূপ রূপ ফুটিয়ে তোলার এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন শিল্পে নাই। শুধু অধ্যাত্মভাবের ব্যঞ্জনা নয়—শুধু মানুষের অধ্যাত্ম-সম্পর্ককে স্ফীত করে তোলার চেষ্টা মাত্র নয়। অসীমের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সাক্ষ্য এ মূর্ত্তিতে আছে—কিন্তু সীমার মর্য্যাদাও রক্ষা করা হয়েছে। আত্মার ঘনীভূত প্রাণকে রূপ দেওয়া হয়েছে, অথচ দেহকে বর্জ্জন করা হয় নি। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, ইহলোকের ও পরলোকের সীমা ও অসীমের মিলনক্ষেত্রে রচিত হয়েছে। ভারতের জীবনতত্ত্বে যেমন গোঁড়ামি নেই, শিল্পেও তা নেই। ভারতবর্ষ যে সামঞ্জস্যের ধ্যান করে এসেছে, তাঁরই ছায়া এ মূর্ত্তিতে রূপ গ্রাহী হয়েছে। এ মূর্ত্তি বিশ্বশিল্পে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব মিলনের প্রতিভূ হয়ে' অবিস্মরণীয় হয়ে' গেছে। এ মূর্ত্তিতে রূপ ও অরূপের মিলনকেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট হয়েছে বলে' আর পরিবর্ত্তন করা চলে না। ভাবের শান্তি স্পর্শ করিতে গেলে শরীরকে ক্ষত করা হবে, শরীরের শান্তি পরিবর্ত্তন করতে গেলে দিব্যভাবকে ক্ষুণ্ণ ও আহত করা হবে। এ হিসাবে এ মূর্ত্তিটি একটা অনন্তমুহূর্ত্তকে স্পর্শ করে ও আকার দিয়ে অমর হয়ে' গেছে। সহজে এইরূপ মূর্ত্তি রচিত হয় নি। এই মূর্ত্তি বহু কালের ও বহু ভাবুকের আহিতাগ্নি ও ধারাবাহী সাধনা ও মননের ফল। আচার্য্যানুক্রমে শিল্পাদর্শের পতাকে অগ্রসর হয়ে' সুদীক্ষিত শিল্পী-পরম্পরা

---

* Sir Joshua Reynolds, Walter Pater, John Ruskin, L. March Phillips, Vernon Lee, R. G. Collingwood, D. S. Maccoll, Charles Holmes, Arthur Symonds, Comyn Carr, Oscar Wilde, G. B. Shaw, William Morris, Clive Bell, Roger Fry, Eric Gill, E. B. Havell, Laurence Binyon, Charles Marriott, E. Dillon W. H. Wilenski, Herbert Read, A. L. Lloyd, Alick West, Raymond Mortimer, Eric Newton.

বহুজীবনব্যাপী চেষ্টাতে এইরূপ দেশকালজয়ী মূর্ত্তি কল্পনা ও রচনা সম্ভব হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই এরূপ সাধনা সম্ভব হয়েছিল, এই জন্য এই মূর্ত্তিটিকে জগতে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বলে অভিহিত করা যেতে পারে।" (২১২ পৃঃ)

কিন্তু লেখক তাঁহার আলোচনা কেবল ভারতের শিল্পেই নিবদ্ধ রাখেন নাই,—উদার দৃষ্টি নিয়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া—রূপ-শিল্পের বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার আদর্শ ও মানদণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বিদেশের রূপচর্চ্চার তত্ত্বকথা এই পুস্তকের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে। এইটাই বইখানির বিশিষ্ট গুণ বা বিশিষ্ট দোষ বলা যেতে পারে। য়ুরোপে চিত্র-সমালোচক ও সাহিত্য-সমালোচকদের বহু গ্রন্থ তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন—এবং সেই সব সমালোচনা হইতে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এইখানেই তাঁহার দিক্‌দর্শী সাধনা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা পাই। তাঁহার গ্রন্থে অন্ততঃ ৫০ জন য়ুরোপীয় সমালোচকদের উক্তি, অনুবাদ সহযোগে উদ্ধৃত হইয়াছে—যদিও অনুবাদগুলি সময়ে সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং সময়ে সময়ে একেবারে অর্থহীন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে সম্পাদক মহাশয় এই অনুবাদগুলি একটু 'ঘষে মেজে' দিলে অনেকের পক্ষে বইখানা আরও সুখপাঠ্য হইত,—কিন্তু সে কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ এবং সম্পাদক তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া ভালই করিয়াছেন। এবং যেহেতু লেখক তাঁহার উদ্ধৃত উক্তিগুলির মূল ইংরাজী পাদটীকায় ছেপে দিয়াছেন—সেই হেতু পাঠক অশুদ্ধ অনুবাদের কথাগুলি নিজেই পরিশোধিত করিতে পারিবেন।

এই উদ্ধৃত উক্তির অনুবাদ-মালায় বইখানির গুণ ও দোষ একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় রূপশিল্পের আলোচনার যোগ্য উপযুক্ত পরিভাষা ও যোগরূঢ় শব্দের একান্ত অভাব। লেখক ইংরাজী ও য়ুরোপীয় পরিভাষা অনুবাদ করে—নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার অভিধান নূতন শব্দ সৃষ্টির দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। কেবল ভাষার দিক দিয়েও বইখানি বাংলা সাহিত্যের গৌরব। লেখক যে সব পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন—সকলেই এগুলি স্বীকার করে না নিলেও লেখকের নূতন চিন্তা ও নূতন ভাবের প্রকাশের জন্য নূতন কথাসৃষ্টির প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কোনও কোনও বিরুদ্ধ সমালোচক বলিতে পারেন—যে লেখক য়ুরোপের রূপ-শিল্পের স্বাধীন সমালোচনা করেন নাই—য়ুরোপের সমালোচকদের পুনরুক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু, যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া বিদেশী সাহিত্যিকদের অভিমতগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহা বর্ত্তমানকালে কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব কিনা—তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বিদেশের সমালোচকদের অভিমতের সুন্দর সংগ্রহ হিসাবেও বইখানির মূল্য আছে। অনেকের পক্ষে এই সব উদ্ধৃত পুস্তক সংগ্রহকরা—এবং তাহা মনোযোগ দিয়া অনুশীলন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের সূচী হিসাবেও বইখানি নিশ্চয় প্রশংসনীয়। আমাদের মতে, বইখানির একাদশ পরিচ্ছেদের মধ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে—"রূপলোকের স্বাধীনতা" ও "অরূপের অপরূপ রূপ"—লেখকের মৌলিক চিন্তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই দুই পরিচ্ছেদে ভারতীয় রস-শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করে ভারতীয় শিল্প সাধনার নিগূঢ় রহস্য চমৎকার ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল এই দুইটী অধ্যায়ের জন্য আমি পাঠকদের বইখানি কিনে পড়িতে অনুরোধ করিব।

এই নূতন সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি করে দিয়েছেন—ডাক্তার কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—তাহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত 'ভূমিকা' লিখে। অনেক কথা যাহা লেখকের ভাষায় সব সময় স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—কল্যাণবাবুর 'ভূমিকায়' তাহা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হয়েছে। শিল্প সম্বন্ধে একটি স্বাধীন নিবন্ধ হিসাবে—কল্যাণবাবুর ভূমিকা বইখানিকে নিশ্চয়ই একটা নূতন কল্যাণে পুরস্কৃত করিয়াছে। দুইটা বিষয়-সূচীযুক্ত বর্ণানুক্রমে সুসজ্জিত ও সুমুদ্রিত বইখানি—সুন্দর প্রচ্ছদপটে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশকদের প্রশংসনীয় ও বহু ব্যয়সাধ্য উদ্যমের জয় ঘোষণা করিতেছে। আশা করি লঘু সাহিত্যের পাঠকের পরিধির বাহিরে—বাহিরে বিদগ্ধ বিদ্বৎমণ্ডলী—বইখানির যথেষ্ট সমাদর করিয়া প্রকাশকদের উদ্যম যথার্থ রূপে সার্থক করিয়া তুলিবেন। গ্রাহক ও পাঠকদের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে—বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডার গুরুগম্ভীর, মননশীল, চিন্তাশীল দার্শনিক সাহিত্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না। স্বাধীন ভারতে রূপশিল্পের গভীর ও সুচিন্তিত সমালোচনা উপযুক্ত সুযোগ না পাইলে ভারতের কৃষ্টির দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে সুগঠিত হইবে না।*

---

* যামিনীকান্ত সেন: "আর্ট ও আহিতাগ্নি" কার্ত্তিক ১৩৫৯, ২২৮ পৃষ্ঠা; প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১২৲।

অর্জ্জুনের বিষাদের কারণ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সম্মুখে রণ-পারাবার। পরপারে ভারত সাম্রাজ্যের প্রেয় সিংহাসন—যশ, মান, সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রম। অর্জ্জুনের রণ-কুশলতা অপূর্ব্ব। ধর্ম্ম তার সহায়। স্বয়ং বাসুদেব তাঁর সারথি। এক্ষেত্রে মোহের উদ্ভব কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ বিষণ্ণ পার্থ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করতে কৃত-সঙ্কল্প। তপ্ত রক্ত-নদী পার হয়ে তিনি সুধী অগ্রজকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান না।

মানুষ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। স্থূল-দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র স্বার্থের চাহিদায় আপনাকে ঘিরে তার বিশ্ব। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে তার ক্ষুদ্র স্বার্থে গড়া বিশ্ব ব্যাপ্তির বাসনার বেগে চঞ্চল। মানুষ রাখে গণ্ডীর মাঝে অন্তরাত্মাকে। কিন্তু অহোরহঃ সে গণ্ডীকে প্রসার করবার প্রেরণায় সে অস্থির। মানুষ চায় সম্প্রসারণ—প্রকৃতির সাথে, মনুষ্যের সাথে, মনুষ্যেতর জীবের সাথে মিলন। সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাস করবার বাসনা তার তিলার্দ্ধ নাই। প্রণয়ে ও কলহে সে চায় মানুষ। কলহে তার অশান্তি, কিন্তু নির্জ্জনতার শান্তি হতে কলহ অন্তের শান্তি তার প্রেয়।

মানুষের অন্তরাত্মা চায় আত্মীয়তা—একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। রাজা রাজত্ব করতে চায় নরের উপর ভূমির উপর নয়। যাদের জন্য রাজত্ব- তাদের অবর্ত্তমানে রাজ-সিংহাসনের লালসা অশোভন, নিরর্থক।

আদিকাল হ'তে চিরকাল মানুষ দল বেঁধে সমাজ গড়েছে। সভ্যতা বাড়ে দলের মধ্যে প্রেমের প্রাবল্যে। সামাজিক সৌন্দর্য্য আত্মীয়তার বিকাশে এবং সদাচারের বাঁধনে। যাদের সাথে রক্তের বা উদ্বাহের বাঁধন, ভারত চিরদিন তেমন আত্মীয় কুটুম্বের তুষ্টি, পুষ্টি ও পালন সদাচারের প্রধান অঙ্গ ব'লে মেনেছে। সমাজ-সৌধের প্রধান্ ভিত্তি পরিবার।

পাণ্ডব ও কৌরব এক মহীরুহের দুই শাখা। উভয়ের মধ্যে বিরোধ—রাজ্যলাভের প্রতিযোগিতা। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাণ্ডব পক্ষের প্রধান অবলম্বন অর্জ্জুনের শৌর্য্য, বীর্য ও রণ-কুশলতা। অথচ মোক্ষম সময়ে সে বিষণ্ণ। কেন?

অর্জ্জুনের বিষাদ প্রমাণ করছে ভারতের মজ্জাগত সংস্কার—স্বজন-প্রীতি, পরিজনের নিরাময়তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সুখের দিনে, ভোগের দিনে, পৃথিবীর সম্পদ নিয়ে আত্মীয় ভোগে আত্মীয়ের সাথে। কিন্তু তাদের প্রাণ, তাদের দেহ সংরক্ষণীয়।

এ নীতি ফুটে উঠ্‌লো পাণ্ডবের চিত্তের গভীরে যখন তার দৃষ্টি পড়লো আত্মোৎসর্গের জন্য উপস্থিত আচার্য্য—যিনি ভিন্নবংশের হলেও পিতৃ-সম্মানের দেব-সম্মানের অধিকারী। পিতৃব্য পিতামহ প্রভৃতি সম্মুখে—যাদের শ্রদ্ধার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্য পিণ্ডক্রিয়ার ব্যবস্থা সমাজে। আরও রয়েছেন মাতুল, ভ্রাতা, পুত্রস্থানীয় সুকুমারেরা, পৌত্র, সখা, শ্যালক এবং শ্বশুর। সৌহার্দ্য জীবনের বাঞ্ছনীয় ভূষণ। কে জানে সে দুর্গম রণে কার হবে জয়, কার হবে পরাজয়, কার যাবে প্রাণ, কে পাবে মানের সাথে পরিত্রাণ।

নিশ্চয় সুশিক্ষিত রাজকুমারের মনে উদয় হল শাস্ত্রের বাণী—পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথি-দেবো ভব।

অর্জ্জুনের বিষণ্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝি সেদিনের সামাজিক আদর্শ। অত্যাচার ও অনাচার-সদাচারের মূল শুকাতে পারে না। জ্ঞাতি-বিরোধের দিনেও, মজ্জাগত আত্মীয়তা-প্রীতির সংস্কারের উচ্ছেদ হয় না। স্পষ্ট কথা বল্লেন ভাই বীর—হে গোবিন্দ, যাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা—আমাদের কাঙ্ক্ষিত তারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। হে মধুসূদন—এঁরা আমাকে মারলেও, পৃথিবী সামান্য, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্য আমি এঁদের প্রাণবধ করতে চাহি না। এঁরা আততায়ী। কিন্তু এঁদেরও মারলে আমাকে পাপ আশ্রয় করবে।

আর্য্য সদাচার কুলধর্ম্ম মানে। সে কথা গুমরে উঠ্‌লো

স্বার্থের প্রাণে। আমরা তাঁর উক্তিতে সন্ধান লাভ করছি সেদিনের সুসভ্য সংসারের আদর্শের। আত্মীয় পালন, গোষ্ঠী-পোষণ, স্বধর্ম্ম-রক্ষণ কুল-ধর্ম্মের মর্য্যাদা। ভারতের ইহাই চিরদিনের জীবধর্ম্ম, সংসারের নীতি।

তার পর বিষাদের এক মূল কারণ বিবৃত করলেন অর্জ্জুন। হিন্দুর পিণ্ডোদক-ব্যবস্থা অতীতের সাথে বর্ত্তমানের সংযোগ-সূত্র। আত্মা অবিনাশী। দেহ গেলে আত্মা পোড়ে না, শুকায় না, লোপ পায় না। এ পৃথিবীর স্বল্পদিনস্থায়ী জীবন অনন্ত জীবনের এক টুকরা বিকাশ মাত্র। এ সত্যকে প্রাণের মাঝে জাগিয়ে রাখে পিণ্ড-তর্পণ ব্যবস্থা। কিন্তু ওঁ স্বধা বলবার অধিকারীর জীবনও যে পবিত্র। জীবনের সূত্র হওয়া চাই নিঃসন্দেহ সত্য। জন্ম-সূত্রে দোষ থাকলে কার পিণ্ড দেবে কে? এই পিণ্ডদান বিধির মাধ্যমে জন্মের পবিত্রতা রক্ষার সনাতন ব্যবস্থা করেছেন আর্য্য ঋষিরা। পিতৃ-পরিচয়ে অপচয় ঘটলে বংশের পবিত্রতা নষ্ট হয়। মাতৃজাতির পাতিব্রত্য এ সমাজের চিরদিনের আদর্শ নারী-ধর্ম্ম। হেথায় মাতৃ-শব্দ পবিত্র ধ্বনি।

যুদ্ধে মাত্র পুরুষগুলার মৃত্যু ঘটে, সদাচারী বীরের হয় দেহ-মুক্তি। যুদ্ধের পর অনাচারী ও পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অর্জ্জুন এ সত্য উপলব্ধি করলেন কুরুক্ষেত্রের রণ-দুন্দুভির ছন্দে ও শব্দে। দেবীর পীঠে সমাসীন মাতৃজাতি। সংসারের মলিনতা, প্রাত্যহিক জীবনের কঠোরতা যাতে তাঁদের না স্পর্শ করতে পারে, তার প্রতিরোধের কল্পনা ও ব্যবস্থা ভারতের আর্য্য সমাজের বিশিষ্টতা। কী সর্ব্বনাশ! কুলক্ষয়ে ধর্ম্ম উৎসন্ন হবে, কদাচার অনাচার, অত্যাচার লোপ করবে সদাচার। নগ্ন বর্ব্বরতা উচ্ছেদ করবে যত্নে-গড়া সভ্যতা! স্ত্রীজাতি হবে অপবিত্র, সে বর্ব্বরতার প্লাবনে। সত্যই তো সমাজভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে এ আসন্ন বিপদের করাল বিভীষিকা বিষাদের জনক। অর্জ্জুন যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলের পুণ্য-শ্লোক বীর। তাই বিজয়ের চিত্র হ'তে কুলক্ষয়ের ছবি তাঁকে করলে অভিভূত। তিনি হ'লেন বিষাদ-মলিন।

তাই বিষণ্ণচিত্তে বল্লেন সারথীকে বীরশ্রেষ্ঠ—অধর্ম্মাভিভূত হলে কুলস্ত্রী দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয়, নারী দুষ্টা হ'লে বর্ণ-শঙ্কর জন্মে।

কুলের সম্ভ্রম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য পাণ্ডব বাসুদেবকে সম্বোধন করলেন সেই নামে, যে নামে তাঁর বংশের পরিচয়—বার্ষ্ণেয়।

বিষাদ-যোগ বুঝলে, অর্জ্জুনের বিষাদের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি সেদিনের সমাজের আদর্শ। সে আদর্শ গভীরভাবে ক্ষত্রিয় বীরের চিত্তের গহনে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান ছিল।

শোক অনিবার্য্য কুলক্ষয়ে। কুলধর্ম্মের উচ্ছেদে সামাজিক বিশৃঙ্খলতায় দুঃখ অনিবার্য্য। পটভূমিতে প্রাণনাশ, ক্ষত্রিয় রক্তের স্রোতস্বতী। পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য যুদ্ধ জয়ে। কিন্তু ভাগীদার রহিল না, অথচ রাজ্য হল ঋদ্ধিতে ভরা—সেটুকুতো মাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয় এ জীবনে। দেবতাদের তুল্য আধিপত্য লাভেই বা ফল কি—যদি ইন্দ্রিয়গুলি শোকে অবশ হয়ে চিত্তে বিকার উৎপাদন করে।

কিন্তু এই সমাজিক চেতনার উপরে আছে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা। মানব-জীবন কর্ত্তব্যের গণ্ডীর পর গণ্ডীর চক্রে ঘেরা। জীবন-নদীর মূল প্রবাহ—কর্ম্ম। সেই স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবার উচ্চাঙ্গের বিধি-নিয়ম বিবৃত করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সে সত্যভাণ্ডারের চাবিকাঠি—অর্জ্জুনের বিষাদ। পরে একদিন ক্ষত্রিয় গৌতমের বিষাদ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল।

আত্মীয়-প্রীতির গণ্ডী সরস সম্প্রসারণের ক্ষেত্র। কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে চিত্তকে চিরদিন অবরুদ্ধ রাখলে বিনষ্টির আশঙ্কা। কারণ মানুষের কর্মভূমি ও সঙ্কল্পের বিশ্ব অনন্ত। গীতার একটি প্রধান শিক্ষা—ব্যাপ্তি। সম্প্রসারণ সর্ব্বজীবে মাত্র নয়, সারা বিশ্বে শিবসুন্দরের উপলব্ধি। অনাদি, অনন্ত, অব্যয় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন মাত্র বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রসাধনে—এ শিক্ষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নয়। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের আলোয়, অব্যভিচারিণী ভক্তির আনন্দ পথে চললে, এই স্থিতিহীন অশ্বত্থ জগতের প্রতি বিরাগ আপনি জাগবে চিত্তের গভীরে। কিন্তু মায়াময় জগতের পথ এড়িয়ে কৈবল্যধামে পৌঁছবার ব্যবস্থা কোথায় সংসারীর পক্ষে।

কর্ম্ম এক প্রধান সাধনা। প্রেম তার পাথেয়। জ্ঞান তার আলোর বাতি। প্রেমে ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে! জ্ঞানের আলো দেখিয়ে দেয় সে অসীম বিস্তৃতির স্বরূপ। পুত্রস্নেহ ছড়িয়ে পড়ে জগতের সকল শিশুর পরে, আত্মীয়তা ছড়িয়ে পড়ে, চেতনা বিশাল রূপ পায় যখন উপলব্ধি জাগে বসুধৈব কুটুম্বকের। বিশ্বের নিগূঢ় একতাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধারণার সোপান।

বিষাদ-যোগ প্রমাণ করে ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রীতি বা কৃপার প্রতিকূল নয়। সেই কৃপা অর্জ্জুনের মত ক্ষাত্রবীরের চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করেছিল।

ক্ষণিক মোহ বিরাট কর্ত্তব্য-পথে সৃষ্টি করে কুহেলিকার যবনিকা। চলার পথে বাধার পর বাধার সাথে যুঝে, প্রাকার ভেঙ্গে অগ্রগতি জীব-ধর্ম্ম মুক্তির পথে। তাই এ জীবনের প্রধান জপ-মন্ত্র—

ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

পথ-নির্দেশ

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

গোবিন্দ সরখেল উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের এক মহকুমায় মোক্তারী করত। কলকাতায় এসে মোক্তারী করার জন্য দুশো টাকা সরকারী সাহায্য পেল—কাছারীর পোষাক ও আইনের কেতাবপত্র কেনবার জন্য। মাস কয়েক আলীপুর, শিয়ালদহ, হাওড়া, হুগলী ঘুরে বেড়িয়ে কোথাও সুবিধা করতে না পেরে শেষে অন্য কোন ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে মতলব ভাঁজতে লাগল।

কিছুদিন পরে মোক্তার গোবিন্দ সরখেলকে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর একখানা খোলার ঘরে সাইবোর্ড টাঙিয়ে বিচিত্র রকমের এক 'সেলুন' চালাতে দেখে পরিচিত মহল অবাক হয়ে গেল। খোলার চাল দেওয়া একখানা ঘরের মাঝখানে রঙিন কাপড়ের স্ক্রীন্ দিয়ে পার্টিসন করা; এক দিকে লেখা আছে—মহিলা-বিভাগ, অপরাংশে পুরুষ বিভাগ। বাহিরে দরজার উপরে সাইনবোর্ড—"বৈজ্ঞানিক মতে কেশ শিল্পাশ্রম।'

দেখতে দেখতে সরখেলের সেলুন উঠল ফেঁপে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেশ শিল্পাশ্রমের রহস্য উপলব্ধি করবার জন্য তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তখন সাড়া পড়ে গেল—দোকান ঘরের আয়তন বড় হলো—কেশ-শিল্পের কারিগর বেড়ে গেল। সরখেলের বেশভূষাতেও পড়ল শিল্পীর ছাপ; চেহারায় চাকচিক্য দেখা দিল। কেশ-শিল্পাশ্রমের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায়—একখানি ছোট টেবিলের সামনে হাত বাক্স নিয়ে বসে আছে শিল্পাশ্রমের মালিক গোবিন্দ সরখেল।

ছাপানো ক্যাটালগে কেশ-শিল্পের নানা নিদর্শন—তরুণ তরুণীদের কেশ-কলাপের হরেক রকম চক্ষু চমৎকারী কারিকুরি! কারুকার্য্যের প্রকার ভেদে দক্ষিণার হার দু' টাকা থেকে ধাপে ধাপে নেমে আট আনায় থেমেছে। আবার—বিশেষ রকমের কাটাকুটি বা কারিকুরির চার্জ—পাঁচ টাকা! সন্ধ্যার পর এই বিশেষ বিভাগে স্থান পাবার আশায় প্রার্থী-

কয়েক মাস যায় এই ভাবে। সরখেলের ব্যবসা-বুদ্ধির খ্যাতি সকলের মুখে। কিন্তু হঠাৎ এ-হেন বৈজ্ঞানিক কেশ-শিল্পাশ্রমের দরজায় তালা পড়েছে দেখে সংশ্লিষ্ট মহল চমকে উঠল। কাণাঘুষায় শোনা গেল—বৈজ্ঞানিক কেশ-শিল্পাশ্রমের ব্যাপারেও সরখেল বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন কোন কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছিল, অবৈধ বা বে-আইনি বলে, যার জন্যে পুলিশের টনক নড়ে ওঠে; ফলে ওয়ারেণ্ট বেরুবার আগেই বিচক্ষণ সরখেল ফেরার হয়েছে।

শাস্ত্রে আছে—'যেসামন্যগতির্নাস্তি তেসাং বারাণসী গতিঃ।' সুতরাং অতঃপর ফেরার গোবিন্দ সরখেল ভোল বদল করে জীব-মুক্তির উদ্দেশ্যে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে একটা আধ্যাত্মিক আশ্রম খুলে দিব্যি জেঁকে বসলো। এখানে তার পরণে গৈরিক বসন, এক মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, ভুঁড়ি থেকে মুড়ি পর্যন্ত সর্বাঙ্গে ভস্মের প্রলেপ পড়ায় প্রথম দর্শনেই লোকে 'সাধু বাবা' বলে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। বেছে বেছে বাঙ্গালীটোলার এক সঙ্কীর্ণ মধ্যে অন্ধকারময় একখানি ঘর আশ্রয় করে নবাগত বাবা তাঁর সিদ্ধাশ্রম খুলে বসলেন। আশ্রমের নাম রাখলেন —'সাধন আশ্রম।' ঠেকে শিখে এবং কাশীর মত তীর্থ ক্ষেত্রে এসেই সরখেল বুঝতে পেরেছিল—সিদ্ধাই আশ্রম খুলে সাধুগিরির ব্যাপারের মত উচ্চস্তরের নিষ্কণ্টক ব্যবসা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। পুরো তিনটি মাস আশ্রমের মধ্যে সাধুরূপী সরখেল মৌনী হয়ে রইল। দিন কয়েক পরে কথাটা প্রথমে গঙ্গার ঘাটে মেয়ে মহলে জানাজানি হয়ে গেল—হিমালয় থেকে ভারি এক সাধু এসেছেন···সাক্ষাৎ শিব! কত কাল যে মুখ বন্ধ করে আছেন, কেউ জানে না। কাশীতেই নাকি মুখ খুলবেন, সেই জন্যেই কাশীতে এসেছেন। ধরা দেবেন না বলে অন্ধগলিতে অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু বাবা বিশ্বনাথই জানিয়ে দিয়েছেন।···ঐ

ভাবে কথাটা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৌনী সাধুকে দেখবার জন্য সেই ক্ষুদ্র গলির মধ্যে বইল জনস্রোত : তাদের মুখে মুখে মৌনী সাধুর নাম ও রটল "মৌনী বাবা!" স্থান-মাহাত্ম্য তো বটেই, তার উপর প্রচার-নৈপুণ্যের দরুন মৌনী অবস্থার মধ্যেই সাধুর শিষ্য-শিষ্যাণীর সংখ্যা বাড়তে লাগল— অযাচিত শ্রদ্ধার উপচারে সাধনা ঘরখানি নিত্যই ভরে উঠে মৌনী বাবার লুব্ধ মনটিও ভাবী আশায় ভরপুর করে তুলল।

পুরো তিনটি মাস একভাবে সাধন আশ্রমে শিষ্য-শিষ্যাণীদের সামনে মৌনী থেকে তার পর একদা সাধু বাবা তাঁর মৌনব্রতভঙ্গ করে মুখর হলেন। এখন থেকে চলতে লাগল সৎ উপদেশ—সেই সঙ্গে তাঁর অমৃত বাণীর প্রচার। এ-হেন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গোড়া থেকেই সাধুরূপী সরখেলের সঙ্গে এমন এক জবরদস্ত ভক্তের সংযোগ ঘটেছিল কাশীর ভদ্রসমাজ যার নাম শুনলেই শিউরে ওঠেন। সেই লোকটি বঙ্কিম বা বঙ্কা গয়লা ৵কাশীধামে কুখ্যাত—গুণ্ডামী বদমায়েসী প্রভৃতি যত কিছু অন্যায় ও অনাচারমূলক কাজ যেন তার সহজাত সংস্কারের মত। এমন এক মহেন্দ্রক্ষণে পরস্পর এরা চাক্ষুস পরিচিত হয়েছিল যে, উভয়েই উভয়কে চিনে নিয়ে ভাবী উপার্জনের একটা পন্থা স্থির করে ফেলেছিল। আর, সত্য কথা বলতে কি, ভোল বদলে সাধু সেজে কাশীতে এলেও গোবিন্দ সরখেল বঙ্কা গয়লার চোখে ধরা পড়ে যায়—জহুরীই জহর চেনে। ফলে, সরখেলের মৌনী বাবারূপে প্রতিষ্ঠার মূলে বঙ্কার কেরামতি বড় কম নয়! গোবিন্দ সরখেলও জানে, ভাল ভাবে প্রচার ছাড়া এ-যুগে কোন ব্যবসাই দানা বেঁধে ওঠে না। বঙ্কা গয়লার মত ভয়ানক প্রকৃতির লোক যদি তার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে নাম প্রচার করতে থাকে, তাহলেই কাশীশুদ্ধ লোকের তাক লেগে যাবে। সে-যুগে জগাই মাধাইয়ের মত দুই পাষণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্যত্ব স্বীকার করতেই নবদ্বীপ স্তম্ভিত হয়—দেশবাসী তাঁকে মহাপ্রভু আখ্যা দেয়। সরখেলের অদৃষ্টেও দেখা দিয়েছে এই পরম পাষণ্ড বঙ্কিম গোয়ালা।

বাস্তবিক, কাশীবাসী অকস্মাৎ বঙ্কা গোয়ালার সাধু-ভক্তির সঙ্গে মতিগতির পরিবর্তন দেখে চমকিত হলেন বৈ কি। যে লোক নেশা করে পথে ঘাটে গুণ্ডামী করে বেড়াত, এখন সে মৌনী বাবার পরম ভক্ত। যেখানেই দেখে দশ জন লোক জড় হয়েছে, বঙ্কা অমনি কাছে গিয়ে মুখে চোখে আর্তভাব ফুটিয়ে ফুঁফিয়ে উঠে বলে—"বাবার কৃপাগো বাপসকল! এমনি দয়ার চোখ—একটি বার তাকিয়ে এই মহা পাষণ্ডের মতিগতি ঘুরিয়ে দিলেন! সাক্ষাৎ শিব।" কোথাও বা বলে—"যদি ওনারে প্রসন্ন করতে পার, আর একটি বার চোখ মেলে তাকান—বাস্, তাহলেই কাজ সিদ্ধ··· দিন তার ফিরে গেল!" গঙ্গার ঘাটে সমবেত মেয়েদের শুনিয়ে প্রচার করে—"কোন রকমে একটি বার বাবার স্থানে গিয়ে চরণ দুটি পরশ করলেই হলো—সেই থেকেই দুঃখ দুর্ভোগ তার সবতে থাকবে···সুদিন ফিরে আসবে!"

শুধু কি বঙ্কিম গোয়ালা একা···তার চেলা সাকরেদরাও সহরময় মৌনী বাবার প্রচার কার্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কেউ বলে—"বাবার দেওয়া ভস্ম মেখে বাত সেরে গেছে।" কেউ জানায়—"তাঁর হাতের পরশ পেয়ে হাঁপানী থেকে মুক্তি পেয়েছে।" এইভাবে রোগমুক্তি, ধনপ্রাপ্তি, ভাগ্যোদয়ের কত কথা ও কাহিনী সুকৌশলে দিকে দিকে প্রচার হতে থাকে। দেখতে দেখতে সাধুর আশ্রম বেষ্টন করে ভাগ্যা-ন্বেষীদের মেলা বসে গেল। আশ্রমের ক্ষুদ্র কক্ষে স্থানাভাব, অথচ জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে লোকের কি ভীড়? জনৈক ধর্মপ্রাণ ধনী সিন্ধি-ব্যবসায়ী দশাশ্বমেধ রোডের প্রকাশ্য স্থানে অনেক টাকা খরচ করে সাধু বাবার এক আশ্রম নির্মাণ করে দিলেন। এখন থেকে সাধু বাবা প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে জলভ্রমণ করেন—স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারেন গঙ্গার অপর তীরে। লোকের মুখে মুখে রটে গেল—ইনি দ্বিতীয় "হরিহর বাবা!" কাশীর এক পুঁজিপতি মহাজন সকাল সন্ধ্যায় সাধু বাবার জল ভ্রমণের জন্য একখানি বজরা বরাদ্দ করে দিলেন। বিশিষ্ট শিষ্য ও শিষ্যাণীরা সাধু বাবার বজরায় স্থান পান। আশ্রম তাঁর সর্বক্ষণই গুলজার : আর—ভক্তদত্ত নানা উপচার—ফল মিষ্ট তরি তরকারি দুধ দধি ক্ষীর, এ সব ছাড়া টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি আনি পয়সা—বৃষ্টিবৎ বর্ষিত হয় তাঁর ধুনির চার দিকে।

আশ্রমে তাঁর এই একরূপ। আবার—এই মানুষটির অপর একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়···নিশীথ রাতে সারনাথ যাবার পথে বিস্তীর্ণ এক বাগান বাড়ীর মধ্যে। এখানে তিনি আর তখন—সেই গৈরিক কৌপীনধারী আত্মভোলা সাধু বাবা নন—পরণে তাঁর পপলিনের পায়জামা, গায়ে মিহি আদ্দির সার্ট। কথা বলেন

রাষ্ট্রভাষায়…হিন্দীতে। একেবারে খাঁটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক—কে বলবে যে, আসলে ইনি পূর্ববঙ্গবাসী…বাঙালী। বাগান বাড়ীর গেটে নেম প্লেটে উৎকীর্ণ—"জি, পন্থ।" কিন্তু মুস্কিল যত অন্দর মহলে। সেখানে ঢুকলেই পূর্ববঙ্গের ভাষা ও বেশভূষা কর্ণ চক্ষুকে যুগপৎ চমৎকৃত করে? তবে ইদানীং সরখেল একজন হিন্দুস্থানী মহিলাকে বাহাল করেছে বাড়ীর পরিজনদের হিন্দী ভাষা, উত্তর প্রদেশের বেশভূষা ও সেই সঙ্গে আদব-কায়দা সম্বন্ধেও পাকা-পোক্ত করে তুলতে। দিনের বেলায় এ-বাড়ী এতই নিস্তব্ধ থাকে যে, বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, বুঝি এখানে লোকজন কেউ থাকে না; কিন্তু রাত হলেই এ ধারণা পালটে যায়; তখন চার দিকে আলোর কুরকুটি, লোকজনের কিচিমিচি, পাখা চলে সারা রাত; গেটে বসে পাহারা—সারা রাত জেগে হাজির থাকে হয়া গোঁফ দাড়ীওয়ালা শিখ সান্ত্রী।

রাত দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেলে বাড়ীর একটা নিভৃত ঘরে একত্র হয় ত্রি-মূর্তির সংযোগ। সিঙ্কি ব্যবসায়ী বি, প্যাটেল, বঙ্কিম গোয়ালা ও সাধু-বাবা—গোবিন্দ সরখেল? সেই সময় দৈনিক উপার্জনের ভাগ বাটোয়ারা হয় তুল্যাংশেই ত্রি-মূর্তি স্ব স্ব ভাগ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন। সিঙ্কি প্যাটেল টাকা ঢেলে আশ্রম নির্মাণ করে উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছেন। বঙ্কিম গোয়ালার প্রচার-নৈপুণ্যেই সাধু-বাবা সুবিখ্যাত হয়ে উঠেছেন, আর—স্বয়ং সাধুবেশী সরখেলই হচ্ছেন এর প্রবর্তক—এঁরই পাকা মাথা থেকে এত বড় একটা লাভজনক ব্যবসায়ের পত্তন হয়েছে।

শারদীয়া পূজা। দশাশ্বমেধ ঘাটে সাধু-বাবার আশ্রমে খুব ঘটা করে নবতম পরিকল্পনায় মা দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মিত হয়েছে—সাধু বাবার নির্দেশে তাঁর আশ্রমের প্রতিমা অষ্টভুজারূপে সবার বিস্ময়োদ্রেক করেছে।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী—পূজার তিন দিন অষ্টভুজার প্রণামী মিলল নগদে সাড়ে তিন হাজার এবং এরই অনুপাতে অজস্র ও অপরিযাপ্ত ফল মিষ্টান্ন। সাধু বাবার প্রণামীর পরিমাণও প্রায় দু'হাজার। পূজার এই তিনটি দিন বঙ্কিম গোয়ালা কিন্তু একাগ্রচিত্তে মহামায়ার পূজায় আত্মনিয়োগ করেছিল; প্রত্যহ শুদ্ধ মনে অনশনে থেকে পূজাস্থানে বসে সে শুনেছে পূজার মন্ত্র—চণ্ডীপাঠ; পুরোহিতের মুখে সে শুনেছে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা ও তাঁর মাহাত্ম্য কথা। তিনি বলেছেন—ইনিই জগন্মাতা মঙ্গলময়ী দুর্গা। ইনি বিশ্বের মঙ্গলদাত্রী, শক্তিদায়িনী। এই মহাপূজা কোন নির্দিষ্ট জাতি বা কোন প্রদেশ বিশেষেরই মঙ্গলের জন্য নয়—এই পূজার আয়োজন সমস্ত জগতের মঙ্গল ও শান্তির জন্য। জননী দশভুজা দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করে আমাদের রক্ষা করবেন সকল প্রকার অত্যাচার ও অবিচার হতে। কায়মনোবাক্যে পবিত্র চিত্তে এই পূজায় প্রবৃত্ত হলে—পূজাস্থানে বসে শ্রদ্ধাভক্তির সংগে এই মহাপূজার আখ্যান শ্রবণ করলে—মহামায়ী জগজ্জননী দুর্গা অবশ্যই প্রসন্ন হবেন। কিন্তু যদি এই পূজার অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে থাকে স্বার্থপরতা, হীনতা, সঙ্কীর্ণতা—তাহলে সবই ব্যর্থ হবে।

দেবীমাহাত্ম্য শুনতে শুনতে বঙ্কিম অপূর্ব এক ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল; তার পাপবিদ্ধ অন্তরের উপরে ধীরে ধীরে ভক্তি ও বিশ্বাসের একটি রেখাকে বুঝি গভীর ভাবে এঁকে দিচ্ছিল; কিন্তু…তার পর…শেষের কথাগুলি শোনবামাত্রই সে একেবারে সভয়ে শিউরে উঠল!…পুরোহিত ঠাকুর একথাও বলেছেন—'যদি থাকে মনের মধ্যে স্বার্থপরতা হীনতা সঙ্কীর্ণতা…তাহলে…তাহলে…এপূজা পণ্ড হবে!…পরক্ষণে তার সমস্ত অন্তর মথিত করে অনুশোচনার একটা বিষাক্ত বাষ্প যেন ঝঞ্জার মত বয়ে গেল—সেই সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল…এই পূজার পিছনে যে সব মিথ্যাচার ভণ্ডামী ও শঠতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মায়ের নাম ভাঁড়িয়ে তারা যে ভক্তদের প্রতারিত করেছে—এ যে মহাপাপ! মায়ের কাছে, শক্তিরূপা চণ্ডীর কাছে—কত বড় তারা অপরাধী! সে নিজে, সেই সঙ্গে পাপিষ্ঠ প্যাটেল, আর এই নাটের গুরু…ঐ ভক্তবিটেল সাধু!

স্বভাবদুর্বৃত্ত পাপীর মনে এ অনুশোচনা বিচিত্র ও বিস্ময়কর বৈকি! কিন্তু শুদ্ধচিত্তে শুচিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার এই তিনটি দিন পুরোহিতের মুখে শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য শুনে, মহাপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে, সে যে জেনেছে—নিষ্ঠার সঙ্গে এই পূজা দেখলে, দেবীমাহাত্ম্য শুনলে, মানুষের মনে হয় শুভবুদ্ধির উন্মেষ, ফলে অতীতের সকল পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে দেবীর কৃপায় মুক্তিলাভ করে। বঙ্কিমও এর পর ভাবতে থাকে—আগে আমি যাই থাকি, যত অন্যায় অপরাধ করে থাকি,

কিন্তু পূজার তিনদিন যখন মায়ের প্রতিমার সামনে বসে মায়ের পূজা আগাগোড়া দেখেছি, তাঁর অপরূপ মাহাত্ম্য শুনেছি, তবে আর আমার ভাবনা কি? মায়ের এই মাহাত্ম্য বেধস মুনিঠাকুরের মুখে শুনেই তো রাজা সুরথ, আর সেই সমাধি বৈশ্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন! আমিও তো সেই মাহাত্ম্য কথা শুনেছি, তবে মহামায়া তাঁর এই ভক্ত সন্তানকে কেন দয়া না করবেন? বঙ্কিম তখন মায়ের প্রতিমার পানে ভাবাপ্লুত দৃষ্টিতে চেয়ে গাঢ়স্বরে প্রার্থনা জানাল—"মাগো, সত্যই আমি মহাপাপী, কিন্তু তোমার সন্তান। তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা, তোমার নাম করে যে অন্যায় এখানে হয়েছে মা, তা নিবারণ করবার ক্ষমতা আমাকে দাও, আমাকে পথ দেখাও মা!

অন্তর থেকে আর্তরব তার কণ্ঠে এসে যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে—'ক্ষমা কর মা—এ অন্যায় ঠেকাবার ক্ষমতা দাও—পথ দেখাও।' মা, মাগো, জগৎজননী তুমি—অভাগা সন্তানের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর মা! সারা জীবনটা পাপের পথ ধরে ছুটোছুটি করে, শেষে তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করেছি মা—ভণ্ডামীর ধূয়ো তুলে, হাজার হাজার লোকের চোখে ধূলো দিয়ে, তোমার নাম করে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করেছি মা! এ মহাপাপ থেকে উদ্ধার কর মা— উদ্ধার কর! এই সব অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত করবার উপায় আমাকে বাতলে দাও জননী।

আর্তকণ্ঠে অনুতপ্ত পাপীর সে কি আর্তনাদ! অনুশোচনাময় অন্তরের অবিরল অশ্রুধারায় সিক্ত হলো মন্দিরতল; মুখে একই বুলি—মা! মা! মা! মা!

সারাদিন একাসনে উপবিষ্ট অনশনক্লিষ্ট অনুতপ্তের অবসন্ন দেহমন নিদ্রার পরশে রাতের শেষভাগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল; সেই অবস্থায় সে অনুভব করল—যেন কোন্ কোমল কর-কমলের স্নিগ্ধ পরশ পড়েছে তার সারা শরীরে! সেই পরমক্ষণে অনুতপ্ত পাষণ্ড কি কোন মুক্তির নির্দেশ পেল? কি—কে জানে!···কিন্তু পরক্ষণেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল—স্বপ্নাবিষ্টের মত তাকাল অষ্টভূজার মৃন্ময়ী মূর্তির দিকে;—কি করুণাময়ী মূর্তি এখন মায়ের, দিব্য আননে কি প্রসন্ন হাসি!

বালকের ন্যায় চীৎকার করে উঠল বঙ্কিম—উচ্ছ্বাসের সুরে আবেগভরে বলল—পেয়েছি মা পেয়েছি; তুমি যে মা দীনতারিণী, দুর্গতিনাশিনী; তাই পাষণ্ডের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানিয়ে দিলে! মাগো, আমার মনে বল দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও, সার্থক হোক এই পূজা।

বিজয়াদশমী। অতি প্রত্যূষে পূজামণ্ডপে এসে উপস্থিত হলো সরখেল ও প্যাটেল। বিনা ভূমিকায় বঙ্কিম বলল—'তিনদিনে পূজায় যে টাকা উঠেছে, কোথায়?' প্যাটেলও তৎক্ষণাৎ টাকার একটি থলি বঙ্কিমের সামনে রেখে বলল—'তোমার হিস্যা এতে সব আছে।' কণ্ঠস্বর কিছু উগ্র করে বঙ্কিম বলল—'শুধু আমার হিস্যা নয়—সব টাকা চাই, আনো এখনি।' চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সরখেল বলল—'এর মানে? বঙ্কিম তখন মানেটা বুঝিয়ে দিল—মনে নেই, পূজার ব্যবস্থা করে সবাইকে বলা হয়েছিল—এই পূজায় যে টাকা উঠবে···মন্দিরে এই তিন দিন যে যা দেবে—সে সবই দরিদ্রনারায়ণের সেবায় লাগানো হবে। কি ভাবে সেটা খরচ করলে মায়ের এই পূজা সার্থক হবে···মায়ের সামনে বসে এই তিনদিন তিন রাত আমি সেই চিন্তাই করেছি; মায়ের কৃপায় তা জানতে পেরেছি···মহামায়ীর ইচ্ছা—সমস্ত টাকা তাঁর উদ্বাস্তু সন্তানদের দিয়ে সাহায্য করা হোক—তাহলেই জগজ্জননী হবেন তুষ্টা, তাঁর পূজা হবে সার্থক, আমরা হব ধন্য।'

প্যাটেল ও সরখেল যন্ত্রচালিতের মত একবার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল—সেই নীরব দৃষ্টি যেন ব্যক্ত করল···এ কি কাণ্ড! ভূতের মুখে রামনাম যে! সরখেল তখন শ্লেষের সুরে বলল—'বুঝেছি, সারারাত মন্দিরে বসে একলাই নেশা করা হয়েছে, তাতেই চোখ দুটো জবাফুলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, মুখে কোন কথা আটকাচ্ছে না···এই জন্যেই বুঝি আমাদের সঙ্গে যাওয়া হয় নি?'

ধীরকণ্ঠে বঙ্কিম উত্তর করল—'ঠিক ধরেছেন আপনি সরখেল মশাই, নেশার লোভেই আমি মন্দিরে পড়েছিলাম। আর, এই আশীর্বাদ করুন—এ-নেশা আমার যেন আর না ভাঙে। আমিও আপনাদের দুজনকেই মিনতি করছি, আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে একবার মা'র মূর্তির পানে তাকান দেখি—যদি ভাগ্যে থাকে, আপনাদের চোখেও নেশা লাগবে।

সরখেল বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে বলল—'এখন বুজরুকি রাখ; মুখ বন্ধ করে নিজের ডেরায় যাও—লোকজন আসবার সময় হয়েছে।'

বঙ্কিমের সেই কোমল মূর্তি পলকে যেন বদলে গেল; তর্জনের সুরে হুকুমের ভঙ্গিতে বলল—'এখন আসল কথায় এসো—পূজায় পাওয়া সমস্ত টাকা আন এখনি—নৈলে তোমাদের নিস্তার নেই।' কথাটা শুনে প্যাটেল হো হো করে হেসে উঠল। সরখেল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল—'গোয়ালার বুদ্ধি তো!' আর যায় কথায়! তীরের বেগে খাড়া হয়ে উঠে বঙ্কিম তার বলিষ্ঠ দুই হাতে সরখেল ও প্যাটেলের গলা একসঙ্গে চেপে ধরে বলল—'মায়ের সামনে আজ এই বিজয়া দশমীর সকালে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করব—নিজের হাতে বলি দিয়ে এই পূজা করব সার্থক।'

প্যাটেল ও সরখেল বঙ্কিমের সবল বাহুপাশ থেকে মুক্তির জন্য বল প্রকাশ করতে লাগল। এই সময় প্রতিমার সামনে বলির প্রকাণ্ড খড়্গের উপর পড়ল বঙ্কিমের দৃষ্টি। দুই পাষণ্ডকে সহসা মুক্তি দিয়েই সে বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে গিয়ে সেই শাণিত খড়্গ সবলে তুলে ধরল। দুর্দ্ধর্ষ বঙ্কা গোয়ালাকে খড়্গ হস্তে রুদ্র মূর্তিতে দেখেই প্যাটেল ও সরখেল এই দারুণ সঙ্কটে নিরুপায় হয়ে সভয়ে করযোড়ে শরণার্থী হলো তার কাছে। বঙ্কিম তখন অদ্ভুত হাসি হেসে বজ্রকণ্ঠে বলল—'মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্—মূর্তি কি ভীষণ হয়েছে! যদি বাঁচতে চাস্—পূজায় মায়ের নাম ভাঁড়িয়ে যে টাকা পেয়েছিস্—সব ওঁর পায়ের কাছে রাখ্! ক্ষমা চেয়ে নে—এতদিন যে সব পাপ করেছিস তার জন্যে। শপথ কর—কখনো এভাবে কোনো অন্যায় করবি না; বিনা দ্বিধায় সব টাকা উৎসর্গ করবি দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। দুর্জনেই তোরা উদ্বাস্তু; একজন এসেছিস পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে; আর একজন পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারা অভাগা। আজকের দিনের উদ্বাস্তুদের দুঃখ বেদনা তোদের প্রাণে বাজে না—এর চেয়ে তাজ্জবের কথা আর কি হতে পারে! যদি আমার কথা গ্রাহ্য না করিস্—সব কথা আমি এখনি পুলিশকে জানাবো, নিজে রাজার সাক্ষী হয়ে তোদের সব কীর্তি প্রকাশ করে দেব!

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে প্যাটেল ও সরখেল এক সঙ্গে মহামায়ার মৃন্ময়মূর্তির সামনে প্রণত হয়ে বলল—মাগো, এমন ক্ষণ আর উপলক্ষ ঘটনাচক্রে আসে, সবই ওলট পালট হয়ে যায়—মূলে তার তোমারই ইচ্ছা; তুমি যে মা ইচ্ছাময়ী। আমাদের মার্জনা কর মা!

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

নির্মল দত্ত

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি সুবিদিত। শুধু বাংলায় কেন, বাংলা তথা ভারতের বাইরেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের নাম আছে। কৃষ্ণনগরের পুতুলের কথা অন্ততঃ বাংলা দেশের ছেলে-বুড়ো সকলেই জানেন। মৃৎশিল্পে এত বড় বৈশিষ্ট্য এক কৃষ্ণনগর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের নির্মিত মূর্তি প্রভৃতি আজও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, বৃটিশ মিউজিয়ম, চিকাগো মিউজিয়ম প্রভৃতি বিদেশীয় যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে।

শুধু মাটী আর রঙ্ দিয়ে, এমন কি রঙ্ না দিয়েও এমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী হ'তে পারে এবং কত বড় সূক্ষ্ম ও নিখুঁত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, তা এই মৃৎভাস্কর্যগুলি না দেখ্‌লে সঠিক উপলব্ধি করা যায় না। শিল্পীদের শিল্পচাতুর্যের কথা ভাব্‌লেও বিস্মিত হ'তে হয়। কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার না ক'রেই শুধু হাত বা বড় জোর সামান্য একটা কাঠির সাহায্যে মাটীর ওপর কাজ ক'রে ক'রে যে এমন জিনিষ তৈরী হ'তে পারে এ তাঁদের অসাধারণত্বের পরিচয় ছাড়া কি? শিল্পীরা যখন মাটী নিয়ে একাগ্রমনে পুতুল গড়তে বসেন, তখন মনে হয়, কত সাধনা, কত শ্রম, কত ধৈর্য, কত দরদ দিয়েই না এগুলো তৈরী হচ্ছে!

একদিকে যান্ত্রিক যুগ ও অন্যদিকে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের চাপে আমাদের দেশের কুটীর-শিল্প ছিল অবহেলিত, তার ওপর দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভগ্নপ্রায়—তাই অন্যান্য কুটীর-শিল্পের মত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পই বা সমাদর পাবে কি ক'রে! ফলে, মৃৎশিল্পে এত বড় নৈপুণ্য দেখিয়েও এবং দিন দিন তা উন্নতির পথে এগিয়েও এই মুষ্টিমেয় শিল্পীদের একাংশ তবুও নিজেদের সাধনা নিয়ে টিকে থাক্‌তে পারে নি। তাই জীবিকার্জনের জন্যে অনেককে মাটীর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধর্‌তে হয়েছে। যাঁরা আজও এই শিল্পটাকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছেন তাঁদের অবস্থাও এমন কিছু আশাপ্রদ নয়। তবে আশার কথা, ভরসার কথা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা দেখাচ্ছেন। তাই আশা হয়, হয়ত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ভবিষ্যতও একদিন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌বে।

কৃষ্ণনগরের বর্তমান মৃৎশিল্পের পরিচিতি যে কতদিনের, তার সঠিক

তারিখ বলা যায় না। তবে কিছুটা যা হিসাব ক'রে পাওয়া যায়, তাতে এর বয়স প্রায় দু'শো বছরের কাছাকাছি। তবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে বাদ দিলে মাটী থেকে নির্মিত জিনিষের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে চ'লে আসছে তা জানতে পারা যায়। তক্ষশীলা ও মহেনজোদারোতেও পোড়ামাটীর নির্মিত সুন্দর সুন্দর জিনিষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মাটী থেকে বিভিন্ন মূর্তি ও গহনা প্রভৃতি যে নির্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ ফরিদপুরেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তবে এগুলো তত প্রাচীন নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বিভিন্ন মাটীর মূর্তির নিদর্শন মেদিনীপুরেও পাওয়া যায় এবং বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় বা পাণ্ডুয়াতে পোড়া ইটের ওপর কারুকার্য আজও দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইজিপ্টের প্রাচীন উপাসনা গৃহাদি খুঁড়েও তখনকার যুগের মাটীর জিনিষপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু মৃৎশিল্পে এমন নৈপুণ্য এক কৃষ্ণনগর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এর আভিজাত্য যেন শুধু কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদেরই জন্মগত

কৃষ্ণনগরের জনৈক শিল্পী কোনো এক সাধকের মূর্তি-নির্মাণে রত

প্রাপ্ত ও মনে-প্রাণে জড়িত। কেবল পুতুলই নয়, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা যে কোনও জীবন্ত লোককে সম্মুখে বসিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুধু মাটী দিয়ে ফটোর মত তাঁর হুবহু চেহারাটাকে গ'ড়ে দিতে পারেন। বৃটিশ আমলের বড়লাট, ছোটলাট থেকে সুরু ক'রে বহু ব্যক্তিই এইভাবে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দিয়ে স্ব স্ব মূর্তি নির্মাণ করিয়ে নিয়েছেন। এ যুগের ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের মূর্তিও এখানকার শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন। কলকাতার বড় বড় প্রতিমাগুলোই শুধু এখানকার শিল্পীরা নির্মাণ ক'রে থাকেন তা নয়, কোন মডেল বা কোন মূর্তি তৈরী করতে হ'লে আজও বহু দূর দেশ থেকে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের ডাক পড়ে। বর্তমানে এখানকার শিল্পীরা শুধু মাটীর মূর্তিই নির্মাণ করছেন তা নয়, মাটী থেকে প্লাষ্টার এবং প্লাষ্টার থেকে পাথরের মূর্তিও নির্মাণ করছেন। এই পাথরের মূর্তিগুলো নির্মাণ করতে শিল্পীদের কি পরিশ্রমই না করতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে পাথরের মূর্তি কোন অংশেই মাটীর নির্মিত মূর্তি থেকে পার্থক্য হয় না।

প্রতিমা নির্মাণে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের খ্যাতি তো আছেই। তা ছাড়া দেব-দেবী, জীবজন্তু, মানুষ, খাদ্যদ্রব্য, ঘরবাড়ী, ফলমূল প্রভৃতি আমাদের আশে-পাশে যে সব জিনিষ সদাসর্বদা দেখতে পাই তার প্রায় অধিকাংশই এখানকার শিল্পীরা মাটী দিয়ে তৈরী করতে পারেন। এমন কি, রামায়ণ, মহাভারত বা যে কোনও গল্পের এক একটা দৃশ্যও এঁরা মাটীর পুতুল দিয়েই সাজিয়ে দিতে পারেন। এখন মাটীর নির্মিত বিভিন্ন জিনিষগুলির নাম করা যাক—

দেবদেবী—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব, মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, নটরাজ প্রভৃতি দেবদেবী এবং বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক বা মহাপুরুষগণের মৃন্ময় মূর্তি এমনই সুন্দরভাবে নির্মিত করা হয়ে থাকে যে ভক্তির উদ্রেক না ক'রে পারে না।

আবক্ষ বা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি :—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিভিন্ন মৃত বা জীবিত মনীষী ও নেতৃবৃন্দের আবক্ষ বা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি এমন নিখুঁতভাবে নির্মিত হ'য়ে থাকে সেগুলোর ফটো তুললে বোঝা যাবে না যে, এগুলো প্রকৃত মানুষের অথবা মাটীর তৈরী।

পুতুল নির্মাণ রত মৃৎশিল্পীরা—কৃষ্ণনগর

খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত :—পানতোয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ, সিঙাড়া এমন কি বিস্কুট পর্যন্ত অতি নিখুঁতভাবে নির্মিত হ'য়ে থাকে। দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ বা সুপারি না খাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না মাটীর তৈরী কিনা! আর এক সঙ্গে দিলে তো আসল নকল পার্থক্যই করা যাবে না।

মনুষ্য মূর্তি :—মনুষ্য মূর্তি বিষয়ক পুতুলগুলো তৈরী ক'রেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের খ্যাতি সুবিস্তৃত। এই সকল মূর্তিগুলোই অধিক সংখ্যায় বিদেশে রপ্তানী হয়। যেমন—সাপুড়ে, দর্জি, ঝাড়ুদার, ভিস্তিওয়ালা, মেছুনী, ধোপা, সৈনিক (শিখ ও গুর্খা), পুলিশ, খানসামা আয়া, বাঁকী, পিয়ন, বরকন্দাজ, কাবুলীওয়ালা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, যাদুকর, বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ভিক্ষুক, কৃষক, ধীবর, মুচি, সন্ন্যাসী, চীনদেশীয় লোক, ইংরাজ, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, ফকির, চৌকিদার, ডাকবাহক, চাপরাশি, তন্তুবায়, মোক্তার, নাপিত, বেদে, মাড়োয়ারী, দোকানী, তরকারী বিক্রেতা, তৈলকার, সন্তানক্রোড়ে নারী প্রভৃতি মানব সমাজের বিভিন্ন জাতি ও উপজীবিকা ভেদে এই মূর্তিগুলো এমন অপূর্বভাবে নির্মিত হ'য়ে থাকে যে, মূর্তিগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

ফলমূল :—আমরা সাধারণতঃ যে সকল তরকারী বা ফলমূল দেখতে পাই, তার প্রায় সবই মাটীর নির্মিত হ'য়ে থাকে। যেমন—আলু, পটল, বেগুন, কলা (কাঁচা ও পাকা), কুমড়া, ঝিঙে, পেঁপে, আম, কাঁঠাল থেকে

সুরু ক'রে কমলালেবু, ন্যাসপাতি, কুল, পেয়ারা, বেদানা, আঙুর, আপেল, তাল, ডাব প্রভৃতি প্রতিটী জিনিষ অতি নিখুঁতভাবে তৈরী হ'য়ে থাকে।

পশুপক্ষী, পোকামাকড় ও মৎস্য সংক্রান্ত :—গরু, হাতী, উট, বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, টিকটিকি, গিরগিটি, কাঁকড়া, মাকড়সা, বিছা প্রভৃতি থেকে সুরু ক'রে ইলিশ, রুই, কাৎলা প্রভৃতি মাছগুলোও অতি দক্ষতার সঙ্গে তৈরী হ'য়ে থাকে। গল্দা চিংড়িকে তো সত্যি ব'লেই মনে হয়।

এ ছাড়াও নৌকাসংক্রান্ত বা বজরা প্রভৃতি, গরুরগাড়ী, চালাঘরে মুদি বা খাবারের দোকান, শ্রাদ্ধ-বাসর, বিবাহ-বাসর, মাঠে লাঙল দেওয়া, কামারশালা, চড়কপূজা, তালগাছ, রথযাত্রা, মহরমের মিছিল, ষাঁড়ে-ষাঁড়ে লড়াই, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, খাবারপূর্ণ রেকাব, হাওদাসহ হাতী, হাতীতে চ'ড়ে শিকারে যাওয়া, বেহারার কাঁধে পাল্কি

গান্ধীজীর মৃন্ময় মূর্তি হইতে গৃহীত ছবি

প্রভৃতি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরী হ'য়ে থাকে যে, দেখলে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না।

মাটীর পুতুল ছাড়াও কৃষ্ণনগরের মাটীর পাত্রও বিশেষ খ্যাত। কিন্তু এত খ্যাতি, এত হাঁকডাক থাকা স্বত্বেও শিল্পীদের অধিকাংশই আজ খেতে পান না। তার কারণ মাটীর পুতুলের আর সমাদর নেই। মানুষ এখন সস্তা জৌলুষ ও চাকচিক্যের মোহে ছুটে চলেছে এবং তার ওপর অর্থনৈতিক দুর্দশাও জনসাধারণের কম নেই। তাই মাটীর পুতুলের জন্যে কে আর অর্থব্যয় করছে! যে শিল্প একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল, আজ ঠিক সেই পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই সেই শিল্পটী মরতে বসেছে। জাতীয় সরকারকে এখন তাই শিল্পটীর পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ৺রাখালদাস পাল, ৺যদুনাথ পাল, ৺পরাণচন্দ্র পাল, ৺বক্কেশ্বর ৺গোপেশ্বর পাল প্রভৃতি শিল্পীরা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি দিয়ে গিয়েছেন। আজও সেই শিল্পীদের বংশধররা আছেন, সহযোগিতা পেলে শিল্পটীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উন্নতি ঘটাতে হ'লে কয়েকটী বিষয়ের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। প্রথম হচ্ছে—মাটীর তৈরী সহজভঙ্গুর। এইজন্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাল-ব্যবহার ক'রে চীনা মাটীর (Procelain) বা পাথুরে (Stone-ware) জিনিষ তৈরী ক'রে বিদেশে চালান দেওয়া। জিনিষ টেঁকসই হয় ব'লে চালান দেওয়া সুবিধা। দ্বিতীয়—মৃৎশি

একটি মূর্তি

প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্যে কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয় বা মিউজিয়ম প্রয়োজন। তৃতীয়—ভারতে বা ভারতের বাইরের প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগ মৃৎশিল্পজাত জিনিষগুলো পাঠানো। এতে প্রচারের সুবিধা হ পারে। এ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়কেন্দ্র খো চতুর্থতঃ—দুঃস্থ শিল্পীদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য ও ঋণ দেওয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া। পঞ্চমতঃ—ভারতের বিভিন্ন যে মডেলগুলি দরকার হয় তা কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দিয়ে নেওয়া।

এই প্রস্তাবগুলো কাযে পরিণত হ'লে এবং সরকারের সাহায্য সহযোগিতা পেলে শিল্পটীর যে অশেষ উন্নতি বিধান হবে তাতে সন্দেহ নেই।

গান

মাগো, তোমার বহ্নি-পরশ বিছাও প্রাণের অতল তলে,
তাইত কত মেঘ-আড়ালে দেখি কত সূর্য জ্বলে।
অচিন উষা ছড়ায়ে হাসি
মূর্ত স্বপন-ছন্দে আসি',
মর্ম-গোলাপ জাগে তারি চির রাঙা বিকাশ-দলে,
মাগো, তোমার বহ্নি-পরশ বিছাও প্রাণের অতল তলে।

কত বাধার ঢেউ-বুকে ছায় জাগর গতির কলধ্বনি
আঁধার-পথে উজল করি', মাগো তোমার চরণমণি।
তোমার মোহন সুরনূপুরে
ভেসেছি আজ নীলসুদূরে,
শরণ-বীণা উঠল বাজি' মুক্ত-প্রাণের সমুচ্ছলে।
মাগো, তোমার বহ্নি-পরশ বিছাও প্রাণের অতল তলে

কথা ঃ রবি গুপ্ত   সুর ঃ নীহারবালা   স্বরলিপি ঃ সাহানা দেবী

তাল কাহারবা

II { পা দা | দর্সা র্সা -া র্সণা | ণদা -া দা -া | দণা ণদণা -া ণা |
মা গো তো মা - র ব - হ্নি - প - র - - শ

ণপা -া পা দমা | মপা মা দপাঃ মঃ | ণ্া সা মজ্ঞা মপা |
বি - ছা -ও প্রা - ণে - র অ ত ল ত -

মপা -া -া -া | -া -া } -া -া |
লে - - - - - - -

পা ণদা পদা পমা | মা মা মা মা | মা জ্ঞমা দজ্ঞা জ্ঞা |
তা - -ই ত ক ত মে ঘ্ আ ড়া - লে

জ্ঞা জ্ঞাদ মা -া | সা ঋা সণ্া ণ্সা | -া ণ্া দ্প্া দ্া |
দে - খি - ক ত - সূ- - র্ য - -

ণ্সা জ্ঞঋা সা -া | -া -া II
জ্ব - - লে - - -

{ জ্ঞা মা দণা ণা | ণা -া র্সণা ধণা | জ্ঞা পমা ণমা র্সণর্সা |
(১) অ চি - ন উ - ষা - ছ ড়া - - য়
(২) তো মা - র মো - হ ন্ সু - র - -

র্সা -া র্সা -া | র্সঋা -া ঋা -া | ঋা ঋা র্সা -া |
(১) হা - সি - মূ - র্ ত - স্ব প ন -
(২) নূ পু রে - ভে সে - ছি আ - জ -

ণা র্সা র্সদা ণা | ণপণা দণা পা -া } পা ণদা পদা পমা |
(১) ছ ন্ দে - আ - - সি' - ম - য় ম -
(২) নী - ল - সু দূ রে - শ র - - ণ -

মা মা -া মা | মা -া জ্ঞমা দজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞদা মা -া |
(১) গো লা - প জা - গে - - তা - রি -
(২) বী - ণা - উ ঠ্ ল - - বা - জি' -

ণ্া সা জ্ঞা মা | পা মা দা পা | ণা দা দণর্সা র্জর্জ্ঞা |
(১) চি র রা ঙা বি কা শ - দ - লে - -

র্সা -া -া -া | ণা ণা ণধা ণা | পা পণা দণা দা |
- - - - চি র রা - ঙা বি কা - - শ

মজ্ঞা রাঃ জ্ঞঃ পা | -া -া { র্সা র্সা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞরা র্সর্জ্ঞা |
দ - - - লে - - মা গো তো মা - র -
(২) মা গো তো মা - র -

র্জর্ঋা -া র্সা -া | দণা দণর্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -া |
ব ন্ - ছি - প - র - - শ বি - ছা ও
ব ন্ - ছি - প - র - - শ বি - ছা ও

ণ্া সা জ্ঞা মা | পা দা দপা পদা | দঋা -া সা -া | -া -া } ||
প্রা - ণে র অ - ত - ল - ত - - লে - - -
প্রা - ণে র অ - ত - ল - ত - - লে - - -

ণ্া সা জ্ঞা মা | পা মা দা পা | ণা ণা দা র্সর্জ্ঞর্া |
(২) মু - ক্ত - প্রা ণে র - স মু চ্ ছ -

র্সা -া -া -া | ণা ধা ণধা ণা | পা পণা দণা পা |
(২) লে - - - মু - ক্ত প্রা ণে - - র

জ্ঞরা জ্ঞরজ্ঞা -া দা | পা -া |
(২) স - মু - চ্ ছ লে -

তাল তেওরা

{ সা সমা মা | মা মা | মপা ণদা | পা মা পা | পরা মা | জ্ঞা -া |
ক ত বা ধা র্ ঢে - - উ বু কে - ছা - য় -

জ্ঞা জ্ঞজ্ঞসা পণদা | পা -া | মা পমা | মরা রা মা | জ্ঞা -া | -া ঋা |
জা গ - - - য় গ - তি র্ ক ল ধ্ব নি - - -

ঋা ঋা ঋা | ঋা -া | সঋা জ্ঞমা | মসা সজ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা | ণ্দা ণ্া |
আঁ ধা র প - থে - - উ জ - ল ক রি' মা - গো

সা সজ্ঞা জ্ঞা | ঋা ঋা | সঋা জ্ঞঋা | জ্ঞঋা সা -া | -া -া | -া -া
তো মা র চ র ণ - - ম - ণি - - - - -

শরৎচন্দ্রের ধর্ম-বিশ্বাস

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ৎচন্দ্র অনেক সময় বন্ধুমহলে নিজেকে একজন "ঘোরতর নাস্তিক" প পরিচয় দিতেন। এ কথা যেমন তিনি মুখে বলতেন, তেমনি বার কখনো কখনো চিঠিপত্রেও লিখে জানাতেন। কিন্তু এইভাবে নি নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিলেও, আসলে তিনি আদৌ স্তিক ছিলেন না। এ ছিল তাঁর আস্তিকতারই একটা অতি-বিনয়। ই তাঁর এই নাস্তিক্যের প্রচারটা ছিল একান্তভাবেই মৌখিক ও ষ্টক। এই মৌখিক কথার আড়ালে তাঁর অন্তরে ফল্গুধারার মতই র-ভক্তির একটা গোপন স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হ'ত। তিনি লন সত্যিকারের একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষ।

শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে যেমন প্রায়ই নিজেকে তক বলতেন, তেমনি একবার তিনি সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যো-ায়ের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ধরা পড়ে লন। কেদারবাবুর যুক্তির কাছে সেদিন তাঁর নাস্তিক্যের আবরণ গিয়ে আস্তিকতাই প্রকাশ পেয়েছিল। এই নিয়ে সেদিন কেদারবাবুর শরৎচন্দ্রের যে কথোপকথন হয়েছিল, কেদারবাবু নিজেই সে কথা "শরৎ-কথা" প্রবন্ধে লিখে গেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার হওয়া স্বাভাবিক……

তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কথাপ্রসঙ্গে বললেন মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন?"

বললুম—"সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অলাভ নেইতো! তবে টি থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা। ওই দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়"…

"এইটে ঠিক বলেছেন" বলে হাসলেন। বললেন—"আমাকে নাস্তিক অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়?"

বললুম—"অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই ার সঙ্গে পরিচয়। তা'তে যে ছাপ হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম ক।"

"কে বললে, কোথায়?—ভুল কথা"—

'যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে বাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারে নি। ফেরবার গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রুক্ষমা প্রার্থনা না ক'রে বাড়ী ত পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ হ'ত না। আপনি পারেন নি"…

"ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবাস্তবের সাহায্য নিতে হয়, ঐ একটাই তো?"…

"বহুৎ আছে। জগতে অবাস্তবও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি;—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি ইনটেলেকচুয়েল জায়েন্টস্ বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল, এটা করলেন কেনো?"…

"আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না, তাহলে সাবধান হতুম।"…

"অনেকেই লেখেন, যাঁর ভালো লাগে তিনিই লেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যেই লেখেন বলে মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।"

"যান্ যান্ বেলা হয়েছে, নমস্কার।—দেখতে যেন পাই"

দ্রুত চলে গেলেন।

(ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৮)

উদ্ধৃত অংশটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গেলেও, কেদারবাবু উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর মুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেটা আদৌ তাঁর অন্তরের কথা নয়। শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর কাছে এইভাবে ধরা পড়ে গেলে, সেদিন তখন তাঁর "যান্ যান্" বলে সরে পড়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

শরৎচন্দ্র মুখে যেমন অনেকের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতেন, মাঝে মাঝে চিঠিপত্রেও তিনি এই ধরণের কথা লিখতেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে একবার লিখছেন—

"মন্টু, একটা কথা বোধকরি পূর্বেও আমার কাছে শুনে থাকবে, আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) ৺স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো—কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। Heredity আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে।"

শরৎচন্দ্র এখানেও 'Heredity আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে' বলে যে কথা বলেছেন, এও তাঁর নিছক রসিকতা। কেন না শরৎচন্দ্রের জীবনী যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, বর্মী ষ্টেটে চাকরী করবার সময় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তিনিও একবার সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, এবং বেশ কিছুদিন সাধুসঙ্গ

করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এইভাবে শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর কথামতই তাঁদের বংশে সন্ন্যাসী হওয়ার ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র এখানে নিজেকে "ঘোরতর নাস্তিক" বলে যে পরিচয় দিয়েছেন, এও তাঁর একান্তভাবেই বাহ্যিক কথা বা রসিকতা মাত্র।

শরৎচন্দ্র কারো কারো কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে লিখলেও, তিনি তাঁর বহু চিঠিপত্রে আবার ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথাও লিখেছেন। রসিকতার কথা ছেড়ে দিয়ে, যখন তিনি তাঁর চিঠিপত্রে গুরুত্ব নিয়ে কোন কথা বলতে গেছেন, তখন অনেক সময় তিনি ঈশ্বরের নামও স্মরণ করেছেন। যেমন শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একবার লিখছেন—"আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। ভগবানের সহিত আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শান্তি দেন—তাই ভাল।"

এর পরে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আর এক পত্রে লেখেন—"অদৃষ্ট যদি আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি জানিতে পারি তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধকরি সহিয়া যাইবে, হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব।

আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সুস্থ হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—শেষ বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল।"

চিঠি দুখানি শরৎচন্দ্রের ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা বড় উদাহরণ। এখানে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তিকেও তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছা হিসাবেই শান্ত মনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অতি বড় ধার্মিক মানুষ ছাড়া এমন কথা কেউ কখনই বলতে পারেন না।

শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই ধরণের আরও অনেক চিঠি লিখেছেন, যাতে তিনি তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা অকপটেই স্বীকার করেছেন। তাই শরৎচন্দ্র কারো কারো কাছে মুখে বা চিঠিপত্রে নিজেকে ঘোরতর নাস্তিক বলে থাকলেও, তিনি আসলে একজন ঘোরতর আস্তিক মানুষই যে ছিলেন, একথা বলা চলে।

আগেকার দিনে আমাদের এই বাঙলা দেশে এক হিন্দুধর্মের মধ্যেই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল এবং এদের নিজেদের প্রচার নিয়ে তখন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। এই নিয়ে একদল নিজেদের গুণগান করে, অপরের নিন্দাবাদ করতেও ছাড়ত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে নানারকমের তিক্ততা, এমন কি ঝগড়াঝাটি পর্যন্তও দেখা দিত। আজকের দিনে বাঙলা দেশের কোথাও কোথাও এই সম্প্রদায়-ভেদ কিছু কিছু থাকলেও, এদের পরস্পরের মধ্যে সে তিক্ততা আর নেই। এখন একজন সাধারণ হিন্দু শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতারই উপাসনা করে থাকে। তার কাছে হিন্দুর সব দেবতাই সমান, সকলেই উপাস্য। শরৎচন্দ্রও ঠিক এই প্রকারেরই একজন হিন্দু ছিলেন। তিনিও শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাকেই মেনে চলতেন। তবে সকল দেবতার পূজা করলেও শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। এই দিক থেকে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন, একথা হয়ত বলা যেতে পারে।

একবার দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে ফেরার পথে শরৎচন্দ্র বৃন্দাবন হয়ে বাড়ী এসেছিলেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে এক প্রবল ভক্তিভাব দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের সেদিনকার সেই ভক্তিভাবের কথা উল্লেখ করে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-কথা' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন—

"তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হ'তে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন, আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও যে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।"

শরৎচন্দ্রের ভক্ত মনের এ একটা বড় পরিচয়। আর শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরেই শুধু সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দেন নি, তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতেও একখানি ঘরকে বিষ্ণুমন্দির করে তুলেছিলেন। তিনি বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিজে নিয়মিত পূজা করতেন। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের এই মূর্তিটি দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর কাছ থেকে তিনি কিভাবে মূর্তিটি লাভ করেছিলেন, আর কিরূপ ভক্তির সহিতই বা তিনি ঐ মূর্তির পূজা করতেন, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন-বন্ধু শৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

"দাদার ওখানে গিয়ে—আমাকে নীচে বসতে হলো—যা কোনদিন হয়নি, তিনি ওপরে ; ভোলা (চাকর) বলে গেল—আপনি বসুন, তিনি আসছেন। একটু পরে দেখি ভোলা এক রেকাবে—রেকাবখানি শ্বেত-পাথরের—ছানা, মাখন, মিছ্রি, ক্ষীর, সর আর নানারকম ফলের টুকরো এনে হাজির।

আমি বললাম, এসব কীরে ?

প্রসাদ। আপনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমি বললাম—প্রসাদ কিসের ? ভোলা সংক্ষেপে বললো, পুজোর। ভোলার সাথে আর কথা কাটাকাটি না করে ও-গুলোর সৎকারে মন দেওয়া গেল। খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় দেখি চা-ও এলো। ভোলা বললে—চা খেয়ে ওপরে যাবেন। বাবু সেখানে যেতে বলেছেন।

ওপরে গিয়ে দেখি—একখানি ঘর ঠাকুর-ঘর হয়েছে—চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, আর কী তাদের মিষ্টিগন্ধ, ধূপধুনোর গন্ধে মসগুল—সামনে

রাখাল বেশে কৃষ্ণমূর্তি। অন্নপূরী সাচ্চা জরীর বুটিদার কষা দিয়ে তার চুড়ো, তাতে ময়ূরের পুচ্ছ, অনুরূপ হলদে রংয়ের সার্টিনে তৈরী তার পরবার কাপড়, তাতে জরীর পীতধড়া—যাকে আমরা বলি কোঁচা। হাতে রূপোর মোহন বাঁশী। আমি ত অবাক্—আমি বললাম, এ সব কী দাদা!

দেখতেই পাচ্ছ, পুজো।

তা দেখতে পাচ্ছি, এ সেই মূর্তি না, যাকে আমি বয়ে নিয়ে এসেছিলাম? দাদা হেসে বললেন—সেই শ্রীমূর্তি!—সর্বনাশ—মূর্তি এবার শ্রীমূর্তি হয়ে গেছে। চেয়ে দেখি দাদার পরণে গরদের ধুতি, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

একদিন আমি ও দাদা দেশবন্ধুর ওখানে এক সন্ধ্যায় যাই। হঠাৎ খবর এলো ফোনে, তারকেশ্বরে গুলি চলছে—তখন তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ চলছিল। এই সব সেরে ফিরতে রাত হলো; ফেরবার মুখে সিঁড়িতে শ্বেত পাথরের এক কৃষ্ণমূর্তি দেখে—দাদা তার খুব তারিফ করলেন। দেশবন্ধু তখনি সেটা তাঁকে দিয়ে দিলেন। মূর্তির রাধা কোথায়—জিজ্ঞাসা করায় দেশবন্ধু বললেন, সেটা চুরি গেছে। খুব হাসাহাসি হলো, এই বউ-চুরি ব্যাপার নিয়ে। সেই মূর্তি বয়ে নিয়ে আমি ট্যাক্সিতে কেবল তুলেই দিই না, দাদার সাথে বাজে শিবপুর পর্য্যন্ত রাতদুপুরে তাকে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল—অবিশ্যি ট্যাক্সিতে। সেদিন ছিল আবার জন্মাষ্টমী! এই সে মূর্তি, যার রূপান্তর হয়েছে আজ দেবত্বে।"

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গোবিন্দজীর এই মূর্তিটি আজও রয়েছে।

খ্যাতনামা বৈষ্ণব-পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন বলেন যে, কার্য ব্যপদেশে তিনি বার তিনেক শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে দুপুরের কিছু আগেই তিনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতেন। শরৎচন্দ্র এই সময়টায় নিজে তাঁর গৃহ-দেবতার পূজা করতেন। তাই সাহিত্যরত্ন মশায় তিন দিনই শরৎচন্দ্রকে পূজা শেষ করে এসে তসরের কাপড়-পরা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে দেখেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যরত্ন মশায়কে মধ্যাহ্নভোজন না করিয়ে একদিনও ছাড়েন নি। শরৎচন্দ্র প্রথম দিন তাঁকে বলেছিলেন—হরেকৃষ্ণবাবু আমিও বৈষ্ণব, এই দেখুন আমারও গলায় তুলসীর মালা রয়েছে।—বলে তিনি তাঁর গলার মালা দেখিয়েছিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসে হরেকৃষ্ণবাবু তিন দিনই লক্ষ্য করেন যে, থালায় তরকারি সমেত সাজানো ভাতের উপরে একটি করে তুলসী পাতা রয়েছে।

ভাতের উপরে তুলসী পাতা থাকার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শরৎচন্দ্র হরেকৃষ্ণবাবুকে বলেছিলেন—গৃহদেবতাকে যে অন্নভোগ দেওয়া হয়েছিল, সেই থালাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে সাহিত্যরত্ন মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাঁর মুখে পদাবলী আবৃত্তিও শুনতেন।

বৈষ্ণব ধর্মের উপর শরৎচন্দ্রের যেমন একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যপাঠের জন্যও তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন, সেই সময় একবার তিনি কলকাতায় এসে পড়বার জন্য শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তখন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বহুবার করে পড়েছিলেন। এই গ্রন্থ-পাঠের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তখন হরিদাসবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"আপনি আমাকে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন, সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই। আসিবার সময় মনেই নাই—তারপর সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে।…এছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজ প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না, এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। আপনাকে অনেক রকমেই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে দান করুন। আমি অনেক আশীর্বাদ করিব এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এ কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।"

শরৎচন্দ্রের গলায় পৈতে এবং বৈষ্ণবের চিহ্ন তুলসীর মালা

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃই শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছ থেকে এই বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থগুলি একরূপ প্রতিদিনই পড়তেন।

বৈষ্ণব ধর্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়াও শরৎচন্দ্রের যে মূল পেশা ছিল, গল্প-উপন্যাস রচনা, তাঁর সেই গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও তিনি অনেকগুলি বৈষ্ণব চরিত্র এঁকেছেন। সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই এই চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ-বশতঃই তিনি চরিত্রগুলি এমনিভাবে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন!

তবে শরৎচন্দ্র নিজে অনেকটা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষ হলেও, হিন্দুর সকল প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডই—তা সে বৈষ্ণবীয়, অবৈষ্ণবীয়, বৈদিক, পৌরাণিক বা লৌকিক যাই হোক্ না কেন, সমস্তই তিনি বিশ্বাস করতেন এবং হিন্দুর সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মেনে চলতেন। শরৎচন্দ্র নিজে যেমন ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও তেমনি অত্যন্ত ধর্মশীলা মহিলা। তিনি জীবনভোর পূজাপার্বণ ও বারব্রত নিয়েই থাকেন। হিন্দুর সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতিই শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা থাকায় শরৎচন্দ্র সকল সময়ই নিজে তাঁর স্ত্রীর—কি বৈষ্ণবীয় আর কি অবৈষ্ণবীয়—সকল বারব্রতেই তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন। অর্থের কথা বাদ দিলেও শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই সব বারব্রতের জন্য অনেক সময় বহু মূল্যবান সময় পর্যন্তও দিয়েছেন এবং নানা অসুবিধাও মেনে নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র একবার কাশী গিয়ে সেখান থেকে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন—"এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে, আর এক মুহূর্ত মন টেকে না এমন হইয়াছে। কালভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্রমাস যাওয়া যায় না—একটা ব্রত উদযাপন আছে এঁর। শ দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

একছত্র লেখা বার হয় না, এ কি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি, আর ঘণ্টাদুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি। এমন মনে হচ্ছে, বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয় ত ফুরিয়েই গেছে—কে জানে।"

একে অত্যন্ত গরম, তার উপর একছত্রও লেখা বার হয় না, তাই তখন তার এক মুহূর্তও তাঁর কাশীতে থাকার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তবুও স্ত্রীর ব্রতউদযাপনের জন্যই শুধু নিজের সকল অসুবিধা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তখন আরও একমাস কাশীতে কাটিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্রাহ্মণ আজকাল অনাবশ্যক বিবেচনায় পৈতে ত্যাগ করে থাকেন। শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণদের এই পৈতে ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কলকাতার প্রতিবেশী অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য পৈতে ত্যাগ করেছেন শুনে একবার তিনি তাঁর উপর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেদিনের সম্বন্ধে নির্মলবাবু তাঁর "শরৎ-স্মৃতি" প্রবন্ধে নিজেই বলেছেন—

"...একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের যে বৎসর তিরোভাব হয় সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে একদিন খালি গায়ে আমি বাগানের কাজে লিপ্ত আছি, হঠাৎ শরৎচন্দ্র আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এমন মাঝে মাঝে আসিতেন। আমার গলদেশে যজ্ঞোপবীত ছিল না লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "তোমার পৈতে কোথায়? নাকি?" তখন আমার সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ছিল না। আমি শরৎচন্দ্রকে তাহাই জানাইলাম। আমার উত্তরে শরৎচন্দ্র সত্যই ব্যথিত হইলেন এবং রংপুরের ভাষণে * যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে পিতৃপুরুষকে অপমান করা হয়।" (শরৎ-স্মরণিকা)

শরৎচন্দ্রের জীবন থেকে এইরূপ বহু উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পূজা, বারব্রত প্রভৃতি ছোট বড় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই শ্রদ্ধার সহিত মেনে চলতেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বাড়ীর সকলের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি নিজে তাঁর চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ১. ৫. ৩৭, তারিখের এক পত্রে সাহিত্যিক শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—

"বাড়ীর সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করচি। সজ্ঞানে এইটেই শেষ কাজ।"

শরৎচন্দ্র যে কিরূপ ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তা তাঁর এই প্রায়শ্চিত্ত-চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা থেকেই বেশ বোঝা যায়। তাই শরৎচন্দ্র কখনো কখনো কারো কারো কাছে নাস্তিক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকলেও তিনি সকল সময়েই যে অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তা বলা চলে। তিনি তাঁর সাহিত্য বা লেখার মধ্যে কোথাও কখনো যেমন নাস্তিকতার কথা প্রচার করেন নি, তেমনি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও একজন পরম ধার্মিকের ন্যায়ই জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

* ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দীনদয়ালের ভবনে তাঁর শয়নকক্ষ। রাত্রি দশটা। নেপথ্যে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে। দীনদয়াল, জয়া, জয়ন্ত, ভুজঙ্গ এবং বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দা।

দীনদয়াল ॥ বুঝলে, ভুজঙ্গ, ওই এক ঘণ্টাতেই আমার ওপর জয়মা'র কি রকম মায়া পড়ে গেল—আমি বললাম, 'আচ্ছা দু'দিন পরেই মদনপুরে এসো' বলে ট্রেন ধরতে ছুটলাম। ও বাবা—স্টেশনে পৌছতে-না-পৌছতেই দেখি, মাও আমার চলে এসেছেন! জন্ম-জন্মান্তরের আকর্ষণ ছাড়া একে আর তুমি কী বলবে, বলো! ও-মা—তার পরেই কিনা দেখি, মাও আমার একা আসেন নি সঙ্গে ওই গাধাটাও এসেছে! কান টানলেই মাথা আসে কিনা! (হাসিতে লাগিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ!

ভুজঙ্গ ॥ চমৎকার বৌ হয়েছে, স্যর।

দীনদয়াল ॥ তা হয়েছে বইকি। দেখবার মত—দশজনকে দেখাবার মত—তাই না রাত দশটায় ট্রেন থেকে নেমেই—এত রাত্রেও—তোমাদের বউ দেখাতে ডেকে এনেছি! বুঝলে, ভুজঙ্গ, ওই গাধাটা আজ পর্যন্ত বুদ্ধির কোন পরিচয় যদি দিয়ে থাকে—তা হচ্ছে এই বিয়েটা।

ভুজঙ্গ ॥ আমাদের হাসপাতালেরও ভাগ্য যে, আমরা ওঁকে পেলাম।

দীনদয়াল ॥ বটেই তো—বটেই তো! বুঝলে, মা জয়া, এই যে—ইনি হচ্ছেন ডাক্তার ভুজংগ মিত্র—মমতাময়ী হাসপাতালে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট—হাসপাতাল-কমিটির সেক্রেটারি—মানে, আমার ডান হাত।

ভুজঙ্গ ॥ (জয়ার প্রতি) নমস্কার।

জয়া ॥ (প্রতি নমস্কার জানাইল) নমস্কার।

এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির ॥ কত্তাবাবা, শাঁখের শব্দ শুনে পাড়ার লোকেরা এসে জড়ো হয়েছে—তারা কেউ বউ না দেখে যাবে না! একটা মেলা বসে গেছে বাইরে!

দীনদয়াল ॥ না—না, এখন কী করে হয়! একে পথের কষ্ট, তার ওপর বউমার শরীর খারাপ। ওকে এখুনি শুইয়ে দিতে হবে। বউ-দেখা—মিষ্টিমুখ-করা—এসব হবে কাল। আমি বলে দিচ্ছি সবাইকে।

যুধিষ্ঠির সহ দীনদয়ালের প্রস্থান। পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলা নিস্তারিণী—জয়ার কাছে গিয়া বলিলেন

নিস্তারিণী ॥ কী ভাই নতুন বউ, চাঁদমুখখানি একটু তোল—একটু ভাল করে দেখতে দাও। (জয়ার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া) বাঃ! খাসা বউ! কী বল ভাই জয়ন্ত!

জয়ন্ত ॥ হাঁ—খাসা দই! জিভে জল আসছে তো, দিদিমা?

নিস্তারিণী ॥ এলেই বা কী করব? এঁটো যে!

সকলে হাসিয়া উঠিল

ভুজঙ্গ ॥ দিদিমার নিষ্ঠা আছে!

বাড়ির পুরাতন ভৃত্য সনাতন দুই পেয়ালা চা আনিয়া ভুজঙ্গ ও জয়ন্তের সামনে রাখিল

জয়ন্ত ॥ বাঁচালি, সনাতন। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

নিস্তারিণী ॥ তার জন্যে চা কেন ভাই? তেষ্টার জল তো সামনেই ছিল!

জয়ন্ত ॥ নিষ্ঠা আমারও কম নয়, দিদিমা—সবার সামনে আবার খেতে পারি না।

নিস্তারিণী ॥ (অন্য সবাইকে) শুনলে তো! চল, ভাই, চল। বাড়া ভাতে ছাই দেব না! (সকলে হাসিয়া উঠিল)। না, হাসির কথা নয়। রাতও অনেক হয়েছে। আসি, ভাই—কাল আবার আসব।

জয়া ও জয়ন্ত চা পান করিতেছে বলিয়া ভুজঙ্গও ঘরে রহিল—আর সকলে চলিয়া গেল

ভুজঙ্গ ॥ (জয়ন্তকে) মরুভূমিতে এতদিনে ফুল ফুটল। বাড়ীটার দিকে তাকানো যেত না, জয়ন্ত—খাঁ খাঁ করত। একেই বলে ভাগ্য। সারাজীবন তপস্যা করেও কেউ কিছু পায় না; আবার, যে পায় সে পথ চলতেও মাণিক পায়।

যুধিষ্ঠির ছুটিয়া আসিল

যুধিষ্ঠির ॥ (জয়ন্তকে) কত্তাদাদা, ওরা সব মিষ্টিমুখ হতে চাচ্ছেন। কত্তাবাবা আপনাদের ডাকছেন।

জয়ন্ত ॥ যাচ্ছি।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়া জয়ন্ত বাহিরে ছুটিল

যুধিষ্ঠির ॥ আপনি বুঝি যাবেন না?

ভুজঙ্গ ॥ (যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) যাও, যাচ্ছি!

যুধিষ্ঠির চলিয়া গেল

ভুজঙ্গ ॥ (চা খাইতে খাইতে হঠাৎ জয়াকে) আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, জয়াদেবী?

জয়া ॥ বলুন।

ভুজঙ্গ ॥ আপনাকে এর আগে কোথাও দেখেছি?

জয়া ॥ আমাকে?

ভুজঙ্গ ॥ হ্যাঁ, আপনাকে?

জয়া ॥ কিন্তু আপনাকে তো আমি এর আগে কোথাও দেখি নি!

ভুজঙ্গ ॥ কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, আপনাকে হাজার-হাজার লোকে দেখছে কিন্তু আপনি তাদের কাউকে দেখেন নি।

জয়া ॥ তার মানে?

ভুজঙ্গ ॥ মানে—আপনি কি কোনদিন সিনেমায় অভিনয় করেছেন?

জয়া ॥ না তো!

ভুজঙ্গ ॥ তা হবে। 'অভিসার' ছবিতে রত্নার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছে, সে মেয়েটি সত্যিই একটি রত্ন। আশ্চর্য আপনাদের দুজনের চেহারার মিল!

নেপথ্যে দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "আচ্ছা—আচ্ছা—সবাইকে বসতে বল।" দীনদয়ালের প্রবেশ

দীনদয়াল ॥ বুঝলে, ভুজঙ্গ, এরা সব নাছোড় বান্দা। গুণের খ্যাতি এর মধ্যেই আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। এস মা, এস। এই এক মিনিট—

জয়াকে লইয়া দীনদয়াল বাহিরে গেলেন। ভুজঙ্গও তাহাদের সহিত যাওয়ার ভান করিল বটে—কিন্তু গেল না। দীনদয়াল ও জয়া চলিয়া যাওয়ামাত্র ভুজঙ্গ খাটের উপরে জয়ার রাখিয়া-দেওয়া ভ্যানিটি ব্যাগটি ক্ষিপ্র হস্তে খুলিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য হইতে খানকয়েক চিঠিপত্র এবং কাগজ বাহির করিল। সেগুলির ভিতর হইতে একটি সচিত্র সিনেমা-সাপ্তাহিকের পাতা বাহির হইয়া পড়িল। ভুজঙ্গের চোখেমুখে উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। সে পড়িল, "অভিসার চিত্রে একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে সখী রত্নার ভূমিকায় উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রী দেবী।" ভুজঙ্গ অন্য একটি চিঠি পড়িতে যাইতেছিল—এমন সময় নেপথ্যে দীনদয়ালের গলা শোনা গেল—"মা, জানবে, এরা সব আমার সুখে সুখী—দুখে দুখী। আজ ওদের আনন্দও কম নয়, মা" এই বলিতে বলিতে দীনদয়াল এক হাতে জয়ন্তকে ও অন্য হাতে জয়াকে ধরিয়া এই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া ভুজঙ্গ পত্রিকার পৃষ্ঠাটি পকেটে পুরিল এবং ব্যাগটি কোনমতে বন্ধ করিয়া খাটে রাখিয়াই সেই কক্ষস্থিত একটি বৃহদাকার আলমারির আড়ালে আত্মগোপন করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়া ও জয়ন্তকে লইয়া দীনদয়াল কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দীনদয়াল ॥ এই ঘর ছিল এতকাল আমার—আজ থেকে হল তোমাদের। (কক্ষে সযত্নরক্ষিত মমতাময়ীর তৈলচিত্রের দিকে তাকাইয়া) কী গো—তাই তো? হ্যাঁ—ওই মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। (জয়ন্ত ও জয়াকে লক্ষ্য করিয়া) ওরে, ও মরে নি—আমাদের জীবনে যদিন বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে আমার মমতাময়ী সহধর্মিণী—তোমাদের করুণাময়ী জননী। অগ্নি সাক্ষী রেখে আমরা দুজনে এক হয়েছিলাম—জীবনে মরণে এক থাকব। অগ্নি সাক্ষী রেখে তোমাদের মিলন হয়েছে—জানবে, সে জন্ম জন্মান্তরের মিলন। আচ্ছা মা, রাত হয়েছে—আমি আসি।

দীনদয়াল চলিয়া গেলেন। জয়ন্ত দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া জয়ার মুখোমুখি দাঁড়াইল

জয়ন্ত ॥ জয়াদেবী।

জয়া ॥ বলুন।

জয়ন্ত ॥ বাবার এই কথার পর—মা'র ওই সামনে—আপনার এখানে থাকতে সাহস হয়?

জয়া ॥ না।

জয়ন্ত ॥ একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে অজস্র মিথ্যে

কৃষি এবং সেচ সর্ব্বাধিক গুরুত্বলাভ করিয়াছে। খাদ্যের দিক হইতে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্যই কৃষির উপর এই গুরুত্ব আরোপ।* খাদ্যের জন্য আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা বহির্বাণিজ্যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। শিল্পের অগ্রগতি ছাড়া দেশের অগ্রগতি অসম্ভব, শিল্পে অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান হয় এবং কৃষির তুলনায় অনেক দ্রুত জাতীয় সম্পদ বাড়ে—এসব কথা স্মরণ রাখিয়াও কমিশন কৃষির অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃষি ও সেচ (বিদ্যুৎসহ) খাতে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৪·৬ ভাগ বা ৯২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কমিশন আশা করিয়াছেন অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে বেসরকারী দায়িত্বে ভারতে দ্রুত ব্যাপক শিল্পোন্নতি হইবে। ৪২টি শিল্পের উন্নতির সম্পর্কে সুপারিশসহ তাঁহারা বেসরকারী প্রয়াসে শিল্পপ্রসারের এই অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতসরকার ১৯৪৮ সালে যে শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন কমিশন তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ইহার ফলেও শিল্পপ্রসারে বেসরকারী প্রচেষ্টা উৎসাহ লাভ করিবে। অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ারী, আনবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ প্রভৃতি শিল্পে পূর্ণ সরকারী কর্তৃত্বাধিকার থাকিবে এবং সরকার বেসরকারী সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণ করিবেন কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান তৈয়ারী, জাহাজ তৈয়ারী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী, খনিজ শিল্প প্রভৃতি। এ ছাড়াও কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, যে সকল ক্ষেত্রে শিল্পের স্বাভাবিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ হইতে দেখা যাইবে, সরকার সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। বৃহৎ শিল্পের হিসাবে কমিশনের হিসাবানুযায়ী সরকার ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন এবং মূল শিল্প ও পরিবহন খাতে ব্যয় করিবেন আরও ৫০ কোটি টাকা। বেসরকারী সংস্থার হিসাবে নির্দিষ্ট নূতন শিল্পগুলিতে ধরা হইয়াছে ২৩৩ কোটি টাকা এবং চলতি শিল্পগুলির সংস্কার খাতে ধরা হইয়াছে ১৫০ কোটি টাকা। কুটীর বা পল্লীশিল্পের উন্নতির জন্য রিপোর্টে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রধানতঃ কৃষির এবং পরোক্ষভাবে শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনার সেচ খাতে ৫৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে সেচসুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ খুবই কমিয়া গিয়াছে, অথচ সেচের সুবিধা না থাকিলে জমির উৎপাদন শক্তির উন্নতি বিধান, এমন কি স্থায়িত্বরক্ষাও কঠিন। বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা ছাড়াও ছোট ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার যে সব পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতেও কৃষি প্রভূত উপকৃত হইবে। ছোটখাট সেচ ব্যবস্থার জন্য কৃষি খাতেই ৩০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। সমাজ উন্নয়ন খাতে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এই সমাজ উন্নয়ন খাতের লক্ষ্য। এ হিসাবে সমাজ উন্নয়ন খাতকে কৃষির সহিত সংযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কৃষি উন্নয়নকেই প্রধানতঃ সাহায্য করিবে। শুধু বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য সেচ পরিকল্পনায় ১২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই বৈদ্যুতিকশক্তি ঠিকভাবে কাজে লাগাইলে বিশেষ করিয়া ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটিবে এবং পল্লীঅঞ্চলে কৃষির উপর নির্ভরশীল অধিবাসীরা দ্বিতীয় আয়ের বাড়তি সুযোগ পাইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারিবে।

কৃষির হউক বা শিল্পের হউক, প্রকৃত আর্থিক উন্নতির অনুপূরক হইতেছে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি। আলোচ্য পরিকল্পনায় যানবাহন খাতে ৪৯৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই টাকায় রেলপথ, রাজপথ, জলপথ এবং বিমানপথের উন্নতির কথা আছে। বেসরকারী বিমান-কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে ভাল চলিতেছে না, অথচ আধুনিক যুগে এই বিমান পথের গুরুত্ব যথেষ্ট। কমিশন এই জন্য সমস্ত বেসরকারী বিমান-পথগুলিকে একটি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন যৌথ কোম্পানীর অধীনে লইয়া আসিবার সুপারিশ করিয়াছেন এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ক্ষতিপূরণ ও নূতন বিমান সংগ্রহের জন্য ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছে। জাহাজ শিল্পের দিক হইতে ভারতের অবস্থা শোচনীয়, কমিশন অন্যান্য নানা খাতের ন্যায় অর্থাভাবে ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান পৌনে চার লক্ষ টনের স্থলে ভারতের উপকূলীয় ও সমুদ্রগামী উভয়-প্রকার জাহাজের পরিমাণ ছয় লক্ষ টন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রধান পাঁচটি বন্দর—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন ও কোচিনের উন্নতির জন্য অর্থবরাদ্দ ছাড়াও কমিশন করাচীর ক্ষতিপূরণ হিসাবে পশ্চিম উপকূলে কাণ্ডলা নামে নূতন বন্দর স্থাপনে ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সংলগ্ন প্রস্তাবিত তৈল শোধনাগারগুলি ভারতের গুরুতর অভাব মিটাইবে, এজন্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি ভারতসরকার নিজ ব্যয়ে করিয়া দিবেন বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। জাতীয় রাজপথ এবং রাজ্যসমূহের রাজপথসমূহের জন্য পরিকল্পনায় মোট ১০৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। রেলপথের উন্নতি এমনিই হইতেছে, কমিশন রেলপথসমূহের জিনিসপত্র সংস্কার ইত্যাদির উপর এবং ইঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। শিল্পসংক্রান্ত পরিবহনে বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা রেলপথগুলির উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করিবে। পরিকল্পনায় ডাক তার বিভাগের উন্নতির জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ব সহরগুলিতে টেলিফোন ব্যবস্থাসম্প্রসারণ ছাড়া দু হাজার বা ততোধিক অধিবাসীসমন্বিত প্রত্যেক গ্রামে ডাকঘর বসাইবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

শিল্পশ্রমিকদের জন্য কমিশনের রিপোর্টে যেসব সুপারিশ আ... তন্মধ্যে শ্রমিকদের আন্দোলন চালাইবার অধিকার ও ট্রেডইউনিয়নগুলি... সাহায্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকগণ শিল্পের প্রাণ, তাহারা ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইলে শি...

* প্রবন্ধ লেখকের নবপ্রকাশিত 'ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গ্রন্থে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সঙ্কট অনিবার্য্য, একথা কমিশন সুস্পষ্টভাষায় জানাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রমিক কল্যাণ খাতে ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ (১) শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, (২) শ্রমিকদের বেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা, (৩) শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও কর্ম্মস্থলের পরিবেশ, (৪) কর্ম্মসংস্থান ও শিক্ষা এবং (৫) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা—এই পাঁচভাগে বিভক্ত।

আলোচ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থিক উন্নয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইলেও ইহাতে দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য সীমাবদ্ধ আর্থিক সংস্থানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত পরিকল্পনা স্বভাবতঃই আর্থিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তবু কমিশন ধরিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসমস্যা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে শুধু কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশবাসীর সত্যকার কল্যাণ হইবে না। সমাজকল্যাণ খাতে মোট ৩৩৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, ইহার মধ্যে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হইয়াছে যথাক্রমে ১৫৫ কোটি টাকা ও ৯৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া এই খাতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য এবং সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক অনুন্নত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হইয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের জন্য একটি কমিশন (Backward classes Commission) গঠন ছাড়াও পরিকল্পনায় ইহাদের উন্নতির জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। একটি উন্নত ধরণের শিশুসংক্রান্ত আইন (Progressive Childrens' Act) প্রবর্তনের সুপারিশ সমাজকল্যাণ অংশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। শিক্ষাখাতের ব্যয় প্রাথমিক ও প্রাথমিক বুনিয়াদি স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্য্যন্ত সকলস্তরের জন্য অল্পবিস্তর বরাদ্দ হইয়াছে এবং জনস্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া নিবারণে (১৭ কোটি - লক্ষ টাকা), চিকিৎসালয় হাসপাতালের সম্প্রসারণে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারে ব্যয়িত হইবে। কমিশন সহর (বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চল) ও গ্রাম অঞ্চলের গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

যুদ্ধ বাধিলে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবেই, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ধরিয়া লইয়া এই দরিদ্র ও সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হইতে পারে না। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যারও উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থান পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু এই সমস্যার বাস্তব রূপ এমনি কঠোর যে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু না করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে দিয়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার প্রয়াস হাস্যকর। কমিশন এজন্য আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসন খাতে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। অবশ্য ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই বরাদ্দ এই টাকা খরচ হইবে, আশ্রয়প্রার্থীরা যদি অনন্তকাল ধরিয়া আসিতে থাকেন, তাঁহাদের এবং আমাদের ভাগ্য যে সেক্ষেত্রে অন্ধকার হইতে বাধ্য, তাহা না বলিলেও চলিবে। আশাপ্রদ একটা অবস্থা ধরিয়া লইয়া পরিকল্পনা রচনা ছাড়া কমিশনেরও বাস্তবিকই কোন উপায় ছিল না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে নাই অন্ততঃ আশানুরূপ দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন অভিযোগ অনেকেই করিতেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের দিক হইতে যুক্তি এই যে, ভারতের পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই যথাসাধ্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, আয় এবং ব্যয়ে আকাশকুসুম রচনার দুঃসাহস তাঁহারা করেন নাই। পরিকল্পনা মেয়াদ অন্তে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা মাত্র ১১ ভাগ বৃদ্ধির কথা আছে, বিভিন্ন খাতের উন্নতির যে আশা করা হইয়াছে তাহাও মোটেই বেশি নয়। এই ভাবে সীমাবদ্ধ উন্নতির লক্ষ্য পরিকল্পনার বাস্তবমুখী বাড়াইয়া দিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব এবং খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ স্যার জর্জ সুস্টার পরিকল্পনার এ বাস্তবমুখী সীমাবদ্ধতার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'India's five year plan is a first-class example of a attempt to map out a general plan of action base on a realistic application of the country's resource and requirement.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে শুধু সরকা কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সততাই যথেষ্ট নয়, দেশবাসীর অব সহযোগিতার উপরও ইহার সাফল্য সর্ব্বাংশে নির্ভর করিতেছে পরিকল্পনা কমিশনও রিপোর্টে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন কংগ্রেস সরকারের আমলের পরিকল্পনা বলিয়া কংগ্রেস সদস্যদে এ ব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আগাইয়া আসা এবং জনসহযোগি সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে গ্রামাঞ্চ পরিকল্পনার কার্য্যকরী-করণে সক্রিয় ব্যক্তিগত সহযোগিতার জ ১৫ কোটি টাকা এবং সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগত সহযোগিতার জন্য ৪ কো টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইভাবে টাকা দিয়া যত কাজ পাওয়া যাক, পরিকল্পনার পূর্ণ সাফল্য জনসাধারণের নিঃস্বার্থ সহযোগিত উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

* The fulfilment of the Five Year Plan calls f nation-wide co-operation in the task of developme —between the Central Goverment and the States, t States and the local authorities, with voluntary soc service agencies engaged in constructive work, betwe the administration and the people as well as amo the people themselves."

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮

নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার আর সিংহ গর্জ্জনে কম্পিত হইতেছিল না। যে স্থানে বাণী-কারাগারে সিংহরূপী পিতামহ গর্জ্জন করিতেছিলেন, সে স্থান অসংখ্য খদ্যোত-আলোকে খচিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন স্রষ্টার অন্তরের অনন্ত আকুতি অসংখ্য কিরণ-কণিকায় স্পন্দিত হইতেছে, অনির্ব্বচনীয় বুঝি আলোকের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সহসা সেই আলোক-বিন্দুগুলি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। পিতামহ কহিলেন, "বাণী তোমার অনুরোধ আমি বারবার লঙ্ঘন করে ফেলছি। আমি কিছুতেই আমার পুরাতন সৃষ্টির প্রতি-মুহূর্ত্তের বিবর্ত্তনকে অনুসরণ করতে পারছি না। আমার কল্পনা কেবলই আমাকে অন্যমনস্ক করে' দিচ্ছে। সুন্দরানন্দ যে সিংহটিকে বন্দী করে' রেখেছে তাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বন্দীত্বের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে তার প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির যে নিষ্ফল আক্রোশ তা নিজের মধ্যে অনুভব করলে বুঝি অভূতপূর্ব্ব কিছু একটা পাব। কিন্তু কিছুই পেলাম না, মনে হচ্ছে সময় নষ্ট হল খালি। কেন এরকম হ'ল বল তো ?"

কেহ কোনও উত্তর দিল না।

"বাণী, তুমি কোথা গেলে"

নিবিড় অরণ্যের বনস্পতিকুল যেন জাগিয়া উঠিল। তাহাদের শাখায়-পল্লবে পত্রে-কিশলয়ে মৃদু মর্ম্মরধ্বনিও শোনা গেল। বাণী বাঙ্ময়ী হইলেন।

"কোথাও যাইনি"

"আমি যা বললাম শুনেছ ?"

"শুনেছি"

"উত্তরে কিছু বললে না যে !"

"আসল সিংহের নিদারুণ বন্দিত্ব—আর নকল সিংহের বন্দিত্বের অভিনয় কি এক হতে পারে কখনও ! আপনি খেলা করছিলেন। এ খেলার শখ যদি মিটে থাকে, চলুন আর একটা খেলায় মাতা যাক"

"মনে হচ্ছে চটেছ। কিন্তু আমি বন্দী-সিংহ সাজতে চেয়েছিলাম কেন তা বোধহয় বুঝতে পারনি ! স্বৈরচর সৃষ্টি করবার কল্পনাটা এখনও মাঝে মাঝে উতলা করছে আমাকে। মনে হচ্ছিল ওই সিংহটার যদি মশা হবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি ওকে কেউ বন্দী করে' রাখতে পারে ? সিংহ সেজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম, সত্যি সত্যি কতটা কষ্ট ও ভোগ করছে। কিন্তু কিছুই তো অনুভব করতে পারলাম না। আমার বরং বেশ মজা লাগছিল"

"তা তো লাগবেই। আপনি যে অভিনয় করছিলেন। তা ছাড়া আপনার মনও কি এখানে ছিল সব সময় ? আপনি শিখর সেনের গল্পটা কেমন লেখা হচ্ছে তা জানবার জন্য বারবার চলে যাচ্ছিলেন যে—"

"তুমি টের পেয়েছ সেটা তাহলে—"

"পাব না ? আমিও যে যাচ্ছিলাম"

"সত্যি কথা বলব তাহলে ? শুধু কবির মনে নয়, বহু স্থানে গিয়েছিলাম আমি। কিশলয়-কোরকে, ফুলের কুঁড়িতে, ফলের সম্ভাবনায়, শিল্পীর স্বপ্নে—সেখানে যত সৃষ্টির স্বপ্ন মূর্ত্ত হচ্ছে সেখানেই গিয়েছিলাম আমি"

"সব জানি"

"তুমি জানবে না ? অথচ ধমকাচ্ছ আমাকে, কি আশ্চর্য্য !"

অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। অরণ্যের প্রান্তে অন্ধকারের বুকে একটি মনোহর আলেয়া মূর্ত্ত হইল

সহসা। অরণ্যপ্রান্ত হইতে ক্রমশ তাহা সরিয়া যাইতে লাগিল। খদ্যোতকুল আকুল হইয়া উঠিল।

"তুমি কোথায় চলেছ বাণী"

"চলুন সুন্দরানন্দের আসল সিংহটাকে দেখে আসা যাক। চার্ব্বাকের খবরটাও পাওয়া যাবে"

"সে তো জালার ভিতর বসে' আছে। জালা থেকে বেরুক আগে"

"এখনি বেরুবে"

"চল তাহলে"

সুন্দরানন্দ যে অরণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন সেখানে কোনও প্রাসাদ তো ছিলই না—সুরক্ষিত কোনও গৃহও ছিল না। প্রথমে অরণ্যের কিছু অংশ পরিষ্কৃত করাইয়া মৃগয়ার জন্য কয়েকটি শিবির ফেলা হইয়াছিল মাত্র। বহুকাল পূর্ব্বে যে বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে নর্ম্মদাতীরে সুন্দরানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, কুম্ভীর শিকারে যাঁহার অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে সিংহের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং পুনরায় যে তাঁহার সহিত দেখা হইয়া যাইবে তাহা সুন্দরানন্দ প্রত্যাশা করেন নাই। গ্রীস দেশের সেই রাজপুত্র যে কিরাতের বেশে একটি হরিণ ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা সত্যই তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিরাতের দলে কিরাতের বেশে মিম্মিরকে প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। একটি বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় কিরাতের অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং নীলচক্ষু তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল মাত্র, বিস্মৃতির কুয়াশা কাটে নাই। সহসা মিম্মির যখন পালক-নির্ম্মিত উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যখন তাঁহার কুঞ্চিত তাম্রবর্ণ কেশদাম ললাটে স্কন্ধদেশে আলুলায়িত হইয়া পড়িল, সকৌতুক হাসিতে যখন তাঁহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সুন্দরানন্দ মিম্মিরকে চিনিতে পারিলেন।

"বিদেশী, আপনি এখানে হঠাৎ!"

"হঠাৎ নয়, অনেক দিন হল এসেছি এক সিংহের সন্ধানে"

"হ্যাঁ। রাজপুতানার মরুভূমিতে প্রথমে তাকে তারপর থেকে তার অনুসরণ করছি, কিন্তু কিছুতেই না পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে—সে যেন আমার বুঝতে পেরেছে—"

"এই অরণ্যে এসেছে সে সিংহ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার লক্ষ্য তো অব্যর্থ। এখনও তাকে মারতে পারেন নি?"

"আমি তাকে মারতে চাই না, বন্দী করতে চাই"

"ও"

সুন্দরানন্দ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর হা বলিলেন, "সিংহ পোষবার শখ আছে না কি"

"আমি আর কখনও সিংহ পুষি নি। এই প্রথম হয়েছে পোষবার। শুধু পোষবার নয়, তাকে অবসর-বিনোদন করবার। আমার জীবনে অবসর ও সে অবসরটাকে আনন্দময় করাটাই আমার জীবনের সমস্যা। আগে অনেক কিছু করেছি, এবার নতুন করে' দেখি। আপনি আমাকে একটু সাহায্য কুমার। আপনার সাহায্য না পেলে এ সিংহকে ধরতে পারব না।"

"কি করতে হবে বলুন"

"এই কিরাতদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে বাস কর তাদের মুখেই শুনলাম তারা আপনাকে কয়েকটি ধরে' দিয়েছে। আমার অনুরোধ—অন্তত একটি আমাকে দিন"

"হরিণ নিয়ে কি করবেন?"

"টোপ স্বরূপ ব্যবহার করব"

"বেশ তো, সে আর বেশী কথা কি। আজই নে আর একটা কথা, আমি যখন এসে গেছি তখন আর কিরাতদের মধ্যেই বা থাকবেন কেন, আ আতিথ্য গ্রহণ করে' আমাকে কৃতার্থ করুন"

"কিরাতদের মধ্যে আমি আনন্দেই আছি কুমার। আপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই"

মিম্মির সেইদিনই আসিয়া কুমার সুন্দরানন্দের গ্রহণ করিলেন। কুমারের শিকার-শিবিরে সুন্দরান

সুতরাং সুরঙ্গমার সহিত মিম্মিরের আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না। আলাপটা কুমারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করাইয়া দিয়াছিলেন।

"ইনি আমার অবসর বিনোদনের উপলক্ষ। মানুষের রুচি বিভিন্ন, আপনার পছন্দ সিংহ, আমার পছন্দ অপ্সরী—"

"আমারও অপ্সরী ছিল কুমার। এখনও সে আছে, কিন্তু আমার নাগালের মধ্যে নেই। তাকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি"

"বিসর্জ্জন দিয়েছেন? মানে?"

"ত্যাগ করেছি"

"ও"

সুরঙ্গমার নয়নে একটি অর্থপূর্ণ হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। সুন্দরানন্দের অধরেও মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। যে সুবিদিত কারণে নারীকে পুরুষেরা সাধারণত ত্যাগ করে তাহাই উভয়ের চিত্তকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া মিম্মির কহিলেন—"আমার অপ্সরীকে আমি কেন ত্যাগ করেছি তার ইতিহাস আপনাদের আর একদিন শোনাব। এখন নয়। একদিন গভীর রাত্রে সে কথা বলব। গভীর রাত্রেই আমরা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে পারি। দিবসের দৃশ্যমান জগত তাকে আবৃত করে' রাখে, দিবালোকে নিখিলের মর্ম্মবাণী আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু তখন আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে' তোলে, তখন আমাদের মনে হয় যে আহরণই বুঝি পরমার্থ, আমরা তখন ভুলে যাই যে ত্যাগ মানেই আহরণ। তাই এখন সে কথা বলব না, বলব গভীর রাত্রে"

মিম্মিরের জ্ঞান-গম্ভীর কথা শুনিয়া সুরঙ্গমা ও সুন্দরানন্দ শুধু বিস্মিত নয়, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, বেশ, তাই হবে। এখন আপনার সিংহ ধরবার জন্য কি কি আয়োজন করতে হবে বলুন"

"সিংহটা কোন অঞ্চলে আছে তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে"

"তা তো ঠিকই। কি করে' নির্ণয় হবে সেটা"

"গর্জ্জন শুনে"

"আমরা তো কোনও গর্জ্জন শুনিনি কোনও দিন"

"আমি শুনেছি। গভীর রাত্রে মেঘ গর্জ্জনের মতো সে গর্জ্জন। একদিন মাত্র শুনেছিলাম, তাই কোন অঞ্চলে সে আছে ঠিক করতে পারি নি। ঠিক করতে দেরি হবে না। ফাঁদটা আর খাঁচাটা আগে তৈরি হয়ে যাক, তারপর তাকে ডেকে আনব এখানে"

"ডেকে আনবেন?"

"হ্যাঁ। সিংহের ডাক ডাকতে পারি আমি। সিংহিনীর ডাক ডাকতে হবে, তাহলেই সে ছুটে আসবে"

মিম্মিরের মুখমণ্ডল হাস্যমণ্ডিত হইয়া গেল।

সুরঙ্গমা সলজ্জ দৃষ্টিতে সুন্দরানন্দের দিকে চাহিতেই সুন্দরানন্দ বলিলেন, "মানুষই প্রিয়ার ডাকে আসে জানি, সিংহও আসে না কি"

"সিংহই আসে, মানুষই বরং না আসতে পারে। সিংহের না এসে উপায় নেই, তাকে আসতেই হবে"

"কেন"

"কারণ সে পশু। স্বাধীনভাবে চলবার তার শক্তি নেই। ভয়ঙ্কর কিছু দেখলে তাকে ভয় পেতেই হবে, ক্ষুধিত হলে সে খাদ্য অন্বেষণ করবেই, ঘুমোবার সময় তাকে ঘুমোতেই হবে, জাগবার সময় তাকে জাগতেই হবে, সিংহিনীর প্রণয়-আহ্বান শুনলে তাকে আসতেই হবে ছুটে। মানুষের মতো যা খুসী করবার ক্ষমতা নেই তার। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তো তফাত"

সুরঙ্গমা বলিলেন—"মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে বলছেন?"

"কেউ যুক্তি মেনে চলে, কেউ আবার খেয়াল অনুসারেও চলে। পশুর মতো বাঁধাধরা একই পথে সবাই চলে না"

"চলে বই কি। তা না হলে সমাজ টিকে আছে কি করে'! সবাই নিজের মতে চললে কি সমাজ টিকত?"

"এটা ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু তবু আপনাকে মানতে হবে যে মানুষই যা-খুশী করতে পারে, পশু পারে না। মানুষের সামাজিক নিয়মও বদলাচ্ছে বারবার, কারণ নিয়ম বদলাবার ক্ষমতা মানুষেরই আছে, পশুর নেই"

"কিন্তু সে ক্ষমতার ব্যবহার কি মানুষ করে? আমি—যা খুশী—করছি, এই ধারণার মোহই তাকে অন্ধ করে' ফেলে না কি?"

মিম্মির মুগ্ধদৃষ্টিতে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সুন্দরানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি শুধু

দেহে নন, মনেও রূপসী। অনেক ফুলের রূপ থাকে কিন্তু সুগন্ধ থাকে না, আবার রূপ নেই সৌরভ আছে এমন ফুলও বিরল নয়। কিন্তু রূপে গুণে সমান এমন ফুল দুর্লভ। দেবতার নির্ম্মাল্য হবার উপযুক্ত এ ফুল। কুমার সুন্দরানন্দ আপনি ভাগ্যবান"

কুমার সুন্দরানন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন ক্ষণকাল, তাহার পর বলিলেন, "নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে করছি আপনার মতো একজন রসিকের সান্নিধ্যলাভ করে'। আচ্ছা, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার 'মিম্মির' নামটা কি আপনার স্বদেশী নাম?"

"না। আমার স্বদেশী নাম হেরোডোটাস। মিম্মির নামটা আমি নিজে গ্রহণ করেছি সব দেশে ঘুরে বেড়াবার সুবিধা হবে বলে'।"

"ওটা কি সংস্কৃত শব্দ?"

"কোনও ভাষা থেকে শব্দটা আমি বাছি নি। হয় তো ওর কোন মানেই নেই। কথাটা নিজেই আমি বানিয়েছি।

"হঠাৎ এ কথা আপনার মনে জাগল কেন কুমার?"

"শব্দটার কোনও অর্থবোধ হচ্ছিল না বলে' মনে হল, হয় তো ওটা বিদেশী শব্দ"

মিম্মির হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "না, ওটা কোন ভাষারই শব্দ নয়। ও শব্দ আমারই সৃষ্টি এবং ওর অর্থ আমি। কিন্তু বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। ফাঁদটা তৈরি করবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলম্ব হলে সিংহ পালাবে"

"কি করব বলুন—"

"প্রকাণ্ড গভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়তে হবে। আর সেই গর্ত্তটাকে ঘিরতে হবে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে, বেশ মজবুত করে'। তারপর সেটার উপর লতাপাতা খড় দিয়ে চাল তৈরি করতে হবে একটা। দরজাও থাকবে। অর্থাৎ দূর থেকে মনে হবে যেন একটা ঘর। ঘরই হবে সেটা, কেবল তার মেঝেটা হবে প্রকাণ্ড গহ্বর। আর সেই গহ্বরের তলায় থাকবে মোটা মোটা দড়ির তৈরি জাল একটা। জালের খুঁটগুলো থাকবে উপরে অর্থাৎ আমাদের আয়ত্তাধীন। হরিণটাকে ঘরের ভিতরে একটা দেওয়ালে এমন ভাবে আমরা বাঁধব যেন মনে হবে সেটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শিং, পা, পেট আর পিঠ সবই বাঁধতে হবে দেওয়ালের সঙ্গে। এমন জায়গায় বাঁধতে যেন হরিণটাকে দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় বা থেকে। দরজার একটা কপাটও থাকবে, আর সেটা থাকবে ওপর থেকে, যে দড়ি থেকে ঝুলে থাকবে সেটা থাকবে বাইরে অর্থাৎ আমাদের নাগালের মধ্যে। সি ঘরের ভিতর ঢুকলেই দড়িটা কেটে দেব আমরা—অ কপাটটা বন্ধ হয়ে যাবে!"

"সিংহটা ঢুকবে হরিণের লোভে?"

"নিশ্চয়। আর আসবে সিংহিনীর ডাক শুনে অর্থাৎ লোভ আর কাম এই দুই রিপুই তাকে বন্দী করবে আমরা উপলক্ষ মাত্র—"

মিম্মিরের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং দৃষ্টি তিনি সুরঙ্গমার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

সুন্দরানন্দ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তি বলিলেন, "বেশ, কাল থেকেই লোক লাগাচ্ছি। চার দিনের মধ্যেই ফাঁদ তৈরি হয়ে যাবে"

কুমার সুন্দরানন্দের আদেশে এবং মিম্মিরের তত্ত্বাবধা কয়েকদিনের মধ্যেই সিংহের ফাঁদ প্রস্তুত হইয়া গে তাহার পর প্রায় প্রতি রাত্রেই মিম্মির গভীর রাত্রে বা হইয়া যাইতেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চতুর্দ্দিক প্রকম্পি করিয়া সিংহিনীর ডাক ডাকিতেন। সত্যই মনে হইত একটা আকুল কামনা নিবিড় অরণ্যের অন্ধকারে গর্ নিশীথিনীর বুক চিরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সিংহি ডাক ডাকিয়া প্রতি রাত্রেই মিম্মির ফিরিয়া আসিতেন ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেন প্রত্যুত্তরে সিং ডাক শোনা যায় কি না। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি কি শোনা গেল না।

সেদিন গভীর রাত্রে মিম্মির উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিলে সমস্ত অরণ্য মুখরিত করিয়া ঝিল্লী ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছি মাঝে মাঝে বন্য-পেচকের কর্কশ চীৎকার, আকা দ্রুতগামী হংসদলের সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত নিনাদ, জম্বুকণ্ঠের ক্ষণস্থায়ী ঐক্যতান ঝিল্লী ঝঙ্কারকে মাঝে বিঘ্নিত করিতেছিল বটে, কিন্তু বিঘ্নিত করিয়াই তাহাকে আরও স্পষ্ট আরও জীবন্ত করিয়া তুলিতে উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহা যেন আ

...ত হইয়া উঠিতেছিল। এই ঝিল্লী ঝঙ্কারের সহিত ...তেছিল মৃদু বীণার ঝঙ্কার। পাশের ঘরে বসিয়া ...মা মালকোষ আলাপ করিতেছিল। মির্মির মনে মনে ...র্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল তিনি আত্মহারা গিয়াছেন। কুমার সুন্দরানন্দ সকৌতুকে তাঁহার ... দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব ...য়া অবশেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কুমার মির্মির, ...নি কি সিংহ গর্জ্জন শোনবার জন্যই অতটা একাগ্র ...ছন?"

...র্মির হাসিয়া বলিলেন, "না। সিংহ গর্জ্জন এত স্থূল ... শোনবার জন্য একাগ্র হতে হয় না। সে গর্জ্জন ...ট হাতুড়ির মতো এসে চেতনার উপর আঘাত করবে। ... ঝঙ্কারময়ী নিশীথিনীর অন্তরের ভাষা শুনছিলাম"

"ও! কি রকম সে ভাষা! আমি একটু জানতে ...কি"

"আত্মসমর্পণের ভাষা। সমস্ত পৃথিবী থেকে অহোরাত্র ভাষা উঠছে আকাশের দিকে। দিনের বেলা সেটা ভাল বুঝতে পারি না। গভীর রাত্রিতে একটু চেষ্টা করলে সেটা বোঝা যায়"

"ও, আপনি একদিন বলেছিলেন বটে এই ধরণের একটা কথা। আপনার অপ্সরীকে কোথায় কেন-ত্যাগ করেছিলেন সে কাহিনীও শোনাবেন বলেছিলেন একদিন গভীর নিশীথে। শোনাবেন না কি এখন—"

"তা শোনাতে পারি। কিন্তু তার আগে মনটাকে প্রস্তুত করে' নিতে হবে। না নিলে এর মাধুর্য্য, এর মহিমা ঠিক বোঝা যাবে না"

"আপনিই মনটাকে প্রস্তুত করে' দিন। সুরঙ্গমাকে ডাকব?"

"ডাকুন—"

বীণাহস্তে সুরঙ্গমা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিতেই মির্মির বলিলেন, "আপনি কুমারের পাশে বসে বীণায় মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিন। তাহলে আমার বক্তব্যের পটভূমিকাটা আরও মনোরম হবে"

কুমার সুন্দরানন্দের মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হইল, সুরঙ্গমাও হাসিমুখে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

ভিক্ষা

এলা বসু

দিনের পরে দিন যে গেল কেটে
তোমার ঘরের প্রদীপ জ্বলল না।
আঁধারে মুখ রইলে তোমার ঢেকে,
তোমার চোখের আড়াল সরল না।
এমনি করেই হবে রাত্রি দিনে,
তোমার ঘরে আমার আনাগোনা
ঋণের বোঝা বাড়বে কেবল দানে,
হবে না আর মোদের জানাশোনা।
হায় গো, তোমায় দেখব বলে প্রভু,
সকাল বেলার আলোয় খুঁজি পথ,
ধূলির বুকে পাইনে চিহ্ন কভু
যেদিক পানে গিয়াছে তোমার রথ।

সন্ধ্যা-বেলা প্রহর গুণি শেষে
আসবে কখন আঁধার-ভরা রাত
হাজার তারার মালা গলায়
হয়ত হেসে ডাকবে অকস্মাৎ।
বরষা রাতে ঘুম আসে না চোখে,
শুনি মেঘের ডাকে তোমার শঙ্খধ্বনি
তোমার বার্ত্তা পাঠাও লোকে লোকে,
আমার বুকে বাজে তাহার আগমনী,
দেখতে আমার বাধা বলেই, প্রভু,
এমনি করে তোমার আসা-যাওয়া?
আমার ঘরের আঁধার ঘুচবে না কি কভু?
তোমার পানে হবে না মোর চাওয়া?

রেলওয়ে বাজেট

সম্প্রতি ১৯৫৩-৫৪ সালের যে রেল-বাজেট ভারতীয় সংসদে রেল-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবারের ন্যায় উদ্বৃত্তই অবশ্য দেখানো হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে—ভারতের রেলপথগুলির আয় ক্রমশই নিম্নগামী হইতে চলিয়াছে। গত ১৯৫২-৫৩ সালে অনুমান করা হইয়াছিল যে ২২ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ষ-অন্তে দেখা গেল, উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাত্রীদের ভাড়া বাবদ চলতি সনে ১১২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া যেখানে ভাবা গিয়াছিল সেখানে ঐ বাবদ মাত্র ১০২ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা কম। মালের মাশুল বাবদ চলতি সনের বাজেটে ১৬৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে অনুমান করা গিয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা গেল যে, এই বাবদেও ২ কোটি টাকা কম আয় হইয়াছে। চলতি সনে রেলওয়ের সর্বসমেত মোট প্রাপ্তি হইয়াছে ২৬৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা; অনুমিত বাজেট অপেক্ষা ইহা ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা কম। প্রাপ্তি কম হইলেও ব্যয় ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বাজেটের অনুমান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে। সমস্ত মিলাইয়া মোট ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, চলতি সনের বাজেটে যেখানে ২৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে অনুমান করা গিয়াছিল সেখানে হইয়াছে মাত্র ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ ১৪ কোটি টাকা কম উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

আগামী বৎসরের বাজেটে ২৭২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা মোট আয় অনুমান করা হইয়াছে। রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৯১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ফাণ্ডে দেয় এবং অন্যান্য ব্যয় যোগ দিয়া মোটমাট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এইরূপে আগামী সনে সর্বসমেত উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে ৪৪ কোটি টাকা। তাহা হইতে সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেয় ৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া আগামী বছরের বাজেটে মোট উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

রেল-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী রেলপথের আয় হ্রাসের কারণ দর্শাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ: যুদ্ধোত্তরকালে মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা গত বৎসর হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলস্বরূপ ইহা ঘটিয়াছে। যদিও তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা দেন নাই, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল এখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; আপাতত রেলওয়ের আয়হ্রাসের যে সূচনা দেখা গেল তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। উপস্থিত রেলদপ্তরের উচিত—ইহার প্রতি রীতিমত লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত এবং রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেখানে সুস্পষ্ট, সেখানে সর্ববিষয়ে সতর্ক নীতি অবলম্বন করাই কর্তব্য। সেই সঙ্গে যাহাতে অপব্যয় নিবারণ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রেলওয়ের বিভিন্নরূপ অগ্রগতির ফিরিস্তিও রেল-মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। যথা, ১২টি লুপ্ত রেল লাইনের পুনর্নির্মাণ চেষ্টা—৫টি নূতন লাইন নির্মাণ প্রভৃতি। সর্বোপরি কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বৈদ্যুতিক ট্রেণ প্রচলন এবং তিলডাঙ্গা পাকুরিয়া মালদহ লাইন নির্মাণ বিষয়ক প্রস্তাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশেষ প্রস্তাবটিতে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা নিশ্চয় আগ্রহান্বিত হইবেন। প্রকাশ ১৯৫৩-৫৪ সালেই উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির তথ্যানুসন্ধানের কাজ সুরু হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধাদানের কতকগুলি দৃষ্টান্ত রেল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে এতাবৎ বহু আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি ফলোদয় উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় নাই। অবশ্য পূর্বাপেক্ষা উন্নতি একটু যে না হইয়াছে এমন কথাও বলি না! কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অত্যধিক ভিড়ের সমস্যায় পূর্বেও যেরূপ বিব্রত হইত আজও তাহাই হইতেছে। তাহার কোনো প্রতিকার আজও হইল না। অথচ ইহার আশু প্রতিকার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বয়ং রেলমন্ত্রী মহাশয়ও এ সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী রিটার্ণ টিকিটের পুনর্ব্যবস্থা সম্বন্ধেও একটু আশ্বাস দিয়াছেন। তবে আশ্বাসটি বিশেষ সন্তোষজনক নয়। রিটার্ণ টিকিটের ব্যবস্থা পূর্ববৎ চালু করিবার দাবী অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এ বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিধার ভাব পোষণ না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করাই উচিত। শিক্ষার্থীদের ও সমাজ-উন্নয়নকার্যে লিপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদিগের ভাড়া সম্বন্ধে সুবিধাদানের যে প্রস্তাব রেল মন্ত্রী করিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। শ্রেণী বিভাগ্ সম্বন্ধে তিনি পুনরায় যদি কিছু করিতে চান

যদা হইলে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, পুনঃ পুনঃ শ্রেণী পরিবর্তনে যাত্রীদের অসুবিধা বৃদ্ধি না করিয়া, সত্বর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলুন। নচেৎ বার বার এইরূপ করিলে রেলদপ্তরের অব্যবস্থিত-চিত্ততাই প্রকাশ পাইবে এবং সরকারের পক্ষেও ইহা সুনামের পরিচায়ক হইবে না।

পশ্চিম বাংলার বাজেট—

প্রথানুযায়ী প্রতিবারের ন্যায় এবারও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় বাজেট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। উপস্থাপিত করিয়াছেন পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বাজেট সমালোচনায় এবার অর্থাভাব অপেক্ষা অক্ষমতার প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ রাজ্য-সরকার কয়েকটি পরিকল্পনায় এমন শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন যাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং লজ্জাজনক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—সরকারী মোটর পরিবহন ব্যবস্থার কথা। ১৯৫০-৫১ সালে এই বাবতে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে; ১৯৫১-৫২ সালে লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা; ২২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে ১৯৫২-৫৩ সালে এবং আগামী সনের বাজেটে অনুমিত লোকসানের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ পরিকল্পনায় ১৯৫১-৫২ সালে সরকারের লোকসান হইয়াছে ২ লক্ষ টাকা;—১৯৫২-৫৩ সালেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে। উপস্থিত ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা অপেক্ষাও অধিক লোকসান অনুমান করা হইয়াছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহসমস্যা সমাধানকল্পে সরকার যে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন তাহাও উল্লিখিতরূপেই শোচনীয়। ১৯৫১-৫২ সালে এই বাবদ সরকার ২৩ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়াছেন—১৯৫২-৫৩ সালে লোকসান দিয়াছেন ১১ লক্ষ টাকা এবং আগামী সনে নাকি লোকসান হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। ইহা ব্যতীত খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যাপারে ১৯৫১-৫২ সালে ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা লোকসান হয়, ১৯৫২-৫৩ সালের লোকসান ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং আগামী বছরের লোকসান ধরা হইয়াছে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এইরূপ আরো বহু আছে—দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। মোট কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানেই গঠনমূলক কাজে হাত লাগাইয়াছেন সেইখানেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং জনসাধারণের অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ ঘটিয়াছে। অথচ একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই সকল পরিকল্পনায় এইরূপ লোকসান হইবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, অতঃপর তাঁহারা যেন একটু সচেতন হন এবং 'গৌরী সেনের' অর্থের প্রতি কিঞ্চিৎ মমতা প্রদর্শন করেন।

শিক্ষকদের দাবী—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে মিছিল করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকরা তাঁহাদের দুস্থ-অবস্থা ও দাবীর কথা ঘোষণা করিতে করিতে বিধান-সভা অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজপথের জনতা কর্তৃক প্রচুর সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করিয়া তাঁহারা সদলে যখন সভার পশ্চিমদ্বারে উপনীত হইলেন, তখন প্রতিবার যাহা ঘটে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল। সভা মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বহিল। সরকার-বিরোধী নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে ও শিক্ষামন্ত্রীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন—বাহিরে গিয়া শিক্ষকদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে এবং তাঁহাদের অভিযোগ শুনিতে। মন্ত্রীযুগল বারংবার তাহা অস্বীকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী জানাইলেন—তিনি শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন; পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে তাহা সম্ভব হইতেও পারিবে। বহুক্ষণ উভয় দলের তিক্ত মন্তব্য বিনিময়ের পর এই অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান হইল। শিক্ষকগণ তাঁহাদের দাবী এবং অভিযোগ-সমন্বিত স্মারকলিপি সদস্যদের হাতে দিয়া শৃঙ্খলার সহিত চলিয়া গেলেন। রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য দূর করার জন্যই শিক্ষকরা এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহারা ভালো রূপেই জানেন যে এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনে সদ্য সদ্য কোনো সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভবপর নয়। শিক্ষকরা যাহা করিয়াছেন তাহা ভালো কি মন্দ সে বিচার করিয়া লাভ নাই। কারণ অন্যান্য রাষ্ট্রেও বুভুক্ষু নগণ্য-বেতনভোগী অবজ্ঞাত শিক্ষককুল অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন। বাধ্য হইতেছেন নিজেদের বাঁচিবার অধিকার ব্যক্ত করিতে। কিন্তু তথাপি কুণ্ঠিত সংকোচের সঙ্গে একটি কথা বলিতে হইতেছে—শিক্ষকগণ কথাটি ভাবিয়া দেখিবেন। বৃত্তি ও জীবিকা যেমনই হোক, শিক্ষকশ্রেণীর সমাজ মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান আছে। সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ করা তাঁহাদের উচিত নয়। তাঁহারা যদি নিজেদের দুরবস্থা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে দলগত রাষ্ট্রনীতির সহিত অজ্ঞাতসারেও জড়িত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য আবিল ও ব্যাহত হইয়া পড়াও বিচিত্র নয় এবং তাঁহাদের আচরণ ছাত্র-সমাজের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহাও চিন্তার বিষয়। তথাপি তাঁহাদের বিক্ষুব্ধ হইবার যে কারণ নাই, একথা কেহ বলে না—বলিবেও না। তাঁহাদের অভাব অনটনের প্রতি সমাজের প্রচুর সহানুভূতি আছে। তাঁহাদের আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ববিধ বৈধ আন্দোলনকে আমরা একান্তভাবে সমর্থন করি। শিক্ষকদের অসন্তুষ্ট রাখিয়া শিক্ষাকে সহজলভ্য করিবার দিন আর নাই।

আজ শিক্ষকগণ যে দাবী লইয়া রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দিনে দিনে তাহার পশ্চাতে জনসমর্থন প্রবল হইয়া উঠিবে ইহা নিঃসন্দেহ। সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী দল ইহাকে যদি অভিসন্ধিমূলক আন্দোলন মনে করিয়া এড়াইয়া যাইতে চাহেন তাহা হইলে ফল শুভ হইবে না। স্বল্পবিত্ত এবং দুঃখ-নিপীড়িত অসন্তুষ্ট শিক্ষকগণের ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ যদি এইভাবে ভাঙিতে আরম্ভ করে, তবে দেশের দশের কাহারও পক্ষেই তাহা মঙ্গলের হইবে না। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার শিক্ষাবিভাগীয় পরামর্শদাতাদের এই অবাঞ্ছিত অবস্থার আশু প্রতিবিধান করিতে আমরা অনুরোধ করি।

বাংলা ভাষা ও বিহার বিধান সভা—

বিহার বিধান সভায় বাজেট অধিবেশনে শ্রীসত্যকিংকর মাহাতো (সদস্য, লোকসেবকসংঘ—মানভূম) হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা জানেন না বলিয়া মাতৃভাষা বাংলায় বাজেট সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য বলিতে শুরু করেন। বক্তৃতা চলিতে থাকে—বাংলা ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বোধগম্য হইতেছে না এমন কথাও কোনো সদস্য বলেন নাই, কিংবা কোনোরূপ আপত্তিও কেহ জানান নাই। সত্যকিংকরবাবু অবাধেই বক্তৃতা দিতে ছিলেন। অকস্মাৎ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরপ্রসাদ বর্মা বাধা দিলেন। জানাইলেন, বাংলায় বক্তৃতা চলিবে না—সত্যবাবুকে হয় হিন্দীতে, নয় ইংরাজীতে তাঁহার বক্তব্য বিধানসভায় জানাইতে হইবে। সত্যবাবু মাতৃভাষা বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন না বা করিতে রাজি নন; সুতরাং তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল।

ভারতের সংবিধানে যে কয়টি ভাষা স্বীকৃতি পাইয়াছে বাংলা তাহার অন্যতম। তথাপি একজন বাঙালী সদস্যকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতে না দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বুঝিলাম না। ইহাদ্বারা অধ্যক্ষ মহাশয় সংবিধানের অভিপ্রায় রক্ষা করিয়াছেন কি না তাহাই প্রশ্ন? আমাদের মনে হয় ইহার মধ্যে অন্য কোনো অভিসন্ধি কার্য করিতেছে। বাংলা ভাষার প্রতি এই অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় শুধু বিধানসভার একজন সদস্য সত্যকিংকরবাবুকে অপমানিত করেন নাই সমগ্র বাঙালী সমাজ ও বাংলা ভাষাকে অপমানিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সংবিধানেরও অভিপ্রায় ভঙ্গ করিয়াছেন।

নেপাল ও ভারত—

সম্প্রতি কাশীতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় নেপালের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গণেশমান সিংহ বলিয়াছেন: নেপালস্থ ভারতীয় উপদেষ্টারা ও সামরিক লোকজনরা অতিশয় উদ্ধত। বিজেতা মার্কিনরা জাপানে যেরূপ আচার-ব্যবহার করিত, উহারাও তাহাই করিতেছে।—শ্রীযুক্ত গণেশমান শুধু এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হন নাই। ভারতীয় উপদেষ্টা ও সামরিক লোকজনদের 'অপদার্থ এবং চরিত্রহীন' বলিয়াও আক্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গণেশমানের অভিযোগগুলি খুবই গুরুতর এবং উহার মধ্যে আংশিক সত্যও যদি থাকে, তাহা ভারত ও নেপালের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার পরিপন্থী হইবে। ভারত ও নেপালের বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কোনো দিনই ভারতবাসী নেপালের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহে নাই। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিদের আচরণে যদি নেপালবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং ভারতের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা অত্যন্ত লজ্জার কারণ হইবে। ভারত সরকারের কর্তব্য, এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

পাকিস্তানের স্বরূপ—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাক-মসলিম লীগের হারুণ পাকিস্তানের দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

জনাব ইউসুফ হারুণের ন্যায় একজন পাক-সরকারের গোঁড়া সমর্থক যখন পাকিস্তানের সর্বত্র ব্যাপক উৎকোচ-গ্রহণ ও সর্বপ্রকার দুর্নীতির কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তখন প্রকৃত অবস্থা অনুমান করিয়া মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অবশ্য সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু যে দুর্নীতির ব্যাপারে ভারতও বিশেষ পিছাইয়া আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিচার পরীক্ষায় মিশরের জননায়ক—

'আল আকবর' নামক কায়রোর এক সংবাদপত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটিতে বলা হইয়াছে যে মিশরের জননায়ক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা নাহাশ, তাঁহার পত্নী এবং আরো পাঁচ জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিচার হইবে। নগীব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অবাঞ্ছিত বিতাড়ন কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহারই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিশরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ওয়াফদের নায়ক যে অবশেষে এইরূপ এক বিচারের সম্মুখীন হইবেন তাহা কে কবে কল্পনা করিয়াছিল? নাহাশ সাহেব নিজেও কি কোনোদিন এইরূপ পরিণতির কথা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন? পারেন নাই। ক্ষমতার আসনে উপবেশন করিয়া অনেক নেতাই ভবিষ্যতের কথা বিস্মৃত হন। ভুলিয়া যান যে, বর্তমানে যে ক্ষমতায় তিনি অধিষ্ঠিত সে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে অনাগত ভবিষ্যতে একদিন জনগণের নিকটে জবাবদিহি করিতেই হইবে। এমন কি, ক্ষমতামত্ত অবস্থায় যে অবাঞ্ছিত শাস্তি তিনি জনসাধারণ ও বিরোধী পক্ষের প্রতি আরোপ করিবেন তাহাই আবার একদিন তাঁহাকে নত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। ইহাই নিয়ম—ইহাই চিরন্তন ইতিহাসের শিক্ষা। আজ মিশরের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও ওয়াফদের সুবিখ্যাত নেতা মুস্তাফা নাহাশ সদলে সেই ইতিহাসের পৌনঃপৌনিকতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

পশ্চিম বার্লিন—

পশ্চিম বার্লিন অবরোধ করার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে অনেক বার সচেষ্ট হইয়াছেন, যদিও কোনোবারই সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হন নাই। উপস্থিত নব পর্যায়ে আবার সেই চেষ্টা শুরু হইয়াছে। সোভিয়েটের অধিকৃত যে সমস্ত রাজপথ পশ্চিম বার্লিনকে পূর্ব বার্লিনের সহিত যুক্ত করিতেছে—প্রকাশ—তাহার অধিকাংশ পথই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে সামান্য পথ কয়টি আজও উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহাও স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের যোগ্য নহে। শুধু তাহাই নয়, তল্লাশী, তদন্ত আর অত্যাচারের আধিক্যে রেলপথে যাওয়া আসাও দায় হইয়া উঠিয়াছে।

অলাপ ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিতেছেন বটে কিন্তু প্রতিবিধানের জন্য আজও তেমন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ইহার পূর্বে আর একবার যখন উভয় বার্লিনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তখন বিমানের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পশ্চিমী কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীগণের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুগুলি বিমানের সাহায্যেই তখন সরবরাহ করা হইয়াছিল। আর তখনই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন —যখন দেখিলেন বিমানের সাহায্যে পরিচালিত সরবরাহ বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমানে যে নিষেধাত্মক ব্যবস্থা তথায় চলিয়াছে তাহার পরিণতি কি হইবে কে জানে!

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৯

তোমার লিপিকাখানি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের খঞ্জনী বাজায়েছি দুইজনে একদোলে তোলো কত প্রেমে দোলাদুলি,
যৌবন উপবনে সুগোপনে কোলাকুলি মিলন বীণার তারে ঝঙ্কার তুলি!
আমার ভাবনা শত ভ্রমিতেছে নিরিবিলি কপোত-কাকলী কোথা লুকালো সুদূরে!
কথা যেথা ফুরায়েছে, গান সেথা সুরু হোলো, গান যেথা শেষ হোলো, রেশ রহে সুরে।
আমার লিপিকাখানি এসেছে ফিরিয়া হেথা কেমনে ভুলিয়া গেলে সহসা আমারে,
তোমার লিপিকাখানি আজো পড়ি নিরালায়, তুমি যে কোথায় আছ শুধাই কাহারে!

তোমার চরণধ্বনি শুনিবারে কানপাতি, ধীরে ধীরে আঁখি'পরে নামিল কি ঘুম!
ক্ষুধিত পাষাণ কাঁদে হিয়ার পরশ লাগি, উদাস বিভোল ধরা নীরব নিঝুম।
ভালো লাগে তোমারে যে ভালোবাসা বিনিময়ে নাহি যাহা তাই দিতে বেদনায় জাগে,
তিমিরের কূলে মোর রূপালী চাঁদের তরী তুমি কি ভিড়াবে আজ প্রেম অনুরাগে!
বরষ বিদায় ক্ষণে মনে আশা হেরিবারে তোমার রূপের জ্যোতি এ দুটি নয়নে,
তোমারে শোনাতে গীতি সাধ হয় অনিবার অভিসারে হৃদয়ের কুসুম চয়নে।

এমন নিশুতি রাতে কথা যদি পড়ে মনে এসো হেথা নিরালায় ক্ষণ অবসরে,
নিখিল ঘুমায়ে আছে, জেগে আছে তারকারা, ধীরে বহে সমীরণ বাতায়ন'পরে।
এ ধরার সব সুর লইয়াছ কণ্ঠে তুলে সুরহারা পথপানে শুনাবে বলিয়া,
জোনাকি খচিতবাসে সুরভি বিলায়ে এসো না বলে গিয়েছ কেন সুদূরে চলিয়া!
পিপাসিত আঁখি পানে ছলভরা আঁখি জল রেখে গেলে পলাতকা—ভুলিবার নয়,
তোমাতে আমাতে দেখা নহে শুধু এই যুগে, যুগে যুগে পরিচয় স্মৃতি-মধুময়।

দীপ জলে গৃহমাঝে, দ্বার খুলে বসে আছি, নুয়ে পড়ে ফুলশাখা আঙিনার কোলে,
নদীতে জোয়ার এলো, ফুলে ফুলে ওঠে ঢেউ তটে তার কলরোল, তরীগুলি দোলে।
চেতনার জয় কোথা? যাহা যাবে যাহা যায় তার প্রতি কেন জাগে অকারণ মায়া,
যেথায় মিলন জাগে সেথায় বিরহ কেন! যেথায় প্রদীপ জলে সেথা আলো ছায়া।
দীপ তুলে ধরিবার পরম লগনে মম আলো করে দাঁড়াবে কি মোর কথা স্মরি!
তোমার নয়ন নীলে নীলিমার ছায়া মেখে আসিবে কি চুপি চুপি এলায়ে কবরী!

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রাবণের শেষে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজনগরের মুখুজ্জেদের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল—এবং খুব ধূমধামের সঙ্গে তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই শ্রাদ্ধে যে পণ্ডিত বিদায় হইয়াছে তাহা লোকবিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক পণ্ডিত একখানা থালা, একটা ঘটি, বস্ত্র ও উত্তরীয়সহ একখানা মোহর পাইয়াছেন এবং সেদিন শাস্ত্রীয় বিচারে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আরও দুইটি মোহর দেওয়া হইয়াছে। মতি-ঠাকুরমশায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে গোপালই গিয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দুইটি মোহর সেই পাইয়াছিল। গোপালের খ্যাতি সেদিন হইতে লোকবিশ্রুত হইয়া আছে।

বিজয়ার পরদিন গোপাল সকালে আসিয়া ডাকিল—বৌঠান, বেরিয়ে এস—

মতিঠাকুরের স্ত্রী হেঁসেলে কি যেন করিতেছিলেন, গোপালের স্ত্রী ঘরের দাওয়া নিকাইতেছিল। তিনি জবাব দিলেন—কি বল্ না গোপাল—

গোপাল এত ছোট যে তিনি দেবরকে নাম ধরিয়াই সম্বোধন করেন। গোপাল কহিল—এস না বাইরে, শোনো—

অগত্যা তিনি বাহিরে আসিলেন, গোপাল তাহার পায়ের নিকট একছড়া কড়িহার রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল—বিজয়ার প্রণাম ক'রলাম।

সবিস্ময়ে বৌঠাকরুণ কহিলেন—কোথায় পেলি তুই? এ হার পরবার বয়স আছে নাকি? বৌকে দিলি না কেন?

—সে তোমরা দিও। রাজনগরে দু'খানা মোহর বিদায় পেয়েছিলাম তাই দিয়ে করলুম—

—তা আমাকে কেন? গৌরীকে দিলেই পারতিস্।

—বললুম ত তোমরা দিও।

দুইজনে যখন বাদানুবাদ করিতেছিলেন সেই সময় মতিঠাকুর ফুলের সাজি হাতে করিয়া অন্দরে ঢুকিলেন। মতিঠাকুরকে দেখিয়া তাহার স্ত্রী কহিলেন—এই ছাখো গো গোপালের কাণ্ড—হার তৈরী করেছে আমার জন্যে, আমার বয়স কম্‌ছে যেন।

মতিঠাকুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—কোথায় পেলি?

—রাজনগরের পণ্ডিত-বিচারে দুটো মোহর পেয়েছিলাম তাই দিয়ে—

—তা হার গড়াতে গেলি কেন?

—বৌঠানের ত কিছুই নেই, সব দিয়ে ত বিয়ের সময় গহনা গড়েছেন—তাই—

মতিঠাকুর পরিহাস করিলেন—ধার শোধ দিচ্ছিস্ বুঝি? সংসারবুদ্ধি তোমার কত! হরিহরের উপনয়ন আছে, তারপর তোর ছেলের অন্নপ্রাসন আছে, সোনা ঘরে থাক্‌লেই কাজ দেয়—

গোপালের স্ত্রী গৌরী ভাসুরকে দেখিয়া দাওয়ার এক-কোণে দাঁড়াইয়াছিল এবং এখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করিল। গোপাল কহিল—সোনা ত ঘরেই রইল।

—বাণীর টাকাটা ত গেল—

—আর বুঝি পণ্ডিত-বিদায় হবে না? হরির উপনয়নের আংটির সোনা পাব না—

মতিঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—কোন বুদ্ধি হল না—পণ্ডিত-বিদায় ত উঠে গেল বলে, সে কথা কি বুঝিস্! তা বৌমাকে কি দিলি শুনি? ও ত ছেলেমানুষ—সখের সময়—

গোপাল লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মতিঠাকুর মহাশয় ঠাকুর ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন—ওসব ছেলেমানুষী ক'রবি নে। আমি আর ক'দিন, এমনি করলে সংসার ক'রতে পারবি?

গোপাল কোনমতেই বুঝিল না এটা অপচয় হইল কি করিয়া! গোপাল মৃদুকণ্ঠে কহিল—একটু গলায় দাও না দেখি—ছোট হল কি না?

বৌঠান সহাস্যে হার গলায় পরিয়া কহিলেন—থাক্

একদিন কত কোল ভাসিয়েছিস্, তোর দেওয়া হার যে গলায় পরবো তা কি ভেবেছি কোন দিন?

গোপাল পরম উল্লাসে কহিল—ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—আন্দাজে মাপ দিয়েছিলাম ত? এখন হরির একটা আংটির জোগাড় ক'রতে হবে—

গোপাল কহিল—আশীর্ব্বাদ ক'রো ঘৌঠান, দাদার শেখানো বিদ্যেয় অনেক আন্‌বো—

রাত্রিতে গোপাল দেখিল—নতুন হারটা গৌরীর গলায় ঝুলিতেছে। গৌরী অপরাধীর মত কহিল—আমাকে পরিয়ে দিলেন আমি কি ক'রবো?

গোপাল ব্যথিত হইয়া কহিল—ওরা শুধু দিলেনই আমাকে সারাজীবন, কিছুই নিলেন না—

গৌরী বেদনার্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হরি ত রইল—তাকে আমরা সব ফিরিয়ে দেব—

গোপাল সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—আত্মপ্রসাদের সঙ্গে একটু হাসিল—তাহার শিক্ষা বৃথা হয় নাই। সে সংক্ষেপে শুধু কহিল—ওদের সেবা ক'রো—দাদার শরীর আর তেমন পটু নেই—

ভাদুলিয়া কলিয়ারীর কুলির ধাওড়া।

প্রত্যূষে উঠিয়া আদুরী ও ভরত ধরণীর অন্ধকার গর্ভে অবতরণ করে। নীচেয় যাইয়া লণ্ঠন ও গাইতি লইয়া দুই জনে ভূগর্ভের নিবিড় অন্ধকার-সর্পিল পথ বাহিয়া যথাস্থানে যায়—ভরত চালায় গাঁইতি, কালো কালো কয়লার স্তূপ খান্ খান্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, আদুরী চুপড়ি বোঝাই করিয়া টব ভর্ত্তি করে, তাহার পর দুইজনে সেটাকে ঠেলিয়া লইয়া যায় উপরের দিকে—সেখান হইতে কলে টানিয়া ভূগর্ভের জ্বালানিকে পৃথিবীর উপরে লইয়া আসে। এমনি করিয়া এক সপ্তাহ তাহারা কাজ করে—শনিবারে মুজুরী পায়। খোরাকী খরচ করিয়া সযত্নে তাহারা সঞ্চয় করে তাহাদের গৃহনির্ম্মাণের অর্থ।

মাঝে মাঝে সিফ্‌টবাবু আসেন দেখিতে—কাজ কিরূপ হইতেছে। মাঝে মাঝে আদুরীর মুখের উপর লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া হয়ত কেহ প্রশ্ন করেন—ঐ তোর মুনিষ—

আদুরী বলে—হাঁ৷ মোর মুনিষ—

—সাঙার, না বিয়ের?

—মোর সাঙার মনিষ।

একদিন বাবু আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোর নাম কি?

ভরত জবাব দিল—ভরত—

—কতদিন এসেছিস?

—এক মাস হ'ল—

—কত করে হপ্তা পাস্—

—দু'জনে বার টাকা পাই—বাবু—

বাবু সমবেদনার সুরে কহিলেন—এতে তোদের চলে?

—চলে বাবু, কোনমতে—

—শোন—আমার বাসায় তোর কামিন যদি কাজ করে আরও এক টাকা পাবে। কিছুই না, একা থাকি, বাসন ধুয়ে দিবি, কাপড় কেচে দিবি, আর চানের জল তুলবি—এক ঘণ্টা কাজ।

আদুরী জবাব দিল—কখন করবেক? খাদে কাজ করে তার পরে কখন ক'রবেক?

বাবু হাসিয়া কহিলেন—সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোর চিন্তার দরকার নেই। বুঝলি? তোর নাম কি?

আদুরী কহিল—মোর নাম আদুরী—

—তা আদুরী শোন, এদিকে কয়লা আছে, টব ভর্ত্তি ক'রতে হবে। আয় আমার সাথে—

আদুরী ও ভরত নূতন কলিয়ারীতে আসিয়াছে তাহারা এত কিছু বুঝে না—চিরদিনের জন্যও আসে নাই। নূতন গৃহনির্ম্মাণের খরচাটা রোজগার করিবার জন্য আসিয়াছে মাত্র। শিল্পাঞ্চলের কলুষ ও গ্লানির সঙ্গে এই প্রকৃতির শিশুর কোন পরিচয় নাই। আদুরী বাবুর পিছনে পিছনে চলিল—দুই তিনটা অপরিসর গলি পার হইয়া অন্ধকার নির্জ্জন একটা কোণে দাঁড়াইয়া বাবু কহিলেন—শোন্, নতুন এসেছিস্ কোন কিছুই জানিস্ না। এ সব আমার হাতে, আমার ওখানে কাজ সেরে একঘণ্টা পরে খাদে নামবি, আবার একঘণ্টা আগে ছুটি পাবি। এদিকে হপ্তার মুজুরী পাবি, ওদিকে কিছু পাবি—বুঝলি—

আদুরী তাহার স্বার্থটা দেখিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কহিল—উঃ ভরত একলাটি—কাজ করবেক কেমনে? ওকে ছাড়তে মু লারবেক—

—একলাটি কোথা? তুই ত আসবি? আর দেখ

এসেছিস্ ত টাকা রোজগার করতে? টাকা পাবি—তাতে তোর ক্ষতি কি?

আদুরী চিন্তিত হইয়া কহিল—দেখি, উঃ যদি বলে তবে করবেক।

—হ্যাঁ রে করবি, আরও টাকা পাবি। আমার কথা শুন্‌লে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবি। টাকা এখানে ছড়ানো, কেবল খুঁটে-নেওয়া চাই—এখন বয়স আছে টাকা রোজগার করে নে। বুড়ো হ'লে ত পারবি না?

আদুরী কহিল—হ্যাঁ, দেখি ভরত কি বলে—

বাবু কহিলেন—কুছ্ পরোয়া নেই, ভরতকে ভাল মদ খেতে দেব। বলবি, বাবু সব সুবিধে করে দেবে—

বাবু আদুরীর কয়লার কালিতে মলিন কাঁধের উপর একটা চাপ দিয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে কি যেন একটা কহিলেন—তাহার অর্থ আদুরী বুঝিল না, কিন্তু মনে মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল।

আদুরী ফিরিয়া আসিয়া ভরতকে সবই কহিল···ভরত সহজ সরল মানুষ। সে কহিল—ভালই হবেক আদুরী, ছুটিও পাবি, টাকাও রোজগার করবি—ভালো বটেক—

আদুরী কহিল—কি জানি কেমন মানুষ। তু ছাড়া মু কোথাও যাবেক নাই—

ভরত হাসিয়া কহিল—ডর কিসের আদুরী। ওরা বাবু লোক, ভদ্দরলোক, মোরা ত ছোটলোক কামিন কুলি—তোকে সাঙ্গা করবেক না আশনাই করবেক? ঘরকে কেউ নেই—তাই ঝি চাকর খোঁজা করলেক্—

আদুরী কহিল—তু ত মরদ, তোর ডর কি? মোর ত ডর লাগবেই—

কথাটা তখন মীমাংসা হইল না। কে একজন কর্ত্তা-ব্যক্তি আসিয়াছে অনুমান করিয়া ভরত ঘন ঘন গাঁইতি চালাইতে লাগিল।

আদুরী ছোটলোকের ঘরের বৌ, কিন্তু তাহার দেহের মধ্যে কোথায় যেন একটা কোমলতা ও সৌন্দর্য্য ছিল যাহা পুরুষের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে পারে। তাহার দেহের সর্পিল ভঙ্গি, মুখে একটা কমনীয়তা সহজেই লোকচক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারিত। তাহার উপরে এই অঞ্চলের কুলি-কামিনগণের মধ্যে যে একটা পুরুষালি কঠোরতা ও খাদের পরিশ্রম-প্রসূত রুক্ষতা থাকে সেটা তাহার মধ্যে নাই—সহজ সরল গ্রাম্য জীবন ও মুক্ত উদার মাঠের দেওয়া কোমলতা ও শুচিতা তাহার চেহারার মধ্যে পরিস্ফুট। এইটাই বোধ হয় বাবুর চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকিবে।

পরের দিনেও খাদের মাঝে বাবু আবার আদুরীকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, কিরে আদুরী, কাজ করবি না কি?

যাহার অধীনে কাজ করিতে হইবে তাহাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করা শোভন নয়, তাই আদুরী কহিল—তু কি বলিস্ বটে ভরত? কাজ করবেক?

—তু যা না—মোর কি?

বাবু কহিলেন—হ্যাঁ তাই যাবি। ছুটি চাস্, না ছুটির পর যাবি!

আদুরী কহিল—ছুটির পর যাবেক—

—হ্যাঁ আমি হাজরীবাবুর ঘরে থাক্‌বো, তোকে সঙ্গে নিয়ে ঘর দেখিয়ে দেব।

আদুরী কহিল—যাবেক হুজুর—

বাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু আদুরীর বুকের মাঝে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। আদুরী কয়লা বোঝাই টবটা ঠেলিতে ঠেলিতে কহিল—শুন্ ভরত, তু উনুনে আঁচ দিবি, আঁচ উঠতে না উঠতে মু যাবেক ঘরকে—

ভরত টবটাকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়া নীচু দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—হ্যাঁ যাবি—দেরী হবেক ত ভাত তুলে দেবেক—তু তরকারী বানাবি—

আদুরী কহিল—দুমাসে দু'কুড়ি টাকা ত আস্‌বেক। কেনে আর বাবুর বাড়ী এঁটো মল্‌বেক?

—যা কেনে, বাবু এত করে বল্‌লেক।

২টার ঘণ্টা পড়িলে ছুটি হয়—ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া তাহারা উপরে উঠিল। হাজরীবাবুর ঘরে বসিয়া বাবু সিগারেট খাইতেছিলেন, তিনি কহিলেন—চল্ আদুরী—চল্—

হাজরীবাবু একটু বক্র নয়নে তাকাইয়া মৃদু হাসিলেন—ইংরাজিতে কি যেন কহিলেন, উপস্থিত জনতার কেহই তাহা বুঝিল না। আদুরী বাবুর সঙ্গে চলিল—

কুলিদের ধাওড়ার পূবে বাবুদের কোয়াটার। বাবু

ঘর খুলিয়া কহিলেন—নে আদুরী বাসন দুটো ধুয়ে দে, একটু জল তুলে এই বাল্‌তিতে রাখ, এই ত কাজ।

আদুরী দেখিতে দেখিতে আদিষ্ট কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বাবু হাতপা ধুইয়া বারান্দায় একটা আসন পাতিয়া বসিলেন এবং আদুরীকে কহিলেন—বৌ ছেলেপুলে এই দিন পনর চলে গেছে বাপের বাড়ী বুঝলি, একা রেঁধে খেতে কষ্ট হয়, তারপর কাজ রয়েছে। নে একটু তামাক সাজ—তুই তামাক খাস্ ত?

আদুরী তামাক সাজিয়া দিল। বাবু তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন—দাঁড়া, তামাক খাবি—

তামাক নিস্ত একটা সুগন্ধ স্থানটাকে সুগন্ধী করিয়া ফেলিল। আদুরী তামাক খায়, সে এই তামাকু কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল—বাবুর ধূমপানান্তে কলিকায় তামাক টানিতে টানিতে আদুরী মনে মনে প্রশংসা করিল—চমৎকার তামাকু, কিন্তু তাহাতে ঠিক গলায় আঁচ দেয় না।

বাবু কহিলেন—ওবেলার ক'খানা লুচি রয়েছে নিয়ে যা খাবি। এবেলা দুটো ভাতই রাঁধবো—

আদুরী আঁচলে লুচি কয়খানি বাঁধিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বাবু কহিলেন—কাল আসবি। আর পরের সপ্তাহে তোর সময় বদলী করে দেব বুঝলি। বেলা দু'টোয় খাববি খাদে—আর দশটায় ছুটি—সেই ত ভাল—

—না বাবু, এই ভাল—রাঁধতে বাড়তে সুবিধে হয়—

বাবু কহিলেন—তোকে খুব ভাল লাগে বুঝলি, নইলে যার তার দেওয়া জল আমার পছন্দ নয়। যা দরকার বলবি—

কয়েকদিন এই ভাবেই কাজ চলিল—

শনিবারের দিনে সপ্তাহের টাকা দেওয়া হইতেছে, হঠাৎ সেখানে দেখা গেল ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন এবং সপ্তাহের মজুরী দিবার সময় আদুরীকে দেখাইয়া কি যেন একটা কহিলেন—আদুরী তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু বাবু যেন কি একটা জবাব দিলেন। সাহেব আদুরীর দিকে চাহিয়া একটু দেখিলেন এবং স্মিত হাস্যে কহিলেন—এ বাবু, এটো কব আয়া?

—এই এক মাস আয়া হুজুর—

—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা; বক্‌শিস্ কর দেগা—

আদুরী সপ্তাহের টাকা ভরতের হাতে দিয়া বাবুর ওখানে কাজ করিতে আসিল। বাবু তখনও আসেন নাই, একটু অপেক্ষা করিতেই তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন—তোর কপাল ভাল আদুরী। সায়েবের নজর পড়েছে, টাকা রোজগার করবি কত! তবে আমি এঁটো ছাড়া সায়েবকে খাওয়াইনে, এই যা পুণ্য কাজ একটা করি—

বাবুর কথা বলিবার রকম দেখিয়া আদুরী কহিল—কি বলছিস্ বাবু—তু রস খেয়েছিস্—

বাবু হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিলেন—হ্যাঁরে শনিবারে রস্ খায়না কোন শালা? চল তু রস্ খাবি, ভরপেট চল—চাট্ খাবি—

আদুরী কহিল—মু রস্ খাই না—চল তাড়াতাড়ি কাজ করা লাগবেক্—ঘরকে যাবেক—

—হ্যাঁ যাবি, যাবি, একবার শয্যা গ্রহণ করে, রস্ পান করে, পাঁঠার ঝাল খেয়ে যাবি বই কি? তোর মরদের কাছে যাবি বই কি? সে বেটা রস্ খেয়ে একলাটি কি করবে।

বাবু বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া টানিয়া টানিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। আদুরী দ্রুত কাজ শেষ করিয়া কহিল—কাজ হল—যাবেক এখন—

বাবু কহিলেন—শুন্ শুন্ আদুরী, মাথা খাস্ শুন্। এই নে দু'টাকা। এদিকে আর একটা কথা শোন—

—টাকা কেনে রে?

—আমি দিলুম নিয়ে যা, তোদেরই ঘাড়ভাঙ্গা টাকা তোদেরই দেব। এদিকে শোন—

বাবুর মাতলামি দেখিয়া আদুরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—রহস্যচ্ছলে আগাইয়া আসিয়া কহিল—কি বলছিস্ বাবু বল না কেনে?

—লে টাকা লে, নথুনী গড়িবি, মল গড়িবি, আয় এদিকে আয়, ঘরকে চল, রস্ খাবি, চল্—

—ঘরকে যাবে কেনে বল্ না?

—ওরে সতী সাবিত্রী তুমি জানো না কিছু? শালী তোর মত কত আদুরীকে দেখলাম, টাকায় কিনা হয়, না হয় আর দু'টাকা, না হয় আরও দু'টাকা এই ত—চল্।

বাবু আদুরীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মাথে

দু'টি টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন—চল সতী-লক্ষ্মী, চল একবার দ্রৌপদী হবে, চল—

আদুরী হাত ছাড়াইয়া লইয়া টাকা দুইটি বাবুর মুখের উপর ছুড়িয়া দিল। প্রদীপ্ত বহ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া কহিল—তু ভদ্রলোক, টাকার জন্য ধরম খোয়াবী, তোর মা-বোন টাকায় জাত দেবেক—টাকার জন্য মু ধরম খোয়াবেক কেনে?

আদুরী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া হনহন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

আসিতে আসিতে শুনিল, বাবু দ্রব্যগুণে চীৎকার করিতেছেন, ধরম খোয়াবেক কেনে? শালী তেরী আম্মা মার দেগা—জানিস্ আমি যুধিষ্ঠিরের ভায়রা ভাই, শালী চলে গেল—তাজা খুন পিয়েগা—তোর নাড়ী টেনে বের করবো—

বাবুর বীরত্ব-ব্যঞ্জক বক্তৃতা চলিতে লাগিল—আদুরী কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সে শুধু বলিল—বাবুর বাড়ীর কাজ সে আর করিবে না।

(ক্রমশঃ)

কম্যুনিটি প্রজেক্ট

॥বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এম-এ

কম্যুনিটি প্রজেক্ট কথাটির সহিত বর্ত্তমানে প্রায় সকলেই পরিচিত হইয়াছেন। বাংলায় এক কথায় কম্যুনিটি প্রজেক্টের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা কষ্টকর। তবে সাধারণভাবে সকলেই যাহাতে এই প্রজেক্টের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে।

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট আমরা পরশাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জাতীয় সমস্যার দায়িত্বও আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। উদ্বাস্তুসমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, খাদ্যসমস্যা, অর্থসমস্যা—বাস্তবিকই সমস্যার যেন আর অন্ত নাই। কিন্তু সমস্যা আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সমস্যাগুলির মূল স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অগ্রণী হওয়াই আজ একমাত্র কর্ত্তব্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প—প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ আমরা শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপদ। এতদিন আমরা আমাদের অনুন্নত অবস্থার সকল দায়িত্ব বিদেশী রাজার উপর আরোপ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরূপ। স্বকীয় রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে আশানুরূপ গড়িয়া তুলিবার সকল দায়িত্ব আজ আমাদের নিজের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে না পারিলে বিশ্বের দরবারে কোনদিনই আমরা আসন লাভ করিতে পারিব না। জাতি হিসাবে আজ আমরা রুগ্ন, অজ্ঞ ও বুভুক্ষু! এই অভিশাপ হইতে আজ আমাদিগকে মুক্তি পাইতেই হইবে। কিন্তু কোন পথে?

বৎসরাধিক পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনপূর্ব্বক প্রত্যেক অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন। পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের উপর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—কারণ যুগে যুগে কৃষিই এ দেশের প্রধান উপজীবিকা এবং গ্রামীণ সভ্যতা ভারতের বৈশিষ্ট্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবেও দেখা যায় ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২.৩জনই গ্রামের অধিবাসী; সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে আজ খাদ্যসমস্যা ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। প্রতি বছর বিদেশ খাদ্য আমদানী করিবার জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদিগকে খরচ করিতে হয়। খাদ্যব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী না হইলে কিংবা স্বাবলম্বী হইতে পারিলেও এই অর্থ দ্বারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া কিছু পরিমাণে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইত। কিন্তু সেকেলে কৃষিব্যবস্থা ও প্রতি বছর অস্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি হইতে বাড়তি ফসলের পরিমাণ দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। এই জটিল অবস্থা হইতে পরিত্রাণের পথ—জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যের ফলন বৃদ্ধি। দেশে ছোট ছোট শিল্পের প্রসারসাধন করিয়া কৃষকদের কিছু উপরি আয়ের পথ করিয়া দিতে পারিলেই উপর লোকসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাপ কিছুটা কমিবে। কিন্তু জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে যে উন্নত-টেক্‌নিক্ প্রয়োজন, বর্ত্তমান চাষীর বিন্দু পরিমাণ জমিতে তাহা প্রযোজ্য নহে। অথচ অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষি অসাধারণ উন্নত অবস্থায়

ঘর খুলিয়া কহিলেন—নে আদুরী বাসন দুটো ধুয়ে দে, একটু জল তুলে এই বাল্‌তিতে রাখ, এই ত কাজ।

আদুরী দেখিতে দেখিতে আদিষ্ট কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বাবু হাতপা ধুইয়া বারান্দায় একটা আসন পাতিয়া বসিলেন এবং আদুরীকে কহিলেন—বৌ ছেলেপুলে এই দিন পনর চলে গেছে বাপের বাড়ী বুঝলি, একা রেঁধে খেতে কষ্ট হয়, তারপর কাজ রয়েছে। নে একটু তামাক সাজ—তুই তামাক খাস্ ত?

আদুরী তামাক সাজিয়া দিল। বাবু তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন—দাঁড়া, তামাক খাবি—

তামাক নিস্থত একটা সুগন্ধ স্থানটাকে সুগন্ধী করিয়া ফেলিল। আদুরী তামাক খায়, সে এই তামাক্ কিরূপ তাহা দেখিবার জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিল—বাবুর ধুমপানান্তে কলিকায় তামাক টানিতে টানিতে আদুরী মনে মনে প্রশংসা করিল—চমৎকার তামাক্, কিন্তু তাহাতে ঠিক গলায় আঁচ দেয় না।

বাবু কহিলেন—ওবেলার ক'খানা লুচি রয়েছে নিয়ে যা খাবি। এবেলা দুটো ভাতই রাঁধবো—

আদুরী আঁচলে লুচি কয়খানি বাঁধিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বাবু কহিলেন—কাল আসবি। আর পরের সপ্তাহে তোর সময় বদলী করে দেব বুঝলি। বেলা দু'টোয় নাববি খাদে—আর দশটায় ছুটি—সেই ত ভাল—

—না বাবু, এই ভাল—রাঁধতে বাড়তে সুবিধে হয়—

বাবু কহিলেন—তোকে খুব ভাল লাগে বুঝলি, নইলে যার তার দেওয়া জল আমার পছন্দ নয়। যা দরকার বলবি—

কয়েকদিন এই ভাবেই কাজ চলিল—

শনিবারের দিনে সপ্তাহের টাকা দেওয়া হইতেছে, হঠাৎ সেখানে দেখা গেল ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন এবং সপ্তাহের মুজুরী দিবার সময় আদুরীকে দেখাইয়া কি যেন একটা কহিলেন—আদুরী তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু বাবু যেন কি একটা জবাব দিলেন। সাহেব আদুরীর দিকে চাহিয়া একটু দেখিলেন এবং স্মিত হাস্যে কহিলেন—এ বাবু, এটো কব আয়া?

—এই এক মাস আয়া হুজুর—

—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা; বক্‌শিস্ কর দেগা—

আদুরী সপ্তাহের টাকা ভরতের হাতে দিয়া বাবুর ওখানে কাজ করিতে আসিল। বাবু তখনও আসেন নাই, একটু অপেক্ষা করিতেই তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন—তোর কপাল ভাল আদুরী। সায়েবের নজর পড়েছে, টাকা রোজগার করবি কত! তবে আমি এঁটো ছাড়া সায়েবকে খাওয়াইনে, এই যা পুণ্য কাজ একটা করি—

বাবুর কথা বলিবার রকম দেখিয়া আদুরী কহিল—কি বলছিস্ বাবু—তু রস খেয়েছিস্—

বাবু হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিলেন—হাঁরে শনিবারে রস্ খায়না কোন শালা? চল তু রস্ খাবি, ভরপেট চল—চাট্ খাবি—

আদুরী কহিল—মু রস্ খাই না—চল তাড়াতাড়ি কাজ করা লাগবেক্—ঘরকে যাবেক—

—হাঁ যাবি, যাবি, একবার শয্যা গ্রহণ করে, রস্ পান করে, পাঠার ঝাল খেয়ে যাবি বই কি? তোর মরদের কাছে যাবি বই কি? সে বেটা রস্ খেয়ে একলাটি কি করবে।

বাবু বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া টানিয়া টানিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। আদুরী দ্রুত কাজ শেষ করিয়া কহিল—কাজ হল—যাবেক এখন—

বাবু কহিলেন—শুন্ শুন্ আদুরী, মাথা খাস্ শুন্। এই নে দু'টাকা। এদিকে আর একটা কথা শোন—

—টাকা কেনে রে?

—আমি দিলুম নিয়ে যা, তোদেরই ঘাড়ভাঙ্গা টাকা তোদেরই দেব। এদিকে শোন—

বাবুর মাতলামি দেখিয়া আদুরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—রহস্যচ্ছলে আগাইয়া আসিয়া কহিল—কি বলছিস্ বাবু বল না কেনে?

—লে টাকা লে, নথুনী গড়িবি, মল গড়িবি, আ এদিকে আয়, ঘরকে চল, রস্ খাবি, চল্—

—ঘরকে যাবে কেনে বল্ না?

—ওরে সতী সাবিত্রী তুমি জানো না কিছু? শালী তোর মত কত আদুরীকে দেখলাম, টাকায় কিনা হয়, না হয় আর দু'টাকা, না হয় আরও দু'টাকা এই ত—চল্।

বাবু আদুরীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মাঝে

দু'টি টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন—চল সতী-লক্ষ্মী, চল একবার দ্রৌপদী হবে, চল—

আদুরী হাত ছাড়াইয়া লইয়া টাকা দুইটি বাবুর মুখের উপর ছুড়িয়া দিল। প্রদীপ্ত বহ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া কহিল—তু ভদ্রলোক, টাকার জন্য ধরম খোয়াবী, তোর মা-বোন টাকার জাত দেবেক—টাকার জন্য মু ধরম খোয়াবেক কেনে?

আদুরী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া হনহন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

আসিতে আসিতে শুনিল, বাবু দ্রব্যগুণে চাৎকার করিতেছেন, ধরম খোয়াবেক কেনে? শালী তেরী মার দেগা—জানিস্ আমি যুধিষ্ঠিরের ভায়রা ভাই, শালী চলে গেল—তাজা খুন পিয়েগা—তোর নাড়ী টেনে বের করবো—

বাবুর বীরত্ব-ব্যঞ্জক বক্তৃতা চলিতে লাগিল—আদুরী কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সে শুধু বলিল—বাবুর বাড়ীর কাজ সে আর করিবে না।

(ক্রমশঃ)

কম্যুনিটি প্রজেক্ট

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এম-এ

কম্যুনিটি প্রজেক্ট কথাটির সহিত বর্ত্তমানে প্রায় সকলেই পরিচিত হইয়াছেন। বাংলায় এক কথায় কম্যুনিটি প্রজেক্টের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা কষ্টকর। তবে সাধারণভাবে সকলেই যাহাতে এই প্রজেক্টের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে।

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট আমরা পরশাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জাতীয় সমস্যার দায়িত্বও আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। উদ্বাস্তুসমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, খাদ্যসমস্যা, অর্থসমস্যা—বাস্তবিকই সমস্যার যেন তার অন্ত নাই। কিন্তু সমস্যা আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সমস্যাগুলির মূল স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অগ্রণী হওয়াই আজ একমাত্র কর্ত্তব্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প—প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ আমরা শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপদ। এতদিন আমরা আমাদের অনুন্নত অবস্থার সকল দায়িত্ব বিদেশী রাজার উপর আরোপ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরূপ। স্বকীয় রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে আশানুরূপ গড়িয়া তুলিবার সকল দায়িত্ব আজ আমাদের নিজের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে না পারিলে বিশ্বের দরবারে কোনদিনই আমরা আসন লাভ করিতে পারিব না। জাতি হিসাবে আজ আমরা রুগ্ন, অজ্ঞ ও বুভুক্ষু! এই অভিশাপ হইতে আজ আমাদিগকে মুক্তি পাইতেই হইবে। কিন্তু কোন পথে?

বৎসরাধিক পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনপূর্ব্বক প্রত্যেক অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন। পরিকল্প কৃষি-উন্নয়নের উপর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—কার যুগে যুগে কৃষিই এ দেশের প্রধান উপজীবিকা এবং গ্রামীণ সভ্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবেও দেখা যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২.৬জনই গ্রামের অধিবাসী সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। আজ খাদ্যসমস্যা ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। প্রতি বছর বিদেশ খাদ্য আমদানী করিবার জন্য প্রায় ১১০ কোটি টাকার মত বৈদেশি মুদ্রা আমাদিগকে খরচ করিতে হয়। খাদ্যব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইলে কিংবা স্বাবলম্বী হইতে পারিলেও এই অর্থ দ্বারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া কিছু পরিমাণে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইত কিন্তু সেকেলে কৃষিব্যবস্থা ও প্রতি বছর অস্বাভাবিক লোকসংখ্য ফলে জমি হইতে বাড়তি ফসলের পরিমাণ দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে এই জটিল অবস্থা হইতে পরিত্রাণের পথ—জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃ করিয়া খাদ্যের ফলন বৃদ্ধি। দেশে ছোট ছোট শিল্পের প্রসারসা করিয়া কৃষকদের কিছু উপরি আয়ের পথ করিয়া দিতে পারিলেই উপর লোকসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাপ কিছুটা কমিবে। কিন্তু উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে যে উন্নত-টেক্‌নিক্ প্রয়োজন, বর্ত্তমান বিন্দু পরিমাণ জমিতে তাহা প্রযোজ্য নহে। অথচ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষি অসাধারণ উন্নত

মূলধন। মূলধনসৃষ্টি উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের দেশের চাষী এত গরীব যে দুইবেলা তাহাদের পেট ভরিয়া আহারই জোটে না, উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের প্রশ্ন ত' অবান্তর। সুতরাং মূলধনসৃষ্টির অবকাশ অতি সামান্য। গত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আমাদের চাষীর ক্রয়ক্ষমতাও দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই আমাদের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার গোড়ার কথা—কৃষি ও শিল্প উভয়েরই যুগপৎ ক্রমোন্নতিসাধন। এই নীতি উপেক্ষা করিলে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য, এককভাবে কৃষি বা শিল্প—কোনটাই উন্নয়নের সম্ভাবনা নাই।

কম্যুনিটি প্রজেক্ট মূল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারই একটি বিশেষ অঙ্গ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত এবং সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে—যেহেতু গণতন্ত্রের ভিত্তি সংখ্যাধিক্যের মতামতের উপর নির্ভরশীল, এখানেও জনসংখ্যার গুরুত্ব সর্ব্বাই স্বীকার্য্য। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামের অধিবাসী; সুতরাং সরকারের দৃষ্টিও সেইদিকে অধিকাংশ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কম্যুনিটি শব্দের অর্থ সমষ্টিগত জীবন এবং বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্রও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। সুতরাং কম্যুনিটি প্রজেক্টের সরলার্থ—সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন। বলা বাহুল্য, এই সমাজকল্যাণের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে পল্লী-কেন্দ্রিক। গত দুইশত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, গ্রামের জনবল ও সম্পদ এক তরফা আহরণ করিয়া সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিয়াছে! পক্ষান্তরে, সহরগুলি হইতে বিন্দুমাত্র সম্পদও গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। মোট কথা, গ্রামগুলিই সহরগুলিকে এতাবৎকাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু গ্রামগুলির পুষ্টি বা কল্যাণসাধনে সহরের বিন্দুমাত্র অবদান নাই। তাই এই প্রজেক্টের শস্যক্ষেত্র আজ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদিগকে কেন্দ্র করিয়াই সীমায়িত করিতে হইবে। রোগ, বুভুক্ষা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য—সমস্ত সামাজিক অভিশাপ আজ গ্রামবাসীরাই মাথায় বহন করিতেছে। তাই গ্রামগুলিকে আজ বাঁচাইতে হইলে চাই প্রচুর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পদের সংস্থান।

কম্যুনিটি প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্য অধিকতর উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজেক্ট সংক্রান্ত এক ইস্তাহারে বলিয়াছেন—ইহা পল্লীঅঞ্চলের নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সকল অধিবাসীকে বাঁচিবার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দিগ্‌দর্শনের কার্য্য করিবে। কম্যুনিটি প্রজেক্ট সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে খসড়া কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ক) কৃষি—

১। উর্ব্বর ও অনাবাদী জমির সংস্কার সাধন।

২। সেচখাল, নলকূপ, পাতকুয়া, নদীনালা হইতে পাম্পের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রচুর জলের সংস্থান।

৩। উৎকৃষ্ট বীজ সংরক্ষণ।

৪। উন্নত ধরণের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৫। পশুপক্ষী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।

৬। উন্নত কৃষিকার্য্যের জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সংস্থান।

৭। গ্রাম্য পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনা ও কৃষিঋণপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান।

৮। পশুপ্রজনন কেন্দ্র সংস্থাপন।

৯। মৎস্য চাষের সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

১০। খাদ্যবিধানাবলীর পুনর্বিন্যাস।

১১। ফল ও সব্জীচাষের উন্নতিবিধান।

১২। ভূমিসংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহদান ও উন্নত ধরণের সার উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

১৩। বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সংস্কার সাধন।

১৪। সমুদয় কার্য্যকলাপের ফলাফল নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা।

খ) যাতায়াত ব্যবস্থা—

১। উপযুক্ত এবং যথেষ্টসংখ্যক রাস্তা তৈরীর ব্যবস্থা।

২। বৈজ্ঞানিক যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

৩। প্রাণীচালিত যানবাহনের সংস্কার সাধন।

গ) শিক্ষা—

১। প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

২। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপন।

৩। গ্রন্থাগারের সুযোগসুবিধা সম্বলিত সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

ঘ) স্বাস্থ্য—

১। স্বাস্থ্যসম্মত ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক বিধানাবলী প্রবর্ত্তন।

২। রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৩। সন্তানসম্ভবা নারীদের জন্য প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে চিকিৎসার উন্নতিসাধন।

৪। ধাত্রীবিদ্যার উন্নতিসাধন।

ঙ) কারিগরী শিক্ষা—

১। কারিগরী শিল্পীদের দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য Refresher Course ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

২। কৃষিজীবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা।

৩। অপরাপর সহকারী কর্ম্মীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৪। তত্ত্বাবধায়কদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৫। শিল্পীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৬। পরিচালনাবাহিনীর কর্ম্মীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

৭। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা।

৮। মূল পরিকল্পনার উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

চ) জীবিকার সংস্থান—

১। কুটীরশিল্পকে আনুষঙ্গিক বা প্রধান কর্ম্ম হিসাবে উৎসাহদান।

২। স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অথবা রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে ছোট ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৩। সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও জীবিকাসংস্থানে উৎসাহদান।

ছ) বাসস্থান—

১। পল্লীঅঞ্চলে গৃহনির্ম্মাণের জন্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

২। সহরাঞ্চলে অতিরিক্ত বাসস্থানের সংস্থান।

জ) সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা—

১। স্থানীয় কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনচিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

২। জনশিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য বেতার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থা।

৩। স্থানীয় ও দূর পল্লীর ক্রীড়ামোদীদল সংগঠন।

৪। পল্লীঅঞ্চলে হাট ও মেলা বসাইবার আয়োজন।

৫। সমবায় ও স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন।

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, পরিকল্পনার ক্ষেত্র ও পরিধি অতি বিস্তৃত। যত শক্তিশালীই হউক না কেন, কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই এককভাবে উপরোক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম্মসূচী সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। তাছাড়া, আজ প্রতিটি রাজ্যের যে সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি, তাহাতে বেশী কিছু আশা করাও সঙ্গত নহে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব গ্রামবাসীদের, রাজ্য শুধু তদারকীকার্য্য পরিচালনা করিবেন। এ কাজে সাফল্যের পথে গ্রামবাসীদের স্বতস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা সব চেয়ে বড় মূলধন। কোন কোন গ্রাম্যসংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষকে আংশিকভাবে আর্থিক সাহায্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইলেও সব কিছুই গ্রামবাসীর নিজেদেরই করিতে হইবে, হয় অর্থ দিয়া, নয় ত অতিরিক্ত মেহনত করিয়া।

বরোদা, মাদ্রাজ ও গোরক্ষপুরের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। অবশ্য নিলোখেরী ও ফরিদাবাদ গ্রামে যে দুইটি পুনর্ব্বসতি জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রভাব ও এই পরিকল্পনার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। উক্ত জনপদ দুইটি যেরূপ অভূতপূর্ব্ব উপায়ে ছিন্নমূল করিয়াছে, সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট এই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রাম্য অধিবাসীর মান উন্নয়নে কম্যুনিটি প্রজেক্টই একমাত্র প্রত্যক্ষ ও ফলপ্রদ কম্যুনিটি প্রজেক্ট এদেশের ও বিদেশের পরিকল্পনাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকে একাগ্রভাবে সমন্বয়িত করিবার এক মহান প্রচেষ্টা প্রজেক্ট অনুযায়ী সমগ্র ভারতের জন্য ৫৫টি পরিকল্পনা খাড়া করা প্রতি ৩০০ গ্রাম লইয়া এক একটি ব্লক তৈয়ারী হইয়াছে। ব্লকের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। প্রত্যেকটি ব্লকের সুযোগী উন্নত কৃষিব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া নিবারণ ও অশিক্ষা দূরীকরণ। যথাযথ সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতের প্রায় ১ কোটির উপর আর্থিক জীবনে উন্নতি প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্লকের সমগ্র এলাকাও এক উচ্চতর অর্থনৈতিক স্তরে আরোহণ আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, এই বিরাট দেশের জন্য মাত্র ৫৫ পরিকল্পনা যেন সাগরে বারিবিন্দুবৎ এবং ইহার দ্বারা সমগ্র মাত্র [illegible] অংশ লোক উপকৃত হইবে। কিন্তু তবুও আর্থিক চাপটা কিছু সামান্য নহে—মাত্র ৪০ কোটি টাকা! সমগ্র পরিকল্পনা পরিচালনা করিতে গেলে আরও অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকা এবং তথাপি উহা যথেষ্ট নহে। অতএব সমগ্র ভারতের জন্য পরিকল্পনা চালু করিতে গেলে আরও ৩০ গুণ টাকার প্রয়োজন। টাকা আসিবে কোথা হইতে? সরকারী ছাপাখানা হইতে নোট ছাপাইয়া এ প্রয়োজন মিটিবে না: আমেরিকা বা দেশের কাছে ভিক্ষাপাত্র বাড়াইয়াও বেশী দিন চলিবে না। পরিক সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, দেশের পুনর্গঠন করিতে হইলে গ্রামব নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াইতে হইবে। নান্যঃ পন্থা। অন্যান্য দেশের জমিতে যাহা উৎপন্ন হয়, আমাদের দেশের জমিতে উৎপন্ন হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের জমির উৎপাদি শক্তি কম নহে, অথচ আমাদের দেশের কৃষকও কম পরিশ্রমী নহে হইতে যেমন করিয়াই হউক, ফসলের পরিমাণ আজ আমাদিগকে বাড়াইতেই হইবে। প্রজেক্ট-বর্ণিত উন্নত কৃষিব্যবস্থার সমস্ত সুযোগ কৃষকগণ গ্রহণ করিতে পারিলেই ইহা কেবলমাত্র সম্ভব। কথায় বলে 'পেটে খেলে পিঠে সয়'—পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে না পারি শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্যসম্ব বিধানগুলি যথাযথ পালন করিলে রোগের হাত এড়ানো অনেক সম্ভব হইবে। সর্ব্বোপরি গ্রাম্যকর্ম্মীর চিত্তবিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। জনশিক্ষা ও আনন্দবিধানের আয়োজন সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া জন্য শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। আমাদের দেশের কৃষক সাধার বৎসরে ছয়মাস নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে। ভূমিহীন কৃষক ত' প্রায় বসিয়া কাটায়। এই অবসর সময়ের সিকিভাগও যদি গ্রাম্য বিদ্য বা রাস্তানির্ম্মাণে পয়ঃপ্রণালীর সংস্কারসাধনে কিং অন্যান্য গ্রামোন্নয়নমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হয় তবে সীমাবদ্ধ সরকারী তহবিলে

কম্যুনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনা একাধারে যেমন এক অভিনব অর্থনৈতিক প্রয়াস, তেমনি এক নূতন গণতন্ত্রের সূচনাও ইহাতে আছে। বর্ত্তমানে বিদেশী খাদ্য আহরণে প্রতি বছর ভারতের প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইতেছে। এই অর্থ দেশের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলে আরও ৭ গুণ ৫৫টা পরিকল্পনায় হাত দেওয়া সম্ভব হইত। এই বিরাট পরিমাণ অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে তদ্বারা দেশের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করাও সম্ভবপর হইবে। এই জন্যই আমাদের 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে খাদ্যসমস্যাই আমাদের মূল সমস্যা। ভারতের মত বিরাট দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ভিত্তি ও উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। একথা আজ বড় বড় দেশ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ আমেরিকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সেখানকার উন্নত কৃষিব্যবস্থার ফলে খাদ্য এবং শিল্পসম্ভারের জন্য কাঁচামালের অভাব নাই এবং পণ্যদ্রব্য কাটতির জন্যও তথায় বিরাট বাজার বর্ত্তমান।

পরিকল্পনানুযায়ী কাজ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীগণ অনুভব করিতে পারিবে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জুলুমের স্থান নাই। পরন্তু ইহার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ হইবে। গ্রামবাসীরা অবাক হইয়া দেখিবে—ডাক্তার, পশুচিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারী, কৃষি তদারককারী অফিসার—সকলেই সর্ব্বদা তাহার প্রয়োজনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। ইহাতে প্রত্যেক গ্রামবাসীর সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজে যে তাহার মতামতেরও একটা মূল্য আছে ইহা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর সে নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার চাবি-কাঠি গ্রামবাসীর নিজেরই হাতে। গতানুগতিক উপায়ে উপর হইতে চমকী দিয়া ইহা সফল করিবার চেষ্টা কষ্ট-কল্পনামাত্র। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিজেই স্থিরীকৃত করিতে পারিবে—প্রচুর অবসর, বাড়তি আয় ও সক্রিয় উৎসাহ সব কিছুই সে নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিবে।

ভারতে যে অপরিমেয় অব্যবহৃত সম্পদ পড়িয়া আছে, অনতিবিলম্বে তাহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই অমানুষিক শ্রম। যুগ যুগ ধরিয়া মহৎ ব্যক্তিরা যে শ্রম ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের সেই জুত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে অনাগত যুগ ব্যাপিয়া আমাদেরও শ্রম ঢালিতে হইবে। অতীত ইতিহাসও সাক্ষ্য দিবে, জগতের প্রত্যেকটি সঙ্কটসময়ে ভারত জগত সমক্ষে আশার আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছিল, যদি এই প্রজেক্ট মারফৎ ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়, তবে এ যুগেও সে জগতের নিকট এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিবে, এমন কি, ইহার ফলে হয়ত আমাদের নিকট এক "নূতন জগতের" দ্বারও উন্মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিপথে পরিচালিত হইলে আমাদের হইবে—যে ইতিহাস গড়িয়া গিয়াছেন গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও অশোক।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিকে পশ্চাতে রাখিলে ইহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত পথে অগ্রসর হয়—হাসি, অশ্রু, আনন্দ, বিষাদ, উত্থান, পতন—কত বিচিত্র পথেই না চলিতে চলিতে সে নির্ব্বাণ লাভ করে। এই পথছাড়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির আর কোনও সহজতর পথও নাই। কম্যুনিটি প্রজেক্টও তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের যাত্রাপথে প্রথম পাদবিক্ষেপ। এই পথেই আমরা আমাদের নূতন লক্ষ্যপথে পৌঁছিব। এই পথ প্রস্তুত করিবে জনগণ, এই পথে পদচারণা করিবে জনগণ এবং এই পথ পরিক্রমা করিবে জনগণ।

যে কম্যুনিটি-প্রজেক্ট লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করা হইল তাহার আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সুবৃহৎ পরিকল্পনায় হাত দেওয়া কখনই সম্ভবপর হইত না, যদি না আমেরিকা আমাদের সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিত। আমেরিকার চতুর্দ্দফা সাহায্য পরিকল্পনানুযায়ী ভারতে কারিগরী সাহায্যদানের ভিত্তিতে আমেরিকার বৈদেশিক দপ্তরে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম Technical Co-operation Administration. ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্যই প্রধানতঃ আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা অতি দীর্ঘ দিনের এবং তাহারা আর্থিক, বাণিজ্যিক, কারিগরী—সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতে সক্ষম। আগামী তিন বৎসরের মধ্যে প্রজেক্ট বর্ণিত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হইবে। ইহার ফলে গ্রামবাসীর আর্থিক সঙ্গতিও নিশ্চিতরূপে কিছুটা বাড়িবে এবং তদ্বারা বাড়তি সম্পদেরও মোটামুটি সবটাই বজায় রাখা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রজেক্ট পরিকল্পনা চালু করিবার জন্য শত শত গ্রাম্য কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। এই সকল কর্ম্মীর শিক্ষার জন্য মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নামক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৫টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখানে কর্ম্মীদের শিক্ষাও সুরু হইয়াছে। পরিকল্পনাগুলি যাহাতে সত্বর ফলপ্রদ হয় তজ্জন্য প্রজেক্টের আওতার বাহিরেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাক্ষেত্রে মার্কিন গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন, যথা আরব্ধ সেচ পরিকল্পনা, ভূমি-জরীপ পরিকল্পনা, পঙ্গপাল বিনাশ ও ম্যালেরিয়া নিবারণ পরিকল্পনা।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলির যে চিত্র অঙ্কিত হইল, তাহা ফলপ্রদ হইলে মনে হয়, দেশে পুনর্ব্বার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আর বিলম্ব নাই। কিন্তু পরিকল্পনার কাজ যেভাবে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এক শ্রেণীর লোক কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে আমেরিকার সাহায্যই

ভারতীয়দের হাতে—ইহাই তাহাদের দাবী। আমেরিকানগণ শুধু দেখিবেন, তাহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা। নতুবা আশঙ্কা করা হইতেছে, এতাবৎকাল দেশের গো-সম্পদ ও লাঙ্গল যেভাবে আমাদের কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, অতঃপর যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর আসিয়া তাহার স্থান দখল করিবে। ওই ট্রাক্টর পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী তৈলের উপর নির্ভরশীল—যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে যাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত। ফলে, সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আরও প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার এত মাথাব্যথা কেন? সকলেই জানেন, আমেরিকা বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে খুবই সমুন্নত। প্রত্যেক মার্কিন নাগরিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রত্যেক অনুন্নত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিও তাহারা সহানুভূতিশীল। তথাপি মার্কিন জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এইভাবে বিদেশে নিয়োজিত করার জন্য মার্কিন গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য বৈকি! যে কৈফিয়ৎ তাহারা দিয়াছেন তাহা এই যে, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে খাদ্য ও অন্যান্য কারিগরী সাহায্যদানের একমাত্র উদ্দেশ্য—দুনিয়ায় কম্যুনিজ্‌মের প্রসার রোধ করা এবং নিজ দেশকেও কম্যুনিজ্‌মের আওতা হইতে রক্ষা করিয়া দুনিয়া হইতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাকে একেবারে তিরোহিত করা। এইভাবে এক নূতন শান্তিপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। আমেরিকা ব্যক্তিগত মালিকানা নীতিতে বিশ্বাসী। আজ বৈষয়িক ক্ষেত্রে তাহারা উন্নতির যে উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত-মালিকানা নীতি অনুসরণ করিবার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে—অন্ততঃ ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন। এই দিক দিয়া তাহারা বাস্তবিকই আশাবাদী। সত্যি কথা বলিতে কি, সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সাও তাহাদের খুব নাই। কিন্তু আমাদের সন্দিহান মন ইহাতে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না, না হইবারই কথা। ইংরাজের সহিত সম্পর্কে আসিবার পর আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে বলা যায়, মুখে তাহারা অনেক বুলি আওড়াইতেন, কিন্তু নিজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কার্য্যকালে সম্পূর্ণ অন্য পথ ধরিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাহাতে এদেশের সংস্কৃতি কি হইল না হইল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশও তাহাদের ছিল না। ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ডরায়। আমাদের মনেও তাই এ আশঙ্কা স্বভাবতঃই দেখা দিয়াছে যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই হয়ত আমেরিকা একদিন ভারতের বাজার গ্রাস করিয়া বসিবে। এমন কি, কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও তাহার অনুগামী এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য হয়ত একদিন ভারতকে যুদ্ধঘাঁটী হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রয়োজনও তাহার দেখা দিতে পারে। যাবৎ ইউরোপের দেশগুলি এশিয়ার অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে যেভাবে শোষণ করিয়াছে, আমেরিকা সম্বন্ধেও অনুরূপ আতঙ্কিত হইলে তাহাকে খুব অস্বাভাবিক বলা যায় না।

নির্ভরশীল হওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত কিনা। অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ উপদেশ দিতেন—জাতীয় পুনর্গঠনের সময় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশেরই পরনির্ভরশীল না হইয়া থাকা সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। কিন্তু নীতি হিসাবে 'ধার দিব না, কর্জ্জ নিব না' নীতি অতি উত্তম। কাপড়ের মাপ অনুযায়ী কোট তৈয়ার করাইবে—ইহাই মহাজনদের উপদেশ। মোট কথা, নিজেদের সমস্যা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই সাধ্যানুযায়ী সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইব—ইহাই মূল বক্তব্য। কারণ এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে একটা সুফল আশা করা যায় এই যে, তাহাতে আমরা সত্যিকার বড় ও উন্নত হইবার প্রেরণা লাভ করি, মনে আত্ম-বিশ্বাস জন্মে এবং নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সজাগ হইতে পারি। বার বার সঙ্কট সময়ে বিদেশীর দুয়ারে ধর্ণা দিলে আমাদের কর্ম্মশক্তিও কোনদিন জাগরূক হইবে না। সহজলভ্য মূলধনের উপর নির্ভর করার আরেকটা কুফল এই যে, আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন না হইয়াই ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার স্পৃহা জন্মে। কিন্তু আজ আমাদের পুনর্গঠন কার্য্যে টাকার চাইতে উপযুক্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন বেশী। আমেরিকান সাহায্য পাইয়া দেশবাসী আজ এইদিক সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। আমেরিকার সাহায্য গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের মর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তাছাড়া, দুই দেশের উৎপাদন-প্রথাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। আমেরিকা শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পিছনে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে। আর আমাদের দেশে শ্রমসম্পদ অপর্যাপ্ত, অথচ মূলধনের পরিমাণ অতি সামান্য। সে দেশের অর্থনীতি নগর কেন্দ্রিক এবং যন্ত্র-নির্ভর, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ পল্লীমুখীন এবং কৃষকসর্ব্বস্ব। তদুপরি দুই দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রাণীহত্যা বিরোধিতা, একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা এবং বিচিত্র জীবনযাত্রার ধারা—আমাদের সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য। এ সব সমস্যার সমাধান বিদেশীগণ জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা কখনই কল্যাণজনক হইতে পারে না।

যদি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ আমাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য হয়, তবে সে বিষয়ে কতিপয় সুষ্ঠুনীতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য একটি উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লইতে হইবে। ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রকৃত স্বরূপ আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নদীর বাঁধনির্ম্মাণে আমেরিকান বিশেষজ্ঞগণ অতিশয় দক্ষ। কিন্তু যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে এবং যাহা দেশবাসীকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাবিত করিবে—সেই কম্যুনিটি-প্রজেক্ট সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। কাজেই এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে এবং সমগ্র পরিকল্পনা রচনার ভার থাকিবে ভারতীয়দের হাতে। বিশেষ বিশেষ কমিটিতে আমেরিকান

ভারতীয়গণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের কৃষিক্ষেত্র হইতে গো-মহিষাদি ও দেশী লাঙ্গল বিতাড়িত করিয়া তৎস্থলে তৈলচালিত ট্রাক্টর আমদানী করিলে গ্রাম্যজীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অতি সুদূরপ্রসারী হইবে। অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে, ইহা বলা সঙ্গত নয়। তবে অতি মাত্রায় ট্রাক্টর চালাইবার আপত্তি এই জন্য যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের সময় যদি তৈল সরবরাহ অনিশ্চিতকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের কৃষিব্যবস্থাই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারাই ব্যাহত হইতে বাধ্য। যদি আমেরিকান বিশেষজ্ঞগণ উন্নত ধরণের গো-চালিত লাঙ্গলেরই প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে এখানে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের অর্থনীতিক্ষেত্রে গরু এক বিরাট সম্পদ এবং দুগ্ধাভাব মিটাইবার জন্যও গবাদিরক্ষণ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, আর পশুহত্যা বা গো-মাংসভক্ষণ ভারতীয় সংস্কৃতিবিরোধী এবং ভারতীয় সমাজে অতিশয় নিন্দনীয়।

মার্কিন সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে ইহা অতিরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক। এই মনোভাব বিদূরিত করা আশু কর্ত্তব্য। আজ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন, নতুবা নূতন ভারত গঠন চিরদিন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, কানপুরের কমাল এণ্ড কোম্পানীর মিঃ ডি. সি- কাপুর ও মার্কিন কৃষিবিশেষজ্ঞ মিঃ হাওয়ার্ড স্থিলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নূতন ধরণের বলদ-টানা লোহার লাঙ্গল আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে এবং চাষ-আবাদের কাজে ইহা বর্ত্তমানে ব্যবহৃত লাঙ্গলের চাইতেও উৎকৃষ্টতর। অনেক কৃষক ইহার সাহায্যে ক্ষেত্রে চাষ করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। ভারতে মোট খাদ্যের শতকরা ৯৮ ভাগ উৎপাদিত হয় বলদ-টানা লাঙ্গলের সাহায্যে কর্ষিত জমিতে। এই নূতন যন্ত্রটিও যাহাতে বলদের সাহায্যেই চালিত হয় সেইদিকে নজর রাখিয়াই লাঙ্গলটির নক্সা করা হইয়াছে। যন্ত্রটিকে নিখুঁত করার জন্য বহুবার হাতে কলমে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে মাত্র ৫১৲ টাকা। যন্ত্রটির উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া মার্কিন সামবায়িক প্রতিষ্ঠান (CARE) ইহা ভারতের দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি মার্কিন গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন, ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের আদৌ নাই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলিই সমগ্র কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতেছেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত না হইলে কোন মার্কিন বিশেষজ্ঞের ভারতে আসিবার সম্ভাবনাও নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বর্ত্তমানে ভারতে মোট ৫৭জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন এবং সকলেরই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিকার্য্যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। অতএব, আমাদের আশঙ্কা বহুলাংশে অমূলক। আমরা শুধু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিব, যেন এই প্রজেক্ট মারফৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে শীঘ্রই আশার সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয়।

শাশ্বত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

কোল্‌কাতা ছেড়ে এঁকে বেঁকে শেষে
বাঁকুড়ার কোল ঘেঁসে !—
বেদুইন সম বাঁধিয়াছি বাসা
পাহাড়ের নীচে এসে !

ছবির ফিতায় ধরিতে এসেছি—
ঝরণার জল-ধারা—
রূপসী রামীর রূপের আলোয়
যেজন আত্মহারা,

সেই প্রেমময় কবি-কাহিনীর
লীলাক্ষেত্রের তীরে
বিস্ময়ে হেরি মাটী হ'লো খাঁটী-
প্রেমের অশ্রু-নীরে।

বাশুলী মায়ের সেবক-সেবিকা
মানুষের মনোরম।
সুরে বাঁধিয়াছ দুঁহু দোঁহাকায়-
ভৃঙ্গ-বল্লরী সম

আকাশে বাতাসে আজিও সেসুর শুনি
বৃন্দাবনের লীলা মাধুরীর ধ্বনি !!

চার

"Mas não pos o. Tenho que voltar"

সাতদিন—সাতরাত। নীল নিতল সমুদ্র এখনো ঘুমে অচেতন। উত্তরের হাওয়া বইছে মৃদু মন্থর নিশ্বাসের মতো। শঙ্খদত্তের সপ্তডিঙাতেও সেই ঘুমের ছোঁয়া লেগেছে—এগিয়ে চলেছে তন্দ্রাতুরের ভঙ্গিতে। হাল ধরে উদাস চোখ মেলে বসে থাকে কাঁড়ার—মাল্লাদেরও হৈ-হল্লা নেই। পাগল উচ্ছৃঙ্খল সাগরে ডিঙার দাঁড়-পাল সামলাতে কাউকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়না—'জৈমিনির' নাম স্মরণ করে তুষ্ট করতে হয়না আকাশের বজ্রধর ক্রুদ্ধ দেবতাকে। হাল্কা ঢেউয়ের দোলায় সাগর যেন দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে। সে দোলা ভয় জাগায় না—নেশা ধরায়।

এই সাতদিন—সাতরাত্রে একাদশীর চাঁদ কলায় কলায় মধুচক্রের মতো ভরে উঠল। শীতের কুয়াশামাখা রাত্রির স্মদের ওপর দেখা দিল পূর্ণিমার রাত—উজ্জ্বল কুয়াশাকে মনে হল কার অপরূপ মুখের ওপর সোনালি মসলিনের এক বিচিত্র অবগুণ্ঠন। ভোর বেলা সেই চাঁদ সামুদ্রিক শঙ্খের মতো বিবর্ণ হয়ে অস্ত গেল—তার পরে চলল অভ্যস্ত ক্ষয়ের ইতিহাস। পূর্ণিমা রাতের ম্লান তারাগুলি ক্রমশ দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল—যেন মুমূর্ষু চাঁদ দিনের পর দিন নিজের আয়ুর ইন্ধন দিয়ে নিভে-আসা নক্ষত্রদের জ্বালিয়ে দিতে লাগল ধীরে ধীরে।

আজ তৃতীয়া।

আজো সন্ধ্যায় সমুদ্রের দিকে চোখ ফেলে দাঁড়িয়েছিল শঙ্খদত্ত। কিন্তু চাঁদ এখনো দেখা দেয়নি—তার শূন্য বাসরের চারপাশে এখন তারার প্রদীপ সাজানো। জরির কাজ-করা নীল মসলিনের মতো সমুদ্র—চাঁদের ওড়না বিষণ্ণ কুয়াশায় হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে চলেছে। পালের শব্দ, জলের কলধ্বনি, কখনো কখনো দূরে-কাছে মালার মতো ছড়ানো এক আধখানা ডিঙা থেকে দাঁড়ের আওয়াজ।

খানিকটা আগে আগেই চলেছে কাঞ্চনমালা ডিঙা। তার হালের কাছে কালো পাথরের মূর্তির মতো বসে-থাকা কাঁড়ার হঠাৎ গান গেয়ে উঠল :

> বিষম ঢেউয়ের ফণায় ফণায়
> মরণ নাচে দিন-রজনী
> তোমারি মুখ বুকে নিয়া
> দিলাম পাড়ি—ও সজনী !

পালের শব্দ যেন আর শোনো গেলনা, দাঁড়ের আওয়াজ থেমে এল, ঝিমিয়ে পড়ল জলের শব্দ। হাওয়ার নিশ্বাসে নিশ্বাসে গানটা যেন শঙ্খদত্তের ওপরেই তরঙ্গিত হয়ে আসতে লাগল : দিলাম পাড়ি—ও সজনী ! মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ঘরে শঙ্খদত্তের কোনো সজনী নেই; তার সমবয়সীদের এর মধ্যেই দু দুবার বিয়ে হয়ে গেছে—কিন্তু শঙ্খদত্ত আজো অবিবাহিত। কোনো কারণ আছে তা নয়—কিন্তু মনের দিকে সে যেন কোনো উৎসাহই অনুভব করেনি। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-নবদ্বীপ-কাল্নার অনেক বড় বড় বণিক পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে তার—বহু সুলক্ষণা সুরূপা কন্যা তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকার শিবমূর্তি

তৈরী করে তারা যে শঙ্কর-সাক্ষাৎ পতি প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনার ফল শঙ্খদত্ত পর্যন্ত এসে পৌছোয়নি ; গঙ্গার স্রোতে যে প্রদীপ তারা ভাসিয়েছিল, তা দূর-দূরান্তে চলে গেছে, কিন্তু তাদের একটিও এসে শঙ্খদত্তের ঘাটে লাগল না।

ধনদত্ত প্রায়ই দুঃখ করেন : আমার পিণ্ডলোপ হবে, আমার বংশ থাকল না।

শঙ্খদত্ত পিতৃভক্ত—কিন্তু এই একটি জায়গায় পিতৃ-আজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। কোনো কারণ নেই—শুধু প্রবৃত্তি হয় না। সপ্তগ্রামের বন্দর, তার বড় বড় শিবমন্দির, তার শঙ্খ ঘণ্টা, তার বণিক আর বাণিজ্যের কোলাহল। ভালোই লাগে—তবু যেন তৃপ্তি হয় না। শঙ্খদত্তকে হাতছানি দেয় সমুদ্র, ডাক দেয় দক্ষিণ-পাটন—দক্ষিণ ছাড়িয়ে আরো দূর—আরো দুর্গম তার মনকে চঞ্চল করে তোলে। আরো যেদিন থেকে সে হার্মাদের জাহাজ দেখেছে, সেদিন থেকে অস্থিরতা অনেক বেড়ে গেছে তার। কত দূর থেকে এসেছে ওদের জাহাজগুলো ! ওদের পালে কত ঝড়ের চিহ্ন—কত নোনা জলের রেখা ওদের জাহাজের গায়ে। শঙ্খদত্তেরও অমনি করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—দেখতে ইচ্ছা করে দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়ানো সংখ্যাতীত নাম-না-জানা নগরকে, পত্তনকে, দিগ্‌দিগন্তের আশ্চর্য অপরিচিত মানুষকে। যতদিন বুড়ো ধনদত্ত বেঁচে আছেন, ততদিন অবশ্য এ আশা তার মিটবে না—একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই এ পাগ্‌লামির ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। ধনদত্ত চোখ বুজলে আর ভাবনা নেই তার—তখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেখানে খুশি ভেসে পড়তে পারবে। কিন্তু আজ যদি সে বিয়ে করে—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়ে সংসারের বাঁধনের মধ্যে, তা হলেই ফুরিয়ে গেল সমস্ত। সেই পিছু টানে সে বাঁধা পড়ে থাকবে—আর ছুটে বেড়াবার উৎসাহ থাকবে না। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই শঙ্খদত্ত তা দেখেছে। দক্ষিণ-পত্তন দূরে থাক, আজ তারা সপ্তগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের বন্দর পর্যন্ত আসতে অনিচ্ছুক। দিন রাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে আছে, টাকা আর মোহর গুণছে, অবসর সময়ে জুয়া খেলছে কিংবা গান-বাজনা করছে, আর মোটা হচ্ছে লক্ষ্মী প্যাঁচার মতো। কার কটি সুন্দরী গণিকা আছে—এ শঙ্খদত্তের আশ্চর্য লাগে। বিয়ে করে যারা [illegible] হয়েছে—গণিকার ওপরে তাদের এ আসক্তির অর্থ সে [illegible] পারে না। কিন্তু এটা বোঝে, বিয়ে করে নিশ্চল-[illegible] হয়ে বসে থাকার এই-ই পরিণাম। বাইরের কর্মশক্তি [illegible] হয়ে গেছে—তাই যত অবুদ্ধি এসে বাসা বেঁধেছে মনের ভেতরে। তাই যারা কুমার, তাদের চাইতে ঢের বেশি তারা মত্তপ, তাই কালী পূজোর রাত্রে অমনভাবে তারা ভৈরবীচক্র তৈরি করে, তাই কোজাগরীর রাত্রে স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রেখে তারা জুয়া খেলতে বসে !

এই সব কারণেই শঙ্খদত্ত বিয়েটাকে এড়িয়ে চলেছে। হয়তো আর একটা পরোক্ষ কারণও আছে তার। গুরু সোমদেব। একরাশ রুক্ষ কেউটের মতো মাথায় বিশৃঙ্খল জটা—রক্তবর্ণ চোখ, গলার স্বরে যেন মেঘমন্দ্র। ধিক্কার দিয়ে বলেন, মানুষ নয়—মানুষ নয়। শূকরের পালের মতো বংশবৃদ্ধিই করে চলেছে কেবল—জীবনের আর কোনো দিকে একবার চোখ মেলে দেখতে পর্যন্ত শিখল না।

যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই হোক—কখনো কখনো কি মন টলেনি শঙ্খদত্তের ? বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে শোনা কত বাসর-রাতের আশ্চর্য কাহিনী কি তার রক্তকে চঞ্চল করে তোলেনি ? বিকেলের রাঙা আলোয় কোনো বাড়ির অলিন্দে দাঁড়ানো একজোড়া কালো চোখ, একটি শাড়ীর আঁচল, একগুচ্ছ কালো চুল কখনো কি মনের মধ্যে কোমল ছায়া ঘনিয়ে আনেনি তার ?

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই দেখেছে তিনদিকে গঙ্গার ত্রিধারা সমুদ্রযাত্রী নৌকোর ভিড়। ছায়া মুছে গেছে—কানে এসেছে দূর কালীদহের কালো জলের ডাক ; চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নারিকেলের বন—পাহাড়ের বুকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ফণায় ফণায় ফেনার উল্লাস, দক্ষিণ-পত্তনের অদ্ভুত সব মন্দিরের আকাশ-ছোঁয়া চূড়ো জ্ঞানবাপীর ধারে নীল পাথরের বিশাল বৃষভমূর্তি। [illegible] থেকে আরো দূর—দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণ—

তবু এই রাত। কাণ্ডারের গলায় এই গানের সুর ; তারায় ভরা আকাশের সীমান্তে চাঁদের রঙ !

ও সজনী

মরণকালে দেখি যেন

শঙ্খদত্তও অমনি কারো মুখ দেখতে পেলে খুশি হত। কিন্তু কে সে—কোথায় সে? এই রাতের সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অমনি কারো কথা ভাবতে তারও ভালো লাগত। জীবনে সে থাকুক বা নাই থাকুক, অন্তত এখনকার মতো কাউকে ভাবতে পারলে মন্দ হত না একেবারে।

কতকগুলো সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব মূর্তি ভাসতে লাগল শঙ্খদত্তের মনের সামনে। স্নানের ঘাটে দেখা কারো মুখ মিলে যাচ্ছে মন্দিরে দেখা কারো চোখের সঙ্গে, পরিচিত কারো ওপরে মন ভুলিয়ে দিচ্ছে কোনো কল্পিতার সৌন্দর্যের চিত্রকঞ্চুক। সে আছে—তবু সে নেই। এই-ই ভালো। থাকবে অথচ থাকবে না—কখনো কখনো আকুল করে তুলবে, অথচ বাঁধবে না। ভালো—এই ভালো।

রাত ঘন হতে লাগল—তারাগুলো নতুন সোনার মতো উজ্জ্বল হতে থাকল, ঢেউয়ের ওপর ছড়িয়ে যাওয়া রক্তাভার ভেতর থেকে তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। তখন চোখে পড়ল বাঁ দিকে কিছু দূরেই সমুদ্র বেলার বিস্তার—আলোছায়া স্তব্ধ মৃত্তিকার নিশ্চলতা। তৃতীয়ার চাঁদের আলোতেও দেখা গেল নারিকেল বনের ঘন বিন্যাস—আর সকলের মাথার ওপর মন্দিরের চূড়ো। ডাঙা এখান থেকে এক ক্রোশও দূরে নয়।

—পুরীধাম!

কে যেন চীৎকার করে উঠল।

পুরীধাম! তা হলে একবার দেবদর্শন করে যাওয়া উচিত। একবার প্রার্থনা করা উচিত নীল মাধবের আশীর্বাদ।

গম্ভীর গলায় ডাক দিয়ে শঙ্খদত্ত বললে, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাব আমরা। ডিঙা ভেড়াও।

শীতের দিন। অগভীর ডাঙার ওপর ঢেউয়ের মাতলামি নেই। সাত ডিঙা একেবারে কূলের কাছাকাছি চলে এল। ভোরের আলোয় চোখ জুড়িয়ে গেল শঙ্খদত্তের। সামনে বালির ডাঙা পার হয়ে ঘন বনের সারি—তার ওপরে মন্দিরের চূড়ো। যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে দারুব্রহ্ম তাঁর আনত বিশাল দৃষ্টি মেলে রেখেছেন—যেন পাহারা দিচ্ছেন দুর্বিনয়ী অশান্ত নীলিমাকে। যে ভক্ত—যে বিশ্বাসী, সমুদ্রের ওপরে সে ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্বিপাকেও তাকে তিনি রক্ষা করবেন, সংকট মোচন করবেন তার। আর স্পর্ধিত অবিশ্বাসী যে তার ওপর ফেলবেন তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি—তুফানের ঘায়ে চুরো টুকরো হয়ে যাবে তার বহর, হাঙর-মকরের

ডিঙা থেকে নেমে ডাঙায় এল শঙ্খদত্ত। চলল মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের সামনেই বাজার—পান্থশালা। কত দেশ বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে যে জড়ো হয়েছে! এসেছে বাংলা দেশ থেকে কুলীনগ্রাম যাজপুর পার হয়ে—নর্মদা পার হয়ে এসেছে দক্ষিণের মানুষ। নীলমাধবের দর্শনের আশায় পথের সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে বয়ে এনেছে তারা। কতজন রোগের আক্রমণে পথেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছে—দস্যুর হাতে প্রাণ দিয়েছে কতজন—বনের হিংস্র জন্তুর মুখেও কত মানুষ চলার ওপর ছেদ টেনে দিয়েছে। যারা শেষ পর্যন্ত এসে পৌছোতে পেরেছে, তাদেরই বা ক'জন ঘরে ফিরে যাবে তীর্থের ফল সঞ্চয় করে? যে মৃত্যুকে কোনোক্রমে একবার এড়িয়ে এসেছে—আর এক একবার মুঠোর মধ্যে পেলে সে তাদের সহজে হয়তো ছেড়ে দেবে না।

তবু মানুষ এসেছে। তবু মানুষ আসবে। নীলমাধবের আহ্বান কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

তীর্থযাত্রীর ভিড়—নারী পুরুষের কোলাহল—পাণ্ডাদের চঞ্চলতা। মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে আসতেই পরিচিত পাণ্ডা উদ্ধব এসে হাসিমুখে অভিনন্দন করলে।

—সপ্তগ্রামের শেঠ যে! কবে এলেন?

সপ্তগ্রামের বণিকদের অত্যন্ত মর্যাদা এখানে। তারা সকলেই শেঠ নয়, কিন্তু শেঠের মতোই দরাজ তাদের মন, তাদের কোমরে যে মোহরের থলি থাকে—তার উদারতা এখানে বিখ্যাত। দক্ষিণের চেট্টিয়া আসেন—পশ্চিম থেকে দোলা-চৌদোলা হাতী-তাঞ্জাম নিয়ে আসেন রাজা মহারাজারা, কখনো কখনো রথযাত্রার সময় কৌতূহলবশে মুসলমান নবাবেরাও দেখতে আসেন। তবু বাঙালী বণিকেরাই এখানে সব চেয়ে প্রিয়।

—আজই সকালে এসেছি। দক্ষিণে চলেছি—ভাবলাম একবার জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাই।

—ভালো করেছেন, অত্যন্ত সৎকাজ করেছেন। দূরের পথ, দেবতাকে একবার পূজো দিয়ে যাওয়ার দরকার বই কি।

চলুন—চলুন। বড় ভালো দিনে এসেছেন আজ।

—কেন?

—কাল অন্নকূট হয়ে গেছে। আজকের তিথিও অত্যন্ত শুভ। সন্ধ্যার পরে বিশেষ পূজোর আয়োজন আছে। চলুন।

শঙ্খদত্ত এগিয়ে চলল উদ্ধবের সঙ্গে। মন্দিরের সামনেই

স্তূপ। অন্ন, ডাল, ঘি, লবঙ্গ, আদা আর নানা মশলার মিশ্রিত গন্ধে চারদিক যেন আবিষ্ট হয়ে আছে। সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ভিক্ষুক আর কাকের ভিড়। এরই মাঝখানে হনুমান নেমে আসছে—মুঠো করে নিয়ে যাচ্ছে, দূরের একটা প্রাচীরের ওপর বসে খাচ্ছে জগন্নাথের প্রসাদ। আজকে ওদের আর তাড়া করছে না কেউ। জগন্নাথ আজ জগতের সকলের জন্যই খুলে দিয়েছেন অন্নের উদার ভাণ্ডার। সেখানে কেউই বঞ্চিত নয়—সকলেরই সমান অধিকার।

জটাধারী কে একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এল—একমুঠো প্রসাদ গুঁজে দিলে শঙ্খদত্তের মুখে। হঠাৎ চমকে উঠল শঙ্খদত্ত। এই রকম বিশাল জটা—রক্তবর্ণ চোখ—সোমদেব নয় তো?

না, সোমদেব নয়। 'জয় জগন্নাথ' বলে ভৈরব কণ্ঠে ধ্বনি তুলে লোকটা এগিয়ে গেল জনতার মধ্যে।

উদ্ধব নীচু স্বরে বললে, আজই চলে যাবেন?

—না। একদিন থেকে যাব ভেবেছি। হাওয়া যদি পাই, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।

—ভালোই হল। আজ রাত্রে বিশেষ আরতি দেখাব আপনাকে। সাধারণের সেখানে ঢোকবার নিয়ম নেই—তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।

শঙ্খদত্ত বললে, সে পূজোর কথা আমি শুনেছি। কখনো দেখবার সুযোগ হয় নি।

—আজ দেখাব। সেই জন্যেই তো বলেছিলাম, বড় শুভদিনে এসেছেন আপনি।

মন্দির দর্শন করে ফেরবার সময় উদ্ধব বললে, জলে আর রাত্রিবাস করে লাভ কী? আমার ওখানেই আজ থাকুন। আমাদের এখানে আপনাদের তিন পুরুষের আটকে বাঁধা আছে—আলাদা ভোগ নিয়ে আসব আপনার জন্যে।

—তাই হবে। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি একটু—

শঙ্খদত্ত বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। খানিকটা বেড়ানোর জন্যেই বটে, তবু অস্পষ্ট লক্ষ্যও একটা আছে। কিছু বালি-হরিণের চামড়া কিংবা বন-গরুর শিঙের খেলনা নিয়ে গেলে মন্দ হয় না সঙ্গে। ভালো দাম পাওয়া যায় জিনিসগুলোর। তা ছাড়া কিছু কড়িও সংগ্রহ করতে হবে—ভিক্ষুকদের উৎপাতে কড়ির থলি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে।

—এই যে, তুমি এখানে?

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠল শঙ্খদত্ত।

একটি বিরাট পুরুষ। মাথায় পাগড়ী। শাদা আচকানের ওপর কালো মখমলের জামা—তার ওপর ঝলমল করছে সোনালি জরির কাজ। কোমরবন্ধে বাঁকা একখানা সুদীর্ঘ ছুরি—চকচক করছে তার মুক্তো বসানো গাঢ় তাম্রবর্ণে রঞ্জিত। রোদে পোড়া মুখের রঙ—শাদা ভ্রূর তলায় ছোট ছোট চোখে মর্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

একজন আরব বণিক। শুধু শঙ্খদত্ত কেন—উত্তরে দক্ষিণে এক ডাকে সকলেই তাকে চেনে। করম আলী।

—খাঁ সাহেব! আপনি এখানে?

—কেন? আসতে নেই?—করম আলী হাসলেন: আমরা এলেও কি তোমাদের দেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে?

—না, সে কথা নয়।—শঙ্খদত্ত শুধু অপ্রতিভ হলনা, কেমন অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। করম আলীকে সে কেমন বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারে না—কোথায় যেন একটা খটকা বোধ করে। তা ছাড়া হামাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের সুলতানের যে বিরোধ, তাতে কোথায় যেন করম আলীর হাত আছে—এমনি একটা জনশ্রুতিও সে শুনেছে।

করম আলী বললেন, দক্ষিণ থেকে ফিরছি। পথে খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাই এখান থেকে। সকালে জাহাজ ভেড়ালাম। দেখলাম, সাতখানা ডিঙা, সপ্তগ্রামের বহর। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তুমি এসেছ। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না।

—বলুন।

—এখানে নয়, একটু আড়ালে চলো। কথাগুলো যেমন গোপনীয়, তেমনি দরকারী।

করম আলীর চোখ দুটোকে কেমন অদ্ভুত মনে হল শঙ্খদত্তের। কোথায় একটা নিষ্ঠুরতা আছে সেখানে, আছে একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার কুটিল ইঙ্গিত। একবার একান্তভাবে ইচ্ছে করল, যে-কোনো ছুতোয় পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিন্তু পারল না। অস্বস্তিভরে বললে, তবে চলুন।

* * * *

ডি-মেলো পারলে তখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন চারদিকের এই বিশ্বাসঘাতকদের ওপর। ধারালো ন[illegible] টুকরো টুকরো করে ফেলতেন ওই কোতোয়ালকে—বন্ধু[illegible] অঙ্গীকার ভুলে যেতে কয়েক মুহূর্তও তার সময় লাগল না। মান্নার উপসাগরের দামী দুর্লভ মুক্তোটা এইমাত্র আত্মসাৎ করে কী নির্লজ্জ দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা! আর ভিড়ের মধ্যে কোথায় গেল খুদ্ সা[illegible]! একবার তাকে যদি কখনো হাতে পান ডি-মেলো—

সিল্‌ভিরাই ঠিক বলেছিল। এই 'বেঙ্গালারা' অত[illegible] অধম জীব—বিশ্বাসঘাতকতা এদের রক্তে রক্তে। শা[illegible] স্থিরবুদ্ধি, বিবেচক ডি-মেলো এইবারে বুকের মধ্যে অনু[illegible] করলেন ডা-গামার বর্বরতা—যে বর্বরতার প্রেরণা[illegible] ভেলায় বেঁধে অগ্নিদগ্ধ জেণ্টুরদের তিনি খাদ্যরূপে [illegible] পাঠিয়েছিলেন জামোরিনের কাছে; সেই হিংসার [illegible]

কামানের মুখে বেঁধে গোলার ঘায়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এই কালো শয়তানদের।

ভুল করেছেন মহান্ আলবুকার্ক—ভুল করেছেন নুনো-ডি-কুন্হা। এদের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক নয়। হতেও পারে না তা। মিত্রতা হতে পারে মানুষের সঙ্গে—কিন্তু এরা অমানুষ! কামানের মুখেই এদের বশ করতে হবে। যে-শয়তানের নিয়ন্ত্রণে এদের আত্মা আজ অভিশপ্ত—একমাত্র জননী মেরীর নামেই তাকে দূর করা সম্ভব। তাই দিকে দিকে চাই গগনস্পর্শী 'ইগ্রেঝা'—চাই Christaos!

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন ডি-মেলো।

—কী বলছে ওরা?—কিশোর গঞ্জালোর প্রশ্ন শোনা গেল। সব বুঝেও যেন সে বুঝতে পারেনি এখনো। দাঁতে দাঁত চেপে ডি-মেলো বললেন, আমরা ওদের বন্দী।

—যুদ্ধ না করে আমরা বন্দীত্ব স্বীকার করব না।—গঞ্জালো দৃঢ় গলায় বললে।

সে কথা কি ডি-মেলোও ভাবেন নি? এ ভাবে অস্ত্র হাতে থাকতেও কুকুরের মতো বশ্যতা স্বীকার—ভাবতেও যেন মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে সব কিছু পণ্ড করার সময় নয় এটা। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে মুক্ত তরবারি সৈনিকের দল—কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে যাবে মাটিতে। না—ভুল করা চলবে না এখন।

দ্বিভাষী মুর এবার বললে, এখনো সময় আছে। খ্রীষ্টান ক্যাপিটান ভেবে দেখুন।

ডি-মেলো মনের উত্তাপকে প্রাণপণে সংহত করতে করতে বললেন, আমি চাকারিয়ার নবাব খান্ খানান খোদা বক্স খাঁকে ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি। আমরা শুধু সাতজনই নই। বন্দরে আমাদের জাহাজ আছে, আর তাতে রয়েছে কামান। যে মুহূর্তে এ সংবাদ সেখানে পৌঁছুবে, সেই মুহূর্তেই কামানের গোলায় বন্দর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মুর নবাবকে ডি-মেলোর বক্তব্য জানাল। ক্রুদ্ধভাবে আসনের ওপর নড়ে উঠলেন খোদা বক্স খাঁ—একটা প্রকাণ্ড কিল মারলেন পাশে। তারপর তীব্র উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করলেন।

সভার যে-যেখানে ছিল, সবাই বিদ্যুৎবেগে ফিরে তাকালো ডি-মেলোর দিকে। তাদের চোখে ঘৃণা এবং বিস্ময়ের মিশ্রিত অভিব্যক্তি। যেন খ্রীষ্টানদের সীমাহীন স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তারা।

মুর বললেন, নবাব এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে তাঁকে ভয় দেখাবার মতো সাহস পর্তুগীজ ক্যাপিটানের এল কোথা থেকে! ক্যাপিটান নিজের বহর সম্পর্কে সম্পূর্ণই আদেশ অনুসারে তাঁর বহরগুলি অধিকার এবং তাঁর সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন হলে ঐ কামানগুলো পর্তুগীজদের ওপরেই ব্যবহার করা হবে।

তা হলে এটা আকস্মিক নয়—এর সবই পূর্বকল্পিত! ডি-মেলো পাথরের মতো নিথর হয়ে রইলেন। তাঁর দু পাশে দাঁড়ানো বাকী ছ'জনও তাঁর অনুভূতিকে ভাগ করে নিয়েছে—কারো মুখে একটি শব্দ শোনা গেল না। এমন কি, উৎসাহী গঞ্জালোরও না।

একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল মুরের মুখে: সর্তটা এখনো কি একবার ভেবে দেখা যায় না?

এবার চীৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো: না—না! কিছুই আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা কারো মিত্রতা চাই না—কারো সঙ্গে বিরোধ চাই না—নবাবের কাছ থেকে বাণিজ্যের অনুমতিও আর প্রত্যাশা করি না।

—কিন্তু—

—"Mas nao posso. Tenho que voltar—" আর্তস্বরে ডি-মেলো বললেন, আমি পারব না, আমি পারব না। আমি ফিরে যেতে চাই। আমার জাহাজ নিয়ে আমি এখনি ভেসে পড়ব সমুদ্রে।

—ফেরার পথ তো অত সহজ নয় ক্যাপিটান!—একটা বিচিত্র নিষ্ঠুর হাসিতে উদ্ভাসিত লোকটার মুখ: এ ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই এখন। হয় সর্ত মানতে হবে—নইলে পা বাড়াতে হবে কারাগারের দিকে।

ডি-মেলো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—সেই ভালো। কারাগারেই যাব আমরা।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে আবার যেন কী চীৎকার করলেন নবাব। প্রহরীরা ঘন হয়ে এল পর্তুগীজদের চারদিকে।

—সসৈন্যে অস্ত্র ত্যাগ করুন ক্যাপিটান—মুরের গলা থেকে ভেসে এল একটা সুকঠিন নির্দেশ।

শৃঙ্খলিত বাঘের মতো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পর্তুগীজেরা মেঝের ওপর তলোয়ার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। মর্মদাহী জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ডি-মেলো ভাবতে লাগলেন, এ বিশ্বাসঘাতকতার জের এখানেই মিটবে না; একদিন কড়ায় গণ্ডায় এর ঋণ শোধ করতেই হবে ঐ অভিশপ্ত মরদের।

কোতোয়াল একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে আদেশ জানালো: চলো।

মাথা তেমনি সোজা করেই সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হলেন ডি-মেলো। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। সামনে কারাগারের অন্ধকার করাল মুখ—দুজন প্রহরী তার বিশাল দরজা দুধারে মেলে ধরল সাদর সম্ভাষণের মতো।

সেই অন্ধকারের গহ্বরে পা বাড়াবার আগে ডি-মেলোর মনে হল দুহাতে ওই কোতোয়ালের গলাটা সজোরে টিপে

পরলোকে মার্শাল ষ্ট্যালিন—

গত ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটের সময় (মস্কোর সময়) মস্কো সহরে রুশিয়ার নেতা মার্শাল ষ্ট্যালিন ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যু শয্যা-পার্শ্বে তাঁহার পুত্র ভাসিনি, কন্যা সভেটালেন ও কম্যুনিষ্ট দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৯ সালে জার অধিকৃত রুশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশে গোরি গ্রামে ২১শে ডিসেম্বর তাঁহার

মার্শাল ষ্ট্যালিন

জন্ম হয়—পিতা ছিলেন চর্মকার ও মাতা কৃষক কন্যা। ১৮৯৩ সালে তিনি স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু ২ বৎসর পরে মার্কসবাদী দল গঠনের জন্য স্কুল হইতে তাড়িত হন। ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি বে-আইনী দলে বেতনভুক কর্মী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। ঐ সময় ৬ বার তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তন্মধ্যে ৫ বার কারাগার হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ১৯১৩ সালে ধৃত হইয়া ৪ বৎসর তিনি আটক থাকেন। পরে কেরেনেস্কি বিপ্লবের সময় অন্যান্যের সহিত তিনিও কারামুক্ত হন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রথম তাঁহার গুরু লেনিনের সহিত পরিচিত হন। ১৯১৭ সালে যখন বলশেভিক দল রুশিয়ার শাসন ক্ষমতা লাভ করে, তখন ষ্ট্যালিনও একটি কাজ পান ও পরে ১৯২২ সালে তিনি সেণ্ট্রাল কমিটী অফ কম্যুনিষ্ট দলের সম্পাদক হন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যু হইলে তিনি রুশিয়ার নেতা হইলেন এবং ট্রট্স্কি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ট্রট্স্কিকে নির্বাসিত করেন ও ১৯৪০ সালে ট্রট্স্কী আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। সরকারী ভাবে ষ্ট্যালিন ছিলেন রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী—কিন্তু কার্যত তিনি এক-নায়ক ছিলেন। ১৯২৯ সালে প্রথম তিনি রুশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন—১৯৩১ সালে তাহার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সালে প্রথম তাঁহার পরিচালনায় কম্যুনিষ্ট দলের কংগ্রেস হয় ও ১৯৩৬-৩৮ সালের প্রসিদ্ধ বিচারে ষ্ট্যালিনের বিরোধী দলকে নির্মূল করা হয়।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষ্ট্যালিন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন—১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট হিটলার-ষ্ট্যালিন অনাক্রমণ চুক্তি হয়—তাহার পর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার পরিচালিত নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করে ও ১৯৪৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বিধ্বস্ত মহানগরী ষ্ট্যালিনগ্রাডে নাৎসী অভিযানের শেষ হয়। ১৯৪৫ সালে ২৩শে এপ্রিল বিজয়ী লাল পল্টন জার্মানীর রাইন ভবনে লাল পতাকা উড্ডীন করে। সোভিয়েট যুক্তরাজ্যে ষ্ট্যালিনের নামে ৬টি সহরের নামকরণ করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে ষ্ট্যালিন সোভিয়েট মন্ত্রিসভার সভাপতি হন। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সর্বশক্তিসম্পন্ন পলিট বুরো দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট রুশিয়া শাসন করিতেছে। এখন পলিট বুরোর নাম হইয়াছে প্রেসিডিয়াম অফ দি সেণ্ট্রাল কমিটী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও ১৯৪৬ সালে ১৬ খণ্ডে তাঁহার সকল লেখা রুশ ভাষায়

প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৩ বৎসরের মধ্যে ষ্ট্যালিন মাত্র ৫ বার বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—তন্মধ্যে ২ জন ভারতীয়।

বিশ্ব ইতিহাসের এই বিস্ময়কর চরিত্রটি পৃথিবীর চতুর্দিকে একটা কুয়াশার জাল সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর কৌতূহলের অন্ত নাই।

পরলোকে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী, সুপ্রসিদ্ধ সলিসিটার নির্মলচন্দ্র চন্দ্র গত ১লা মার্চ রবিবার বেলা ১টায় তাঁহার ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া হৃদযন্ত্রের রোগে ভুগিতেছিলেন। মেয়র নির্বাচিত হইয়াও অসুস্থতার জন্য তিনি কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই। নির্মলবাবু ১৮৮৮ সালে ৬ই অক্টোবর বিখ্যাত চন্দ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া প্রথমে হাইকোর্টের উকীল হন—পরে পিতার ফার্ম মেসার্স জি-সি-চন্দ্র এণ্ড কোংতে যোগদান করেন। একবার তিনি এটর্ণী সোসাইটীর সভাপতিও হইয়াছিলেন। পরিষদে কাজ করেন। কিছুদিনের জন্য তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় আইন সভায় যান ও ১০ বৎসর তথায় কাজ করেন। তিনি ১৯২৩ সালের পূর্বে কয়েকবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সমিতির সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। সহরের সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং শিল্প ও সঙ্গীতের উন্নতি বিধানে সর্বদা তাঁহার উৎসাহ দেখা যাইত। কংগ্রেস আন্দোলনেও তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী প্রধান ৫ জনের (বিগ্ ফাইভ্) তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার সামাজিক জীবনে একজন কৃতী ব্যক্তির অভাব হইল।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ৮ই মার্চ রবিবার কলিকাতা রামমোহন পাঠাগারে এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস সভায় সভাপতিত্ব করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শ্রীমাধবানন্দ, মহাবোধি সোসাইটীর সম্পাদক ভিক্ষু জিনরত্ন, জৈন তেরাপন্থী শ্বেতাম্বর মহাসভার সম্পাদক শ্রীশ্রীচন্দ রামপুরিয়া, শিখ গুরুদ্বার জগৎ সুধারের সম্পাদক জ্ঞানী শ্রীকর্তার সিং এবং প্রাচী বাণী মন্দিরের শ্রীরমা চৌধুরী ও শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সত্বর যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করা হয়, সে জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণ—

গত ৭ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে গিয়াছিলেন। তথায় ৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী-সংসদ সদস্যদিগের এক সভায় ডাক্তার রায় বলিয়াছেন—গঙ্গার

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

S. 202-50 BG

অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। পশ্চিম বাংলার লোক এই সংবাদে অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

নৈহাটী বঙ্কিম পাঠাগারে সমাগত সুধীগণ

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—

নূতন পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর সে বিষয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি বাংলা ভাষায় একত্র প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি ভারতবর্ষের লেখক খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা একটি পুস্তকে সমগ্র পরিকল্পনাটি প্রকাশ করায় সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে। বইখানির নাম 'ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'—মূল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা—কলিকাতায় সর্বত্র পাওয়া যায়। লেখক ৫টি পরিচ্ছেদে পরিকল্পনার ভিত্তি, সূচনা, রূপ, স্বরূপ ও উপসংহার বিবৃত করিয়াছেন। সুবোধ্য করিয়া বাংলা ভাষায় অর্থনীতিক বিষয় রচনা করিয়া অধ্যাপক শ্যামসুন্দর সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র' গ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদর লাভও করিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য জানিতে উৎসুক, তাঁহারা ভাষায় এইরূপ পুস্তক প্রকাশের ফলে লোককে পরিকল্পনা জানিবার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

বিদেশী প্রতিষ্ঠানে অভারতীয় নিয়োগ—

ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর যে সকল বিদেশী প্রতিষ্ঠান এদেশে ব্যবসা করেন, তাহাদের ক্রমে ক্রমে অভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিতে বলা হইয়াছে। গত ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী ১০৬০টি বিদেশী চালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কতজন অভারতীয় নিযুক্ত ছিল—তাহার হিসাব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মাসিক বেতন	অভারতীয়ের সংখ্যা
হাজার টাকার অধিক	শতকরা ৭৫ জন
* * *	ভারতীয়
৫শত হইতে এক হাজার পর্য্যন্ত	শতকরা ৮৫ জন
৩শত হইতে ৫শত পর্য্যন্ত	শতকরা ৯৯ জন

এখনও যে অধিক বেতনের পদে অভারতীয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহা উপরোক্ত হিসাব হইতে জানা যায়। তবে কম বেতনের পদে ক্রমে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ করা হইতেছে।

স্কুলে গীতা আবৃত্তি—

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার এক পত্রে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীঅনিলবরণ রায় মহাশয়কে জানাইয়াছেন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা শিক্ষা দেওয়া যাইবে না, সংবিধানে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তদনুসারে কলিকাতার গীতা প্রচার সমিতি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাকে জানাইয়াছেন—প্রতিদিন কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বে যেন ছাত্রগণ গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪৪ নং শ্লোক আবৃত্তি করেন। তাহার ফলে তাহাদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ঐ কয়টি শ্লোকে অর্জুনের প্রার্থনা আছে। আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা সত্বর এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কার্য্য করিবেন।

প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতিরক্ষা—

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচাকী এক সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন—ক্ষুদিরামের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—কিন্তু প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থার

"আমি জানি
লাক্স টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বককে আরও মনোরম ক'রে তুলবে"

স্মৃতি বিশ্বাস
বলেন

"এই বিশুদ্ধ শুভ্র সাবানটি আমার গায়ে যে সুগন্ধ রেখে যায় তা আমি ভালবাসি" স্মৃতি বিশ্বাস বলেন। "মনোরম গায়ের রং পেতে হোলে আমি যা করি আপনিও তাই করুন— লাক্স টয়লেট্ সাবান মেখে রোজ আপনার ত্বকের যত্ন নিন।"

LUX
TOILET SOAP

**লাক্স
টয়লেট্ সাবান**

চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

LTS. 370-X30 BG

সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টায় শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি ও নরেনবাবুকে সম্পাদক করিয়া কলিকাতায় এক সভায় একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে ও ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতায় উহার কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। • আমাদের বিশ্বাস নবগঠিত কমিটী প্রফুল্ল চাকীর উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

পেপসুর শাসনভার—

পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়নে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে তথায় সংবিধান অনুসারে শাসন ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সে জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং উক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজপ্রমুখের উপর কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। তথায় বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস দল তথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ার ফলে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। নূতন সংবিধান প্রবর্তনের পর এই প্রথম অচল অবস্থা হইল।

দ্বারকায় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা—

আচার্য্য বিষ্ণুজিৎ স্বামীজি ধর্মপ্রচার উদ্দেশে ও তীর্থ যাত্রীদের সুখ সুবিধার্থে দ্বারকা মহাতীর্থে বাঙ্গালীদের জন্য একটি আশ্রম ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত দোলযাত্রার সময় বহু যাত্রী ঐ ধর্মশালার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। মরুভূমির মধ্যে বলিয়া দ্বারকায় দারুণ জলাভাব—স্বামীজি তাঁহার আশ্রমে প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করায় সকলেই উপকৃত হইয়াছেন। ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে ঐ ধর্মশালা অবস্থিত। এই ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামীজি জনগণের উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ৬ই মার্চ শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডেপুটী মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বিনা বাধায় কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে ঐ পদ শূন্য হইয়াছিল। নরেশনাথ দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এবার মেয়র নির্বাচিত হইয়া নির্মলবাবু অসুস্থ থাকায় নরেশনাথই মেয়রের কাজ করিতেছিলেন। তিনি জনপ্রিয় ব্যক্তি, তাঁহার নির্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

পরলোকে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনী-প্রকাশের পিতার মাতুল ছিলেন—গুণেন্দ্রনাথের জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে ১৮৭৬ সালের ৩রা নভেম্বর যামিনীপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করেন—শৈশবে তিনি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত একত্র মানুষ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি শিল্প সাধনায় মন দেন ও ১৮৯৭ সালে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়া ৩ বৎসরে পাঠ শেষ করেন। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র শুধু ভারতের সকল স্থানে নহে—ভেনিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার চিত্রজগত একজন প্রকৃত সাধকে হারাইল।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও চরিত্রের শুচিতার প্রয়োজন—

৬ই মার্চ শুক্রবার জামসেদপুর টাটানগরে আজাদ ময়দানে এক জনসভায় ভাষণদান কালে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন—একতা, সহযোগিতা ও অধিকতর উৎপাদন যেন ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হয়। জমির কৃষক বা কারখানার শ্রমিক সকলের জীবনেই যেন এই এক উদ্দেশ্যের কথা ধ্বনিত হয়। দৃঢ় ও নির্মল চরিত্র না হইলে ভারতবাসী কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। গান্ধীজি আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন—সে কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

মার্কিণবাসী ভারতীয়ের দান—

ডক্টর এস-সি-ঘোষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো সহরে ব্যবসা করেন। তিনি সম্প্রতি ভারতে আসিয়া ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়াছেন—ঐ টাকার সুদে ১৮ জন মহিলা মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। পীড়িত সন্ন্যাসীদের সেবার ব্যবস্থার জন্যও তিনি স্বতন্ত্রভাবে ৪০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন—উহার বার্ষিক সুদ হইতে ১২ শত টাকা। ডাঃ ঘোষ ৫০ বৎসর পরে
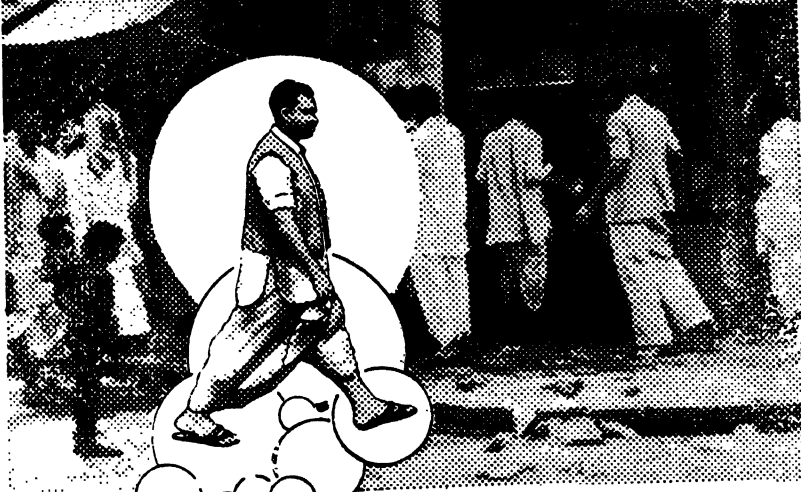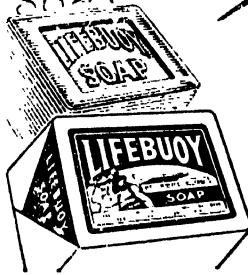
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, নাম স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ—বয়স ৬৩ বৎসর। ডাঃ ঘোষের এই দান তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে।

কানাইলালের মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ৮ই মার্চ রবিবার বিকালে চন্দননগর সহরে বিপ্লবী শহিদ কানাইলাল দত্তের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। প্রবর্তক সংঘের শ্রীমতিলাল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। যে স্থানে ডুপ্লের মূর্তি ছিল, সে স্থানেই কানাইলালের মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। কানাইলালের অগ্রজ ডাঃ আশুতোষ দত্ত ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী সভায় উপস্থিত থাকিয়া কানাইলালের জীবনকথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

রাজমহেন্দ্রীতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের সংবর্দ্ধনা

অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্ম রাজ্য সভার উদ্যোগে গত জানুয়ারি মাসে হায়দরাবাদে এক নিখিল ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং India's Cultural Heritage এই বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৫শে জানুয়ারী পশ্চিম গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রীতে অন্ধ্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে নলিনীবাবু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত করা হয়। ম্যাট্রিকাফ ষ্টুডেন্টস হলের ছাত্রদের তরফ হইতে নলিনীবাবুকে প্রদত্ত এক মানপত্রে ভারতের জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বাংলার দানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নলিনীবাবু তাঁহার ভাষণে বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা কি ভাবে একদা অন্ধ্রের জনমনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করে এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করেন।

গিরিশচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সৃষ্টির প্রেরণা জাগে শতাব্দীর অন্তরে অন্তরে,
মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ক্রমে নানা স্বপ্ন, নানা সম্ভাবনা,
জীবনে জোয়ার এল, রূপ নিল কত-না কল্পনা,
রঙ্গমঞ্চ হ'ল গড়া, এল নট উৎসাহের ভরে।

এত ঘাত-প্রতিঘাত, নাট্যকার কোথা তার তরে ?
অপূর্ণ সম্পূর্ণ হ'ল, হে গিরিশ! সমাপ্ত এষণা,
সাধক লভিলে সিদ্ধি, জয়যুক্ত তোমার সাধনা,
জাগ্রত প্রতিভা তব অপরূপ রূপ-সৃষ্টি করে।

অসংখ্য চরিত্র যেথা আনাগোনা করে ক্ষণে ক্ষণে,
বিস্ময়ে বৈচিত্র্যে ভরা সে জগৎ সৃষ্টি যে তোমার।
প্রেম ও ভক্তিতে সিক্ত, নিঃস্বনিত হাস্যে ও ক্রন্দনে,
সঙ্গীতে মুখর তব নাটকের সৌন্দর্য্য-সম্ভার।

যাদের দিয়েছ প্রাণ জীবন্ত যে তারা মনে মনে,
স্রষ্টা, কবি হে গিরিশ, তুমি নট, তুমি নাট্যকার।

Rexona
Rexona

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৭৯ (রামচাঁদ ৬২, উমরীগড় ৬১, পি রায় ৪৯, কিং ৭৫ রানে ৫ উইকেট) ও **৩৬২** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আপ্তে ১৬৩, মানকড় ৯৬, উমরীগড় ৬৭। ওয়েল ৬২ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩১৫ (উইকস ১৬১, ওয়ালকট ৩০। গুপ্তে ১০৭ রানে ৫ উইকেট) ও **১৯২** (২ উইকেটে। ষ্টলমেয়ার ১০৪, উইকস নট আউট ৫৫)

কুইন্স পার্ক ওভালে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। লাঞ্চের সময় এক উইকেট হারিয়ে ভারতবর্ষের ৪১ রান হয়। চা-পানের সময় চার উইকেট পড়ে দলের রান দাঁড়ায় ১৩৩। রামচাঁদ-রায়ের ২য় উইকেটের জুটিতে ৮১ রান ওঠে। প্রথমদিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ৫টা উইকেট পড়ে গিয়ে ভারতবর্ষের ১৬৭ রান হয়। ৫ম উইকেট পড়ে ১৩৬ রানে, শেষের তিনটে উইকেটে মাত্র ৩৭ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ৮ উইকেট পড়ে ২২৭ রান দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয় ২৭৯ রানে। ঘোরপাদ এবং গুপ্তের শেষ উইকেটের জুটিতে ৫০ রান ওঠে। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ২ উইকেট পড়ে ৭৮ রান হয়।

তৃতীয় দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮০ রান করেছে। ভারতবর্ষের থেকে এক রান এগিয়েছে, হাতে জমা পাচটা উইকেট। উইকস ১৫৯ রান ক'রে নট আউট আছেন।

খেলার চতুর্থ দিনের লাঞ্চের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৩১৫ রানে শেষ হয়ে যায়। তারা শেষ পাঁচটা উইকেটে মাত্র ৩৫ রান করে। দলের মোট রানের মধ্যে উইকসের রানই ১৬১। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৩৬ রানে এগিয়ে যায়। উইকস শতাধিক রান করলেও একাধিকবার আউট হ'তে হ'তে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি নিজস্ব ৭৪ এবং ১৫২ রানের মাথায় ক্যাচ-আউট থেকে বেঁচে যান।

ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা সুরু ক'রে চা-পানের সময় ৩টে উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৫ রান করে।

খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে আর কোন উইকেট না পড়ে রান দাঁড়ায় ১১৮। ফলে ভারতবর্ষ ৮২ রানে এগিয়ে যায়। আপ্তে এবং উমরীগড় যথাক্রমে ৬০ এবং ৪৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

পঞ্চম দিনের চায়ের সময় ভারতবর্ষের ২১৩ রান ওঠে ৬টা উইকেট পড়ে। নির্দ্ধারিত সময় রান গিয়ে দাঁড়ায় ২৮৭, আর কোন উইকেট না পড়ে। ষ্টলমেয়ারের বলে লেট-কাট মেরে আপ্তে ১৩৫ রান করলে পর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে নট আউট রানের নতুন রেকর্ড হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল হাজারের ১৩৪ নট আউট, বোম্বায়ের ২য় টেষ্টে। আপ্তে এবং মানকড় যথাক্রমে ১৪১ এবং ৭৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে ৩৬২ রান ক'রে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মানকড় ৯৬ রান ক'রে রান আউট হ'ন। তরুণ খেলোয়াড় আপ্তে ১৬৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তিনজন খেলোয়াড়ের জুটিতে আপ্তে দলের পক্ষে মোটা রান তুলেছিলেন—৪র্থ উইকেটে আপ্তে-উমরীগড়ের জুটীতে ১৩৫ রান, ৫ম উইকেটে আপ্তে-হাজারের জুটিতে ৬৪ রান এবং ৭ম উইকেটে আপ্তে-মানকড়ের জুটিতে ১৫৩ রান ওঠে। আপ্তে মোট ৫৮৭ মিনিট সময় ব্যাট ক'রে ১৪টা বাউণ্ডারী করেন। মানকড় ২১৪ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী করেন।

আপ্তে-মানকড়ের ৭ম উইকেটের জুটিতে যে ১৫৩ রান ওঠে তা বর্ত্তমান সফরে উইকেটের জুটীতে সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে।

লাঞ্চের ২৮ মিনিট আগে অধিনায়ক হাজারে ভারতবর্ষের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ অবস্থায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে জয়লাভের জন্য ৩২৭ রান প্রয়োজন। হাতে মাত্র সময় ১৭৮ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে এই পর্ব্বত প্রমাণ রান তোলা অসম্ভব ব্যাপার! ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ নির্দ্ধারিত সময়ে ২ উইকেট হারিয়ে ১৯২ রান করে। ষ্টলমেয়ার ১০৪ এবং উইকস ৫৫ করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৯৬ (ওয়ালকট ৯৮, উইকস ৪৭। গুপ্তে ৯৯ রানে ৩, মানকড় ১২৫ রানে ৩, হাজারে ১৩ রানে ২ উইকেট) ও **২২৮** (ষ্টলমেয়ার ৫৪, গোমেজ ৩৫। ফাদকার ৬৪ রানে ৫, গুপ্তে ৮২ রানে ২ এবং মানকড় ৫৪ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ২৫৩ (আপ্তে ৬৪, হাজারে ৬৩, উমরীগড় ৫৬। ভ্যালেনটাইন ৫৮ রানে ৪ উইকেট) ও **১২৯** (রামচাঁদ ৩৪, মঞ্জরেকার নট আউট ৩২। রামাধীন ২৬ রানে ৫ উইকেট)

বার্বাদোসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৪৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এই জয়লাভের সমস্ত গৌরবের অধিকারী, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রবাসী ভারতীয় খেলোয়াড় রামাধীন। তাঁর একার বোলিং সাফল্যে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস অল্প রানে শেষ হয়। রামচাঁদ, উমরীগড় এবং ফাদকার—এই তিনজন তাঁর বলে বোল্ড আউট হ'ন—দশ ওভার বলে মাত্র ৬ রানে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল প্রথম ইনিংসের রানের ফলাফলে ভারতবর্ষের থেকে মাত্র ৪৩ রানে এগিয়ে থাকে। খেলার চতুর্থ দিনে চা-পানের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ২য় ইনিংস ২২৮ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষের থেকে ২৭১ রানে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের হাতে সমস্ত উইকেট জমা এবং দু'দিনের বেশী সময়। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের অনুকূলে খেলার ফলাফল আশা করা, অন্ততঃ খেলাটা ড্র হওয়া মোটেই দুরাশা নয়। কিন্তু রামাধীনের মারাত্মক বোলিংয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এই সাফল্য লাভের ফলে রামাধীনের রাহুর দশা কেটে গেল। টেষ্ট খেলা থেকে তাঁর বাদ পড়বার যে সম্ভাবনা ছিল আপাততঃ তা আর রইল না।

চতুর্থ দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে দুই উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ৫৪ রাণ ওঠে। পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ভারতবর্ষের ২১৭ রাণ প্রয়োজন। হাতে যথেষ্ট সময়, ৬০০ মিনিট।

খেলার ৫ম দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৮টা উইকেটে মাত্র ৭৫ রাণ উঠে, ২য় ইনিংসে মোট রাণ দাঁড়ায় ১২৯। ফলে ভারতবর্ষকে ১৪৩ রাণে হার স্বীকার করতে হয়। রামাধীনের বোলিং কৃতিত্বকে যথোচিত সম্মানিত করেও বলা যেতে পারে ভারতবর্ষ মানকড় এবং গাইকোয়াড়ের আঘাত হেতু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়া—দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ম টেষ্টে ৬ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের ফলাফল সমান করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পক্ষে এ সাফল্য যেমন গৌরবের, তেমনি আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ ১৯৩৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া যে একাধিপত্য বজায় রেখে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজ খেলায় তা খর্ব্ব হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া শেষ বার 'রাবার' হারিয়েছে ১৯৩২-৩৩ সালে, ইংলণ্ডের কাছে। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডকে ২-১ টেষ্ট খেলায় হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পায়। সেই থেকে অষ্ট্রেলিয়া চারটি দেশের (ই[illegible]ণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ,

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ) বিপক্ষে ১১টি টেষ্ট সিরিজ খেলে ৯ বার 'রাবার' পেয়েছে। টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে ২বার, ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৫৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এই ১১টি টেষ্ট সিরিজে ৫৪টি টেষ্টম্যাচ খেলা হয়েছে—অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় ৩৫, হার ৮, খেলা ড্র ১১। যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়া মাত্র ৬টি টেষ্টম্যাচে হেরেছে, ইংলণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে একটি ক'রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২টি। অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৮টি টেষ্ট সিরিজে ৩৪টি টেষ্টম্যাচ খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় ২৪, দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে জয় ৩, খেলা ড্র ৭টি।

অষ্ট্রেলিয়া ৭টি টেষ্ট সিরিজে রাবার পেয়েছে। একটি সিরিজে ফলাফল অমীমাংসিত হয়েছে।

ব্যবধান

শান্তশীল দাশ

স্বর্গ-দেবতা পৃথিবীতে নেমে এসে,
অসহায় হয়ে দানব অত্যাচারে,
পেতেছিল হাত দীন ভিখারীর বেশে
এই মানুষের দ্বারে।
দেবতার লাগি হাসিমুখে ছিল প্রাণ,
মরণ বরণ করেছিল অকাতরে,
অস্থিতে তার দেবতারা পেল প্রাণ
দানব হনন করে।

মাটির মানুষ ত্যাগের তপস্যায়
জয় করে নিল দেবতার অন্তর ;
চির-উজ্জ্বল আপনার মহিমায়
হল অবিনশ্বর।
সেই মানুষের সাথে কিছু আমাদের
মিল আছে না কি ? বৃথা করি সন্ধান ;
সে-জীবন সাথে আজিকার জীবনের
কি বিরাট ব্যবধান।

সাহিত্য-সংবাদ

শরৎ-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত "শরৎ-স্মরণিকা" (৬ষ্ঠ বর্ষ)—১৲
সাহানা দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "নীরাজনা"—৮
শ্রীরবি গুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মর্ম মরাল"—৩৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বধূ বিপ্লব"—১৷৹, "সিক্রেট সেফ"—২৷৷৹
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র পরিবেশিত গল্প-গ্রন্থ "বেফাঁশ"—১৷৹
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সন্ধ্যারাগ"—৪৷৷৹
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "উপনিষদ্" (জড় ও জীবতত্ত্ব)—৫৲
মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ঘোষ, হিমাদ্রিশেখর বসু ও অসীম ভট্টাচার্য প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "চার কলম"—২৲
শ্রীহীরেন্দ্রভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "ডালি"—১৲
শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সমালোচনা-গ্রন্থ "কবিগুরুর রক্তকরবী"—৩৲
শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "নূতন ছড়া ও কবিতা"—৮০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শুভদা" (৭ম সং)—২৷৷৹, "বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতি" (২১শ সং)—২৲, "শ্রীকান্ত" (৪র্থ পর্ব্ব—১১শ সং)—৩৲
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "মাসফল" (৭ম সং)—২৲
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর কাহিনীর নাট্যরূপ "মন্ত্রশক্তি" (৮ম সং)—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

থকে এক রান

শিল্পী—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

চিত্রপট

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
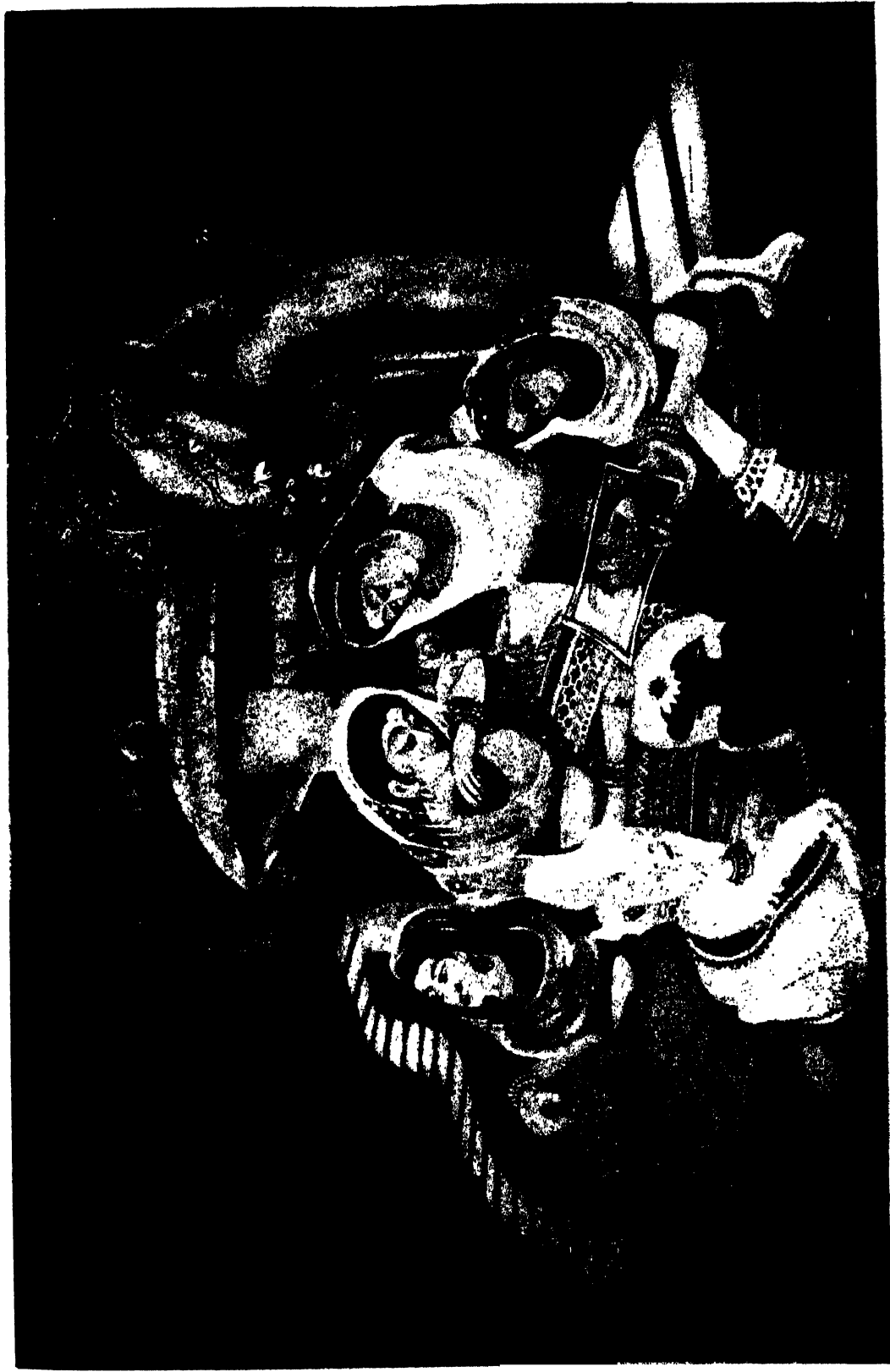
দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সত্যানুসন্ধান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জগতে সত্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য ; লোকচক্ষের অন্তরালে যাহার বাস, অন্তরের গভীরে যাহার ক্রমবিকাশ এবং অন্তর-বাহিরের উপলব্ধি-সমন্বয়ে যাহার লীলাখেলার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—সেই সত্য অনুসন্ধান-সাপেক্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম জিজ্ঞাসার উত্তর।

কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখি, অবস্থা বৈগুণ্যে কালে কালে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আজ যে সত্য আমাদের বুদ্ধি ও বিচারে ধরা দিল, কাল তাহা আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। ষ্টিভেনসন্ সেই জন্য বলিয়াছেন—

"Truth is like the horizon,—the nearer
You approach it, the move it recedes."

তাইত দেখিতে পাই সত্য যেন দিগ্বলয়ের মত, তাহার স্থিতি কোনও কালের সীমায় আবদ্ধ নহে—তাহার অবস্থান সর্ব্বদা গতিশীল। যতই তাহার নিকট যাওয়া যায়, ততই সে দূরে সরিয়া যায়। এ ছবি অতি সুন্দর! অপসৃয়মান দিগ্বলয়ের শোভা সত্যই সুন্দর।

গত কালের বৈজ্ঞানিক সত্য, আধুনিকতম তথ্য আবিষ্কারের পর, নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। কালিকার সত্যেরই ইহা পরিবর্ত্তিত রূপ। ইহাকে উপেক্ষা করে চলে না, স্বীকার করিয়াই লইতে হয়। সত্য স্থাণু নহে গতিশীল, তাহার পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সত্য স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে, অখণ্ডনীয় বা অকাট্যও নহে।

জ্ঞান অর্জ্জনের দিক হইতে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা ঋদ্ধিলাভের পক্ষে সহায়ক—ইহা মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। যদি বলি—মৃত্যুহার পাইয়াছে, তাহা হইলে এ সত্যের মেয়াদকাল স্বল্পদিন কারণ পান-পাত্রে স্যাম্পেন ঢালিলে প্রথমে উপরচা চকচক

করিয়া উঠে, কিন্তু বেশীক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে তাহা বিবর্ণ হইয়া পড়ে, অপেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। সেরূপ দিন যত আগাইয়া যায় একদা যে সত্যটি আমার চোখের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিয়াছে যাহাকে গ্রহণ করিয়াছি, কালক্রমে তাহা আর আমাকে চমকিত করিতে পারে না—যাহার গাণিতিক যোগটা একদা ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইয়াছিল এখন আর তাহার উপর সেরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে না।—পুরাতন সত্যের স্থল নূতন সত্য দখল করিয়া বসে। আমরা অবাক হইয়া যাই।

ক্রমাগত মানুষের মনে দাগ পড়িতেছে—কারণ নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে মানুষ মানসিক অস্বস্তি অনুভব করিতেছে। যে সত্যের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া পূর্ব্বে সে স্বস্তি পাইত, নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়া তাহার জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে। গত কালের সিদ্ধান্ত আজিকার অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ বদলাইয়া যাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত আইনকানুন ও আদালতের রায় যেমন অবস্থান্তরে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে ঠিক তেমনি পুরাতন সত্যের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সত্য প্রতি-নিয়তই দুইটি বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় সাধন করিতেছে। সেই জন্য সত্যের প্রতি মানুষের মর্য্যাদাবোধ এত অধিক। সত্যের রূপ বদলাইলেও তৎপ্রতি আমাদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যে কম হইয়া যাইতেছে এমন ধারণারও অবকাশ নাই।

অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় লোক-প্রতীতির উপরই সত্যের অস্তিত্ব বজায় থাকে। আলাপ আলোচনার সময় কোনও বিষয়ে একে অন্যের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে। পরস্পর ভাবিতেছি পরস্পরের কথা অভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য। এই ভাবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন চলিতেছে। দূরবর্ত্তী কোনও ব্যাঙ্কের উপর চেক দেওয়ার মত—বৈষয়িক ব্যাপার এই ভাবে চলে। কেহ যখন সে 'চেক' প্রত্যাখ্যান করে তখন আর তাহার কোনও মূল্য থাকে না। সন্দেহ জাগিল, প্রশ্ন উঠিল,—চেকের প্রতি পূর্ব্ব বিশ্বাসের ও নির্ভরতার এই-খানে শেষ হইয়া গেল। মূল্যহীন কাগজের মত টুকরা-কাগজ স্থান পাইল। সত্যও এমনি নির্বিশেষ উপেক্ষায় অনেক সময়ে মূল্যহীন বোধ হইয়া থাকিবে আমাদের কাছে।

যাহাকে যাহা বলা যায়—প্রায় ক্ষেত্রেই তাহা বিশ্বাসের সহিত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সেই জন্যই দেখা যায় সত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের সীমা রেখা সুদূর বিস্তৃত। সাধারণ লোকের ভ্রান্তির মূলে আছে সত্যের প্রতি বিশ্বাসের এই আন্তরিকতা। ইহাও আমরা দেখিয়াছি —সত্য বহু হাতে আঘাত খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতেছে।

"The progress of truth questioned at first, registed at its speed, abused at its reknown — but finally accepted in its triumph."

প্রথমেই প্রশ্নবানে আহত, অগ্রসরে বাধা-প্রাপ্ত, প্রসিদ্ধিতে নিন্দিত কিন্তু সর্ব্বশেষে বিজয়গর্ব্বে স্বীকৃত—ইহাই হইতেছে সত্যের প্রগতি।

তাই বলিতেছি যে সত্য পঙ্গু নহে, সত্য দুর্ব্বল ও স্পর্শ-কাতর নহে, আঘাত নিন্দা ও বিঘ্নবাধায় নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে পারে বিশ্বমানবের অনুসন্ধানীয় সত্য।

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-বার তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"There is no such thing as THE TRUTH." একথার তাৎপর্য্য আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমরা যাহাকে "সত্য" বলিয়া থাকি তাহা কাজ চালাইয়া লইবার মত একটি অনুমিতি (Hypothesis) মাত্র। ইহার প্রচলন করিয়া আমরা আমাদের বিধি ব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা জটিলতা ঢুকাইয়া দিই। তিনি তাঁহার মতকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

"What was true yesterday, that is
What was helpful yesterday, may not be
True today. Old truths like old
Weapons tend to grow rusty and
become useless."

অর্থাৎ কাল যাহা সত্য ছিল—অর্থাৎ কাল যাহা সাহায্যে লাগিয়াছিল, আজ তাহা সত্য নাও হইতে পারে। পুরাতন

সত্য পুরাতন অস্ত্রের মত—মরিচা পড়িয়া তাহা ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক জেমসের এই মন্তব্যে ইহাই বুঝা যায় যে সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য কাহারও গোচরীভূত নহে। যদিও প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সত্যের চাক্ষুষ পরিচয় কিছু না কিছু ঘটিয়াছে এবং তাহার উপলব্ধিও প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অল্পাধিক বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের এই সত্য-দর্শন তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে পর্য্যবেক্ষণের ফল মাত্র। সত্যের পরিপূর্ণ রূপ এক এবং কোনও একটি বিশেষ কোণ হইতে তাহাকে দেখিলে তাহার এক একটি রূপ এক একদিকে ধরা পড়িবে। দীপালোকে দেখা সত্য সূর্য্যালোকে দেখা সত্য হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক না হইতে পারে এমন নহে।

মানুষের মনে যদি কোনও সত্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে, আপত্তি উঠে, অথবা সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তে আসিবার আগ্রহ দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে নিরস্ত করা কখনই উচিত নহে; বরং সেই সত্যবিশেষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা উচিত। হয়ত তাহার সিদ্ধান্ত অপরের পক্ষে প্রীতিকর বা সন্তোষজনক হইবে না, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সকলের মনে যেন এই আত্মজিজ্ঞাসা জাগে, "আমি কি বাস্তবিকই সত্য উপলব্ধি করিতে চাই? না, অন্তঃসারশূন্য মনের অন্তরালে চিন্তার জগাখিঁচুড়ি পাকাইয়া অসুস্থ হইতে চাই?" এ দুইটিই আমার কাম্য হইতে পারে না। এ দু'য়ের মধ্যে একটিকেই আমাকে বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের কল্পনাশক্তিকে যথাসম্ভব উদ্বুদ্ধ করিয়া বিভিন্ন মতের দিক হইতে বস্তুবিচার করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের উদ্দীপ্ত কৌতূহল যেন যবনীকার অন্তরালে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতে মানুষের বিচার বুদ্ধির উন্মেষ হয়। কাজেই তাহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা তাহার বিচার করিতে হইবে—তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমারেখার পরিমাপে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে মানুষ যে-পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল সেই পর্য্যন্তই পৃথিবীর শেষ বলিয়া ধরিয়া লইল। ইহা সত্যের বৃহৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়া। "অহং" জ্ঞানই তাহার সত্যস্বরূপের জ্ঞান-অর্জ্জন করিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিল। অনেক ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি-ভ্রষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমরা দুঃখিত হই। কেহ আমাদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হই, ইহাতে আমাদের আত্মশ্লাঘা বা আত্মতুষ্টি ব্যাহত হয়। কেহ আমাদের ভ্রান্তি দূর করিতে গেলে তাহার উপর আমরা অসন্তুষ্ট হই। যে সত্য জানিলাম, কিন্তু মানিয়া লইতে পারিলাম না, তাহা আমাদের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে যাহারা পুরাতন সত্যের বিলুপ্তির স্থলে নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া বিক্ষুব্ধ হয় না তাহাদের লাভ হয় দুই তরফা। যেমন তাহারা নূতন সত্যের আলোক দেখিতে পায়—তেমনি তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারও নূতন সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

আমাদের শৈশবে ও কৈশোরে অনেক পরীর গল্প শুনিয়াছি। এখনও মনে পড়ে আমরা নির্ব্বিচারে, সে সকল গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম—গল্প বলিবার ভঙ্গিতে; সে ভঙ্গিটি যেন গাল্পিকের সহজাত ছিল—কোনও উপক্রমনিকা ছিল না, কোনও কৈফিয়ৎ কাটা ছিল না—আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় সরলতা-পূর্ণ রসাত্মিক মনটি উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত— শ্রোতাহিসাবে আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহ আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিত—গল্প শুনা নহে, সে যেন গল্প গিলিয়া খাওয়া। বিশ্বাস করিতে আমাদের কোথাও বাধিত না—সম্ভব অসম্ভবের সংশয় আমাদের কাছে ছিল কিন্তু তাহা অবান্তর। শুধু বলিতাম তারপর? তারপর? ক্রমশঃ বয়স বাড়িয়া চলিল, বস্তুজগতের সংস্পর্শে আসিয়া আর একটি মন যেন আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিল—আমরা তখন সেই ঘটনাগুলিকে রূপকথার কল্পনা মনে করিতে লাগিলাম—ক্রমশঃ সে সকল ঘটনা-গুলির উপর আর বিশ্বাস রহিল না। তবু এখনও যদি পরীর গল্প পড়ি তখন ফিরিয়া যাই সেই শৈশবে, সেই কৈশোরে—সেই দ্বিধাহীন সংশয় বিহীন বিশ্বাসের দিনে—ভাল লাগে, নয়ত বা আমাদের অতর্কি মুহূর্ত্তে কোনওটা

বা বিশ্বাসও করিয়া ফেলি, শৈশবের সেই আনন্দের সুর যেন মনের মধ্যে বাজিয়া উঠে। ড্রাইডেন (John Dryden) বলিয়াছেন—

"Men are but Children of a larger growth." ভারি সুন্দর ও সঙ্গত কথা এইটে।

অর্থাৎ আকারে বড় হইলেও—প্রকারে আমরা সেই শিশুই আছি।

তরুণ বালকের মত মানুষ দূরবীণের সাহায্যে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করিতে চায় ;—অবশ্য যদি তাহার চোখে সে দৃশ্য ভাল লাগে এবং তাহার পছন্দমত জায়গায় যদি "ফোকাস" (Focus) পড়ে—অর্থাৎ ঠিক জায়গায় তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধের অবকাশ ঘটে। কিন্তু কেহ যদি তাহার দূরবীণটিকে তাহার দৃষ্টিকেন্দ্রের বহির্ভূত করিয়া দেয় তাহা হইলে তথাকার দৃশ্যবস্তু সম্পর্কে তাহার আর কোনও আকর্ষণই থাকে না। হয়ত বা ইহাতে তাহার চিত্তবিক্ষোভও ঘটিতে পারে। সেই কারণেই একজন মনীষী বলিয়াছেন—

"It is real humanity and kindness to hide strong truth from tender eyes."

অর্থাৎ সুকোমল দৃষ্টি হইতে রূঢ় সত্যকে গোপন রাখাই মনুষ্যত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয়।

সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহার নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিই সদাজাগ্রত মনের খোরাক ; ইহার দ্বারাই মন প্রশস্ত হয় এবং ঔদার্য্যগুণে তাহার গ্রহণশীলতাও বৃদ্ধি পায়। যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও কথা তৎক্ষণাৎ সত্য বলিয়া মানিয়া না লওয়াই চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। মানুষের সমালোচনানিপুন মন তাহার সমগ্র চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। যে মানুষের মন প্রশ্ন করে, সমালোচনা করে, দোষগুণ বিচার করিয়া তবে কোনও সত্যকে স্বীকার করিয়া লয়—তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে—তাহার স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ন্যায্য অধিকার থাকা উচিত। কোনও একটি বিশেষ সময়ে স্বীকৃত সত্যের মধ্যে যে মন আবদ্ধ নহে, তৎপ্রতি নির্ভরতার প্রশ্নও সে মন সম্বন্ধে উঠে না। এরূপ আত্মবঞ্চনা বাঞ্ছনীয় নহে। এই প্রকার আদর্শ সম্পর্কে সক্রেটিসের বেশ একটি সুন্দর মন্তব্য আছে। তিনি বলিয়াছেন—

"I pursue the trail of truth like a blood hound"—অর্থাৎ আমি শিকারী কুকুরের মত সত্যের গন্ধ অনুসরণ করিয়া চলি।

সত্যের গন্ধে গন্ধে মন তাহার পায়ে চলার পথে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। অবশেষে সেই সত্যের সন্ধান মিলে—চিত্তের আকুলতা ও মনের সমস্ত সংশয় নিরশন করিয়া সত্য চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

তুমি আমাকে যে সত্য মানিয়া লইতে বল—আমার যুক্তিতে আমি মনে করিতে পারি তাহা তোমার অনুমান মাত্র—এ বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতে পারি, তোমার সত্য প্রমাণ-সাপেক্ষ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার ন্যায়োচিত অধিকারও আমার আছে—তোমারও আমার সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার, সন্দেহ প্রকাশ করিবার সমান অধিকার আছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে যখনই আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণগুলি বিবেচনা ও বিচারের নিক্তিতে ওজন করি তখনই আমরা প্রচুর পরিমাণে সারবান সত্যের সন্ধান পাই ; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারতা লাভ করে ; স্বাধীন চিন্তার ধারা অবারিত হইয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। ইহাকেই দার্শনিক ভাষায় বলে আত্মজিজ্ঞাসা—ইহার দ্বারাই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

মরীচিকা

শক্তিপদ রাজগুরু

বলরাম ঝিম্ হয়ে বসে রয়েছে ভাঙ্গা ঘরটার দাওয়াতে। দাওয়া-আর কুঠরি বলে কোন জিনিসই আর খাড়া নাই। দীর্ঘদিন ছাওয়া হয় নাই, চালে খড়গুলো অনেকদিন বৃষ্টির জলখেয়ে খসে খসে পড়েছে। বাখারিগুলো ফাঁক হয়ে গেছে, আলো-বাতাস বৃষ্টি সমানে যাতায়াত করতে বাধা পায় না!

তিন চার দিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকার পর আজ উঠে বসেছে বলরাম! মা-বাবা কবে মরে গেছে জানে না, গাঁয়ের লোকের মুখে শুনেছে তার বাবা নাকি বড়তরফের চাটুয্যেদের বাড়ীতে কাজ করত! তাদের যথাসর্বস্ব সেই নাকি লুট করে চাটুয্যেদিকে ফৌত করেছিল শেষকালে নিজেই ফৌত হয়ে যায়! ছেলেবেলায় সে নাকি বাবুদের ছেলের মত তোষকেই শুত। সাবান দিয়ে তার গা হাত পা পরিষ্কার করত। তার বাবা যা খেত তা নাকি অনেক বাবু-ভায়েরাই পায় না। এ সব অবশ্য বলরামের শোনা কথা, মনে তার কিছুই পড়ে না। যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে তার, পরের দয়াতেই মানুষ! কোনদিন কেউ চাটি দিয়েছে খেয়েছে, না দিয়েছে নিজেই বামনপাড়ার দিকে গেছে, এর তার ঘরে দু মুঠো পাতের এঁটো কাঁটা যা দিয়েছে তাই খেয়েছে!

পা দুটো কাঁপছে, তিন চার দিনের ম্যালেরিয়া জ্বর তার জীর্ণ শরীরটাকে নুইয়ে দিয়ে গেছে! গলাটা শুকিয়ে আসছে, কাঁথাখানা গা থেকে নামিয়ে কোন রকমে হাঁটবার চেষ্টা করে সে। পাশেই মনো বাগ্দীর বাড়ি, ডাকতে থাকে —"পিসী—এই পিসী!"

"শুকনো ঝামেলা কতদিন সহ্য করতে পারে নিস্তারিণী, ছোট্ট ছেলেটাকে ফেলে রেখে যেদিন মারা যায় বলরামের বাবা···নিস্তারিনী আর মনমথই তাকে বড়সড় করে তোলে, কিন্তু বলরাম আজও রয়ে গেছে পরমুখাপেক্ষী। বিরক্ত হয়ে ওঠে নিস্তারিণী—"মরিস্ নি যম কুথাকার, রোজ রোজ তুর ব্যাগার দিতে লারব!"

অভ্যর্থনার বহর দেখে থেমে যায় বলরাম! জল খেতে হবে পরেও জল নাই···, কোন রকমে সামনের ডোবাটাতেই নেমে যায়, হাঁসগুলো সরে গেল, ডোবার জলে কে একগাদা খড় ভিজিয়ে রেখেছে···, ময়লা নীল জলটাই আঁচলা আঁচলা করে খেতে থাকে বলরাম! নাকে একটা বিশ্রী গন্ধ আসে···, আসুক···তেষ্টা মিটবে ত!—"এ্যাই—এ্যাই – মাগো!"

হঠাৎ পিছন দিক থেকে কার চীৎকারে থামল বলরাম! কুসি ততক্ষণ নেমে এসেছে জলের ধারে···"জল নাই তাই বলে বিষ খেতে হবেক? উঠ!"

বলরাম তার ব্যথা ভরা ডাগর চোখের দিকে চেয়ে থাকে! কুসুম তার হাত ধরে উপরে নিয়ে আসে। বলরাম কি বলবে ঠিক বুঝতে পারে না!

···কদিন পর থেকে আবার সুরু হয় বলরামের দৈনন্দিন পরিক্রমা! মুনিষ খাটতে পারে না, বয়সও খুব বেশী নয়, তাছাড়া শরীরও শক্ত নয়! এর আগে কয়েক বছর মাহিন্দার খেটেছিল দু একটা বাড়ীতে কিন্তু সেখান থেকে যে সুনাম নিয়ে এসেছে তার ফলে সহজে আর কেউ তাকে নিতে চায় না! অবশ্য বলরাম তার জন্য দোষী ঠিক নয়। কয়েক বৎসর পর পর ম্যালেরিয়াতে ভুগে, ঠিক মত খেতে না পেয়ে কানেও কম শোনে, আর চোখ দুটো সন্ধ্যের পর থেকেই বিকল হয়ে যায়, সোজা কথায় 'রাতকানা' সে! দিনের আলো মুছে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটোর সামনে কেমন যেন জমাট অন্ধকার নেমে আসে! কিছুই আর দেখতে পায় না! সেবার ধান কাটতে গিয়েছিল বনের মাঠে, ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়···পুকুনের বন, ধরে হাতড়ে হাতড়ে পথ বার করতে না পেরে চীৎকার করে ডাকাডাকি

করতে থাকে! লোকজন গ্রাম থেকে/ছুটে যায় লাঠি সড়কি নিয়ে—কে জানে হয়ত কাকে জানোয়ারে ধরেছে··· গিয়ে দেখে বলরাম। এর আগে পর্য্যন্ত রোগটা সে চেপে রাখতে পেরেছিল বুদ্ধি কৌশল খাটিয়ে, কিন্তু তারপর থেকেই ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে গেল!

···এই সব নানা কারণে এখন বলরাম বাধ্য হয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ভিক্ষে করেই দিন কাটায়! প্রথমে সঙ্কোচ আসত লজ্জা আসত তাদের গুষ্টিবর্গের মধ্যেও দু একজন তাকে কথা শোনাত। সেদিন সাতা শাঁতে তাকে ভোজ খাবার সময় এক পংক্তিতে বসতে দেয় নি, ইচ্ছে করেই আলাদা একটা পাতা করে দিয়েছিল, বলরামের মনে এই আঘাত সেদিন রেখা পাত করেছিল, কিন্তু চুপ করে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া তার কোন উপায়ই ছিল না।

ক্রমশঃ সবই সহ্য হয়ে যায়! ভিক্ষে করেই সে ঘরে চাট্টি চাল জমাতে পেরেছে, মেজের নীচে মাটির ভাঁড়ে করে প্রায় কুড়িখানেক টাকাও রেখেছে। আরও বেশী কিছু জমলে চিকিৎসা করাবে কান দুটোর! বলা কালা যেন আর কেউ না বলতে পারে!

···দুপুর হয়ে গেল বনকাটি গ্রামেই! চালের পুটুলিটাও বেশ হয়েছে, চাষীবাসীর গাঁ, একবেলা চাট্টি ভাত কোথায় খেয়ে নিয়ে জিরিয়ে আবার বাড়ী রওনা হবে! রাত্রিতে চাট্টি ফুটিয়ে নিলেই নিশ্চিন্ত!

···বিকাল বেলাতে গাঁয়ের দিকে আসছে, পথে কুসুমের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই কেমন যেন কুণ্ঠা বোধ হয়, কাঁধে চালের পুঁটুলিটা লুকোবার জায়গা খুঁজে পায় না। হেসে কুসুম বলে—"শরীল সেরেছে লাগছে!"

ঘাড় নাড়ে বলরাম! ব্যগ্র চোখে চেয়ে থাকে কুসুমের পুরুষ্টু দেহের দিকে, শাড়ী খানা যেন গায়ে কেটে বসে রয়েছে দেহের ভাঁজে ভাঁজে!—"তুমি যেছো কোথায়?"

বলরামের কথায় আবার হেসে ফেলে কুসুম, ঠোঁটের উপর পানের লালচে ছোপ···সারা মুখখানা যেন হাসির ঝলকে ভরে ওঠে, বলে—পরের বাড়ী, কুটুমের ঘরে কি তিবাত্তির বাস করতে আছে, ঘরকে ফিরে যেছি!"

[illegible]ন কথা হোলনা, কুসুম চলে গেলো মাঠ পার বলরামকে যাবার সময় বলে যায়—"আমাদের ঘরকে যাবা কিন্তক একদিন!"

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় বলরাম! সারা মনটা তার কোন অজানা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে, কুসুম এসেছিল বোনের বাড়ী, আবার চলে গেলো, এতে বলরামের যে কোনখানে কি এসে গেলো বলরাম বুঝতে পারে না! তবু যেন মন মানে না!

···একদিন সে যাবে নদীর পারে আখক্ষেতের সীমানা পারের গাঁয়ে—কুসুমকে দেখে আসবে। কিন্তু যদি সে জানতে পারে বলরাম ভিক্ষে করে দোরে দোরে গাঁয়ে গাঁয়ে ···শিউরে ওঠে বলরাম, সারা মনটা লজ্জায় অপমানে কোনখানে যেন নেমে যায়, এ পরিচয়ে সে কুসুমদের গাঁয়ে যাবে না।

···রাত্রি নেমে আসে গাঁয়ের বুকে, নেমে আসে সুষুপ্তির আবেশ! রাতের বাতাস বাঁশ বনের মাথায় পরশ বুলিয়ে যায়।

রাতের নীরবতা মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাকে দীর্ণ হয়ে যায়। আকাশের বুকে তারার আলো···ছেঁড়া কাঁথাখানায় পড়ে রয়েছে বলরাম! সব যেন জমাট অন্ধকার, মনের মধ্যে কি যেন ভাবনার জোয়ার চলেছে। এমনি করে জীবন সে কাটাবে না! মান-সম্মান নাই, পরের দরজায় হাত পাততে সে আর পারবে না! নিজের গতর খাটিয়ে খাবে! তারপর···মনে কেমন যেন একটা নেশার ঘোর! কার দুটো উছল আঁখি তারা! একটা তৃপ্তির আবেশ!

সকাল বেলাতেই বামুন পাড়ার দিকে চলেছে বলরাম! এর মধ্যে সে ঠিক করে ফেলেছে কার কার বাড়ীতে সে কাজের চেষ্টা দেখবে! নোটন মুখুয্যের বাড়ীতে যাবে না। সে বড্ড মুখদড় লোক···কাজের বেলাতেও তেমনি টাইট; রামু ঘোষালের বাড়ীতেও নয়—বড্ড কিপ্‌টে, নিজেই পেটে খায় না, মুনিষ মাহিন্দারকেও খেতে দেয় না।

মেজ মুখুয্যেদের বাড়ীতে ঢুকতেই বৌরা তার দিকে চেয়ে থাকে, বলরাম ওদের কথার জবাব না দিয়ে সটান গিন্নীর কাছে গিয়ে হাজির হয়।

মালা জপ করছিলেন তিনি, বলরামের দিকে মুখ তুলে চাইলেন, বলরাম সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে—

একটু বিস্মিত হয়ে যান গিন্নীমা, বৌরাও এসে পড়েছে ততক্ষণে, বলরামের প্রস্তাব শুনে বৌরাও হাসতে থাকে!

"কাজ করবি তুই? হ্যারে?"

—"অ্যাঁ"…বলরামের কানে কথাটা ঠিক ঠাওর হয়নি! গিন্নীমা মালাটা হরিনামের ঝুলির মধ্যে পুরে বড়বৌমাকে ধমক দিয়ে ওঠেন…"সাত সকালে এত হেসোনা বাছা!"

বলরাম ততক্ষণে উবু হয়ে দাওয়ার নীচে বসে পড়েছে! বলে চলেছে "দুরোণে দুরোণে ভিক্ষে করে মান নষ্ট হয় গো, তুমার বাড়ীতেই একটা কাজ কম্মো কিছু দাও, দেখে লিবে ষোল আনা বাজার করব আমি!"

বড়বৌমা হেসে ফেলে—"মায়ের আমার কাঠবিড়ালী দিয়ে সমুদ্র বন্ধন হয়েছে! বলা কালা এইবার খাসপাইক হবে আর কি!"

গিন্নীমা জবাব দেন না, বলরামকে বলে ওঠেন—"থাক, বলছিস যখন! গরুবাছুরগুলোর একটু যত্ন আত্তি করিস, আর ছেলেপুলেগুলো মাঝে মাঝে ধরিস একটু! মাইনে কি লিবি?"

বলরাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়—"মাঠের কাজও পারব গুলিন!"

বলরাম খাটিয়ে মুনিষ হিসেবে পুরোপুরি স্বীকৃতি চায়।

বৃত্তি বদল করে বলরাম নিজেকে নতুন করে গড়তে লাগল! রৌদ্র জল-বৃষ্টির মধ্যে দরজায় দরজায় আর ঘুরতে হয় না! বাড়ীর মধ্যেই কাজ কর্ম…গিন্নীমাও তাকে ভালো চোখে দেখেন!—"ওকে বেশী করে ভাত দিও বৌমা, আর কাঁচাকলাইএর ডালের ঝোল অনেকখানি! দিনকতক আবাং করে তেল মেখে চান কর দিকি, তোর রাতকানা সেরে যাবে!"

…বলরাম মুখ নীচু করে থাকে, তার 'রাতকানা' রোগের খবরটাও গিন্নীমার কানে এসে গেছে।

সেদিন বড়বাবু কলকাতা থেকে আসবেন, ইষ্টিশানে কাউকে পাঠাতে লিখেছেন! গিন্নীমায়ের বলবার আগেই বলরাম রাজী হয়ে যায়—সেই যাবে! ভোর রাতে ট্রেণ, বলরাম সন্ধ্যাবেলাতেই ষ্টেশনে গিয়ে রাত কাটাবে!

সেজেগুজে বলরাম বার হোল! ধোপদুরস্ত জামা পরেছে, খারে কাচা একখানা কাপড়, কানে একটা সিকি গুঁজে পকেটে দেশলাই বিড়ি নিয়ে রওনা হোল বেলা থাকতেই। মেজ বৌ বলে ওঠে—"দেখিস, পথে যেন সন্ধ্যা হয়ে যায় না—তুই আবার রাতের বেলায় দিনপ্যাঁচা হয়ে যাস্ কিনা!" প্যাঁচা নাকি দিনে দেখতে পায় না! হাসে বলরাম!

নদীর ওপারে মাইলখানেক দূরে ইষ্টিশান! তার এপাশেই কুসুমদের গাঁ! নদীর পলিমাটিতে জায়গাটায় সোনা ফলে! নদী পার হবার সময়েই কেমন একটা অজানা আতঙ্কে বলরামের বুকটা কাঁপতে থাকে! কুসুমের নিটোল পুরুষ্ট দেহ, তার দ্যুতিমাখা চোখদুটো বার বার চোখের উপর ভেসে ওঠে। ওপারে বালির মধ্যে ছোট কুয়ো—কুড়ে-গায়ের মেয়েরা জল নিতে এসেছে, হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে ওঠে বলরাম! কাঁকালে জলের কলসি …এগিয়ে আসছে কুসুম!

সেও বিস্মিত হয়ে গেছে!—"ওই তুমি যে!" বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুসুম বলরামের দিকে! তার চেহারায় এসেছে আমূল পরিবর্তন! গায়ে মাংস লেগেছে, কাল রংএর উপর বেশ একটা জেল্লা এসেছে।

বলরামও চেয়ে রয়েছে কুসুমের দিকে, চোখে তার কি যেন একটা নেশা!—"ইষ্টিশানে যেতে হবে, বড়বাবু কাল বিয়েনে নামবে কিনা!

—"বিয়েনে নামবে ত চোপ্পরাত উখানে বসে হাপু গাইবে নাকি, ঘরকে চল!"

এগিয়ে চলেছে কুসুম, চলার ছন্দে সারা দেহ কেঁপে ওঠে, ছলকে ওঠে কলসীর জল…অমনি দোলা লাগে আর একটি মনে। দিনের আলো মুছে আসছে। নদীর বালু রেখার ওপারে অস্পষ্ট ছায়াছন্ন গ্রামসীমার মাথায় শেষ রশ্মির আভা, বন থেকে পাখীর দল কাকলিতে ভরিয়ে তুলেছে নীরব মাঠটা, মাঝে মাঝে সাড়া দেয় কুসুমের কলসীর জল…কোন অজানা কামনার ভাষায় কুসুম কি তা জানে!

—"কেউ কিছু ভাববে না?"

বলরামের কথায় ফিরে চাইল কুসুম! চোখের তারায় তার কি যেন একটা শিহরণ—"সে ভার তুমাকে লাগেনি, তুমি এসো কেনে!"

ছোটবাবুর সঙ্গে গেছে হাটে! রতনেশ্বর শিবের মন্দিরের নীচেই বট-অশ্বত্থ তেঁতুল গাছের শ্যামছায়াঘন জায়গাটার নীচে হাট বসেছে! বেগুনের বস্তাটায় হাত পুরে ভিড়ের মধ্য থেকে বেগুন বাছতে ব্যস্ত বলরাম, বেছে বুছে না নিলে সবগুলোই কানা বেগুন তুলে দেবে। আর ছোটবাবু এ হাটের বোঝেই বা কি? চট পট বেছে বেগুন গাদা করেছে, হঠাৎ একখানা হাত খপ্ করে তার হাতটাকে বাধা দেয়।

—"সব যদি ভালো গুলান তুমিই লিয়ে যাবা—ঐ কানা গুলে কে নিবেক হে, বেছোনা কিন্তুক! ধর্ম্মের দাঁড়িতে যা ওঠে লিতে হবেক?"

ধমক দিয়ে ওঠে বলরাম লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে —"তাই বলে কানা বেগুন লুব নাকি গো?"

বেগুনওয়ালী ছাড়বার পাত্রী নয়; বলে ওঠে—"রেখে দাও আমার বেগুন, ঢের বেগুন-খোর দেখেছি।" জোর করে তার হাত থেকে বেগুনগুলো কেড়ে নিতে যাবে—বেগুনওয়ালীর মুখের দিকে চাইতে দুজনেই অবাক হয়ে যায়! হাতটা ছেড়ে দেয়, কুসুম! বলরামও অবাক হয়ে যায়—"আচ্ছা পাইকের বট কিন্তুক ভাই?"

হেসে ফেলে কুসুম—"তুমিই বা কম কি!"

নরেন দূর থেকে দেখে বলরাম বেগুন কিনতে ব্যস্ত!

ছোটবাবুকে দেখিয়ে বলে বলরাম—"আমায় ছোট মনিব খুব ভালবাসে! ছোট হলে কি হবেক; এইবার কলকাতায় বড় ডাক্তোরী পাশ করবেক! ইয়ার মধ্যেই একেবারে ধন্বন্তরী!"

নরেনকে আগে ভাগে বিদেয় করে বলরাম সেদিন শেষ বেলা পর্য্যন্ত রইল! দুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসে! শীতের প্রারম্ভ, বিষ করমচা গাছে এসেছে বেগুনী ফুলের আস্তরণ। বীরবাঁধের জলে কাজল-কালো জলের ঢেউ আছড়ে পড়ে মাটিতে! কুসুম গামছায় করে মুড়ি ভিজিয়ে এনেছে—; আর পাটালি গুড়! সেদিনের বেলাটা যেন শীগগীর শীগগীর শেষ হয়ে গিয়েছিল!

হাসপাতাল থেকে আড্ডা মেরে বাড়ী ফিরতে নরেনের দেরী হয়েছিল একটু, সাইকেলে করে বাঁধের উপর দিয়ে আসছে, হঠাৎ নির্জন ঘাটের ধারে দুজনকে বসে মসগুল হয়ে মেয়েটি শূন্য ঝুড়িটাকে নামিয়ে রেখে গল্প করছে বলরামের সঙ্গে, আর মুড়ি খাচ্ছে!

সেদিন বাড়ী ফিরতে বেলাই হয়েছিল বলরামের। বড় বৌদির কথার জবাব দেয় বলরাম—"শেষ হাটে জিনিষ সস্তা হয় মাঠান! দেখ কেনে বেগুন তিন আনা সের পেলাম। হাটের দর পাঁচ আনা!"

উপর থেকে নরেন ডাক দেয়—"শুনে যা বলরাম!"

ভালবাসার প্রথম ছোঁয়া মনে যখন রং লাগায় সে প্রকাশপথ খোঁজে, মনের কাছাকাছি যারা তাদিকে না জানিয়ে পারে না—পুরুষ তার এই জয়ের কাহিনী, অন্তর জয় এবং রাজ্যজয় তখন একাকারই হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে। নরেনের কথায় সেদিনের লজ্জা কুণ্ঠা ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়, বলরাম আগাগোড়া কাহিনীটা বলে যায় নরেনকে। তার গ্রাম্য সরল মনের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শ্যামল মেয়েকে ভালোবাসার কাহিনী!

—"তোর বেগুনওয়ালী কি বলে রে?"

"উর মনেও অংএর ঘোর লেগেছে ছুটবাবু, লইলে—"

চুপকরে যায় বলরাম, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে ব্যাপ্ত হয়েছে ওর। মাথা নাড়ে নরেন—"হুঁ কঠিন রোগ তোর!"

হেসে ফেলে বলরাম—"হুঁ, ব্যাধি বটেন বইকি! সারা মনকে জারিয়ে দেয়!"

পৌষপার্ব্বণ আসতে তাই বার বার কুসুমের কথা মনে পড়ে। সেদিন হাটে কুসুম কত করে বলেছিল—দলের গাঁয়ে মেলায় যেতে! ওর নিমন্ত্রণ রাখবে সে!

মকর সংক্রান্তির দিন নদীর ধারে মেলা বসে! এক দিনের মেলা রাত্রি বেলায় সব শেষ হয়ে যায়! ছোট খাট মিষ্টি, লোহার কড়াই, কাঠের চাকি, মণিহারী দোকান আসে! আর আসে শাঁকআলু; গ্রামগ্রামান্তর থেকে নদীতে মকরের চান সেরে মেলা দেখে যায় লোকজন! বলরামের তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে! ছোটবাবুর কাছে নগদ একটা টাকাই পেয়ে যায়! মেজবৌদির কাছ থেকে বাসতেল মেখে ফর্সা জামা কাপড়, একখানা চাদর উড়িয়ে টাকা কোঁচড়ে গুঁজে বার হয় বলরাম! কাল সকালে ফিরবে!

যাত্রী ছেলেমেয়ের দল ! বলরাম মনের আনন্দে গান ধরেছে ! দূর থেকে মেলার কলরব শোনা যায়।

নদীর ধারে বট কদম গাছে ঘেরা আশ্রম, বাইরে বট মসনে যবাক্ষেতের সবুজ আস্তরণে ঢাকা নদীতীর। নতুন ফুলের রঙ্গীন আলপনা দিয়ে কে যেন পৌষলক্ষ্মীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছে ! ফাঁকা জায়গাটা আজ লোকের ভিড়ে ভরে গেছে ! কোলাহল—এক পয়সার খাগের বাঁশির সুর আর আশ্রমের কীর্ত্তনের শব্দমুখর জায়গাটায় বলরামের দুটো চোখ কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে ; জনহীন হতে থাকে নদীতীর। গাড়ীগুলো আবার ফিরে যায়, যাত্রীরা দল বেঁধে ফিরে চলেছে দূর গ্রামের দিকে ! কুকুরগুলো মিষ্টির দোকানের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজেদের অধিকার বিস্তার করবার জন্য মারামারি বাধাতে সুরু করেছে। সাঁঝের তারার আলোমাখা আলিপথটা দিয়ে এগিয়ে চলে বলরাম ! হাতে তার মেলা থেকে কেনা একশিশি নেবুতেল, তরল আলতা, কাঁচপোকার টিপ ! কুসুমকে এভাবেই তার প্রথম সম্ভাষণ !

কুসুমদের উঠানে পা দিতেই থমকে দাঁড়ায়। ক'জন লোক উঠানে বসে রয়েছে, ওপাশে বসে রয়েছে কুসুমের বাবা, কুসুম ঘরের ওদিকে কি করছে বোধহয় রান্নায় ব্যস্ত ! লোকগুলোর সঙ্গে কথা কইছিল বুড়ো, বলরামকে দেখে খুব যেন খুসী হয়েছে বলে মনে হল না। বলে ওঠে —"ওগো পিসী, তুদের গাঁয়ের লুক আইছে"

বার হয়ে আসে নিস্তারিণী, সেও মেলা দেখতে এসেছিল, দূরসম্পর্কে আত্মীয় হয় কুসুমরা, তাছাড়া একটা দরকারে কুসুমের বাবা ডেকে এনেছিল আজ ওকে ! লোকজন আসবে শুভ কাজে, বাড়ীতে প্রবীণা মেয়ের একজন দরকার ! বলরামকে দেখে নিস্তারিণী সেদিনের পটলকে মারার দৃশ্যটা একবার স্মরণ করে নিয়ে এগিয়ে আসে ! তার হাতে তখনও রয়েছে সেই প্রসাধন সামগ্রী, মনে মনে ব্যাপারটা আঁচ করে নেয় নিস্তারিণী, বলরামের পেটে পেটে এত !

বাড়ীর বাইরে এনে যে কথাগুলো বলরামকে সেদিন শোনালে নিস্তারিণী তার অর্থ অতি পরিষ্কার ! সে নাকি মাতাল দুশ্চরিত্র, পরের মেয়েকে ফুসলানোর একটি ওস্তাদ, এবং সমস্ত গুণের কথাই নিস্তারিণী ওর মুনিব বাড়ীতে গিয়ে প্রকাশ করে দেবে !

বলরাম বিশ্বাসই করতে পারে না এসব !

"এসব কিছুই বুঝতে পারি না মাসী !"

পিচ্ কেটে বলে ওঠে নিস্তারিণী—"মাসী, চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম মাটি সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরীতি ! মাসী তুর কেরে ? ইগাঁয়ে এয়েছিস মেয়েকে কুলের বার করতে। আজ বাদ কাল উর বিয়ে

জীবনে এতবড় আঘাতটা এই প্রথম পেল বলরাম ! মা বাবা যখন মারা যায় তখন বুঝবার মত কোনো ক্ষমতাই তার হয়নি।…আজ সারা মন তার হাহাকার করে ওঠে ! হাতের জিনিষগুলো যেন বোঝা হয়ে উঠেছে ! চোখের পাতা দুটো ভিজে ভারী হয়ে আসছে ! ম্যালাথেকে আসতে আসতে বারকতক হোঁচট খেলেও !

পথটার কাছে এসে কার ডাকে চমকে উঠল ! একফালি আলোতে এগিয়ে আসে মূর্ত্তিটা ! কুসুম ! কণ্ঠস্বর যেন ওরও ভারি হয়ে উঠেছে। সেও আড় থেকে নিস্তারিণীর কথাগুলো শুনেছে।

—"তুমাকে ডেকে এনে ইসব হবেক ভাবতে পারিনি !"

অপমানের জ্বালার চেয়ে আর এক জ্বালা সারা ভরিয়ে দিয়েছে বলরামের—"উরা কারা !"

—"আমার যম !" কুসুমও যেন কাঁদছে !

বলরামের হাতের জিনিষগুলোর দিকে চেয়ে বলে কুসুম—"উ সব লিয়ে আর কি করব ভাই !"

বলরামের ভাষা যোগায় না ! ছোট্ট মেয়ের মত কুসুম কাঁদছে ! দিনের বেলায় যেখানে শত শত লোক এসে আনন্দ মেলার সৃষ্টি করেছিল, নিশীথরাত্রে সেখানের মাটিতে ঝরে পড়ল দুজনের চোখের জল ; মনের অব্যক্ত ভাষা, সঞ্চিত বেদনা প্রকাশ পথ পায় ওদের চোখের জলে !

বলরামের জীবনে সঞ্চয় কিছুই নাই ! কেউ তাকে ভালবাসেনি, মা-বাবা…আত্মীয় স্বজন কারোও ভালবাসা সে পায় নি ! পেয়েছে শুধু আঘাত আর ঘৃণা। তাই কাঙ্গাল মনের পাতায় একটু স্পর্শ সারা জীবনের ঊষরতাকে সহ্য করবার সাহস দিয়েছিল। আজ কুসুম—একটু শান্ত নিবিড় স্পর্শ…সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেল ! ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শংগগাঁর, পাকা দেখা !

…রাত দুপুরে ফিরে সেদিন আর মুনিব বাড়ী গেল না নিজের ঘরে পড়ে রইল। মাথাটা ধরে এসেছে—অসহ একটা বেদনা।

নিস্তারিণী এহেন সংবাদটা পৌছে দেবার জন্য বেলাতেই পাখায় ভর করে ছুটে আসে গারে ! গিন্নী আহ্নিক সেরে উঠেছেন, বৌরা যে যার কাজে ব্যস্ত, এমন সময় নিস্তারিণী ধুলো পায়ে এসেই সুরু করে…

"কাল রেতে গিন্নীমা…তুমাকে বলতে লাজ লাগে তুমাদের ওই বলাকালা ! হেই মাগো,…উয়ার প্যাটে এতো !"

"কি হয়েছে কি ?"

—"বলছি মা—বলবার জন্যি ত পক্ষীর মত এসেছি ! মেয়েছেলের ঘর, মান ইজ্জত আছে, ইসব জানানো ভালো। মদনামেরে—"

—"স্বচক্ষে দেখলাম স্বকন্নে শুনলাম ! ছিঃ ছিঃ লাজে মরি মা—"

নিস্তারিণীর বলার ভঙ্গীতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটা সত্যিই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় !

—"আমার খুড়তুতো বুনের পিসীর মেয়ে সেই যে কুসুম। আজ বাদ কাল তার বিয়ে। ছোঁড়া গেছে হাসত্যাল আলতা ফিতে টিপ কিনে, তার সব্বোনাশ না করলেই কি লয় মা ! তুমিই হয়ার বিচার করো ! উর বাপ তুমাদের পেরজা—তার মেয়েটোকে লিয়ে ফুসলানি···"

সকাল বেলায় বলরাম একটু দেরীতেই উঠে মুনিব বাড়ীতে আসে ! এক রাতের মধ্যেই তার উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ! পায়ের আঙ্গুলটা গেছে কেটে, একটু রক্ত চাপ বেঁধে রয়েছে, চোখ মুখ বসে গেছে। গিন্নীমা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ! আড়ালে বৌরা মুখ টিপে হাসাহাসি করে !

নীরবে উঠে গেল বলরাম নরেনের ঘরের দিকে ! বৌদিদের কাছ থেকে কথাটা একটু শুনেছিল নরেন, সামনে বলরামকে দেখে তার দিকে চায় !

—কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলি, নিস্তারিণী এসে যা তা একগাদা লাগিয়ে গেল ! মদ খেয়েছিলি নাকি ?

'মদ' কথাটা জড়িয়ে যায় বলরামের ! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রি রি করে ওঠে ঘৃণায়। চোখ ঠেলে জল বার হয়ে আসে।

"সব মিছে কথা ছোটবাবু ! মদ জীবনে ছুঁইনি ! কাল বেতে গিইছিলাম কুসুমদের বাড়ী, ওর বিয়ের কথা শুনে চলে এলাম ! ইয়ার পর যদি কেউ মিছে কথা লাগায় আমার তুষ কুনখানে বল তুমি ?"

সারাদিন কাটে বলরামের কেমন একটা অস্বস্তির মাঝে ! অন্য দিন হৈ-চৈ করে বৌদের সঙ্গে বকাঝকা মুরুব্বীপণা করে বাড়ী মাথায় করত, আজ নিজের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় পায়। গিন্নীমার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না।

সন্ধ্যা বেলাতে গিন্নীমার ডাক শুনে চমকে ওঠে ! বাড়ীটা নিস্তব্ধ, নরেন কোথায় বেড়াতে গেছে। নীরবে গিন্নীমার সামনে দাঁড়াল ! বৌরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! কেমন একটা থমথমে ভাব।

"তোর মাইনে নিয়ে নে বলরাম ! অন্য জায়গায় কাজ দেখ, শরীর ত ভালই হয়েছে এইবার অন্য কোথায় খাটতে পারবি !"

কয়েকটা টাকা ফেলে দেন তিনি !

বলরামের চোখের সামনে নেমে আসে অন্ধকারের যবনিকা। মাথাটা ঘুরপাক দিচ্ছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি ধীরে ধীরে সরে যায়—অতলে নেমে যাচ্ছে সে ! হয়ত পড়েই যেতো খুঁটিটা ধরে সামলে নেয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন নির্বাক হয়ে গেছে। চোখ ঠেলে কান্না আসে ! অন্ধকারেই তার চোখ থেকে ঝরে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ! ভাঙ্গা গলায় বলে ওঠে "তুমি আমার কাছে ম্যাবতা ! সব কথা ছুটবাবু জানেন ! কি অন্যায় আমি করেছি শুন তাঁর কাছেই ! কিন্তুক সাঁঝের বেলা তুমার কাছে দিব্যি খেছি—যদি কুন অন্যায় আমি করে থাকি চোখ-কান গতর সব আমার যাবেক !"

আর কথা বলতে পারে না সে ! কোন রকমে বার হয়ে গেল ! পড়ে রইল টাকা ক'টা ! গিন্নীমা মালা জপ বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে থাকেন ! অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ছোঁড়াটা !

পরদিন সকালে আর তাকে গাঁয়ে দেখা যায় নাই ! নরেন বলেছিল তার বৌদিকে—"ছোঁড়া বলত কি জান—ছুটবাবু ব্যাটা ছেলের রং লাগলে তার সমূহ বেপদ ; সব হারায় সে। আর মেয়েছেলের রং লাগলে চোখের জলে ধুয়ে মুছে আবার ঘর পাতে লোতন করে !"

লাভ হয়েছে নিস্তারিণীর ! বলরামের পরিত্যক্ত ঘরখানা ধুয়ে মুছে বেড়া দিয়ে নিজেই দখল করেছে। সেদিন নতুন বৌ জামাই এনে রাজা ঠাকুরদের বাড়ীতে পেন্নাম করতে নিয়ে আসে ! নরেন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কুসুমকে দেখে, বলরামের কথা মনে পড়ে—সেই হাটের মেয়েটিই ! নিটোল পুরুষ্টু গড়ন, শাড়ী সিন্দুরে মানিয়েছে চমৎকার ! মেজবৌ আড়ালে হাসে—"ঠাকুরপো, তোমার বলরামের নজর ছিল ভালই !"

'চমকে ওঠে কুসুম—বলরামের ঘরেই তারা স্বামী-স্ত্রীতে রাত্রিবাস করবে। ঘরখানাকে আর চেনা যায় না, তবুও কুসুমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহুদিনের একটা ঘটনা, সেই রোগজীর্ণ বলরামের মুখখানা। পরশমণির ছোঁয়া লেগে কেমন করে সে বদলাল ! ঝলমলে স্বাস্থ্য ভর যোয়ান মরদ···! কিন্তু তার জন্যই আজ সে বিবাগী—সে সংবাদও কুসুমের মনে পৌঁছে গেছে ! হাহাকার করে ওঠে সারামন ! অজ্ঞাতেই ঝরে পড়ে দু-ফোঁটা অশ্রু বলরামের ভিটেতে ! সে খবর বলরামের অজানাই রয়ে গেল ! তার খবরও গ্রামের কেউ আর জানে না।

বঙ্গীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশে অবিলম্বে একটী পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

একদিন এই বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তপস্বিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ নিখিল বিশ্বে ভারতের ওজস্বিনী বাণী প্রচার করতে গিয়ে সংস্কৃত-বিপ্লাবিত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মঠে মঠে, গৃহে গৃহে, প্রতি শিক্ষায়তনে নিবিড়ভাবে সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারই ছিল তাঁর প্রাণের কথা। তাঁর সেই মহতী বাণী: "Sanskritize India, and the whole miracle will be there" "ভারতকে সংস্কৃতময় করে তুলুন, তা হ'লেই সর্বসিদ্ধি লাভ হবে,"—ভারতের মর্মকথা। এই বঙ্গদেশই ভারতের সর্বশুভ জন-আন্দোলনের জননী। একটী পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে' সংস্কৃতকে পূর্ণতর রূপ দেওয়ার পবিত্রতম গণ-আন্দোলন ও জন-প্রগতির হোতৃরূপে বঙ্গদেশ পুনরায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি অবতীর্ণ হয়েও, তার অদম্য প্রাণশক্তি ও সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য, আজ যে ভারতের সর্বপ্রথম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তা সর্বদিক থেকেই অতি ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত হয়েছে, তা' নিঃসন্দেহ।

বাঙ্গালী মাত্রেরই ধমনীতে ধমনীতে সংস্কৃতের প্রতি আসক্তি স্রোত প্রবাহিত। এই বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহোদয়গণ নিখিল ভারতের সর্বত্র বিজয়মুকুট পরিহিত হয়ে বিচরণ করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বিভাগের শ্রেষ্ঠ মনস্বিগণ এই বঙ্গদেশেই জন্মপরিগ্রহ করে' বঙ্গজননীর অশেষ জ্ঞানগৌরবমহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে গেছেন। দর্শনে সাংখ্যকার মহামুনি কপিল, কাব্যে জয়দেব, ছন্দে গঙ্গাদাস, অলঙ্কারে কবিকর্ণপুর ও শ্রীরূপ গোস্বামী, ব্যাকরণে কাশিকাকার বামনাদিত্য, মীমাংসা দর্শনে তৌতাতিতমততিলককার, ভবদেব ভট্ট ও পালিক ভট্ট, আয়ুর্বেদে ভট্টার হরিচন্দ্র, চক্রপাণি দত্ত, শিবদাস সেন ও ... সেন, বৈশেষিক দর্শনে শ্রীধরদাস, বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বঙ্গমাতার পুণ্যশ্লোক সন্তানদের তুলনা জগতে নেই। এরূপে বৈদিক যুগের বাঙালী ঋষি দীর্ঘতমার যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার নিরন্তর প্রবাহ বঙ্গদেশকে চির-সরস, চির-পবিত্র পুণ্যস্থলে পরিণত করেছে। সুজলা সুফলা বঙ্গজননীর অঙ্গস্থল প্লাবিত করে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যেমন নিরন্তর কল্যাণপ্রবাহে প্রবাহিত, সংস্কৃত শিক্ষা-স্রোত, বাণীর আশীর্বাদ-স্রোতও ঠিক তেমনি ... আবহমানকাল বঙ্গে অশেষ শুভ বহন করে এনেছে। সেজন্য সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের মহাব্রতে যে বঙ্গদেশবাসীরাই সর্বপ্রথম অগ্রণী হবেন, তা' আর আশ্চর্যের বিষয় কি?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে: কলিকাতা মহানগরীতে প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে, পুনরায় আরেকটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগিতা কি? তার আমরা বল্‌ব: তার উপযোগিতা অনেক। ইয়োরোপীয় পরিচালিত, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় যতই বৃহৎ হোক্ না কেন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও আমাদের সনাতন সংস্কৃত শিক্ষাদান সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমতঃ এই শিক্ষাপদ্ধতির একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এই যে, এটা, আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, সম্পূর্ণ residential আবাসিক। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাবলম্বী ছাত্র শিক্ষালাভের সময়ে গুরুগৃহেই অবস্থান করবেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি Residential College বা Universityর অত্যাবশ্যকতার আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু ভারতের সংস্কৃতশিক্ষক পণ্ডিত সেই তথ্যটী আবিষ্কার করেন মানবসভ্যতার প্রথম উষাগমে এবং শত ঝড়-ঝঞ্ঝা বিপ্লবের মধ্যেও তাঁরা আজও সেই ধারাটী অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছেন, যা' আজও কলিকাতা বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন সম্ভবপর হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সনাতন শিক্ষাদানপদ্ধতির আরেকটী শ্রেষ্ঠ হ'ল গুরুশিষ্যের অতি নিকট, অতি মধুর, অচ্ছেদ্য প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক। আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, গুরুদেব এই বলে ছাত্র শিষ্যকে গ্রহণ করেন—

"প্রাণানাং গ্রন্থিরসি ন মা বিস্রংসঃ। ব্রহ্মবর্চসমসি ব্রহ্মবর্চসায় ত্বা ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। পুষ্টিরসি পুষ্টিং ময়ি ধেহি।"

"তুমিই আমার প্রাণের গ্রন্থি, আমাকে পরিত্যাগ করো না। আমার ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মতেজ লাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করি। আমার বল, বললাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করি। তুমিই পুষ্টি, পুষ্টিলাভের জন্য তোমাকে গ্রহণ করি।"

প্রাণের এই আকর্ষণ কলিকাতা বা অন্য কোনো বিশ্ব-শিক্ষাপদ্ধতিতে কোথায়? প্রাণের চেয়েও, পুত্রের চেয়েও আদরে শিষ্যপরিপালন, অনাহারে—অনিদ্রায়, প্রাণপণ করে শিক্ষাদান—এই সমুন্নত আদর্শ বর্তমান পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়?

তৃতীয়তঃ এই শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অর্থের সম্পর্কশূন্য Free Education। ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্য অনুসারেই জ্ঞান বিদ্যা ক্রয়বিক্রয়ের বস্তু নয়। একপক্ষে, গুরু কোনোদিন অর্থের জন্য শিষ্যের নিকট জ্ঞানদান করেন না। অপরপক্ষে, মাসিক

বিনিময়েই মাত্র শিষ্য গুরুর কাছ থেকে জ্ঞানশিক্ষা 'দাবী করতে পারেন না। শিষ্যের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সাধনা ও তপস্যায় তুষ্ট হয়েই কেবল গুরু স্বেচ্ছায়, বিনামূল্যে, অকাতরে তাঁকে অপূর্ব জ্ঞানবিজ্ঞানদানে ধন্য করেন। এই মহান্ আদর্শ—জ্ঞানলাভ যে বহু তপস্যার ধন, মাত্র কয়েকটী মূল্যলভ্য নয়—এই অপূর্ব আদর্শ বর্তমান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়? বারো টাকা মাসিক মাহিনাদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত যে বিদ্যা, তার আদর্শ বারো মাসের পর আরেক বারো মাস আসতে না আসতেই চিরতরে লোপ পেয়ে যায়। তার প্রমাণ, স্কুল কলেজে থাকতে থাকতেই গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্কশূন্যতা ভীমবিক্রমে ধর্মঘট প্রভৃতির আকারে কঠোর রূপ ধারণ করে।

চতুর্থতঃ, কেবল অর্থদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত বিদ্যা অর্থার্জনেই চিত্তকে সর্বথা ব্যাপৃত রাখে, গুরুসেবা, জনসেবা, দেশসেবায় ছাত্রদের তেমন ভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বোধিত করে না। কিন্তু আমাদের এই সনাতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ সমাপ্ত করে, ছাত্রের প্রত্যাবর্তনের সময়ে, সমাবর্তন কালে গুরু শিষ্যকে এতদিনের শিক্ষার সার্থকতা কোথায়, তা' অতি সহজ ভাবে বুঝিয়ে বল্‌ছেন—

"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

"এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ।"

"সত্য বলবে। ধর্মাচরণ করবে। শাস্ত্রপাঠে অবহেলা করবে না। সত্য থেকে বিচলিত হবে না। ধর্ম থেকে বিচলিত হবে না। মঙ্গল থেকে বিচলিত হবে না।

"মাতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে। পিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে। আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবে।"

"শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে না। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে দান করবে। লজ্জা ও বিনয়ের সঙ্গে দান করবে। ধর্ম ভয়ের সঙ্গে দান করবে। জ্ঞানের সঙ্গে দান করবে।"

"এই আদেশ। এই উপদেশ। এই হল বেদরহস্য বা বেদার্থ।"

সত্য ও সেবার এই মহিমময় আদর্শ যে বর্তমান ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারছে না, তার অসংখ্য প্রমাণ ত আমরা চারিদিকে তাকিয়েই পাচ্ছি। সেজন্যই প্রাচীন রীতি অনুসারে পরিচালিত একটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য যুগোপযোগী কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এই শিক্ষায় আবশ্যক হতে পারে, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তার মধ্যেও আদর্শটী অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সেই সনাতনী আদর্শই আমাদের আদর্শ—গুরুগৃহে থেকে ছাত্রমণ্ডলী অতন্দ্রিতভাবে বিদ্যাভ্যাস করবেন, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের চরিত্রমহিমার অনুশীলনে গৌরবান্বিত হবেন, সর্বপ্রকার অসত্যাচরণ থেকে পরাঙ্মুখ হয়ে আদর্শ গৃহস্থ বা তপস্বী জীবনযাপন করবেন।

ভারতের একান্তই নিজস্ব জিনিষ, জগতে অতুলনীয় এই অপূর্ব শিক্ষাদানপ্রণালী ভারতেরই পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়গণের অনুপম স্বার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টার ফলেই আজও ধরাতল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন, সামাজিক বিপ্লব প্রভৃতির মধ্যেও তাঁরা এই সনাতন, মৃত্যুঞ্জয় আদর্শের অনির্বাণ দীপশিখাটী প্রাণ বিনিময়েও সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। সেই শাশ্বত আদর্শেরই পূর্ণতর, ব্যাপকতর, মঙ্গলতর সংহতরূপ দেবার জন্যই একটী স্বতন্ত্র সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে, একটী নূতন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—এরূপ একটী আপত্তি হয়ত এক্ষেত্রে উত্থাপিত হতে পারে। তার উত্তরে আমরা বলব যে, যদি সত্যই প্রচুর অর্থের প্রয়োজনও হয়, তা হ'লেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক পণ্ডিতমহাশয়গণের নিকট আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী যে ঋণভার সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; তারই সামান্যতম শোধ হিসাবে, সে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া আমাদের উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কোনোরূপ অর্থব্যয়েরই প্রয়োজন এক্ষেত্রে নেই। ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালে "কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন" সরকারীভাবে স্থাপিত হয় এবং ১৯৩২ সালে সেটী "বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন" এই নাম ধারণ করে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে "বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন"কে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ" এই নামে একটী স্বতন্ত্র রাজকীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সেই থেকে এই প্রতিষ্ঠানটী নামে না হলেও কাজে একটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করেছে। প্রতি বৎসর আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের প্রায় পঞ্চাশটী কেন্দ্র থেকে প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রী এই পরিষদের আদ্য, মধ্য ও তীর্থ বা উপাধি পরীক্ষা দেন। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উপাধির সম্মান প্রচুর। এই পরীক্ষার জন্য পরিষদ প্রতি বৎসর বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ, তর্ক, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, পৌরোহিত্য প্রভৃতি পঞ্চাশটী বিষয়ে ২৭০টী প্রশ্ন-পত্র প্রস্তুত করেন। এই সব পরীক্ষার জন্য উপযুক্তসংখ্যক প্রশ্ন-পত্র-কর্তা, পরীক্ষক ইত্যাদি নিয়োগ এবং পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকাপ্রণয়ন, পুস্তক নির্বাচন প্রভৃতির জন্য পরিষদের ৮টী Boards of studies আছে। প্রতি বৎসর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উপাধি দানের জন্য সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারতে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ প্রদত্ত উপাধির প্রচুর সম্মান পরিলক্ষিত হয়। পরিষদের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা স্কুল-ফাইনাল, আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার তুল্যমূল্য বলে সাধারণতঃ আজকাল মেনে নেওয়া হচ্ছে। পরিষদ নিজের পাঠ্য-তালিকা নিজেই নির্বাচন করেন। পরিষদের নিজস্ব পরিদর্শক বিভাগ আছে এবং বঙ্গদেশের প্রায় দেড় হাজার টোল এ পরিষৎ কর্তৃক সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিষদ প্রায় তিন শতের অধিক টোলে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদানও করেন। পরিষদের নিজের কার্যকরী সমিতি এবং সাধারণ পরিচালনা সমিতি আছে—যা' বিশ্ববিদ্যালয়ের Syndicate এবং Senate অনুরূপ।

উপরিলিখিত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ সম্পূর্ণ একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছেন। এটী নামে বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কিন্তু কাজ করেন একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়টীকে এখন নামেও বিশ্ববিদ্যালয় করবার এবং সেভাবে এর উপাধিসমূহের মূল্যবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং তজ্জন্য খুব অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের কোনও প্রয়োজন হবে না। পরিষদের উন্নতির জন্য যা' প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনও তাই—কারণ, এটী একটী বিশ্ববিদ্যালয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষৎকে বিশ্ববিদ্যালয় পদবীতে উন্নীত করবার অতিফলপ্রদ সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। এতে আমাদের জীবনের একটী কঠোর সাধনা জয়যুক্ত হবে—সেই জন্যই আজ শ্রীভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

। পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'বোলশুই থিয়েটার'টি সোভিয়েট-রাজ্যের সর্ব্ব-প্রধান জাতীয় রঙ্গালয় এবং বয়সেও প্রাচীন—প্রায় ১৭৬ বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান! ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উরুসভ্ নামে সে-যুগের রুশীয় রঙ্গ-জগতের বিশিষ্ট নাট্যকলা-কুশলী এক শিল্পী তৎকালীন Czar-এর অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে দেশের সেরা অভিনেতৃবৃন্দ ও রস-স্রষ্টাদের নিয়ে স্থায়ীভাবে রঙ্গাভিনয়ের বিচিত্র দল গড়ে তোলেন মস্কো সহরের বুকে। গোড়ার দিকে এ-দলের রঙ্গাভিনয়ের আসর বসতো ভোরোন্ট্সভ্ নামে মস্কোর এক বিশিষ্ট ধনীর জ্নামেন্কা ষ্ট্রীটস্থ আবাস-ভবনে। বছর চারেক এমনি ভাবে অভিনয়ের আসর জমাবার পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এঁরা মস্কোর পেট্রোভস্কী ষ্ট্রীটে নিজস্ব রঙ্গালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এ রঙ্গালয়টির অবস্থিতি ছিল মস্কোর পেট্রোভস্কী ষ্ট্রীটে; সেই কারণে রাস্তার নামানুসারে রঙ্গালয়ের নাম রাখা হয়েছিল—পেট্রোভস্কী! আজ যেখানে সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েট-রঙ্গালয় 'বোলশুই থিয়েটার' মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক সেই জায়গাটিতেই ছিল সেকালের সেই সুবিখ্যাত 'পেট্রোভস্কী' নাট্যশালা! পেট্রোভস্কী রঙ্গালয়ে সে-আমলে শুধু যে নাটক এবং গীতি-নাট্যের বিচিত্র সব পালার অভিনয় হতো, তা নয়…সেখানকার কলাকুশল-কর্ম্মীরা অপরিসীম প্রচেষ্টায় এবং অপরূপ শিক্ষাদানে দেশের বহু নবীন এবং প্রতিভাবান শিল্পীকে অভিনয়-বিদ্যায় নিপুণ ও পারদর্শী করে গড়ে তুলতেন। 'পেট্রোভস্কী' নাট্যশালায় নৃত্য-গীত এবং অভিনয়-কলায় পারদর্শী শিল্পীদের ছিল সমান আদর…তাঁরা সকলে একই রঙ্গালয়ে—একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—রস-সৃষ্টির সেবায় সবাই ছিলেন একান্তিক! পেট্রোভস্কী থিয়েটারের কুশলী শিল্পী-গোষ্ঠীর এই অভিনব একনিষ্ঠ সাধনার ফ… রুশীয় নৃত্য-গীত-অভিনয়কলার প্রভূত উন্নতি-সাধন হয়েছিল এবং … খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বাইরে দূর-বিদেশের সর্ব্বত্র! … 'ব্যালে' নৃত্য, গীতি-নাট্য 'অপেরা' এবং নাটকাভিনয়ের বি… গুণগরিমার বিশেষ সমাদর ছিল তৎকালীন বিদেশী রসিক-সমাজে… দেশের লোকের কাছেও 'পেট্রোভস্কী' থিয়েটারটি দিন-দিন ক্র… বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সুরু করেছিল—এমন সময় হঠাৎ ১৮০৫ স… এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই অভিনব নাট্য-ভবনটি … ছাই হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে! নাট্যগৃহ দগ্ধ-বিনষ্ট হলেও এ-প্রতিষ্ঠা… মঞ্চ-শিল্পীরা কিন্তু আগাগোড়াই সহরের বিভিন্ন ধনী নাট্য-কলানু… জনের সুপ্রশস্ত গৃহাঙ্গণে তাঁদের বিচিত্র নাটকাভিনয়ের … অবিচ্ছিন্নভাবে রীতিমত জমিয়ে রেখেছিলেন সুদীর্ঘ বিশ বছর ধ… অবশেষে প্রোফেসর মিখাইলভের পরিকল্পনা এবং নির্দ্দেশ অনু… ১৮২৫ সালে মস্কো সহরের বুকে নূতন ছাঁদে নির্ম্মিত হলো সুব… 'বোলশুই থিয়েটারের' সুদৃশ্য-বিরাট এই অপরূপ নাট্য-ভব… সেই দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত ওদেশের বহু-বিচিত্র নৃত্য ও গীতি-না…
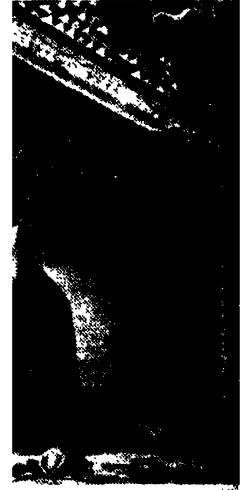
মস্কোর বোলশুই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত—রুশলান্-উদমিলা গীতি-নাট্যের একটি দৃশ্য

পালা সাড়ম্বরে ও সাফল্যে অভিনীত হয়ে আসছে এই 'বোল্‌শুই থিয়েটারের' অভিনয়-আসরে ! তৎকালীন রুশীয় 'Czar' শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট হলেও 'বোল্‌শুই থিয়েটারের' কলা-কুশল শিল্পীদের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল দেশের সাধারণ জন-গণের মনোরঞ্জন করার দিকে। সেজন্য তাঁরা দর্শক-সাধারণের কাছে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে ছলাকলা-লাস্যের ঢলা-চটকের সুলভ রস-পরিবেশনের মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে—রুশ দেশের নানা বিচিত্র লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য এবং লোক-গাথা-কাহিনীর সাহায্যে তাঁদের পালাগুলি রচনা করতেন। সে-সব পালা শিল্প-সৃষ্টি এবং রুচি-শালীনতার দিক দিয়ে দেশের সাধারণ দর্শকদের মনে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করতো বিশেষভাবে ! তা ছাড়া নাট্য-রচনায় দেশের লোক-গীতি, লোক-নৃত্য, লোক-গাথার অনুসরণ করা হতো বলে 'বোলশুই থিয়েটারের' এই সব নাট্য-শিল্পীরা তৎকালীন রুশীয় দর্শক-সাধারণের মনে জাতীয় নৃত্য-গীত-গাথার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং অপরূপ দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন অতি সহজে ! এমনি ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে ও-দেশের লোক-গাথার সুমধুর কাহিনী অবলম্বনে সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় গীতিনাট্যকার গ্লিন্‌কা ১৮৪২ সালে রচনা করেছিলেন তাঁর অমর সঙ্গীত-নাটিকা 'ইভান সুসানিন্' (Ivan Susanin)…এ-

বোলশুই থিয়েটারে অভিনীত "রুশলান্দ-লুদমিলা"—গীতি-নাট্যের একটি দৃশ্যে রুশীয় অভিনেত্রী আইরিণা মাসেলনিকোভা

স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য অপূর্ব্ব আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে—ছন্দ-গানের অপরূপ বিন্যাসে ! উক্ত গীতি-নাট্যাভিনয়ের বছর চারেক পরে রুশ-দেশের সুবিখ্যাত একটি লোক-গাথার সুমধুর কাহিনী অবলম্বনে গ্লিন্‌কা 'রুশলান্দ্ ও লুড্‌মিলা' অমর গীতি-নাট্যখানি রচনা করেন ! সেকালে 'বোল্‌শুই থিয়েটারে' এ-দুটি নাটকের পালা অভিনয় সুদীর্ঘকাল ধরে ওদেশের দর্শক-সাধারণের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। সেই থেকে আজও পর্য্যন্ত গ্লিন্‌কার রচিত এই গীতি-নাট্য দু'খানি অমর হয়ে রয়েছে রুশীয় রঙ্গালয় ও রসিক-জনের কাছে !… যুগ-যুগান্ত ধরে-বহু-বহুবার পরম সাফল্যে অভিনীত হয়ে আসা স্বত্বেও আজকের দিনে সোভিয়েট নাট্যশালাগুলিতে কিম্বা রস-পিপাসু দর্শক-সাধারণের মনে কোথাও গ্লিন্‌কার এ দুটি অমর গীতি-নাট্যের প্রতি এতটুকু বিরাগ বা সমাদরের অভাব দেখা যায় না ! দেশের সাধারণ দর্শকদের মনে লোক-গাথা অবলম্বনে রচিত এ দু'টি গীতি-নাটকের এমন অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া এবং বোলশুই থিয়েটারের শিল্পী-গোষ্ঠির এতখানি সাফল্যলাভ দেখে তৎকালীন রুশীয় Czar-এর নিজস্ব প্রাসাদ-রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবৃন্দ বিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে উঠলেন ! 'বোল্‌শুই থিয়েটারের' দলটিকে ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা অবশেষে হীন-চক্রান্ত চালালেন…এমন কি 'জার্' তাঁরা রীতিমত দলভুক্ত করলেন এই জঘন্য অভিসন্ধির ব্যাপারে। দেশের জনসাধারণের মন থেকে দেশাত্মবোধ-ভাব এবং জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি অনুরাগের ছাপ মুছে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে রুশীয় 'জারের' (Czar) অনুগত-অনুচরের দল অনন্তর বিদেশের রঙ্গালয় থেকে নানা রকম ভাড়াটে-অভিনেতৃদলকে 'বায়না' দিয়ে ডেকে আনতে লাগলেন 'বোল্‌শুই' থিয়েটারের' পাদ-প্রদীপের আলোর সামনে ! সুদূর ইতালী দেশ থেকে এলো মেরেলীর ইতালীয় অপেরার দল…এমনি আরো কত বিদেশী অভিনেতৃ-গোষ্ঠি। তাদের ভিড়ে তখন আর রুশ-দেশের নাট্য-শিল্পীদের ঠাঁই জুটতো না বিশেষ জাতীয় নাট্যশালা বোলশুই থিয়েটারের অভিনয় আসরে ! রুশীয় রঙ্গমঞ্চের এমনি দুর্দ্দশা চলেছিল প্রায় বছর দশেক ধরে ! শেষে রুশীয় নাট্যকার, গীতকার, সুর-শিল্পী অভিনেতৃবৃন্দ এবং রঙ্গ-সমালোচকের দল সবাই একজোটে তুমুল আন্দোলন চালালেন দেশের 'জার্' এবং তাঁর অনুচরদের এই হীন লজ্জাকর বৈদেশিক-পৃষ্ঠপোষকতা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে ! রুশ দেশের জাতীয় রঙ্গালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-রক্ষার এই বিপুল সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন সুরস্রষ্টা চাইকোভ্‌স্কী, ওডোয়িয়েভস্কী, কাশ্‌কিন্ এবং আরো বহু সুপ্রসিদ্ধ কলা-কুশলী শিল্পী-সমালোচকের দল ! এঁদেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অপরিসীম স্বার্থত্যাগ এবং ঐকান্তিক সাধনার ফলে বিশ্বের শিল্প-সংস্কৃতি এবং নাট্যকলার দরবারে রুশীয় নৃত্য-গীত-সঙ্গীতাভিনয়ের অপরূপ কলা-প্রতিভা আজ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে ! সুপ্রসিদ্ধ রুশ-গীতিনাট্যকার গ্লিন্‌কার 'রুশ্‌লান্দ ও লুড্‌মিলা' অপেরা ছাড়া 'বোল্‌শুই থিয়েটারের' অভিনয়-আসরে পরবর্ত্তীকালে আরো যে

সাফল্যগৌরব লাভ করে—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সুবিখ্যাত সুরস্রষ্টা চাইকোভ্‌স্কীর রচিত 'Swan Lake' (রাজহংসী-হ্রদ), 'Eugene Onegin' (ইউজেন ওনেজিন্), 'Cherevichki' (শ্চেরেভিচ্‌কী) এবং The Queen of Spedes (ইস্কাবনের বিবি)—প্রভৃতি সুর-লালিত্যে মধুর নৃত্য-নাট্যের পালাগুলি। চাইকোভ্‌স্কীর অমর-রচনাবলী ছাড়াও গ্লিন্‌কা, মুসোর্গ্‌স্কী, রিম্‌স্কী-কোর্সাকভ, দার্গোমিজ্‌স্কী, বোরোদিন প্রভৃতি সুবিখ্যাত রুশীয় গীতি-নাট্যকার ও নৃত্য-নাট্য-রচয়িতাদের অভিনব নাট্য-রচনা ও শিল্প-সৃষ্টির গুণে এবং অপরূপ কলা-নৈপুণ্যের গরিমায় বোলশ্যই থিয়েটারের প্রভূত উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল উত্তরোত্তর। শুধু এই সব কুশলী রঙ্গ-রচয়িতাদের অপরূপ প্রচেষ্টাই নয়—'বোলশ্যই থিয়েটারের' জগৎজোড়া সুখ্যাতির মূলে ছিল শালিয়াপিন্ (Chaliapin), সোবিনভ এবং নেজদানোভার মত সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় কণ্ঠ-সঙ্গীত-শিল্পীদের অভিনব সুর-সৃষ্টি প্রতিভা এবং রোজ্‌লাভ্‌লেভা, স্মর্নি, গেল্‌ৎসার, টিখোমিরভ, মোরস্কী প্রমুখ খ্যাতনামা রুশ নৃত্য-শিল্পীদের অপরূপ কলা-কৌশল নৈপুণ্য! এই সব কুশলী নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত ও অভিনয়-কলাবিশারদ শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বিচিত্র শিল্প-সৃষ্টির গুণে ইউরোপ, আমেরিকা এবং জগতের আরো বহু জায়গায় রুশীয় 'ব্যালে'-নৃত্য (Ballet) ও 'অপেরা'র বিশেষ সুনাম ছিল এবং সে-সুনাম আজ পর্য্যন্ত অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েছে! রুশীয় Czarএর শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে সারা দেশের উপর যে ব্যাপক বল্‌শেভিক-বিদ্রোহের ঝড়-আন্দোলন বয়ে গিয়েছিল—তার এলোমেলো ঝাপ্‌টায় জাতীয় নাট্যশালা 'বোলশ্যই থিয়েটারের' শিল্প-সাধনার সাময়িক-ব্যাঘাত ঘটলেও রস-সৃষ্টির প্রগতি-অভিযানে বিরাট কোনো বাধা-বিপর্য্যয় অভিনয়-কলার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি! সোভিয়েট আমলের গোড়া থেকেই 'বোলশ্যই থিয়েটার' জাতীয় নাট্যশালা হিসাবেই বিশেষ ঐতিহ্য সম্মান লাভ করে আসছে—রাষ্ট্রের সরকারী এবং বেসরকারী দর্শক-সমাজে দেশের সাংস্কৃতিক ও নৃত্য-সঙ্গীত-নাট্যকলাভিনয়ের অন্যতম পীঠস্থান হলো মস্কোর এই বিরাট রঙ্গালয়টি। রুশীয় 'Czar'-আমলে রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মস্কোর 'বোলশ্যই থিয়েটারে'—দেশের সাধারণ প্রজার অবাধ প্রবেশাধিকার মিলতো না—রাজা এবং রাজ-অমাত্যদের কড়া-আদেশে, কিন্তু সোভিয়েট ব্যবস্থায় এ-রীতির আমূল রদ-বদল ঘটলো। জাতীয় রঙ্গালয় 'বোলশ্যই থিয়েটার'-এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো দেশের সমস্ত প্রজা-সাধারণের জন্য···চাষী, মজুর, কুলী-কামার সবাইকার প্রবেশাধিকার মিলছে আজ এই সোভিয়েট রঙ্গালয়ের অপরূপ অভিনয় আসরে!

লোকানুরঞ্জন এবং লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে উদ্বোধিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশানুসারে 'বোলশ্যই থিয়েটারে ওদেশের বহু প্রতিভাবান নাট্য-রচয়িতা এবং নৃত্য সঙ্গীত নাট্যশিল্পীদের অপরূপ শিল্প-সৃষ্টির বিকাশ সাড়ম্বরে এবং সাফল্যগৌরবে অভিনীত হয়ে আসছে এ-যাবৎকাল। সোভিয়েট-আমলে যে সব নাট্যাভিনয় দেশ-বিদেশের রসিক-সমাজে বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, এ-প্রসঙ্গে তাদের কয়েকটির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় সুর-স্রষ্টা গ্লিয়েরের রচিত 'Red Poppy', 'The Bronze Horseman,' এবং আসাফিয়েভ্ রচিত 'Flames of Paris,' 'The Fountain of Bakhchisarai', 'Prisoner of the Caucasus' প্রভৃতি শিল্প-কলা-লালিত্যে ও ছন্দ-মাধুর্য্যে মধুর অপরূপ নৃত্যনাট্যাভিনয়ের পালাগুলি অমর হয়ে রয়েছে ওদেশের রঙ্গালয়ের আসরে রসিক দর্শক-সাধারণের কাছে। সুবিখ্যাত রুশীয় সুর-কার প্রোকোফিয়েভ সেক্সপীয়রের অমর-নাটক অবলম্বনে 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর অপরূপ নৃত্য-নাট্য রচনা করেছিলেন—সোভিয়েট রঙ্গালয়ে সেটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে—এবং রাজ্যের অন্যান্য নাট্যশালার মত মস্কোর 'বোলশ্যই থিয়েটারে' আজও এ-নৃত্যনাট্যের অভিনয় জমে অসামান্য সাফল্য গৌরবে! এ-সব নৃত্য-নাট্যের অভিনয় ছাড়া সোভিয়েট আমলে বোলশ্যই থিয়েটারে এ-যাবৎ বহু অপরূপ প্রাচীন গীতি-নাট্যেরও পালা অভিনীত হয়েছে—নতুন-রূপাভিব্যঞ্জনায়! এগুলির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে—'Boris Gudunov', 'Khovan-shchina,' 'Sadko', 'Eugene Onegin,' 'Queen of Spades' প্রভৃতি গীতি-নাট্যের পালাগুলি। সোভিয়েট রাজ্য-পরিক্রমণকালে সে দেশের বিভিন্ন রঙ্গালয়ে এই সব বিচিত্র নৃত্য ও গীতিনাট্যের অনেকগুলির অভিনয় দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেছিল আমাদের ···সে-সব কাহিনী পরে বলবো-যথাসময়ে! (ক্রমশঃ)

স্মৃতি

সুশান্ত পাঠক

বাণী যবে ফুরায়েছে মৌনতার গভীর তিমিরে
নিরুদ্যম-হতাশায়—যায় চিন্তা সূত্র ছিঁড়ে।
কল্পনা-নিরুদ্ধ গতি—স্মৃতি যেন ছিন্ন নীলাকাশ
অন্তহীন সাধনায়—সিদ্ধি সে তো অতৃপ্ত বিলাস।

অফুরন্ত কামনার রক্তোচ্ছ্বাসে একান্ত বিহ্বল
লাঞ্ছিত জীবন কাঁদে—বেদনায় নিয়ত চঞ্চল,
অভ্রান্ত কিছুই নহে, শুধু মোর অন্তরের গান
চিরস্থির রহিয়াছে—পূর্ণ করি ব্যথাহত প্রাণ।

—হা বটে, ওটো শালবন, পশ্চিম বগলে গাঁ বটে—

—হোথা ওই—হোথা ঘর মোদের—না ভরত—

—হা হা, হোথা মোদের ঘর—

আদুরীর চোখ ছাপাইয়া জল আসিতে লাগিল—হাঁ৷ ঐখানেই তাহাদের ঘর, প্রতিবেশী, দিঘি, মাঠ, আমবন চিরসুন্দর—চিরপরিচিত। পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় আদুরী চোখ মুছিল—এই প্রিয়জন রাখিয়া তাহারা কোথায় গিয়াছিল?

আদুরী ও ভরত যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন খানিকটা বেলা হইয়াছে—তাহারা সঙ্গের বোঝা দাওয়ায় নামাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—তালপাতার ঘরে গরুগুলি তখনও দাঁড়াইয়া আছে, খাইবার কিছু নাই তাই এদিক ওদিক চাহিতেছে, ঘরে কুলুপ দেওয়া, দাওয়ায় ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছে, উঠানে আগাছা জন্মিয়াছে। ঘরের চারিপাশে পড়োবাড়ীর আবর্জ্জনা ও বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি হইছে রে আদুরী? ঘরখানাকে ইঁদুরে ফোঁপরা করলেক রে?

ভরত চারিপাশে চাহিয়া গরুগুলির নিকটবর্ত্তী হইল, গাভীটির গায়ে হাত দিতেই সে ভরতের হাতখানা চাটিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল—আদুরী তু দেখ হেথা। মুংলী কেমন চিন্‌লেক—খড় নাই রে?

গরুগুলির গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া ভরত ফিরিয়া আসিল। তাহার বাড়ীর এই জীর্ণ-ভগ্নদশা, সর্ব্বাঙ্গের বিষণ্ণতা তাহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ঘর ছেড়ে আর যাবেক নাই—কি হইছে রে? কি হইছে—দেখছিস্—

আদুরীও ব্যথিত হইয়াছিল, কত শ্রমে যত্নে সে ঘর নিকাইয়া, উঠান নিকাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত তাহা এত শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। সেও প্রতিধ্বনি করিল—কোথা আর যাবেক—ঘর ছাড়বেক নাই আর—

তু যা, বেটাকে ডাক্। বাবার সাথে দেখা করবেক নাই।

আদুরী নটবরের বাড়ী তথা পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ভরত উঠানের আগাছাগুলি টানিয়া তুলিতে তুলিতে দেখিল, গরুগুলি সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইতেছে। গরুগুলি কঙ্কালসার হইয়াছে। ভরত ঘরের চালা হইতে খড় টানিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিল—জলে ভিজিয়া খড়গুলি লবণাক্ত হইয়াছে, গরুগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল—

ভরত উঠানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এই তাহার স্নেহকোমল গৃহ—প্রতি ধূলিকণা তাহার কত পরিচিত, বাল্য কৈশোর যৌবনের কত স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে এই গৃহের সঙ্গে, এই জননী-স্বরূপিণী গৃহকে ত্যাগ করিয়া সে কোথায় গিয়াছিল? যেখানে গিয়াছিল সেখানে দয়া নাই মমতা নাই, ভূগর্ভের তিমির সঞ্চিত হইয়া আছে। আর আছে অর্থের মোহ ও তাহার উলঙ্গ দম্ভ। দারিদ্র্য যতই কঠোর হোক্, তবুও সে আর এই সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবে না—

ভরত অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—বসন্তসায়র জলে টলমল করিতেছে, সাদা বক কূলে বসিয়া আছে খাদ্যের আশায়। কঠিন মৃত্তিকার গর্ভে তাহারাইত সৃষ্টি করিয়াছিল ঐ জলাশয়। কর্ত্তার দয়ায় তাহারা বাঁচিয়া ছিল, গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর। ভরত মনে মনে আর একবার কহিল—এমনি পিতৃতুল্য কর্ত্তাকে রাখিয়া আর সে কোথায়ও যাইবে না।

নূতন করিয়া সংসার পাতিতে বেলা অনেক হইল।

বৈকালে ভরত কহিল—তু যাবি আদুরী, হিন্দলবনের ধারে জমিটা একবার দেখবি না?

আদুরী কহিল—চল—

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে গাইতি চালাইয়া পাথর কুড়াইয়া তবে তাহারা এই জমি চাষ করিয়াছিল—কত শ্রমে কত যত্নে। তাহারা মাঠ পার হইয়া শালবনের ধারে জমিটার আইলে আসিয়া দাঁড়াইল।

ধান হইয়াছে, মঞ্জরীগুলি ধানের ভারে অবনত শীষ। ভরত সোল্লাসে বলিয়া চলিল—দেখছিস্ আদুরী দেখছিস্—সোনা ফলতে লেগেছে রে—

—হাঁ বটে, নতুন জমি জোর করতে লেগেছে ত?

—হা—হা—

একপাশের সামান্য কিছু ধান গরুতে খাইয়া গিয়াছে।

কহিল—দেখছিস্ আহুরী গরুতে খাওয়া করালেক—শালারা—

আহুরী কোন জবাব দিল না—সে ভাবিতেছিল অন্য কথা যদি পৃথিবীর বুকে গাঁইতি চালাইতে হয়, তবে ভূগর্ভের তিমিরে গাঁইতি চালাইয়া কালি মাখিয়া কি লাভ। সে কহিল—গাঁইতি চালাবি ত, হেথা চালা—কয়লার কালি আর মাখবেক নাই।

ভরত কহিল—হাঁ বটে, আর ত কোথা যাওয়া করবেক না। হেথা সোনার ডাঙ্গালে সোনা ফলবেক—

প্রচুর ধান হইয়াছে, আর কয়েকদিন পরেই ধান কাটা চলিবে। তাহারা হৃষ্ট মনে ফিরিয়া আসিল। যে টাকা আছে তাহার সাহায্যে তাড়াতাড়ি ঘরখানি ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে—ধানকাটা আরম্ভ হইলে আর কিছু হইবে না।

সারদা মল্লিক রেলগাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে—

চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলার পরে সারদা তাহার বর্ণনা দিতেছিল। সারদা কহিল—প্রথমে বুঝলে মতি খুড়ো, প্রকাণ্ড একটা হাতির মত, ধোঁয়া উড়ছে। তার পিছনে বাঁধা অনেক গাড়ী, লোহার পাটির উপর দিয়ে গড় গড় করে যায়—

একজন প্রশ্ন করিল—তা হলে মাটির উপর দিয়ে চলে না? যেখান সেখান দিয়েও গরুর গাড়ীর মত যেতে পারে না?

—না, তাহ'লে চাকা বসে যাবে। পাথরের পথ, কাঠের উপরে পাটি বসানো—সায়েব বাঁশী বাজায়, তার পর গাড়ী ছাড়ে—

সারদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া রেলগাড়ীর ভঙ্গি অবলম্বনে বলিতে লাগিল—শোনো, প্রথমে করলে—হি-স্-স্,... প্প হুপ-প্ প্—তার পর হুপ্-হুপ্-হুপ্—হুপ্পপ্ এই চললো গাড়ী।

সারদা চণ্ডীমণ্ডপটা নাচিতে নাচিতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—গাড়ী কি বলে জানো?—

সকলে হাসিতেছিল। সারদা কহিল—চলে আর বলে—দাদা কোথা, দিদি কোথা, ভালবাসা যেথা সেথা।

সভাস্থলকে মাত করিয়া দিয়াছিল—সকলেই হাসিতেছি। সারদা বসিয়া পড়িয়া কহিল—হেসো না খুড়ো হেসো না। মাঠের মাঝে নগর সৃষ্টি হয়েছে, দোকান পসার লোকজন কিন্তু খাবার দফা শেষ—

ভগবতী কহিলেন—তার মানে?

—দুধ, তরকারী মাখন ঘি সব রেলে উঠে চলে যাচ্ছে। পাইকের এসে নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে দাম চড়ে যাচ্ছে। বাজারে তাদের ঠ্যালায় জিনিষ কেনাই ভার?

ভগবতী কহিলেন—বাবা, এত সর্ব্বনেশে ব্যাপার; রেল গাড়ী না এলেই ত ভাল। না হয় গরুর গাড়ী করে যাবো—

সারদা কহিল—একদিন হাটে আনাজ-পাতি কেনা গেল না। পাইকের সব এসে একধার থেকে কিনে নিয়ে গাড়ীতে উঠল। গ্রামের লোকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। এক সঙ্গে যদি দু'মণ পাঁচ মণ বিক্রি হয়, তবে কে আর বসে বসে এক সের আধ সের বিক্রি করে—বল?

—দুধ কোথায় যাচ্ছে?

—ওই বর্দ্ধমান, কলকাতা। ছানা করে নিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম সায়েবরা আজকাল খুব সন্দেশ খাচ্ছে—

ভরত আসিয়া দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ভগবতী কহিলেন—কবে এলি রে ভরত—

—আজ্ঞে কাল।

—কি করে এলি—

—কয়লার খাদে দু-মাস কয়লা কাটা করলেক ঘরখানা বাঁধা করাবেক ত?

—ঘর হবে ত?

—হাঁ কর্ত্তা, হবেক বৈ কি?

সারদা কহিল—আর কি দেখে এলি—

—সে অনেক হুজুর, রেল গাড়ী। কয়লা খাদ থেকে যেমনি ওঠা করে অমনি হুস্ হুস্ করে গাড়ীতে চলে যাওয়া করলেক—

—কোথায় যায়?

—সে মু কেমনে জানবেক কর্ত্তা—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—আবার যাবি নাকি?

—না, কর্ত্তা, হোথা আর যাবেক নাই; হেথা উপোস

কুটীর শিল্পে বেত-বাঁশের স্থান

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

দেশের দারুণ অর্থ-সঙ্কটে এমনি একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, আজিকার এই জীবন-যুদ্ধে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা বরং সর্বদিক হইতেই ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জনগণকে একেবারে দিশেহারা করিয়া ফেলিয়াছে। নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিদেশলব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমস্যা সমাধানের জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছেন—জাতীয় সরকার উচ্চতর যান্ত্রিক শিল্প হইতে কুটীরজাত শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন—মণীষীগণ ও অর্থবিদরা সঙ্কট ত্রাণের পথ খুঁজিতেছেন। তথাপি এই হাহাকার কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না।

এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করিতে হইলে আজ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদিগকে কর্মব্রত হইতে হইবে এবং ভূমিহীন দীন দরিদ্রদিগকে জীবিকার জন্য কুটীরজাত শিল্পেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ ভাবে আমাদের পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের। আমার ১১ বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তদ্বারা আংশিক সমস্যার সমাধান হইবে নিশ্চয়। তবে অনেক সময় কাঁচামাল বা উপাদানের (raw meterials) অভাবে কাজের বিঘ্ন ঘটে বা কাজ আটকাইয়া যায়। বর্তমানে যেমন তাঁত বা বয়ন শিল্পীগণ অপ্রচুর সুতা পাওয়ার দরুণ সময় সময় দুর্ভোগ ভুগিয়া থাকেন। কিন্তু আমি আজ আপনাদের নিকট যে শিল্পের বিষয় অবতারণা করিতেছি তাহার কাজ কখনো উপকরণ বা কাঁচামালের জন্য আটক রাখিতে পারিবে না। তবে এ বিষয়ে চাই গবর্ণমেন্টের পূর্ণ সহায়তা।

আপনারা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন যে দরিদ্র পর্ণকুটীরবাসীদের যেমন সামান্য মূল্যের বেত-বাঁশের তৈরী ধামা, কুলো, টুকরী, ঝুড়ি ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারিক জিনিসগুলি ছাড়া কিছুতেই চলে না ; তেমনি আবার রাজার রাজপ্রাসাদে বা বিলাসী ধনবানদের বৈঠকখানায় ঐ বেত-বাঁশের তৈরী মূল্যবান নানা প্রকার ডিজাইনের চেয়ার, ইজিচেয়ার, সোফা, কৌচ, গোলাকার, অর্দ্ধচন্দ্র মণ্ডিত, ত্রিকোণ বিশিষ্ট, চতুষ্কোণ সমন্বিত টেবিল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত না থাকিলে আভিজাত্য রক্ষা হয় না।

প্রকৃতির লীলাময় বাংলার পাহাড়-পর্বত ভিন্ন প্রতি পল্লীতে পল্লীতে বিধাতা-প্রদত্ত বেত-বাঁশের ঝোপের অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। অনন্ত মহিমাময় মহাশিল্পীকেই তাঁর অনুপম কারুকার্য্যসমন্বিত চিরসুন্দর এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সভ্য অসভ্য সমগ্র মানব হৃদয়ে শিল্পানুরাগ জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, তাই আমরা দেখিতে পাই পর্বতাশ্রিত অসভ্য জাতিবর্গের মধ্যেও প্রকৃতজ উপাদানে প্রস্তুত মনোরম শিল্পদ্রব্যাদি শিক্ষিত ও সভ্যসমাজে আদৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। অথচ এই সব দ্রব্যের উপাদানের (raw meterials) মূল্য অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের উপাদানের মূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ এবং দেশে ইহার চাহিদাও বেশ রহিয়াছে। কাজেই কুটীরজাত শিল্প মধ্যে বেত ও বাঁশের শিল্প যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বেত-বাঁশের কাজের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি

(১) দা—ছুরি, (২) ছোট করাত, (৩) হাতুড়ী (ছোট), (৪) বাটাল, (৫) মার্তুল বা screw driver (৬) ছিদ্র করার জন্য লৌহ শলক (৭) একখণ্ড লোহার পাত বা টিন একখণ্ড ১ ফুট (১১''×২২'') (৮) নানা প্রকারের ছোট বড় লৌহ nails ইত্যাদি। (৯) প্লাস বা তারকাটানী।

উপরোক্ত হাতিয়ারগুলি খরিদ বা প্রস্তুত করিতে পনর বছর পূর্বে পাঁচ টাকার অধিক খরচ পড়িত না। এ সম্পর্কে আমি বিগত ১৩৫৫ বাংলার ২২শে কার্ত্তিক রবিবার সংখ্যা "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত "বেত-বাঁশের শিল্প" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ করা খরচের একটা হিসাব প্রদান করিয়াছিলাম। বর্তমানে জিনিষের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ পাঁচ ছয়গুণ বৃদ্ধি পাইলেও ত্রিশ টাকাতেই হইয়া যাইবে মনে হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন বহু কর্মী ছিল যাহারা মাত্র ভাল একখানা 'দার' সাহায্যেই সব কাজ চালাইয়া নিত।

আমাদের দেশে নানা প্রকার বাঁশই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'নলখাই' 'মাখাল' 'সুনাবেতি' ইত্যাদি কয়প্রকার বাঁশই সাধারণত ব্যবহার হইয়া থাকে। আসামজাত রাজমুলী, বুলি, মিডংআ প্রভৃতি বাঁশ এ কার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট।

গ্রামাঞ্চলের বেতের ঝোঁপের জালি বেত, কাছাড় জেলার শিলচর করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সুনাই জালিবেত, সুন্দী, গল্লা আসামের শুকনা আইল কাপা বা আঁটি বাঁধা বেত ইত্যাদি দ্বারা সচরাচর শিল্প কার্য্য হয়। কলিকাতার কোনো কোনো স্থানে বিশেষত বড়বাজারে মালেকা বা বালাই বেত পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বেতগুলির স্বাভাবিক বর্ণ এত উজ্জ্বল যে, উক্ত বেত দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন বার্ণিশ করা হইয়াছে—বিশ্বশিল্পীর তুলির এমনি বিচিত্র অঙ্কন! এই বেতের প্রস্তুত জিনিষ বেশ একটু মোটা মূল্যেই বিক্রয় হইয়া থাকে।

পূর্বে উপাদান ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে ২০. মূলধন হইলেই চলিয়া যাইত। আমার প্রতিষ্ঠানের বেত-বাঁশের বিভাগের শত শত প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ উক্ত মূলধন খাটাইয়া পরিবারম্ভাবে ব্যবসা

চালাইয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ প্রায় সময়ই আমাদের মারফত বিক্রয় হইয়া যাইত। কখনো মজুত পড়িয়া থাকিত না। আজ পশ্চিমবঙ্গে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রাথমিক ব্যয়ই শতাধিক টাকা পড়িবে।

(ক) নানা প্রকার ডিজাইনের বাসকেট, টুরিং বাসকেট, সুটকেস, টিফিন বাসকেট, সোডাওয়াটার বোতল ক্যারিয়ার, ট্রে, রকমারি সেলাই কেস, নিটিং বাসকেট, শুধু বেতের ব্যাগ, লেডিস হেণ্ডব্যাগ, অফিস বাসকেট, ফাইল বাসকেট, ওয়েষ্ট পেপার বাসকেট, বাজার বাসকেট, ফল রাখার ঝুড়ি, দোলনা, ফুলের সাজি, মোড়া ইত্যাদি—

(খ) নানা প্রকার ডিজাইনের চেয়ার, ইজিচেয়ার, সোপা, কোচ, রকচেয়ার, হেলান চেয়ার, টেবিল, টী-পয়, আলমায়রা, সেল্ফ ইত্যাদি।

"ক" বিভাগের জিনিষগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ রহিয়াছে যাহার উপাদানের মূল্য অতি সামান্য, অথচ শিল্প-নৈপুণ্যের পারিশ্রমিক অধিক। যেমন "লেডিস হেণ্ডব্যাগ" নিটিং কেস ইত্যাদি। কাজেই যাহারা অধিক মূলধন খাটাইতে অক্ষম তাহারা এই জিনিষগুলি প্রস্তুত করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। 'খ' বিভাগের কাজ করিতে অধিক পরিমাণ বেতের প্রয়োজন পড়িবে। কেন না "গাটাম" গল্লাবেত বা ... দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। সময় সময় ভাল বাঁশ দ্বারাও এই কার্য্য ... হইয়া থাকে, তবে ইহাতে তেমন মজবুত বা স্থায়িত্ব লাভ করে না। ... এই বিভাগের কাজের উপাদানের মূল্য অত্যধিক পড়ে।

এখন শিল্পীকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইবে যাহার চাহিদা বেশী এবং প্রতিযোগিতার বাজারে সহজেই চালু হইয়া যাইতে পারে।...জিনিষগুলির উপর একটু রং বা বার্ণিশ চড়াইয়া দিলে ... সৌন্দর্য্য বেশ বৃদ্ধি পায়।—রং করার প্রণালীও অতি সহজ।

বর্ত্তমানে বেতবাঁশের শিল্পকার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কোনো কোনো ... বিদ্যালয়ে থাকিলেও ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যে তেমন ... লাভ করে নাই।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি সরকারী উদ্বাস্তু ... বিভাগ (Refugee Rehabilitation Dept.) এই বিষয়ে ... দৃষ্টিদান করেন তাহা হইলে অন্ততঃ উদ্বাস্তু কেম্পের ও উদ্বাস্তু ... এক শ্রেণীর বেকারদের কাজের একটা সুরাহা হইতে পারে। ... উদ্বাস্তু শিবিরে এমন অনেক লোক আছেন বেত চাঁচানো এবং ... প্রয়োজন মিটাইবার জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী অনেকেরই জানা ... তাহারা অতি সহজেই এই কার্য্য শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ... বাহুল্য শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু আয়ও হইবে।— ... উদ্যম ও উপযুক্ত শিক্ষাদাতার প্রয়োজন। এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের শিল্প বিভাগ (Department of Industries)ও সাহায্য করিতে পারেন।

... উল্লেখ করিয়াছি এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।—আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম প্রদেশে প্রকৃতিজাত বেত বাঁশের প্রাচুর্য্য সর্বজনবিদিত।—আসাম সরকারের সহিত আমাদের রাজ্য সরকার অতি সহজেই কাঁচা মাল (বেতবাঁশ) আমদানী ... ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারেন। এই মাল আমদানী সম্পর্কে বাষ্পীয় রেল গাড়ী, বা জাহাজ (Train-steamers) ভিন্ন বায়ুর যান মালবাহী এরোপ্লেনেও জরুরি কাজে সরবরাহ করা যাইতে পারে।

ইহাও একটী সমস্যার বিষয়। এ সম্বন্ধেও আমাদের সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে।—প্রস্তুত জিনিষ ... জন্য সরকার হইতে নানা স্থানে দোকান বা Emporium হইবে—সরকারি প্রচার বিভাগ হইতে ছায়া চিত্র এবং নানা প্রকার পোষ্টার ইত্যাদি দ্বারা প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। তদুপরি বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিদেশে মাল চালু করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। আমার অধুনা-বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা জেলার কুণ্ডা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রস্তুত বহু জিনিষ কলিকাতা চৌরঙ্গী প্লেসের বেঙ্গল ষ্টোর্স—পরিচালকবর্গ ১৯৩৪ইং মার্চ্চ মাস হইতে কিছুকাল কমিশনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—তদ্ভিন্ন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের (অবিভক্ত বাংলার) শিল্পবিভাগ হইতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে যে একটী "মিউজিয়াম" স্থাপিত করা হইয়াছিল তাহাতেও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি জিনিষ প্রদর্শনীর জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্দরুণ "মিউজিয়াম" দর্শকবৃন্দের নিকট হইতেও যথেষ্ট অর্ডার পাইয়াছিলাম। অত্যধিক চাহিদার দরুণ জিনিষ প্রায়ই মজুত থাকিত না।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন শ্রীহট্টের প্রস্তুত বেত বাঁশের জিনিষ প্রসিদ্ধ।—শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠস্থিত গ্রামবাসীরা শুধু এই বেত বাঁশের কাজ করিয়া সচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। পরিবারে ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলেই এই কাজ করিতে আনন্দ পায় এবং তজ্জন্য পরিবারের সকলেই বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। আমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভৌগলিক প্রসিদ্ধ কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয়ের বেত-বাঁশের বিভাগের শত শত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মিরা ভীষণ দুর্দিনেও এই শিল্প কার্য্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি সর্বগ্রাসী ১৩৫০ বাংলার ধ্বংসকারী মন্বন্তরের সময় সহস্র সহস্র লোক শুধু "মিলিটারী রেশন বাসকেট" প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতে গেলে বক্তব্য বিষয় দীর্ঘ হইয়া যাইবে। নতুবা আরো কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইত।

পরিশেষে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াই আমার নিবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি—আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক অব্যবহার্য্য পতিত জমী পড়িয়া রহিয়াছে—যেমন ডোবা নালা জলা-জায়গা ইত্যাদি, সেই সব স্থানে বেতের চাষ করা যাইতে পারে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই গ্রামাঞ্চলের বেত ঝোপগুলির জন্য কোন প্রকার যত্নেরই প্রয়োজন হয় না। শুধু মাঝে মাঝে বেতগুলি লম্বা হইয়া উঠিবার জন্য এক একটী বৃক্ষ থাকিলেই চলে। তিন বৎসরেই ব্যবহারোপযোগী, ভাল বেত উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে কৃষি-বিভাগের কৃষি-বিদ্‌দের উপদেশ লওয়া যাইতে পারে।

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ডাক্তার রাউফ একান্ন বৎসরের উৎসাহী বদান্য মানুষ। ছিলেন রেঙ্গুনে ভারতীয় রাজদূত, সেখান থেকে পদবৃদ্ধি হ'য়ে এসেছেন জাপানে রাজদূত হ'য়ে। তাঁকে চোখে তো দেখিই নি—এমন কি তাঁর বাঁশি পর্যন্ত শুনি নি। কিন্তু দেখা হ'তে না হ'তে তিনি এমন সহজ সরল সুরে ইন্দিরাকে ও আমাকে আপনার ক'রে নিলেন যে মনে হ'ল যেন কতদিনের আলাপী! সঙ্গে ছিল তাঁর দু'দুটি ভারতীয় সেক্রেটারী, জাপানী সারথি ও প্রকাণ্ড মোটর। সত্তর মাইল উজিয়ে এসেছেন ঐ ঠাণ্ডা রাতে আমাদের সংবর্ধনার্থে। দুদিন আগেও এখানে তুষারপাত হয়েছে—অনেক জায়গায় সে-তুষার তখনো গলে নি। কিন্তু এখানেই তাঁর সদাশয়তার শেষ নয়—তিনি এমন কথাকুশলী যে ধন্যবাদ দেবারও সুযোগ দিলেন না,

টোকিওর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির টুস্কিজি হঙ্গানজি
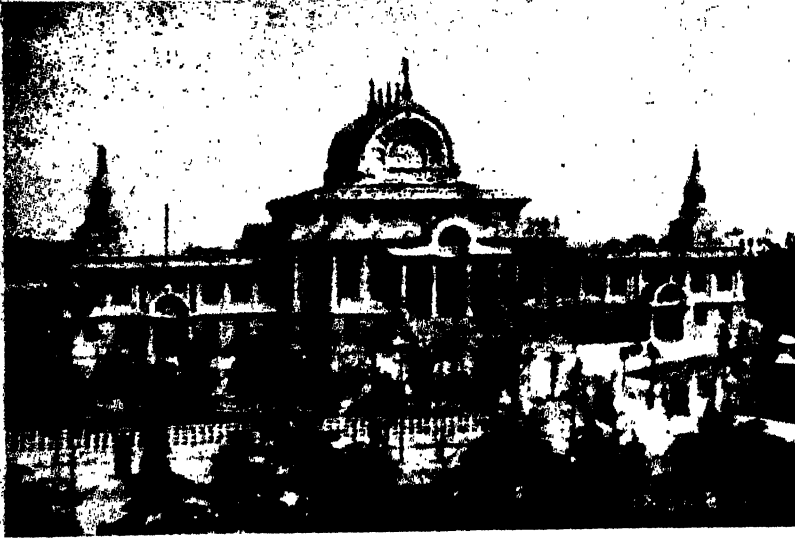
মোটরে একথায় সেকথায় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধবৎ আবিষ্ট ক'রে রাখলেন। জাপানের কত খবরই যে শুনলাম মোটরে এই প্রথম চল্লিশ মিনিটে। বিদেশে এমন স্বজন যে এত সহজে মিলতে পারে কে ভেবেছিল? অমায়িক, আলাপী অথচ একটুও অশোভন কিছুর আমেজ পেলাম না তাঁর সহৃক্রিয়া অন্তরঙ্গতায়। বললেন সলজ্জে যে শ্রীমতী রাউফ আসতে পারলেন না—হাঁপানির জন্যে। ইন্দিরা তো গ'লে গেল সমবেদনায়—সমানধর্মী ভালো, ততোধিক সমানমর্মী। ভাবলাম দেখা যাক, হাঁপানি প্রতিযোগিতায় দুজনের মধ্যে কে জেতে।

*　　　*　　　*

১৯২৭এ শেষ গিয়েছিলাম কালাপানির পারে, এ পঁচিশ বৎসরে জগৎ কতখানি বদলেছে তার প্রথম আভাস পেলাম বন্ধুবরের "দূতাবাস" (Embassy)তে পৌঁছতে না পৌঁছতে। বাইরে যখন জল পর্যন্ত বরফ হ'য়ে যাচ্ছে—ভিতরে তখন দিব্যি ধুতি চাদর ও একটি সাধারণ পিরাণ প'রে ব'সে থাকতাম। এ-অতিরঞ্জন নয়—ধুতি প'রে ও একটি আলোয়ান মুড়ি দিয়ে তাঁর বাড়িতে দিনের পর দিন ডিনার খেয়েছি, প্রবন্ধাদি লিখেছি, গল্পগুজব করেছি। ভারতীয় গৃহকর্তা—ভারতীয় শিল্পী—ভারতীয় ধুতি পরা চলবে না কেন শুনি? অবশ্য বাইরে যাবার সময়ে আচকান ও চোগা হ'ত—কারণ অন্দরের অবস্থা সুভদ্র হ'লে সদরে আর ঠাণ্ডা তো ভেতো নয়, পুরোদস্তুর বাঘা, ঘরের বাইরে যেতেই দেখা যায় প্রাঙ্গণে জল জ'মে বরফের পাত হ'য়ে চিক চিক করছে।

জগৎ বদলেছে বৈ কি! কই, পঁচিশ বৎসর আগে এ হেন সমভাবে উত্তাপ পরিবেশন করতে তো দেখি নি কোনো ভবনে। আমেরিকায় যাই নি, শুনেছি সেখানে ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থা। বলতে ভুলেছি মোটরে রীতিমত গরম হচ্ছিল। মোটরের আভ্যন্তরীণ তাপ প্রায় পণ্ডিচেরির গ্রীষ্মের। বাড়িয়ে বলা নয়—বন্ধুবরকে অনুরোধ করতে হ'ত রাজরথের শার্শি একটু খুলে দিতে। আপনার মনে যখন বাইরে তাপ শূন্য তখনো মোটরের ভিতর গরম হয়। বিচিত্র নয়? ধন্য ডাক্তার রাউফের রাজরথ!

অন্য দিক দিয়েও ভাবতে আনন্দ। ভারতের দুর্দশা ভাবতে আজ —বাইরে ভারতের আজ কী প্রতিপত্তি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। শোনা কথা ও চোখে দেখার মধ্যে সেই চিরন্তন প্রভেদ—Seeing is believing—বলে না সাহেব পুরাণে? ভারত যে স্বাধীন একথা সবচেয়ে সহজে উপলব্ধি করতে হ'লে ভারতের বাইরে কোনো রাজদূতের আতিথ্য-গ্রহণ গুরুর মতনই চক্ষুরুন্মীলক। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করব না—শত্রু বলবে: নিরন্নের সামনে রাজভোগ ধরলে তার এমনি চিত্তচাঞ্চল্যই হয়। না, বাইরে কিছুতেই স্বীকার করব নয় যে এতখানি গৌরব পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি। ফরাসী ভাষায় বলে parvenu, ইংরাজি ভাষায়—upstart, আমরা ...

স্বাধীন হ'য়ে উদ্ভ্রান্ত হ'লে এই ছাপ উপাধি যদি কেউ কপালে সেঁটে দেয়! কাজ কি?

* * *

ডাক্তার রাউফের শিরে কিন্তু রাজদূতের মুকুট মাত্রই শোভা পায়। সম্ভ্রান্ত অভিজাত বটে। সঙ্গে মুসলমানী আদবকায়দা। মণিকাঞ্চন সংযোগ বলে আর কাকে? আলাপী মনে প্রাণে, সাদর সর্বান্তঃকরণে, সবদিক দিয়েই একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ পার্সনালিটি। শ্রীমতী রাউফও অতি সুশীলা—সুদর্শনা। নয়টি সন্তানের জননী। ছেলেমেয়েগুলিও অতি সুশ্রী ও মন্তব্যক। মনে হ'ল যেন কর্তাদের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি দূর বিদেশে। মন দেখতে দেখতে ভরে উঠল। বিধাতার ললাটলিপি নিয়ে অনুযোগ করার আর পথ রইল না। এমন যোগাযোগ হ'য়ে গেল তো আঁতুড়ঘরে তাঁর সদয় লেখনীর করুণা বলেই।

* * *

বন্ধুবরকে বললাম: "এখানে থাকব তো মাত্র সাত আট দিন। 'সাইট সীইং' চাই না—ও বিড়ম্বনা চুটিয়েই করেছি। তবে জাপানী সংস্কৃতির কিছু চাক্ষুষ পরিচয় চাই—ছুটোছুটি না ক'রে যেটুকু পাওয়া যায় মাত্র সেইটুকু।" ডাক্তার রাউফ বললেন: "কিয়োতো, কোবে, য়োকোহামা দেখতে যাবেন?" বন্দোবস্ত—"বাধা দিয়ে বললাম: "নৈব নৈব চ—যেটুকু টোকিয়োতে দেখা যায় সেইটুকু আমাদের জন্যে বরাদ্দ করুন। একটু অলস হ'য়ে নিই এখানে। কদিন যা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে—দিল্লিতে!"

তথাস্তু। পরদিন সকালে উঠে বন্ধুবর আলাপ করিয়ে দিলেন মাধবন নায়ার ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এঁর একটু পরিচয় না দিলেই নয়—কারণ জাপানে ইনিই ছিলেন আমাদের প্রধান পথনির্দেশক তথা দোভাষী ব্যাখ্যাকার।

ইনি ত্রিবন্দ্রমবাসী—অতি সদাশয় বন্ধু। জাপানে ও চীনে পঁচিশ বৎসর কাটিয়েছেন। চমৎকার জাপানী বলেন। না বলবেন কেন—যাঁর গৃহে নিত্য স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে প্রত্যহ জাপানী ভাষায় কথা কন?

জাপানের বহু ঘরোয়া কথা এঁর কাছেই শুনলাম। যাঁর গৃহিণী জাপানী, জাপানের ঘরোয়া কথা বলবার স্বাধিকার তো তাঁরই। তাছাড়া জাপানের বাসিন্দাও তো বটে। জাপানী মার্কিণ রাজনীতির সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলেন, যা আমার অগোচর ছিল—কারণ সে সব কথা তো সংবাদপত্রে বেরোয় না। কিন্তু সে সব নাই বললাম। তাছাড়া আমি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি—জাপানের সাংস্কৃতিক দিকটাই তো আমার এলাকার মধ্যে পড়ে।

কেবল একটা কথা না ব'লেই পারছি না। নায়ার বহুদিন ছিলেন নেতাজি সুভাষের সহকারী, সহচারী—শুধু জাপানে নয় সিঙ্গাপুরেও। ইনি মনে করেন সুভাষ ইহলোকে নেই, তবে একথাও বলেন যে সুভাষের দেহান্তের যে-রটনা পাওয়া গেছে তার সাক্ষ্যমূল্য বেশি নয়।

প্রথম দিন সকালেই গেলাম রেঙ্কোজি মন্দিরে—যেখানে সুভাষের অস্থি রাখা হয়েছে। সুভাষের ছবিও সেখানে দেখলাম। কিন্তু কে যে এ-অস্থি দিয়ে গেছে তার পুরোপুরি হদিশ না কি পাওয়া যায় না—বললেন নায়ার। তবু মনটা ভ'রে উঠল, যখন জাপানী পুরোহিত দেখালেন মঞ্জুষাটি যাতে সুভাষের অস্থি সুরক্ষিত।

সেখান থেকে গেলাম মেইজি মন্দিরে। এ-মন্দিরে রাখা হয়েছে জাপানের বর্তমান সম্রাট হিরোহিতোর পিতামহের অস্থি। একটি চমৎকার জাপানী উদ্যানে এ-মন্দিরটি নির্মিত। দেখে ভালো লাগল। সেদিন রবিবার—তাই সকালে বহু জাপানী নরনারী ও শিশুর দেখা মিলল। আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই চলেছে মন্দিরে। সেখানে দেখি এক জাপানী পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছে—আর সামনে কত নরনারী ও বালক বালিকা যে প্রণামী দিয়ে নিয়মিত হাততালি দিয়ে রাজমঞ্জুষাকে অভিবাদন করছে! বলতে ভুলেছি, এরা মন্দিরে ঢুকবার আগে প্রত্যেকে মন্দিরের সামনে-রাখা একটি চৌবাচ্চার নির্মল জল থেকে হাতায় ক'রে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে তবে মন্দিরে ঢোকে। আর একটি জিনিস দেখলাম যা বিচিত্র। একটি পত্রহীন বাদন গাছের নানা শাখায় শাদা ফুল—
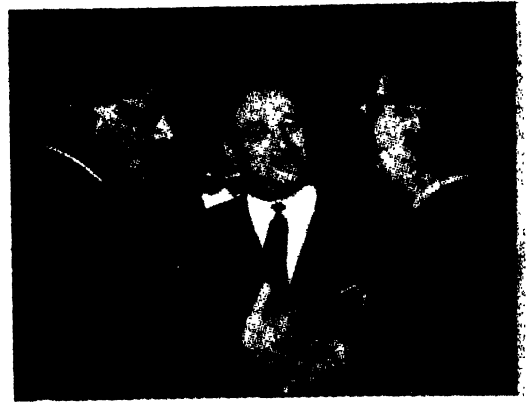
টোকিওস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ এম-এ-রাউফ, শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং টোকিওস্থ ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রদূত

পাতা নেই—ফুল! নায়ার বললেন: "ফুল নয়—নানা প্রার্থনা সহ লম্বা ফিতের মতন কাগজ প্রার্থীরা এসে বেঁধে দেয় গাছের নানা ডালে। রাজ-অস্থির প্রসাদে সে-সব প্রার্থনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনায় এরা অনেকে এখনো বিশ্বাস করে।"

জাপানের রাজপূজার কথা বইয়েই পড়েছিলাম—এবার চোখে দেখলাম। কোনো রাজার স্মৃতিসমাধিতে এযুগের শিক্ষিত আবালবৃদ্ধ বণিতাও যে এভাবে ভক্তিভরে প্রণাম করতে পারে—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। শুধু ভক্তি নয়—জাপান আজ দরিদ্র অথচ এরা প্রত্যেকেই ৩০, ৫০, ৬০, ১০০ য়েনের নোট নিবেদন করছে লক্ষ্য করলাম। সাইট-সীইং এর বর্ণনা দিতে নয়—জাপানের নরনারীর এই ব্যাপক মনোভাবের প্রমাণ মিলল, তাই এত কথা ব'লে ফেললাম।

তারপর গেলাম ওকুরা জাদুঘরে। কী সুন্দর বুদ্ধমূর্তি যে দেখলাম সেখানে! আর কত সুন্দর সুন্দর জাপানী গালার বাক্স—চি

রকমের যে অপূর্ব সুন্দর মঞ্জুষা ! ছবির তো কথাই নেই। জাপানী সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত ! জাপানী রেখারূপ নৃত্য করে, জাপানী রং ঢং কয় ! তবে ছবির আমি কিছু বুঝি না—তাই এ নিয়ে বেশি বলতে অনধিকার চর্চার অপরাধে অভিযুক্ত হব না ! কাজ নেই—জাপানী চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের চিত্রীরা বহু লিখেছেন ও জেনেছেন···তাঁরাই এ সম্বন্ধে কথা বলুন।

* * *

পরদিন ডাক্তার রাউফ নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন জাপানী পণ্ডিতকে। এঁরা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক। ইন্দিরার গান শুনে খুশি হ'য়ে উঠলেন, তবে সেটা কৌতূহলবশে না রসবোধের দরুণ বলব কী ক'রে ? এঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ জমালাম বেশি ক'রে। ইনি কথা দিলেন আমাকে একটি জাপানী বৌদ্ধমঠ দেখাবেন—যেখানে বৌদ্ধ মন্ত্রপাঠ ও সামগান হয়। আমার অনেক দিনের সাধ একটি জাপানের বৌদ্ধমঠের কিছু ঘরোয়া খবর পাওয়া : এরা কেমন ক'রে সাধনা ক'রে, কী ভাবে থাকে, কেমন এদের মুখচোখের ভাব—এই সব। অবশ্য এসব দেখাই হবে উপর উপর দেখা—তবু এর বেশি কীই বা দেখা যেতে পারে দুদিনে ? জাপানী বন্ধু বললেন—দুদিনবাদে নিজে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁর অভিভাবকতায় যে মঠটি পরিচালিত হচ্ছে সেখানে। যদি দেখে যে কোনো বর্ণনীয় ভাবোদয় হয় তবে লিখব। জাপানী অধ্যাপকদের সম্বন্ধে শুধু একটি কথা ব'লেই এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব। ভদ্রতা এদের যে শুধু মজ্জাগত তা নয়—ভদ্রতাতে এদের হৃদয় পর্যন্ত সাড়া দেয়। য়ুরোপীয় কোনো ভদ্রলোক যখন অভিবাদন করেন তখন তাঁর অভিবাদনের পিছনে হৃদয়ের তাপ থাকেনা। এদের প্রতি অভিবাদন, ভদ্রতার কৌলীন্যে এরা বিশ্বাস হারায় নি—শালীনতায় এদের সহজ আনন্দ।

টোকিওর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির টুগুকিজি হঙ্গানজির অভ্যন্তর দৃশ্য

একথা আরো ভালো ক'রে তথা নতুন ক'রে উপলব্ধি করা গেল যখন এক জাপানী ভদ্রলোক ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করলেন যেতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি "রীতিমত জাপানী নর্তকীর" নাচ দেখতে—যে নাকি জাপানের শ্রেষ্ঠা নটীদের অন্যতমা।

গেলাম বিকেল বেলা। জাপানী ঘর—সুন্দর ফ্রেম-করা মাদুরের উপরে বসলাম। সামনে উনুন, উনুনের উপরে রাখা একটি চতুষ্কোণ ট্রে-মতন। ট্রের নিচে থেকে নেমে এসেছে লেপের ঝালর। বসতে হয় মাদুরের উপরে-রাখা কুশনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে—লেপের ঝালরে আজানু মুড়ি দিয়ে। পা চমৎকার গরম থাকে—আর ব'সেও চমৎকার আরাম। অপারগ সাহেবরা যদি পা মুড়ে বসতে পারত তবে বিলেতেও সহজেই কোচ চেয়ার ছেড়ে এভাবে বসার রীতি চালু হ'য়ে যেত। কিন্তু সে অন্য কথা—যা বলছিলাম। যিনি এ-নৃত্যবিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর বাইশ বৎসরের মেয়ে নাচল কিমোনো ও ওবি প'রে, হাতে জাপানী পাখা দুলিয়ে। কতরকম ভঙ্গি সে ! বেশ মনোজ্ঞ ভঙ্গি মানব, কিন্তু কোথায় তাল ? সঙ্গে যে জাপানী গীতিসঙ্গত হ'ল, তার না আছে সুর না তাল। অধিকাংশই "ও" স্বরবর্ণে গাঁথা। সঙ্গে বাজল জাপানী সামিসেন—খানিকটা ব্যাঞ্জোর মতন—কিন্তু শুনতে একটুও ভালো নয়, আস্ত বেসুরো লাগে আমাদের কানে। জাপানী গানের সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাদের ছবি, খোদাই প্রভৃতি এত চমৎকার তাদের নৃত্যগীত কেন উন্নত হ'ল না—কে বলবে ? বোধহয় এক একটি জাতি এক একটি জমির মতন—যেখানে মাত্র দু'একটি শিল্পেরি চাষ হ'তে পারে—তার বেশি নয়। জাতিভেদকে আমরা সক্রভঙ্গে অর্ধচন্দ্র দিতে চাই, কিন্তু জগতে সংস্কৃতির গোড়াপত্তন জাতিভেদে ওরফে শ্রেণীজাত বিশেষজ্ঞদের সুদীর্ঘ তপস্যায়। আমাদের ওস্তাদ, বীণকার, খেয়ালিয়া, তবলিয়া কত যুগ যুগের সাধনার ফলে আজ এত উন্নত ! জাপানে না আছে তালের বাহার, না সুরের মাধুর্য, না নৃত্যের নিপুণ পদক্ষেপ। শুধু হাত ঘুরিয়ে আর পাখা দুলিয়ে কি নাচ হয় ? মাত্র এটুকু কৃতিত্বকে কেবল নাড়ু দেওয়া যায়—বাহবা নয়, শিরোপা তো নয়ই। তাছাড়া কী শাদা পেন্ট ! মুখচোখ ঠিক যেন হাতির দাঁতের মতন পালিশ করা শাদা দেখায় এদের প্রসাধনে। ভালো লাগে শুধু এদের বেশভূষা।

সুমি হানায়াগি নামক বিখ্যাত নর্তকীর নাচও আমাদের ভালো লাগল না। নাচে তাল না থাকা কেমন? না কবিতায় ছন্দ না থাকলে যেমন: অপটু, মিথ্যা-উচ্চাশী, নাবালক।

কিন্তু কী সুন্দর এদের অভ্যর্থনা! কী অপরূপ অভিবাদন, মিষ্ট হাসি, মধুর সম্ভাষণ! ভদ্রতা অনেকে জানে, কিন্তু ভদ্রতায় চরম মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছে এক জাপানী। সৌকুমার্য এদের বয়োয়া নামাবলী—আর এমন নামাবলী যে অতি-ব্যবহারেও মলিন হয় না, পালিশ হারায় না। কারণ—ঐ যে বললাম—ভদ্রতায় এরা বিশ্বাস করে—তার জন্তে তপস্যা করে। গিয়ে শুনলাম সুমি হানায়াগি একটি খ্যাতনাম্নী গাইশা নর্তকী। গাইশা নর্তকীদের সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন বই, প্রবন্ধাদি, লিখবার আছেও অনেক। কিন্তু সব লিখতে গেলে এ-দিনপঞ্জিকা হ'য়ে উঠবে মহাভারত। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই দাঁড়ি টানি যে গ্রীসে যেমন কোর্টেসান ছিল জাপানে তেমনি গাইশা রূপসী! এদের শেখানো হয় কথা বলতে, অতিথিদের সম্ভাষণ করতে, নৃত্যগীতে অতিথি অভ্যাগতের চিত্তরঞ্জন করতে। বলাই বেশি এ-শ্রেণীর চিত্তরঞ্জনের সমাপ্তি এইখানেই নয়—চিত্তের কোঠায় রূপসী যুবতী নারী আসতে না আসতে হ'য়ে ওঠে মোহিনী—যার ফল অনুমেয়। কাজে গাইশা নর্তকী সহজেই ধাপে ধাপে নেমে যায়—অতিথি-সৎকার হ' দাঁড়ায় তাই যার নাম না দিলেও চলে। কিন্তু তা ব'লে এদের সাধা বিলাসিনী বললে একটু বেশি বলা হবে। এদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথা রূপ ও ভাবভঙ্গির চটকে পুরুষের চিত্তরঞ্জনে বিশেষজ্ঞ হওয়া। এ সময়ে জাপানে ছিল এ একটি মান্যগণ্য প্রতিষ্ঠান। এই কথাটি বুঝলে জাপানী সংস্কৃতিতে গাইশা-নর্তকীর ঠিক মূল্য দেওয়া সম্ভব হ না। জাপানী কাগজে পড়ছিলাম গত কালই যে মিনেকিচি নাশিমোে ব'লে একজন বৃদ্ধা গাইশা নর্তকী আজ "অল জাপান ফেডারেশন গাইশা গার্ল"-এর প্রেসিডেন্ট ও সমাজে তিনি বিশেষ সম্মানিতা—মা গণ্য অভিজাতরা তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে বা গল্পালাপে অভিনন্দি করতে গৌরব বোধ করেন। এই মহিলা দুঃখ করেছেন যে জাপানে গাই নর্তকীরা পুরাকালে সৌকুমার্যের ও শালীনতার যে উচ্চ আদর্শ পো করত আধুনিক নর্তকীদের মধ্যে সে-বিবেকবুদ্ধি নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। নিয়ে আর বেশি বলার সময় নেই, সার্থকতাও না—কারণ দু'কথায় এদে সম্বন্ধে বেশি বলতে গেলে এদের স্বরূপ সম্বন্ধে উল্টো বুঝানোই হবে।

ঝরা-মুকুল

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

বাসনারে তব রূপ দিয়েছিলে
নিয়েছিলে যার দান,
আশ্রয় সে ত পেল তারি কোলে,
জাগায়েছে সেবা প্রাণ।
স্নেহ-প্রীতি-ডোরে যদি বেঁধে রাখো
কচি-কিশলয়-কলি,
শুষ্ক কখনো জেনো হবে নাকো
তোমারে যাবে না ভুলি।
কুসুম না হ'তে ঝরেছে কোরক
মুকুলে গিয়াছে খসি'
সৌরভটুকু বিলায়ে গিয়াছে
তোরি লাগি ভালবাসি।
কিসের বাঁধনে বাঁধা আছে হিয়া
কেন কাছে টেনে আনা?
মনের মুকুরে ভাসে কা'র ছায়া
সে কি নাই তোর জানা?
আঁখির আড়ালে যায় যদি চলে
কেন তবে আঁখি মোছা?

লুকায়েছ যারে প্রাণের আড়ালে
কেন তারে মিছে খোঁজা?
নীরব নিশীথে আকাশের চাঁদে
কেন বাহুপাশে চাও?
যে চাঁদে বেঁধেছ হৃদয়ের ফাঁদে
কেন খুঁজে নাহি পাও?
দূরে চলে গেলে কাছে কাছে রাখা
সে ত বেশী কিছু নয়?
যে ছবি রয়েছে স্নেহ দিয়ে ঢাকা
কেন হারাবার ভয়?
হারাও যদি বা চোখের তারায়
জেনো আছে হিয়া মাঝে,
বন্দী যে আছে প্রাণের কারায়
মুক্তি কি তারে সাজে?
যখন ক্লান্ত জীবনের শেষে
স্মৃতির দুয়ার ঠেলি'
মন-মন্দির প্রাংগণে এসে
দাঁড়াবে বেদনা ভুলি',

দেখ চেয়ে যাহা মিলাল আঁধারে আজও জেগে আছে সেত,
মন-মুকুরের বুকের মাঝারে মধ্য মণির মত !!

নবম পরিচ্ছেদ

বনপর্ব

পার্বত্য নদী যেমন সিধা একদিকে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় মোড় ঘুরিয়া সম্পূর্ণ নূতন দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তেমনি বজ্রের জীবনও এতদিন বৈচিত্র্যহীন ঋজু পথে প্রবাহিত হইবার পর অকস্মাৎ নূতন পথ ধরিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্য বজ্র নিজেও প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত সে রাজার ছেলে। সাত বছর ধরিয়া সে পিতার পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু পিতৃ-পরিচয় পাইবার পর কী করিবে এ প্রশ্ন তাহার মনে আসে নাই। কাল বর্ষণমথিত সন্ধ্যায় যখন সে মায়ের মুখে তাহার পিতার কাহিনী শুনিল, তখন নিমেষ মধ্যে তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল—সে পিতার সন্ধানে যাইবে, পিতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, মাতার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান করিবে। হয়তো তাহার অন্তরের অন্তস্তলে এই সঙ্কল্পের বীজ লুক্কায়িত ছিল, হয়তো চাতক ঠাকুর অনুভবে তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে পিতৃ-পরিচয় জানিতে দেন নাই। এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, বজ্র নিঃসঙ্গভাবে অজানিত নূতন পথে যাত্রা করিল।

পায়ে হাঁটার পক্ষে পথ অল্প নয়। গ্রামের সীমান্ত হইতে বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ হইয়াছে। তরুপাদপহীন মাঠ, তাহার দক্ষিণে বহু দূরে শ্যামায়মান অরণ্য দিক্‌চক্রকে যেন স্থূল রেখার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। মৌরী নদীর ধারা কুটিল খাতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঐ বনরেখায় মিলাইয়াছে।

বজ্র যখন বনের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। এই বন অনুমান দশ ক্রোশ গভীর, বিশাল তরুশ্রেণীর সমাবেশে অন্ধকার এবং দুর্গম। পূর্বকালে নাকি এই বনে হাতী বাস করিত; এখন হিংস্র জন্তুর মধ্যে ভালুক ও সাপের বাস। অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবজন্তুও আছে। এই বন পার হইয়া আরও একদিনের পথ হাঁটিলে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছানো যায়। মৌরীর তীর ধরিয়া চলিলে বনের সঙ্কট এড়াইতে পারা যায়; কিন্তু এই স্থান হইতে মৌরীর স্রোত ধনুকের মত পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কূল ধরিয়া চলিলে একটু ঘুর পড়ে। যাহারা শীঘ্র রাজধানীতে পৌঁছিতে চায়, তাহাদের পক্ষে বন ভেদ করিয়া যাওয়াই সুবিধা।

বজ্র এক তরুচ্ছায়ায় বসিয়া আতপতপ্ত দেহের উষ্ণতা দূর করিল। কিন্তু অধিক বিলম্ব করা চলে না, দিনের আলো থাকিতে থাকিতে জঙ্গল পার হইতে পারিলেই ভাল। সে উঠিয়া নদীতে অবতরণ করিল। হাত মুখ ধুইয়া কিছু আহার করিতে হইবে, তারপর আবার যাত্রা।

নদী হইতে তীরে ফিরিয়া বজ্র লক্ষ্য করিল, অদূরে এক বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের পাশে একজন মানুষ বসিয়া আছে। স্থির হইয়া বসিয়া আছে, একটু নড়িতেছে না, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ সতর্কতার চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া আছে।

বজ্র বিস্মিত হইল। এই নির্জন বনপ্রান্তে মানুষ কোথা হইতে আসিল, কী করিতেছে, কোথায় যাইবে? কৌতূহল-বশে বজ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মানুষটি অন্ধ। কঙ্কালসার দীর্ঘ দেহ, দেহের চর্ম রৌদ্রে পুড়িয়া খদির-বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মাথায় মুখে জটা গ্রন্থিযুক্ত রুক্ষ কেশ, কটিতে জীর্ণ কৌপীন। হাতের নড়ী পাশে রাখা রহিয়াছে। অন্ধ বজ্রের পদ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সে নড়ী শক্ত করিয়া ধরিয়া আরও সতর্ক হইয়া বসিল; একবার অধরোষ্ঠ খুলিয়া যেন কিছু বলিবার উদ্যোগ করিল, তারপর কিছু না বলিয়াই মুখ বন্ধ করিল।

বজ্র তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—'তুমি অন্ধ, এখানে কি করে এলে?'

অন্ধ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর ক্ষীণ অনিশ্চিত স্বরে বলিল—'আমার দৃষ্টি নেই, কখন কোথায় যাই বুঝতে

পারি না। তোমার পায়ের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বনের শ্বাপদ—'

বজ্র প্রশ্ন করিল—তুমি কোথায় যাবে? কোনও গন্তব্য স্থান আছে কি?'

অন্ধ দ্বিধাভরে ক্ষণেক নীরব রহিল, শেষে নড়ি নাড়িয়া বলিল—'না।'

অসহায় অন্ধের ভগ্ন-জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বজ্রের দয়া হইল। সে বলিল—'তুমি ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। আমার কাছে খাদ্য আছে। খাবে?'

অন্ধ উত্তর দিল না, বুকে চিবুক গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। বজ্র তখন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, হাত ধরিয়া বৃক্ষতলে লইয়া গেল। পুঁটুলিতে যে খাদ্য ছিল তাহা ভাগ করিয়া অর্ধেক অন্ধকে দিল, অর্ধেক নিজে লইল। অন্ধ আর সঙ্কোচ করিল না।

আহার করিতে করিতে বজ্র বলিল—'আমি কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছি. তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

অন্ধ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল—'না।'

'তবে কোথায় যাবে?'

অন্ধ আবার স্থির সতর্কতার সহিত চিন্তা করিল।

'জানিনা। কাছে কি লোকালয় নেই?'

'দক্ষিণের কথা জানিনা। উত্তরে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রাম আছে।

'কোন্ গ্রাম?'

'বেতসগ্রাম।'

অন্ধের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল, তাহার অস্থিসার দেহ সহসা কঠিন হইয়া স্থির হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ কথা কহিল না, যখন কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় অস্পষ্ট শুনাইল—'কি গ্রাম বললে?'

'বেতসগ্রাম।'

অন্ধ আর কোনও কথা বলিল না, প্রশ্ন করিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সজাগ হইয়া রহিল।

আহার সমাধা হইলে বজ্র বলিল—'আমি এবার যাব। তুমি কোথায় যেতে চাও তা তো বললে না।'

অন্ধ কণ্ঠস্বরে ঔদাস্য ভরিয়া বলিল—'আমার কাছে সব সমান। বেতসগ্রামেই যাই।'

'ভাল।'

বজ্র তখন অন্ধকে উত্তরমুখ করিয়া দাঁড় করাইয়া হাতে নড়ী ধরাইয়া দিল। বলিল—'এইবার সিধা চলে যাও; বাঁ দিকে বেশী যেও না, নদীতে পড়ে যাবে। এখনও অনেক বেলা আছে, চাকা ডোববার আগে গ্রামে পৌঁছতে পারবে।

অন্ধ বলিল—'তুমি বড় সৎ, বড় দয়ালু। তোমার নাম কি?'

বজ্রের একবার ইচ্ছা হইল নিজের নামের সঙ্গে নগরের পিতৃ-পরিচয়ও অন্ধকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু সে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া কেবল বলিল—'আমার নাম বজ্র।'

তারপর দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইল। কেহ কাহাকেও চিনিল না। অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া বিপরীত মুখে চলিল।

*   *   *   *   *

শীঘ্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আগ্রহে বজ্র নদীর তীর ছাড়িয়া বনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, মনস্থ করিয়াছিল, যদি দিন থাকিতে বন পার হইতে না পারি গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব। কিন্তু দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহার দিগ্‌ভ্রম হইল। জঙ্গলের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে মুক্ত স্থান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন মন্দালোকিত স্তম্ভের ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডের সারি অন্তহীন ভাবে চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে, নিবিড় পত্রাবচ্ছেদে সূর্য দেখা যায় না। বজ্র দিক্ হারাইয়া ফেলিল, দক্ষিণে যাইতেছে কি পশ্চিমে যাইতেছে, কিম্বা যেদিক হইতে আসিতেছিল সেইদিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না।

উপরন্তু বনে যে জীবজন্তু আছে তাহাও সে অনুভব করিয়াছে। উহারা যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজেরা অদৃশ্য থাকিয়া তাহার আশে পাশে ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অদূরস্থ গুল্মের মধ্যে সর্ সর্ শব্দ করিয়া কোনও প্রাণী অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছে। একবার একটা কৃষ্ণকায় রোমশ জন্তু দূরে একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অন্য গাছের আড়ালে চলিয়া গেল, আবছায়া অন্ধকারে সেটা কী জন্তু ধরা গেল না।

উহারা সকলে হিংস্র শ্বাপদ না হইতে পারে, কিন্তু কিছুই বলা যায় না। বজ্র তীরধনুক আনে নাই; পুরুষের ন্যায় ধনুষ্পাণি বেশে কর্ণসুবর্ণে অবতীর্ণ হইবার বাসনা তাহার ছিল না, কিন্তু এখন মনে হইল—আনিলেই ভাল

কি কারণে পাথরগুলাকে হুন্তমুণ্ড ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি প্রস্তর স্তূপের মধ্যে কচ্ছুর নির্জন গুহাগৃহ। এখানে অন্য কোনও মানুষের বসতি নাই।

শুষ্ক শিলাকীর্ণ ভূমি, কিন্তু পাষাণ পুঞ্জের ভিতর হইতে জলের একটি ক্ষীণ প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। এই জলধারার দুই পাশে একটু হরিদাভা, দুই চারিটি গাছ। গাছগুলি বন্য গাছ নয়; বন এই স্থানটিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে কিন্তু শিলাব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই। যে গাছ-গুলি জলধারার পাশে জন্মিয়াছে সেগুলি ফলের গাছ; কদলী, জাম্বুবা, কামরাঙা, ডালিম, শ্রীফল। তাছাড়া ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ ও কন্দ আছে, শিম্বি ও পুতিকা লতা আছে। এগুলি কচ্ছুর দুই বধূ রত্তি ও মিত্তির দ্বারা লালিত।

রত্তি ও মিত্তি দুই সতীন, কিন্তু দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা। দেখিতেও দুটিকে প্রায় একরকম, যেন এক-জোড়া সুঠাম সুন্দর হরিণশিশু। কৃষ্ণসারের ন্যায় আয়ত কোমল চক্ষু, অজিনের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণ দেহবর্ণ; দেহে অটুট নিটোল যৌবন। বেশ বাসও এক প্রকার; কটিতটে বল্কলের আচ্ছাদন, বক্ষ নিরাবরণ, গলায় গুঞ্জার মালা, চুলে সিন্দুবর্ণ বনকুসুমের নর্মভূষা।

সেদিন প্রদোষকালে রত্তি ও মিত্তি গুহার সম্মুখে জল-প্রণালীর বহমান ধারায় পা ডুবাইয়া বসিয়াছিল। আকাশে শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ ফুটি ফুটি করিতেছে, দিনের শব্দ থামিয়া গিয়াছে। রাত্রির শব্দ এখনও আরম্ভ হয় নাই। দুই শবর-যুবতী নীড়ের পাখীর মত অস্ফুট ভাষণে দুটি একটি কথা বলিতেছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া বনের কিনারায় সঞ্চরণ করিতেছিল। কচ্ছুর ফিরিবার সময় হইয়াছে।

বনের ভিতরে চুচুর ডাক শুনা গেল। কিন্তু চুচুর ডাক স্বাভাবিক নয়, তাহাতে উত্তেজনা ও আতঙ্কের সঙ্কেত মিশ্রিত রহিয়াছে। রত্তি ও মিত্তি চকিত সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বনের আড়াল হইতে চুচু তীরবেগে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় গৌরকান্তি যুবক কচ্ছুকে কাঁধে লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—

চুচু ছুটিতে ছুটিতে রত্তি ও মিত্তিকে দেখিয়া আবার উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। মিত্তি রত্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধনিশ্বাসকণ্ঠে বলিল—'সাপ! জাত সাপ!'

বজ্র যখন কচ্ছুকে পয়ঃপ্রণালীর পাশে নামাইল তখন কচ্ছুর জ্ঞান নাই। বজ্রও এই এক ক্রোশ কণ্টকাকীর্ণ শিলাকর্কশভূমি কচ্ছুকে বহন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, পথে কোথাও বিশ্রাম করে নাই; তাহার সংজ্ঞাও লুপ্তপ্রায়। সে কচ্ছুর পাশে বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক তালু হইতে কোনও প্রকারে শব্দ উচ্চারণ করিল—'সাপ—সাপে কামড়েছে।'

এ সংবাদ রত্তি মিত্তির কাছে নূতন নয়, চুচুর ডাক হইতে পূর্বেই তাহারা জানিয়াছিল। কুকুরের ডাক শবর শবরীর কাছে যে বার্তা বহন করে সভ্য মানুষের কাছে তাহা দুর্বোধ্য।

রত্তি ও মিত্তি বৃথা বিলাপ করিল না, বজ্রের পানেও ফিরিয়া চাহিল না; নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত কচ্ছুর পরিচর্যা আরম্ভ করিল। কচ্ছুর চোখের পাতা তুলিয়া দেখিল, পায়ের অঙ্গুষ্ঠে সাপের দাঁতের দাগ পরীক্ষা করিল, ধরাধরি করিয়া তাহাকে পয়ঃপ্রণালীর অগভীর জলে শোয়াইয়া দিল। তারপর মিত্তি হরিণীর মত ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে দিনের দীপ্তি নিঃশেষ হইয়াছে, চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। রত্তি অন্তর্জলশয়ান কচ্ছুর পা হইতে ধনুকের ছিলা খুলিয়া ফেলিল, কচ্ছুর অঙ্গুষ্ঠে অধর সংযুক্ত করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিতে লাগিল। কচ্ছু নড়িল না, অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

মিত্তি ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে কয়েকটা লতা-পাতা ও শিকড় বাকড়। সে রত্তিকে ডাক দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল এবং আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। গুহার এক কোণে ভস্মাচ্ছাদনের অন্তরালে অঙ্গার ছিল, মিত্তি ফুঁ দিয়া তাহা জ্বালাইয়া তুলিল। রত্তি কচ্ছুর দেহ অবলীলাক্রমে জল হইতে তুলিয়া লইয়া গুহায় প্রবেশ করিল।

বজ্র বাহিরে আসিয়া দেখিতে লাগিল। আজ সমস্ত দিনের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাহার বজ্রকঠিন দেহও গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কচ্ছুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেটুকু তাহার সাধ্য তাহা সে করিয়াছে; কিন্তু সে সাপের মন্ত্রৌষধি জানেনা, আর কি করিতে পারে? এখন কচ্ছুর ভাগ্য, আর রত্তি-মিত্তির গূঢ়বিদ্যার শক্তি। বজ্র জলস্রোতের পাশে অবনত হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিল, তারপর শিলাপটের উপর শয়ন করিল।

গুহার মধ্যে কচ্ছুর মুষ্টিযোগ আরম্ভ হইয়াছে। মিত্তি পাতা ও শিকড় চিবাইয়া অঙ্গুষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছে, রত্তি ময়ূরের পালক আগুনে পুড়াইয়া কচ্ছুর নাকের কাছে ধরিতেছে। আর সেই সঙ্গে উভয়ে অস্ফুটকণ্ঠে অবিশ্রাম মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এই দৃশ্য গুহামুখ হইতে দেখিতে দেখিতে বজ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

বনপ্রান্তে এক পাল শৃগালের যাম-ঘোষণার শব্দে বজ্র জাগিয়া উঠিল। রাত্রির মধ্যযাম। চন্দ্র অস্ত যাইতেছে।

গুহার মধ্যে রক্তাভ আগুন জ্বলিতেছে। বজ্র উঠিয়া দেখিল কচ্ছু তেমনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই পাশে বসিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতেছে ও গূঢ়স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। বজ্র জিজ্ঞাসুনেত্রে রত্তি মিত্তির পানে চাহিল; কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব তন্ময়-সমাহিত। বজ্র প্রশ্ন করিতে পারিল না, কচ্ছুর জীবনের আশা আছে কি না? সে বাহিরে আসিয়া আবার শয়ন করিল।

এবার যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন চারিদিকে পাখীর কলরব, সূর্যোদয় হইতেছে। বজ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রত্তি ও মিত্তি তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নিকষ অঙ্গে নবারুণের সোনালী কষ্ লাগিয়াছে; চোখে মুখে ক্লান্তির জড়িমা। রত্তির হাতে পত্রপুটে হরিণের মাংস, মিত্তির দুই হাতে দুটি পাকা ডালিম।

ধড়মড় করিয়া বজ্র উঠিয়া বসিল—'কচ্ছু—?'

উভয়ে ক্লান্তিশিথিল কণ্ঠে হাসিল।

'বাঁচবে।'

বজ্র দ্রুত উঠিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। দেখিল, কচ্ছুর জ্ঞান হইয়াছে, সে শুইয়া শুইয়া মিটিমিটি চাহিতেছে। এই এক রাত্রে তাহার দেহ শুকাইয়া প্রেতাকৃতি হইয়া গিয়াছে; গালের চর্ম কুঞ্চিত, চক্ষু কোটরগত। বজ্র তাহার পাশে নতজানু হইয়া আনন্দবিগলিত স্বরে ডাকিল—'কচ্ছু!'

কচ্ছু শীর্ণ কম্পমান হাত দুটি তুলিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া লইল, স্খলিতস্বরে বলিল—'ভাই, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

বজ্র বলিল—না, না, তোমার বৌরা তোমাকে বাঁচিয়েছে। কাঁধে তুলে এনেছিলে তাই ওরা বাঁচাতে পারল। কাল থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, আমি অতিথির সেবা করতে পারলাম না। রত্তি! মিত্তি!'

রত্তি মিত্তি হরিণের মাংস ও ডালিম বজ্রের সম্মুখে রাখিল। কচ্ছু বলিল—'খাও ভাই, আমি দেখি।'

বজ্রের যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সে খাইতে বসিল। রত্তি ও মিত্তি নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কি কথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বজ্র খাইতে খাইতে কচ্ছুর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কচ্ছু যেন তাহার কতদিনের পুরানো বন্ধু; কচ্ছু যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এই তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আহার শেষে বজ্র বাহিরে গিয়া জলপান করিল। বাহিরে কিন্তু রত্তি মিত্তিকে দেখিতে পাইল না। সে ফিরিয়া আসিয়া কচ্ছুর কাছে বসিল, বলিল—'রত্তি মিত্তি কোথায় গেল? তাদের দেখলাম না!'

কচ্ছু বলিল—'বোধ হয় জঙ্গলে গেছে শিকারের খোঁজে। কাল আমি কিছু মেরে আনতে পারলাম না—'

বজ্র তখন কচ্ছুর বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'ভাই, আজ তবে আমি যাই। আমাকে কানসোনা যেতে হবে। অনেক দূরের পথ!'

কচ্ছু তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—'বন্ধু, আজকের দিনটা থাকো, যদি যেতেই হয় কাল যেও। আমি তোমার সেবা করতে পারলাম না, আমার বৌরা তোমার সেবা করুক। আমাদের সেবা না নিয়ে যদি চলে যাও, তাহলে—তাহলে—কচ্ছুর অক্ষিকোটর জলে ভরিয়া উঠিল।

'ভাল, কালই যাব।' বজ্র নির্বন্ধ করিল না। তাহার হাত-পা এখনও আড়ষ্ট হইয়া আছে, গায়ের ব্যথা মরে নাই। একদিনের বিলম্বে কী ক্ষতি হইবে?

দ্বিপ্রহরে রত্তি ও মিত্তি ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে কয়েকটি নধর বন্য কুক্কুট। তাহারা বনে ফাঁদ পাতিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়াছে।

অতঃপর কুঁকুড়ার মাংস রন্ধন হইলে সকলে একসঙ্গে

আহারান্তে বজ্র কচ্ছুর পাশে লম্বা হইল। রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই প্রান্তে আসিয়া বসিল; মিত্তি পা টিপিতে আরম্ভ করিল, রত্তি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বজ্র একটু আপত্তি করিল কিন্তু তাহারা শুনিল না। তখন বজ্র পরম আরামে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রত্তি ও মিত্তি রাত্রে ঘুমায় নাই, তাহারাও অল্পকাল মধ্যে বজ্রের দুই প্রান্তে ঢুলিয়া শোইয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে বজ্র যখন জাগিয়া উঠিল তখন তাহার দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়াছে। কচ্ছুও শরীরে অনেকটা বল পাইয়াছে এবং নিজের চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়াছে। তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গুহার বাহিরে প্রস্তর পট্টের উপর বসাইয়া দিল। পশ্চিমে সূর্য তখন বনানীর শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে।

কচ্ছুর দুই পাশে তাহার দুই স্ত্রী গা ঘেঁষিয়া বসিল; বজ্র তাহাদের সম্মুখে কিছুদূরে বসিল। সকলের মুখেই প্রীতি-গদগদ্ হাসি। তাহাদের দেখিয়া বজ্র ভাবিতে লাগিল, কী মধুর ইহাদের জীবন! এই তিনটি আদিম নর-নারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালবাসা! ঈর্ষা নাই, স্বার্থ-পরতা নাই, ক্ষুদ্রতা নাই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য!

রত্তি ও মিত্তি কচ্ছুর কানের কাছে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। গানের কথাগুলি তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা জংলা সুর কখনও স্নেহে আর্দ্র, কখনও চটুল হাসিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। কচ্ছুর নবজীবন লাভে তাহারা কত সুখী হইয়াছে তাহাই যেন তাহাদের কণ্ঠের কাকলিতে প্রকাশ পাইল। গান শেষ হইলে তাহারা কচ্ছুর দুই কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরব রহিল।

শবর শবরীদের এই অকুণ্ঠ প্রণয়লীলা দেখিয়া বজ্র একটু লজ্জা পাইল, কিন্তু মনে মনে মুগ্ধও হইল। ইহারা যেন পাখীর জাত। লজ্জা জানেনা।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। কচ্ছু তখন বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'ভাই, কাল সকালে তুমি চলে যাবে। তুমি শুধু আমাদের অতিথি নয়, আমার প্রাণদাতা। আমি বনের মানুষ, কি দিয়ে তোমার পূজা করব? আমার দুই বৌ আছে, এদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে তাকে তুমি নাও, আজ রাত্রির জন্যে সে তোমার বৌ—

কচ্ছুর ইঙ্গিতে রত্তি ও মিত্তি আসিয়া বজ্রের সম্মুখে বসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মধুর হাস্য করিল। তাহাদের সরল মুখে মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহাদের সহজ প্রীতি তাহারা অর্পণ করিতে চায়, বন্ধুজনকে প্রীত করিতে চায়।

বজ্র ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। রত্তি ও মিত্তির হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদের কচ্ছুর পাশে বসাইয়া দিয়া বলিল—'কচ্ছু, তোমার বৌ তোমারই থাক, আমার দরকার নেই।'

কচ্ছু আহতস্বরে বলিল—ওদের কাউকে ভাল লাগেনা?

'দু'জনকেই ভাল লাগে। ওদের তুলনা নেই। কিন্তু—।'

বজ্র কচ্ছুর সম্মুখে বসিল। গুঞ্জার মুখ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, আবেগ-মথিত মুখ, তীব্র প্রেমতৃষ্ণা-ভরা চোখ দুটি। বজ্র গাঢ়স্বরে বলিল—আমারও বৌ আছে। তাকে গ্রামে রেখে এসেছি। অন্য বৌ আমার দরকার নেই।

বজ্রের বৌ আছে শুনিয়া রত্তি ও মিত্তি কৌতুক-কৌতূহলী চক্ষে চাহিল। কচ্ছু কিন্তু বড় নিরাশ ও মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে বজ্র কচ্ছুর নিকট বিদায় লইল। কচ্ছু আজ বেশ সুস্থ হইয়াছে কিন্তু বেশী দূর পথ হাঁটিতে পারিবে না। তাই রত্তি ও মিত্তি বজ্রকে পথ দেখাইয়া বনের প্রান্তে রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

কচ্ছু বজ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'বন্ধু, তোমার সঙ্গে আর বোধ হয় কখনও দেখা হবে না। আমি বনের মানুষ, তুমি লোকালয়ের মানুষ। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব তোমাকে ভুলব না। তুমিও আমাদের ভুলনা। যদি কোনও দিন দরকার হয়, মনে রেখো এই জঙ্গলে তোমার তিনজন বন্ধু আছে।

কচ্ছু গুহাদ্বারে চুচুকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বজ্র বাহির হইয়া পড়িল। এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে বজ্রের সহিত এই শবর-দম্পতীর ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বজ্রকে লইয়া রত্তি ও মিত্তি পূর্বদিকে চলিল। আবার বন আরম্ভ হইল; তেমনি প্রদোষ ছায়াচ্ছন্ন ঘন বনানী। তাহার মধ্যে দুই চঞ্চলা শবরযুবতী অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া চলিল।

প্রায় দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহারা এক রাজপথে আসিয়া উপনীত হইল। উত্তর দক্ষিণে পথ, তাহার অপর পারে কলোর্মিচঞ্চলা ভাগীরথী। এই রাজপথের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, উত্তরে মহাকোশল হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত ইহা ভুজঙ্গের ন্যায় বক্ররেখায় পড়িয়া আছে।

রত্তি বজ্রের হাতে একটি লতা দিয়া বাঁধা পাতার মোড়ক দিল, বলিল—'খাবার আছে—খেও। এবার ঐদিকে চলে যাও, কানসোনায় পৌছিবে।'

'আচ্ছা।' রত্তি ও মিত্তির মুখে একঝলক মিষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। তারপর তাহারা দুইটি বিচিত্র নীল প্রজা-পতির ন্যায় আবার বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আতিথেয়তায় শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্রের বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী নিরুপমা দেবী একবার তাঁর এক ব্রত উদ্‌যাপনের সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন করানোর মানসে শরৎচন্দ্রকে প্রচুর 'সিধা' পাঠিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু ঐ সঙ্গে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—'দাদা, আপনার বৌমা স্বর্গলাভের আশায় ঘুষ পাঠাচ্ছেন, গ্রহণ করবেন।'

এই সিধা ও চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লেখেন—"ভায়া, বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা কেউ নেই। আছি প্রকাশ, আমি ও রামকৃষ্ণ। দুঃখ তাঁরা কেউ ঘুষের পরিমাণটা দেখতে পেলেন না। আমরা পরমানন্দে ভোজন করবো এবং বৌমাকে সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ করবো…।"

শরৎচন্দ্রের এই যে "পরমানন্দে ভোজন" এ শুধু তাঁর মুখেই ছিল। আসলে কিন্তু ভোজনের উপর তাঁর কোনদিনই লোভ ছিল না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবরা যদি কখনো তাঁকে খাওয়ানোর জন্য প্রচুর আয়োজন করতেন, তাহ'লে তিনি খুশি না হয়ে বরং বিরক্তই হতেন। জুটে গেলে হয়ত তিনি ভাল জিনিসই খেতেন, কিন্তু তাই ব'লে বেশি আদৌ খেতেন না। এই দিক থেকে শরৎচন্দ্র ভোজন-বিলাসী হলেও অতিভোজী কখনো ছিলেন না। তিনি ছিলেন পরিমিত ও স্বল্পাহারী। তাঁর এই অল্প আহারের কথা নিয়ে রসিকতা ক'রে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়াসু,……কোনকালে আমি অম্বলের রুগি নই। এত কম খাই যে, অম্বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরী করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে, আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে—আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ীর লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব।…আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেলে—ঘরসংসার রান্নাবান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাব, ইত্যাদি কত কি। আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে। বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি।"

শরৎচন্দ্র নিজে অল্প খেতেন বটে, কিন্তু অপরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন, এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁকে খাওয়ানোর জন্যে তাঁর বাড়ীর লোকজনের যেমন ব্যস্ততার সীমা ছিল না, শরৎচন্দ্রও ঠিক তেমনি ভাবেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, যখন তাঁর বাড়ীতে কোনও অতিথি যেতেন। নিজের খাওয়ার সখ তিনি মেটাতেন, অতিথিদের খাইয়েই। পরি বন্ধুবান্ধব বা অপরিচিত কোন লোকজন তাঁর বাড়ীতে গেলে, তিনি তাঁ আপ্যায়নের কখনো কোনও ত্রুটি করতেন না।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে আসেন, তার পূর্ব্বেই তি সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। তাই তিনি দেশে ফি আসার সময় থেকেই বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা ও সাহিত্যিকরা কাছে যাতায়াত করতে থাকেন। পরে আবার একজন অপরা কথাশিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম যখন ছড়িয়ে পড়ল, দেশের নানা স্থান থেকেই তাঁর কাছে লোকের যাতায়াত আরও গেল। তখন শুধু সাহিত্যসেবীরাই তাঁর কাছে যেতেন না, বহু স সমিতি থেকেও তাঁর কাছে আহ্বান আসতে থাকল, আবার কত লে এই সাহিত্য-সম্রাটকে দেখবার জন্যেও তাঁর বাড়ীতে যেতে লাগল।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর শরৎচন্দ্র কি বাজে-শিবপুরের বাড়ী কি সামতাবেড়ে, আর কি কলকাতায় যখনই যেখানে থেকেছেন, সময়েই তাঁর কাছে সাহিত্যসেবী ও দর্শনার্থীদের সমাগম হয়েছে। শরৎ সকল সময়েই তাঁর এই সব অতিথিদের যথাযোগ্য সমাদর করলেও যখন গ্রামে সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকতেন, তখন সেখানে অতি সমাগম হ'লে, তাদের পরিচর্যার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সামতাবেড় হচ্ছে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে। বি,এন, রে দেউলটি স্টেশনে নেমে মাইল দুই পায়ে হেঁটে গেলে তবে এই পৌছানো যায়। তাই কলকাতা বা অন্য কোন স্থান থেকে কেউ গেলে, শরৎচন্দ্র আগে তাঁর বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা করতে এখানে পরিচিত, অপরিচিতর কোন প্রশ্ন ছিল না। সকল অতিথি তিনি সমান ভাবে সমাদর করতেন। আর এখানে শরৎচন্দ্রের অতি প্রায় লেগেই থাকত। মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা ত লেখা পাব আশায় তাঁর কাছে যেতেনই, তাঁরা ছাড়া বহু সাহিত্যিক, অধ্যাপক শিক্ষকও যেতেন। আবার অনেক সময় ছাত্ররাও যাঁকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। এ ছাড়া আরও কত রকমের যে কত প্রয়োজনে তাঁর কাছে যেতেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই বিভিন্ন ধরণের অতিথি তাঁর প্রায় রোজই লেগে থাকত। থেকে দূরে তাঁর এই গ্রামের বাড়ীতে তিনি সকল অতিথি যথাসাধ্য আদর যত্ন করতেন। শরৎচন্দ্রের এই অতিথি-প উদাহরণ হিসাবে তাঁর অতিথিদেরই লেখা দু'একটা কাহিনী এখ উদ্ধৃত করা গেল—

একবার রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মোৎসব সভার উদ্যোগীরা ঠিক করেন যে, শরৎচন্দ্রকে তাঁরা সেবারকার সভায় সভাপতি করবেন। তাই এই প্রস্তাব নিয়ে 'অমৃতচক্রের' তৎকালীন সচিব উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন। শরৎচন্দ্র তখন সামতাবেড়েই থাকতেন। উমাচরণবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলালের কিরূপ আলাপ ছিল, তিনি অমৃতলালের কোন্ কোন্ বই পড়েছেন এবং তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন, সমস্তই জানালেন, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ সভায় সভাপতিত্ব করার অক্ষমতাও তিনি শেষে প্রকাশ করলেন। শরৎচন্দ্র অমৃতলালের স্মৃতি-সভায় যাওয়ার অক্ষমতা জানালেও তিনি উমাচরণবাবুকে যে ভাবে সমাদর করেছিলেন, সে সম্বন্ধে উমাচরণবাবু নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন—

"একদিন বেলা প্রায় একটার সময় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম, শরৎচন্দ্র তখন আহারান্তে একখানি ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন চৈত্র মাস—দ্বিপ্রহরে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া এত যত্ন করিলেন যে, আমি মনে করিলাম যেন কোন অতি-আত্মীয়ের নিকট আসিয়াছি।···কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তিনি কত বড়, আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকেও যিনি এত সমাদর করিলেন। এমনি অতিথিপরায়ণ ছিলেন শরৎচন্দ্র—এতই মিষ্ট ছিল তাঁহার ব্যবহার।" (বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪৪)

অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন কয়েকজনসহ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সেই-ই প্রথম পরিচয়। এর আগে শরৎচন্দ্র তাঁদের কোনদিন দেখেনও নি; আর তাঁদের নামও শোনেন নি। কাননবাবুরা গেলে আলাপ-পরিচয় ও কথায় কথায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। এমন সময় বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসে। শরৎচন্দ্র তখন কাননবাবুদের কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, রাতটাও সেখানে কাটাবার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সেদিনকার সেই কথার উল্লেখ করে কাননবাবু লিখেছেন—

"পাড়াগাঁয়ের মানুষদের কাছে অতিথিসেবা একটা অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের মধ্যে। সহরের জীবনে অতিথিসেবা নেই—তা নয়। সহরের লোকেরাও বাড়ীতে অতিথি এলে সাধ্যমত যত্ন করেন। কিন্তু তাঁদের সেই যত্ন অনেকটা সামাজিক। পল্লীর মানুষদের সেবার মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়তা আছে। তাঁরা এটাকেও ঠিক সামাজিক কর্তব্য হিসেবে দেখেন না—এটা যেন গার্হস্থ্যধর্মের অঙ্গ। তাই অতিথি পেলে তাদের যে যে খুসি আপনা থেকে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে তা সহরের লোকের মধ্যে দেখিনি। শরৎচন্দ্রের আতিথ্যের মধ্যে এমি একটা আত্মীয়তা ছিল। প্রথম যেদিন তাঁর পানিত্রাসের * বাড়ীতে যাই, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ মোটেই ছিল না। তখন খুব কম তিনি কলকাতায় আসতেন। তাই স্বভাবতই তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকে প্রায়ই পানিত্রাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। সহজেই অনুমান করা যায়, তখন তাঁর অতিথি সমাগমের প্রায়ই কামাই ছিল না। অথচ আমাদের সঙ্গে কয়েকঘণ্টা আলাপের পর তিনি আমাদের সে-রাত্রিটা থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কথা বলার ধরণে বেশ বোঝা গেল, এটা তাঁর নিতান্ত মৌখিক পীড়াপীড়ি নয়।" (বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্রের এই অতিথিসৎকারের কথা-প্রসঙ্গে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর "শরৎচন্দ্র-স্মৃতিকথা" প্রবন্ধেও এক স্থানে লিখেছেন—

"···একবার প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটির সভায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, জলখাওয়ার আয়োজন বেশ ছিল। খাওয়াইতে আমি তাঁহাকে কুণ্ঠিত দেখি নাই। আমার বন্ধু গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, একবার তাঁহার নূতন-বাড়ী পানিত্রাসে গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য শরৎবাবুকে দেখিতে ও প্রণাম জানাইতে। চারুবাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, তখন সরকারী কাজে ঐ অঞ্চলে ঘুরিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে একথালা গরম লুচি, বেগুন ভাজা ও ছয়খানি বাতাসা আসিয়া উপস্থিত হইল। চারুবাবুর কোন কথা বলিবার পূর্বেই শরৎবাবু তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্যভরা কণ্ঠে বলিলেন—এত বেলায় ব্রাহ্মণের বাড়ী এসে কি অভুক্তাবস্থায় যেতে পারো ভায়া?

চারুবাবু—বেশ, বেশ, বাতাসা আবার কেন?

শরৎবাবু—ওটা ভায়া গ্রামের ভদ্রতা।" (সংহতি—ভাদ্র ১৩২৮)

শরৎচন্দ্রের গ্রামের বাড়ীতে যাঁরা গেয়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, প্রায় ২ ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধের কি রকম বড় বড় বাতাসা তিনি তাঁর অতিথিদের খেতে দিতেন। সামতাবেড় একেবারে অজ পাড়াগাঁ। কাছাকাছি কোথাও হাট বাজার না থাকায় ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। তাই শরৎচন্দ্র সব সময়ের জন্য তাঁর বাড়ীতে এই রকমের বড় বড় বাতাসা মজুত রাখতেন এবং অতিথিরা এলে মিষ্টদ্রব্য হিসাবে এই বাতাসা খেতে দিতেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে শুধু যে ক্ষণিকের বা এক আধ দিনের অতিথিরাই যেতেন তা নয়, তাঁর এমনও সব বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ছিলেন যাঁরা একটানা মাসের পর মাসও তাঁর বাড়ীতে কাটিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এরূপ দুজন বন্ধু একসময় তাঁর বাড়ীতে তিনমাস থেকে ছিলেন। এঁরা হলেন, প্রবোধচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যক্ষ) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

সেটা তখন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ, শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি, আর প্রবোধচন্দ্র বসু ও বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। বিজয়বাবু নামে কোষাধ্যক্ষ হলেও তিনিই ছিলেন হাওড়া কংগ্রেসের প্রধানতম স্তম্ভ। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এঁরা তখন কিরূপ খাওয়া-দাওয়া ও আদর-যত্নের মধ্যে ছিলেন, সে-সম্বন্ধে বিজয়বাবু

* শরৎচন্দ্রের গ্রামের নাম সামতাবেড়। সামতাবেড়ের ডাকঘর

"শরৎদার বাড়ীতে আমরা রাজার-হালে ছিলাম। তিনি রোজই খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করতেন। তাঁর দুটো পুকুর ছিল। পুকুর থেকে রোজ মাছ ধরানো হ'ত। আর শরৎদার বাড়ীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তাঁর নিজের পোষা গরুর ঘন মিষ্টি দুধ। শরৎদার সেই খাওয়ানোর কথা আজও মনে আছে।"

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে, তৎকালীন ভারত গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে তখনই বে-আইনী ঘোষণা করে এবং আইন-অমান্যকারী কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র যদিও তখন আইন অমান্য করে জেলে গেলেন না বটে, কিন্তু সেই সময় তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বসে অনাথ কংগ্রেসকর্মীদের অন্নের সংস্থান করে যেতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীনির্মলচন্দ্রনাথ রায়কে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—"লোকের আমার বিরাম নেই—দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনি হবার দরুণ যাঁরা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের।"

শরৎচন্দ্র তখন গ্রামে থেকে দিনের পর দিন তাঁর এইসব কংগ্রেসী অতিথিদের আহার জুগিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে কলকাতায় চলে এলে, তাঁর কাছে যাওয়া অনেকটা সহজ হওয়ার ফলে, এখানে তাঁর অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। তবে সামতাবেড়ের মত তাঁর এখানকার অতিথি অভ্যাগতদের জন্য তাঁকে মধ্যাহ্নভোজন বা নৈশভোজনের ব্যবস্থা বড় একটা করতে না হ'লেও, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে না খাইয়ে ছাড়তেন না। "অমুক দিন আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ রইল" ব'লে প্রায়ই তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এভাবে তিনি এত নিমন্ত্রণ করতেন যে, আসলে খাওয়ানোর দিনই হয়ত তাঁর নিমন্ত্রণ করার কথাটা মনে থাকত না। এরকম ঘটনাও ২ একবার ঘটেছে। এই অবস্থাটা তাঁর আত্মভোলা ভাবের জন্যেই হ'ত। শরৎচন্দ্রের এইরূপ নিমন্ত্রণ করে ভুলে যাওয়ার একটা কাহিনী এখানে উল্লেখ করা গেল—

সাহিত্যিক শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ও স্নেহভাজন বন্ধু। তিনি একদিন শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অনেক কথাবার্তার পর অসমঞ্জবাবু যখন চলে যাবেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন—দেখ অসমঞ্জ, তুমি অনেকদিন আমার বাড়ী খাওনি। আগামী রবিবার আমার বাড়ী তোমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, আসবে তো?

—নিশ্চয়ই আসব দাদা, বলে অসমঞ্জবাবু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

পরের রবিবার দুপুরে যথাসময়ে অসমঞ্জবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্র অসমঞ্জবাবুকে যে সেদিন তাঁর বাড়ীতে খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন, সে কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন। তিনি অসমঞ্জবাবুকে দেখেই বলে উঠলেন—কি হে অসমঞ্জ যে, এস, এস। হঠাৎ দুপুরে কি মনে করে ভাই? কিছু দরকার-টরকার আছে নাকি? আচ্ছা থাকে সে পরে হবে। এখন চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। আজ সেখানে আমার একটা ভাল নিমন্ত্রণ আছে। আমি ত খেতে পারি নে জানই, তবু নিমন্ত্রণ করে গেছে, আর বলে গেছে যেতেই হবে। তোমার কিন্তু-বোধ করবার কোনও কারণ নেই, আমি তাদের বলেই দিয়েছি, আমি একা যাব না, কোন বন্ধুবান্ধবকে পেলে সঙ্গে নিয়ে যাব। তারা বলে গেছে—নিশ্চয়ই, আপনি যতজনকে পারেন নিয়ে যাবেন।—আরে তাদের সে এক বিরাট কাণ্ড। বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাদের আজ বাগানপার্টি। চল আর দেরি নয়, এখনি। দেরি হয়ে গেল। এতক্ষণ কাকেও পাচ্ছিলাম না বলে, যাব কিনা তাই ভাবছিলাম। চল বেরোনো যাক্।—ব'লেই শরৎচন্দ্র একরূপ জোর করেই অসমঞ্জবাবুকে তাঁর সঙ্গী করে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশে রওনা হলেন।

এদিকে অসমঞ্জবাবু ত শরৎচন্দ্রের কথা শুনে অবাক্। তিনি ভাবলেন—দেখা যাচ্ছে শরৎদা নিমন্ত্রণ করে দিব্যি ভুলে গেছেন। তা যাই হোক্ যেখানে হয় দুপুরের খাওয়াটা হ'লেই হ'ল। এই ভেবে তিনি আর কোন কথা না বলেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হলেন।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে শরৎচন্দ্র বললেন—কই হে অসমঞ্জ, নিমন্ত্রণওলাদের যে পাত্তা নেই। তারা যে বলেছিল, বাগানে রান্না হবে। বাড়ী থেকে, কি হোটেল থেকে খাবার তৈরী করিয়ে আনছে নাকি! আচ্ছা চল ততক্ষণে ঐ রাস্তার ধারের দোকানটায় বসে চা খাওয়া যাক্। এখনি তারা নিশ্চয়ই আসবে। হয়ত কোথা থেকে খাবার তৈরী করিয়েই আনছে, এখানে সবাই মিলে মিশে খানাপিনা করবে।

দোকানে গিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ অসমঞ্জ, তারা এই পথ দিয়েই বাগানে আসবে। আমরা যে এখানে আছি, তারা এলেই জানা অগন্। ততক্ষণ খুব ধীরে ধীরে চা খাই এস। আমরা ত আজ তাদের অতিথি। তারাই এসে তাহলে চায়ের দামটাও দেবে।

—দাদা, কখন তারা আসবে তার কি ঠিক আছে। আর চা তত দেরি করে ধীরে-ধীরে খাওয়া যায়। চা ত তাহলে জল হয়ে যাবে।

—আরে না এলে ত আমরা দাম দোবই, তবু দেখা যাক্ না। ভুলে যাচ্ছ কেন, আজ যে আমরা তাদের অতিথি। তাদের এখানে আমাদের নিজেদের পয়সায় চা খাওয়া মানে যে, তাদের অপমান করা।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কারও দেখা না পেয়ে শরৎ বললেন—তাই ত হে কি ব্যাপার বল ত—বলেই শরৎচন্দ্র পকেট নিমন্ত্রণ পত্রটা বার করলেন। নিমন্ত্রণ পত্রটা পড়ে শরৎচন্দ্র হাসতে বলে উঠলেন—ও অসমঞ্জ, আরে সর্বনাশ করে বসে আছি।

অসমঞ্জবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে শরৎদা?

—আরে ভুল করে বসেছি, নিমন্ত্রণ যে এ রবিবারে নয়, আগামী রবিবারে। এই দেখ চিঠি—বলে তিনি অসমঞ্জবাবুর হাতে চিঠিখানা দিলেন।

অসমঞ্জবাবু চিঠিখানা পড়ে হেসে বললেন—দাদা বলুন, আপনি আজ আরও একটা ভুল করেছেন।

—কি ভুল বল ত?

—আপনি আজ ত দুপুরে আপনার বাড়ীতে খাওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন!

—তা কই তখন বাড়ীতে বললে না। দেখলে আমি যখন ভুলেই গেছি, তখন তোমার নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল। তুমি ত আর আমার নতুন পরিচিত নও যে, যেচে বলতে তোমার লজ্জা হবে।

—আমি দেখলাম, আপনি ভুলে গেলেও আর একটা নতুন নিমন্ত্রণ যখন জুটে গেল, তখন আর সেকথা উত্থাপনই করলাম না।

—তাই ত এত বেলায় বাড়ীতেও ত হাঁড়ি উঠে গেছে। ক্ষিধেও লেগেছে, আর তোমার যে ভাল রকমই ক্ষিধে পেয়েছে, সেও বোঝা যাচ্ছে। চল ভাল দেখে একটা দোকানে যাওয়া যাক্। এ বেলাটা দোকানে খেয়েই কাটুক। হ্যাঁ, দেখ অসমঞ্জ, কালই কিন্তু তোমাকে আমার বাড়ীতে খেতে হবে, ঠিক ত? তা না হ'লে বুঝব তুমি রাগ করেছ।

—রাগ আবার কি দাদা? আচ্ছা কালই খাব। তবে দয়া ক'রে কাল আর যেন এই নিমন্ত্রণ করার কথাটা ভুলবেন না।

—না হে না, আর কি ভুলি। আজ দেখছ ত সবদিকেই আমার ভুল হয়েছে। কাল আর হবে না, তুমি কালই নিশ্চয় আসবে।

ঐদিন শরৎচন্দ্র অসমঞ্জবাবুকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত এবং অনিমন্ত্রিত অতিথিদেরই শুধু যে যত্নসহকারে খাওয়াতেন তা নয়, অনেক সময় তিনি তাঁর সামতাবেড়ের বাগানের ফলমূল, পুকুরের মাছ প্রভৃতিও বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় তাঁর ছোট ভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী হিসাবে শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্র গ্রামে সামতাবেড়ে থাকার সময় "ভারতবর্ষে" লেখা অথবা তাঁর পুস্তক প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় যখন এঁদের কাছে আসতেন, তখন মাঝে মাঝে তিনি সুধাংশুবাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করতেন। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এমনি বন্ধুত্ব ছিল যে, অনেক সময় তিনি সামতাবেড় থেকে রূপনারায়ণের তপ্‌সে মাছ কিনে সুধাংশুবাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র নিজে যেমন লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন, আবার তেমনি তিনি গল্পের আসরে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করেও সময় সময় অনেককে খাওয়াতেন। অবশ্য যাঁরা তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং যাঁদের উপরে তাঁর জোর চল্‌ত, তাঁদের কাছ থেকেই তিনি টাকা আদায় করতেন। এজন্যে অনেক সময় তিনি সোজাসুজি ভাবে টাকাপয়সা না চেয়ে, নানা ফন্দিফিকির করেও টাকা আদায় করে নিতেন। বন্ধুরা কখনো কখনো শরৎচন্দ্রের ফন্দির কথা জানতে পারলেও হাসিমুখেই টাকা দিতেন। এই রকমের একটা ঘটনা এখানে বলা গেল—

শরৎচন্দ্র সেদিন "ভারতবর্ষ" অফিসে এসেছেন। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি বসে বসে গল্পগুজব করছেন। তখন বিকাল বেলা। শরৎচন্দ্রের আফিং খাওয়ার সময়, তাই তিনি পকেট থেকে আফিংএর কৌটোটা বা'র করে, একটা আফিংএর পাকানো বড়ি খেয়ে নিলেন। অফিসের কর্মচারীরা তাঁর আফিং খাওয়া দেখছেন দেখে শরৎচন্দ্র তাঁদের বললেন—কি আফিং দেখে বুঝি খাবার লোভ হচ্ছে? তারপর তিনি পাশের একজনকে বললেন—দেখ তুমি একটু আফিং খাও, তাহ'লে দেখবে তুমি আমার মতই সাহিত্যিক হয়ে গেছ। এই ব'লে শরৎচন্দ্র শুধু তাঁকেই নয়, নানাভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং আফিংএর অশেষ গুণমহিমা বর্ণনা করে অফিসশুদ্ধ সকলকেই একটু একটু করে আফিং খাইয়ে দিলেন।

এই সময়টায় ভারতবর্ষের সত্বাধিকারীদের—কি হরিদাসবাবু আর কি সুধাংশুবাবু কেহই অফিসে ছিলেন না। তাঁরা তখন বাড়ী চলে গেছেন। শরৎচন্দ্র আরও মজা করবার জন্যে "ভারতবর্ষের" অন্যতম সত্বাধিকারী বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠি লিখে অফিসের দরোয়ানের হাত দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন—ভায়া, আফিংএর রূপের মোহে, আর কেউ কেউ আফিং ধরে আমার মত সাহিত্যিক হবার লোভে, আপনার অফিসশুদ্ধ সমস্ত লোকই আমার কাছ থেকে জোর করে আফিং কেড়ে নিয়ে খেয়ে বসে আছে,—এখন তারা আফিংএর নেশায় ঝিমুচ্ছে। এখনি যদি না তাদের মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, ঝিমুনি কাটবে না। তাহলে কি হবে বুঝতেই পারছেন? আপনার হাতে এখনি পুলিশের হাতকড়া পড়বে। অতএব পত্রপাঠ কিছু পাঠিয়ে দিন।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের পত্র পেয়ে তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও দরোয়ানের হাতে তখনি দশটা টাকা পাঠিয়ে দিলেন। অফিসে অল্পই কর্মচারী। তাই বিকালের জলযোগটা তাঁদের মন্দ হ'ল না।

শরৎচন্দ্র এমনিভাবে নানা উপায়ে অনেককেই খাওয়াতে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতে লোকজনকে মাঝে মাঝে যেমন খাওয়াতেন, তেমনি আবার বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করেও মাঝে মাঝে অনেকের ভোজের ব্যবস্থা করতেন। সব সময়েই বিশেষ করে তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁর অতিথি-সেবার ভিতর এমন একটা আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার ভাব ছিল যে, যিনি একবার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, তিনি সেকথা আর ভোলেন নি। তাই অনেকেই শরৎচন্দ্রের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে নানা জায়গায় নানা ভাবে তাঁর সেই আতিথ্যের উচ্চ প্রশংসা করে লিখে গেছেন। শরৎচন্দ্রের অতিথি-পরায়ণতার এগুলি নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

নৃত্য সঙ্গীত*

মালকোষ—একতালা

আমি	স্বপনের মালা গাঁথি	বাঁধি	অধরারে সুরে বাঁধি,
ওরে	অসীম আমার সাথী।	তার	কিরণ ছন্দগুলি
আমি	চলি তারি গান গেয়ে গেয়ে,	তুলি	সঙ্গীত দোলে তুলি।
সে যে	চলে মোর তরীখানি বেয়ে,	সে যে	চলে কূলে কূলে দুলে দুলে,
আমি	আকাশ-কামনা গাঁথি—	আমি	চলি অকূলের পাল তুলে,
ওরে	অসীম আমার সাথী	আমি	আলোক মন্ত্র গাথি,
আমি	তপনের সুর সাধি,	মম	অরুণ সারথি সাথী।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : সাহানা দেবী

ণদা ণা II { সা ণমা জ্ঞা | সা ণ্দা ণ্ | সমা মজ্ঞা মা | (জ্ঞমা সা -া) } |
আ মি স্ব প নে র মা লা গাঁ থি

া মা মা | জ্ঞা মা দা | দা ণদা মা | জ্ঞমা দণর্সা দণর্সা | ণদা মা জ্ঞা | II
ও রে অ সী ম্ আ মা র্ সা - - - থী আ মি

া { মা মা | মজ্ঞা মা ণদা | ণা র্সা -া | র্জ্ঞর্জ্ঞসা ণর্সা ণদণা
আ মি চ - লি তা- রি গা ন্ গে - - - য়ে গে
সে যে চ - লে কূ- লে কূ লে দু - - - লে দু

র্সা } র্সা র্সা | র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞসা | র্সমা র্মা র্মা | সমা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা
য়ে সে যে চ - লে মো - র্ ত রী খা- নি- বে -
লে আ মি চ - লি অ - কূ লে র্ পা- - ল্ তু -

র্জ্ঞর্সা | { র্সা র্সা | র্সার্ম র্জ্ঞা র্সা | ণার্জ্ঞ র্সা ণা | দা সণা দা | মা } মা
য়ে - আ মি আ- কা শ কা- ম না গাঁ - - থি ও
লে - আ মি আ- লো ক ম - ন্ ত্র গা - - থি ম

মা | মা জ্ঞমা দণর্সা | ণর্সা ণর্সা র্সা | সা মজ্ঞা মা | জ্ঞমা জ্ঞা সা | II II
রে অ সী - - - ম্ আ মা র্ সা - - থী - - -
ম অ রু ণ সা র থি সা - - থী - - -

* এই গানটি আমার নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "নীরাজনা"তে আছে।

{ । সা সা । সা মা মজ্ঞা । মা মসা জ্ঞা । জ্ঞাম মা -া । -া মা মা ।
আ মি ত প নে র সু র্ সা ধি - - বাঁ ধি

মজ্ঞা মা মদা । দমা মা দা । দণা দণা -া । -া ণদা ণা
অ ধ রা - রে সু রে বা - ধি - - - তা - র্

ণর্সা র্সা র্সণা । দণা দা ণা । ণা র্সা
কি - র ণ - ছ - ন্ দ গু লি - তু লি

র্সণা দমা জ্ঞা । সা ণা দা । র্সা ণা -া । }
স - - ং গী ত দো লে তু লি -

বর্ত্তমান অন্নসমস্যা ও পরিপূরক-খাদ্য

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিছুকাল যাবৎ দেশে খাদ্য-সমস্যা এক প্রধান জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে ভারত ও প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সরকার খুবই সচেষ্ট রয়েছেন, কিন্তু সমস্যাটির জটিলতা ও বিস্তৃতি এতদূর গিয়ে পৌঁচেছে যে দেশের জনসাধারণ ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে এর সমাধানে মনোনিবেশ না করলে এর সমাধান, স্বল্পকালের মধ্যে হওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও, কত দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থায় তা হওয়া সম্ভব বলা কঠিন।

গত দ্বিতীয় মহাসমরের উত্তাল তরঙ্গ যখন ভারতের গায়ে এসে লাগল বাঙলাদেশ সৈন্য-সমাবেশের এক প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল। কত দেশ-বিদেশের লোক জমায়েত হল এদেশে। তাতে বাঙলার খাদ্য-শস্যের উপর পড়ল হামলা। বিদেশী সরকার দেশের জনসাধারণকে লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলেন এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। ১৯৪৩ সালের সেই দুর্ভিক্ষে কতশত নরনারী অনাহারে ভগবানকে স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করল। সেই সুযোগে দেশে মুনাফাকারী, খাদ্য আমানতকারী করে নানা সমাজদ্রোহীদের দলগুলো বেশ পরিপুষ্ট হল।

যুদ্ধের শেষ ঘটল একদিন, কিন্তু দেশে খাদ্যাভাব বেশ কায়েমী হয়ে দাঁড়াল। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ এক স্থায়ী খাদ্যাভাবরূপে প্রকাশ পেল। যে হারে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেই হারে খাদ্যোৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয় নি। তারপর, যুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশ, মালয় থেকে যে চাল আমদানী করা যেত তাও বন্ধ হয়ে এল। অন্যদিকে দেশে মুনাফাকারী আর আমানতকারীদের দল সংখ্যায় অনেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, খাদ্যাভাবকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রাখা গেল দেশের জনবহুল শহরগুলোতে নির্দ্দিষ্ট আহার বরাদ্দের ব্যবস্থা করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল এমন দুটো নূতন সমস্যা যাদের প্রভাব এসে পড়ল খাদ্যাভাবের উপর। এ' অভাব বেড়ে গেল বহুগুণ, লোকেদের দুর্গতির শেষ রইল না। দেশের এমন দুটি অংশ ভিন্ন এক রাষ্ট্রে পরিণত হল যেখানে অখণ্ডিত ভারতে উৎপন্ন গম বা চালের মোট পরিমাণের বেশী ভাগই জন্মায়। পাঞ্জাবের গম, আর পূর্ব্ব বাঙলার চাল আজ আর ভারতের কাজে আসে না। কিন্তু এ' দু' অংশ থেকে ভারতে এসেছে এবং আজও আসছে, দলে দলে বাস্তুহারা।

বিদেশ থেকে গম, ময়দা করে নানা খাদ্য-শস্য ভারত-সরকার গ[illegible] কয়েক বছর যাবৎ বহু পরিমাণে আমদানী করেছেন। এ ভাবে খাদ্যশ[illegible] আমদানী করায় এদেশের বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতে বহু টাক[illegible] নানা ভাবে লোকসান গিয়েছে। তাছাড়া, আমদানী-করা খাদ্যশস্যে[illegible] উপর নির্ভর করে কতদিন আর দেশের লোক বাঁচতে পারবে? এ[illegible] দেশের স্বাধীন মতামতকে অনেক সময় অন্য দেশের প্রভাবেও পড়তে হ[illegible] পারে। এত সব অসুবিধের হাত থেকে দেশকে রক্ষে করতে চাই—চা[illegible] গমের পরিবর্ত্তে অন্য নানা খাদ্য-শস্যের প্রচলন—হোক না তা স[illegible] শাকসব্জী।

খাদ্য-সার, খাদ্য-প্রাণ ও তাপ,—এ তিনের বিচারে চাল ও গমে[illegible] পরিবর্ত্তে আংশিকভাবে এবং অন্ততঃ সাময়িকভাবেও আলু, সমাধীন ক[illegible]

নানা তরিতরকারী ব্যবহার করা যেতে পারে। আর ছোলা, মসুর করে নানা ডাল এবং ভুট্টা, জোওয়ার করে নানা কম জনপ্রিয় খাদ্যশস্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এসব পরিপূরক খাদ্যশস্য বা তরিতরকারী যা দেহে প্রয়োজনীয় তাপ, খাদ্য-প্রাণ ও খাদ্যসার সঞ্চার করতে পারে সেদিকে অবশ্য নজর দেওয়া আবশ্যক। কেবল কি তাই? পরিপূরক-খাদ্য সুস্বাদু হওয়া বাঞ্ছনীয়, তারপর এ খাদ্য দামে সস্তা হওয়া একান্ত দরকার। চাল, আটা অথবা ময়দা যত দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে ততই তাদের দাম যাচ্ছে বেড়ে। যদি পরিপূরক খাদ্য ব্যবহার করতে গিয়ে সেই চড়া দামেই তা কিনতে হয় তবে সে খাদ্য ব্যবহারে আর্থিক সুবিধে রইল কোথায়? আর, আর্থিক সুবিধে না থাকলে সে-খাদ্য জনপ্রিয় হতে পারবে না মোটেই। প্রায় সমান দামে লোকেরা ভাত অথবা গমের রুটি-সুচি ছেড়ে ছোলার ছাতু, ভুট্টা-জোয়ারের চাপাটি, ফলের মোরব্বা, কিম্বা আলুর চপ, মুগের ডালের নাড়ু, বজরার রুটি খেতে চাইবে কেন? তাই, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লীতে যে পরিপূরক খাদ্য-প্রদর্শনী খোলা হয় তাতে নানা প্রতিযোগীরা যে সব খাদ্যশস্য রেশনের আওতায় পড়ে না সেই সব খাদ্যশস্য ব্যবহার করে সস্তায় মুখরোচক এক একটি খাদ্য অথবা এক এক বেলার খোরাক বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক ও প্রসূতির উপযোগী তৈরী করে প্রদর্শনীতে দেখান। রেশনের প্রভাবমুক্ত খাদ্য-শস্য ব্যবহারের জনপ্রিয়তা যাতে বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে এ ভাবের প্রদর্শনীর প্রয়োজন আছে বৈকি। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় এক খাদ্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় তাতে যে সব নারীসমাজ এবং সমিতি যোগদান করেন তাঁরা সস্তায় নানা রুচির পরিপূরক-খাদ্য তৈরী করে দেখান।

এদেশে খাদ্য-প্রস্তুতি ও পরিবেশনের সম্পূর্ণ ভার সেই মহাভারতের যুগ থেকে নারীদের হাতে তুলে দেওয়া রয়েছে! পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদীর এক বিশেষ চিন্তার কারণ ছিলেন নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পাণ্ডব, ভীমসেন। ভীমসেন যে কেবল বেশী খেতেন এমন নয়, খাওয়াতে তাঁর এক রুচিবোধ ছিল। তা' না হলে অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজার পুরীতে তিনি রসুইকার হয়ে প্রবেশলাভ করেন কি ভাবে? যাক্ সে কথা; মেয়েরা সমবেতভাবে যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, বিশেষ করে দেশকে খাদ্যসঙ্কটের হাত থেকে রক্ষে করবার প্রয়োজনে, তাঁদের কাজে সফলতা আসবে নিশ্চয়ই বলতে পারি।

খাদ্যশস্য, শাকসব্জী, ফলমূল সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত একটু আলোচনা করা যাক। পরিপুষ্টি সাধন করবার মত উপাদান এদের মধ্যে কি পরিমাণ আছে, তা জানা গেলে চাল আর গমের বদলে এদের ব্যবহার কমন করে এবং কতটা সম্ভব তা স্থির করা অনেক সহজ হয়ে পড়বে। প্রথমে দেখা যাক, চাল অথবা চাল থেকে তৈরী নানা খাবারে কি পরিমাণ ছানার পদার্থ, তাপ ও খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান আছে। ঢেঁকীছাটা চালে ছানা-জাতীয় উপাদান আছে শতকরা ৮·৫ ভাগ; শর্করা ৭৮; মাখন জাতীয় উপাদান ০·৬; লবণ জাতীয় উপাদান শতকরা ০·২; খাদ্যপ্রাণ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি কমে আসে; চোখের দৃষ্টি যায় কমে, দাঁত উঠার বিলম্ব ঘটে। গ-খাদ্যপ্রাণ পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করে।

এরপর, আটার কথা বলা যাক। এতে ছানাজাতীয় পদার্থ আছে শতকরা ১২·৭৭; মাখন ২·৫; শর্করা ৬৮·৮৮; লবণ জাতীয় উপাদান ৫·৭; ক ও খ খাদ্যপ্রাণ।

নানা ডালে ছানা-জাতীয় পদার্থ আছে শতকরা ১৭·১ থেকে ২৮·০ ভাগ; মাখন ০·৮ থেকে ৫·৩; শর্করা ৫৫·০ থেকে ৬৫·৫; লবণ ১, ২·৫; খাদ্যপ্রাণ ক ও খ।

তরিতরকারীর মধ্যে আলুর কথা সবার আগে বলতে হয়। আলুর ব্যবহার হয় নানা ভাবে এবং অনেক পরিমাণে। তাছাড়া আলু নানা জাতের—গোল আলু, রাঙ্গা আলু, শকরকন্দ আলু, শাঁক আলু, চুবড়ী আলু, খাম আলু ও শিমুল আলু। এদের বিভিন্ন স্বাদগুণ—আর এদের মোট উৎপাদনও কম নয়। আলুতে ছানা-জাতীয় উপাদান আছে শতকরা ০·৭৮ থেকে ২·০ ভাগ; মাখন ০·১৬ থেকে ০·৩১; শর্করা কম বেশী ২১·৭; লবণ ০·৫ থেকে ১·০। এতে ক, খ গ করে তিন রকমের খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান। গ-খাদ্যপ্রাণ দাঁত ও শরীরের চামড়ার পরিপুষ্টি সাধন করে।

আলুর পর রয়েছে সয়াবীন, টোমাটো, পটল, এঁচোড়, কচু, কপি করে নানা সময়ের, নানা স্বাদের তরিতরকারী। তারপর কলা, কমলা, আম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল করে নানা ফল। পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ফলের প্রাধান্য বড় কম নয়। ভাত-ডাল-তরকারী খাবার পর প্রতিদিন ফল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দেহ আর মনের তেজ আমরা আহরণ করি উপযুক্ত আহার থেকে এ গেল ব্যক্তির কথা। জাতির কথা বলতে গিয়ে সেই একই কথা বলতে হয়। খাদ্যের অসম্পূর্ণতা যদি পূরণ না করা যায় অল্পকালের মধ্যে জাতির জীবনীশক্তি ক্রমে আসে কমে। এমন এক অবস্থায় সে শক্তি এসে দাঁড়ায় যখন জাতিকে বাঁচাতে নানাভাবে নানা দিক থেকে খাদ্যসমস্যার উপর আক্রমণ চালাতে হয়। বহুদিন ধরে জমা পরাধীনতার গ্লানি যেই ধুয়ে মুছে গেল, সেই দেখা গেল যে জাতির জন্য এক পরম শত্রু আসর জাঁকিয়ে বসেছে। সে-শত্রু হচ্ছে খাদ্যাভাব। আজ ভারতের অস্তিত্ব, ভারতের সম্মান, ভারতের ঐতিহ্যকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, আর সে অস্তিত্ব, সে সম্মান, সে ঐতিহ্য আমাদের রক্ষে করতে হবে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চাই সুস্থ, সবল, সতেজ এক জাতির গঠন। পুরুষানুক্রমে যথোচিত খাদ্য যদি না খেতে পাই তবে সেই আদর্শ জাতিকে আমরা গড়ে তুলব কি করে? প্রয়োজনমত আমাদের আহার প্রথাকে জীবনীশক্তির অনুকূল করে তুলতে হবে। খেলা-ধূলায়, যুদ্ধক্ষেত্রে, সাহিত্য-রচনায়, সঙ্গীত-সৃষ্টিতে যে দৈহিক কিম্বা মানসিক শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তির উপাদান যদি আমরা ভাত, আটা, ম

আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশে অন্য যেসব খাদ্য-শস্য পাওয়া যায়—যেমন জোয়ার, ভুট্টা, বজরা,—সেগুলোর সাহায্যে জীবনীশক্তির অভাবতা দূর করতে পারি। তারপর রয়েছে নানা ডালের প্রাচুর্য্য—মসুর, মটর, ছোলা, কলাই, মুগ, অড়হর। এরা সব ভাত অথবা রুটি-লুচির দোসর। এরপর রয়েছে নানা তরিতরকারী, শাকসব্জী। যেমন মুখরোচক এরা, তেমনই এদের মধ্যে রয়েছে জীবনীশক্তির নানা উপাদান। হোক না অপ্রাচুর্য্য চাল আর গমের, জনসাধারণ যদি একমনা হয়ে সচেষ্ট হন এ অপ্রাচুর্য্য দূর করতে কতক্ষণ?

খাদ্যশস্যের সাময়িক অপ্রাচুর্য্যের জন্য আমরা যদি কম খেয়ে কিম্বা না খেয়ে দিন কাটাই তবে উপবাসের অবসাদ, জড়তা আমাদের পেয়ে বসবে। তাই আমাদের সমবেত চেষ্টা চাই—সেই অবসাদ যাতে না আসে আমাদের দেহে আর মনে।

পরিপূরক-খাদ্য ব্যবহার করে না হয় সাময়িকভাবে দেশে অন্ন-সমস্যার সমাধান করা গেল, কিন্তু দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথা ভাবলে এ সাময়িক সমাধানের মূল্য বড়ই কমে আসে। গত কয়েক বছরের গড় হিসেব নিয়ে দেখা যায় যে জনসংখ্যা প্রতি বছরে প্রায় ৮০ লক্ষ করে বেড়ে চলেছে। এ বিরাট জনসংখ্যার জন্য যে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন তার মোট হিসেব দাঁড়ায় ১৮০ কোটি মণের উপরে। ১৯৬১ সালে আবার যখন লোকগণনা হবে তখন বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জন্য ১৫৪ কোটি মণ খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেবে বলে অনুমান করা যায়। অনুমিত প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও বর্ত্তমানের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাবার মত খাদ্যও এদেশে জন্মায় না। এদেশে যে পরিমাণ খাদ্য জন্মায় তার হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে বছরে কম বেশী ১২৪ কোটি মণ খাদ্য এদেশে সংগ্রহ করা যেতে পারে। চাষাবাদের বিস্তৃতি হওয়ার ফলে আগামী পাঁচ বছরে খাদ্যোৎপাদন প্রায় ২৭ কোটি মণ বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু এতেও তো জনগণের প্রয়োজন মিটবে না।

সারা ভারতে শস্যোৎপাদনের উপযোগী মোট জমির শতকরা ৬১ ভাগে চাষাবাদ চলেছে; ১৬ ভাগ পতিত জমি, আর বাকী ২৩ ভাগ জমিতে কোনদিনই চাষাবাদ করা হয়নি। যে-পরিমাণ জমিতে চাষের কাজ হচ্ছে তার অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে পুরাণ পদ্ধতিতে চাষ হওয়ার ফলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে। কর্ষিত জমির আট ভাগের এক ভাগে মাত্র উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা আছে, বাকী সাতভাগ মরশুমী-বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। যান্ত্রিক উপায়ে জলসেচের নানা পরিকল্পনা দেশের বিভিন্ন অংশে কার্য্যকরী করে তোলার প্রচেষ্টা সুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বছর দশেকের আগে যে একাজ সম্পূর্ণ করা যাবে তা মনে হয় না। আর তাতে জলসেচের উপযুক্ত জমির মোট পরিমাণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র জলসিঞ্চিত হবে। বাকী শুকনো জমিকে রসাল করে তুলতে বোধহয় আরও ২০ বছর সময় প্রয়োজন হবে।

ক্ষেতে যেই সোনার ফসল ফলল, তার উপর হামলা চলল বানর, পাখী আর নানা জীবজন্তুর। পঙ্গপাল পড়লে ত সবই গেল। তারপর, ক্ষেত থেকে অন্ন-সংগ্রহ করে গোলায় তুলে রাখলেই যে সে-অন্ন সবটাই কাজে আসবে এমন নয়। ভাল করে রাখা চাই তা, যাতে পোকা-মাকড় নষ্ট না করে বসে; যাতে তা পচে গলে না যায়। এতেও অন্ন অপচয় করার শেষ কথা বলা হয় না। ভাত রেঁধে ফ্যান ফেলে দেওয়া; প্রয়োজনের অতিরিক্ত রুটি-চাপাটি বানিয়ে তা বাসি করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া করে আমরা নানাভাবে যথেষ্ট খাদ্য অনেক সময়েই নষ্ট করে থাকি। আজ আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন, তার সম্পূর্ণ সমাধান করতে খাদ্য-অপচয় আমাদের একেবারেই বন্ধ করতে হবে।

এদেশের জমিতে যে পরিমাণ শস্য জন্মে তার গড়পড়তা হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হার চাইতে অনেক কম! এ হার পৃথিবীর সর্ব্বনিম্ন বললে অত্যুক্তি হয় না। এদেশে প্রতি তিন বিঘে জমিতে গড়পড়তা ১০ মণ ধান জন্মে থাকে, আর পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে ১৫০ মণ। এসব জানাশোনার পর হতাশার অন্ধকার স্বভাবতঃ আমাদের মনকে ঘিরে বসতে পারে। তা' হ'লে আমাদের বাঁচাই হবে দায়।

তাই, আশার ক্ষীণ আলোর সন্ধান করা যাক পৃথিবীর নানা দেশের দিকে একবার তাকিয়ে। রুশিয়া ও আমেরিকায় কৃষিকাজে যে সব অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যে দেশ কৃষিকাজের দেশই নয়, যার জনসংখ্যার সামান্য অংশমাত্র স্বদেশজাত খাদ্যশস্যের সাহায্যে জীবনধারণ করতে পারে,—সেরূপ একটা দেশ হচ্ছে যুক্তরাজ্য। ১৯১৩ সালে এদেশে কৃষি উৎপাদনের উন্নতি-সাধন করার প্রচেষ্টা সুরু হয়; আজ সে দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন হার ১৯৩ মণ থেকে ৮২৫ মণ দাঁড়িয়েছে। এ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের পেছনে রয়েছে ভূমির ও কৃষিকাজের আমূল সংস্কার।

এদেশে সেই সংস্কারের কাজ-সুরু করার গোড়াতেই চাই শিক্ষিত-সমাজের সহায়তা। প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে মুক্তি নিয়ে চাষাবাদের কাজের উপর যেন এসে পড়ে। এজন্যে শিক্ষিতকে মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে হবে না, অথবা জমি থেকে ধান কেটে গোলায় তুলতে হবে না। যে অনাদর ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি তার ছিল কৃষকের উপর—সে-দৃষ্টিটি হবে আদরের, সহানুভূতির দৃষ্টি। কৃষক যখনই বুঝতে পারবে যে সমাজে তার জন্য এক সম্মানিত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই বেড়ে যাবে কুলকর্ম্মের প্রতি তার আস্থা ও শ্রদ্ধা। সেই সঙ্গে সে যদি নানা আধুনিক যন্ত্রপাতির কথা জানতে পারে, আর সংঘবদ্ধভাবে চাষাবাদের সুবিধে যদি তার দৃষ্টির গোচরে এসে যায় তবে তো আর কথাই নেই।

অন্নসমস্যার সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী যে দুটি উপায় রয়েছে সে উপায় দুটি কার্য্যকরী করে তোলায় শিক্ষিতের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যথেষ্ট। পরিপূরক-খাদ্য ব্যবহার চালু করে দিয়ে শিক্ষিত যেমন অন্নসমস্যার সাময়িক সমাধান করতে এগিয়ে আসবে একভাবে, অন্যভাবে সে কৃষকের মনে এনে দেবে দৃঢ়তা, তার অভিজ্ঞতায় আনবে প্রসারতা, আর সংঘবদ্ধভাবে তার কাজ করার স্পৃহাকে দেবে বাড়িয়ে। এভাবে সমান তালে এগিয়ে গেলেই অন্নসমস্যার প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব হবে, নচেৎ নয়।

সম্প্রসারণ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কবি গেয়েছেন—

তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মানব-চিত্তের সংস্কার। মন সদা চায় বাড়তে। বুদ্ধি প্রসারের প্রয়াস। সর্ব্বদা ব্যস্ত প্রসার লাভ করবার আগ্রহে। মন সক্রিয়—ক্ষুদ্র এবং মহৎকে জানতে। সম্প্রসারণের উদ্বেগ জীবের প্রকৃতি-গত।

মধুর সম্প্রসারণের বাহন প্রেম। প্রেমের প্রেরণাও আমাদের প্রকৃতিগত। সৃষ্টির মূল-প্রকৃতি অনন্ত পরা-প্রকৃতির আংশিক প্রকাশ। পরা-প্রকৃতি এক। বিভিন্ন বিকাশের আদি কারণ একই সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি আপন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ভিন্নরূপে, ভিন্ন রসে, ভিন্ন গন্ধে, বিভিন্ন ধ্বনিতে এই স্থূল জগতে বিরাজ করছেন। তাই পরিবর্ত্তন পরিদৃশ্যমান বিশ্বের স্বভাব। পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য মায়াময়। কিন্তু সার তত্ত্বে পরিবর্ত্তন নাই, সে মূল যে নিত্য। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূতি লাভ করি যাদের, তাদের ক্ষয় হচ্চে সর্ব্বদা। কিন্তু যে অব্যয় সূত্রে জগত গাঁথা, তার ক্ষয় নাই।

সেই অনিত্যের সন্ধানই জীবের অতৃপ্তির উত্তেজনা। তাই তৃপ্তি ভূমায়। বহুত্বের অনন্ত বিশালতার মাঝে নিজেকে প্রসার করবার প্রয়াস প্রাণের প্রেরণা। প্রসার-প্রয়াসী প্রেম এবং জ্ঞানলিপ্সা মানবের প্রকৃতি-গত সংস্কার।

মানুষের জ্ঞান বাড়ে। সে ধীরে ধীরে বোঝে যা কিছু সত্ত্বা আছে—স্থাবর বা জঙ্গম—তার সৃষ্টির অন্তরে বিদ্যমান পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। প্রকৃতিকে কেহ বলে জড়, কেহ জানে অজ্ঞ। কারও মতে অণুপরমাণুর অজ্ঞাত আচম্বিত মিলনের ফলে জন্মেছে জড়। কিন্তু মানব মন যে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির আধার—এ কথা অস্বীকার করবার অধিকার নাই কারও। অজ্ঞানকে জানবার তৃষ্ণা এবং অন্য জ্ঞানীর জ্ঞানের অংশীদার হবার তাগিদ অদম্য। এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন চিত্ত ঘনমেঘে আবৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সে তমো-ভাবের কুহেলিকাও তো চিরস্থায়ী নয়। পরক্ষণেই মানুষ চিত্ত হ'তে জড়তার প্রলেপ মুছে ফেলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থ সম্পাদনের মাঝে সংশয় ওঠে প্রাণে, কিসের জন্য শ্রম উদ্যম, উদ্দীপনা ও অদম্য স্পৃহা। লোভে লোভ বাড়ে এ সত্য কর্ম্মীর প্রাণে জাগে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অন্তে—সাফল্যে ও বিফলতায়। তখন জ্ঞান প্রকাশ পায়। বো[illegible] আসে—ক্ষুদ্র স্বার্থ হতে বৃহৎ অর্থ আছে জীবনের। তখন উপলব্ধি হয় বিশ্ব জগতের সাথে নিজের অভেদ্য সম্বন্ধ।

এই জ্ঞানের রশ্মি জ্বালিয়ে রাখলে নিজের স্বরূপ প্রকা[illegible] পায়। বুঝি সহস্র পরিবর্ত্তনের মূলে যে সূত্র আছে তার যে পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু সে সূত্র সসীম আমাদের মাঝে এই জ্ঞানের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। যার ফলে প্রতীতি জন্মে বিশ্বের একপ্রাণতার। সে জ্ঞান উপজিলে দুঃখ পায় লোপ আনন্দের ঝর্ণাধারা বর্ষে আলোর ঝরণা ধারার সঙ্গে, তা[illegible] গীতা বলেছেন—

জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বর রূপ আত্মাকে দর্শন ক'রে আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না। সেই কারণেই পরমগতি প্রাপ্ত হন।*

যখন মানুষ ভূত সকলের পৃথক পৃথক ভাব একে অ[illegible] দেখেন এবং সেই এক হতেই বিস্তার দেখেন তখন ব্রহ্মস্বরূপ হন।†

মনের একাগ্রতা জন্মিলে, মানুষ বিশ্ব-মনের আভাস পা[illegible] —সমদর্শী হয়। কারণ মন তখন বোঝে বিশ্বে বিচ্ছিন্নভাব তার স্থান নাই। তখন সম্প্রসারণ অনিবার্য্য, কারণ বিক্ষি[illegible] মনে যে বিশালতার, বিশ্ব-মৈত্রীর বা বিশ্ব-আত্মীয়তা সংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়, বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র করলে অনুভূতিকে গাঢ় করলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ক্ষুদ্র বিচ্ছি[illegible] একের সত্ত্বা নাই—সে সর্ব্বব্যাপী একের বুদ্বুদ।

এ কথা বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগনিরত পুরুষ আপনাকে সর্ব্বভূতে

---

* শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—১৩।২৯

† শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৩।২৯

অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে নিরীক্ষণ করেন।*

পর যে নিজেরই অংশ! আমি যে আবার মহতোর্ম-হীয়ানের ক্ষুদ্র প্রকাশ। আস্তিক্য-বুদ্ধি সদাই সন্ধান করে সেই মহান পুরুষকে যাঁর জ্যোতির আভাসমাত্র দীপ্ত করে চিত্তকে। যাঁকে চিনি না অথচ—

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে.
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে।

তাঁকে হারাই হারাই সদা ভয় পাই। হারাবার ভয় থাকেনা যদি চক্ষু মেলে তাকাই জগতের সর্ব্বত্র মোহমুক্তদৃষ্টিতে। তাঁর পূর্ণ পরিচয়ের অবকাশ আসে যদি মানুষ বোঝে গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—

যিনি সর্ব্বত্র আমাকে দেখেন এবং আমার মাঝে জগতের সমস্ত ভূত ও পদার্থ দেখেন আমি তাঁর পরোক্ষ হই না তিনিও আমার দৃষ্টির বাহিরে যান না।†

নিজের মধ্যে সারা বিশ্বকে প্রতিভাত করতে গেলে চাই সারা বিশ্বের মাঝে আপনার সম্প্রসারণ। পরের অভ্যুদয়ে সুখের উপলব্ধি, অন্যের দুঃখে আপনার প্রাণে ক্লেশের অনুভূতি এই সম্প্রসারণের প্রথম সোপান। অনুরাগ এবং দ্বেষের চিরন্তন দ্বন্দে, দ্বেষের পরাজয়ে অনুরাগের বিজয়। অনুরাগের বিজয়ে আপনাকে ছড়িয়ে ফেলতে পারে মানুষ সর্ব্বভূতে, সকল পদার্থে। তখন ক্ষুদ্রত্ব বিলুপ্ত হয়, বিশালতা রূপ পায়।

মানুষ শত কর্ম্মের মাঝেও বোধ করে শক্তির প্রাচুর্য। এ শক্তি মনের। দেহ অবসন্ন হলেও মন থাকে সক্রিয়। মানুষ নিজেকে আপনার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। বহির্জগতে না ছুটে প্রাণ ক্ষুদ্র আমিত্বের মধ্যে তিষ্ঠতে পারে না। আমিত্ব যখন সর্ব্বই ব্রহ্ম এই উপলব্ধি করে তখন সে লাভ করে পূর্ণতা। ক্ষুদ্র আমি কর্মেন্দ্রিয় বন্ধ করেও মনে মনে স্মরণ করে কর্ম্মের গতি ও পরিণাম। কর্মে নিযুক্ত করব না আপনাকে—এমন কথা ভেবে মানুষ চেষ্টা করে সংযমের। কিন্তু মন ছাড়ে না। সম্প্রসারণ তার স্বভাব ও গতি। মন চায় বাড়তে, দেহটাকে বাড়াতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অন্তরের রহস্য বুঝে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মাঝে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে। এ কথা সহজে আমরা বুঝি না। তাই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জগতে বদ্ধ হই। গীতা প্রথমেই সতর্ক করেছেন—যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে, মনে মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় স্মরণ ক'রে অবস্থান করে সে কপটাচার।*

মায়াময় অখিলের ভাবপ্রবাহ ও কর্ম্মস্রোত অনিবার্য্য। অর্জ্জুনের সমস্যার অবসান করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ অমৃত বর্ষণ করেছিলেন! সে বর্ষণে স্নান করলে মনের অন্ধকার দূরে যায় জ্ঞানের দীপ জ্বলে ওঠে। চিত্ত বোঝে জীব ও শিবের অভেদ্য সংস্রব। অর্জ্জুন প্রথমে নিজের কথা ভেবেছেন, তারপর কুলের, পরে সমাজের। সংসারে ঐ রকম কতকগুলি পর পর ব্যাপী চক্রের কেন্দ্রে মনুষ্য অবস্থিত। এ বেষ্টনীগুলি মায়াপ্রসূত—কিন্তু জীবন প্রবাহের অঙ্গ। এদের প্রভাব তীক্ষ্ণ। তাই ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ মেনে নিলেন কর্মের আবশ্যকতা, ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন। ক্রমশঃ বোঝালেন চক্রগুলির যাকে কেন্দ্র বোধ হয়—মনুষ্য, আমি—সেও অশাশ্বত ভাব-যোজনা। তার ব্যয় আছে। আসল কেন্দ্র শাশ্বত আত্মা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকাশ বিকারে সে আবদ্ধ। এই মায়ার বেষ্টনকে জানতে পারলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। তখন জ্যোতির্ময় শাশ্বত কেন্দ্র স্ব-প্রকাশ হয়। সে আলো অতীন্দ্রিয় অব্যয় আলোর ক্ষীণ অংশ মাত্র। কিন্তু অনাবৃত হ'লে পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। কারণ সারা বিশ্ব এক অখণ্ড, অচিন্তনীয় জ্যোতির টুকরা মাত্র। কবি গেয়েছিলেন—তোমার আলোয় নাইকো ছায়া,

আমার মাঝে পায় সে কায়া।

কিন্তু এ মায়াব্যূহ ভেদ করতে হবে অশান্তির মধ্যে শান্তিময় কর্মের অনুষ্ঠানে, তাঁর স্বরূপের অনুসন্ধানে এবং তাঁর সভক্তি আবাহনে। শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় এবং ঈশ্বরে নিষ্ঠাবান হ'লে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়।

সুতরাং মুক্তি জ্ঞানী-ভক্তেরই লভ্য। সাধনার প্রবেশ পথ কর্ম। কারণ মানুষ ক্ষণকালও কর্ম না করে তিষ্ঠতে পারে না। সম্প্রসারণ অনিবার্য্য, প্রচুর উদ্বৃত্ত জীবনী-শক্তিকে মহাশক্তি লাভের পথে চালালে সম্প্রসারণ হবে আনন্দের প্রকৃষ্ট পন্থা।

---

* গীতা ৬।৩০।

† গীতা—৬।২৯।

* গীতা—৩।৬

জর্জ সান্তায়না

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সমাজে প্রজ্ঞা

পরলোকের আশা ও ভয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে মানুষকে ন্যায়ের পথ অবলম্বনে প্রণোদিত করা যায়, ইহাই দর্শনের প্রধান সমস্যা। সক্রেটিস্ এবং স্পিনোজা যে চরিত্রনৈতিক দর্শন জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন, মানুষ যদি তাহা গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এই দর্শন দার্শনিকদিগেরই বিলাসোপকরণ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য লোকের পক্ষে পারিবারিক স্নেহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে সকল সামাজিক চিত্তাবেগ বিকাশিত হয়, তাহাদের দ্বারাই নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর।

সোপেনহর বলিয়াছেন—প্রেম জাতি-কর্ত্তৃক ব্যক্তির উপর অনুষ্ঠিত ছলনা মাত্র। যাহা হইতে প্রেমের উৎপত্তি হয়, তাহার একদশমাংশ যদি থাকে প্রেমের মধ্যে, তাহা হইলে নয়দশমাংশ থাকে প্রেমিকের আপনার মধ্যে। ইহা সত্য হইলেও প্রেমের পুরস্কারও আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগেই মানুষ তাহার সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ণতা এবং মহত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত লা-প্লাস বলিয়াছিলেন "বিজ্ঞান তুচ্ছ বস্তু, প্রেম ভিন্ন সত্য কিছু নাই।" রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে অনেক মিথ্যা কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু ইহার পরিণতি হয় সন্তানের জন্মে। অবিবাহিত জীবনের নিরুপদ্রব শান্তি হইতে সন্তানের সহিত পিতামাতার যে সম্পর্ক, তাহা অধিকতর প্রীতিপ্রদ। সন্তান দ্বারাই আমরা অমর হই। "আমাদের জীবন গ্রন্থের মসী-কলঙ্কিত, মূল পাণ্ডুলিপির সুন্দরতর প্রতিলিপি যখন দেখিতে দেই, তখন আমরা অসঙ্কোচে সেই পাণ্ডুলিপি অগ্নিতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হই।"

পরিবারই মানবজাতির সাতত্যের উপায় এবং সমাজের মৌলিক ভিত্তি। অন্য সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পরিবার দ্বারাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা সভ্যতা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে না। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের। নীৎসে রাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—রাক্ষস। কিন্তু এই রাক্ষসের পীড়ন অসংখ্য দস্যুর পীড়ন হইতে ভালো। এক প্রধান দস্যুকে কর দিয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যুর পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা শ্রেয়স্কর। লোকে ইহা বোঝে; তাহারা জানে যে রাষ্ট্রীয় শাসনের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, অরাজকতার মূল্য তাহা হইতে অনেক বেশী! কিন্তু রাষ্ট্রকে ভালবাসার অর্থ সংসার-বিরোধিতা নয়। যিনি তাহার দেশকে বাস্তবিক ভালবাসেন, তিনি তাহাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার প্রয়োজন।

সান্তায়না স্বজাতি-গৌরবচেতনা অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। কোন কোন জাতি যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উন্নততর তাহা সুস্পষ্ট। পরিবেশের সহিত উৎকৃষ্টতর সামঞ্জস্য-স্থাপনের ফলে তাহারা জীবনসংগ্রামে অধিকতর উপকৃত হইয়াছে। এইজন্য যে সকল জাতি সমান উন্নত তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বিপজ্জনক। ইহার ফলে জাতির উৎকর্ষের বিনাশ সাধিত হয়।

রাষ্ট্রের প্রধান দোষ এই, যে যুদ্ধের দিকে ইহার একটা ঝোঁক আছে। আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বলতর রাষ্ট্রকে সে অবজ্ঞা করে। সমগ্রমানব জাতিকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করিয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠা সান্তায়না সমর্থন করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ একই শাসনের অধীন হইলে জগতের মঙ্গল হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলা দ্বারা যুদ্ধের পিপাসা তৃপ্ত হইতে পারে এবং বিভিন্ন দেশের অর্থের বিনিয়োগ দ্বারা বাণিজ্যের বাজারের জন্য যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে বলিয়াও সান্তায়না বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু শিল্পের উপর তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। শিল্প যেমন শান্তির তেমনি যুদ্ধেরও পরিপোষক হইতে পারে।

সান্তায়না শিল্পপ্রধান গণতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার মতে সভ্যতার অর্থ সাধারণের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের জীবনযাপন প্রণালীর প্রসার। সাধারণ জনগণের মধ্যে সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। উৎপত্তি হইয়াছে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। আধুনিক জাতিদিগের অন্তর্গত জনগণের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমিক। কোনও জাতির মধ্যে যদি কৃষক ও শ্রমিক ভিন্ন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সে জাতি বর্ব্বরই থাকিয়া যাইবে। কোনও উদার ঐতিহ্য তাহার থাকিবে না, দেশ-প্রেমের যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক সারভাগও নষ্ট হইয়া যাইবে। দেশ-প্রেমের আবেগ যে তাহারা অনুভব করিবে না, তাহা নহে। কেননা সাধারণ জনগণের মধ্যে উদারতার অভাব নাই। প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তাহাদের আছে, নাই অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে, তাহাদিগকেই অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে হইবে।

সান্তায়না সাম্যের আদর্শে বিশ্বাস করেন না। মানুষের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আছে, সকল মানুষ সমান হইতে পারে না। যাহারা সমান নয়, তাহাদের সাম্যই অসাম্য। তাই বলিয়া তিনি অভিজাততন্ত্রের দোষের প্রতি অন্ধ নহেন। অভিজাততন্ত্রের পরীক্ষা ইতিহাসে হইয়া গিয়াছে। সেই পরীক্ষায় তাহার দোষও দেখা গিয়াছে—দোষ ও গুণ সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অভিজাততন্ত্রে অভিজাত শ্রেণীর বাহিরের প্রতিভাবান ব্যক্তিরও উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা নাই

অভিজাততন্ত্রে অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ সীমাবদ্ধ; তাহাদের বাহিরের শক্তির বিকাশ এই তন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অভিজাত-তন্ত্রে যেমন সংস্কৃতির উন্নতি হয়, তেমনি অত্যাচারেরও সুযোগ ঘটে। সামান্য কতিপয় লোকের স্বাধীনতা লক্ষ লক্ষ লোকের দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনও সমাজ যে পরিমাণে তাহার অন্তর্ভুক্ত জনগণের জীবনের পূর্ণতা-সাধন এবং তাহাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, তাহার দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হয়। এইদিক হইতে গণতন্ত্র অভিজাত-তন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে কেবল যে উৎকোচের প্রাচুর্য্য থাকে, তাহা নহে; গণতন্ত্র কার্য্যে অপটু। গণ-তন্ত্রেরও এক বিশেষ প্রকারের অত্যাচার আছে। তাহা হইতেছে একাকারের (uniformity) উপর অসাধারণ অনুরাগ। বেনামী অত্যাচারের অপেক্ষা ঘৃণিততর কোনও অত্যাচার নাই। এই অত্যাচার সর্ব্বব্যাপী, ইহার ভীষণ মূর্খতার ফলে যাবতীয় নূতনত্ব এবং প্রতিভার উন্মেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানকালের লোকের বিশৃঙ্খলা এবং অত্যধিক ত্বরান্বিত জীবন সান্তায়নার অতিশয় অপ্রীতিকর। পূর্ব্বে লোকে স্বাধীনতাকেই পরম মঙ্গল বলিয়া গণ্য করিত না, বিজ্ঞতা ও স্বীয় অবস্থাতে সন্তোষই মঙ্গল বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ থাকিলেও, সেই অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয় বলিয়া গণ্য হইত। সান্তায়নের মতে বিজ্ঞতা ও এবম্বিধ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাতে সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই হয়তো অধিকতর সুখ ছিল। লোকে জানিত, যে পৃথিবীতে জয়লাভ অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। বর্ত্তমানে গণতন্ত্রের কেহই তাহার অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, প্রত্যেকেই বড় হইতে চায়। ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে শ্রেণী জয়ী হয়, তাহার দ্বারাই উদার-নীতিও (যে নীতির দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়) বিনষ্ট হয়। বিপ্লবেরও পরিণতি ইহাই। টিকিয়া থাকিতে হইলে বিপ্লব-কর্ত্তৃক যে অত্যাচারের অবসান হয়, বিপ্লবকে তাহাই আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। পৃথিবীতে বহুবার বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনাচারের অবসান হয় নাই। প্রত্যেক সংস্কার দ্বারা নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার নূতন অনাচার উদ্ভূত হইয়াছে।

সমাজ যেভাবে গঠন করো না কেন, ফল একই। সমাজের বিভিন্ন-রূপের মধ্যে পার্থক্য তত বেশী নাই। সমাজকে যদি কোনও বিশেষরূপ দিতেই হয়, তবে Timocracy প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা উচিত। গুণশালী ও আত্মসম্মান বিশিষ্ট লোক-কর্ত্তৃক শাসন ব্যবস্থাকে সান্তায়না Timocracy বলিয়াছেন। এই শাসন তন্ত্র একপ্রকার অভিজাত তন্ত্র; কিন্তু ইহাতে বংশগত শাসন নাই। প্রত্যেক নরনারীর ক্ষমতা অনুসারে উন্নতির পথ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত; রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদও তাহার নিকট উন্মুক্ত। কিন্তু কাহারও পশ্চাতে অসংখ্য লোকের সমর্থন থাকিলেও, তিনি যদি অনুপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ। বড় হইবার সুযোগ সুবিধা সকলের পক্ষেই সমান। এই সাম্যই রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত সাম্য। এইরূপ শাসন-তন্ত্রে উৎকোচ, স্বজনপ্রিয়তা প্রভৃতি অনাচার কমিয়া যাইবে, বিজ্ঞান ও কলা উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে গণতন্ত্র ও অভিজাত তন্ত্রের এবম্বিধ সমন্বয়ের জন্যই মানব সমাজ উৎসুক হইয়া আছে। সমাজে যাহারা সর্ব্বোত্তম তাহারাই শাসন করিবে, কিন্তু প্রত্যেকেই সর্ব্বোত্তমদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। ইহা যে প্লেটোর মত, তাহা সুস্পষ্ট।

বিশ্বাস ও সংশয়

"সংশয়বাদ ও জৈব বিশ্বাস" (Scepticism and Animal faith) সান্তায়নের শেষ গ্রন্থ। ষষ্টি বর্ষ বয়সে সান্তায়না এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার যৌবনকালে লিখিত গ্রন্থের সুষমা ও চিন্তার গভীরতা বর্ত্তমান। তাঁহার মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান (Epistemology) দ্বারা দর্শনের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি দর্শনের গতিপথের বাধা বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অধ্যাত্মবাদ সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের প্রত্যয়ের মাধ্যমেই যে আমরা জগতের পরিচয় লাভ করি, তাহা সত্য। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর যাবত জগৎকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও আমাদের কাজ সুন্দরভাবেই চলিয়াছে; সংবেদনগণ জগতের সত্যরূপ আমাদিগকে দান করে, এই বিশ্বাসে আমাদের জীবনের কোনও ক্ষতিই হয় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতেও কোনও ক্ষতি হইবে না, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। এই বিশ্বাস—সংবেদন জগৎকে যেরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, তাহা সত্য, এই বিশ্বাস,—আমাদের জীবত্ব হইতে উদ্ভূত; ইহা সর্ব্বজীব—সাধারণ। এই বিশ্বাসকে পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাসের সদৃশ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এটা যে একটা উৎকৃষ্ট কাহিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ইহাতে বিশ্বাস করিয়া জীবনযাত্রা সুন্দরভাবে চলে। যুক্তির মূল্য অপেক্ষা জীবনের মূল্য অধিক। হিউম মনে করিয়াছিলেন, যে প্রত্যয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার সত্যতা নাই প্রমাণ করিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। যে সন্তানের পিতা-মাতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় "প্রাকৃতিক সন্তান" বলে, এবং প্রাকৃতিক সন্তান অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়। হিউমও যাহা প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবৈধ বলিয়াছেন। কিন্তু "সকল শিশুই কি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয় না?" এই প্রশ্ন যে ফরাসী মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞতা হিউমের দর্শনের মধ্যে ছিল না। অভিজ্ঞতার সত্যতায় সন্দেহ জার্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে একপ্রকার পীড়ায় পরিণত হইয়াছে। উন্মাদে যেমন হস্তে বিন্দুমাত্র ময়লা না থাকিলেও অনবরত হাত ধুইয়া থাকে জার্মান দার্শনিকদিগের পীড়াও তদ্রূপ। কিন্তু যে সকল দার্শনিক তাঁহাদের মনের মধ্যেই জগতের ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করেন, তাহারা যে ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জীবনে তো তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তু যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই বিশ্বাসের কোনও প্রমাণ তাঁহাদের জীবনে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক জগতের যে ধারণা আমাদের আছে, তাহা বর্জন করিতে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাহাতে অবিশ্বাস করিতে তাঁহারা আমাদিগকে বলেন না। (কেবল তর্কের সময়ই এই বিশ্বাস বর্জন করিতে বলেন)। যখনই আমরা তর্ক করিনা, তখন যে মত আমরা গ্রহণ করি না, সেই মত সমর্থন করা লজ্জা-জনক। যে পতাকার ছায়ায় আমরা বাস করি, তাহা হইতে ভিন্ন পতাকার অধীনে যুদ্ধ করা কাপুরুষোচিত ও অসাধু। এই জন্য স্পিনোজা ভিন্ন অন্য কোনও দার্শনিক সান্তায়নার দৃষ্টিতে পূর্ণ দার্শনিক নহেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মিম্মির বলিতেছিলেন, "তার নাম ছিল তানে। আমার ভৃত্য আবাস তাকে কিনে এনেছিল সিরিয়ার হাট থেকে। আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা পিওনি মারা যাবার পর একটি পরিচারিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, আবাসকে তাই সিরিয়ার হাটে পাঠিয়েছিলাম। পঞ্চদশী তানেকে কিনে নিয়ে এল সে। রজনীগন্ধার শুভ্রতা, সৌরভ আর তনিমার সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মদিরতা মেশালে যা হয় তানে তাই ছিল। দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম, মনে হ'ল ওলিম্পাসের কোনও দেবী বুঝি ছলনা করতে এসেছেন আমাকে, হয় তো আফ্রোদিতে নিজেই এসেছেন। আবাসকে বললাম, তোমার রসবোধের উপর আমার আস্থা ছিল, তুমি যে ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য রজনীগন্ধার ডাল নিয়ে আসবে তা কল্পনা করিনি। আবাস বললে—ওকে দেখে ভাল লাগল তাই নিয়ে এসেছি। কাফ্রী ওথাকেও এনেছি, সেই পরিচারিকার কাজ করবে। প্রশ্ন করলাম—তানে করবে কি? আবাস মৃদু হেসে বললে, ও বিশেষ কিছু করবে না, ও আশে-পাশে থাকবে খালি, যদি আদেশ করেন গান করতে পারে মাঝে মাঝে। তানের রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, গান শুনে আত্মহারা হলাম। তারপর একবছর, দু'বছর, তিন বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল স্বপ্নের মতো। মনে হল ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ, হারিয়ে ফেলছি নিজেকে, তারপর আবার সহসা একদিন অনুভব করলাম অবসাদ এসেছে। আবিষ্কার করলাম, তানের পদ-শব্দ শোনবার জন্যে আর আমি উৎকর্ণ নই, তার তন্বী দেহকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধবার আগ্রহ আর আমার নেই। অপসৃয়মান রঙীন মেঘের মতো তানে ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তানেও সেটা অনুভব করেছিল সম্ভবত। সে একদিন বললে এসে—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই। মাকে অনেকদিন দেখি নি, দেখে আসি। তানের মা-বাবা আছেন কিনা, কোথায় তাঁদের বাড়ি, যে মেয়েকে তাঁর হাটে বিক্রি করে' দিয়েছেন তার প্রতি তাঁদের স্নেহ অটুট আছে কি নেই—এসব কোনও প্রশ্নই আমি করলাম না। তাকে ছুটি দিলাম। সে যখন চলে গেল তখনই যেন তাকে আবার পেলাম, তার স্বপ্ন, তার অভাব, তার অনবদ্য রূপের শত সহস্র প্রকাশ আমার চিত্তকে আকুল করে তুলল। মনে হ'তে লাগল সে যখন কাছে ছিল তখন তাকে এমনভাবে পাই নি। সেই সময় ঠিক আর একটা জিনিসও আমার চোখে পড়ল। চোখের সামনে সেটা চিরকালই ঘটছিল; কিন্তু দেখতে পাই নি···"

মিম্মির নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, মনে হইল তিনি যেন অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা নবদৃষ্টিলাভ করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যেন মনে মনে তাহাই আবার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্ধকার অরণ্যের ঝিল্লীকুল আকুল ঝঙ্কারে যেন সেই দর্শনের পটভূমিকা সৃজন করিতেছে।

কৌতূহলী সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল, "কি চোখে পড়ল আপনার" "শেফালী ফুলের গাছ একটা। আমি যে ঘরে বসতাম সেই ঘরের জানালা দিয়ে সম্পূর্ণ গাছটা দেখা যেত। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম গাছের তলায় অজস্র ফুল পড়ে রয়েছে। রোজই পড়ে থাকে, কিন্তু সেদিন তাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম। মনে হল ওই শেফালী তরুটি যে ফুলগুলিকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত শত শত বৃন্ত বন্ধনে সাগ্রহে বেঁধে রেখেছিল সেগুলিকে কত সহজে ত্যাগ করেছে। এই যে ওর এতগুলি সন্ততির শবদেহ ওর পদপ্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এর জন্য ওকে তো শোকাকুল মনে হচ্ছে না, ওর শাখাপত্রগুলি তো অবনমিত হয় নি। বাতাসের হিল্লোলে ও আগেও যেমন আনন্দিত হ'ত, এখনও তেমনি হচ্ছে। তারপরই লক্ষ্য করলাম ওর শাখায় শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি রয়েছে, একটু পরেই সেগুলি ফুল হয়ে ফুটবে।

মনে হল রহস্যটা যেন বুঝলাম একটু। ত্যাগ করতে পারে বলেই গাছ নূতন ফুলের স্বপ্নে আকুল হ'তে পারে। পুরাতন ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে পারত না। যে ফুলগুলোকে ও ত্যাগ করতে পেরেছে তারাই আবার ফিরে আসছে ওর নবমুকুলের স্বপ্নে, নবকুসুমের বিকাশে। পুরোনো ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে এসব হত কি? বিচ্ছেদ না থাকলে কি মিলন মধুর হয়? ত্যাগ না করলে কি ভোগের আনন্দ পাওয়া যায়! শেফালী তরুর ভিতর আমি সেদিন যে সত্যের ইঙ্গিত পেলাম তা নিজের মধ্যেই আমি স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করছিলাম তানের বিরহ-বেদনার নিগূঢ়-নিবিড় অনুভূতিতে। বুঝতে পারছিলাম তানে দূরে চলে গেছে বলেই আরও নিকটে পেয়েছি তাকে।···"

পুনরায় মিস্মির নীরব হইলেন। ঝিল্লী-ঝনৎকার সহসা যেন বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল অন্ধকারের নিবিড়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একদল উন্মত্ত সুর আকুলভাবে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে, যাহা খুঁজিতেছে তাহা না পাইলে বুঝি তাহাদের জীবনান্ত ঘটিবে। সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, মিস্মিরের নয়ন দুইটি ক্রমশ নিমীলিত হইতেছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিমীলিত নয়নে তিনিও আকুল ঝিল্লীঝঙ্কারের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা সোৎসুকে মিস্মিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মিস্মির অবশেষে অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, "সেদিনকার রাত্রিও এমনি ঝিল্লী-মুখরিত ছিল···"

"কি ঘটেছিল সে রাত্রে"—সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"একবাহু ঋষির দেখা পেয়েছিলাম। গোড়া থেকে ঘটনাটা বলতে হবে। তানের বিচ্ছেদে যখন আমি অধীর হয়ে উঠেছি তখন সে হঠাৎ ফিরে এল একদিন, আরও মনোহারিণী হয়ে ফিরে এল। মনে হতে লাগল অপূর্ব্ব স্ফটিক পাত্রটি এতকাল শূন্য ছিল এবার পূর্ণ হয়েছে, সুরায় না অমৃতে, তা প্রথমে বুঝতে পারি নি। প্রথমে মনে হয়েছিল সুরায়, কিন্তু পরে সে ভুল ভেঙেছিল। পরে বুঝেছিলাম তানে মানবী নয়, দেবী। তার উৎফুল্ল যৌবন যে মাধুর্য্যরসে কানায় কানায় ভরে' উঠেছিল তা মদিরা নয়, অমৃত। তানে আসবার কিছুদিন পরেই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম তাকে নিয়ে। বাল্যকাল থেকেই দেশভ্রমণ করা আমার আমাকে বাল্যকাল থেকে। অশ্ববাহিত রথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা দু'জনে। স্থল পথ শেষ হয়ে গেল, সুরু হল জলপথ। সমুদ্রতীরে কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর অর্ণবপোত পাওয়া গেল একটা। শুনলাম সেটা সিরিয়া যাবে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। তাতেই চড়ে বসলাম। তানে বললে, সিরিয়া থেকে একটা স্থলপথ পারস্য অভিমুখে গেছে। সে পথে ইচ্ছা করলে আমরা পারস্যে যেতে পারি। পারস্য থেকে গান্ধার হয়ে আর্য্যাবর্ত্তে যাওয়া যাবে। তাই হল। পথে যে কত কি দেখলাম, কত কি অনুভব করলাম, কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে আর তানেকে আবিষ্কার করলাম তার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই আমার। সে চেষ্টাও করব না, কারণ আমার মানসকাননে যে সব স্মৃতি অপূর্ব্ব ফুলের মতো ফুটে আছে সেখান থেকে তাদের তুলে এনে বাইরে ঘাঁটাঘাটি করবার প্রবৃত্তি নেই। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে কখনও পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও শকটে, কখনও দোলায়, কখনও উষ্ট্রবাহিত হয়ে; কখনও নৌকায় পথে প্রান্তরে মরুভূমিতে, অরণ্যে কাননে নদীতে সমুদ্রে আমরা দু'জনে যে অমৃত আহরণ করেছিলাম তার ভাণ্ডার আজও অক্ষয় হয়ে আছে, কখনও নিঃশেষ হবে না। শেফালী গাছের শাখায় শাখায় রূপের স্বপ্ন যেমন নিঃশেষ হয় না···"

মিস্মির আবার নীরব হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"অবশেষে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলাম আমরা। হিমালয়ের এক উপত্যকাতেই শবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। তখন থেকেই আমি ভালবেসেছি এই বন্য ব্যাধদের। তাদের সরল সাহস, অকপট আতিথেয়তায় আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। এখানে এসে তাই ওদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। হিমালয়ের বনাকীর্ণ উপত্যকায় পশু চর্ম্মে আর পাখীর পালকে দেহ আবৃত করে, ধনুর্ব্বাণ দিয়ে পশুপক্ষী শিকার করে, পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করে' শিখর থেকে শিখরান্তরে ভ্রমণ করে' আমি আর তানে যে উদ্দাম বন্যজীবন যাপন করছিলাম তাতে সহসা একদিন চে· পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা বাঘের সন্ধান করছিলাম।

তানের হাতে ছিল ধনুর্ব্বাণ। তানেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেবী আরটেমিস সশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন—”

“আরটেমিস কি ধরণের দেবী ?”—উৎসুককণ্ঠে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

“আরটেমিস ? ঠিক ও ধরণের দেবী আপনাদের মধ্যে আছে কিনা জানি না। আরটেমিস জীব হনন করেন, জীব পালনও করেন। তিনি রূপসী, তাঁকে দেখে তাঁর প্রণয়ে পড়ে' অনেকে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও প্রণয়-পাশে বাঁধা পড়েন নি। কেউ কেউ বলে—তিনি ঘুমন্ত এন্‌ডিমিয়নকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আমারও মনে হয় ওটা ঠিক নয়। আরটেমিস চিরযৌবনা, চিরকুমারী, চিরপ্রদীপ্তা, কানন কাণ্ডারের বিজয়িনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এইরূপেই তাঁকে কল্পনা করতে ভাল লাগে। তানেকে দেখে আমার মাঝে মাঝে আরটেমিসের কথা মনে হ'ত। কিন্তু সেটা আমার ভুল, তানে নিজেকে উৎসর্গ করে' দিয়েছিল আমার কাছে।...”

পুনরায় মিস্মির নীরব হইলেন। সুন্দরানন্দ কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ নীরব থাকতে দিলেন না।

“তারপর কি হল ? বাঘের অনুসরণ করতে করতে কোথায় গিয়ে পড়লেন আপনারা—?”

“অনুসরণ ঠিক নয়, সন্ধান করছিলাম আমরা বাঘটার। একটা ঝরণার ধারে একটা বিরাট বন্য মহিষকে মেরেছিল বাঘটা। আমরা আশা করেছিলাম সে আশে পাশে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমরা দু'জনে কাছাকাছি এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম যেখান থেকে মৃত মহিষটাকে দেখা যাবে। কিছুদূরে একটা টিলার শীর্ষদেশে সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ দেখতে পেলাম, সেইটের উপরই চড়ে' বাঘের প্রতীক্ষা করব এই ঠিক করে সেই দিকেই এগিয়ে গিয়ে তার উপরই আরোহণ করলাম আমরা। জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল, গাছের উপর থেকেও মৃত মহিষটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু গাছের উপর চ'ড়ে এমন আর একটা জিনিস দেখতে পেলাম যা শুধু বিস্ময়কর নয়, আতঙ্ক-জনকও।...”

মিস্মির চুপ করিলেন।

“কি দেখলেন ?”

দেখলাম, যা তা অদ্ভুত। আমরা যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের আর একটা উপত্যকা। সেই উপত্যকার অন্তপ্রান্ত থেকে আবার পর্ব্বতশ্রেণী উঠেছিল। উপত্যকাটি ছোট, আমরা দেখতে পেলাম একটি গুহার সম্মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর তার সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দীর্ঘকায় পুরুষ বসে' আছেন। তাঁর একটি বাহু অবশিষ্ট বাহুটিও তিনি আগুনের শিখার মধ্যে করিয়ে দিচ্ছেন, যে ভাবে আমরা উনুনে কাঠ দিই। সেই ভাবে ! মাঝে মাঝে আবার বার করেও নিচ্ছেন হাতটা। আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে' থেকে আবার সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে। তানে বললে লোকটা হয়তো পাগল, কিম্বা কোনও তান্ত্রিক যাদুকর। চল দেখে আসি ব্যাপারটা কি। গেলাম দু'জনে। কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটি সত্যিই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গোপ দাড়ি আর অবিন্যস্ত কেশভারে মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। চোখ দুটি অঙ্গারের মতো জ্বলছে। কিন্তু সে দীপ্তিতে দাহ নেই, প্রশান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন বিকীর্ণ হচ্ছে তার থেকে। আমাদের দিকে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তারপর একটু হেসে সংস্কৃত ভাষায় বললেন—স্বাগতম্। আমি আর তানে একটু একটু সংস্কৃত শিখেছিলাম, আলাপ করতে খুব বেশি অসুবিধা হ'ল না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি করছেন আপনি। তিনি বললেন, যজ্ঞ করছি। আর্য্যাবর্তে খুব যজ্ঞ হয় একথা শুনেছিলাম, কিন্তু তা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা কল্পনা করিনি। আমাদের দেশেও দেবতার উদ্দেশ্যে একরকম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাতে পশুমাংস অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হত। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি আর একটু হেসে বললেন, যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক। আমার প্রিয়তম ছিল হাত দুটি, সেই দুটিই দেবতাকে দেব একটি দিয়েছি, আর একটি দিচ্ছি। আমাদের মুখে কথা সরছিল না। আমাদের দিকে আরও ক্ষণকাল থেকে তিনি বললেন, আপনাদের দৃষ্টি থেকে ক্ষরিত হচ্ছে। অনুকম্পার কোনও প্রয়োজন নেই, কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আপনারাও আনন্দিত হোন। তানে বললে—হাত

প্রিয়। এই হাত দিয়ে আমি না করেছি কি? শিকার করেছি, বীণা বাজিয়েছি, ফুল তুলেছি, মূর্ত্তি গড়েছি, ছবি এঁকেছি, কবিতা লিখেছি, দেবতার জন্য নির্ম্মাল্য রচনা করেছি। আমার হাতের কিছু কীর্ত্তি এখনও আমার গুহার মধ্যে সঞ্চিত আছে। যদি কৌতূহল হয়, কাল সকালে এসে দেখে যাবেন। এখন আপনারা যান। আপনারা থাকলে আমার আরাধনা বিঘ্নিত হবে। কাল সকালে আসবেন ওই গুহায় আমি থাকব। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে আমরা দু'জনে সেই দেবদারু বৃক্ষশীর্ষে পাশাপাশি বসে' রইলাম। কারও মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না। পারিপার্শ্বিক আর পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম না কেউ। একদিকে সেই বন্য মহিষের শবটা পড়েছিল, আর একদিকে দেখা যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই যাজ্ঞিককে, মাঝে মাঝে হাতটা তুলে অগ্নিশিখার ভিতর দিচ্ছেন আবার বার করে' নিচ্ছেন। চতুর্দ্দিকে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে পর্ব্বতমালা, উদ্দাম ঝিল্লীধ্বনি মন্থর হয়ে এসেছে অরণ্যের জটিলতায়, নিষ্ঠুর শার্দ্দূলের আগমন প্রতীক্ষায় থম থম করছে চারিদিক, আকাশের জ্যোৎস্নাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে পর্ব্বতের সানুদেশে, উপত্যকার নৈশ রহস্য ঘনতর হচ্ছে। আমরাও দু'জনে ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তানে বসেছিল আমার বাম উরুর উপর, আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে। সে কি ভাবছিল তখন আমি জানতে পারি নি, পরে জেনেছিলাম। আমি ভাবছিলাম ওই অদ্ভুত যাজ্ঞিকের কথা। "দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক···আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন···!"—তাঁর এই কথাগুলো আমার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কেবল, সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করছিল এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির অদ্ভুত রসে। সেই শেফালী গাছটার ছবি ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হচ্ছিল চোখের সামনে··· অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে আর ঝরাচ্ছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই ওর সাধনা। আমি কি করছি? আমার চোখের ঠিক সামনেই দেবদারুর একটা বক্র শাখা ছিল, সেটা মৃদু হাওয়ায় দুলতে লাগল, আমার মনে হল আমার প্রশ্নটাই বুঝি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে ওই কুটিল কৃষ্ণ শাখায়, যেন দুলে দুলে আমাকে প্রশ্ন করছে, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ···? হঠাৎ তানে বললে, মহিষটা তো আর দেখতে পাচ্ছি না। দেখলাম সত্যিই মহিষটা নেই। বাঘ যে কখন্ নিঃশব্দে এসে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা আমরা টের পাই নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম—পূর্ব্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হল এবার গাছ থেকে নেমে শবর-পল্লীতে ফিরে যাওয়াই উচিত। মন্ত্রচালিতবৎ নামলাম, যন্ত্রচালিতবৎ চলতে লাগলাম। কারও মুখ দিয়ে কথা বেরুল না একটিও, অথচ···ঠিক আপনারাও বুঝতে পারছেন কি না জানি না—আমার সমস্ত সত্তা তখন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ, সে ভাবের ঘোরে আমি এমনি বিভোর যে তা প্রকাশ করে' বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলাম না, করলেও ভাষা খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। পোষাক পরিবর্ত্তন করে' শবর পল্লী থেকে যখন ফিরছি তখন তানে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে"

"তুমি"

কথাটা শুনে নীরব হয়ে গেল সে। তার দিকে চেয়ে দেখলাম অপূর্ব্ব একটা জ্যোতি ঝলমল করছে তার চোখের দৃষ্টিতে। আমিও আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। নীরবে একটা খাড়াই অতিক্রম করতে লাগলাম দু'জনে। খাড়াইটার পর ছিল একটা উৎরাই—তারপর উপত্যকা, উপত্যকার অপর প্রান্তে আবার পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাড়ে সন্ন্যাসীর গুহা। গুহায় পৌঁছে দেখলাম, সন্ন্যাসী তাঁর অর্দ্ধদগ্ধ বাহুতে পনীর মাখাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন, আপনারা দু'জনেই কি কাল রাত্রিতে এসেছিলেন? উত্তর দিলাম, হাঁ, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার আচরণে এবং আলাপে যা পেয়েছি তাতে কৌতূহল কমে নি, বেড়েছে। সন্ন্যাসী কিছু না বলে দগ্ধ ক্ষতস্থানগুলিতে পনীর লেপন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর একটু হেসে বললেন, 'গুহার ভিতর প্রবেশ করে' আমার দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তিগুলি যদি দেখেন তাহলে আরও আশ্চর্য্য হবেন।' গুহায় প্রবেশ করলাম। সত্যিই বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাস্কর্য্য এবং চিত্রাঙ্কনের এমন নিদর্শন আর কখনও দেখি নি। বেরিয়ে আসতেই

সন্ন্যাসী বললেন, "ওগুলো সৃষ্টি করেছিলাম আনন্দের প্রেরণায়, এখন যে প্রেরণায় হাত দুটোকে বিসর্জ্জন দিচ্ছি তা আরও মহৎ, আরও সূক্ষ্ম—"। তাঁর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সসম্ভ্রমে চুপ করে' রইলাম, প্রশ্ন করতে সাহস হল না। আমার মনের কথা কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, "আমার হাত দুটো আমার প্রিয় ছিল, কারণ আমার অহঙ্কারকে ওরা তৃপ্ত করত। এরকম অহঙ্কারে একটা আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু মাদকতাও আছে। সমস্ত মাদক জিনিসের মতো এই অহঙ্কারের আনন্দও মনকে অবশেষে অবসন্ন করে'। নূতন খোরাক না পাওয়া পর্য্যন্ত অবসন্ন হয়েই থাকে সমস্ত চিত্ত। আর নিত্য নূতন খোরাকের সন্ধান করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। কারণ খোরাকের সন্ধান করাটাই মুখ্য হয়ে পড়ে, তখন আনন্দটা হয়ে যায় গৌণ। একদিন গভীর রাত্রে এই সত্যের উপলব্ধি হল। বুঝলাম কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে' থাকবার চেষ্টা করলেই দুঃখ। কারণ চিরকাল কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে' থাকা যায় না। জরা মরণ কাউকে খাতির করে না। নিজের প্রিয় বস্তুকে স্বেচ্ছায় দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করলেই নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ দেব-চরণে সমর্পিত বস্তু অমরত্ব লাভ করে কল্পলোকে, নব নব রূপে তা বিকশিত হয় অবস্তু লোকের অমরায়, জরা মরণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মনে পড়ল উপনিষদের বাণী—যতশ্চোদতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি—যাঁর ভিতর থেকে সূর্য্য উদিত হয়, যাঁর ভিতরে আবার সূর্য অস্ত যায়—তাঁর মধ্যেই আমার প্রিয় বস্তুকে সমর্পণ করলে তা নিরাপদ থাকবে—কারণ সেই স্থানই জরা-মরণবিহীন স্থান। এই উপলব্ধি হবার পর থেকে আমি যজ্ঞের আয়োজন করে' আমার হাত দুটিকে দেবতার চরণে সমর্পণ করছি—"

প্রশ্ন করলাম—"কে আপনার দেবতা ?"

"চরাচরে প্রত্যক্ষে-কল্পনায় যিনি প্রকট, তিনিই আমার দেবতা। তিনি সত্য-অসত্য সুখ-অসুখ জ্ঞান-অজ্ঞান বাস্তব-অবাস্তব সবই। কোনও একটি সংজ্ঞায় তাঁকে বোঝানো যাবে না। তিনি নানারূপে প্রকাশিত, নানা আলোকে প্রদীপ্ত। অগ্নি তাঁর হুতবহ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার প্রশ্ন করলাম—বস্তুত প্রশ্ন করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল আমার। প্রশ্ন করলাম, "ক্ষতস্থানে পনীর লেপন করছেন কেন? জ্বালা করছে ?"

তিনি উত্তর দিলেন—"জ্বালা অবশ্য করছে। কিন্তু সেটাকে আমি আমোল দিচ্ছি না। আমি এতে পনীর লাগাচ্ছি, পনীর অগ্নির প্রিয় খাদ্য বলে'। আমার এই হাত শুষ্ক মাংসমেদহীন, বিস্বাদ। পনীর লাগিয়ে সেটাকে একটু সুস্বাদু করবার চেষ্টা করছি—"

তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে' গেল।

আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, ইচ্ছে করলে যে কোনও লোকই কি যজ্ঞ করতে পারে ?"

"প্রত্যেক লোকই যজ্ঞ করছে, কিন্তু সে কথা তারা জানে না। দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ মানেই যজ্ঞ, তার সদ্য ফল আনন্দ। প্রত্যেক মানুষই আনন্দলাভের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ করছে। কারণ ত্যাগ না করলে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায় না। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—কথাটা মিথ্যে নয়। আপনারা সবাই যজ্ঞ করছেন, কিন্তু জানেন না সে কথা"—তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"আপনিও করছেন। কিন্তু খুব ভালভাবে করছেন না। মন যেদিন বৃহৎ আনন্দের দাবী করবে, ভূমা যখন সীমার প্রান্ত-রেখার পরপারে আভাসিত হবে, তখন আপনিও তার মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, প্রিয়তমকে যজ্ঞের বলি করতে আপনিও তখন আর ইতস্তত করবেন না, বুঝতে পারবেন যে প্রিয়তমকে চিরন্তন করতে হলে তাকে ত্যাগ করতে হয়"—আর একটু থেমে তানের দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি আপনার কে হন—?"

"আমার প্রিয়তমা"

"হয় তো এঁকেই তা হলে যজ্ঞের বলি হতে হবে একদিন"

আমি আর তানে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।...

মির্ম্মির পুনরায় নীরব হইয়া গেলেন। আরণ্য শুব্ধতাকে বিচলিত করিয়া অসংখ্য প্রকার ধ্বনি অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহসা সুন্দরানন্দের কর্ণে বেদমন্ত্রের মতো ধ্বনিত হইল। মনে হইল অসংখ্য অদৃশ্য উদ্গাতা যেন সামবেদ গান করিতেছেন। তিনি একাকিনী

হার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ অনুভূতি তাঁহার আর কখনও হয় নাই। তাঁহার এই অনুভূতি রহস্যময়ভাবে মিম্মিরের অন্তরেও সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন, "শুনছেন কুমার, বসুন্ধরার আত্মনিবেদনের ভাষা? সমস্ত নিখিল বিশ্ব জুড়ে যজ্ঞ চলছে, সবাই দিতে চাইছে, সবাই ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের ক্ষণিক খোলস ছেড়ে শাশ্বত লোকে যেতে চাইছে। তানেও চেয়েছিল। সবাইকে চাইতে হবে একদিন—"

"তানের কি হল তারপর—?" সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"তানে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে উঠে আমাকে বললে, শুনছ হেরোডোটাস? শুনতে পাচ্ছ কিছু?"

সেদিনও এমনি ঝিল্লীধ্বনি দিগদিগন্ত ঝঙ্কৃত করছিল। ঝিল্লীধ্বনি ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে কথা বললাম তাকে।

তানে বলল—"কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?"

"কই না—"

"ভাল করে' শোন—"

শুনতে পেলাম না কিছু।

তখন তানে বললে, "কচি ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?"

"কচি ছেলের কান্না? কই না"

"আমি পাচ্ছি"

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে নিজেও কাঁদতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কিছু, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেঁদে তানে বললে, "একটা কথা তোমাকে এতদিন বলি নি, আজ বলছি। তোমার কাছে আসবার আগে আমার একটি ছেলে হয়েছিল। সে কিন্তু বেশী দিন বাঁচে নি। তারই কান্না আজ ক'দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে কোথাও যেন আছে, কোথাও যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। দেহের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি বলে যেতে পারছি না আমি তার কাছে। খাঁচাটা আমার ভেঙে দাও তুমি।" শুধু সেদিন নয়, প্রতি রাত্রেই সে ধড়মড় করে' বিছানায় উঠে বসত, উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনত খানিকক্ষণ, তারপর বলত— "ওই সন্ন্যাসীর মতো তুমিও যজ্ঞের আয়োজন কর, আর সে যজ্ঞে বলি দাও আমাকে। আমিই তো তোমার প্রিয়তমা, আমাকেই উপহার দাও, দেবতার উদ্দেশে আমাকেই উৎসর্গ কর অগ্নিমুখে..."

মিম্মির চুপ করিলেন।

"তারপর?"—

"তাই করতে হল অবশেষে।..."

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-গর্জ্জনে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মিম্মির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে গিয়া অনুরূপ আর একটা গর্জ্জন করিলেন। নিবিড় অন্ধকার হইতে সিংহের প্রত্যুত্তর আসিল। মিম্মির তাহার উত্তরে এমন একটা শব্দ করিলেন—যাহা আদেশ, অনুনয় এবং গর্জ্জনের অদ্ভুত সমন্বয়—তাহা যেন ক্ষুধার বাঙ্ময়ী রূপ...। পরমুহূর্ত্তেই খুব কাছেই সিংহটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মিম্মির ভিতরে আসিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপনকরত সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গর্জ্জন।

মিম্মির হাসিয়া বলিলেন, "সিংহ বন্দী হল—"

তারপর সহসা সুন্দরানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কুমার আপনি একটা যজ্ঞের আয়োজন করুন। যে পশুশক্তির উন্মাদনায় আমরা অহঙ্কৃত, অথচ যে শক্তি সামান্য কামের বা সামান্য লোভের ফাঁদে তুচ্ছ হয়ে যায়—সেই পশুশক্তির প্রতীক এই পশুরাজকে সেই যজ্ঞে বলি দিন"

সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "আপনিই তো এখনি বললেন যা প্রিয়তম, তাই দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হয়। সিংহ আমার প্রিয়তম নয়। আপনার তানের মতো আমার যদি কেউ থাকত তাহলে করতাম—"

"আপনারও তো আছে"

মিম্মির সুরঙ্গমার দিকে চাহিলেন।

সুন্দরানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তানের মতো সুরঙ্গমা কি আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে রাজি হবে! ওর এখন ভরা যৌবন—"

অপ্রত্যাশিতভাবে সুরঙ্গমা বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় রাজি হব, করুন আপনি যজ্ঞের আয়োজন। জীবনে অনেক ভোগ করেছি, এখন আর মরতে আপত্তি নেই। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে ডুবে যাওয়াই তো ভাল, দুঃখ কখন কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে জানি না তো। আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন। আমি সানন্দে সেই যজ্ঞের বলি হ'ব"

"চমৎকার—চমৎকার—"

মিম্মির সহর্ষে হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

কুমার সুন্দরানন্দের মুখভাবে যদিও বিষাদের ছায়া পড়িল কিন্তু তাঁহাকে বলিতে হইল "বেশ তো—"

বিদেশী মিম্মিরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া কি চলে? সুন্দরানন্দের মনে হইল নিজের দুর্ব্বলতার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। সত্য সত্যই যজ্ঞের আয়োজন শুরু হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

দেবান্ ভাবয়তানেন

কবিরাজ শ্রীসুধীররঞ্জন সেন পঞ্চতীর্থ, এল্, এম্, এস্, (ন্যাট্)

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥—গীতা ৩।১১

হে অর্জ্জুন, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা, "তদর্থং কর্ম্ম" দ্বারা দেবতাদের ভাবনা কর, দেবতারাও তোমাদের ভাবনা করুন। এই প্রকার পরস্পর ভাবনা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনা দ্বারা তোমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।

দেবতা কি জান? সমুদ্রে তরঙ্গমালার মত শক্তিস্বরূপিণী মায়ের আমার তরঙ্গসমূহ দেবতারূপে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, দেহের অণুতে অণুতে অনুস্যূত। আমরা জানিনা, চিনিনা, বুঝিনা, তাই মহাশক্তির এই বিশেষ বিশেষ বিকাশ বা বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ এই দেবতাকে অস্বীকার করিয়া সংসারে হইয়াছি দীপ্তিহীন, স্থিতিহীন ও শ্রীহীন—অথচ আমাদের পরস্পরের ভাবনা ও সম্বর্দ্ধনার ভিতরেই আমাদের সকল শ্রী, সকল শ্রেয়ঃ লুক্কায়িত। আমাদের দেহ, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় এই দেবতাদিগেরই আধার, আশ্রয় ও লীলাক্ষেত্র। বাইরে অসীম, অফুরন্ত আকাশ, স্পর্শময় অনন্ত বায়ুমণ্ডল, রসময় রসাল জলদজাল, দিগন্তপ্রসারী প্রশান্ত সাগর—এ সমস্ত মায়েরই আমার বিশিষ্ট প্রকাশ দেবতারই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। ঐ যে বায়ু কখনও মৃদু, কখনও মধুর, কখনও বা ভীম-প্রভঞ্জনময়, ঐ যে নিবিড় কৃষ্ণ ঘন মেঘের ঘন ঘন গর্জ্জন, আবার ইতস্ততঃ স্তিমিত সঞ্চালন, ঐ যে বালারুণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিমালা, আবার দীপ্ত খর রৌদ্র-জ্বালা, ঐ যে স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু কলতান, আবার রুদ্রতালে প্রলয়ঙ্কর ভয়াল প্লাবন—সবই সেই দেবশক্তির লীলাবিলাস। আবার ঐ যে তোমার অন্তরে—বাহিরাকাশে ভাবরাজীর বিবিধ ভঙ্গিমা, চিন্তাতরঙ্গের রক্ত রঞ্জনা সে শক্তিময়ী দেবতারই শক্তিবিলাস। দেখ, তোমারই অন্তরে দেবতার অধিষ্ঠান, তোমারই অন্তরে দেবলোক অধিষ্ঠিত, তোমরা দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ সেই দেবতারই দান। শ্রুতি বলেন—"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ" ঐতরেয় ২।৪ 'অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, সূর্য্য চক্ষুরূপে অক্ষিতে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মনোরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন।' দেখ সাধক, তোমরা অন্তরে আজ এ কিসের মহা-মহোৎসব, কিসের মহাসমারোহ! যে দেবতার দানে দানে তুমি এমন দিব্য দেহের অধিকারী "দেবান্ ভাবয়তানেন" সে দেবতাকে তুমি ভাবনা কর, সম্বর্দ্ধনা কর, পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। ওরে, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার ঝলকের মত বিদ্যুদ্বরণা মা আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত গতায়াত করেন। প্রতি ইন্দ্রিয় পথে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে চিন্ময়ী মা আমার অর্থাকারে আকারিত হন—তাই ত পদার্থসমূহ ফুটিয়া উঠে। আমরা পদার্থকে পদার্থ বলিয়াই জানি, মায়ের 'পরম পদ' বলিয়া আদর করি না। তাই অপদার্থ হইয়া জগতের বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হইয়াই রহিয়াছি। শ্রুতি বলেন, "পদেন অনুবিন্দেৎ"—পদ বা বিষয়কে অনুসরণ আত্মাকে দেখিতে হইবে। এই বস্তু বা পদার্থ যে তাঁহারই পদক্ষেপে চিহ্ন "স পদার্থে পদার্থত্বং স তত্ত্বং যদনুত্তমম্।" তিনি কোথায় করিয়া পদক্ষেপ করেন, বস্তু বা পদদ্বারা তাহা জানা যায় তাই বস্তু পদগুলির নাম পদার্থ। পদে পদে পরমপদকে তুমি প্রত্যক্ষ করি থাক—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাদ লোকাদমৃতা ভবন্তি তুমি অ-মৃত, অভয়-পারংগত হইবে।

আবার বলি, দেবতা কী জান? চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থা প্রকাশের নাম দেবতা। চৈতন্য যখন সর্ব্ববিশেষ বর্জ্জিত নির্ব্বিশে হয়েন, তখন তিনি নির্গুণ, নিরঞ্জন ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। ম কর—একটি পর্ব্বত। বিশুদ্ধ চৈতন্যের যে অংশে "আমি পর্ব্বত" এ বোধ বা সম্বেদন ফুটিয়া উঠে, সেই অংশটির নাম "পর্ব্বতাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতা। এমনিভাবে যে চৈতন্য 'আমি সূর্য্যরূপে', আমি চন্দ্ররূ বা আমি বুদ্ধিরূপে প্রতিভাত, তিনিই যথাক্রমে সূর্য্যদেব, চন্দ্রদেব এ বুদ্ধির অধিপতি দেবতা অচ্যুত। যেমন সব জলই সমুদ্রের জল, তথা নদীর ভিতর যে জল থাকে, তাহাকে নদীর জল বলে কিংবা কূপে মধ্যে যে জল থাকে তাহাকে কূপের জল কহে। সেইরূপ বিশ্বব্যাপি এক মহতী চৈতন্যময়ী শক্তির প্রকাশে সব কিছু প্রকাশমান হইতে প্রত্যেকের বিভিন্ন শক্তি ও সত্তার যে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি তার ন দেবতা; আর সমূহশক্তি বা সমূহমূর্ত্তিই আত্মা—মা। অনন্তশক্তি আমার নিজে অনন্তা, তাঁর ব্যষ্টি শক্তিপ্রকাশ দেবতার সংখ্যাও ত অনন্ত। পুরাণাদিশাস্ত্রে এই অসংখ্য সংখ্যাবোধক কোটি যথা তি বা তেত্রিশ কোটি দেবতার সংখ্যা দেখিতে পাই। বৃহদারণ্যক বলে "অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি—ত্রয়শ্চ চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি" দেবতার সংখ্যা—কোন স্থানে তি শত তিন, কোন স্থানে তিন হাজার তিন উক্ত হইয়াছে।

আবার বলিলেন—"ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি" অর্থাৎ দেবতার সং তেত্রিশ। আমাদের দশ ইন্দ্রিয় বা মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় সত্ত্ব, তম এই তিন গুণে গুণিত হইয়া ত্রিশ বা তেত্রিশ সংখ্যা বিশিষ্ট হয় অবান্তর ভেদে ইহাদেরই অসংখ্য ভেদ হইয়া থাকে।

এই দেবশক্তি বাহিরে চন্দ্রসূর্য্যাদি অধিদৈবরূপে আর তে অন্তঃশরীরে ইন্দ্রিয়াদিরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত। 'দেবান্ ভা তাহাদের তুমি সম্বর্দ্ধনা কর। অথর্ব্ববেদ বলেন,—

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্ব্বে সমাহিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥

যস্ত ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥"

—অথর্ব্বঃ ১০।৭

—তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা যাহার অঙ্গে অবস্থান করেন, তেত্রিশসংখ্যক দেবতা যাহার অঙ্গের অবয়ব স্বরূপ, সকলের আধার ইনি স্কম্ভ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং কেবল ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই এই সব তত্ত্ব জানিতে পারেন। অর্থাৎ এমনিভাবে আপনার শরীরের ইন্দ্রিয়নিচয়রূপে চৈতন্যের প্রবাহকে যাহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তাহাদের কাছেই দেবতাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়। সাধক, তুমি অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়কে "ব্রাত্মা-ত্মাধিষ্ঠানে" ব্রাস্তের মত, অজ্ঞের মত জড় ও চেতনহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ, ভাবিতেছ তোমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বুঝিবা জড়, জড়ত্ব-প্রিয় ও জড়ভাবেই পরিচালিত। কিন্তু তোমার ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারে "ইন্দ্রঃ ইনতে গচ্ছতি ইতি ইন্দ্রিয়ম্" দীপ্তিশীল আত্মদেবতা, ইন্দ্রই যে নিত্য যাতায়াত করেন ইহা প্রত্যক্ষ কর, দেবতার সম্বর্দ্ধন হইবে, আত্মদেবতা আপ্যায়িত হইবেন।

সাধক তোমার চক্ষু এতদিন ভৌতিক রূপ গ্রহণেই ব্যস্ত ছিল, জড় রূপেই মুগ্ধ ছিল, আজ দেখ রূপ মাত্রেই মায়ের রূপ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" তোমার চক্ষু দেবতার সম্বর্দ্ধনা হইবে। কর্ণ এতদিন আন্ কথাই শুনিয়াছে কিন্তু আনন্দ পায়নি; তাকে আজ বলিয়া দাও—সকল শব্দই মায়ের শব্দ, মাতৃ-আহ্বান "যত শোন কর্ণপুটে সকলই মায়ের মন্ত্র বটে" এমনিভাবে মাতৃ-মন্ত্র, প্রণব ঝংকার শুনিতে শুনিতে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" পরিতৃপ্ত হইবেন, তোমার সকল শোনা সার্থক হইবে। কমনীয় স্পর্শের কামনায় তোমার ত্বক্ এতদিন কুরঙ্গের মত ছুটাছুটি করিতেছিল, আজ তার সর্ব্ব অঙ্গে মাতৃস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দিক। এই মত তোমার জীবনের সকল গতি তাঁর দিকেই প্রবাহিত হউক, তোমরা চপল চিত্ত তার চঞ্চল বৃত্তিপ্রবাহে অচঞ্চলা মাকেই আমার চয়ন করুক "শ্রেয়ঃ পরমবাপ্নোতি" পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। দেবী ভাগবত বলেন,—

"তচ্চিত্তং চপলং চিনোতি কুশলং
যস্মিংশ্চলং শংকরে।
তে শ্রোত্রে পরমে শিবামৃতরসং
যাভ্যাং রহঃ শ্রূয়তে।
তে হস্তাঃ শিবধর্ম্মকর্ম্মনিরতাঃ
পূজাপ্রণামোৎসুকাঃ।
তৌ পাদৌ সময়ৌ প্রদক্ষিণরতৌ
নিত্যং বিভো ভাবিতৌ॥"—দেবী ভাগবত

আবার বলি, দেবতা কি জান? বেদের নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য বলেন, 'দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা" যাদের দানে দানে দেহ দীপ্ত হয়, বাস্তব জগতের জ্ঞান পাওয়া যায়, সেই দ্যোতনশীল ইন্দ্রিয়গণই দেবতা' ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে"। আচার্য্য শংকর ইহার ভাষ্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—দেবা দীব্যতে র্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ তদ্বিপরীতাঃ সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। শাস্ত্রীয়প্রকাশবৃত্ত্যভিভবনায় স্বাভাবিকতমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ।" মানব-শরীরে এই দেবাসুরের নিত্য নিরন্তর সংগ্রাম চলিয়াছে। শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেবতা, আর তাহার বিপরীত বিষয়-বাসনারূপ বৃত্তিই অসুর—এই উভয়ে পরস্পরকে অভিভব করার জন্য, নিষ্জিত করার জন্য সতত সমুদ্যত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সাধক, তোমার, চক্ষু যে পরম বস্তু পরমাত্মাকে না দেখিয়া জড় বস্তুতে আকৃষ্ট হয়, জানিও উহা অসুরেরই অত্যাচার—"তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ঞ্চ"—(ছান্দোগ্য) অসুরেরা ইহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল, এই জন্য লোকে চক্ষুদ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে, ভাল মন্দ এই দুই রকমই দেখে। আমরা ভাল ও মন্দ যে চক্ষুতে দেখি, সে চক্ষু অসুরাহত চক্ষু—আসল চক্ষু জ্ঞান চক্ষু—যে প্রজ্ঞা-চক্ষু জগতে এক নূতন দর্শন খুলিয়া দেয়, যেদিকে দৃষ্টিপাত করে সেই দিকেই মাকে দেখে, মাতৃমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। বাইরের জগতে যাহা কিছু হইতেছে—পাখীর গান, নদীর কলতান বা বনের মর্ম্মর ধ্বনিতে, সে দেখে এক মহা-শক্তির খেলা। একটা ফল বা একটি ফুল ফুটিয়া উঠার ভিতরে কত বড় শক্তির ধারা, কত অজ্ঞেয় রহস্যই না লুকায়িত রহিয়াছে। এ যে তাঁর শক্তিমূর্ত্তি—দ্যুতিময়ী, কম্পনময়ী, কামিপল্লবাসিনী মা। উপনিষদের ভাষায় "তদেজতি তন্নৈজতি"। এমনতর যে চক্ষু, যে চক্ষু দৃষ্টি সম্পাত-মাত্রেই মাকে দেখে অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই মাকে প্রত্যক্ষ করে—মা আমার এমনই সুপ্রকট, এমনই স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে চক্ষুকে আক্রমণ করিলে অসুরও যে চূর্ণ হইয়া যায় "যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসেত এব" পর্ব্বতে ঢিল ছুঁড়িলে, ঢিলটি যেমন চূর্ণ হইয়া যায় তেমনতরই হে আমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ, তোমরা অসুরকুলকে নিষ্জিত করিয়া স্ব-স্বরূপে দীপ্ত হইয়া উঠ—" দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ" তোমাদের দেওয়া দৃষ্টি দিয়া আমরাও যেন দেখিতে পারি যে, আমাদের বাহুতে বাহু, চরণে চরণ, হৃদয়ে হৃদয় দিয়া জড়ালো মা আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে আবির্ভূতা! আমরা যা' কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, যা কিছু আস্বাদন করি, সে সবার সত্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা যে একমাত্র মা, আমাই…এই শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিয়া হে দ্যোতনশীল দেবতাবৃন্দ! তোমরা আমাদের অন্তরে নিত্য দীপ্যমান হইয়া উঠ, আমাদের অহং কর্ত্তৃত্ব আত্মদেবতার পায়ে অর্পণ করিয়া আমরা অভয়-পারংগত হই। প্রকাশময় যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে ও বনস্পতিতে, সেই দেবতা, যিনি সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে নমস্কার—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"

—শ্বেতাশ্বেতর

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের আপিস ঘর। সকালবেলা। ভুজঙ্গ খাতাপত্র দেখিতেছে। হঠাৎ সে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "নার্স নার্স"। ক্ষণপরে নার্স বেলা বোসের প্রবেশ

ভুজঙ্গ ॥ আমি তোমাকে বলে এলাম—এখনি আসবে, এত দেরী করলে যে?

বেলা ॥ ইয়েস্ ডক্টর। কারণ ছিল। ডাক্তার চৌধুরী তার বউমাকে হাসপাতাল দেখাচ্ছেন। তিনি যদি আমাকে না ছাড়েন—আমি কি করতে পারি বলুন?

ভুজঙ্গ ॥ বউমাকে হাসপাতাল দেখানো—এটা হল গিয়ে একটা প্রাইভেট ব্যাপার। তার জন্য হাসপাতালের duty suffer করবে—এসব আমি সইব না নার্স। এই Diet Bill টা চেক্ করে আমাকে এ-বেলাই দেবে।

বেলা ॥ (কাগজটা লইয়া) ইয়েস্ ডক্টর।

বেলা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আবার ফিরিল। ভুজঙ্গের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল

বেলা ॥ প্রাইভেট ব্যাপার আপনারও অনেক কিছু দেখলাম ভুজঙ্গবাবু।

ভুজঙ্গ ॥ What do you mean?

বেলা ॥ জয়া চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে টিপে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে হাসপাতালের ডিউটি করছিলেন বুঝি?

ভুজঙ্গ ॥ How do you dare?

বেলা ॥ আমি দেখলাম। আর বলতে পারবো না?

ভুজঙ্গ ॥ বেলা, don't be silly, যাও—কাজে যাও।

বেলা ॥ যাচ্ছি। কিন্তু তিনি কি ভাবলেন!

ভুজঙ্গ ॥ তুমি যাও। তিনি কিচ্ছু ভাবেন নি।

বেলা ॥ হাঁ-যাচ্ছি। কিন্তু এক রাত্রের পরিচয়েই মানুষ এত নির্লজ্জ হতে পারে—এ জানা ছিল না।

ভুজঙ্গ ॥ বেলা—মুখ সামলে কথা বলবে।

বেলা ॥ (রুখিয়া উঠিয়া) কেন? কিসের ভয়?

ভুজঙ্গ তাহার এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া খানিকটা দমিয়া গেল

বেলা ॥ মেয়েদের সর্বনাশ করা আপনার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

ভুজঙ্গ ॥ ছিঃ বেলা। কাজে যাও, please কাজে যাও।

বেলা ॥ না, আমি যাব না। কেন আপনি আমাকে ওখানে ও-ভাবে অসম্মান করলেন?

ভুজঙ্গ ॥ তোমাকে অসম্মান করলাম ওখানে। মানে?

বেলা ॥ আপনি আমাকে বিয়ে করবেন—একদিন ধর্মসাক্ষী রেখে বলেছিলেন। তবেই বাপ-মা ঘর-বাড়ী ছেড়ে আপনার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম এই মদনপুরে। আমার সামনে জয়া চৌধুরীর সঙ্গে চোখ টিপে আর মুখ টিপে হাসা—এ সাহস আপনার এলো কোত্থেকে তাই ভাবছি!

ভুজঙ্গ ॥ মেয়েটিকে আমি জানি—তাই। সে অনেক কাহিনী। আমি তোমাকে বলবো—আমি তোমাকে বলবো বেলা। please কাজে যাও।

বেলা চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণ সান্যালের প্রবেশ

ভুজঙ্গ ॥ আসুন, আসুন নিবারণবাবু।

নিবারণ। কি ভায়া—হঠাৎ জরুরী তলব যে? বুড়ো তো শুনলাম—কাল রাত্রে ছেলে-বউ নিয়ে এসেছে। শুনলাম—বাড়ীতে কাল রাত্রে খুব মাতামাতি হয়েছে। ছেলের বউ এনে বুড়োর হৈ-হল্লা আরো বেড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

ভুজঙ্গ ॥ বসুন। বলছি। ছেলে তো কাল রাত্রেই উধাও। বউএর সঙ্গে নাকি ঝগড়া হয়েছে।

নিবারণ ॥ আসতে না আসতেই ঝগড়া!

ভুজঙ্গ ॥ বাপেরই তো ছেলে! ছিটতো একটু থাকবেই।

নিবারণ ॥ আমাদের ব্যাপারটা কদ্দূর? জজ সাহেবের হুকুম হলো?

ভুজঙ্গ ॥ আজ সকালে এসেছে।

নিবারণ ॥ এসেছে!

ভুজঙ্গ॥ সেই জন্যই তো আপনাকে ডেকেছি। এই নিন্—দেখুন।

নিবারণবাবু চশমাটি চোখে আঁটিয়া জজসাহেবের আদেশ পড়িতে লাগিলেন। উপুড় হইয়া আদেশটি দেখিতে দেখিতে ভুজঙ্গ মন্তব্য করিতে লাগিল

ভুজঙ্গ॥ হতে পারে ওর টাকাতেই এই হাসপাতাল। কিন্তু একবার যখন এই হাসপাতালটা ট্রাষ্টিদের হাতে তুলে দিয়েছেন—তখন এই হাসপাতালের উপর ওর নিজস্ব অধিকার আর কিছু নেই। আপনার-আমার মত উনিও ট্রাষ্টিদের একজন সভ্যমাত্র। দেখছেন—জজসাহেব বলেছেন—গভর্ণমেণ্টের বাঁধা-ধরা নিয়মে এই হাসপাতাল চালাতে হবে—ওর খাম-খেয়াল মত নয়।

নিবারণ॥ তাতো দেখছি। কিন্তু এই যে এইখানটা—আমি তখনই বলেছিলাম, দীনদয়াল চৌধুরীর অসাক্ষাতে, অনুপস্থিতিতে, তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে বোর্ড থেকে সরিয়ে দেবার প্রস্তাব—হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারের পদ থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব—আমরা পাশ করলেও, জজসাহেব সরাসরি তা মেনে নেবেন না। মানেনও নি—এই যে—

ভুজঙ্গ॥ হাঁ, পাকাপাকিভাবে মেনে নেন নি বটে—কিন্তু আপাতত তো রাজী হয়েছেন। এই যে এখানটায় বলেছেন—"বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে একটি হাসপাতালের নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা ও চিকিৎসার উপর। এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মতো প্রকৃতিস্থতা ডাক্তার চৌধুরীর আদৌ আছে কিনা তাহা একটি মেডিকেল কমিশন দ্বারা এই মাসের শেষেই পরীক্ষা করা হইবে। এই পরীক্ষা হইয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার চৌধুরী হাসপাতালের কোন দায়িত্বসম্পন্ন পদেই থাকিবেন না। ট্রাষ্ট বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীভুজঙ্গ মিত্র এই সময়ে ডাক্তার চৌধুরীর দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করিবেন।"

নিবারণ॥ হাঁ, তা দেখছি বটে। কিন্তু তুমি কি ভাবছো ভুজঙ্গ—যে দীনদয়াল জজসাহেবের এই আদেশ মানবে? লোকটা তো আর সত্যিই পাগল হয়নি?

ভুজঙ্গ॥ পাগল হওয়ার যেটুকু বাকী ছিল—জজসাহেবের এই অর্ডার দেখলেই সেটুকু আর বাকি থাকবে না। জজসাহেবের অর্ডার। মানব না বললেই তো আর চলবে না। হাঁ চেঁচামেচি খানিকটা করবে। কিন্তু তা শায়েস্তা করতে আমি জানি।

নিবারণ॥ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু মেডিকেল কমিশন—এই মাসের শেষেই আসছে। সেখানে তো আমাদের ধাপ্পা চলবে না ভুজঙ্গ। তার কি করছ?

ভুজঙ্গ॥ এখনো পনরদিন বাকী? জজসাহেবের এই এক অর্ডারের ঘা খেয়েই বদ্ধ পাগল হয়ে দাঁড়াবে তিন দিনেই। তে-রাত্রি আর পোহাবে না। সে আপনি ভাববেন না নিবারণবাবু। শুধু একটা কথা, ওকে পাগল সাব্যস্ত করতে পারলে, আপনারা যেন আপনাদের কথা রাখেন।

নিবারণ॥ নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তুমি হবে এ হাসপাতালের চীফ-মেডিকেল অফিসার, আর আমার ছে[illegible] হবে তোমার অ্যাসিষ্টাণ্ট। কিন্তু পারবে তো?

ভুজঙ্গ॥ পারি কি না দেখুন—কিন্তু কথা যে ঠিক থাকে।

নিবারণ॥ আমাদের সকলেরই স্বার্থ রয়েছে ভায়া শুধু তোমার একলার নয়। আমি চলি। বুড়োর সাম[illegible] পড়লে আমি যেন কেমন হয়ে পড়ি। কি হয়—খবর দি[illegible]

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির॥ স্যার, কর্তাবাবু বউদিদিমণিকে হাসপা[illegible] দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। রোগীরা স্যার—মহাখুশি হয়ে[illegible] কর্তাবাবু আপনাকেও ডাকছেন স্যার।

ভুজঙ্গ॥ ডাকছেন? আমাকে? গিয়ে বল—[illegible] তাদের ডাকছি এখানে। পাগলামি করার জ[illegible] হাসপাতাল নয়।

যুধিষ্ঠির। আপনি বলছেন কি স্যার?

ভুজঙ্গ॥ (সপদদাপে) বেরিয়ে যা—বেরিয়ে বলছি…

যুধিষ্ঠির ধমকের চোটে চট্ করিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া পা[illegible] দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো "আরে—আরে—আরে। ওট[illegible] যুধিষ্ঠির না? হামাগুড়ি দিয়ে পালালো।" জয়া সহ দীনদয়ালের প্র[illegible]

দীনদয়াল॥ ব্যাপার কি ভুজঙ্গ? যুধিষ্ঠির অমন হামাগুড়ি দিয়ে পালালো কেন? মাথা খারাপ হলো না[illegible]

ভুজঙ্গ ॥ তা হয়তো হবে। পাগলামি ব্যাধিটা অনেক সময় সংক্রামক হয়ে ওঠে। কারো হয়ত ছোঁয়াচ লেগেছে। নমস্কার জয়া দেবী—বসুন।

দীনদয়াল ॥ না, যুধিষ্ঠির দেখছি আমাকে ভাবিয়ে তুললো। হামাগুড়ি দেওয়া দেখছি নতুন লক্ষণ। রোগী মনে করে সে যেন একটি শিশু—হামাগুড়ি দেয়। তবে কি "সাইকুটা ভিরুনা"—আচ্ছা সে দেখব এখন। বুঝলে ভুজঙ্গ, জয়া মাকে হাসপাতাল দেখিয়ে আনলাম। এদিকে শুনেছ তো—গাধাটা বউমার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করে কাল রাত্রেই কলকাতা চলে গেছে।

ভুজঙ্গ ॥ শুনেছি।

দীনদয়াল ॥ বুঝলে ভুজঙ্গ, মানে—'শোণিত-প্রধান, ক্রোধ-প্রবণ, পরিবর্তনশীল স্বভাব। সে যে স্থানে রহিয়াছে সে তাহার গৃহ নহে, এইরূপ বিশ্বাস। শয্যা হইতে উঠিয়া পলায়ন। ভগ্ন-প্রেমের কুফল, স্ত্রী বা স্বামীর চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা--"হায়াসায়াস।" (জয়াকে) না, না, বোধহয় সে রকম কোন চেষ্টা করেনি—কি বলো মা?

ভুজঙ্গ ॥ করে থাকলেই কি উনি তা বলবেন?

দীনদয়াল ॥ আচ্ছা, আচ্ছা মা, সে সব তোমার সঙ্গে আমি পরে আলোচনা করব। তবে এটা ঠিক—জয়ন্তর এখন দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

ভুজঙ্গ ॥ দস্তুর মত চিকিৎসা আরও অনেকের দরকার।

দীনদয়াল ॥ বিশেষ করে তোমার। আজকাল তো তোমাকে কখনো হাসতে দেখি না ভুজঙ্গ। রুক্ষ মেজাজ, ... আচরণ, সশংকভাব···আচ্ছা তোমার কি কখনো ষড়যন্ত্র করার ইচ্ছা হয়? প্রিয়জনের বিরুদ্ধে?

ভুজঙ্গ ॥ নিজের যে ব্যাধি—সেটা বুঝতে না পারাই কি সব চেয়ে বড় ব্যাধি নয় স্যার?

দীনদয়াল ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার লক্ষণটা আমাকে আগে বলো নি কেন? আচ্ছা সে পরে শুনবো। মাকে হাসপাতালের কাজকর্ম সব বোঝাচ্ছি। এই যে মা, এই জিনিষটি দেখ—(বেদীর উপরে রক্ষিত তাজমহলের একটি মর্মর-নির্মিত মডেলের কাছে লইয়া গিয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন) দেখেই বুঝছ—তাজমহলের মডেল। মমতাজের স্মৃতিকে অমর করবার জন্য সাজাহান গড়েছেন এই তাজমহল— আর, আমার মমতার স্মৃতিকে অক্ষয় করবার জন্য আমি গড়ে তুলেছি এই মমতাময়ী হোমিও হাসপাতাল।

ভুজঙ্গ ॥ (ঈষৎ হেসে) হাঁ—উনি হলেন আমাদের এযুগের সাজাহান।

দীনদয়াল ॥ সাজাহান! সাজাহান! আমি এক নতুন সাজাহান। কিন্তু সাজাহান ছিলেন সম্রাট। আর আমি হচ্ছি সেবক। সত্যিকার প্রভু হচ্ছেন তাঁরা—যাঁদের হাতে এই হাসপাতালের পরিচালনার ভার আমি ছেড়ে দিয়েছি—সেই "Board of Trustees." দেখি খাতাপত্রগুলো। (আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং খাতা টানিয়া বাহির করিয়া জয়াকে বলিলেন) বুঝলে মা, এই হচ্ছে ট্রাষ্ট বোর্ডের খাতা। এতে ট্রাষ্টিরা হাসপাতালের পরিচালনা সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব পাশ করেন—তা লেখা থাকে। এর নকল পাঠাতে হয় জজসাহেবের কাছে। তিনি অনুমোদন করলে তবে সে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হয়। (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) এই যে আমাদের শেষ মিটিং এর সব প্রস্তাব। একি! একি! গত ৮ঠা মিটিং হয়েছে! আমাকে না জানিয়ে। আমাকে বাদ দিয়ে? একি! একি! আমি পাগল! আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে প্রস্তাব পাশ করেছ!

ভুজঙ্গ ॥ পাগলকে পাগল বলা ছাড়া উপায় নেই স্যার।

দীনদয়াল ॥ রাস্কেল। আমারই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আমাকে তোমরা বলবে পাগল? তোমরা—যাদের আমি বড় বিশ্বাস করে—আমার যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মূল্যবান —সব—সব—যাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মানিনা—আমি তোমাদের এই প্রস্তাব মানিনা। যাচ্ছি আমি জজসাহেবের কাছে।

ভুজঙ্গ ॥ দাঁড়ান। জজসাহেবের কাছে আর যেতে হবে না। তাঁর অর্ডার এসে গেছে।

দীনদয়াল ॥ কি অর্ডার? দেখি।

ভুজঙ্গ অর্ডারটি সতর্কতার সঙ্গে তাহার সামনে ধরিল

দীনদয়াল ॥ (ধীর স্থির ভাবেই অর্ডারটি পড়িলেন)

রাখিয়াছে। এ শ্রেণীর মনীষা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"! রাথ সীমাহীন মহাপারাবার ; আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গোষ্পদ। ই আমাদেরই সগোত্র একজন মানুষ বলিয়া মনে করিতে হৃদয় স্ফুচিত হইয়া উঠে। জানি, ইহাতে অতিমাত্রায় Hero-worship আছে, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণ র পক্ষে তাঁহার ন্যায় এত বড় একটা প্রতিভাকে উপলব্ধি করিবার জের পক্ষে হস্তীর ধারণার মতই হাস্যকর। অন্ধ যেরূপ হস্তীর টি অবয়বকেই হস্তী বলিয়া ভুল করে, আমরাও সেইরূপ অলোক-রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া মনে করি। দ্যুতিমান হীরকখণ্ডের ছটা যেরূপ তাহার প্রতিটি কোণ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া দর্শককে চমৎকৃত করিয়া তোলে, রবীন্দ্র-প্রতিভার যেটুকু অংশ চোখে পড়ে তাহাও ঠিক্ সেইরূপ আমাদিগকে মুগ্ধ ৎকৃত করে। জ্ঞানে, কর্ম্মে, চিন্তায়, দার্শনিকতায় ও য় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা দেদীপ্যমান। ভাবিতে বিস্ময় হয়—এরূপ একটা মনীষার আবির্ভাব এ দেশে কিরূপে সম্ভব আমাদের এই গড্ডালিকা-প্রবাহের মত জীবন ও সঙ্কীর্ণ য়ার মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যময় রবীন্দ্র-জীবন ও তাঁহার সর্ব্বসংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়জনক! আমাদের পবলে তিনি মহাসমুদ্রের কল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের থদুঃখময় স্বার্থ-কণ্টকিত জীবনের পরিসরকে তিনি বিশ্ববোধ য় বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি কাব্যে, চিত্রে, সমালোচনায়, অভিনয়ে, প্রাণের প্রাচুর্য্যে চিরতারুণ্যের বজয়ন্তী উড়াইয়া গিয়াছেন। একটা কাব্য ও ললিতকলাবিমুখ য় রক্ষণশীল, সর্ব্বপ্রকার নূতনত্বে সন্দিহান জাতিকে ধীরে ধীরে পার প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তোলা, তাহাকে তাহার তনের অন্ধ তিমির হইতে বহির্জগতের আলোকে আনিয়া ত করা এবং কর্ম্মে ও চিন্তায় তাহার নূতনত্ব-ভীরুতাকে করা যে কত বড় মনীষার লক্ষণ তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ন্দ্রনাথ কবি। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ লক্ষণীয় হইলেও তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। কিন্তু কৃতই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাহিত্যের যে বিভাগেই তিনি হাত তাহাকেই তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সামান্য ইষ্টকখণ্ডকেও র্ণে পরিণত করিয়াছেন। ইহাই মনীষা। ইহার পন্থা সম্পূর্ণ অভিনব। বাঙালী যদি রবীন্দ্রনাথকে গালি দিতে চায় তবে ভাষাতেই তাঁহাকে গালি দিতে হইবে।

ন্দ্রকাব্য স্থায়ী হইবে কি হইবে না তাহা লইয়া যাহারা মস্তিষ্কের করে তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নিত্য নূতন চমকপ্রদ র ফুলঝুরি ফুটাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিবার লোকের অভাব ক্ষেত্রে আজকাল না থাকিলেও এমন কোনো লোকোত্তর পুরুষের হয় নাই যিনি তাঁহার শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। ক্ষে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—বি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা বলিলে ক্তি হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—পোটা যুগ। এই বিশাল সর্ব্বগ্রাসী মনীষার অনিবার্য্য প্রভাব আত্মরক্ষা করা বর্ত্তমান যুগের মৌলিকতা বিশিষ্ট লেখকদের প্রায় অসম্ভব।

াদের এই মাত্রাজ্ঞানহীন অভিভাষণের দেশে বিশেষণের বহুচ্ছ অনেক সময় যেরূপ হাস্যকর সেইরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক! তাশূন্য শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও চর্ব্বিতচর্ব্বণস্বরূপ গবেষণাকেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা মনীষা বলিয়া ভুল করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্র-মনীষা কোনো শুষ্ক পাণ্ডিত্যের আস্ফালনও নির্ভুল তথ্যসংগ্রহের গলদঘর্ম্ম প্রচেষ্টা নয় ; ইহা বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সারভূত বস্তু, ইহার প্রভাবে জগতের সকল জ্ঞান হস্তামলকবৎ অধিগত হইয়া থাকে। স্কুল-কলেজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ইহার জন্ম নয়—ইহার উদ্ভব রহস্যময়ী প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। ইহা সহজাত সংস্কারের মত অনায়াসলব্ধ, অথচ দুষ্প্রাপণীয়!

বস্তুত রবীন্দ্র-মনীষা যদি জগতে কোনো কিছুর সহিত তুলনীয় হয়, তবে তাহা একমাত্র মধ্যাহ্ন-সবিতার নিশিত শরবৎ তীব্র, তীক্ষ্ণ ময়ূখমালার সহিত তুলনীয়। নামে ও গুণে কি আশ্চর্য্য মিল! এরূপ সার্থকনামা মনীষীর আবির্ভাব জগতে কোনো দিন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবি আখ্যাটি শুধু প্রচলিত লৌকিক অর্থেই নয়—তাহা যে কত শাস্ত্রসম্মত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি একাধারে কবি, মনীষী ও স্রষ্টা। সাধারণ মানুষ যুগ্মনেত্রবিশিষ্ট, কিন্তু বিশ্ববিধাতা তাঁহাকে তৃতীয় নেত্র দান করিয়াছেন। আমাদের স্থূল চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে যাহা কিছু নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ে না। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কবি ওয়ার্ড-সোয়ার্থ-সৃষ্ট Peter Bell. নদীর ধারে যে প্রিম্‌রোজ পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে তাহা Peter Bellএর মত আমাদের নিকটও নিছক একটি প্রিম্‌রোজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাহিরের সৌন্দর্য্যের অন্তরালে উহার কোনো নিগূঢ় অর্থ আমরা লক্ষ্য করি না এবং উহার আসল সত্তাটির আমরা আদৌ সন্ধান পাই না।

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় নেত্রের সম্মুখে জগৎ ও জীবনের সত্য অরুণালোকধৌত আকাশের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে বস্তুকে তাহার স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চাই এবং তবেই তাহার অন্তর্লীন সত্তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব। অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলে কবি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া কুহেলিকাচ্ছন্ন, ধূসর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। Poet এবং Prophet যে মূলত এক, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

> স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভক্ষুধানল
> তত তার বেড়ে ওঠে, বিশ্বধরাতল
> আপনার খাদ্য বলি না করি' বিচার
> জঠরে পুরিতে চায়……

ইহা কাব্য—না—ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের চিত্র?

সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও অগভীর। তাহারা বস্তুকে খণ্ডিত ও সীমায়িত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। বস্তু তাহার সমগ্র রূপ লইয়া কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—

> ধূলির আসনে বসি' ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে,
> আলোকের অতীত আলোকে।

এই "আলোকের অতীত আলোক" এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থের "The light that never was on land or sea" একই বস্তু! অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে ইহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—

ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ জড়বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া এমন এক তুরীয়লোকে উপস্থিত হইয়াছেন যেখানে বস্তুর সত্যমূর্ত্তি—Life of things তাঁহার মনোমুকুরে অবিকল প্রতিফলিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি কেবলমাত্র ছন্দোনিপুণ কবি নহেন ; তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সগোত্র।

বিচিত্র-ছবি

শ্রীঅমিয়কুমার পাঠক এম-এ, বি-এল

অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত টিল্ সে দেশের রাজবাড়ীতে এসে পৌছল। দূর থেকে দেখল রাজবাড়ীর সিঁড়ির উপর বসে দুজন সেনানায়ক পাশা খেলছে। তাদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করল—টিল্ তার গাধার পিঠে চড়ে অতি নম্রভাবে তাদের খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। এই সেনানায়কটি টিল্কে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠল "ওহে, ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকটি, তোমার চাই কি?" "আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত" জবাব দিল টিল্। "আর যদি আমি দুর্ভিক্ষপীড়িতই হই, যা আপনি বলছেন, সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

"তা, তোমার যদি খিদে পেয়ে থাকে তা হ'লে এখান থেকে যেতে যেতে যে ফাঁসি কাঠ পাবে তার দড়ি চিবিয়ে খেও। তোমাদের মত ভবঘুরেদের জন্যই এই সব দড়ির বন্দোবস্ত করা হয়" বলল সেনানায়ক। উত্তরে টিল্ বলল —"আপনার টুপিতে যে সুন্দর শিকলটা রয়েছে শুধু ঐটা আমাকে দিন। আমি ওটা নিয়ে তাহ'লে ঐ যে রসুই-খানায় বিরাট মাংসখণ্ড ঝুলছে দেখা যাচ্ছে সেখানে সোজা গিয়ে দাঁত দিয়ে ওটা কামড়ে ঝুলি।"

সেনানায়ক টিল্কে জিজ্ঞাসা করল "তুমি আসছ কোথা থেকে?" "ফ্ল্যাণ্ডারস্ থেকে।" "তোমার চাই কি?" "মহারাজকে আমার একখানা ছবি দেখাতে চাই—আমি চিত্রকর।" টিলের কথা শুনে সেনানায়ক বলল "তুমি যদি ফ্লাণ্ডারস্ দেশের চিত্রকর হও তাহ'লে ভিতরে এস আমি তোমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

রাজার সম্মুখে এসে টিল্ তাঁকে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ ক'রে বলল "মহারাজ, আপনার সম্মুখে আসতে সাহসী হ'য়েছি—আপনার চরণতলে আপনারই জন্য আঁকা একখানা ছবি উৎসর্গ করতে চাই—ধৃষ্টতা আমার মার্জ্জনা করবেন। এই ছবিতে ভগবান্ যিশুখৃষ্টের মাতা মেরীকে রাজবেশে আঁকার সু[যোগ] পাবার অবকাশ আমার হয়েছে।" একটু থেমেই আ[বার] সে বলতে লাগল "আমার ছবি দেখে হয়ত আপনি [খুশি] হবেন। তা যদি হ'ন, তাহ'লে এই যে মখমলের গ[দি] আঁটা সুন্দর চেয়ার দেখছি, যার উপর আপনার রাজস[ভার] চিত্রকর তাঁর জীবদ্দশায় বসতেন তার উপর বসবার আ[মি] দুরাশা পোষণ করি।"

যে ছবি টিল্ রাজাকে দেখাল, সেখানা খুবই সুন্দর। ছবিখানা বিশেষভাবে পরীক্ষার পর রাজা টিল্কে সে[ই] চিত্রকরের চেয়ারে বসতে অনুমতি দিলেন। আর আশ্বাস দিলেন যে তাকে রাজ-সভার চিত্রকরের প[দে] অধিষ্ঠিত করবেন। তার পর টিল্কে আপাদম[স্তক] নিরীক্ষণ ক'রে বললেন "যাই বল, তোমার কথাবার্ত্তা শু[নে] তোমাকে খুব বাচাল ব'লে মনে হচ্ছে।" টিল্ উত্তর ক[রল] "মহারাজ, আমার গাধা জেফ, বেশ পেট ভরেই খেয়ে[ছে] কিন্তু আমি এই গত তিনদিন ধ'রে পেয়েছি শুধু কষ্টই আর নিজের পুষ্টির জন্য আশার কুয়াসা ভিন্ন আ[র] কিছুই পাই নি।" "আচ্ছা, তুমি শীঘ্রই এর চেয়ে ভা[ল] খাবার পাবে" আশ্বাস দিলেন রাজা। "তা, তোমা[র] গাধাটি কোথায়?" "আমি তাকে রাজবাড়ীর সম্মু[খে] ঐ মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যদি রাত্রের মত তা[র] একটু আশ্রয়, শোবার জন্যে কিছু খড় আর খাবার [...] দেওয়া হয় তা হ'লে আমি বিশেষ বাধিত হই।"

রাজা তখনই তাঁর এক চাকরকে হুকুম দিলেন—টি[লের] গাধাকে তাঁর নিজের গাধার মতই দেখাশুনা করতে। শীঘ্রই রাত্রের খাওয়ার সময় হ'ল। সে একেবারে [রাজ]বাড়ীর ভোজ। খাওয়া দাওয়ার পর টিলের ফুর্ত্তি দেখে [...] কিন্তু রাজা কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে পড়লেন। [...]

তিনি বলে উঠলেন "দেখ চিত্রকর, তোমাকে আমার একখানি ছবি আঁকতে হ'বে। বংশধরদের কাছে ছবিতে নিজের স্মৃতি বজায় রাখা আমাদের মত নশ্বর নরপতিদের পক্ষে একটা খুব সন্তোষের বিষয়।"

"আপনার হুকুমেই আমার আনন্দ" উত্তর দিল টিল্। "তবুও একটা বিষয় ভেবে দুঃখিত না হ'য়ে পারি না। আমার মনে হচ্ছে, যদি একলা আপনারই ছবি আঁকি তা হ'লে হয়ত ভাবী যুগে আপনি একেবারে নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে রাজমহিষী, রাজ-দরবারের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণ, সেনানায়ক আর রাজ্যের সমরবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণের থাকা উচিত। তা হ'লে লণ্ঠন দিয়ে ঘেরা জোড়া-সূর্য্যের মত আপনারা দুজন জ্বলজ্বল করবেন।"

এই বিরাট কাজের জন্য "তা হ'লে আমাকে কত দিতে হ'বে?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। "একশ' মোহর—নগদ বাকী যা হয় পরে, আপনার যা ইচ্ছা।" রাজা পারিশ্রমিকটা আগেই দিয়ে দিলেন। মোহরগুলি পেয়ে টিল্ বলল "প্রভো, আপনি আমার প্রদীপ তেল দিয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। এখন থেকে এটা আপনারই সম্মানে জ্বলবে।"

পরের দিন টিল্ যাদের ছবি আঁকতে হবে তাদের সকলকে দেখতে চাইল। প্রথমেই তার সম্মুখে এলেন রাজার পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক। লোকটা বেশ মোটাসোটা—বিরাট এক ভুঁড়ি যা বয়ে তার চলাফেরা করা কষ্টকর। তিনি টিলের কানে কানে এসে বললেন "দেখ, আমার যখন ছবি আঁকবে অন্ততঃ আমার অর্দ্ধেক ভুঁড়ি বাদ দিয়ে দিতে হ'বে। নইলে কিন্তু তোমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হ'বে।" এঁর পরে এলেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা পিঠে একটা কুঁজ। ইনি বল্লেন, "দেখুন চিত্রকর মশায়, ছবিতে যদি আপনি আমার কুঁজটা বাদ দিয়ে না দেন তা হ'লে আপনার মৃত্যু অবধারিত।" মহিলাটি চলে যাওয়ার পর এলেন রাণীর এক অল্পবয়স্কা সখী। মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু তার উপর পাটির তিনটে দাঁত প'ড়ে গিয়েছিল। টিল্‌কে বলল "ছবিতে আমি যেন দেখি আমি হাসছি, আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নিখুঁত এক পাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। এ যদি না হয়, লোক দিয়ে আপনাকে কুচি কুচি ক'রে কাটাব।" এই ব'লে সে চ'লে গেল।

একজনের পর একজন এই ভাবে যেতে লাগল। সব শেষ এল রাজার পালা। তিনি বললেন "বন্ধু, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তুমি যে সব লোক দেখলে তাদের চেহারা আঁকতে গিয়ে সামান্য মাত্র ভুলও যদি কর, তা হ'লে তোমাকে মুরগী জবাই করার মত জবাই করা হবে।"

টিল্ এই সব কথা শুনে মনে মনে ভাবতে লাগল "যদি ছবি আঁকতে গিয়ে আমার মাথাটা যায়, আমাকে যদি কুচি কুচি ক'রে কেটে' ফেলা হয়, আর শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসি কাঠে ঝোলানই হয় তা হ'লে আমার ছবি না আঁকাই ভাল। আমাকে ভেবে দেখতে হ'বে কি করা শ্রেয়ঃ।" তার পর সে রাজার দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল "যে ঘর আমি এই সব লোকের ছবি এঁকে অলঙ্কৃত করব সে ঘরটা কোথায়?" রাজা তাকে সঙ্গে ক'রে একটা খুব বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘর দেখে টিল্ রাজাকে বলল "দেখুন মহারাজ, আগাগোড়া দেয়ালে যদি একখানা পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় তা হলে বড় ভাল হয়—ছবির উপর তা হ'লে ধূলা বা পোকামাকড় পড়তে পায় না।" রাজা তাই করার জন্য হুকুম দিলেন। পর্দ্দা টাঙ্গান হ'য়ে গেলে টিল্ তার ছবির রং মেশানোর কাজের জন্য তিনজন সহকারী চাইল। তারও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ত্রিশদিন ধ'রে টিল্ আর তার তিনজন সহকারী বেশ আনন্দে খাওয়া দাওয়া, আমোদ প্রমোদ করতে লাগল। রাজা কোন কথা না ব'লে এই সব দেখে যেতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একত্রিশ দিনের দিন তিনি ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে বললেন "কি হে টিল্, ছবিগুলোর কতদূর কি হ'ল?" "এখনও শেষ হয় নি" জবাব দিল টিল্। "তা হ'লে দেখতে পাওয়া যাবে কবে?" প্রশ্ন হ'ল। "এখন নয়" বলল টিল্।

ষাট দিনের দিন রাজা খুব রেগে গেলেন। সোজা ঘরে ঢুকে টিল্‌কে বললেন "আমাকে এখনই ছবিগুলো দেখাও।" "দেখাচ্ছি" বলল টিল্ "কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে যাঁদের ছবি আঁকা হচ্ছে তাঁদের এখানে ডেকে না আনা পর্য্যন্ত পর্দ্দা সরাবেন না। টিল্ সেই পর্দ্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল। রাজার হুকুম মত রাজপুরুষরা আর মহিলারা সেখানে এসে হাজির হ'লেন।

তাঁদের সম্বোধন ক'রে টিল্ বলতে শুরু করল "মহারাজ,

মহিষী, রাজপুরুষ ও মহিলাগণ, আপনারা যে যেমন, আমার সাধ্যমত আপনাদের সেই চেহারা আমি পর্দ্দার পেছনে এঁকেছি। আপনারা সহজেই নিজেদের চিনে নিতে পারবেন—আপনারা যে নিজের চেহারা দেখবার জন্যে ব্যস্ত সে ত খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমি আপনাদের অনুনয় করছি, পর্দ্দাটা সরানর আগে আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরুন। আপনারা জেনে রাখুন—আপনাদের মধ্যে যাঁরা উঁচু বংশের তাঁরা আমার ছবি দেখে সত্যিই আনন্দ পাবেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেউ নীচ বংশের হ'ন তিনি ফাঁকা দেয়াল ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাবেন না। এইবার আপনারা বেশ ভাল ক'রে চোখ খুলে দেখুন—এই বলে টিল্ পর্দ্দাটা সরিয়ে দিল। তার পর আবার সে মনে করিয়ে দিল "পুরুষই হ'ন আর মহিলাই হ'ন, মনে রাখবেন কেবল উঁচু বংশের যাঁরা তাঁরাই আমার ছবি দেখতে পাবেন।" এই কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টিল্ তৃতীয়বার বলে উঠল—"নীচ বংশের যাঁরা তাঁরা কিন্তু আমার ছবি দেখতে পাবেন না। যাঁরা পরিষ্কার দেখতে পাবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উঁচু বংশের।"

এই কথা শুনে যাঁরা সেখানে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ভাল ক'রে চোখ খুলে দেখতে লাগলেন। ফাঁকা দেয়াল ছাড়া যদিও তাঁরা অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না তবুও তাঁরা ভান করতে লাগলেন যেন সকলে নিজেদের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। আর এমন কি তাঁরা আঙুল দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে দেখাতে লাগলেন। মনে মনে অবশ্য তাঁরা খুব লজ্জা বোধ করলেন।

কাছেই ছিল রাজার ভাঁড় দাঁড়িয়ে। সে তিনবার লাফিয়ে ব'লে উঠল "আমি দামাম নাকারা বাজিয়ে পারি দাদা, খালি দেয়াল ছাড়া আমি কিছুই দেখতে না, তাতে আপনারা আমাকে যাই বলুন আর বলুন।"

"ভাঁড়েরা কথা বলতে আরম্ভ করলে বিজ্ঞ লোকদের স'রে পড়াই উচিত" এই কথা ক'টা বলে টিল্ রাজ থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় রাজা বাধা দিলেন। বল্লেন "তুমি গর্ব্ব কর যে তুমি যে নিন্দা ক'রে আর যা ভাল তার প্রশংসা করে ঘুরে বেড়াও। এতগুলি উচ্চবংশের পুরুষ ও মহিলাদের তুমি বিদ্রূপ সাহসী হয়েছ আর তাদের আভিজাত্যকে উপহাসাস্পদ করেছ। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার এই অসংযত কথার জন্যে কোন্ দিন তোমায় ফাঁসি যেতে হ'বে।"

এই কথার জবাবে টিল্ বলল "ফাঁসি কাঠের দড়িটা যদি সোনার হয় তা হ'লে আমি কাছে যাওয়ার ভয়েই দড়িটা ছিঁড়ে যাবে।" টিলের কথা শুনে রাজা বল্লেন "থাম। এই দিচ্ছি তোমাকে দড়ির প্রথম অংশ" এই বলে তিনি টিলকে পনরটা মোহর দিলেন।

টিল্ বলল "আপনাকে শত ধন্যবাদ। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমার চলার পথে যত সরাইখানা পড়বে প্রত্যেকটাই এর এক টুকরা পাবে—যে সোনার টুকরা থে শঠের রাজা এই সব সরাইখানাওয়ালারা কুবেরের মত ধনী হ'য়ে উঠে।" এই ব'লে টিল্ তার গাধার পিঠে রওনা দিল।

বেলজিয়ান গল্প (দ' কস্টর)

রজার বেকন (১২১৪-১২৯২)

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এস্‌সি

...র ইতিহাসে ফ্রান্সিস্কান রজার বেকনের চরিত্র যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ...দিয়া ইহা আবার তেমনই কুহেলিকাপূর্ণ ও বিতর্কমূলক। ম্যাজিক, কিমিয়া, ফলিত জ্যোতিষ, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি নানা ...নিক ও আধা-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যেমন দুর্নাম আছে, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ...ক, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রধান উদ্গাতা ও পণ্ডিতীয় মনোভাবের তীব্র বিরুদ্ধসমালোচক হিসাবেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার ...ন্য আসন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বেকন ছিলেন স্বপ্নবিলাসী দ্রষ্টা। ...জের কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পাদন না করিলেও তিনি ...লের দৃষ্টিতে অদ্ভুত যে সব বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার কথা কল্পনা ...রিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার ...বিশ্বাস ছিল, এককালে মানুষ সমুদ্রগামী নৌকা হইতে হালের পাট ...দিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে যন্ত্রচালিত দ্রুতগামী বৃহদাকার অর্ণবপোত ...র্মাণ করিতে পারিবে ; পশুর বদলে যন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা অবিশ্বাস্যবেগে ...নবাহন চালাইতে পারিবে, পাখীর মত কৃত্রিম পক্ষযুক্ত একপ্রকার ...ন্ত্র উড়োজাহাজে আকাশে অবলীলাক্রমে বিচরণে সমর্থ হইবে ; ...পৃথিবী ভূপ্রদক্ষিণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি! বেকনের ...ই সব বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। তাঁহার কালে বাতুলের ...লাপ বলিয়া লোকে, এমন কি প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত, হাসিয়া ...উড়াইয়া দিলেও কালসহকারে এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই ...ত্য হইয়াছিল।

বেকনের পূর্ববর্তী, তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী ...জ্ঞানীদের বিজ্ঞান সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল—সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে এক ...গুঢ় একতার সন্ধান করা। এই একতার সন্ধান করিতে গিয়া ...জ্ঞানীকে শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদ, প্রজ্ঞা ও দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ...য়াছে। জ্ঞানের এই অন্তর্নিহিত একতার প্রশ্ন বেকনকে কম বিব্রত ...র নাই। কিন্তু তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এই একতার ...ন্ধানে ছুটিয়া হয়রাণ হইবার পরিবর্তে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের ...চত প্রথমে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা, ...নের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। তথ্যের সহিত সম্যক রূপে পরিচিত ...বার সুযোগ না ঘটিলে এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা ...তথ্যের অভ্রান্ততা নির্ণয় করিতে না পারিলে জ্ঞানের সত্যকার মূল্য ...রূপণ যে সম্ভবপর নয়, ইহা বেকন সুস্পষ্টরূপে প্রথম অনুধাবন করেন। ...নি আরও অনুভব করেন যে, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ...ত্যের অভ্রান্ততা নির্ণয়ই যথেষ্ট নহে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন অগ্রগতি একরূপ অসম্ভব। এই মহাসত্য উপলব্ধি হইতেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রদূত হিসাবে বেকনের দাবী স্বীকার করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

বেকন বিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞান ও দর্শনের এক বিশেষ শাখা হিসাবে দেখেন নাই। মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতেও বিজ্ঞানকে তিনি বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। *Opus majus* ও *Opus tertium* গ্রন্থদ্বয়ে তিনি বারংবার বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও এক অতি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস্ বেকন সুসংবদ্ধভাবে জোরালভাষায় বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়তা-বাদেরই জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রেনেশাঁর অভিজ্ঞতার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকনের পক্ষে বিজ্ঞানকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা সহজ হইয়াছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা রজার বেকনের পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। রজার বেকনের চিন্তাধারার মৌলিকতার ইহা এক অকাট্য প্রমাণ। এই ভাবে বিচার করিবার ফলে বিজ্ঞান, শুধু বিজ্ঞান কেন সমগ্র দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থা, তাঁহার দৃষ্টিতে এক নূতন তাৎপর্য ও অর্থ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সমসাময়িক কাল বেকনের প্রতিভা নিরূপণ করিতে পারে নাই। অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্নাস্ ও সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের সুনাম ও জনপ্রিয়তার চাপে বেকনের প্রতিভা অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছিল। ইহার জন্য বেকনের কলহপ্রিয় স্বভাবও বড় কম দায়ী নহে। তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ করিতে পারিতেন না এবং অ্যালবার্টাস ও অ্যাকুইনাসের সাফল্যে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করিতেন। অবশ্য দার্শনিক হিসাবে অ্যাকুইনাসের প্রসিদ্ধি ছিল বেকনের অপেক্ষা অনেক বেশি এবং তাঁহার রচনাও ছিল অনেক বেশি সুসংহত ও প্রণালীবদ্ধ। বেকনের রচনায় এই প্রণালী ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ; ইহা অসংলগ্ন ও স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি-দুষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি ছিলেন অ্যাকুইনাস অপেক্ষা বড় এবং সম্ভবতঃ অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্নাসের সমকক্ষ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক হইতে তিনি অ্যালবার্টাসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাণী ও জীববিদ্যায় অ্যালবার্টাস্ বেকনকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছিলেন ; তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিতে বেকন ছিলেন অনেক বেশি পারদর্শী। উভয়ের জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে যত মতদ্বৈধই থাকুক না কেন বেকনের প্রতিভা ও স্বকীয়তা শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

রজার বেকনের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়
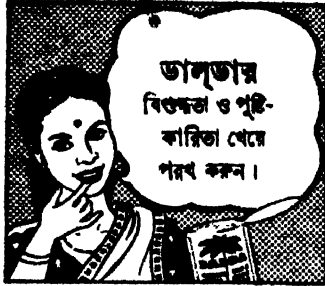
ব্যাপারে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সমর্থন তেমনি অদ্ভুত ঠেকে। ...পর নানা রচনায় যাদুকর ও কিমিয়াবিশারদ হিসাবে আমরা বেকনের ...খ পাই। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে রচিত রবার্ট গ্রীণের নাটকে ...Honorable History of Frier Bocon and Frier ...ngay) এক উদ্ভট ও কুশলী যাদুকর হিসাবে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত ...য়াছে। ১৬২৫ খৃঃ অব্দে নোদে বেকনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা ...খ করিয়া সর্বপ্রথম তাঁহাকে এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসাবে ...বাইবার চেষ্টা করেন। * ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে জেব্ বেকনের বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus majus*'-এর এক সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিলে তাঁহার ...জ্ঞানিক খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রুয়ার, ...জেস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বেকন সম্বন্ধে গবেষণা ও তাঁহার গ্রন্থগুলি পুনঃ ...দ্রিত করিয়া যে সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহাতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ...বিশিষ্ট ফ্রান্সিস্কান পণ্ডিতের আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে সমস্ত ...দূরীভূত হইয়াছে।+

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইংলণ্ডে সমার্সেটের অন্তর্গত ইল্‌চেষ্টারে বেকনের জন্ম হয় ১২১৪ খৃঃ ...। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে এম-এ ...ী লাভ করেন। এইখানে তিনি খ্যাতনামা শিক্ষক ও পণ্ডিত রবার্ট ...সেটেষ্ট ও অ্যাডাম মার্শের ভাবধারা ও রচনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে ...বিত হন। অক্সফোর্ডের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ...ক অ্যারিষ্টটল সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত ...। প্যারী গমন করেন আনুমানিক ১২৪০ খৃঃ অব্দে। প্রায় দশ ...র প্যারীতে, ইতালীতে ও ইউরোপের নানাস্থানে কাটাইবার পর ...০ খৃঃ অব্দের অনুরূপ সময়ে অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ...ভাবে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন। ইউরোপে অবস্থানকালে ...র তৎপরতার কথা বিশদভাবে জানা না থাকিলেও, প্রধানতঃ ...পনা, অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চার কাজেই তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাস যে ...বাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ে তিনি ...istola de accidentibus senectutis', 'Questions ...tive to the Aristotelian Physics and Metaphysics, ...he *De Plantis* and *De Causis*' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ...। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি (Epistola) তিনি মহামান্য পোপ চতুর্থ ...সেন্টকে উপহার দেন ১২৪৩ খৃঃ অব্দে।

অক্সফোর্ডে অধ্যাপনার কার্যে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। অক্সফোর্ডে তখন ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতদের বিশেষ প্রাধান্য। অল্প কয়েকবৎসরের মধ্যেই ফ্রান্সিস্কানদের প্রভাবে বেকন তাঁহাদের দলভুক্ত হন এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করিবার ব্রত গ্রহণ করেন। বেকনের জন্ম হইয়াছিল সম্ভ্রান্ত ধনী বংশে ; কিন্তু বিদেশ ভ্রমণে, এবং গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও বিজ্ঞান চর্চার ব্যয় সঙ্কুলান করিতেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। যাহা হউক, ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে শেষ পর্যন্ত শুভ হয় নাই। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও কার্যকলাপ অচিরে ফ্রান্সিস্কান্ প্রধানদের অসন্তোষ উদ্রেক করে। বিরুদ্ধ সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ, ভিন্ন মতাবলম্বীদের তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ ও কলহপ্রিয় স্বভাবের জন্য তিনি ফ্রান্সিস্কানদের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। তারপর আর একটি ব্যাপারেও বেকানের জ্ঞানচর্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। ১২৫৪ খৃঃ অব্দে জিরার্ড নামে এক ফ্রান্সিস্কান কর্তৃক রচিত 'Liber introductorius ad Evangelium aeternum' শীর্ষক গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক সভ্যের উপর ফ্রান্সিস্কান কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক আদেশ জারি করে যে, কোন গ্রন্থ বা রচনা প্রকাশের পূর্বে প্রত্যেক সভ্যকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। এই আদেশ বলবৎ হওয়ায় বেকন মহা অসুবিধায় পড়িয়া যান। অতঃপর তাঁহার পক্ষে কিছু প্রকাশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রায় ১২ বৎসর তিনি কোন গ্রন্থ লিখিবার বা প্রকাশ করিবার উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই।

১২৬৬ খৃঃ অব্দে বেকন নিজের বৈজ্ঞানিক মত ও বিশ্বাস গ্রন্থাকারে লিখিবার ও প্রকাশ করিবার এক আশাতীত সুযোগ লাভ করেন। ঐ বৎসর গি ড ফুক্ বা পোপ চতুর্থ ক্লিমেন্ট বেকনের রচনাবলী পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। ফ্রান্সে অবস্থানকালে গি ড ফুকের সহিত বেকনের পরিচয় হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময় বেকনের রচনার ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সহিত ফুকের কিছু পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। ফুক ১২৬৫ খৃঃ অব্দে পোপের পদে অভিষিক্ত হন এবং পর বৎসরই বেকনের সমগ্র রচনার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এক নগণ্য ফ্রান্সিস্কান পাদ্রীর পক্ষে ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ ; বেকন ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। পোপের অনুরোধের বহু পূর্ব হইতেই তিনি 'Compendium philosophiae' নামে এক বিরাট বিশ্বকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনাও তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার ফল। তিনি চারিটি বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্র (১ম খণ্ড), গণিত (২য় খণ্ড), পদার্থবিদ্যা (৩য় খণ্ড), অধিবিদ্যা ও নীতি বিজ্ঞান (৪র্থ খণ্ড) এই ছয়টি বিষয় আলোচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তবে ১২৬৬ সালের পূর্বে এই বিশ্বকোষের অতি সামান্য অংশই তিনি লিখিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। পোপের নির্দেশ পাইলে তিনি দেখিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পক্ষে পরিকল্পিত

---

* Apologie pour tous les grands personages qui ...este faussement soupconnez de Magic, Paris, ...—by Gabriel Naude,

+ *Opus majus*—Edited by Samuel Jebb (folio London F 1733 ; by John Henry Bridges, ...rd, 1897.

বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে না। তিনি বিশ্বকোষের পরিবর্তে 'Opus majus', 'Opus minus', 'Opus tertium' ও 'De multiplicatione speoierum' নামে চারিটি গ্রন্থ পোপের নিকট প্রেরণ করেন ১২৬৮ খৃঃ অব্দে। দুর্ভাগ্যক্রমে বেকনের গ্রন্থ পাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লুকের মৃত্যু হয়।

বেকনের প্রতি পোপের এই অনুগ্রহে ফ্রান্সিসকান প্রধানরা তাঁহার প্রতি মনে মনে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিল। এমনিতেই বেকনকে তাহারা দেখিতে পারিত না ; তাহার উপর উপর-ওয়ালাদের ডিঙ্গাইয়া বেকনের স্বয়ং পোপের এইরূপ অনুগ্রহভাজন হইবার ব্যাপারে প্রধানরা অপমানিত বোধ করিল। ক্লুকের মৃত্যু হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে তাহারা বদ্ধপরিকর হয়। প্রথমে অভিনব মতবাদের অধ্যাপনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক আদেশ জারি করা হয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্সিসকানরা নানারূপ উদ্ভট ও আজগুবী মত পোষণ করিবার এক অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনয়ন করে। প্যারীতে এই অভিযোগের শুনানী হইয়াছিল এবং বেকন অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাবাসের আদেশ লাভ করেন ১২৭৮ খৃঃ অব্দে। ১২৯২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তাঁহার কারাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বেকনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'Opus majus'

পোপ চতুর্থ ক্লিমেন্টের নিকট প্রেরিত 'Opus majus' বেকনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অপর তিনটি গ্রন্থ কতকটা ইহার সম্পূরক মাত্র—ইহাদের মধ্যে এমন কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই যাহা 'Opus majus'-এ আলোচিত না হইয়াছে। এই গ্রন্থটি সাতটি ভাগে বিভক্ত :—(১) ভ্রান্তির কারণ, (২) দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সম্বন্ধ, (৩) ভাষাচর্চা, (৪) গণিত,—জ্যোতিষ, সঙ্গীত ও ভূগোলও ইহার অন্তর্ভুক্ত,—(৫) আলোকবিদ্যা, (৬) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, এবং (৭) নীতি। 'Opus minus' এই মূল গ্রন্থের উপক্রমণিকা বিশেষ। জ্যোতিষ, কিমিয়া ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'Opus tertium'ও 'Opus majus'-এর সম্পূরক। এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৈজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের, যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, ইত্যাদি,—পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, 'Opus majus' ও তাহার সম্পূরক উপরোক্ত গ্রন্থগুলি হইতে বেকনের বিজ্ঞানিক প্রতিভা, দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। এইবার সংক্ষেপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার তৎপরতা ও মতের আলোচনা করিব।

গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোল : বেকন গণিতজ্ঞ ছিলেন বটে, তবে গণিতে কোন মৌলিক গবেষণা তিনি সম্পাদন করেন নাই। এই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ও চর্চায় গণিতের গুরুত্ব তিনি সম্যকরূপে অনুধাবন করেন। তিনি বলিতেন, জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ; কিন্তু এই পরীক্ষার সমস্ত ফল পাইতে হইলে গণিতের মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টির আলোচনা হওয়া চাই। "Though the best source of knowledge (outside revelation) is experimentation, the latter must be completed by mathematical treatment to bear all fruits." * বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গণিতের প্রয়োগের অপরিহার্যতা উপলব্ধি তাঁহার অভিনব ভাবধারার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'Opus majus'-এর চতুর্থ খণ্ডে গণিত সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণা করেন :—পদার্থ বিদ্যায় প্রয়োজনীয়তা, জ্যোতিষ, পঞ্জিকা সংস্কার, ভূগোল, ও ভাগ্যগণনা। তাঁহার জ্যোতিষীয় আলোচনা হইতে মনে হয়, তিনি গ্রীক ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রোসেটেষ্টের মত টলেমীর ও বিত্রুজির প্রস্তাবিত উভয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত মিলের দিক হইতে টলেমীর পরিকল্পনা অধিকতর সন্তোষজনক ইহা তিনি লক্ষ্য করেন ; আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে আল্ বিত্রুজির পরিকল্পনা যে শ্রেয় প্রতীয়মান হয় তাহাও তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

পঞ্জিকা সংস্কার ব্যাপারে বেকন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি গুরু ও শিক্ষক রবার্ট গ্রোসেটেষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। 'Compotus naturalium' ও 'De termino Paschali' গ্রন্থদ্বয়ে এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা মনোজ্ঞ ও তথ্যপূর্ণ। পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সময় পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হইয়াছিল 'Compotus'-এ তাহার এক পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে, এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ও প্রচলিত নানাবিধ পঞ্জিকার তিনি ব্যাপক সমালোচনা করেন।

'Opus majus'-এর গণিতীয় খণ্ডে ভূগোল সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রাচীন ভৌগলিকদের প্রদত্ত তথ্যই কেবল আলোচিত হয় নাই, স্বল্প পরিচিত নানা দেশ সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। বেকনের সমসাময়িক ফ্লেমিশ ফ্রান্সিসকান্ ভৌগলিক ও পর্যটক উইলিয়ম অব রুব্রুকির ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে বহু তথ্য তিনি গ্রহণ করেন। মার্কো পোলোর পূর্বে রুব্রুকি ছিলেন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ভৌগলিকদের অন্যতম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি সাইবিরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যে ও কনস্তান্তিনোপোল, সিরিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে পর্যটন করেন। শুধু বর্ণনাই বেকনের ভূগোলের বিশেষত্ব নহে ; ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহার নানা মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণ গোলার্ধ যে বসবাসের পক্ষে উপযোগী তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন। সমগ্র পৃথিবীর এক ব্যাপক ও সম্পূর্ণ পরিমাপ বা জরীপ গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পোপের নিকট তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সম্পর্কে পার্চমেন্ট কাগজে স্বরচিত পৃথিবীর একটি মানচিত্রও তিনি পাঠাইয়াছিলেন ; এই

* Introduction to the History of Sience,—G. Sarton, Vol II, pp 950.

মানচিত্রে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান জনপদের স্থানাঙ্ক (Coordinates) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মানচিত্রটি এখন নিখোঁজ। তারপর স্পেন হইতে জলপথে সরাসরি পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিবার সম্ভাবনার কথা তিনি আলোচনা করেন। অবশ্য এই সম্ভাবনার কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে একাধিক ভৌগলিক ও বিজ্ঞানী বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার শোচনীয় অবনতির কালে এইরূপ কথা, প্রাচীন ধারণার পুনরাবৃত্তি হইলেও, নূতন করিয়া বলিবার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। এইরূপ বিশ্বাস হইতেই কলম্বাস তাঁহার দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানের পরিকল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কলম্বাসের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার উৎস অবশ্য পিয়ের দ্'ঈ-এর (Pierre d' Ailly) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Imago mundi'।

আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা : আলোক সংক্রান্ত গবেষণাতেও বেকন গ্রোসেটেস্টের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান ভিত্তি ছিল আল্-কিন্দি ও আল্-হাজেনের আলোক সম্বন্ধীয় গবেষণা। বেকন আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; এজন্য আরব্য বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকারদের মূল রচনার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। উল্লেখযোগ্য নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার না করিলেও প্রতিফলক ও লেন্সের সাহায্যে তাঁহার সম্পাদিত অনেক পরীক্ষার নজির পাওয়া যায়। তিনি অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সম্ভাব্যতা অনুমান করেন। গোলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে আলোকের প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ফলে উৎপন্ন প্রতিকৃতির যে সব দোষ জন্মাইয়া থাকে প্যারাবোলয়েড ও হাইপারবোলয়েড আকৃতির প্রতিফলকের বা লেন্সের ব্যবহারে সেই সব দোষ দূর করা যে সম্ভবপর তাহার অস্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সব পরীক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করিতেই বেকনের পৈতৃক সম্পত্তির এক মোটা অংশ উজাড় হইয়া যায়। আলোক সংক্রান্ত গবেষণার উপর তিনি কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহার এক প্রমাণ এই যে, নিজে কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পোপকে তিনি একটি লেন্স্ উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেকনের কয়েকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আলোক এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাহিত হয় না; এই প্রবাহ ঘটিতে যত অল্পই হোক কিছুটা সময় লাগে। অর্থাৎ, আধুনিক ভাষায় আলোকের একটি সসীম গতিবেগ আছে। গ্রোসেটেষ্ট প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের মতে আলোক প্রবাহ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিবার কথা অর্থাৎ তাহার গতিবেগ হওয়া উচিত অনন্ত। বেকন আরও বলেন, আলোক অতি ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ নহে, ইহা একপ্রকার গতির প্রবাহ (transmission of a movement)।* নিতান্তই ভাসা ভাসা ভাবে তিনি উপরোক্ত মন্তব্যগুলি করিয়াছিলেন। তবে বেকন আলোক-তরঙ্গ-তত্ত্বের আঁচ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে কেহ যেন এইরূপ মনে না করিয়া বসেন।

বল বিজ্ঞানেও তাঁহার অনুরূপ উৎসাহ ছিল। বল কি এবং প্রকৃতির সাহায্যে কি ভাবে ইহাকে প্রকাশ করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। আদেলার্দ অব্ বাথের মত তিনি বলেন যে, শূন্য স্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব। দূরত্বের ব্যবধানে আপাতঃ কোনরূপ সংযোগ রক্ষা না করিয়া নানা প্রকার বল ও শক্তির ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া কি ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে এই প্রশ্ন বেকনের এক প্রিয় গবেষণার বস্তু ছিল। মানুষের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব তিনি দূরত্বের ব্যবধানে ক্রিয়াশীল এক অদৃশ্য বল বা শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা আগেই বলিয়াছি তিনি ফলিত জ্যোতিষে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন।

কিমিয়া, বারুদ, চিকিৎসা বিদ্যা : আলোক বিজ্ঞানের মত কিমিয়া শাস্ত্রে বা রসায়নে বেকনের আজীবন নেশা ছিল। যাদুবিদ্যা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার ভয়ে তিনি গোপনে কিমিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা ও গবেষণা করিতেন। অক্সফোর্ডের উপকণ্ঠে তাঁহার একটি কিমিয়ার গবেষণাগার ছিল। বেকন কিমিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করেন—অনুধ্যানমূলক (Speculative) ও প্রক্রিয়া বা পরীক্ষামূলক (Operative)। মৌলিক পদার্থ হইতে কিরূপে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা যায়—যেমন, লবণ, খনিজ, ধাতু প্রভৃতির উৎপাদন—এইরূপ আলোচনা অনুধ্যানমূলক কিমিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রক্রিয়ামূলক কিমিয়ার উদ্দেশ্য হইল স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, পরীক্ষা ও কৌশলের দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করা। পাতন, ঊর্ধ্ব পাতন প্রভৃতি উপায়ে উন্নততর বর্ণ প্রস্তুত, ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য প্রক্রিয়ামূলক কিমিয়ার গবেষণা ও আলোচনার বিষয়। প্যারাসেলসাসের বহু পূর্বে বেকন বলেন যে, রাসায়নিক গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভবপর। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, কিমিয়া বা রসায়ন পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মধ্যগা।

বারুদ আবিষ্কারের সহিত বেকনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বিতর্ক আছে। বারুদ আবিষ্কার সম্পর্কে যে সব ল্যাটিন বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় রজার বেকন তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং এক সময়ে একদল ঐতিহাসিকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বেকনই বারুদের প্রথম আবিষ্কর্তা। 'Epistola de secretis operibus natural' ও 'Opus tertium'-এ বিস্ফোরক দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়ায় বেকন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। 'de secretis'-এ প্রাপ্ত একটি সূত্রের (cipher) ব্যাখ্যা করিয়া কর্ণেল হাইম** এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, রজার বেকনই বারুদের আবিষ্কর্তা। কিন্তু 'de secretis' গ্রন্থের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত, বেকন সম্ভবতঃ বারুদের কথা জানিতেন, কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনও না কোন সময়েই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তবে তিনিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া

---

* Sarton, Vol II, pp 957.

** Roger Bacon Commemoration Essays—edited by A. G. Little, Oxford, 1914—Paper on Gunpowder by Col. H. W. L. Hime.

"সত্যিই...
লাক্স
টয়লেট
সাবান
মেখে আপনি
আরও সুন্দর
হ'তে পারেন"
শ্যামা বলেন

LUX
TOILET SOAP

নাই। আর একদলের অভিমত, বারুদ ইউরোপে আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন মহাদেশে এবং তথা হইতে এই জ্ঞান মুসলমান বিজ্ঞানীদের সাহায্যে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

বেকন চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'Liber de retardatione accidentium senectutis' গ্রন্থটির খ্যাতিই খুব বেশি। সার বস্তুর দিক হইতে তাঁহার 'De erroribus medicorum' গ্রন্থটিই অধিকতর মূল্যবান। ইহাতে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরীক্ষার গুরুত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান—পরীক্ষার আদর্শ

বেকন 'Opus majus'এর প্রথম খণ্ডে ভ্রান্তির কারণ ও ষষ্ঠ খণ্ডে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই দুইটি আলোচনার পারস্পরিক সম্বন্ধ অতি নিকট এবং গুরুত্বও সমধিক। মানুষ কেন ভুল করে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি এই উপসংহারে উপনীত হন যে, প্রামাণিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা, স্বভাব, কুসংস্কার ও জ্ঞানের মিথ্যা অহঙ্কার মানুষের ভুলের প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ফ্রান্সিস্ বেকনের (১৫৬১—১৬১৬) চারি আদর্শের সহিত রজার বেকনের এই চারিটি কারণের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না।

বেকনের পরীক্ষার আদর্শের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা গ্রন্থে তাঁহার এই আদর্শের আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের পরীক্ষা গুলিতে যতই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটী বিচ্যুতি থাকুক, তাঁহার নানা মন্তব্যে ও সমালোচনায় যতই অসঙ্গতি, দুর্বলতা ও পরস্পর-বিরোধী মতবাদের বাহুল্য থাকুক, পরীক্ষার আদর্শের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠার নড় চড় দেখা যায় না। এইখানেই বেকনের শ্রেষ্ঠত্ব। রেনেশাঁর পর গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের হাতে এই আদর্শ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহাদের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে, ইউরোপের বিজ্ঞান সাধনা যখন পণ্ডিতীয় মনোভাব ও স্বার্থপ্রয়োগের জালে আবদ্ধ, বেকন বিজ্ঞানকে এই বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার প্রথম স্বপ্ন দেখেন। এজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে রজার বেকন অবিস্মরণীয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরীক্ষার স্থান ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বেকন ঠিক কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যে কোন প্রকার গবেষণায় অগ্রসর হইতে হইলে এক প্রকার বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য। যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী প্রকৃতির রহস্যভেদের মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার এইরূপ বিশ্বাস থাকা চাই যে, প্রকৃতিকে জানা সম্ভবপর এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিবার উপায় বর্তমান। এই বিশ্বাস না থাকিলে তাহার পক্ষে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সম্পাদনের উপযোগী যান্ত্রিক বিদ্যায় ও নানা কৌশলে ও টেক্‌নিকে সমৃদ্ধ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হইল প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতের নানা ঘটনা 'কি ভাবে' ঘটিয়া থাকে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা। ঘটনা 'কি ভাবে' ঘটে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান আয়ত্ত হইলে বিজ্ঞানী তখন চেষ্টা করেন 'কেন' এইরূপ ঘটিতেছে তাহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করিতে। কিন্তু মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি ঠিক ইহার উল্টাটি ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির অভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র বিশেষ পরিমিত থাকায় বস্তুজগতে ঘটনাবলী 'কি ভাবে' সংঘটিত হয় তাহা নির্ণয়ে মধ্যযুগীয় জ্ঞানীরা সাধারণতঃ অক্ষম ছিলেন। এমত অবস্থায় যুক্তি তর্কের শরণাপন্ন হইয়া ঘটনা 'কেন' ঘটে তাহা চিন্তা করা ও সে সম্বন্ধে নানা [illegible] ও মতবাদের কাঠামো রচনা করা ছাড়া বিজ্ঞানীর গত্যন্তর ছিল না। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দুর্বলতার জন্য বস্তুর বিচিত্র ব্যবহার ও স্বভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য মনে হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়াই প্রচার করেন যে, প্রকৃতির কার্যকলাপ উদ্দেশ্যহীন নহে, প্রকৃতি বৃথা কোন কাজ করে না, 'Natura nihil facit frus'a'। বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যে পরগাছাটি বাড়িয়া উঠে তাহারও একটি উদ্দেশ্য আছে, একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে প্রকারান্তরে বৃক্ষকে সাহায্য করে, পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদের সহিত তাহার এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে, বড়দিনের উৎসবে গৃহ-সজ্জার কাজে এই পরগাছার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির রাজ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ও সহায়তার সম্ভবতঃ এক প্রতীকস্বরূপ এই পরগাছা! ইহা পরগাছার অস্তিত্বের মনগড়া কারণ নির্দেশ মাত্র, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা ইহার স্বভাব ও ব্যবহার প্রণিধান করিবার চেষ্টা নহে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা নূতন তথ্য ও জ্ঞানলাভ যদি সম্ভবপর না হয়, তবে কি ভাবে এই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইবে? মধ্যযুগীয় পণ্ডিতেরা বলিতেন, মণীষী ব্যক্তিরা ঐশ্বরিক অনুগ্রহে অন্তর্দিষ্টিবলে মাঝে মাঝে এই জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, ইহা আপনা হইতেই তাহাদের মনে উদয় হয়, ইহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেই হইবে।

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ যে জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় বেকন নিজেও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে ইহা একমাত্র পন্থা নহে; প্রাকৃতিক দর্শন ও গণিতের মাধ্যমেও জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। ইহার পর বেকন যোজনা করেন তাঁহার নিজস্ব মতবাদ এবং ইহাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ, প্রাকৃতিক দর্শন ও গণিতের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও সেই জ্ঞান যে অভ্রান্ত তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? বেকন বলিলেন, একমাত্র পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এই জ্ঞানের অভ্রান্ততা যাচাই করা যায়। শুধু তাহাই নহে, বাস্তব অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জ্ঞানকেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণে পরীক্ষার প্রয়োজন, ইহার সপক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন থাকা চাই, নচেৎ যত বড় পণ্ডিত যত বড় জ্ঞানের কথাই বলুন না কেন তাহার কোন মূল্য নাই। বেকনের এই অভিমত আমরা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ
প্রাকৃতিক দর্শন বা } —পরীক্ষা —নিশ্চয়তা।
গণিতের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান (বাস্তব অভিজ্ঞতা)

বেকনের সময়ে ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ বাধে নাই। ফ্রান্সিস্‌কানদের হাতে তাঁহার নানা লাঞ্ছনা ও দুর্দশাভোগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি দায়ী। অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্‌নাস্, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস্ প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সমালোচনা এবং ফ্রান্সিস্‌কান প্রধানদের কার্যের নিন্দা করিয়া তিনি নিজেই উপদ্রব ডাকিয়া আনেন। তাহার ফলে কি ধর্মসংস্থায়ে কি বিদ্বৎ সমাজে উচ্চপদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভে তিনি বঞ্চিত হন। পোপ চতুর্থ ক্লিমেণ্ট তাঁহার জীবনের মোড় অনেকটা ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলে বেকন তাঁহার দীর্ঘ গবেষণা ও চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন কিনা সন্দেহ। লোকচক্ষুতে তিনি হয়ত এক সাধারণ যাদুকর ও কিমিয়াবিদ হিসাবেই থাকিয়া যাইতেন, তাঁহার উর্বর ও স্বকীয় মনের পরিচয় হয়ত চিরকালের জন্য চাপা পড়িয়া যাইত।

* Roger Bacon and his Search for Universal Science—Stewart Easton, Oxford, 1952, [illegible]

—পাঁচ—

"Estou cansado ; gostaria de descansar."

...ন্দির, বাজার আর তীর্থযাত্রীদের ভিড় পার হয়ে করম আলীর সঙ্গে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত। ক্রমে চারদিক ফাঁকা হয়ে এল, সমুদ্রের হু হু হাওয়া অভ্যর্থনা করল দুজনকে। ...কটা ছোট ছোট বালিয়াড়ী, অজস্র কাঁটাবন, দূরে ...-জঙ্গলের মেঘরেখা আর সামনে জোয়ার-লাগা ...সমুদ্র।

করম আলীর কোমরবন্ধে হাতীর দাঁতের বাঁটে মুক্তো ...নো ছুরিখানা, চোখের ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টি, আর বালির ...র দিয়ে চলবার সময় তার ভারী পায়ের একটা অদ্ভুত ...—সব মিলিয়ে তেমনি কঠিন অস্বস্তি জাগিয়ে রেখেছে ...দত্তের মনে। কোথায় তাকে এ ভাবে নিয়ে চলেছে ...কটা—কী তার মতলব? যদি নির্জনে নিয়ে এসে ...র মতো শক্ত মুঠোয় তার গলাটা টিপে ধরে, তা হলে ...বার আর্তনাদ করার সময়ও পাবেনা শঙ্খদত্ত, আত্মরক্ষা দূরের কথা। লোকটার অমানুষিক শক্তির কাছে সে ...স্ত শিশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

শঙ্খদত্ত চোখ তুলে তাকালো: আমরা কোথায় চলেছি সাহেব?

করম আলী বললেন, বেশি দূর নয়। আর একটু এগিয়ে।

—কিন্তু এমন কি গোপন কথা যে এত নির্জনেও যায়না?

—শুনলেই বুঝতে পারবে। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি

—ভয়?—শঙ্খদত্ত অপ্রতিভ হল: না—না। মিথ্যে মিথ্যে ভয় করব কেন?—কিন্তু মন বলছিল, ভরসাও নেই। এই আরব-বণিকদের সম্বন্ধে চেনা যায়না। কোথায় কবেকার শত্রুতা যে মনের মধ্যে পুষে রেখেছে কেউ আন্দাজ করতে পারেনা সেটা। সময় পেলেই সুদে-আসলে তা মিটিয়ে নেয়। হার্মাদের তলোয়ারের মতো ওদেরও ছোরার ফলায় ফলায় রক্তের কণা শুকিয়ে থাকে।

—তবে আর একটু চলো। একটা ভালো জায়গা দেখে বসা যাক।

আরো কয়েক পা এগিয়ে একটা বালিয়াড়ীর তলায় বসল দুজনে। পেছনে বালিয়াড়ীর উঁচু প্রাচীর, দু পাশে ঘন কাঁটাবন, সামনে কয়েক হাত দূরেই সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। অকারণেও কেউ এদিকে আচমকা চলে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। গোপন আলাপের উপযুক্ত জায়গাই বটে।

—বোসো। দাঁড়িয়ে আছো কেন?

শঙ্খদত্ত আঙুল বাড়িয়ে দিলে: ওই যে।

পাশেই কাঁটা ঝোপের নীচে টাটকা একটা সাপের খোলস পড়ে আছে। সদ্য ছেড়ে-যাওয়া—এখনো ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে সেটাকে। প্রায় হাত চারেক লম্বা বিশাল কায় গোক্ষুরের খোলস।

—ওঃ, খোলস?—পা দিয়ে সেটাকে বালির মধ্যে মাড়িয়ে দিয়ে করম আলী হাসলেন: সাপ তো আর নয় যে ছোবল দেবে।

—কিন্তু কাছাকাছি সাপ আছে বলেই মনে হচ্ছে।

—থাকে থাক। এসো, এসো, বসে পড়ো।—করম

ধরতে পারি। তারপরেও আছে আমার কোমরের ছোরাখানা। নেহাৎ কপাল না পুড়লে সাপ এদিকে আসবেনা কখনো।

আর দ্বিধা করা যায়না। খোলসটা থেকে সাধ্যমতো দূরত্ব বাঁচিয়ে বালির ওপরে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত।

কুঞ্চিত মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন করম আলী। জোয়ারের উচ্ছলতায়, হাওয়ার মাতলামিতে চঞ্চল ঢেউ লক্ষ লক্ষ সাপের মতো হিস্ হিস্ করে ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। বহু দূরান্তে কাদের একখানা জাহাজ ভেসে চলেছে, তাকে দেখা যায়না—শুধু চোখে পড়ছে একটা ছোট্ট বকের মতো তার বিরাট শাদা পালটা। মাথার ওপরে থমকে থেমে আছে একখানা রক্তরাঙা মেঘ।

মেহেদী-রঙানো মোটা মোটা আঙুলে করম আলী খুঁড়তে লাগলেন বালির ভেতরে। তার পর আস্তে আস্তে বললেন, একটা বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে।

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল: কোথায়?

করম আলী হাসলেন: এখানে—এই বালিয়াড়ীর তলায় নয়। আমি বলছি, সারা হিন্দুস্থানে।

—কি রকম?

—ঝড় উঠবে। সে ঝড়ে তুমি আমি সবাই উড়ে যাব। যেমন করে শুকনো পাতা উড়ে যায়, ঠিক সেই রকম।

—কথাটা বুঝতে পারছি না।

—খ্রীস্টান আসছে। হার্মাদ।

—সে তো জানি।

—না, কিছুই জানো না—করম আলীর কপালে মেঘের ছায়া ঘনাতে লাগল: ব্যাপারটা এখনো তোমরা কিছুই বুঝতে পারোনি। না চট্টগ্রামের বণিকেরা—না সপ্তগ্রামের।

—কী বুঝতে পারিনি?

করম আলী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন: ওরা বিদেশী। ওরা বিধর্মী।

একটু চুপ করে থেকে শঙ্খদত্ত বললে, তাতেই বা কী ক্ষতি? আপনারাও তো বিদেশী—তা ছাড়া আপনাদের ধর্মের সঙ্গেও আমাদের মিল নেই। সেজন্যে কোথাও কিছু করেন, ওরাও তাই করবে। এর মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—হয় তুমি কিছুই বোঝোনা, নইলে বুঝেও না বোঝার ভাণ করছ শঙ্খদত্ত—চাপা গলায় করম আলী গর্জন করে উঠলেন। থাবার মধ্যে একমুঠো বালি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বললেন, খ্রীস্টানদের মতলব অত সহজ নয়। বাণিজ্যের নাম করে ওরা মাটিতে পা দেয়, তারপর তলোয়ার দিয়ে দখল করে তাকে। এক হাত দিয়ে ওরা মশলা কেনে আর এক হাত দিয়ে গলা কাটে। কালিকটে, গোয়ায়, মালদ্বীপে ওরা এর মধ্যেই ঘাঁটি আগলেছে—এইবার নজর দিয়েছে বাংলা দেশের দিকে। এদেশের ওপর সকলেরই লোভ। এখানকার মাটিতে সোনা ফলে, এখানকার আকাশ থেকেই মাণিক ঝরে। এখন থেকে সাবধান হও শঙ্খদত্ত। নইলে গোয়া কালিকটের বণিকদের যে দশা হয়েছে, সে দুঃখ তোমাদেরও জন্যে অপেক্ষা করছে।

নীরবে কথাগুলো শুনে গেল শঙ্খদত্ত, তখনই কোনো জবাব দিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে চন্দ্রনাথ মন্দিরের সেই পাগলা সন্ন্যাসী সোমদেবের কথা। খ্রীস্টানেরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছুবে দিল্লীর শাহী-তখ্‌ত পর্যন্ত! কিন্তু হিন্দু বণিকদের কী আসে যায় তাতে? এ কাজ কি এর আগে কেউ করেনি? করেনি করম আলীর স্বজাতি তারই আত্মজন?

আসলে বাধছে স্বার্থে। মরের ভোগে আজ ভাগ বসাতে এসেছে খ্রীস্টান। তাইতেই গায়ের জ্বালা। এতকাল বাইরের একচেটিয়া কারবার ছিল আরবদেরই হাতে: তারা ইচ্ছে মতো দাম দিয়ে জিনিস নিয়েছে, তারপর সারা দরিয়ার শহরে শহরে বিক্রী করে মুনাফা লুটেছে যত খুশি। এবার প্রতিযোগিতার পালা। বরং পর্তুগীজদের সঙ্গে যারা কারবার করেছে, তারা বলে, আরবদের চাইতে ঢের বেশি দাম দেয় ওরা—এক বস্তা শুকনো লঙ্কার বদলে বের করে দেয় এক মুঠো সোনা।

শঙ্খদত্তের কাছে দুই-ই সমান। কেউই ...

দিয়ে আর এক কাঁটার উৎপাটন। সোমদেবের ...ভয়ঙ্কর চোখ দুটো মনে পড়ছে।

—এতটা ভাববার সময় কি এখনি এসেছে?—...খানে জবাব দিল শঙ্খদত্ত।

—এখনি এসেছে।—করম আলীর দৃষ্টি দপ্ দপ্ করে ...: খ্রীস্টান যেখানে পা দেবে, সেখানে আর ...টিকেই মাথা তুলতে দেবে না। কীভাবে ওরা কালিকটের রাস্তায় কামান দিয়ে মানুষের মাথা উড়িয়ে দিয়েছে—...কি শোনোনি? শোনোনি—নির্দোষ হজযাত্রীদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে—করম আলীর একখানা হাত ক্ষিপ্ত ...লার ছোরার বাঁটের ওপর গিয়ে পড়ল: ওরা গায়ের ...ল মিটিয়েছে? মাত্র কিছুদিন আগেই কেমন করে ...রা হাঙ্গামা বাধিয়েছিল চট্টগ্রামের বন্দরে? ওদের চাইতে ... গোখরো-সাপটাও নিরাপদ তা মনে রেখো।

—চট্টগ্রামে যা হয়েছে, তার জন্যে ওদের খুব দোষ ছিল না। বরং কৌশল করে—

করম আলী কথাটাকে থামিয়ে দিলেন: তুমি ...ডিরাকে চেনোনা—আমি চিনি। একটা মূর্তিমান শয়তান সে। যদি কল-কৌশল কিছু করা হয়ে থাকে, সে ...লোর জন্যেই। সুলতানের কাছে ওরা আর সহজে ...ড়তে পারবে না—সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আরো একটু কাজ আছে।

—কী কাজ?

—সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে। কালিকট গোয়ায় ... হয়েছে, তার আর চাড়া নেই। কিন্তু বাংলা দেশের মাটিতে কিছুতে পা দিতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের। ওদের সঙ্গে লেন-দেন বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে। সবরকমভাবে শত্রুতা করতে হবে। তোমার বাপ ধনদত্তের প্রভাব আছে সপ্তগ্রামের বণিকদের ওপরে—তোমরা একটু চেষ্টা করলে কাজটা কঠিন হবে না।

—বেশ তো, দেখব।

—না, শুধু কথার কথাই নয়।—করম আলীর কপালের ...রে মেঘের ছায়াটা আরো ঘন হয়ে এল: আমি ...লো বলছি শঙ্খদত্ত, ঘর সামলাও। নইলে তোমাদেরও তোমাদের ওই সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বন্দর, রক্তে রাঙা হয়ে যাবে গঙ্গা আর সরস্বতীর জল, আজ যেখানে তোমাদের মন্দিরের চূড়ো আকাশে মাথা তুলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে উঠবে ওদের ইগ্রেজা—ঘণ্টা বাজবে মেরীর নামে। তলোয়ারের মুখে দেশকে দেশ খ্রীস্টান করে দেবে ওরা।

করম আলীর স্বার্থ যতটাই থাক, কথাগুলো একেবারে অমূলক নয়। হাঁ, হার্মাদদের দেখেছে বইকি শঙ্খদত্ত। অদ্ভুত টুপির নিচে চোখের এক দিকটা ঢাকা—আর একটা পিঙ্গল চোখ বন্যজন্তুর মতো ঝকমক করে। বাঘের গায়ের মতো ডোরাদার আংরাখা। রোদে-পোড়া তামাটে রঙ। কোমরের তলোয়ারগুলো অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ।

—আমি বুঝতে পেরেছি!—শঙ্খদত্ত একটা নিশ্বাস ফেলল: এইজন্যেই ডেকেছিলেন?

—না, আরো খবর আছে। আরো গুরুতর।

—গুরুতর?—শঙ্খদত্ত শঙ্কিত জিজ্ঞাসু চোখ তুলল।

—দেশে একটা ভয়ঙ্কর অশান্তি আসছে। সেই অশান্তির সুযোগ নেবে হার্মাদেরা।

—কিসের অশান্তি?

—সাসারামের বাঘ। সেই পাঠান।

শঙ্খদত্ত সজাগ হয়ে নড়ে বসল: শের খাঁ?

—শের খাঁ নয়, এখন সে শেরশাহ। বিদ্রোহ করেছে সে। ফৌজ নিয়ে এগিয়ে গেছে সে—চুনারের কেল্লা দখল করেছে। দিল্লী থেকে স্বয়ং বাদশা আসছেন তাকে দমন করবার জন্যে।

—চুনার? সে তো অনেক দূর। তার জন্যে আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে?

—শুকনো ঘাসে আগুন লেগেছে শঙ্খদত্ত, ও শুধু চুনারেই থেমে থাকবে না। তোমার ঘর পর্যন্তও তা এগিয়ে আসবে। শেরখাঁ শুধু নামেই শের নয়, কাজেও আদত শের। বাদশা হুমায়ুনকে এত সহজেই পার পেতে দেবে না সে। মোগল পাঠানে বেশ এক হাত পাঞ্জা হয়ে যাবে— কে জিতবে জোর করে বলা যায় না। আর এর মাঝখানে যদি একবার পর্তুগীজেরা মাথা গলাতে পারে, তাহলে এই সুযোগে তারা তাদের কাজ ভালো করেই গুছিয়ে নেবে।

—হুঁ, কিছু কিছু বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের

—হার্মাদদের এই মাটিতে ভিড়তে দেওয়া নয়—সে তো তোমাকে আগেই বলেছি। আর তা ছাড়া—করম আলী একবার চারদিকে তাকালেন : তোমার দেশের মাটিতে যদি যুদ্ধ এসে পৌঁছোয়, তা হলে কার পক্ষে দাঁড়াবে তোমরা ?

নিভৃত আলোচনাটার অর্থ এইবারে বুঝতে পারা গেল।

—কেন ? সতর্কভাবে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে : মোগল এখন দেশের রাজা। তার দিকেই দাঁড়ানো উচিত।

—হুঁ:, মোগল !—করম আলী অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করলেন : বিলাসী অপদার্থের দল সব। না আছে তলোয়ারের জোর, না আছে মনের জোর। নাচ-গান ফুর্তি,আর পোলাও কালিয়া। দিল্লীতে আমি গিয়েছিলাম—দেখেছি এই বাদশা হুমায়ুনকে। আয়েসী দুর্বল মানুষ—তলোয়ার তোলবার মতো কব্জীর জোর পর্যন্ত নেই ! এই মোগলের হাতে যদি দিল্লীর তখ্‌ত থাকে, খ্রীস্টানকে কেউ ঠেকাতে পারবে না—এক ধাক্কায় তাদের দূরে ফেলে দিয়ে খ্রীস্টান সেই তখ্‌তে চেপে বসবে।

নীরবে শঙ্খদত্ত শুনে যেতে লাগল।

—আজ শক্ত মানুষ চাই—চাই শক্ত কব্জী। সে কব্জী আছে পাঠানের—আর তাদের মধ্যে সেরা পাঠান হচ্ছে শেরখাঁ। সাচ্চা মুসলমান। দেশে ওই শেরখাঁকেই কায়েম করতে হবে। চুণার ছাড়িয়ে ওই লড়াই যদি কোনো দিন গৌড়ে এসে ঢোকে, তা হলে সেদিন একথা ভুলোনা শঙ্খদত্ত। হয়তো তুমি-আমি সবাই সেদিন কাজে লাগব।

শঙ্খদত্ত চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। সামনের সমুদ্রের মতোই মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ। একটা কিছু বিপর্যয় আসছে—বিরাট, ভয়ঙ্কর। ঢেউয়ের একটানা তীব্র গর্জনে যেন তারই পূর্ব-সংকেত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে; মাথার ওপর থমকে থেমে থাকা রক্তবর্ণ মেঘে তারই চাপা ইঙ্গিত।

শঙ্খদত্ত বললে, অনেক কথা এক সঙ্গে বললেন। ভাবতে হবে।

করম আলী উঠে দাঁড়ালেন : হবে বই কি। ভাবনার সবে তো শুরু। কিন্তু এটা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে যেমন করে হোক, খ্রীস্টানদের রুখতেই হবে আমাদের। বাইরে [illegible] বাংলা দেশ কালিকট নয়। এখন চলো,

—তাই চলুন। আমিও বড় ক্লান্ত, আমার বি[illegible] দরকার—বিবর্ণ মুখে জবাব দিলে শঙ্খদত্ত।

উদ্ধব পাণ্ডার বাড়িতে আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। শঙ্খদত্তের মাথার মধ্যে ক্রমাগতই যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ[illegible] মনের ওপর ভাসছে আকাশের রক্ত মেঘের [illegible] ঝড় আসছে।

কোথায় নিয়ে পৌঁছুবে এ শেষ পর্যন্ত ? মোগ[illegible] পাঠান—পর্তুগীজ। সারা দেশের ওপরে ঘনাচ্ছে ব্যাপ[illegible] দুর্লয়। ভাবনাগুলো একটা অন্ধকারের গোলক[illegible] ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

কাছেই কোথায় একটা জুয়ার আড্ডার চিৎকার [illegible] শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শঙ্খদত্ত। খোলা জানালা [illegible] মাঝে মাঝে বয়ে-আসা সমুদ্রের হাওয়ায় আরো নিটোল এসেছিল ঘুমটা। তারপর কানের কাছে কে যেন ডা[illegible] শেঠ—শেঠ !

তখন অনেক রাত। শঙ্খদত্ত চমকে চোখ [illegible] ঘরের কোনায় প্রদীপটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। [illegible] আছে উদ্ধব।

—কী হল উদ্ধব ঠাকুর ? কী হয়েছে এত রাত্রে ?

—মন্দিরে বিশেষ পুজো দেখতে যাবেন বলেছিলেন। সময় হয়েছে।

শঙ্খদত্ত ধড়মড় করে উঠে বসল : চলুন।

দুজনে যখন বেরিয়ে এল, তখন স্তব্ধ রাত্রি। পথে [illegible] জন নেই। বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় যেন শ্মশানের শূ[illegible] শুধু তিন চার জন লোক মাধ্বী খেয়ে পথে মাতলামি ক[illegible] আর তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানা[illegible] একটা শীর্ণকায় কুকুর।

মৃত পাণ্ডুর আলোয় প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে [illegible] মন্দির। চূড়োগুলো যেন আকাশে তুলে রেখেছে [illegible] বাহু। সারা ভারতবর্ষের পরম পুণ্যতীর্থ এই মন্দি[illegible] দেখেও কখনো কখনো এমন ভয় করে কেন কে [illegible] দরজার প্রহরী উদ্ধবকে দেখে পথ ছেড়ে দিলে। [illegible] নিঃশব্দে পার হয়ে চলল প্রহরীর পর প্রহরী—দরজার [illegible] দরজা, তারপর এসে পৌঁছুল একেবারে মূল মন্দিরের [illegible]

...া, পট্টবস্ত্রপরা বিশালমূর্তি পুরুষ। যেন প্রতিহারী কাল-...র। সবল বাহুতে দরজা রোধ করে রেখেই সে তীব্র ...তে উদ্ধব আর শঙ্খদত্তের দিকে তাকালো।

উদ্ধব মৃদু গলায় বললে, সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠ শঙ্খদত্ত। এঁর ...া আমি বলেছিলাম।

—ওঃ!

বাহু সরে গেল।

মন্দিরের মধ্যে পা দিতেই ধাঁধাঁ লেগে গেল শঙ্খদত্তের। ...রের বেলাতেই যা তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এ সে মন্দির ...। যেখানে একটিমাত্র প্রদীপ জেলে তারই অত্যন্ত ক্ষীণ ...লোকে দেব দর্শন করতে হয়—আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে ...রূপ। চারদিকে খরদীপ্ত উজ্জ্বল আলো। দেবতার ...র্তি ফুলে ফুলে সাজানো, রুদ্ধশ্বাস ঘরখানি চন্দনের ...ন্ধে আশ্চর্য সুরভিত হয়ে উঠেছে। বাঁশী আর বীণার ...টা সুমিষ্ট আলাপ শোনা যাচ্ছে। এখানে ওখানে ...কটি মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ ...ভায়।

একটা স্তম্ভের পাশে দাঁড়াতে নীরব ইঙ্গিত করলে ...। শঙ্খদত্ত দাঁড়ালো। বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল বিগ্রহের দিকে, কান পেতে শুনতে লাগল বাঁশী আর বীণার স্বপ্নমেদুর ঝঙ্কার।

হঠাৎ কোথা থেকে শোনা গেল নূপুরের গুঞ্জন। এবার শঙ্খদত্তের চোখ একবার চমকে উঠেই নিষ্পলক হয়ে গেল। অপূর্ব একটি দৃশ্যের যবনিকা উঠল দৃষ্টির সামনে।

বাঁশী আর বীণার তালে তালে পূজোর অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশ করল দেবদাসী।

গলায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের কঙ্কন, পায়ে নূপুর। নির্মল শ্বেতপদ্মের মতো সুঠাম শুভ্র দেহে কোথাও কোনো আবরণ নেই। সংসারের সমস্ত লৌকিক লাজ-লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দেবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অনাবৃতাঙ্গী দেবদাসী। উজ্জ্বল আলোয় সুকুমার শরীরের প্রতিটি অংশ মায়ালোকের মতো একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। কোথা থেকে একটা মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি সমস্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করে দিলে—হাওয়ার দোলা-লাগা শ্বেতপদ্মের মতো উজ্জ্বল দেহখানি প্রণামের ছন্দে নত হয়ে পড়ল দেবতার পায়ের সম্মুখে। (ক্রমশঃ)

প্রণাম তোমার শেষের সে নয়

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

...হ'য়ে আসে গোধূলির আলো সন্ধ্যা নামিছে ধীরে,
কালো কেশ বিছাইয়া দেয় প্রকৃতির বুকে তার ;
...দের ঘন ছায়াখানি নামে সারা পৃথিবীরে ঘিরে,
...া ও ব্যথা, নিরাশার মাঝে সন্ধ্যার অভিসার।
...নীলিমার উদার বুকেতে উদাস তারকা ফুটে,
...ল জোনাকি কা'র সন্ধানে খুঁজে মরে দিশি দিশি ;
...র স্বনে কোন সে বেদনা গুমরি গুমরি উঠে,
...র ছায়ে তরু-মর্ম্মরে কি কথা ফিরিছে মিশি।
...আমার নিয়েছ বিদায় এমনি সে এক ক্ষণে,
...ন পথ, নীরব নিথর নির্জ্জন নদী তীরে ;
...র ছায়া মিশেছিল যবে রাত্রির মায়া সনে,
বলেছিলে যবে 'বিদায় বন্ধু' শেষের নমস্কারে ;
'ক্ষমা ক'রো তুমি বন্ধু আমার, যত অপরাধ ত্রুটি ;
ভেবে পাইনিক নন্দিত করি কোন সে পুরস্কারে,
নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়েছিনু শুধু তব আঁখিপানে দুটি।
ধীরে ধীরে তুমি মিলালে বন্ধু সুদূর পথের শেষে,
আমি শুধু একা রহিনু দাঁড়ায়ে তব পানে মেলি আঁখি ;
অজানা সে কোন গোপন ফুলের সুবাস আসিল ভেসে,
বিদায় তোমার হৃদয়-পটেতে রহিল চির যে আঁকি।
প্রণাম তোমার শেষের সে নয়, ভেবে দেখি মনে মনে,
মর্ম্মের মূলে বিদায় তোমার শাশ্বত হ'য়ে রয় ;
শেষের বাণী সে অশেষ হইয়া দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে,

...বীর সর্বত্র গান্ধীজির স্মৃতিরক্ষা—

গত ১৯শে মার্চ দিল্লীতে লোক সভায় বৈদেশিক ...াগের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ জানাইয়াছেন—...জিল, ব্রহ্মদেশ, বেলজিয়াম, কঙ্গো, সিংহল, ইথিওপিয়া, ...জি, ইন্দোনেশিয়া, মরিশস, মালয়, বৃটেন ও পাকিস্তান— ... ১২টি দেশে গান্ধীজির স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ...মেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটীশ পূর্ব-আফ্রিকা, বৃটিশ ওয়েষ্ট ...জ ও ইন্দোচীনে স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা ... হইতেছে। সকল দেশে সাধারণতঃ বেসরকারী ...তেই এই স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থা হইতেছে—ভারত সরকার এ ... কোথাও কোনরূপ সাহায্য দান করেন নাই। স্কুল, ...জ, প্রসূতি-সদন, মর্মরমূর্তি, মিউজিয়াম, পাঠাগার, ...ন প্রভৃতি রচনা দ্বারা স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। ...তের সর্বত্র গান্ধীজির স্মৃতি রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

...ন অন্ধ্র রাজ্য গঠন—

গত ২৫শে মার্চ দিল্লীর লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী ...হরলাল নেহরু মাদ্রাজ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া নূতন ... রাজ্য গঠন সম্পর্কে বিচারপতি বাঞ্চুর রিপোর্ট প্রকাশ ...রিয়াছেন। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে নূতন স্বতন্ত্র ... রাজ্য গঠিত হইবে। তেলেগু-ভাষী ১১টি জেলা ও ...রী জেলার ৩টি তালুক লইয়া নূতন রাজ্য হইবে— ...লাগুলির নাম (১) শ্রীকাকুলম, (২) বিশাখাপত্তন, ...) পূর্ব গোদাবরী, (৪) পশ্চিম গোদাবরী (৫) কৃষ্ণা, ...) গুণ্টুর, (৭) নেলোর, (৮) কুরনুল, (৯) অনন্তপুর ...০) কুডাপা, (১১) চিত্তুর। অন্ধ্রের লোক পরে ...জধানীর স্থান স্থির করিবে। স্বাধীনতা লাভের পর ...া অনুসারে এই প্রথম রাজ্য গঠিত হইল।

...াচীন ইট ও খিলান উদ্ধার—

হুগলী জেলার সেওড়াফুলী হইতে ২৫ মাইল পশ্চিমে হাওড়া ...গাডাজা মার্টিন রেলের পিয়াসাড়া ষ্টেশনের উত্তরে ছাত্তবা- ... গ্রামে রাণী রায়বাঘিনীর গড় খনন করিবার সময় কতিপয় প্রাচীন ইট ও একটি পাথরের খিলান পাওয়া গিয়াছে। খিলানে প্রাচীন বাংলা লিপিতে কয়েকটি বাক্য লিপিবদ্ধ আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী রায়বাঘিনীর ঐ গ্রামে দুর্গ ছিল। ১৯৩৭ সালে সেওড়াফুলী সারদাচরণ মিউজিয়ামের পরিচালকগণ ঐ স্থানে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

খোলাবাজারে চাউল বিক্রয়—

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশন-গ্রহীতাদের শীঘ্রই বিশেষ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকান হইতে খোলাবাজারে চাউল কিনিবার সুযোগ দেওয়া হইবে—ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বর্তমানের মত রেশনের দোকান হইতেও চাউল কিনিতে পারিবেন। নূতন দোকানগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে চাউল বিক্রয় করা হইবে। খোলা বাজারের এই চাউল ক্রয়ের ব্যাপারেও অবশ্য বর্তমান রেশনে উল্লিখিত চাউলের পরিমাণকে অতিক্রম করা চলিবে না। এই ব্যবস্থায় জনগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত ভাল চাউল পাইতে পারিবেন।

ধূমপান নিষেধ আইন—

গত ২৫শে মার্চ কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ট্রামে বাসে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ আইন গৃহীত হইয়াছে। ট্রামে ও বাসে ধূমপানের ফলে সাধারণ যাত্রীদের অসুবিধা হইত, সে জন্য এই আইন করা হইয়াছে। কেহ এই আইন অমান্য করিলে প্রথম দফায় তাহার ২০ টাকা জরিমানা হইবে—দ্বিতীয় বারে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। যে কোন সাধারণ গাড়ীতে ভাড়া লইয়া ৬জন লোক যাতায়াত করিবেন, সেখানেই এই আইন প্রয়োগ করা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ধূমপানকারীদের হয় ত অসুবিধা হইবে—কিন্তু জনসাধারণ উপকৃত হইবেন।

কেন্দ্রে নূতন বাঙ্গালী উপমন্ত্রী—

খ্যাতনামা দেশকর্মী, লেখক ও সাহিত্যিক, কেন্দ্রীয় লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগের ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া গত ১৯শে মার্চ

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅনিলকুমার চন্দ একমাত্র বাঙ্গালী উপমন্ত্রী ছিলেন—অরুণবাবুর এই নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইবেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা বাঙ্গালীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, প্রত্যেক বাঙ্গালী তাহাই আশা করে।

নূতন অলডারম্যান—

নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যুতে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে অলডারম্যান পদ শূন্য হইয়াছিল, সর্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সেই পদে গত ২৫শে মার্চ অলডার-ম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। বিরোধী নাগরিক পরিষদের সদস্যগণ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন।

কাপড়ের কল ও তাঁত শিল্প—

গত ১৭ই মার্চ কলিকাতায় বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির উনবিংশ বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে ভাষণদান কালে খ্যাত-নামা ব্যবসায়ী ও মিল মালিক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁত শিল্প রক্ষা করিবার ব্যবস্থার জন্য যে আইন করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলার কাপড়ের কলগুলির দারুণ ক্ষতি করা হইয়াছে। বাংলায় কাপড়ের কলে ধুতি ও শাড়ী অধিক বোনা হয়। সার্টিং প্রভৃতি কম হয়। এখানে ধুতি বোনা নিয়ন্ত্রণের ফলে কলগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে ও দেশে বেকার সমস্যা বাড়িবে। তাহা ছাড়া বাংলায় যে কাপড় উৎপন্ন হয়, দেশবাসীর পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে—অন্য রাষ্ট্র হইতে বাংলায় কাপড় আম-দানী করিতে হয়। বাংলায় কম কাপড় উৎপন্ন হইলে কাপড়ের দামও বাড়িয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস ভারত গভর্ণমেণ্ট বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করিয়া বাংলার কাপড়ের কলগুলি যাহাতে রক্ষা পায় সে বিষয়ে অবহিত হইবেন।

রাণী মেরীর পরলোক গমন—

গত ২৪শে মার্চ রাত্রিতে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের পিতামহী রাণী মেরী লণ্ডনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৬৭ সালে মেরী জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ডিউক অফ টেকের কন্যা—১৮৯৩ সালে সপ্তম এডোয়ার্ডের পুত্র পঞ্চম জর্জের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়—[illegible] সন্তানের জননী ছিলেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [illegible]—অষ্টম এডোয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন—কিন্তু পদত্যাগ করায় তৃতীয় ষষ্ঠ জর্জ রাজা হন—গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি [illegible] গিয়াছেন। ষষ্ঠ জর্জের কন্যাই এখন ইংলণ্ডের [illegible] ১৯১১ সালে তিনি স্বামীর সহিত ভারতে আসিয়া[illegible] ১৯৩৬ সালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। রাণী মেরীর [illegible] সময় তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস রয়াল তথায় উ[illegible] ছিলেন। পুত্র ডিউক অফ উইণ্ডসরকে কয়েকবার [illegible] হয়—কিন্তু মৃত্যুর ১০ মিনিট পরে তিনি আসিয়া [illegible] হন। তাঁহার শেষ ইচ্ছা অনুসারে ২রা জুন তারিখেই এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পাদিত হইবে
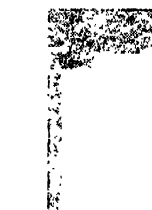
বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা পরিদর্শনরত দুইজন সুবিখ্যাত রস-স[illegible]
শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম) ও শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভারতে জাপানী প্রথায় চাষ—

ভারতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের ব্যবস্থা জন্য ১৫টি জাপানী কৃষক পরিবারকে শীঘ্রই ভারতে [illegible] হইবে—তাহারা ৩ হইতে ৫ বৎসর এদেশে থাকিয়া সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে ধান চাষ করিবে। ভারত একদল কৃষক-যুবককে জাপানে পাঠাইয়া জাপানী ধান চাষ শিখাইয়া আনা হইবে। কম পরিশ্রম[illegible]

উপায়ে একাধিকবার অধিক ধান উৎপাদন করা যায়, বিষয়ে জাপানী কৃষকরা অভিজ্ঞ। ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় জাপানী প্রথা প্রবর্তিত হইলে খাদ্যাভাব দূর হইবে আশা করা যায়।

জোর করিয়া হিন্দী শিক্ষা—

গত ১৮ই মার্চ পুরুলিয়ায় এক জনসভায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে এক প্রার্থনা সভায় বলেন—মানভূম জেলায় বাংলা ভাষার ব্যবহারই অধিক। এ ক্ষেত্রে মানভূমে জোর করিয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া ঠিক হইবে না। তাহাতে হিন্দী শিক্ষার উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হইবে। তিনি মানভূমের বাংলা ভাষাভাষীদিগকে হিন্দী শিক্ষা করিতে ও বিহারীদের আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার কথায় বিহারের রাষ্ট্র পরিচালকরা কি অবহিত হইবেন?

পশ্চিম বঙ্গে সহরের সংখ্যা বৃদ্ধি—

সম্প্রতি বাঙ্গালার আদম সুমারীর কর্মকর্তা শ্রীঅশোক-কুমার মিত্র যে ৫৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবরণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও চন্দননগর লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে ১৯০১ সালে ৭৪টি সহর ছিল—১৯৫১ সালে তাহা ১১৪টি হইয়াছে। গ্রামের সংখ্যা ১৯০১ সালে ৪৩৩৯০জন—১৯৫১ সালে হইয়াছে ৪৩০৯৩—অর্থাৎ গ্রামগুলি জনহীন বা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ২৪৯৯৭৯৪২—তন্মধ্যে ২১০৩৯৬০১জন বঙ্গ ভাষাভাষী, ১৫৮০৭২৪জন হিন্দী ভাষাভাষী, ২১২৫৬২ নেপালী, ৬৬৩৫১৬ সাঁওতালী, ১৮২৬১৮ উড়িয়া, ৫৭২৯জন চীনা ও ৩৮২৮৩ জন ইংরাজী ভাষাভাষী। ২৪পরগণা বাংলার সর্ববৃহৎ জেলা, তাহার আয়তন ৫২৯২০৮ বর্গ মাইল—জনসংখ্যা ৪৬০৯৩০৯। সহরের সংখ্যা—২৪পরগণা ৩৩, বর্দ্ধমানে ১৪, মেদিনীপুরে ১১, হুগলীতে ১১, নদীয়ায় ৭, কুচবিহারে ৬, মুর্শিদাবাদে ৬, [illegible]মে ৫, বাঁকুড়ায় ৫, দার্জিলিংয়ে ৩, হাওড়ায় ৪, দিনাজপুরে ৩, জলপাইগুড়িতে ২, মালদহে ২। এই বহু তথ্য সম্বলিত বিবরণ শিক্ষিত সহরবাসীদের পাঠ করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত।

জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ -

পশ্চিমবঙ্গের ১৫০ বৎসরের প্রাচীন জমীদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় আইন উপস্থিত করা হইবে—সেজন্য আবশ্যক আলোচনা শেষ হইয়াছে। জমীদারদিগকে মোট ১৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। যে সকল জমীদার ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাইবেন, তাঁহাদের টাকা নগদ দেওয়া হইবে। যাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক পাইবেন তাঁহাদের ঋণপত্র দিয়া ক্রমে সে ঋণ শোধ করা হইবে। বর্তমানে জমীদার-দিগের মোট আয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

পাকিস্তানকে দিয়া ভারত আক্রমণ—

বৃটেনের বিশিষ্ট পত্রিকা ডেলী একস্‌প্রেসের সম্পাদক মিঃ কোনে বর্তমানে পাকিস্তানে আছেন। তিনি জানাইয়াছেন—পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীকে গঠন করিবার জন্য বৃটেন যে শত শত বৃটীশ অফিসার পাকিস্তানকে ধার দিয়াছে, তাহারা ভারত আক্রমণের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মিঃ কোনে তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন জনৈক বৃটীশ অফিসারের নিকট হইতে। শ্রীনেহরুর শক্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া বৃটীশ রাজনীতিকগণ ভীত হইয়াছেন—সেজন্য তাঁহারা ভারতের শক্তি হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সিকিম রাজ্যে নির্বাচন—

দেড় হাজার হইতে ১৫ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত জন-বিরল সিকিম রাজ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীন আছে। সিকিমের বর্তমান মহারাজা সার তাসি সমগিয়ান একজন দেওয়ানের সাহায্যে রাজ্যটি শাসন করেন। সম্প্রতি সিকিমে জনগণের ভোট লইয়া ১২জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইয়াছে। পরে ১৭জন সদস্য লইয়া সিকিমে শাসন পরিষদ গঠন করা হইবে—মনোনীত সদস্য থাকিবেন ৫জন সিকিমে লেপচা, ভুটিয়া ও নেপালীয়া বাস করে। ভারতের নূতন শাসন যন্ত্র সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছে।

ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত সফর—

ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ইউ নু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ৭ দিন ধরিয়া ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। গত ৫ই এপ্রিল তাঁহার সফর শেষ করিয়া শ্রীনেহরু বিমানযোগে দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। শেষ দিনে এক ভোজ সভায় বক্তৃতা কালে তিনি কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান কল্পে যুদ্ধানুষ্ঠানের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করেন এবং এই মর্মে তাঁহার দৃঢ় অভিমত

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচ
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচ
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

...করেন যে—বিরোধী ব্যাপার লইয়া সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার দ্বারাই ...র যথাযথ সমাধান হইতে পারে।

দামোদর নদের বাঁধ নির্মাণের একটি দৃশ্য। ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাঁধ পরিকল্পনা।

অরণ্য বিদ্যায় ভারতের নেতৃত্ব—

গত ৩১শে মার্চ দেরাদুনে অরণ্য বিদ্যা কলেজের বর্তন উৎসবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ মন্তব্য করেন—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অরণ্য বিদ্যায় ভারত বহুকাল হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে—ভবিষ্যতেও ভারত উপযুক্ত শিক্ষা, গবেষণা ও দৃঢ় পরিচালনা দ্বারা এই স্থান রক্ষা করিতে পারিবে। অরণ্য বিদ্যা মানবের কল্যাণ সাধনের উপায়। ১৮৭৮ সালে দেরাদুনে এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল—বর্তমানে তথায় অরণ্য গবেষণা মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই মন্দির দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে।

পরলোকে রাষ্ট্রদূত আসফ আলি—

গত ২রা এপ্রিল রাত্রিতে সুইজারল্যাণ্ডের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আসফ আলি ৬৪ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া সহসা বার্ণ সহরে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি মাত্র পূর্বদিন ভারত হইতে তথায় গমন করেন। সুইজারল্যাণ্ডের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীডি-বি-দেশাইও বার্ণ সহরে পরলোকগমন করেন। আসফ আলি আজীবন কংগ্রেস-সেবক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর উড়িষ্যার রাজ্যপালের কাজ করিয়াছেন! ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯১২ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হন। ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৪২ সালে তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ও আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের কাজও করিয়াছেন। বাঙ্গালী অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

গোধূলি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নন্দ-যশোদা-নয়নানন্দ
গোকুল-কামিনী-কণ্ঠহার—
ব্রজ-গোপালক-বালক-বন্ধু,
ঘনাইয়া আসে অন্ধকার।
হেরিয়া দীর্ঘ-দিবসাবসান
অধীর ব্যাকুল ব্রজ-জন-প্রাণ
প্রতীক্ষা করি প্রিয় প্রাণারাম
বৃন্দা-বিপিন-চন্দ্রমার।
গোধূলি-ধূসর-বদন-চন্দ্র
নিরখি ব্রজের যুবতীবৃন্দ
আরক্ত-নয়ন-উৎপলরাজি
সাজায়ে রেখেছে পথের ধার।

প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া
প্রেম চন্দনে হৃদয় ভরিয়া
আনন্দ ঘনে অভিনন্দিতে
মুক্ত করেছে কুঞ্জ-দ্বার।
নামিছে সন্ধ্যা কালিন্দীজলে
প্রেম-বিগলিত-হৃদয়ের তলে
পড়িতেছে প্রিয়-সুন্দর-ছবি
তোমার আরতি বন্দনার।
এস জননীর হৃদয়ের ধন
এস প্রিয়াজন-হৃদয়াভরণ—
এস হে নিখিল-গোকুল-...
...

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
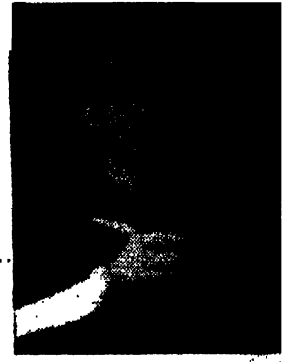
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ঃ

বাংলা ঃ ৪৭৯ (পি বি দত্ত ১৪১, নির্ম্মল চ্যাটার্জি ৫২, শিবাজী বসু ৪৮, গিরিধারী ৪৫। গাইকোয়াড় ১২৮ রানে ৪ উইঃ) ও **৩২০** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফ্র্যাঙ্ক ৬২, গিরিধারী ৫৮ নট আউট, নির্ম্মল চ্যাটার্জি ৫২, বি দাশগুপ্ত ৫৯ নট আউট।

হোলকার ঃ ৪৯৬ (নিম্বলকার ২১৯, মুস্তাক আলি ৯৯, রঙ্গনেকার ৮৬। সোম ১৯৫ রানে ৪ উইঃ। ও **১৭৭** (৯ উইকেটে মুস্তাক আলি ৪৬। গিরিধারী ১৭ রানে ৩, সোম, ব্যানার্জি এবং দাশগুপ্ত প্রত্যেকে ২ উইঃ পান।)

রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে হোলকার দল মাত্র ১৭ রানে বাংলা দলকে হারিয়েছে; প্রথম ইনিংসের রানের ফলাফলের উপর এই জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়। হোলকার দল রঞ্জি ট্রফি জয়ী হ'লেও খেলার নৈতিক দিক থেকে বাংলা দলেরই জয়লাভ হয়েছে—বাংলার পক্ষে এ পরাজয় অগৌরবের নয়। হোলকার দলের অধিনায়ক ছিলেন খ্যাতনামা প্রবীণ টেষ্ট খেলোয়াড় কর্ণেল সি কে নাইডু। দল পরিচালনায় সমস্ত কূটনীতির চাল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর সঙ্গে দলে ছিলেন মুস্তাক আলি, নিম্বলকার, সারভাতে, রঙ্গনেকার এবং গাইকোয়াড়ের মত নামকরা প্রবীণ খেলোয়াড়রা। সেই দিক থেকে বিচার করলে বাংলা দল ছিল দুর্ব্বল—তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী। কিন্তু খেলায় বাংলা দল আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ইতিপূর্ব্বে এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়নি—৫ম দিনের খেলার শেষ বলটিতে পর্য্যন্ত 'প্রবল উত্তেজনা ছিল। শেষ পর্য্যন্ত বাংলা দলের সর্ব্বশেষ বলটিও হোলকার দলের কাছে উপেক্ষার বস্তু না হয়ে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা দল খেলাটাকে এমনই এক অবস্থায় টেনে রেখেছিল যে, তাদের সর্ব্বশেষ বলটির ফাঁদে পড়ার অর্থ হোলকার দলের পক্ষে নিশ্চিত পরাজয়। খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় পাঁচটা। ৪-৩ মিনিটের সময় হোলকার দলের ৯ম উইকেট পড়ে গেল। আর হাতে মাত্র একটা উইকেট সম্বল, এদিকে সময়ও অনেক বাকি। হোলকার দলের পক্ষে সমস্যার সমাধান রান করা নয়—বাকি সময়টা একটা উইকেট জিইয়ে রাখা। শেষ উইকেটে গাইকোয়াড়ের জুটি হ'লেন ধানওয়াদ—দু জনেই বোলার এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা নট আউট থেকে দলকে বাঁচালেন। প্রকৃত পক্ষে ধানওয়াদই হোলকার দলের ত্রাণকর্ত্তা। ১ম ইনিংসের শেষ উইকেটে তিনি নিম্বলকারের জুটি হ'ন, দলের রান তখন ৪৫৫—বাংলা দলের ১ম ইনিংসের রানের সমান করতে ২৪ রান দরকার। এবং তাঁদের জুটিতেই হোলকার বাংলা দলের থেকে ১৭ রানে এগিয়ে যায় এবং ২য় ইনিংসের সর্ব্বশেষ উইকেটে গাইকোয়াড়ের সঙ্গে মিলে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উইকেটে থেকে যান।

এই খেলাতে হোলকার দলের নিম্বলকার সাবলীল ভঙ্গীতে নির্ভুল খেলে ২১৯ রান ক'রে ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দেন। মুস্তাক আলির ৯৯ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার পক্ষে সেঞ্চুরী ১৪১ রান করেন পি বি দত্ত। প্রথম ইনিংসে বাংলা দলের শেষ তিন উইকেটে ১২৮ রান ওঠে। শেষ উইকেটের জুটিতে সুধাংশু ব্যানার্জি এবং নীরোদ চৌধুরীর ৬৬ রান বিশেষ উপযোগ্য হয়েছিল। বাংলার পক্ষে তরুণ খেলোয়াড় সুনীল

ইংসে ২৩৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে দলের পক্ষে বেশী উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

হোলকার দলের ১ম ইনিংসের বিপুল ৪৯৬ রানের বিপক্ষে বাংলা দল প্রায় দুদিন ফিল্ডিং ক'রে খেলার ৪র্থ দিনের ২ ২৫ মিনিট সময়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এক ঘণ্টার খেলায় দলের ১০০ রান ওঠে। দলের ২০০ রান উঠতে ১১০ মিনিট সময় লাগে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাংলা ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান তুলে প্রায় ১৫৫ মিনিটের খেলায়। প্রায় দুদিন ফিল্ডিং করার পর এত দ্রুতগতিতে রান তোলা বাংলা দলের পক্ষে প্রশংসনীয়। খেলার শেষ দিনে তিন ওভার বলে ৩৩ রান ক'রে ৫ উইকেটে ৩২০ রানের মাথায় বাংলা ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে দেয়।

ভারতবর্ষ-ওয়েষ্টইণ্ডিজ ঃ

৪র্থ টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৬২ (মানকড় ৬৬, গাদকারী ৫০ নট আউট। ভ্যালেনটাইন ১২৭ রানে ৫ উইকেট) ও ১৯০ (৫ উইকেটে। পঙ্কজ রায় ৪৮। উমরীগড় ৪০ নট আউট। ভ্যালেনটাইন ৫৮ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্টইণ্ডিজ ঃ ৩৬৪ (ওয়ালকট ১২৫ ; উইকস ৮৬ ; ওরেল ৫৬। গুপ্তে ১২২ রানে ৪ এবং মানকড় ১৫৫ রানে ৩ উইকেট)

জর্জটাউনে অনুষ্ঠিত ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ বৃষ্টির দরুণ খেলার শেষ দিনে নির্দ্ধারিত সময়ের আগে পরিত্যক্ত হওয়ায় ফলাফল অমীমাংসিত ঘোষণা করা হয়েছে। খেলার ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে বৃষ্টির দরুণ লাঞ্চের আগে পর্য্যন্ত খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি ; লাঞ্চের পর মাত্র আধঘণ্টা খেলা হয়, রান ওঠে ২৩। পঞ্চম দিনের শেষে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ৫টা উইকেট পড়ে ১৬৭ রান ওঠে—ভারতবর্ষ মাত্র ৬৫ রানে এগিয়ে থাকে। খেলার সে অবস্থায় পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের পক্ষে এ রান মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বরুণদেবের কৃপায় ভারতবর্ষ পরাজয়ের সব রকম সম্ভবনা থেকে রক্ষা পায়। ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের ওয়ালকট ১২৫ রান করেন ; ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই তাঁর ৩য় টেষ্ট সেঞ্চুরী—অপর দুটি করেন ১৯৪৮-৪৯ সালের ভারত সফরে।

টসে জয়লাভ ক'রে ভারতবর্ষ প্রথম দিনে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে। খেলার প্রথমদিন রাত্রে প্রচুর বারিপাত হয়। দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টি পড়ে। ফলে ক্রিকেট খেলার মত মাঠের অবস্থা ছিল না। খেলা আরম্ভের দেরী দেখে এক শ্রেণীর দর্শক উত্তেজিত হয়ে মাঠের অবস্থা পরিদর্শনরত ভারতীয় দলের ম্যানেজারকে লক্ষ্য ক'রে একটা ইট নিক্ষেপ করেন এবং মাঠের ভেতর ঢুকে কোন কোন অংশ 'দধিকাদায়' পরিণত করেন। সমস্ত মাঠে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র একঘণ্টা খেলা সম্ভব হয়। এই এক ঘণ্টার খেলায় ভারতীয় দলের আরও তিনটে উইকেট পড়ে—রান ওঠে ৫৫। মোট রান দাঁড়ায় ২৩৭, উইকেট পড়ে ৯টা। ভারতীয় দলের ১ম ইনিংসে বরণদেব যেমন রান করার পক্ষে অন্তরায় ছিলেন ২য় ইনিংসে তেমনি ভারতবর্ষের অনুকূলে যান।

টেবল টেনিস টেষ্ট ম্যাচ ঃ

হংকং বনাম ভারতবর্ষের মধ্যে পাঁচটি টেষ্ট খেলায় হংকং ৪-১ টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ডেভিস কাপ খেলার প্রথা অনুযায়ী (অর্থাৎ চারটি সিঙ্গলস এবং একটি ডবলস, মোট পাঁচটি) এই খেলা হয়। হংকং দলে খেলেছিলেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান সি সু চু এবং হংকংয়ের ভূতপূর্ব্ব ১নম্বর খেলোয়াড় চুং চিন সিং।

খেলার ফলাফল ঃ

১ম টেষ্ট, বাঙ্গালোর—ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় হংকংকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন কল্যাণ জয়ন্ত এবং নাগরাজ। জয়ন্ত এবং নাগরাজ উভয়ই সিঙ্গলসে চুং চিন সিংকে পরাজিত করেন এবং ডবলস বিজয়ী হ'ন। অপরদিকে সি সু চু দু'টি সিঙ্গলসে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেন।

২য় টেষ্ট, মাদ্রাজ—হংকং ৩-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান কল্যাণ জয়ন্ত এবং থিরুভেঙ্গাডাম। হংকং ২টি সিঙ্গলস এবং ডবলসে জয়ী হয়, সুতরাং বাকি দুটি খেলার আর প্রয়োজন হয় না।

৩য় টেষ্ট, হায়দ্রাবাদ—হংকং ৩-১খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন [illegible] এবং থিরুভেঙ্গাডাম।

৪র্থ টেষ্ট,• বোম্বাই—হংকং ৩-১ খেলায় জয়ী হয়ে ব্বার' লাভ করে। কল্যাণ জয়ন্ত, উত্তম চন্দ্রাণা এবং দেবচাঁদ সোমায়া ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন।

৫ম টেষ্ট, ক'লকাতা—হংকং ৩-১ খেলায় জয়ী হয়। কল্যাণ জয়ন্ত এবং ভাণ্ডারী ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেন।

কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড বোটরেস ঃ

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্যালয়ের বাৎসরিক নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজদল আট লেংথে গত বৎসরের বিজয়ী অক্সফোর্ড দলকে পরাজিত করেছে। এই বৎসরের ফলাফল নিয়ে কেম্ব্রিজের পক্ষে জয় ৫৮ বার এবং অক্সফোর্ডের পক্ষে ৪৪বার। মাত্র একবার প্রতিযোগিতার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। পৃথিবীর ক্রীড়াজগতে এই দুই বিশ্ববিত্যালয়ের বাৎসরিক নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা আভিজাত্যের দিক থেকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—যার তুলনা ক্রীড়াজগতে বিরল। খেলাধূলায় 'পেশাদার এবং অপেশাদার' সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই এবং আজ পর্য্যন্ত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি বের হয়নি যা নিঃসংশয়ভাবে এই দুইয়ের প্রভেদ বিচার করে দেয়। এই দ্বন্দের মধ্যে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের বাৎসরিক নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা 'অপেশাদার' সংজ্ঞার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বিজেতা দলকে কোন রকম পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, এমন কি প্রশংসাপত্র পর্য্যন্ত নয়। প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী পর্য্যন্ত আদায় করা হয় না। এর থেকে খেলাধূলায় 'অপেশাদার' আর কি হ'তে পারে! প্রতিযোগিতায় কোন পুরস্কার অথবা প্রশংসাপত্র নেই—অথচ জয়লাভের জন্য এই দুই দলের মধ্যে কি প্রস্তুতি, কঠোর সাধনা এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

বিশ্ব টেবল টেনিস ঃ

বুখারেষ্ট-এ অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ইংলণ্ড

মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : রুমানিয়া

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

হাঙ্গেরীর সিডো পুরুষদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে জয়ী হয়ে এবং রুমেনিয়ার এঞ্জেলিকা মহিলাদের [illegible]স, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে জয়লাভ ক'রে 'ত্রিমুকুট' লাভ করেছেন।

এঞ্জেলিকা রোজেনিউ এই নিয়ে পর্য্যায়ক্রমে চার বছর [illegible] সিঙ্গলস জয়লাভ করলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি [illegible]ছেন ১৯৫০ সালে বুদাপেষ্টে, ১৯৫১ সালে [illegible] এবং ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে।

(কাইনাল জয়া)

পুরুষদের সিঙ্গলস : এফ সিডো (হাঙ্গেরী)

„ ডবলসে : সিডো এবং জোসেফ কুজিয়ান (হাঙ্গেরী)

মহিলাদের সিঙ্গলস : রোজেনিউ (রুমানিয়া)

„ ডবলস : রোজেনিউ এবং ফার্কাস (হাঙ্গেরী)

মিক্সড ডবলসে : সিডো এবং রোজেনিউ

৫ম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৩১২ (উমরীগড় ১১৭; রায় ৮৫; ভ্যালেনটাইন ৬৪ রানে ৫ উইকেট। ও ৪৪৪ (পি রায় ১৫০; মঞ্জরেকার ১১৮। গোমেজ ৭২ রানে ৪ এবং ভ্যালেনটাইন ১৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েষ্টইণ্ডিজ ঃ ৫৭৬ (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯, ওয়ালকট ১১৮; পিয়ারডো ৫৮। গুপ্তে ১৮০ রানে ৫; মানকড় ২২৮ রানে ৫ উইকেট। ও ৯২ (৪ উইকেট)

কিংস্টোনে অনুষ্ঠিত ৫ম টেষ্ট খেলা ড্র যাওয়ায় ওয়েষ্টইণ্ডিজ ১-০ টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে 'রাবার' সম্মান লাভ করেছে। ওয়েষ্টইণ্ডিজ আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে জয় লাভ করে ২য় টেষ্ট, ১৪৩ রানে। বাকি ৪টি টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৮-৪৯ সালের ভারত সফরে ওয়েষ্টইণ্ডিজ অনুরূপ অল্প ব্যবধানে 'রাবার' পেয়েছিল।

৫ম টেষ্টের ১ম ইনিংসে ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের তিনজন—ওরেল, উইকস এবং ওয়ালকট (সকলেরই নামের আত্ত অক্ষর ইংরাজিতে W) সেঞ্চুরী করেন—ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্টইণ্ডিজের টেষ্ট খেলায় এক ইনিংসে অধিক সংখ্যক হওয়ার সেঞ্চুরী রেকর্ড হয়েছে। ওরেল ২৩৭ রান ক'রে উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন; পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল উইকসের ২০৭, আলোচ্য টেষ্ট-সিরিজের ১ম টেষ্টে। উইকস এবং ওরেল ব্যতীত দুই দলের অপর কোন খেলোয়াড় ভারত-ওয়েষ্টইণ্ডিজের টেষ্ট খেলায় ডবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংসে ৫৭৬ রান ওঠে—ওয়েষ্টইণ্ডিজের মাটিতে অনুষ্ঠিত যে কোন টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসে এই রান সংখ্যাই সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে।

ভারতবর্ষ খেলার চতুর্থ দিনে চা-পানের পর ২৬৪ রান পিছিয়ে থেকে ২য় ইনিংস আরম্ভ করে। এবং কোন উইকেট না পড়ে নির্দ্ধারিত সময়ে তাদের ৬৩ রান ওঠে। ৫ম দিন লাঞ্চের সময় ১ উইকেট গিয়ে ১৪১ রান দাঁড়ায়। নির্দ্ধারিত সময়ে ৩ উইকেট পড়ে ৩২৭ রান। ভারতবর্ষ মাত্র ৬৩ রানে এগিয়ে যায়। পঙ্কজ রায় ১ম ইনিংসে ১৫ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি; ২য় ইনিংসে হতাশ হননি, ১৫০ রান করেন। পি রায়

...ন্বারের ২য় উইকেটের জুটিতে ২৩৭ রান উঠে রেকর্ড ...। মঞ্জরেকার ১১৮ রান করেন।

খেলার শেষ দিন লাঞ্চের সময় ৭ উইকেটে ভারতবর্ষের ৩৭৭ রান হয়। লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর ৪৪৪ রানে ভারতবর্ষের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ১৮০ রানে এগিয়ে থাকে। খেলার সময় তখন ১৪০ মিনিট বাকি। ওয়েষ্টইণ্ডিজ দল জয়লাভের উদ্দেশ্যে দ্রুত রান করার চেষ্টা করে না। নির্দ্ধারিত সময়ে তাদের ৯২ রান ওঠে, উইকেট পড়ে ৪টে। খেলা ড্র যায়।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের ব্যাটিং গড়পড়তায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১ম স্থান লাভ করেছেন পলি উমরীগড়—রান ৫৬০ (এভারেজ ৬২'২২.), ২য় আপ্তে—রান ৪৬০ (এভারেজ ৫১'১১) এবং ৩য় পঙ্কজ রায়—রান ৪৬০ (এভারেজ ৩৮'৩৩)। ইণ্ডিজের পক্ষে ১ম উইকস—রান ৭১৬ (এভারেজ ১০২'২৮), ২য় ওয়ালকট—রান ৪৫৭ (এভারেজ ৬৫'২৮) এবং ৩য় ষ্টলমেয়ার—রান ৩৫৪ (৫৯'০০)।

বোলিংয়ে ভারতীয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন সুভাষ গুপ্তে—উইকেট ২৭টা (এভারেজ ২৯'২২ ১ম স্থান)। ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের পক্ষে ভ্যালেনটাইন ২৮টা (এভারেজ ২৯'৫৩)।

ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ষ্টলমেয়ার ভারতীয় দলের ফিল্ডিং সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। লেগ-স্পিন বোলার সুভাষ গুপ্তে সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

এই টেষ্ট সিরিজ নিয়ে ভারতবর্ষ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে ১০টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। এই ১০টি টেষ্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রেকর্ড নিয়ে দেওয়া হ'ল।

	ভারতবর্ষ	ওয়েষ্টইণ্ডিজ
সর্ব্বোচ্চ ইনিংস:	৪৫৪ দিল্লী, ১৯৪৮-৪৯	৬৩১ দিল্লী, ১৯৪৮-৪৯
সর্ব্ব নিম্ন ইনিংস:	১২৯, ১৯৫৩	২২৮, ১৯৫৩
এক সিরিজে সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত রান:	৫৬০ রোসী মোদী (১৯৪৮-৪৯) পলি উমরীগড় (১৯৫৩)	৭৭৯ উইকস, ১৯৪৮-৪৯
এক সিরিজে সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত উইকেট:	২৭-সুভাষ গুপ্তে (১৯৫৩)	২৮-ভ্যালেনটাইন, ১৯৫৩
মোট সেঞ্চুরী সংখ্যা:	১০	১৯
এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান:	১৬৩ এম এল আপ্তে (১৯৫৩)	২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (১৯৫৩)

* নট আউট।

সাহিত্য-সংবাদ

শচীন সেনগুপ্ত কৃত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "পথের দাবী"—২৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত প্রবন্ধ-সমষ্টি "কোন্ পথে ?"—২॥৹

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ব্যোমকেশের ডায়েরী" (৪র্থ সং)—২॥৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নিষ্কৃতি" (২০শ সং)—১॥৹, "পল্লী-সমাজ" (২৭শ সং)—২॥৹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (২য় পর্ব—৩য় সং)—২৲

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"—১।৹

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "জীবনটাই নাটক"—২৲

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "দুর্জয় মোহন"—২৲, "মৃত দস্যুর কবলে মোহন"—২৲, "স্বপন-মিনার পর্ব"—২৲, "প্রগতি"—৩৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "প্রথম প্রণয়"—২৲

বীরেন দাশ প্রণীত "মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি"—২৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "তিলোত্তমা"—১৲

ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত "তপকুমার"—৸৹

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "করে দেখ"—১।৹

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "চূড়ালা ও শিখিধ্বজ"—১॥৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিরহী যক্ষ

শ্রীকৈলাস ও তুষার তীর্থযাত্রী

শ্রীমান্ কমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবর পরিক্রমাকালে গৃহীত।

বৈশাখের প্রচ্ছদপটের শ্রীকৈলাসের অপর চিত্রখানিও শ্রীমান্ কমলকুমারের গৃহীত

দ্বিতীয় খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃতির ইঙ্গিত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর ভবিষ্যৎ কি, আজকের এই তপ্ত ক্লান্ত ভগ্ন সমাজ-জীবনের বিধ্বস্ত দিনে তার গতি কোনদিকে, এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সীমা নেই, হা-হুতাশের শেষ নেই। চতুর্দ্দিকে দেখি রোদনভরা বেদনা, কান্নার রোল—গেল গেল, সব গেল—দেশ ভাঙলো, সমাজ ভাঙলো—মিলন নেই, উৎসব নেই, আনন্দ নেই, দেবতার দেউল শূন্য, ঋত্বিক্ অনাগত—দীপ জ্বলে না, অন্ধকার কাটে না, তমসা দূর হয় না। দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রতিটি উপলখণ্ডে মিশে থাকে নিঃসহায়ের বেদনা, মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় স্তব্ধ হয়ে থাকে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস, দিকে দিকে শুধু অভিসম্পাত, অক্ষম আস্ফালন, মনুষ্যত্বহীন পরাজিত মনোভাবের বিকার, বিদ্বেষ কলুষ ক্লেদ গ্লানি ক্ষুদ্রতা পরশ্রীকাতরতা। আর সবার উপরে সত্য আছে 'অচিন্ত্য চমৎকারা'। সুস্থ সমাজ নয়, আনন্দিত চেতনা নয়, বিকৃত, জন্তুর উপবাসী দেহ ও মন। শ্রীমতা' গেছে [illegible] জন্ম নয় জানি, উদয়াস্ত আমাদের কাটে অন্নের চেষ্টায়, ছেলেরা ছোটে, মেয়েরা জোটে। থাকে সমাজ অভাব, গতানুগতিক অভিযোগ। সংসার সমুদ্রমন্থনে যে হলাহল ওঠে তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি কোন নীলকণ্ঠের— প্রশ্নও মনে আসে না। কবির কথায়:

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারিদিকে
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুষ্‌গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই
আজকে দিনের চিন্তাকের তুল্য নেই
যেন এ দুখ অন্তহীন
ঘর ছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থাহীন

কিন্তু শুধু কান্নায় মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পাবে না—আ[illegible] জানতে হবে কোন আলোকের অগ্রবাহিকায় এই নীর[illegible]

অন্ধকারের খারা গিয়ে মিশবে, কোন নব নচিকেতার নব-অভ্যুদয়ে রাত্রির তপস্যা দিনের সন্ধান দিবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করবো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা—"নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই যে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্ব্বাদে পরিণত করে তুলবে এই চাই।······আজ চারিদিক থেকে দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাইবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই, বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে···সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপর মাথা তুলবে···বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত। বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধিগর্ব্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্রসন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য, ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্ম্মা-বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা মাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বত-উদ্যত ইচ্ছার···"। সেদিন কবির আবেদন ছিল প্রাদেশিকতার অভিমানে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মেলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্ত-শক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে সেইজন্য।" যদিও তিনি এই কথা বলেছিলেন পনের বৎসর পূর্ব্বে, তবু সত্যাশ্রয়ী কবি-ঋষির দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল অনাগত সত্যের রূপ—"ঋষির নয়ন মিথ্যা না হেরে"। কিন্তু আমরা ত বলি না যে "ম্যয় মহাপুরুষকা দাসা হু"। সে যাই হোক, সমস্যাসঙ্কুল এই দেশে রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক কি সমাধান হবে সে আমার বক্তব্য নয়, কিন্তু ইতিহাসের রক্ত-সম্ভব ইঙ্গিত কোন মনন-সূত্রকে অবলম্বন করে চলবে ও চলা উচিত ভারত-পথ-পথিক রবীন্দ্রনাথ তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। জানি আপাতদৃষ্টিতে চাল ডাল তেল নুন লকড়ির সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু চিরকালের ইতিহাস-লক্ষ্মী শুধু স্বর্ণ-পেচককে বাহন করে গড়ে ওঠেনি, সেখানে মহা-সরস্বতীর প্রসাদও পড়েছে। এখানে এসেছে প্রটোঅষ্ট্রলয়েড, দ্রাবিড়, আর্য্য, পোষ্ট-মোঙ্গল, হুন, শক, তুর্কী, আরব, পাঠান, মোগল, পোর্টুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ! সবাই এনেছে নিজেদের দান—সকলের মিলিত উপচারে গড়ে উঠেছে বৃহৎবঙ্গ, মহাভারত। কেউ দিলে গ্রামীন্ সংস্কৃতি, কেউ আনলে অপূর্ব্ব অনুপম কল্পনা, কেউ আনলে নাগরিক সভ্যতা, কেউ দিলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ইতিহাসের একপ্রান্তে একদিন শুনেছি এটা হচ্ছে পাখীর দেশ, দস্যু তস্করের দেশ—'তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি'। আবার আর একদিন শুনেছি "What Bengal thinks today India thinks tomorrow." ভেড্ডিড ইণ্ডিড্ মেলানিড্ বাঙালীর রক্তে ভাবে মননে আছে নানা ধারার স্রোতধ্বনি, সে গড়ে তুলেছে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি—সবার পরশে তীর্থ-করা। সে হয়েছে ভারত-পথ-পথিক—নানা ভুল ভ্রান্তি সে করেছে, অহমিকায় সে চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পাদপীঠে যুগে যুগে বাঙালী নিয়ে এসেছে ভারত-পথ-পথিকত্ব। এই বৈশিষ্ট্য আজকের দিনেও যেন না আমরা ভুল বুঝি। স্থির অবিচলিতচিত্তে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও অখণ্ড ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই প্রশ্নটিই জাগবে—বাংলা দেশ শুধু কি একটা ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ, না তার একটা আদর্শের, ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির রূপ রেখা আছে। ইতিহাসের গভীরে তার সত্যকার সত্তাটিকে রসবিশ্লিষ্ট করে বেত্তার দৃষ্টি দিয়ে যিনি বাংলার সত্যকার ইতিহাস পড়েছেন—তিনিই জানেন বাঙালীর জয়যাত্রা সেইদিনই হয়েছে যেদিন সে স্বপ্ন দেখেছে বিস্তৃতির, যেদিন সে কৌপীনবস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, ভল্লশূলশল্য নিয়ে নয়, গৈরিক কাষায় পরে, আদর্শ নিয়ে, আইডিয়া নিয়ে, বই নিয়ে, সেবার মন্ত্র নিয়ে, দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞান করে। বাঙালীর ইতিহাসে এই বিচিত্র রূপটি ধরা পড়ে তিনটি যুগে যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—পাল সেন যুগে, বৈষ্ণব মধ্যযুগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথম যুগের প্রথম পাদে গুপ্ত যুগের অবসানে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর গোপালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে "শাশ্বতী প্রাপ শান্তিঃ"। বাঙালী শ্রমণ, বাঙালী নাবিক, বাঙালী রসিক ছড়িয়ে পড়েছিলো দ্বীপময় ভারত বালি জাভা কাম্বোডিয়া চম্পা শ্যামসুবর্ণ ভূমি হইতে তুষারশীর্ষ নেপাল তিব্বত চীন পামির খোটান পর্য্যন্ত। প্রথম যুগের দ্বিতীয় পাদে অর্থাৎ সেনযুগে কিছুটা Hindu revival

কর্ণামৃতের অমর প্রবাহে "গঙ্গা বঙ্গাল বাণী চ" বাংলার ভাষা গঙ্গার জলের মতই গভীর ছিল। শুধু জয়দেব শরণ ধোয়ী নয়, দত্ত নাগ মিত্র রক্ষিত প্রভৃতি বহু বাঙালী কবির পরিচয় পাই। নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে বাংলার শ্যামল সমৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির চিত্র দেখি, প্রাকৃত পৈঙ্গলে তার ভোজন বিলাসের প্রশংসা করি। কিন্তু সেদিনও সে বেরিয়েছে, চলেছে, সে অর্জন করেছে, বর্জন করে নি। তারা পারমিতাকে নিয়ে সে যোগিনীচক্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বারবোদুরে আঙ্করে ভাষায় ভাষায় গাঁট বেঁধেছে। জাভার শৈলেন্দ্র নরপতিরা, প্রাম্বানানের মন্দিরনির্মাতারা, পাগানের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ উৎসর্গপত্রের রচয়িতারা, জাপানে হবিউজীমাঙ্গরের পুস্তকের বর্ণমালা সবই নদীমেখলা সাগর-চুম্বিতা বাংলাদেশের দিকে চেয়ে। আবার সে সত্যেরে নিয়েছিল সহজ করে—

আজি ভুসুক বাঙালী ভৈলি
নি এ ঘরণী চণ্ডালী লেলি

ভুসুক্ আজ তুই বাঙালী হৈলি, তুই চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করিলি। এদেরই পরবর্তীরা বল্লে

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই
চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরসেদে

ওদিকে পরিহাস-কেশবের মন্দিরে কাশ্মীরের উপত্যকায় মুষ্টিমেয় বাঙালী-সৈন্য ইতিহাস রচনা করলে। আবার বহুপূর্ব্বে বাঙালী নাগার্জ্জুনই মাধ্যমিক ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করলেন, কেউ কেউ বলেন তিনি রসায়নশাস্ত্রেরও উদ্গাতাও—বটযক্ষিণীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—"দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্ব মে"। এ রস কি শুধু পারদের রস? ওদিকে শাসনকার্য্য পরিচালনা করছেন গর্গ, দর্ভপাণি, হলায়ুধমিশ্র, বোধিদেব, গুরুবমিশ্র কেদারমিশ্র। আবার দীপঙ্কর অতীশ, ধীমান্ বীতপাল, তারানাথ, চন্দ্র-গোমী বসুবন্ধু সন্ধ্যাকর নন্দী, কত নাম ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভেসে ওঠে। কিন্তু এই যুগের দুইটি ধারাই সমীকরণের যুগ, পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকার মত খণ্ডিত চিহ্ন নয়, নতুন করে পেতে হবে, নতুন করে দিতে হবে। নূতন করে গড়ে উঠলো এক সহজ নাথধর্ম—ঐতিহ্যের সমন্বয়-সন্ধানী এক অপূর্ব্ব জিনিষ, আজও মাঠে রাস্তায় ঘাটে, বাউল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখে যাদের কিছু কিছু ভগ্নাংশও প্রাচীন তত্ত্ব ও তথ্যকে সহজ করে জনমনে বাঁচিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয় যুগেও সেই কথা। শৈবশাক্ত যুগ পেরিয়ে, বল্লালসেনী কৌলীনী মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে—মঙ্গলকাব্যের রস পান করে—দনুজমর্দ্দনদেবকে নমস্কার করে যখন বাংলার মর্ম্ম স্থানে পৌছানো গেলো তখনো সেই-এক পন্থা।—বাঙালী বেরিয়েছে, ভারত-পথ-পথিক হয়েছে—জয় করেছে প্রেম দিয়ে, নাম দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে, শরণ দিয়ে। সে চলেছে দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে। রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখী মহান্তীর শিষ্যত্বেই তার অভিযান অবসান হয়নি। সেদিন বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করে গুজ্জরে, মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিণাত্যে, আসামে, উৎকলে, মিথিলায় প্রভুর বেশে নয়—সেবকের রূপে প্রবেশ করেছিল। এও এক সমীকরণের যুগ—বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, ইসলামের চণ্ড বেগ, প্রচণ্ড আঘাতে কাঁপছে দেশ ও দশ। সেদিন ভারতবর্ষের দিকে দিকে এই বৈষ্ণব ও সাধু সন্তরাই ভারতলক্ষ্মীর মণিকটকে সযত্নে নূতন করে ঘষে মেজে তুলে ধরেছিলেন। এই মহাভারতের সাধনায় বাঙালীর দান নগণ্য নয়। শুধু শান্তিপুর আর নদেই ডুবে যায় নি।

আবার তৃতীয় যুগেও অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালীর এই ভাব-সাধনা চলেছে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঠাকুমার কোলে বসে শোনা রামায়ণের এক টুকরো ছড়া—আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজায়ে—অবোধ শিশুর মনে কত না কল্পনা জাগাতো—কে ঐ ভগীরথ, কতো বড় সে, কোথা থেকে এলো এই রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যা—চোখের সামনে এগিয়ে এলো ভগীরথের দল—শাখায় প্রশাখায় দুকূল-প্লাবিয়ে আজ লুকুলো কোথায়। বাঙালীর সাধনায় এই একশো বছরের ইতিহাস রসঘন রসায়নের ইতিহাস। এতো শুধু অনুকূল হাওয়া পূরবৈয়া বয়েই আসেনি, পশ্চিম থেকেও এসেছিল এক আগুনভরা আঁধি, ঝোড়ো হাওয়ায় দৃপ্ত পদ-ক্ষেপে। এই একশো বছর পেয়েছে হাজার বছরের বিস্তৃতি, ত্রিকালের ছাপ তার দীর্ঘ বোপে, অতীত বর্তমান অনাগত

নিয়ে যে ত্রিকাল—স্মৃতি চিন্তা আশা যার প্রতীক্। বেরিয়ে এসেছিলো এই একশো বছরের মন্থনে রামমোহন,বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল, জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, অবনীন্দ্র, নন্দলাল। এলেন বঙ্কিম রবীন্দ্র শরৎ, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ।

সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব ভারত-পথ-পথিকত্বের রূপদান। শত দুঃখের মধ্যেও শত বেদনার তিক্ততার গৃধ্নু তার মধ্যেও এই কথাটা যেন না ভুলি—যদিও অনেকের কাছে বাংলার বা বাঙালীর কথা বলা মানেই প্রাদেশিকতা। কিন্তু রামমোহনের কর্ম্মধারায়, রামকৃষ্ণের আহ্বানে, বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে যে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত সে ভারতবর্ষ এই বাংলারই দান। তার মন্ত্র হচ্ছে বন্দেমাতরম্। ভারত ভাগ্যবিধাতাকে মহা-ভারতের তীরে যে প্রতিষ্ঠা করেছে, জন গণ মন অধিনায়ক পথি-পরিচায়ক কে। এই ত তাঁদের ঋষিত্ব। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশই ভারতবর্ষকে নূতন ইঙ্গিত দিয়েছে, তার শিল্পী, তার কবি, তার কর্ম্মী, তার দেশনায়ক তার সাহিত্যিক ভারতবর্ষের যজ্ঞসম্ভব মূর্ত্তি গড়েছে, পূর্ণাহুতির সমিধ জুগিয়েছে। বাইরের দিকে চাইলে দেখা যায় তার দৃষ্টি ফেরানো পশ্চিমের দিকে, প্রতীচীর জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের দিকে,কিন্তু পশ্চিমের রসবস্তুকে আহরণ করে পূর্ব্বের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দীপ্তি জেগে উঠেছে—আমরা শুনেছি নূতন করে অনুশীলনের ছন্দ, নূতন করে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা, নূতন গীতাঞ্জলি, নূতন ভাগবত-জীবনের কার্য্য, নূতন সেবার মন্ত্র। আবার দেখেছি বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আঢ্য বলিষ্ঠতা, ঋজুতা—যা আমরা ভুলে যাচ্ছি ভাবের কোলাহলের গদগদ মোহে, ভাষার চাক-চক্যে চিন্তার আবিলতায়। ভুলে যাচ্ছি সত্যকার দেশ গড়ে ওঠে মাটি দিয়ে নয়, মানুষ দিয়ে, মৃন্ময় মানুষ যখন হয় চিন্ময়।

এই যে স্বপ্ন, এই যে নিষ্ঠা, এই যে তপস্যা. এও সমী-করণের প্রকাশ—আজ নতুন করে বাঙালী বাপ মা এই অপূর্ব্ব উত্তরাধিকারের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি একটি ছেলেকেও মানুষ করে তুলতে পারে—তবেই তার সার্থকতা। আজ যদি একটি বাঙালী ছেলেও বড় বৈজ্ঞানিক হয়, চিন্তাশীল হয়,তবে তার কাছে পাঠ নিতে আসবে সারা বিশ্বের লোক, এখানে বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, বিতণ্ডা নেই। এই হচ্ছে বাংলার সব চেয়ে বড় সম্পদ—তার সাধনার শেষ কথা—আমি যেন দিতে পারি—আমার জ্ঞান, বিজ্ঞান, আমার তপ তপস্যা, আমার প্রেম ভালবাসা। জানি তার্কিক তর্ক তুলবেন—ওহে আকাশ থেকে নেমে এসে শক্ত মাটিতে পা দাও ত বাপু—অন্ন বস্ত্রের ছোট্ট সন্ধানটী দাও ত, তার-পর ঐতিহ্য নিষ্ঠা তপস্যা সংস্কৃতির কথা বোলো। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত একথাটার দাবী আছে, মূল্য আছে কিন্তু তারও পেছনে যে আছে ততঃ কিম—মানুষের মনের বুভুক্ষা, একটি অমৃতভাণ্ডের জন্য আকুলতা—সে জানবে সে শিখবে, সে বলবে বেদাহমেতং। সেই চিরকালের মানুষকে বাঙালী চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেছে এবং এই শ্রদ্ধাই তার লাঞ্ছিত মূর্চ্ছিত জীবনের শেষ সম্বল, তার উত্তরাধিকার, সেখানে সে যেন পরাজিত না হয়, সে যেন বলতে পারে—দূরকে নিকট করতে হবে, পরকে আপন করতে হবে, এই ত মধুরের সাধনা, এই ত বিধুরের সাধনা সে যেন বলতে পারে

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যংময়ি ধেহি
বলমসি বলংময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজোময়ি ধেহি
মন্যুরসি মন্যুংময়ি ধেহি। সহোঽসি সহোময়ি ধেহি

তুমি তেজ আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য আমায় বীর্যবান কর; তুমি বল, আমায় বলবান কর; তুমি ওজঃ আমায় ওজস্বী কর, তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্যায়দ্রোহী কর তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর।

কন্যা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ট্রেনে নয়—নৌকায় নয়, মোটরবাস কিংবা গরুর গাড়ি—কোন যানই মনে পড়ছে না—অথচ দুলারী কেমন করে যেন নতুন দেশে পৌঁছল! পৌঁছতে ক'দিন লাগল—কিংবা ক'ঘণ্টা—দীর্ঘ পথের হিসাব রাখেনি সে। যখন পৌঁছল—দিন কিংবা রাত্রি—প্রত্যূষ কিংবা প্রদোষ সে বোধই কি ছিল? বেশ নরম আলোয় মনোরম একটি ফুল বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক বাড়ি দেখা গেল। লোহার ফটকটা তার তেমনি বড়—তেমনি বাহারী। ফটকের মাথায় একটি লণ্ঠন ঝুলছে—ফটকের গায়ে নাম লেখা রয়েছে—লোহার হরপে। দুলারী পড়তে পারে না—হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হরপের চেহারা অনুভব করতে লাগল। ফটকটা বন্ধ ছিল না—ভেজানো ছিল, ওর হাতের ঠেলা লেগে খুলে গেল। সামনেই শানবাঁধানো চওড়া পথ। ঘাস নেই—ধুলো নেই। খানিকটা চলে বসে—দু'পাশে পড়ল ফুলের গাছ। চেনা অচেনা কত ফুল—গন্ধও চেনা অচেনা। একটা বড় গাছে অজস্র সাদা ফুল ফুটেছে—তার তলায় একটা পাথরের বেদী। বেদীর ওপর বিছিয়ে রয়েছে ফুল। যেন ফুলের শয্যা বিছিয়ে প্রতীক্ষা করছে কোন জন। সে লোক অন্তরালেই আছে—সুযোগ বুঝে সামনে এসে দাঁড়াবে।

দুলারী বেদীতে বসল। আঃ—কি নরম বিছানা, কি প্রাণ আকুল-করা গন্ধ। কেমন শিথিল আলস্যে চোখের দু'টি পাতা জড়িয়ে আসছে—সারা দেহে নামছে ঘুমের ঢুল।

দুলারী কিন্তু ঘুমুলে না। বাড়ীর অন্দরমহলে কি ঘটছে—দেখবার কৌতূহলে উঠে দাঁড়াল।

বাড়িটা খালি নয়—অনেক লোক চলাফেরা করছে, কিন্তু কল কল শব্দ উঠছে না। সদর দরজার পর দলিজ—সেটা পেরিয়ে বাঁধানো উঠোন। তার দুধারে বারান্দার মাঝখানে ঠাকুর দালান। পাঁচ ফুকরের দালান, খাঁজকাটা ইঁটের তৈরী থাম, খিলানের মাথায় ইঁটেরই লতাপাতা—যেন ক'টা ঝাঁকড়া গাছের গুঁড়িতে পরিপাটি করে বেঁধে দিয়েছে—একখানি সবুজ সামিয়ানা। দালানের মধ্যে কাপড়-মোড়া ঝাড় লণ্ঠন টাঙানো রয়েছে—পূজোর দিনে এগুলিতে বুঝি মোমবাতি জ্বলে। সেই মিটি মিটি আলোয় এতবড় দালানটায় আলো হয় তো?

দালানের পাশেই অন্দরমহলে যাবার ফালি পথ। ছোট একটি দরজা—সেটি লোহারই হবে—তারই ওপিঠে মেয়েদের রাজ্য। এখানেও সারি সারি ঘর—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব তিন দিকেই মুখ, মাঝখানে চওড়া উঠোন। উঠোনের একধারে একটা টিউবওয়েল—তার পাশেই কলঘর। কলঘরে জল পড়ছে ছড় ছড় শব্দে—ঝি-বউয়েরা কাপড় কাচছে—গা ধুচ্ছে। কেমন সাবানের গন্ধ—ওই নাম-না-জানা ফুলের মতই ঘন আর মিষ্ট। নাকের মধ্যে যেতেই চোখে ঘুম আসে—প্রাণ আনচান করে। কে যেন হারিয়েছে—কে যেন নাই এমনি ভাব।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল কলঘর থেকে। চমৎকার চন্দনের গন্ধ বেরুচ্ছে ওর গা দিয়ে। মাথার চুল ওর আশ্চর্য্য রকমের নরম চকচকে, যেন একগোছা মসৃণ রেশম হাল্কা বাতাসে পিঠের উপর সন্তর্পণে এলিয়ে রয়েছে। দু'টি টানা চোখে খুসীর আমেজ—তুলি দিয়ে আঁকা একজোড়া কালো ভ্রূ—তার মাঝখানে উজ্জ্বল সিন্দুর টিপ একটি। সকালবেলাকার শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের মতই ওর মুখখানির লাবণ্য। পরণে খড়কে ডুরে শাড়ী—হাতে চার গাছি করে বরফি প্যাটার্ণ চুড়ি আর কঙ্কণ—গলায় চিক্ চিক্ করছে সোনার হার—ফুটন্ত ফুলের মত একটি লকেট ঝুলছে তাতে, কানে কান-পাশা। মেয়েটি ওর সামনে এসে দাঁড়াল—কিন্তু সামনের মানুষকে দেখেও দেখলে না যেন।

ওপাশের ঘর থেকে এক বর্ষিয়সী ডাকলেন—শ্বেতা, তোর হ'লো?

যাই-মা। মেয়েটি চলে গেল। চলে গেল না তো—একঝাড় ফুল ফুটিয়ে জায়গাটিকে গন্ধে ভরিয়ে দিয়ে গেল।

বউ, গিন্নী, মেয়ে—সবাই ব্যস্ত। কেউ কুটনো কুটছে—কেউ রান্নার তদারক করছে। একটা মস্ত বড় লাল টকটকে রুইমাছ উঠোনের একধারে পড়ে আছে। চক্‌চকে একখানি বঁটি হাতে করে একটি বয়সী মেয়ে বেরিয়ে এল ভাঁড়ার ঘর থেকে। বাঁ কাঁকে তার আনাজের পেতে। কি সব আনাজ। কালো পালিশ করা বেগুন, সবুজ কড়াই শুটি, দুধের মত সাদা ফুল কপি, লাল রঙের মুলো আর সিম বরবটি। এতক্ষণে ডালে সম্বরা দেওয়া হ'ল। ভাজা ডালের সুবাস উঠানে উথলে উঠল। ঘিয়ের গন্ধ—মশলার গন্ধ—মিষ্টি মিষ্টি তরকারির গন্ধ···

দুলারী আকণ্ঠ শ্বাস টেনে—উঠানের এধারে সরে এল।

মেয়েটি ততক্ষণে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খড়কে ডুরে ছেড়ে একখানি কচি কলাপাতা রংএর সিল্কের শাড়ী পরেছে। জরির জেল্লায় চওড়া আঁচলা ঝক্ ঝক্ করছে। আর মেয়েটির মায়ের রং—সেও জলছে, শাড়ীতে গহনায় আর গায়ের রঙে—এমন মানান হয়েছে···অপলকে সেই সৌন্দর্য্য চেয়ে দেখতে লাগল দুলারী।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে দুলারীও দোতলার ঠাকুর ঘরে এলো। রূপোর সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। মূর্ত্তি ছোট—কিন্তু ঠাকুরের গহনা আর সিংহাসনের সাজসজ্জা হাঁ করে চেয়ে দেখবার মত। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় শিখিচূড়া ও হাতে মকরমুখো বাঁশী; দুই সোনা-বাধানো। আর সোনায় মুক্তায় নানান মণিতে মেশানো সব গহনা—কুণ্ডল, কেয়ূর, হার, কটিবন্ধ নূপুর, বেশর, গুঞ্জরীপঞ্চম, বাউটি, নিমফল, কঙ্কণ। ঘেঁষাঘেঁষি দুই মূর্ত্তির পিছনে সোনা মুক্তার কাজ করা নীল মখমলের পিঠবস্ত্র। অনেকগুলি ধূপ পুড়ে গেছে—তারই গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

মেয়েটি প্রণাম করলে মাথা লুটিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। কি প্রার্থনা করলে—শুনতে পেলো না দুলারী, কিন্তু প্রার্থনার ভাবাটি ওর জানা।

হে ঠাকুর—পূর্ণ কর মনোবাঞ্ছা। ধন নয়—খ্যাতি নয়, কুমারী মেয়ের মনোবাঞ্ছা।

নেমে এল এক তলায়। যেখানে দালানে অনেক মেয়ে জড়ো হ'য়েছে। সধবা-বিধবা-কুমারী, বৃদ্ধা-বালিকা-যুবতী-প্রৌঢ়া।—বড়দের প্রণাম করলে মেয়েটি। প্রত্যেকে চিবুক ধরে চুমো খেয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। 'আশীর্ব্বাদ পেয়ে মেয়েটির আনন্দ যেন ধরে না। ওর—চলনে উথলে উঠল আনন্দ—ওর মুখে চোখে সৌভাগ্যের রোদ পড়েছে—সকালের সূর্য্য পূবদিকের আকাশেরে যেন স্নিগ্ধ করে তুললে।

অন্দরের দুয়োর দিয়ে সদরে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। 'দুলারী ততক্ষণে ওর পায়ের তলায় ছায়াটি হয়ে গেছে।

বড় বৈঠকখানা ঘরে চারখানা তক্তাপোষের উপর ফরাস পাতা। সাদা ধব ধবে চাদরের উপর গোটা কতক তাকিয়া গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেওয়াল জুড়ে সব ছবি। মানুষের ছবি—তেল-রংএ চক্‌চক্ করছে। একটা ক্লক ঘড়ি বাজছে টক্ টক্ করে। অনেকগুলি সুবেশ মানুষ বসে আছে কিসের প্রতীক্ষায়। সামনে একটা বড় ট্রেতে এক রাশ পান, ক' প্যাকেট সিগারেট, দেশলাই, রূপোর কৌটায় সুগন্ধি জরদা। একটা ছেলে পিচকারী নিয়ে ঘুরছে—মাঝে মাঝে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে সকলের গায়ে। ভুর ভুর করে খোসব বেরুচ্ছে তাজা গোলাপ ফুলের।

ফরাসের এক ধারে একখানি কার্পেটের আসন পাতা—তারই উপর বসল মেয়েটি। বসেই নীচু হয়ে প্রণাম জানালে সবাইকে।

সকলেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। মুগ্ধ প্রশংসা-ভরা চাহনি। এমন সজ্জা—এমন রূপ—এমন কোমল ভঙ্গি! সবাই ধন্য ধন্য করলেন—বাক্যে নয়—চোখের দৃষ্টিতে।

'দুলারী সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল মেয়েটির মধ্যে।

ওর মনে হল—এই যে নীরব বন্দনা, রূপ-প্রশস্তি, লুব্ধ প্রশংসা—এই পাওনা একা ওই কুমারী মেয়েটিরই নয়। একা ওরই দেহ এই অমৃতধারায় স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল না, একা ওর প্রাণেই রোমাঞ্চ জাগল না। ওর অংশ জানিনা জগতের প্রতিটি মেয়ে—দুলারীও।

বাড়ীর মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল আনন্দের ঢেউ। মেয়ে পছন্দ হ'য়েছে। মেয়েটি বিজয়িনীর মত এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে—এর কাছ থেকে ওর কাছে। এত বড় বাড়ীটিতে ওই যেন একমাত্র প্রাণী—পূব আকাশের অনন্ত সূর্য্য—দিগ্‌দিগন্তরালে আলোক স্নান করিয়ে দেবার দায়িত্ব যার হাতে।

থরে থরে চলেছে ভোজ্য বস্তু—সুদৃশ্য আধারে।···লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ভোজ্যবাহীর দল। আজ ভাঁড়ার লুটিয়ে দিয়ে ওরা ধন্য হতে চায়।

দুলারী এত ভোজ্য চোখে দেখে নি কোনদিন। এমন বর্ণ—এমন আকার—এমন গন্ধ ওর কল্পনাতেও ছিল না কোনকালে। আশ্চর্য্য, ওই সব চমৎকার খাবার কেউ প্রাণ ভরে খেলে না, প্রায় ভর্ত্তি প্লেট সব ফেরত আসতে লাগল? ওরা প্লেট নামিয়ে রাখলে উঠোনের এক পাশে—কাকে বেড়ালে নষ্ট করে—করুক সে! বস্তুর প্রয়োজন শেষ হলে এমনি অনাদরই হয়! দুলারীর প্রাণটা কর কর করে উঠল। তাদের দেশের মত এখানেও অপচয়—অনাদর। যাদের ভোজের জন্য আয়োজন হল এই দীর্ঘ সময় ধরে—তারা দৃষ্টি মাত্র সার্থক করে দিয়ে গেল দ্রব্য! বাস, ফুরিয়ে গেল তার প্রয়োজন। পাশে পিছনে কারা রইল বঞ্চিত হয়ে, তা যেন গণনার মধ্যেই নয়!

মেয়েটি শুয়ে পড়েছে বিছানায়। সামনের দুটো বড় জানালাই দিয়েছে খুলে। ঘরের আলো প্রত্যূষের মতই অস্বচ্ছ—সামনের আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীল—আর তাতে ফুটে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। হীরের মত জ্বল্ জ্বলে নক্ষত্র। আকাশের গহনা। দোকানের কাচের আলমারিতে নীল কাগজের ওপর এমনি সাজানো থাকে সোনার গহনা। পথের লোককে দয়া করায় তার জলুম; নাগালের বাইরে বলে তারা চেয়ে চেয়ে দেখে অনেকক্ষণ। মনে মনে অনেক স্বপ্ন গড়ে আর ভাঙ্গে।

কি ভাবছে মেয়েটি? এই তিন-তলা বাড়ির ধন ঐশ্বর্য্য ওর কাছে পুরোনো হয়ে আসছে? ওর আকাশে উঠছে বুঝি নূতন তারা? তারা নয় চাঁদ। একদিন জ্যোৎস্নার বন্যায় ভাসিয়ে দেবে ওর পৃথিবী। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে ফুরফুরে, জলে উঠছে ছোট ছোট ঢেউ। জল কাঁপছে—আকাশ কাঁপছে—মন কাঁপছে আর কাঁপছে মেয়ে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে পরম আবির্ভাব ঘটবে—সেই প্রত্যাশায় কাঁপছে।······

ফুলের নরম বিছানায় শুয়ে পড়ল—দুলারী। স্পর্শ-ভীরু কামিনী ফুলের বিছানা—বহু প্রত্যাশা-ভরা গন্ধ। চোখ চাইতে ইচ্ছা করছে না। আকাশের নীল ওর বুকের মাঝেই রঙ ধরিয়েছে—টিপ টিপ করে কাঁপছে বুক; প্রত্যেক কুমারী মেয়েরই যেমন কাঁপে।

হঠাৎ হেঁচকা টানে কে যেন স্বর্গ থেকে টেনে নাবাল দুলারীকে।

এই মাগী—ওঠ—ওঠ, আবার আরাম করে ঘুম দেখ না! মরণ আর কি—কত সখই যায়!

হাঁ—কামিনী তলায় ফুলের বিছানাতেই শুয়ে আছে দুলারী। কুমারী মেয়ে দুলারী। ফুলের গন্ধ ওর সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে—আকাশ ও চোখের সামনে খোলা। সব ঘুম ভাঙ্গা চোখে অপরূপ। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মত লোকটা ওকে এমন ধমক দিয়ে উঠল—বলি নর্দ্দমা সাফ করতে হবে—না শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখবি—আহ্লাদী মেয়ে!

ধড়মড় করে উঠে বসল দুলারী। পাশেই পড়ে রয়েছে ঝাড়ু আর ঝুড়ি—আর নলটানা বুরুশটা। ময়লা আঁচলে বাঁধা দু'খানা বাসি রুটি তখনও পিঠে ঝুলছে।

রোদ উঠেছে চড়চড়ে—কামিনী ডালের ফাঁকে ফাঁকে ওর কলকিগুলো যেন বিষের মত এসে লাগছে গায়ে। এখনও অনেক কাজ বাকী। তিন মহলা প্রকাণ্ড বাড়ী—অনেক আবর্জ্জনা এখানে ওখানে, অনেকগুলি ড্রেনও আছে তার আশে পাশে। আজ ঝগরু আসবে না, একাই সাফ করতে হবে। ওর সঙ্গে সাঙার কথা হচ্ছে বলে নয়—আজ থেকে ওর সরকারী কাজ হয়েছে। বিশ রুপেয়া বেতন আর দুলারী মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে খাটছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। হু-হু করে বাড়ছে চালের দাম—কাপড়ের দাম হু-হু করে নামছে জীবনের দাম।

দোতলার খাটে শুয়ে বই পড়ছে—এ বাড়ীর একমাত্র অনূঢ়া মেয়ে শোভা। পরশু ওর পাকা-দেখা হ'য়ে গেছে দুলারীদের মত—জ্ঞাতগোষ্ঠী সবই জড়ো হয়ে ক'বোতল সরাব খেয়ে কথা পাকা করা নয়—রীতিমত একটা ভোজের ব্যাপার হয়েছিল। কি সব খাবার-দাবার—কি ফেলা ছড়ার ধূম! কাকে কুকুরে ছড়াছড়ি করে খেয়েছে—দুলারীও আঁচল ভর্ত্তি করে টুকরো ভাঙ্গা অর্দ্ধভুক্ত জিনিস নিয়ে গেছে।

—আর—রোদটা ক্রমেই চড়ে উঠছে।—মেয়েটি দে দিব্য শুয়ে আছে! বৈশাখের রোদ ওর ঘরে—ভয়ে ভা উঁকিও মারবে না। ও স্বপ্ন দেখবে আশ্চর্য্য দেশের—বর্ণময় আকাশের আর সুন্দর জীবনের।—ওরই মত কুমারী মেয়ে দুলারী—ওর সঙ্গে মিশে যেতে পারে কে?

বাসি রুটি দু'খানিতে আঁচলের গেরোটা শক্ত করে দিয়ে—নল সাফ্ করবার বুরুশটা হাতে তুলে নিল দুলারী।

এ বিভূতি ক্ষুদ্রমতি ভক্তের চিত্তশুদ্ধির উপায় হলেও পার্থের মত পূর্ণ জ্ঞানীর তুষ্টিসাধন করতে পারে না। অথচ লৌকিক অভ্যাসবশে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশাবতংশ বীরেরও মনে ব্যবহারিক মেধায় উপলব্ধ বহু দেবতার আরাধনা সম্ভব। তার ফলে মানুষ ভ্রান্ত হ'তে পারে। ঐশ শক্তি বহু পরস্পর-নিরপেক্ষ ঈশ্বরে বিভক্ত এ সন্দেহ সম্ভব। একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি হয় অজ্ঞের মনে। অখণ্ড-মণ্ডলাকার যে তাঁর মূর্তি। সে বিশ্বরূপ দেখালেন প্রভু। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে প্রথমেই পরমেশ্বরের শক্তির একত্বে বীরের চিত্ত বিস্তৃত হোল। তিনি বল্লেন—

হে দেব তোমারই দেহের মধ্যে সকল দেবতাদের, স্থাবর জঙ্গমের, নানা ভূত বিশেষের সঙ্ঘ, এমন কি সর্বনিয়ন্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখছি, সকল দিব্য ঋষিবৃন্দকে এবং বাসুকী প্রভৃতি নাগ দেবতাদের দেখছি। *

সুতরাং খণ্ড বিভূতিকে আর পূর্ণ পরমেশ্বর ভ্রমের অবকাশ রইল না। বিভিন্ন দেবতার স্বাতন্ত্র্যের ভ্রান্ত ধারণা হল অবলুপ্ত। সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মা তিনিও সেই বিশ্ব-রূপের বিরাট দেহের মাত্র একাংশে স্থিত। অর্থাৎ ব্রহ্মারূপ সৃষ্টি শক্তি পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তির মাত্র অংশ বিশেষ। পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরের মহত্ত্ব ক্ষীণাদপি ক্ষীণ, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ প্রতিভাত হল। এমন কি স্বর্গাধিপতি দেবতা কুলের মহিমা ও প্রভাব বিশ্বরূপের একাংশের বিকাশ। কুরুক্ষেত্রে সমবেত পৃথিবীপতিরা সে বিশ্বে বেলাকুলের একটি বালুকণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

তাই সমগ্র রূপ উপলব্ধি করে শেষে সংক্ষেপে অর্জুন বলেছিলেন—হে অপ্রতিম প্রভাব, সমস্ত লোকের, সারা চরাচরের তুমি স্রষ্টা (পিতা)। গুরু তোমার পাদ-পদ্মের সন্ধান দেন, তাই তিনি পূজ্য। তুমি যে গুরুর-গুরুদেব। ত্রিভুবনে কে তোমার সমকক্ষ? তোমা হতে শ্রেষ্ঠ তো কেহ হতে পারে না।

তারপর আবার অর্জুনের চিত্তে দিব্যালোকের জ্যোতির স্ফুরণ হোল। নিমেষে ভাবলেন—অমিতপ্রভাব তিনি কেন আমার মত তুচ্ছ মানুষকে নিজের অপ্রমেয় দ্যুতিসম্পন্ন শ্রীরূপ দেখালেন? কোন গুণ আমার আছে?

আবার সত্য বিকসিত হল অর্জুনের চিত্তে। আমার 'আমিত্ব' তো তাঁকে পেতে পারে না। তাঁর নিজ স্বভাবই মানুষকে পবিত্র করে, বিশ্বরূপ দেখায়। আমার আমিত্বকে সহ্য করে তাঁর স্নেহ, তাঁর প্রেম। তাঁর প্রিয় ভাবই আমাকে সহ্য করেছে! পিতার স্নেহ নিজের অন্তরের উৎস-মুখ হতে উদ্ভূত হয়। পিতামাতা তো অপেক্ষা করেন না পুত্রের ভক্তির। তাঁরা ক্ষমাশীল নিজ গুণে। সে অসীম শক্তির সামান্য ছায়া মানবপিতার অন্তরে নিবদ্ধ। যিনি দেবাদিদেব, অপ্রতিম প্রভাব, বিশ্ব যাঁর একাংশে অবস্থিত অথচ যিনি মণিহারের সুত্রের মত সকলকে গেঁথে রেখেছেন —তাঁর স্নেহের কি সীমা আছে। তিনি অর্জুনের বিহার-শয্যাসন-ভোজনের অসম্মান ক্ষমা করবেন এতে বিচিত্রতা কি? এখন অর্জুন দিব্য-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছেন।

পিতা পুত্রে অনুরক্ত হয় বাৎসল্য প্রকৃতির বশে। ঈশ্বর নিজ প্রকৃতিবশে পুত্ররূপে সর্বভূতকে স্নেহ করেন। ভূতের মধ্যে স্নেহ সেই অনন্ত আলোর প্রতীক, ক্ষুদ্র দীপ। সখারূপে ঈশ্বর সদাই জীবের মনে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করছেন। অর্জুন তাঁকে পেয়েছিলেন সখারূপে—শ্রীকৃষ্ণ সখারূপে অর্জুনকে ধন্য করেছিলেন জগতের হিতের জন্য। সারা বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাঁর অনন্ত রূপের মাঝে সমস্তই সম্বদ্ধ। সুতরাং তাঁকে ভালবাসতে গেলে তাঁর সকল অংশকে না ভালবাসলে প্রেম হয় আমিত্বের নামান্তর। যে মানুষকে আমরা বৈরী ভাবি—সে শত্রু ও তাঁরই অনন্ত দীপ্ত দেহে সমাহিত। যে প্রেমিক সে কি আরাধ্যের দেহের কোনো অঙ্গের সাথে বৈরিতা করতে পারে। তাই তাঁকে ভালবাসতে গেলে বিশ্ব-প্রেম প্রয়োজন। যে সর্বভূতে

---

* পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান।

সমদর্শী সে-ই কৃষ্ণভক্ত। ভক্তির রাজ্যে ঘৃণা বা বৈরিতার স্থান নাই। সে প্রেমের রাজ্যের মাত্র নীতি বিশ্ব-প্রেম। বিশ্ব-প্রেম সন্ধান দেয় বিশ্বরূপের।

অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখে আশ্বস্ত হলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। কোন্ তপস্যা বলে অর্জুন তাঁর এমন অনন্তরূপ দেখবার যোগ্যতা অর্জন করলেন? তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন—পিতা পুত্রের সম্পর্কে, সখ্যতার বন্ধনে বা মধুরপ্রিয়ভাবে এমন রূপ-দর্শন তাঁর মত জীবের ভাগ্যে ঘটেছিল? কিন্তু নিশ্চয়ই মনের নিভৃত কক্ষে প্রশ্ন উঠেছিল—সখ্যই কি তোমাকে এমন ভাগ্যের অধীশ্বর করেছে, পার্থ? কারণ তপস্যা, বেদ-পাঠ, দান, যজ্ঞ এই সব সাধনার ফলেই তো মানব পরমার্থ লাভ করে, ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হয়, তাঁকে দেখতে পায়। আমার তো সে সাধনা নাই।

যেন তাঁর এই সমস্যা তিরোহিত করবার জন্যই শ্রীমুখে বাণী ঘোষিত হল। আবহমানকাল মানুষ তার জ্বালা-যন্ত্রণা, মান-অভিমানের কষাঘাত, আশা-নিরাশার বিষ এড়াতে পারে সে বাণীতে। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—তুমি ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কেহ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, পুণ্য, ক্রিয়াকলাপ বা অতিকঠোর তপস্যার দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করতে সমর্থ হয়নি। *

আজ তুমি আমায় যেমন দেখলে, তেমন দর্শন লাভ হয়না চতুর্বেদ পড়ে, চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যার ফলে, গোদান, ভূমিদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি দানের পুণ্যফলে বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা। †

হে অর্জুন অনন্যা ভক্তির দ্বারাই এমনভাবে আমার স্বরূপ জানতে পারা যায়, দেখতে পাওয়া যায় এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। ‡

গীতার ভক্তিতত্ত্বের এই সার। অনন্যা ভক্তি· ভক্তিই পরমপুরুষ জগদীশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের দিতে পারে।

এই চরম বাণীর এক একটি শব্দ নিয়ে নিজের এবং পাণ্ডিত্য অনুসারে ভক্ত এবং জ্ঞানী বহু কথা বলেছেন। কিন্তু এ শ্লোক বুঝতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। চিত্ত-বৃত্তিকে যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রিত করা তো সকল মানুষের সংস্কার এবং শক্তির মধ্যে। তাঁর প্রতি যদি অনন্যা ভক্তি থাকে তা হলে বুদ্ধি তিনি যোগ করে দেবেন আমাদের চিত্তে। এ আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। সাধনার ক্রম তো কষ্টসাধ্য নয়—কেবল অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করা।

হৃদয় যখন বিশ্বরূপে আপ্লুত হয় তখন প্রাণ হতে স্তব আপনি ওঠে। সন্দেহ যখন লোপ পায়, তখন মন আপনার সাথে কথা কয়। অর্জুন আবার বল্লেন—বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, প্রপিতামহ সবই তো তুমি। তুমি দিকপাল হয়ে দশদিকে কিরণ বিকীরণ করছ শ্রীকৃষ্ণ।

তাই অনন্যাভক্তি নত করলে মাথা—একদিকে নয় নানা দিকে। ভক্ত গদগদ চিত্তে বল্লে—ওগো প্রাণের দেবতা, বিশ্বের দেবতা, জন্মের দেবতা, মরণের দেবতা, ওগো পালনের কর্তা, জ্যোতির্ময়। আমি সম্মুখে তোমায় নমস্কার করি। পিছনে তোমায় নমস্কার করছি, ওগো মাত্র একবার কেন, পুনঃপুনঃ বারে বারে তোমায় প্রণতি করে ধন্য হচ্ছি। প্রণাম, প্রণাম, সর্বস্বধন তুমি, তোমাকে প্রণাম। সকল দিকে তুমি বিরাজিত, তোমাকে প্রণাম।

এই প্রণাম আত্মনিবেদন। এই প্রণামের যোগসূত্র ক্ষুদ্রকে বাঁধে মহতের সাথে—ক্ষুদ্রত্ব মহানকে টেনে আনে নিজের চেতনার মাঝে। চেতনা প্রসার লাভ করে।

কেবল মাধুরীর চিত্রে শ্রীভগবান আপনাকে প্রকট করলেন না শিষ্যের চিত্তে। জগত যে আপাতঃমধুর, আপাতঃকঠোর। সৃষ্টি ও ধ্বংস নটরাজের একই তাল, একই ছন্দ। তাই করাল দ্রংষ্ট্রা ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছিলেন অর্জুন। লোকক্ষয়প্রবৃত্ত কালরূপে তিনি দেখা দিলেন।

অর্জুন পূর্ণ ভগবানের দর্শন-পুলকে কৃতাঞ্জলি হলেন। তাঁর কলেবর হল বিকম্পিত। মনে ভয় হল

---

* ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
 র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
 এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
 দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর। ১১।৪৮

† নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ১১।৫৩

‡ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়াশক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪

চিত্ত হল গদগদ। তিনি আত্মায় নমস্কার করলেন। করলেন।

তিনি অনন্ত! তিনি দেবেশ! অথচ তিনি জগতেই বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আবার অতীন্দ্রিয়। তিনি তো জগৎ-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া নন। তিনি হেথায়, তিনি সেথায়, তিনি স্ফটিক স্তম্ভে। তিনি গোলক বৃন্দাবনে। অর্জুনের সত্তাকে তিনি উদ্ভ্রান্ত করেছেন। পার্থিব চক্ষুর সাথে দিব্য চক্ষু জুড়ে দিয়েছেন।

দিব্য চক্ষু দিলেন দিব্যদর্শন প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে যা দেখলেন, হৃদয়ের অন্তস্তল হতে স্তবরূপে তা উচ্ছ্বসিত হল।

আপনি আদিদেব। আপনি আদি পুরুষ, এই বিশ্বের আপনিই একমাত্র নিধান। আপনি সর্ববিদ, আপনিই তো বেদ্য। আপনি পরম ধাম। হে অনন্তরূপ এই সারা বিশ্বতে আপনি পরিব্যাপ্ত। *

মানুষ যে সসীম। তার মেধা, বৃত্তি, শক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়-সেবিত। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধে মানুষ অনন্ত সত্য উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু মুক্ত না হলে আবার তাকে অসীমের গণ্ডীর মাঝে ফিরতে হয়। অর্জুনের অনন্ত সত্যের উপলব্ধি হোল। কিন্তু তার তো কর্মের ক্ষয় হয়নি। ক্ষাত্রধর্মের দাবী তাকে ভূমণ্ডলে টানলে বিশ্বের অসীম অনন্তধাম হতে।

কিন্তু ভক্তির মদিরা তার রক্ত কণিকাকে মধুর হিল্লোলে করছে তরঙ্গায়িত। সে তো একেবারে সান্নিধ্য বা তিরোধান লাভ করতে পারে না। তার ইষ্টদেবতা চতুর্ভুজ। সে চতুর্ভুজও তো সহস্রবাহুতে সন্নিবদ্ধ, কিন্তু মোক্ষ সে চায় না—কর্তব্যের প্রাঙ্গণে। অতীন্দ্রিয় রূপ সে দেখেছে। তাঁর নিত্য-সেবার ইষ্ট চতুর্ভুজে অর্জুন আবদ্ধ রাখতে চাইলেন বৃত্তিকে। তাই আবার মর্তে নামলেন। বল্লেন—কিরীটসমলঙ্কৃত, সদাচক্রধৃত তোমার চতুর্ভুজ মূর্তি দেখতে চাই আপাততঃ। এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরে না অনন্তরূপ। সহস্র-বাহু বিশ্বমূর্ত্তি চতুর্ভুজ হও। †

বিশ্বরূপ দর্শনের প্রতিক্রিয়া অর্জুনের হৃদয়ে যে হিল্লোল্ উত্থিত করেছিল তা ভাববার কথা। প্রথমে তিনি বিষণ্ণ হয়েছিলেন। সে বিষাদের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে এ সংসার ও সমাজ অশাশ্বত, সুতরাং মায়াময় হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠান মোক্ষলাভের পরিপন্থী নয়। সংসার একটা আশ্রম। কিন্তু কোন সংসার? সু-গঠিত সুনির্জিত আত্মীয়বহুল সমাজ—যেথায় পরস্পরের শ্রদ্ধাই ধর্মের অঙ্গ এবং যেথায় স্ত্রীজাতির সতীত্ব সু-রক্ষিত ও সম্মানিত। তার ধ্বংস অবাঞ্ছিত। তাই বিষণ্ণ হয়েছিলেন অর্জুন।

আরও বুঝেছি এই বিশ্বরূপ দর্শনের প্রাণের সাড়ায় যে তখন মানুষ বহু দেবতার উপাসনায় বিস্মৃত হত, যে এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই—দেবতায় খণ্ড বিভূতির দিব্যদ্যুতি জ্যোতির্ময় এক অখণ্ড ব্রহ্ম-শক্তির অপ্রমেয় দ্যুতি মাত্র। সুতরাং সাধনার পূর্ণতা এক অখণ্ড মণ্ডলাকারের উপলব্ধি।

কিন্তু সে উপলব্ধি তো একেবারে আসে না। জ্ঞানের পটভূমিতে এ ধারণা রেখে ঋষিরা ব্যবস্থা করেছিলেন—ক্রম। অতীন্দ্রিয়-শক্তির উপলব্ধি—ইন্দ্রিয় হতে লাভ করা অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত—এমনভাবে মানুষের মনের গঠন। যেদিন জ্ঞানের প্লাবন আসে সে সকল কালের আঁধার-ঘেরা আবর্জনাকে ধুইয়ে দেয়। কিন্তু সে জ্ঞানের প্লাবনকে লাভ করবার জন্য যে প্রণালীর প্রয়োজন—সে অভ্যাস। একবার পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেও দৃষ্টিকে সদা সন্নিবদ্ধ করা যায় না সে জ্যোতিতে। আর একবার সে জ্যোতির সন্ধান পেলে তার দ্বারা সমস্ত অশাশ্বত বিশ্ব-সংসারকে চিনে ফেলা যায়। কিন্তু একের মোক্ষে তো জগতের মোক্ষ নয়। তাই অর্জুনের মত মহাপ্রাণ মহাজ্ঞানীকে মোক্ষ হতে ফিরে এসে আবার গাণ্ডীব ধারণ করে লোকক্ষয়রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

কিন্তু ধর্মের পথ ছাড়া সংসার ধর্ম নাই। অভ্যাস মনকে দৃঢ় করে। ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে মন। অর্জুনের ঈশ্বর আরাধনার দৃঢ়ভূমি ছিল চতুর্ভুজ বিষ্ণুর উপাসনা। তিনি সহস্রবাহু অনন্ত দেবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মোক্ষ চাহিলেন না। অথচ যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তা ত্যাগ করলেন না। তাই বল্লেন—বিশ্বমূর্তি চতুর্ভুজ হও।

বিশ্বরূপ দর্শনের পরও যখন অর্জুন গৃহদেবতারূপে পূর্ণ-ব্রহ্মকে দর্শন করলেন, সংসারে ফিরে এলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সংসারধর্মীর সার কর্ত্তব্য বর্ণনা করলেন। "এ-উপদেশ সর্ব্বশাস্ত্রসার পরম রহস্য।" বলেছেন শ্রীধরস্বামী। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—ইহা সর্ব্বগীতাশাস্ত্রের সারভূত অর্থ নিঃশ্রেয়সার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান বল্লেন—আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মৎপরায়ণ আমার আসক্তিবর্জ্জিত ভক্ত, সর্ব্বভূতে নির্বৈর যে ব্যক্তি সে আমাকে পায়। *

ভাববার কথা—নির্বৈর হয়ে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ব্যবস্থা।

---

* ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ। ১১।৩৮

† কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে। ১১।৪৬

* মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ১১।৫৫

আড়াই হাজার বছর আগে

(জগতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ভবিষ্যবাণী)

নরেন্দ্র দেব

প্রভু গৌতম বুদ্ধ জেতবন বিহারে বিরাজ করছেন। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। উষার আলোর প্রত্যুষের আকাশ সবেমাত্র রাঙা হয়ে উঠেছে। সংবাদ এল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীপুরী থেকে প্রভুর দর্শনার্থী হ'য়ে এসেছেন। প্রসেনজিৎ মগধের মহারাজা বিম্বিসারের ন্যায় বুদ্ধদেবের একজন পরম ভক্ত। বহুসমাদরে তাঁকে বুদ্ধ সকাশে নিয়ে আসা হ'ল। কুশলাদি প্রশ্নের পর শাস্তা জেতবনে তাঁর এতভোরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সবিনয়ে জানালেন—প্রভু, কাল শেষরাত্রে আমি পরপর ষোলোটি অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ভীত হ'য়ে রাজ্যের আচার্য ব্রাহ্মণগণের শরণ নিয়েছিলাম, স্বপ্নের ফলাফল সম্বন্ধে বিচারের জন্য। তাঁরা বিচার ক'রে স্থির করলেন—সেগুলি অতীব দুঃস্বপ্ন। সেইসব স্বপ্ন দর্শনের ফলে আমার রাজ্যনাশ, প্রাণনাশ এবং অর্থনাশ, এর যে কোনও একটি বিনষ্টি ঘটতে পারে! তাঁদের মতে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আমার একমাত্র উপায় প্রতি চতুষ্পথে যজ্ঞানুষ্ঠান করা। আমি আতঙ্ক-বিহ্বল হ'য়ে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্মতি দিই। তাঁরাও পরম উৎসাহে নগরের প্রতি চতুষ্পথ সঙ্গমে যজ্ঞকুণ্ড খনন করে যজ্ঞের আয়োজনে লেগেছেন। বহু পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব তাঁরা এই যজ্ঞে বলি দেবার জন্য সংগ্রহ করছেন। অগণিত প্রাণীহত্যার আয়োজন হচ্ছে দেখে আপনার প্রিয়শিষ্যা রাজমহিষী কোশল-মল্লিকা দেবী ব্যাকুলা হ'য়ে আমাকে পাঠালেন এর প্রতিবিধানের জন্য আপনার কাছে। যিনি নরলোকে ও দেবালোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, যিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বিষয়ই যাঁর নিরন্তর জ্ঞানগোচর, আমি তাঁরই শ্রীচরণে শরণ নিতে এসেছি প্রভু! স্নিগ্ধমধুর স্মিতহাস্যে শাস্তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে বললেন—

তখন কোশলরাজ করজোড়ে জানালেন—আমার প্রথম স্বপ্ন-

"চারি কালো ষাঁড়ে এল শিং নাড়ি মিছে ;
লড়িলনা কেউ তারা, ফিরে গেল পিছে।
তর্জন গর্জন আর হুঙ্কার তুলিয়া
বৃষ-যুদ্ধ উপক্রম, শেষে লঘু ক্রিয়া !"

শ্রীবুদ্ধ শুনে বললেন—"মহারাজ! আপনার অনিষ্টের তো কোনো সম্ভাবনা দেখছি না এ স্বপ্নের মধ্যে? এতে আপনি যা দেখেছেন তা দূর কালে অবশ্যই একদিন ঘটবে এই জগতে। সেদিন আপনি বা আমি কেউই থাকবো না এখানে। সেদিন পৃথিবীর সকল দেশের শাসক হ'য়ে উঠবেন অধার্মিক, দান-কুণ্ঠ; শাসিতেরাও অসৎপথে ... করবে। জগতের অবনতি ঘটবে। কল্যাণের পরিবর্তে অমঙ্গল বাড়... অনাবৃষ্টি হবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। আকাশের চার কোণে ... উঠবে। লোকে মনে করবে বৃষ্টি আসন্ন। পুরস্ত্রীরা গৃহের ছাদে অঙ্গনে যা কিছু রৌদ্রে দিয়েছিলেন ভিজে যাবার ভয়ে ঘরে তুলে ... আসবেন। পুরুষগণ ঝুড়ি কোদাল নিয়ে ক্ষেতে যাবেন আল ... বৃষ্টির জল ধরবার জন্য। কিন্তু মেঘ গর্জন করবে। বিদ্যুৎ খেলা... আসন্নবর্ষণের ভাব দেখা যাবে, কিন্তু ওই স্বপ্নদৃষ্ট বৃষগুলির শিং ... তেড়ে এসে যুদ্ধ না ক'রে ফিরে যাওয়ার মতই এককোঁটা বর্ষণ করে মেঘ কেটে যাবে। আপনার স্বপ্নের এই অর্থ মহারাজ। ... কোনও কারণ নেই। বলুন আপনার দ্বিতীয় স্বপ্ন কি?

তখন কোশলরাজ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ভগবান্ আপনার জয় হোক—আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত এইবার ... করুন—

"হেরিলাম শত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতা
সহসা উদ্ভূত হ'ল বিশ্বে যথা তথা,
সেই সব শিশু বৃক্ষ, ক্ষুদ্র লতাচয়,
ফুলে ফলে ভরি উঠে জাগালো বিস্ময় !"

শুনে শ্রীবুদ্ধ বললেন—মাভৈঃ! মহারাজ! এও সুদূর ভবিষ্য... ইঙ্গিত। সেই অনাগত ভবিষ্যতের অধোগামী জগতে মানুষেরা স্বল্পায়ু ও স্বাস্থ্যহীন। তারা তীব্র রিপুপরবশ হয়ে পড়বে। অল্প বয়স্কা বালিকারা কামী-পুরুষের সংসর্গে অকালে ঋতুমতী হ'য়ে বয়স্কাদের ন্যায় গর্ভধারণ ও ক্ষীণ দুর্বল পুত্র কন্যা প্রসব করবে। আ... যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতাকে শিশু অবস্থায় ফুলে ফলে ভরে উঠতে দেখে... তা সেই অকালে ঋতুমতী বালদম্পতীজাত পুত্রকন্যাদের ... ভয় নেই। সেদিন আমিও থাকবো না, আপনিও থাকবেন না মহারা... বলুন এইবার আপনার তৃতীয় স্বপ্ন কি?

কোশলরাজ করজোড়ে বললেন—শুনুন প্রভু—

"অদ্ভুত তৃতীয় স্বপ্ন—দেখে ভীত প্রাণ :
'সদ্যজাত বৎসক্ষীর ধেনু করে পান !"

স্মিতহাস্যে শ্রীবুদ্ধ জানালেন 'এও আমাদের বহু পরবর্তী ... দিনের ছবি। আপনি দেখছি বিগত রজনীতে স্বপ্নের মধ্যে ভাবী ...

চিত্র অবলোকন করেছেন। জগতে এমন একদিন আসবে লোকে বয়োজ্যেষ্ঠদের আর সম্মান দেখাবেন না। মাতা ক উপেক্ষা করে নিজেরাই সংসারে কর্তৃত্ব করবে। বধূরা শ্বশুর কে মানবে না। নিজেদের ইচ্ছা ও অভিরুচি মতো চলবে। অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের কেউ কেউ অযত্নে অবজ্ঞার সঙ্গে করলেও, অনেকেই খেতে পরতে দেবেনা। সেই সব অসহায় বৃদ্ধগণ তাদের সন্তানসন্ততিদের মুখাপেক্ষী ও অনুগ্রহভাজন হয়ে দের দেওয়া অন্নপানে জীবন ধারণের চেষ্টা করবেন। এরই অভিব্যক্তি —'সদ্যজাত বৎসক্ষীর ধেনু করে পান'। এর মধ্যে ভীষণতা কিছু ই, সুতরাং আপনি ভয় পাবেন না। আপনার চতুর্থ স্বপ্ন বর্ণনা করুন।

রাজা চতুর্থ স্বপ্ন বললেন—

"ভারবাহী বলিবর্দে রাখিয়া গোয়ালে ;
তরুণ বৃষেরে আনি বেঁধেছে জোয়ালে ;
গতিহীন যান তাই দাঁড়াইয়া পথে,
অর্বাচীনে নাহি পারে টানিবারে রথে।"

বুদ্ধ বললেন, এও সেই সুদূর অনাগত কালে ঘটবে। সেদিন বর্গ অনাচারী ও অধর্মপরায়ণ হ'য়ে কর্মকুশল, সুপণ্ডিত, প্রবীণ ও অমাত্যবর্গকে রাজকর্ম পরিচালনা থেকে অবসর দিয়ে তাদের দা করবে। ধর্মাধিকরণে, শুল্ক নিরূপণে, শিক্ষাভবনে বিচক্ষণ ধান, ব্যবহারবিদ্ বয়োবৃদ্ধদের নিযুক্ত করবে না। বরং এঁদের রীত লক্ষণযুক্ত, অধৈর্যস্বভাব তরুণদের সমাদর বাড়বে। তারাই জ্যের নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে জটিল রাজকার্যে ভিজ্ঞতাবশতঃ তারা শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারবে না, পদগৌরব ক্ষুন্নই করবে। অবশেষে রাজকার্য পরিহার করতে বাধ্য। বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ অমাত্যগণ পূর্বকৃত অনাদর ও অবহেলা স্মরণ পুনরায় কর্মভার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হবেন। তাঁরা বলবেন, দের শাসন কার্য অচল হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের কি ক্ষতি? আমরা তো এরাজ্যের কেউ নই। আমরা এখন বাইরের কমাত্র। দিয়েছো ছেলে-ছোকরাদের হাতে কার্যভার, তারা ক্ষমতা হাতে পেয়ে তার অপব্যবহার করে আমরা কি বো?। কৃতকর্মের ফলভোগ একদিন করতেই হয়। ভার করে নিয়ে দূরে যেতে সক্ষম, বলিষ্ঠ বলিবর্দদের বয়স হয়েছে উপেক্ষা ক'রে তাদের স্কন্ধের জোয়াল খুলে নিয়ে তরুণ, অক্ষম ও বলিবর্দদের স্কন্ধে তুলে দিলে যা হয়, এখানেও তাই ঘটেছে। শকট অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ! এই হ'ল আপনার অর্থ। এর মধ্যে আপনার অর্থনাশ, রাজ্যনাশ, প্রাণনাশ কোনও নাশেরই সম্ভাবনা নেই। ধনলুব্ধ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে বুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে কিছু উপার্জনের চেষ্টা করছে মাত্র। বলুন আর পঞ্চম স্বপ্ন কি?

রাজা বললেন—পঞ্চম স্বপ্নে—

"দুই দিকে দুই মুখ অশ্ব হেরিলাম,
দুই মুখে ঘাস দানা খায় অবিরাম!"

শ্রীবুদ্ধ ব্যাখ্যা করলেন—এও সেই সুদূর ভবিষ্যৎকালে যা ঘটবে তারই পূর্বাভাস মাত্র! ধর্মহীন শাসকদের রাষ্ট্রে এই ব্যাপারই হতে দেখা যাবে। নির্বোধ ও অধর্মাচারী শাসকবর্গ অর্থলোভী ধর্মহীন অসৎ ব্যক্তিদের বিচারপতির আসনে বসাবে। দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর পদেও নিযুক্ত করবে। ফলে, আপনার স্বপ্নদৃষ্ট দুমুখো অশ্বের ন্যায়ই পাপপুণ্য ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য রাজকর্মচারীরা অবাধে অর্থী প্রত্যর্থী উভয়ের নিকটই উৎকোচ গ্রহণ করবে। এই আপনার স্বপ্নের অর্থ মহারাজ। এর মধ্যেও আপনার ভয়ের কোনই কারণ নেই। আপনার ষষ্ঠ স্বপ্ন কি বলুন শুনি।

মহারাজ বললেন—ষষ্ঠ স্বপ্ন অতি বিচিত্র প্রভু—

"লক্ষ মুদ্রামূল্য হেন-স্বর্ণ পাত্রে ধ'রে
শৃগালের মূত্র সবে ল'য়ে যায় ভ'রে!"

শ্রীবুদ্ধ বললেন—এ ব্যাপারও পৃথিবীতে বহুকাল পরে ঘটবে। তখন রাজকুলোদ্ভব শাসকেরাও অধার্মিক হয়ে পড়বেন। অভিজাতবংশীয়দের সকলেই অবিশ্বাস করবেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অসম্মানের পাত্র হয়ে উঠবেন। যারা অকুলীন ও অপাংক্তেয় তাঁরা উচ্চপদে নিযুক্ত হবেন। এ সময় সদ্বংশীয়দের হবে দুর্গতি এবং নীচকুলোদ্ভবদের হবে উন্নতি। কুলীনেরা সেদিন জীবিকা নির্বাহের আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে, শেষে অকুলীনদেরই আশ্রয় নেবেন এবং বংশমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে, সমাজবিধির বিরুদ্ধাচরণ করেই তাদেরই ঘরে কন্যাদান করবেন। শৃগালের মূত্রস্পর্শে সুবর্ণ পাত্রখানি যেমন কলঙ্কিত হ'ল, অকুলীনদের সংসর্গে এসে কুলকন্যার জীবন-যাপন অবিকল সেই একই ব্যাপার! সুতরাং এতে আপনার কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। বলুন আপনার সপ্তম স্বপ্নের বিবরণ মহারাজ।

রাজা বললেন—অতি অদ্ভুত আমার সপ্তম স্বপ্ন—

"হেরিলাম কোনও লোক বসি চৌকী 'পরে
যত দীর্ঘ চর্মরজ্জু রচনা সে করে,
পড়িছে অজ্ঞাতে তাহা ঝুলি চৌকী তলে;
জানেনা—শৃগালী এক গেলে কুতূহলে!"

প্রভু বুদ্ধ বললেন—মহারাজ! এ স্বপ্নও সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থা নির্দেশ করছে মাত্র। সেদিন জগতের নারীগণ পুরুষসঙ্গলুব্ধ, সুরাসক্ত, অলংকারলোলুপ, ভ্রমণবিলাসিনী ও প্রমোদপরায়ণা হয়ে উঠবে। পুরুষেরা নানা উপায়ে কঠিন পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জন করে আনবে এই সব দুঃশীলা ও চরিত্রভ্রষ্টা স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে তা সুরাপানে, জুয়াখেলায়, আমোদপ্রমোদে ও বিলাসউপকরণ সংগ্রহে নিঃশেষে ব্যয় করবে। সংসারে অনটন ও অভাব দেখা দিলেও তা' গ্রাহ্য করবে না। গৃহে বয়োপ্রাপ্ত পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারে পরাঙ্মুখ হবেনা। হাতের শেষ সম্বলটুকুও নেশায় ও আমোদে ব্যয় করে.

ফেলবে। স্বপ্নে যেমন দেখেছেন একব্যক্তি বহু কষ্টে রজ্জু প্রস্তুত করছে, কিন্তু, তার অগোচরে গৃহপ্রবিষ্ট এক শৃগালী গোপনে তা' উদরসাৎ ক'রে ফেলছে, তেমনি সেদিন গৃহস্থপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ স্বামীদের অজ্ঞাতসারে তাদের বহু কষ্টলব্ধ ধন নিজেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য অপব্যয় করবে। সেদিন আমিও থাকবো না, আপনিও থাকবেন না। সুতরাং ভয়পাবার কারণ নেই। বলুন আপনার অষ্টম স্বপ্ন কি?

মহারাজ বলিলেন—আমার অষ্টম স্বপ্ন নিতান্ত হাস্যকর প্রভু!

"সুবৃহৎ পূর্ণ কুম্ভ হেরিলাম দ্বারে,
শূন্য কুম্ভ আছে বহু তারই চারি ধারে।
চারি বর্ণ জনস্রোত ভরি দিক চারি,
আসিয়া ঢালিছে সবে পূর্ণ কুম্ভে বারি।
উপচিয়া কুম্ভ স্রোত বহিছে সেথায়,
তবু শূন্য কুম্ভ পানে কেহ নাহি যায়!"

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে শাস্তা বললেন—এও ভবিষ্যৎ ঘটনার এক পূর্বাভাস। সেদিন পৃথিবীর অত্যন্ত দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে মহারাজ! দেশের শাসকেরা নিঃশেষিত রাজকোষ নিয়ে বিব্রত বোধ করবে। ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টায় তাদের কৃপণতা বাড়বে। রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী বণিকের কাছেও লক্ষমুদ্রার সঞ্চয় থাকবে না। অভাবগ্রস্ত শাসক-সম্প্রদায় নানা-ভাবে জনসাধারণের কাছে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করবেন। প্রজারা উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হবে। তাদের শ্রমজাত ধান চাউল গম যব প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য কেড়ে নিয়ে রাজভাণ্ডারে জমা করা হবে। তাদের গৃহের মরাইগুলি শূন্যই থেকে যাবে। রাষ্ট্রীয় অধিকার বলে শাসকেরা চারিদিক থেকে সকল লোককে কেবল রাজভাণ্ডারই পূর্ণ করতে বাধ্য করবে। রাজভাণ্ডাররূপ কুম্ভ পূর্ণ হয়ে উঠলেও তাদের মুক্তি নেই, পুনঃ পুনঃ সেইখানেই তাদের ক্ষেতের উৎপন্ন সামগ্রী জমা দিয়ে আসতে হবে। নিজেদের গ্রামের আশে পাশের শূন্য মরাইগুলি শূন্য কুম্ভের মতো শূন্যই থেকে যাবে। সেদিন আপনি বা আমি কেউই থাকবো না। সুতরাং, ভয়ের কোনো কারণ নেই, মহারাজ! এইবার আপনার নবম স্বপ্ন বর্ণনা করুন।

মহারাজ বললেন—নবম স্বপ্নটি বড় রহস্যময়—

"হেরিলাম পঙ্ক-পদ্ম স্নিগ্ধ সরোবর,
চারিদিকে স্নানঘাট অতি মনোহর;
মধ্যে পাঁক, কিন্তু, তীর স্বচ্ছ জলে ঘেরা,
স্নান করে, পান করে যত শ্বাপদেরা।"

স্বপ্ন শুনে প্রভু বললেন—এরও পরিণাম সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে মহারাজ। তখন শাসক সম্প্রদায় অধর্মপরায়ণ হয়ে উঠে যথেচ্ছাচার করবে। অন্যায় ভাবে রাজ্যশাসন করবে। বিচারের সময় ন্যায় ধর্মের মর্যাদা রাখবে না। অর্থ লালসায় উৎকোচ গ্রহণ করবে। প্রজা-সাধারণের প্রতি তাদের কিছুমাত্র দয়া মায়া বা প্রীতি থাকবে না। প্রজাদের নিষ্ঠুরভাবে এবং ভীষণভাবে পীড়ন করে নানা বিভিন্ন কর আদায় করবে। তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও ধান্য কেড়ে নেবে। অত্যাচারে ও করভারে প্রপীড়িত প্রজারা শেষে নিজ গ্রাম ও নগর ছেড়ে রাজ্যের সীমানা পার হ'য়ে অন্যত্র গিয়ে খুঁজবে। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জনপদসমূহ হয়ে পড়বে। কিন্তু পলাতক প্রজারা সীমান্তে গিয়ে বসবাস করায় সীমান্ত প্রদেশ বহুজনসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, আপনার রাজ্যরূপ পঙ্ক-পদ্ম সরোবরের জনবিরল মধ্যভাগ হয়ে যাবে আবিল।

ভগবান বুদ্ধ

তীরভূমি অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশ হয়ে উঠবে জনাবিল। এর জন্য আপ কোনও ভয়ের কারণ দেখি না। আপনার দশম স্বপ্ন কি বলুন—

মহারাজ বললেন—দশম স্বপ্নটি আমার অসম্ভব বলে মনে হয়—

"একই পাত্রে ফুটিতেছে ত্রিবিধ তণ্ডুল,
হলনা সুসিদ্ধ কেহ তবু এক চুল!
রয়েছে পৃথক হ'য়ে সবগুলি চাল,
কিছু সিদ্ধ, অর্ধসিদ্ধ, কিছু কাঁচা হাল!"

শাস্তা শুনে বললেন, "এও বহুকাল পরের ভবিতব্য মহারাজ। তখন

অধার্মিক ও দুষ্কৃতকারী শাসকবর্গ ও তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট সমভাবে অন্যায় আচরণ করবে। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গৃহপতি, ... জনপদবর্গও তাদের অসৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে ভ্রষ্ট হবে। ফলে, ... লোকেরই অধোগতি উপস্থিত হয়েছে দেখা যাবে। সেদিন ব্রাহ্মণ, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা, এমন কি, বৌদ্ধ শ্রমণগণ পর্যন্ত থেকে বিচ্যুত হবে। জনগণের উপাস্য দেব-দেবীরও মহিমা ও বিলুপ্ত হবে। কেউ আর তাঁদের মানবে না। যেখানে ধর্ম নেই দেবতাও অবস্থান করেন না। সেই অধর্মপুষ্ট প্রদেশে ...ৎ দুর্যোগ উপস্থিত হবে। ঝড় জল অতিবৃষ্টি ও ভূকম্পন পৃথিবীকে ... করে তুলবে। পরমাণুর উৎক্ষেপে বিমান পর্যন্ত প্রকম্পিত হবে। কুপিত হয়ে বারিবর্ষণ বন্ধ রাখবেন। শস্যক্ষেত্রে কৃষকেরা ... ও বীজবপনের সুবিধা পাবে না। বৃষ্টি যদিই বা হয়, তবে সর্বত্র ... ভাবে হবে না নিশ্চয়। ফলে কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও স্বল্পবৃষ্টি, ... বা অতিবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটবে। কোথাও অনাবৃষ্টির তৈরি শস্য চোখের সামনে শুকিয়ে যাবে; কোথাও বা স্বল্পবৃষ্টির শস্য জন্মাবে না, আবার, কোথাও বা পরিমিত বৃষ্টি হওয়ার জন্য কিছু ...াণ শস্য উৎপন্ন হবে। সুতরাং আপনার স্বপ্নদৃষ্ট তণ্ডুলের ন্যায়, ...ই রাজ্যের শস্য সম্পদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটবে মহারাজ! কিন্তু ...নার আমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপনার একাদশ স্বপ্ন বলুন—

মহারাজ বললেন—একাদশ স্বপ্ন আমাকে বড় বিচলিত করেছে—

"হেরিলাম রাজ্যে মোর বহু লোকই, জেনে
চন্দনের বিনিময়ে পচা-ঘোল কেনে!"

ভগবান বুদ্ধদেব বললেন—অবহিত হ'য়ে শুনুন, মহারাজ, যখন আমার ...ষ্ঠিত এই বৌদ্ধ শাসনচক্রের অবনতির জন্য বৌদ্ধ ধর্ম বিনষ্ট হবে, ...ই সুদূর ভবিষ্যৎকালে আপনার স্বপ্নফল দৃষ্ট হবে। তখন ভিক্ষু ...ণীরা নির্লজ্জ ও লোভপরায়ণ হবে। তাদের চরিত্রে অসংযম দেখা ...বে। লোভের নিন্দা করে আমি তাদের কাছে আজ যে সকল উপদেশ ...ছি, তারা সেদিন চীবরাদি যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে জনসাধারণের ...ছে সেই সব কথাই বলবে। তারা লোভপরবশ হ'য়ে বৌদ্ধ শাসন পরিহার ...রে বিরুদ্ধ-ধর্মমতাবলম্বীদের সম্প্রদায়ে যোগ দেবে। মনুষ্য সমাজকে ...রা সেদিন আর নির্বাণের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। কী উপায়ে, ...ভাবে মিষ্টবাক্য ও স্তুতিবাদের দ্বারা ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের ...ছে কিছু দান পাওয়া যেতে পারে তারা কেবল সেই চেষ্টাই করবে। ...কে পরকালের ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মতিগতি কিসে ...ভিক্ষু শ্রমণদের দান করবার পুণ্য সঞ্চয়ে প্রোৎসাহিত হয়ে ওঠে, ধর্ম ...দেশ দেবার সময় তারা কেবল এই চেষ্টাই করবে। অনেক ধর্ম-...রক হাটে-বাজারে রাজপথের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণ বা রজতমুদ্রার ...ভে জনসাধারণকে ধর্মকথা শোনাবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ ...উপদেশের ছলে নির্বাণরূপ মহামূল্য রত্নও তারা চীবরাদি সামান্য উপকরণ ও তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতে প্রবৃত্ত হবে। তারাই পচা ঘোলের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করতে চাইবে। ভয় নেই মহারাজ। সেদিন আপনি ও আমি কেউই থাকবো না। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন শুনি—

মহারাজ বললেন—অত্যাশ্চর্য আমার এই দ্বাদশ স্বপ্ন প্রভু,

"দেখিনু চাহিয়া এক জলাশয় জলে
অলাবুর শূন্যপাত্র ডুবিল অতলে!"

প্রভু বললেন—এ ব্যাপারও আজ থেকে বহু বর্ষ পরে ঘটবে! দেশের শাসকেরা সেদিন ধর্মবিরোধী হবে। পৃথিবী বিপথে চালিত হবে। সদ্বংশসম্ভূত অভিজাত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপরিচালকেরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন। যারা অকুলীন, সামান্য সাধারণ লোক, তারাই সেদিন রাষ্ট্রে সম্মানিত হবে। তারাই দেশে প্রভুত্ব করবে ও শাসনকার্যে অংশ নেবে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশগৌরবে ধন্য ব্যক্তিরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। নগণ্য লোকেরাই রাষ্ট্রপরিষদে, মন্ত্রণাসভায়, বিচারালয়ে সর্বত্রই শূন্য অলাবুপাত্র সদৃশ তুচ্ছ ব্যক্তিরাই প্রধান হয়ে উঠবে। তাদের কথাই গণ্য হবে। যেন তারাই একেবারে সকল বিষয়ে অতলস্পর্শী জ্ঞান নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও দেখা যাবে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুশ্রমণদের মধ্যে কোনও বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে যারা ভ্রষ্ট, পতিত, দুঃশীল ও পাপাচারী তারাই কর্তৃত্ব করবে। যারা প্রকৃত ধার্মিক, সুশীল ও বিনয়ী, তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। কারণ, অধার্মিকেরাই সেদিন প্রাধান্য লাভ করবে। অর্থাৎ কিনা, সেদিন সকল বিষয়েই যারা অন্তঃসারশূন্য অলাবু-পাত্র সদৃশ সেই সকল অপদার্থ লোকেদেরই সারবান ব্যক্তি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটবে। সুতরাং আপনার কোনও ভয়ের কারণ নেই মহারাজ। আপনার ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বলুন?

মহারাজ বললেন—আমার ত্রয়োদশ স্বপ্ন অধিকতর বিস্ময়কর ভগবন্,

"নৌকাসম ভেসে যায় শিলা সুবৃহৎ,
হেরিয়া বিস্মিত, জলে ভাসিছে পর্বত!"

ভগবান বুদ্ধ বললেন—এরও ফলাফল সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে। পূর্বেই বলেছি অধার্মিক রাষ্ট্র পরিচালকেরা নগণ্য সাধারণ লোকগুলোকে সম্মান দেবে। কুলমর্যাদাহীনেরা প্রভুত্ব পাবে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিদের দুঃখ দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকবে না। কারণ, তাদের লোকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। অতি নগণ্য সাধারণ ব্যক্তিরাই সম্মানিত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, মন্ত্রণা-পরিষদে, বিচার বিভাগে, দায়িত্বপূর্ণ দেশরক্ষা পদে কোথাও সুবৃহৎ শিলার মতো জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ভারি, সারবান, বিচারকুশল, শাসনদক্ষ অভিজাতগণকে লোকে আমোলই দেবে না। তারা বৃথাই ভেসে বেড়াবে। তারা কিছু বলবার চেষ্টা করলেও লোকে তাদের কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। ... এ নীরেটগুলো আবার কি সব বাজে বকছে? ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও অভিজ্ঞগণ

মহাস্থবীরদের কোনও সম্মান ও সমাদর থাকবে না। তাঁরা কিছু উপদেশ দিতে গেলে হাস্যাস্পদ হবেন। পর্বততুল্য জ্ঞান ও মনীষা যাঁদের তাঁরা গণমনের অবজ্ঞার স্রোতে ভেসে যাবেন। আপনার কোনও ভয় নেই। বলুন চতুর্দ্দশ স্বপ্ন কি?

মহারাজ বললেন—চতুর্দশ স্বপ্নে দেখেছি অতি বিপরীত ঘটনা ঘটতে—

"মহুয়া ফুলের তুল্য ক্ষুদ্র ভেক দল
মহাবিষধর সর্পে করিছে বিহ্বল,
তাড়া করে গিয়ে তারে নকুলের মত
ছিন্ন পদ্মনাল হেন করিছে নিহত।"

শাস্তা বললেন—এ ঘটনাও আজ থেকে বহুকাল পরে ঘটবে। তখন পৃথিবীতে লোকক্ষয় হ'তে শুরু হবে। সকল পুরুষেরাই আদি রিপুর তাড়নায় তরুণী ভার্য্যার পদানত দাস হ'য়ে পড়বে। সংসারে ভৃত্য ও দাসদাসীরা, গৃহপালিত পশু পক্ষীরা, সোনা রূপা, হীরা জহরৎ, টাকাকড়ি প্রভৃতি সমস্ত ধনরত্নই হ'য়ে যাবে সেই সব চটুলা যুবতী স্ত্রীলোকগণেরই করায়ত্ত। স্বামীরা যদি কখনো অর্থ অলংকারাদি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানতে চান, পত্নীরা ভর্ৎসনা করে বলবেন—'যেখানেই থাকনা! তোমাদের সে খোঁজে কি দরকার? তোমরা যে যার নিজের কাজ করগে যাও।' আরও নানা বিষয়ে স্বামীরা যখন তখন পত্নীদের কঠিন ভর্ৎসনা ও তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হবেন। অর্থাৎ, বীর্যবান শক্তিশালী পুরুষেরাও সেদিন অবলা ক্ষুদ্র নারীদের চরণ তলে ক্রীতদাস হ'য়ে স্বীয় আত্মাভিমান হারাতে বাধ্য হবেন। তাদের অবস্থা হবে ঠিক তেমনি—যেমন ভেকের দ্বারা কালসর্পের দুর্গতি হ'তে দেখেছেন আপনি স্বপ্নে! এজন্য আপনার এখন কোনও অনিষ্টেরই আশংকা নেই জানবেন। আপনার পঞ্চদশ স্বপ্ন কি বলুন।

মহারাজ বললেন—পঞ্চদশ স্বপ্নটিও নিতান্ত এক হাস্যকর ব্যাপার!—

"দশবিধ অমঙ্গল যুক্ত গ্রাম্য কাক
অধার্মিক বলি যার আছে নাম ডাক,
হেরিলাম চলে যেন মহাগর্বেস্ফীত
স্বর্ণ-পক্ষ রাজহংসে হয়ে পরিবৃত!"

বুদ্ধদেব বললেন, মহারাজ! এও অতি দূরকালের সম্ভাব্য চিত্র। তখন আপনিও থাকবেন না, আমিও না। সেদিন অলস ও বিলাসী এবং চরিত্রভ্রষ্ট রাষ্ট্রপরিচালকেরা দুর্বল ও দেশরক্ষায় অক্ষম হ'য়ে পড়বেন। রণক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করতে ভুলে যাবেন। অস্ত্রের ব্যবহার দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে বিস্মৃত হবেন। পাছে রাজশক্তি তাঁদের হস্তচ্যুত হ'য়ে পড়ে এই ভয়ে রাজ্যের মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশীয়দের কোনও ব্যাপারেই প্রভুত্ব করবার সুযোগ দেবেন না। তাঁরা যত সব নীচকুলোদ্ভব নিম্নশ্রেণীর হীনবুদ্ধি লোকগুলোকে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োগ করবেন। এর ফলে, রাজ-অনুগ্রহ বঞ্চিত দেশের সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়েরা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হ'য়ে নিরুপায়ের মতো কাক-পরিচর্যারত স্বর্ণ-পক্ষ রাজহংসদের ন্যায় অভিজাতেরাই অকুলীনদেরই উপাসনা করতে বাধ্য হবে। মাভৈঃ মহারাজ, ষোড়শ ও শেষ স্বপ্নটি এইবার ব্যক্ত করুন।

মহারাজ বললেন—ভগবান! এই ষোড়শ ও শেষ স্বপ্ন অবিশ্বাস্য:—

"এতকাল জানিতাম বাঘে খায় ছাগ,
স্বপ্নে দেখি বিপরীত—ছাগে খায় বাঘ!
ছাগ হেরি বাঘ দূরে পলাইছে ডরে,
ভয় পায়, পাছে তাকে ছাগে এসে ধরে!"

প্রভু গৌতম বললেন—আশা করি আপনি এতে ভীত ... মহারাজ! এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এসব সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপা... এ সেই অনাগত কোনও যুগে দেখা যাবে, যখন দেশের ... থেকে নিম্নপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালকেরা সকলেই অধা... সত্যভ্রষ্ট ও নষ্ট চরিত্র হ'য়ে উঠবে, যত সব নীচ অকুলীন ক্ষমতার অ... হয়ে প্রভুত্ব শুরু করবে। কুলগৌরবে যারা সম্মানিত ছিলেন এক... তাঁরা সেদিন অবজ্ঞাত ও দুর্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়বেন। অধার্মিক শা... গোষ্ঠীর আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয়পাত্রের দল সেদিন রাষ্ট্রের সর্বে... ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। দেশের প্রাচীনবংশীয় যত ভূমি... জমিদারবর্গের যা কিছু ভূসম্পদ ও ঐশ্বর্য সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করা... তারা আত্মসাৎ করবে। ভূমি ও সম্পত্তির পুরুষপরম্পরা যাঁরা স্বা... ছিলেন তাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তাদের ... অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেন। কুলমর্যাদাহীন নির্গুণ নীচেরা সে... স্পর্ধাভরে সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয়দের তিরস্কার ক'রে বলবে—'তো... উচ্ছন্ন যাও! তোমরা দীর্ঘকাল আমাদের বঞ্চিত রেখে বংশপরম্পরায় ভোগ করেছো, আমরা আজ সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিচ্ছি ... তোমাদের সবংশে নিধন ক'রে।' ভীত ও উৎপীড়িত ভূস্বামীরা প্রা... সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে, ঠিক আপনার স্বপ্নে দেখা ছাগের ভয়ে বাঘেরা পালিয়ে ছিল। অভি... সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নীচবংশীয়দের অত্যাচারে যেমন স্থানচ্যুত হবেন, ... ধার্মিকেরাও সেদিন আর সে অধর্মের রাজ্যে বাস করতে পারবেন... অধার্মিক অসৎ মঠাধ্যক্ষগণের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত অপমানের ... বিতাড়নের আশঙ্কায় ধর্মভীরু সাধুপুরুষেরাও ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে প... করবেন সেদিন। মহারাজ, ভয় পাবেন না। এসব বহু বহু ... পরে ঘটবে জানবেন। অবশ্য, আপনার রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা আজ সম্পদের লোভে আপনাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে যে চতুষ্পথ ... আয়োজন করছেন এর মধ্যেই সেই ভাবী অকল্যাণের বীজ রোপণ করে যাচ্ছেন। একান্ত শাস্ত্রসঙ্গত নয়, আপনার ... প্রচেষ্টাও এর মধ্যে নেই। অর্থই তাদের কাছে আজ পরমার্থ ... উঠেছে।*

* ('মহাস্বপ্নজাতক' হইতে)

অধার্মিক ও দুষ্কৃতকারী শাসকবর্গ ও তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট লোকেরা সমভাবে অন্যায় আচরণ করবে। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গৃহপতি, ... শ্রমণগণবর্গও তাদের অসৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে ভ্রষ্ট হবে। ফলে, ... সমাজের লোকেরই অধোগতি উপস্থিত হয়েছে দেখা যাবে। সেদিন ... ব্রাহ্মণ, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা, এমন কি, বৌদ্ধ শ্রমণগণ পর্যন্ত ... থেকে বিচ্যুত হবে। জনগণের উপাস্য দেব-দেবীরও মহিমা ও ... বিলুপ্ত হবে। কেউ আর তাঁদের মানবে না। যেখানে ধর্ম নেই ... দেবতাও অবস্থান করেন না। সেই অধর্মপুষ্ট প্রদেশে ... দুর্যোগ উপস্থিত হবে। ঝড় জল অতিবৃষ্টি ও ভূকম্পন পৃথিবীকে ... করে তুলবে। পরমাণুর উৎক্ষেপে বিমান পর্যন্ত প্রকম্পিত হবে। ...দেব কুপিত হয়ে বারিবর্ষণ বন্ধ রাখবেন। শস্যক্ষেত্রে কৃষকেরা কর্ষণ ও বীজবপনের সুবিধা পাবে না। বৃষ্টি যদিই বা হয়, তবে সর্বত্র ... ভাবে হবে না নিশ্চয়। ফলে কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও স্বল্পবৃষ্টি, ...থাও বা অতিবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটবে। কোথাও অনাবৃষ্টির ...তৈরি শস্য চোখের সামনে শুকিয়ে যাবে; কোথাও বা স্বল্পবৃষ্টির ...শস্য জন্মাবে না, আবার, কোথাও বা পরিমিত বৃষ্টি হওয়ার জন্য কিছু ...মাণ শস্য উৎপন্ন হবে। সুতরাং আপনার স্বপ্নদৃষ্ট তণ্ডুলের ন্যায়, ... রাজ্যের শস্য সম্পদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটবে মহারাজ! কিন্তু ...নার আমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপনার একাদশ স্বপ্ন বলুন—

মহারাজ বললেন—একাদশ স্বপ্ন আমাকে বড় বিচলিত করেছে—

"হেরিলাম রাজ্যে মোর বহু লোকই, জেনে—
চন্দনের বিনিময়ে পচা ঘোল কেনে!"

ভগবান বুদ্ধদেব বললেন—অবহিত হ'য়ে শুনুন, মহারাজ, যখন আমার ...ষ্ঠিত এই বৌদ্ধ শাসনচক্রের অবনতির জন্য বৌদ্ধ ধর্ম বিনষ্ট হবে, ... সুদূর ভবিষ্যৎকালে আপনার স্বপ্নফল দৃষ্ট হবে। তখন ভিক্ষু ...নীরা নির্লজ্জ ও লোভপরায়ণ হবে। তাদের চরিত্রে অসংযম দেখা ...। লোভের নিন্দা করে আমি তাদের কাছে আজ যে সকল উপদেশ ..., তারা সেদিন চীবরাদি যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে জনসাধারণের ... সেই সব কথাই বলবে। তারা লোভপরবশ হ'য়ে বৌদ্ধ শাসন পরিহার ... বিরুদ্ধ-ধর্মমতাবলম্বীদের সম্প্রদায়ে যোগ দেবে। মনুষ্য সমাজকে ... সেদিন আর নির্বাণের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। কী উপায়ে, ...বে মিষ্টবাক্য ও স্তুতিবাদের দ্বারা ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের ... কিছু দান পাওয়া যেতে পারে তারা কেবল সেই চেষ্টাই করবে। ...কে পরকালের ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মতিগতি কিসে ... শ্রমণদের দান করবার পুণ্য সঞ্চয়ে প্রোৎসাহিত হয়ে ওঠে, ধর্ম ...দেশ দেবার সময় তারা কেবল এই চেষ্টাই করবে। অনেক ধর্ম...যক হাটে-বাজারে রাজপথের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণ বা রজতমুদ্রার ...জে জনসাধারণকে ধর্মকথা শোনাবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ ...পদেশের মূলে নির্বাণরূপ মহামূল্য বস্তুও তারা চীবরাদি সামান্য উপকরণ ও তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতে প্রবৃত্ত হবে। তারাই পচা ঘোলের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করতে চাইবে। তবে নেই মহারাজ। সেদিন আপনি ও আমি কেউই থাকবো না। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন শুনি—

মহারাজ বললেন—অত্যাশ্চর্য আমার এই দ্বাদশ স্বপ্ন প্রভু,

"দেখিনু চাহিয়া এক জলাশয় জলে
অলাবুর শূন্যপাত্র ডুবিল অতলে!"

প্রভু বললেন—এ ব্যাপারও আজ থেকে বহু বর্ষ পরে ঘটবে! দেশের শাসকেরা সেদিন ধর্মবিরোধী হবে। পৃথিবী বিপথে চালিত হবে। সদ্বংশসম্ভূত অভিজাত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপরিচালকেরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন। যারা অকুলীন, সামান্য সাধারণ লোক, তারাই সেদিন রাষ্ট্রে সম্মানিত হবে। তারাই দেশে প্রভুত্ব করবে ও শাসনকার্যে অংশ নেবে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশগৌরবে ধন্য ব্যক্তিরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। নগণ্য লোকেরাই রাষ্ট্রপরিষদে, মন্ত্রণাসভায়, বিচারালয়ে সর্বত্রই শূন্য অলাবুপাত্র সদৃশ তুচ্ছ ব্যক্তিরাই প্রধান হয়ে উঠবে। তাদের কথাই গণ্য হবে। যেন তারাই একেবারে সকল বিষয়ে অতলস্পর্শী জ্ঞান নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও দেখা যাবে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুশ্রমণদের মধ্যে কোনও বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে যারা ভ্রষ্ট, পতিত, দুঃশীল ও পাপাচারী তারাই কর্তৃত্ব করবে। যারা প্রকৃত ধার্মিক, সুশীল ও বিনয়ী, তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। কারণ, অধার্মিকেরাই সেদিন প্রাধান্য লাভ করবে। অর্থাৎ কিনা, সেদিন সকল বিষয়েই যারা অন্তঃসারশূন্য অলাবুপাত্র সদৃশ সেই সকল অপদার্থ লোকেদেরই সারবান ব্যক্তি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটবে। সুতরাং আপনার কোনও ভয়ের কারণ নেই মহারাজ। আপনার ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বলুন?

মহারাজ বললেন—আমার ত্রয়োদশ স্বপ্ন অধিকতর বিস্ময়কর ভগবন্,

"নৌকাসম ভেসে যায় শিলা সুবৃহৎ,
হেরিয়া বিস্মিত, জলে ভাসিছে পর্বত!"

ভগবান বুদ্ধ বললেন—এরও ফলাফল সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে। পূর্বেই বলেছি অধার্মিক রাষ্ট্র পরিচালকেরা নগণ্য সাধারণ লোকগুলোকে সম্মান দেবে। কুলমর্যাদাহীনেরা প্রভুত্ব পাবে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দুঃখ দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকবে না। কারণ, তাদের লোকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। অতি নগণ্য সাধারণ ব্যক্তিরাই সম্মানিত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, মন্ত্রণা-পরিষদে, বিচার বিভাগে, দায়িত্বপূর্ণ দেশরক্ষা পদে কোথাও সুবৃহৎ শিলার মতো জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ভারি, সারবান, বিচারকুশল, শাসনদক্ষ অভিজাতগণকে লোকে আমোলই দেবে না। তারা বৃথাই ভেসে বেড়াবে। তারা কিছু বলবার চেষ্টা করলেও লোকে তাদের কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। ... মীরেটগুলো আবার কি সব বাজে বকছে? ...

মহাস্থবিরদের কোনও সম্মান ও মর্যাদা থাকবে না। তাঁরা কিছু উপদেশ দিতে গেলে হাস্যাস্পদ হবেন। পর্বততুল্য জ্ঞান ও মনীষা যাঁদের তাঁরা গণমনের অবজ্ঞার স্রোতে ভেসে যাবেন। আপনার কোনও ভয় নেই। বলুন চতুর্দশ স্বপ্ন কি ?

মহারাজ বললেন—চতুর্দশ স্বপ্নে দেখেছি অতি বিপরীত ঘটনা ঘটতে—

> "মহুয়া ফুলের তুল্য ক্ষুদ্র ভেক দল
> মহাবিষধর সর্পে করিছে বিহ্বল,
> তাড়া করে গিয়ে তারে নকুলের মত
> ছিন্ন পদ্মনাল হেন করিছে নিহত।"

শাস্তা বললেন—এ ঘটনাও আজ থেকে বহুকাল পরে ঘটবে। তখন পৃথিবীতে লোকক্ষয় হ'তে শুরু হবে। সকল পুরুষেরাই আদি রিপুর তাড়নায় তরুণী ভার্য্যার পদানত দাস হ'য়ে পড়বে। সংসারে ভৃত্য ও দাসদাসীরা, গৃহপালিত পশু পক্ষীরা, সোনা রূপা, হীরা জহরৎ, টাকাকড়ি প্রভৃতি সমস্ত ধনরত্নই হ'য়ে যাবে সেই সব চটুলা যুবতী স্ত্রীলোকগণেরই করায়ত্ত। স্বামীরা যদি কখনো অর্থ অলংকারাদি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানতে চান, পত্নীরা ভর্ৎসনা করে বলবেন—'যেখানেই থাকনা ! তোমাদের সে খোঁজে কি দরকার ? তোমরা যে যার নিজের কাজ করগে যাও।' আরও নানা বিষয়ে স্বামীরা যখন তখন পত্নীদের কঠিন ভর্ৎসনা ও তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হবেন। অর্থাৎ, বীর্যবান শক্তিশালী পুরুষেরাও সেদিন অবলা ক্ষুদ্র নারীদের চরণ তলে ক্রীতদাস হ'য়ে স্বীয় আত্মাভিমান হারাতে বাধ্য হবেন। তাদের অবস্থা হবে ঠিক তেমনি—যেমন ভেকের দ্বারা কালসর্পের দুর্গতি হ'তে দেখেছেন আপনি স্বপ্নে ! এজন্য আপনার এখন কোনও অনিষ্টেরই আশংকা নেই জানবেন। আপনার পঞ্চদশ স্বপ্ন কি বলুন।

মহারাজ বললেন—পঞ্চদশ স্বপ্নটিও নিতান্ত এক হাস্যকর ব্যাপার !—

> "দশবিধ অমঙ্গল যুক্ত গ্রাম্য কাক
> অধার্মিক বলি যার আছে নাম ডাক,
> হেরিলাম চলে যেন মহাগর্বেস্ফীত
> স্বর্ণ-পক্ষ রাজহংসে হয়ে পরিবৃত !"

বুদ্ধদেব বললেন, মহারাজ ! এও অতি দূরকালের সম্ভাব্য চিত্র। তখন আপনিও থাকবেন না, আমিও না। সেদিন অলস ও বিলাসী এবং চরিত্রভ্রষ্ট রাষ্ট্রপরিচালকেরা দুর্বল ও দেশরক্ষায় অক্ষম হ'য়ে পড়বেন। রণক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করতে ভুলে যাবেন। অস্ত্রের ব্যবহার দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে বিস্মৃত হবেন। পাছে রাজশক্তি তাঁদের হস্তচ্যুত হ'য়ে পড়ে এই ভয়ে রাজ্যের মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশীয়দের কোনও ব্যাপারেই প্রভুত্ব করবার সুযোগ দেবেন না। তাঁরা যত সব নীচকুলোদ্ভব নিম্নশ্রেণীর হীনবুদ্ধি লোকগুলোকে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োগ করবেন। এর ফলে, রাজ-অনুগ্রহ বঞ্চিত দেশের সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়েরা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হ'য়ে নিরুপায়ের মতো কাক-পরিচর্যারত স্বর্ণ-পক্ষ রাজহংসদের ন্যায় জাতিদ্রোহীর সেই অকুলীনদেরই উপাসনা করতে বাধ্য হবে। মাভৈঃ মহারাজ, আপনি ষোড়শ ও শেষ স্বপ্নটি এইবার ব্যক্ত করুন।

মহারাজ বললেন—ভগবান ! এই ষোড়শ ও শেষ স্বপ্ন একেবারে অবিশ্বাস্য :—

> "এতকাল জানিতাম বাঘে খায় ছাগ,
> স্বপ্নে দেখি বিপরীত—ছাগে খায় বাঘ !
> ছাগ হেরি বাঘ দূরে পলাইছে ডরে,
> ভয় পায়, পাছে তাকে ছাগে এসে ধরে !"

প্রভু গৌতম বললেন—আশা করি আপনি এতে ভীত হননি মহারাজ ! এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এসব সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। এ সেই অনাগত কোনও যুগে দেখা যাবে, যখন দেশের শাসক থেকে নিম্নপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালকেরা সকলেই অধার্মিক সত্যভ্রষ্ট ও নষ্ট চরিত্র হ'য়ে উঠবে, যত সব নীচ অকুলীন ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রভুত্ব শুরু করবে। কুলগৌরবে যারা সম্মানিত ছিলেন একদিন তাঁরা সেদিন অবজ্ঞাত ও দুর্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়বেন। অধার্মিক শাসক গোষ্ঠীর আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয়পাত্রের দল সেদিন রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। দেশের প্রাচীনবংশীয় যত ভূস্বামী জমিদারবর্গের যা কিছু ভূসম্পদ ও ঐশ্বর্য সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করার নামে তারা আত্মসাৎ করবে। ভূমি ও সম্পত্তির পুরুষপরম্পরা যাঁরা মালিক ছিলেন তাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তাদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেন। কুলমর্যাদাহীন নির্গুণ নীচেরা সেদিন স্পর্ধাভরে সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয়দের তিরস্কার ক'রে বলবে—'তোমরা উচ্ছন্ন যাও ! তোমরা দীর্ঘকাল আমাদের বঞ্চিত রেখে বংশপরম্পরায় ভোগ করেছো, আমরা আজ সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাই তোমাদের সবংশে নিধন ক'রে।' ভীত ও উৎপীড়িত ভূস্বামীরা প্রাণের ও সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে, ঠিক যেমন আপনার স্বপ্নে দেখা ছাগের ভয়ে বাঘেরা পালিয়ে ছিল। অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নীচবংশীয়দের অত্যাচারে যেমন স্থানচ্যুত হবেন, তেমনি ধার্মিকেরাও সেদিন আর সে অধর্মের রাজ্যে বাস করতে পারবেন না। অধার্মিক অসৎ মঠাধ্যক্ষগণের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত অপমানের ও বিতাড়নের আশঙ্কায় ধর্মভীরু সাধুপুরুষেরাও ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে পলায়ন করবেন সেদিন। মহারাজ, ভয় পাবেন না। এসব বহু বহু কাল পরে ঘটবে জানবেন। অবশ্য, আপনার রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা আজ ধনসম্পদের লোভে আপনাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে যে চতুষ্পথ যজ্ঞের আয়োজন করছেন এর মধ্যেই সেই ভাবী অকল্যাণের বীজ রোপণ করে যাচ্ছেন। একাজ শাস্ত্রসঙ্গত নয়, আপনার মঙ্গল প্রচেষ্টাও এর মধ্যে নেই। অর্থই তাদের কাছে আজ পরমার্থ হয়ে উঠেছে।*

---

* ('মহাস্বপ্নজাতক' হইতে)

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

...লে ভগবতীর বৈঠকখানায় বসিয়া মতিঠাকুর মহাশয় ...লাপ করিতেছিলেন। মতিঠাকুর কহিলেন—চাঁদু ত ...রিজি পড়ছে, কেমন করছে?

—মাষ্টার মশায়রা ত ভালই বললেন। এখন ভাগ্যে যা ...কে তাই হবে। বামুনের ছেলে ইংরিজি পড়ে ম্লেচ্ছ না ...য়ে যায়।

—শিক্ষা যে রকমই হোক, সেই ভাল। কোন শিক্ষাই ...ধ হয় জগতে কোনো অন্যায় কাজ করতে বলে না। ...র যদি তাই হয় তবে ইংরেজরা কি আর এতবড় দেশটা ...ল করে রাজত্ব করতে পারতো। কিছু গুণ আছেই—

ভগবতী কহিলেন—তা হতেও পারে। হলেই মঙ্গল—

মতিঠাকুর কহিলেন—গোপাল বল্‌ছিল ছেলেটাকে ...রিজি পড়াতে। তার নাকি বুদ্ধি ও ধীশক্তি আছে। ...ন্তু ইংরিজি শিক্ষা ত খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। এখন কি ...রি বলত ভগবতী। ইংরিজি পড়ালে নাকি ধনাগমের ...বিধা হয়, কিন্তু ভাবছি ধনাগমের সঙ্গে ধর্ম্মের নিগম ...া হয়।

—সেটা ভাগ্য বলেই মনে হয়। যদি পড়ে ভালই হবে, ...নে এক সঙ্গে থেকে লেখাপড়া করতে পারবে। এই ত ...দু শিগ্‌গিরই আস্‌বে। এক সঙ্গে পাঠিয়ে দেব সদরে। ...দু আর হরি এক সঙ্গেই পড়বে—

কথাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং একটা শুভদিন ...র ঠিক করিতে বাকী আছে এমন সময় নবতাঁতি ও তাঁতি ...াড়ার কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রণামান্তে ...লিসায় বসিল। ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—কি নবদা? ...ি খবর?

নব হতাশার সঙ্গে কহিল—তাঁত ত সব বন্ধ হ'তে ...লেছে—

ভগবতী এইরূপই একটা সংবাদ আশা করিতেছিলেন, ...ও তিনি প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—ধুতি শাড়ী বিক্রী ত বন্ধ হ'য়েছে, গামছা আর মশারীর থান একটু আধটু বিক্রি হচ্ছে। ঘরে ঘরে একখানা তাঁতের বেশী আর চল্‌বে না—এখন খাবো কি করে? বেয়াইদের গ্রামে ত সব দেখলাম দু'চার জন কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছে, আমরাও কি তাই করবো?

ভগবতী একটু চিন্তান্বিত হইয়া কহিলেন—তোমরা সকলেই যদি ব্যবসা কর তবে এত খদ্দের পাবে কোথায়?

—তবে?

ভগবতী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতিঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মতিঠাকুরও কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

নব পুনরায় কহিল—বেয়াই বলছিল—কলে কাপড় বোনা হয়, একটা লোকে ২০।২৫ খানা কাপড় একদিনে বুনছে—এক সঙ্গে ৫০ খানা ধুতির তানা দেওয়া চল্‌ছে। কলে সুতা কাটছে—তা হ'লে আমরা কি করে পারবো? এখন জাত ব্যবসা ছেড়ে কি করে খাবো?

মতিঠাকুর কহিলেন—সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে নব, বি... করে যে বাঁধ দেওয়া যায় তা ত বুদ্ধির অগম্য। আমিই ব... কি ব'লবো, আর ভগবতীই বা কি বল্‌তে পারে। ওর বি... সাধ্যি আছে যে তোমাদের সকলকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে?

—সে ত বুঝি ঠাকুরমশায়, কিন্তু ছেলে-পুলের হাত ধরে আমরা দাঁড়াই কোথা? তাই ভাবছি, এখন হালই ধরতে হবে। দু'চার বিঘা যা আছে তাই এখন চাষ-আবাদ করে খাই, তার পরে দেখা যাবে—গোবিন্দ ত কেরোসিনের ব্যবসা করতে লেগেছে, ছোট ভাই জলধরকে বলি কাপড়ের ব্যবসা করতে—বেঁচে থাক্‌তে হবে ত?

ভগবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—হ্যাঁ বেঁচে থাকবার জন্যে সংগ্রাম আরম্ভ হল। বেশ সুখে জাত ব্যবসা নিয়ে সকলে ছিলাম কিন্তু একি হ'ল? নতুন কি ব্যবস্থা হবে সমাজের, কেমন করে সকলে আমরা বাঁচবো কিছুই বুঝছি না। তবে নবদা জেনো, যতক্ষণ আমার কিছু থাকবে ততদিন তোমরা মরবে না। তার পরে কি হবে জানি না— দেশের যে অবস্থা হ'ল এতে প্রজা খাজনা দেবে কি করে,

আমিই বা কিসের বলে তোমাদের ভরসা দেব। তবে আপাততঃ ঐ কর নবদা—

নব ও তাহার সঙ্গীবৃন্দ উঠিয়া গেল। ভগবতী মতিঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—কেমন করে ভাঙ্গনটা এল? কেমন করেই বা এই প্লাবনটা রক্ষা করা যায়—

মতিঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—এর মীমাংসা আমাদের শাস্ত্রে নেই, তবে তোমার চাঁদু যদি নতুন শিক্ষা পেয়ে কিছু করতে পারে। তবে কলে যদি ১০ জনের কাজ একজনে করতে পারে তবে বাকী নয় জনের অন্ন মারা যাবেই। তারা বেকার হ'য়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবেই এটা সাধারণ জ্ঞানে বুঝতে পারি। আর ন'জনের রুজি মেরে কল ফেঁপে উঠবে, মালিক বড় হবে—

ভগবতী কহিলেন—কল কি চলবে—

—চল্‌ছে ভগবতী, চলছে। কলকাতায় নাকি কত কল এখনি বসে গেছে, আরও বস্‌বে। কত কলিয়ারী হ'য়েছে কয়লা উঠেছে কত—

ভগবতী কহিলেন—যারা বেকার তারা ত না খেয়ে মরবে না, আপ্রাণ চেষ্টা করবে বেঁচে থাকতে, যেমন করেই হোক চুরি ডাকাতি অধর্ম্ম যেমন করেই হোক না কেন?

মতিঠাকুর কহিলেন—হ্যাঁ, দেশময় একটা অরাজক দুর্ভিক্ষ চলবে। শাস্ত্রে আছে দুর্ভিক্ষে বিপ্লবে ধর্ম্ম থাকে না। অভাবই ত মানুষকে ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথে চালিত করে।

ভগবতী কহিলেন—তাঁতি, কুলু, কামার, কুমার সকলেরই যদি জাতব্যবসা যায় তবে তারা কি করবে? তারা কি সকলেই সৎপথে উদরান্ন সংস্থান করতে পারবে? সমাজের সর্ব্বত্র এই প্লাবন ধাক্কা দিয়েছে—একটা ওলট-পালট হবে বলেই মনে হ'চ্ছে—

মতিঠাকুর কহিলেন—হবে নয় ভগবতী—হ'চ্ছে। ভরত আহুরী ত খাদে কাজ করতে গিয়েছিল কিন্তু এ সব গাঁ থেকে কেউ কোন দিন ত যায় নি। সবই দয়াময়ের ইচ্ছা—তা কে রোধ করবে—

মতিঠাকুর ও ভগবতী উভয়েই ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে

ধান কাটা সুরু হইয়াছে—

ভরতের গৃহনির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে, সামান্য [illegible] বাকী তাহা ধীরে সুস্থে পরে করিলেও ক্ষতি নাই। [illegible] ধান কাটিয়া মাঠে রাখিয়া আসে—সকলের জমিতেই [illegible] ধান পড়িয়া থাকে। ধীরে ধীরে শুকাইয়া ভিজা ধান [illegible] হইলে তবে গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া আসিতে হইবে। ভরতের টাকা নিঃশেষ হইয়া গেলেও ভরতের আনন্দ [illegible] —ধান যাহা হইয়াছে তাহাতে বৎসর কাটিবে, সামান্য [illegible] লাগিবে তাহা মজুর খাটিয়া অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবে। অতএব সে এখন সারাদিন ধান কাটে এবং রাত্রে আনন্দে মদ্যপান করিয়া গান করে—আহুরী তাহার বিকল স্বামীর বিকৃত গানের সুর শুনিয়া হাসে।

মাঘের শীতে শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া তাহারা দেহ উষ্ণ করে—ফাগুনে ধান ঝাড়িয়া ঘরে তুলিয়া খড়ের পাইল দেয়—চৈত্রে প্রাচুর্য্যের মাঝে গরু লইয়া শুষ্ক তৃণশূন্য মাঠে শালবনে চরাইয়া বেড়ায়। চৈত্রের শেষে গাজনে মাতিয়া পথে বিপথে পড়িয়া থাকে—উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ মাঠের উপর দিয়া বহিয়া যায়। তাহার মাঝে তাহারা নেশার ঘোরে গ্রাম গ্রামান্তরে গান গাহিয়া—সং দিয়া ফিরে—সংক্রান্তির মেলায় যাইয়া নাচে—তাহার পর আসে রুদ্র রুক্ষ বৈশাখ—পৃথিবীর মাটি রৌদ্রে ফাটিয়া চৌচির হয়, ধরিত্রীর বুকে কম্পমান বায়ুস্তর মরীচিকার সৃষ্টি করে, উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ দেহ পোড়াইয়া, তরুণ পল্লবকে ঝলসাইয়া বহিয়া যায়। গৃহবধূগণ ছায়াঘন বট অশ্বথ বৃক্ষে সমগ্র বৈশাখ ধরিয়া জলসেচ করে। এইগুলি পুণ্য কার্য্য, বটের ডালকাটা পাপ, বৃক্ষরোপণ পুণ্য কাজ ইহা তাহারা জানিয়াই পরকালের মোহে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষা করিয়া যায়—তাহার আকর্ষণে হয় প্রচুর বারিবর্ষণ—আনন্দে ভিজিয়া তাহারা ভূমিকর্ষণ করে—সোনার ধান ফলায়—এমনি করিয়াই গিয়াছে বৎসর—যুগযুগান্ত—

বৈশাখের মাঝামাঝি একদিন বৈকালে আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর মাতামাতি। গরুগুলি কালো ঘন মেঘ দেখিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল—তালগাছ দোলাইয়া, শালবনে আন্দোলন তুলিয়া আসিল ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু [illegible] ভিজাইয়া সরস করিয়া দিল আকাশের মেঘ। পৃথিবী

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ভরত গাঁইতি কাঁধে করিয়া কহিল, াদুরী তু চল, হিজুলবনের জমি তুলবেক আজ, চল—
—আজ কোথা যাবি তু? জল কোথা?
—হ্যাঁ রে, চল—মাটি ত নরম হ'ল বটে,—এবার গাঁইতি বক—চল—দুবিঘা তুলবেক এখন—আদুরী চোখে জল দিয়া ঘর হইতে কিছু মুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া ।—চল—র াঁধবেক নাই?
—তু রাঁধবেক, বেলা হ'তে দে—
দুইজনে আবার চলিল—ভূত্বকের উপর গাঁইতি চালাইতে, মৃত্তিকাকে করিতে স্বর্ণপ্রসূ। ভরত আবার গাঁইতি য়, আদুরী পাথর কুড়াইয়া আইলের বাঁধ দেয়, ভরতের মুখে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। সে মনে বলে—কয়লা আর ভাঙবেক নাই—কালি আর বক নাই।

অম্বুবাচী নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে, আষাঢ়ের মাঝামাঝি। উপযুক্ত বর্ষণ বিনা চাষের কাজ বন্ধ হইয়া আছে। কি বীজ তলায় বীজ বপন করা হয় নাই। চারিপাশে চ্ছে হাহাকার—গ্রামে গ্রামে ইতর ভদ্র মিলিয়া কীর্ত্তন তেছে—চতুঃপ্রহর অষ্টপ্রহর—কিন্তু তথাপি বৃষ্টি হয় নাই। সেদিন সকলে মিলিয়া মতিঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে ত হইল—এই অনাবৃষ্টির একটা কিছু বিহিত ব্যবস্থা, নইলে দেশে ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। মতি মহাশয় কহিলেন—আমার যাহা সাধ্য, শাস্ত্রোক্ত বিধি বেশ্যই করবো। তোমরা নারায়ণকে ডাকো—তিনি য় নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন—আমি কাল উদয়াস্ত পাঠ করবো—ভয় কি?
সকলে সাহস পাইয়া ফিরিয়া আসিল—ঠাকুর মশায় বলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।
সেইদিনই বৈকালে সকলে চণ্ডীতলা পরিষ্কার করিয়া, ইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া রাখিল।
পরদিন উদয়াস্ত চণ্ডী পাঠ হইবে। অতি প্রত্যূষে মতি- ও গোপাল আসিয়া সংকল্প বাক্য পাঠ করিয়া চণ্ডী আরম্ভ করিলেন! গোপাল মাঝে মাঝে চণ্ডী পাঠ া ঠাকুর মহাশয়কে বিশ্রাম দিবে। সকাল হইতেই জন সমবেত হইতে লাগিল, পূজা স্থানে নৈবেদ্য সিধা চ আসিতে লাগিল।

অপরাহ্নের দিকে মতি ঠাকুর মহাশয় ভক্তি ভরে সাশ্রু- নেত্রে চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন, ভগবতী অদূরে আসনে বসিয়া চণ্ডী শ্রবণ করিতেছেন। গাছতলায় অপর দিকে ছোটলোকেরা বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে মায়ের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করিতেছে। ভগবতী থাকিয়া থাকিয়া আকাশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, পূর্ব্ব দক্ষিণকোণে একখানা কালো মেঘ যেন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। ভগবতী আশান্বিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেইখানেই বার বার দেখিতেছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় উদাত্ত কণ্ঠে দেবীর মহিমা পাঠ করিতেছেন, এমনি সময়ে একটা হাওয়া ছাড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মেঘখানা বায়ু চালিত হইয়া যেন উঠিতে লাগিল। ভগবতী কহিলেন—এই তোরা ছাতা নিয়ে আয়, চণ্ডীমা আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন বোধ হয়।

কয়েকজন ছুটিয়া গিয়া কয়েকখানা তালপাতার ছাতা লইয়া আসিল। ততক্ষণে নিবিড় কালোমেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে এবং প্রবল বায়ুর সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভগবতী ছাতা হাতে করিয়া ঠাকুর মহাশয় ও পুঁথিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সবই বৃথা। প্রবল ঝাপ্টার সঙ্গে বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিল—পুঁথিপত্র, সিধা নৈবেদ্য সব ভাসিয়া যায় আর কি!

ভগবতী কহিলেন—এখন কি করা যায়? ওরে তোরা বড় বড় তালপাতা নিয়ে আয় সব। ঠাকুর মশায় ভিজে যাচ্ছেন—

মতিঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ব্যস্ত হবার কিছু নেই—ভিজলে কি হয়েছে। উদয়াস্ত সংকল্প আছে, এত সন্ধ্যার আগে বন্ধ হতে পারে না।

পুঁথির অক্ষর দেখা যায় না, কিন্তু ঠাকুর মশায় নিজের অভ্যাস বশতঃ পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আষাঢ়ের প্রথম আকম্পিত বর্ষণে অন্য সকলে বার বার চণ্ডীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইল। সকলে ভক্তিসহকারে ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

পরদিন হইতে দ্রুত কাজ আরম্ভ হইল। বীজতলা চাষ দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইল, জমিচাষ করিয়া বপনোপযোগী করা হইল। দিবারাত্রি সমানে কাজ চলিল।

ভরত তাহার নূতন জঙ্গলে জমি চাষ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল। ক্রমশঃ

আমিএল (১৮২১-১৮৮১)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

১৮৮২ সালে জেনেভায় হেনরি ফ্রেডারিক আমিয়েলের ফরাসী ভাষায় লিখিত দিনপঞ্জী প্রকাশিত হয়। দিনপঞ্জীর লেখক আমিএল জেনেভায় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপনা অথবা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি-লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দিনপঞ্জী প্রকাশিত হইলে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও ধর্ম্মে অচল নিষ্ঠায় সকলে মুগ্ধ হন এবং সমগ্র ইয়োরোপে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রেঁণার মতে আমিএলের দিনপঞ্জী তৎকালে প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থদিগের অন্যতম। ইহা জগতের সাহিত্যে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু

একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে ঈশ্বরকে পাওয়া ও তাঁহাকে বোধ করা। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সকল শক্তি, সমস্ত বাহ্য সম্পদ, ঈশ্বরের সামীপ্য-প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়, ঈশ্বরকে ভোগ করিবার এবং পূজা করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি। যাহা বিনশ্বর, তাহা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহা সনাতন এবং অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, কেবল তাহার সহিতই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে এবং অন্য যাবতীয় বস্তু ঋণ-বদ্ধ বস্তুর মতো ভোগ করিতে আমাদিগকে শিখিতে হইবে। যাহা ঘটিবার ঘটুক, মৃত্যু আসে তো আসুক; কিন্তু নিজের সহিত শান্তিতে বাস কর, ঈশ্বরের সামীপ্য ও সাযুজ্য ভোগ কর এবং যে সকল সার্ব্বিক শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিবার সামর্থ্য তোমার নাই, তোমার জীবন-পরিচালনার ভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত কর। মৃত্যু যদি বিলম্বে আসে ভালো, যদি অচিরে আসে, আরও ভালো; যদি অর্দ্ধমৃত্যু আমাকে অভিভূত করে, তো আরও ভালো; কেননা তাহা হইলে (পার্থিব) সফলতার পথ আমার নিকট রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং বীরত্বের পথ, নৈতিক মহত্বের পথ এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভরের পথ উন্মুক্ত হইবে। যখন ঈশ্বরের বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সচেতনভাবে তাঁহার মধ্যে বাস করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

ঈশ্বর-প্রাপ্তি

হে আমার ঈশ্বর, তোমার সান্নিধ্যে আমি যে এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার ইচ্ছা আমার নিকটে আসিয়াছিল; আমি আমার ত্রুটিগুলির পরিমাপ করিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার দয়া অনুভব করিয়াছিলাম। আমি যে কত নগণ্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমি তোমার শান্তি আমাকে করিয়াছিলে। তিক্ততার মধ্যেও মিষ্টতা আছে, আত্মসমর্পণের মধ্যে আছে, শাস্তিদাতা ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমময় ঈশ্বর আছেন।

পাইবার জন্য জীবন-ত্যাগ, সমস্ত অধিকার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন, নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া প্রতীয় হয়, কিন্তু ইহা মহৎ সত্য। যে কষ্টভোগ করে নাই, সুখ কি, তাঁ সত্য জ্ঞান তাহার নাই। মুক্তির জন্য যাহারা নির্ব্বাচিত হ তাহাদের অপেক্ষা পাপ হইতে যাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়[২] তা অধিকতর সুখী।

ব্যক্তির জীবন ও মায়া

ব্যক্তির জীবন কি? একটা সনাতন ব্যাপারের প্রকারভেদ মা জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ, অনুভব, আশা, ভালবাসা, কষ্টভোগ, ক্রন্দ মরণ। ইহার সঙ্গে কেহ কেহ ধনী হওয়া, চিন্তা করা, জয়লাভ ক যোগ দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা যতই চেষ্টা ক কেন, তাহাদ্বারা আমাদের অদৃষ্ট-প্রবাহে ন্যূনাধিক তরঙ্গমাত্রই অ সৃষ্টি করিতে পারি।......ব্যক্তির অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব সমগ্রের তু এতই সামান্য ব্যাপার, যে তাহার প্রত্যেক কামনা ও প্রত্যেক অভিযে হাস্যজনক। আমাদের পৃথিবীর জীবনে সমগ্র মানবজাতি ক্ষণ দীপ্তিমান এবং এই গ্রহ বায়বীয় অবস্থায় ফিরিয়া গেলেও তাহা ক্ষণকালের জন্যও অনুভব করিবে না। ব্যক্তি অভাবের ক্ষুদ্রতম অংশ।

তাহা হইলে প্রকৃতি কি? প্রকৃতি "মায়া"—অর্থাৎ প্রতিভা বিরামহীন, ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন প্রবাহ, যাবতীয় সম্ভাবনার প্রকাশ যা সংযোগের অফুরন্ত খেলা।

মায়া কি অন্য কাহারও—কোনও দ্রষ্টা ব্রহ্মের—আমোদের জন্য প্রদর্শন করিতেছে, অথবা ব্রহ্মই কোন স্বার্থহীন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন? জীবাত্মার সৃষ্টিদ্বারা স্বাধীন পুরুষ আপনাকে বিভক্ত করিয়া স্বকীয় পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করা, ই কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য? এই কল্পনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ইহা অধিকতর কি? আমাদের নৈতিক বোধদ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। মানুষ মঙ্গলের ধারণা করিতে সক্ষম, তখন জগতে অনুস্যূত যে তত্ত্ব, তাহা মঙ্গলময়, তাহা বলিতে হইবে। কেননা তাহা মানুষ অপেক্ষা

---

(১) Elect. (২) Redeemed. (৩) Nothi

পারে না। যে দর্শন বলে সকলই প্রতিভাস ও মূল্যহীন এবং মূল্যহীন বস্তুজগৎ হইতে উদ্ভূত, তাহা অপেক্ষা যে দর্শনে পরিশ্রম, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও চেষ্টার মূল্য স্বীকৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে খেয়ালী মায়া সনাতন চিন্তারূপী ব্রহ্মের অধীন এবং ব্রহ্মও স্বয়ং ঈশ্বরের অধীন।

ব্রহ্মের স্বপ্ন

এক দার্শনিক আলোচনা সভায় বৈজ্ঞানিক এডোয়ার্ড ব্লাপারিড্ বলিয়াছেন "একমাত্র অহমেরই অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্ব সেই অহমেরই প্রক্ষেপণ—ছায়াবাজি, যাহা আমরাই সৃষ্টি করি, অথচ সৃষ্টি করিয়া বুঝিতে না পারিয়া ভাবি, যে আমরা তাহা দর্শন করিতেছি।.. সুতরাং আমাদের জাগ্রত অবস্থা অধিকতর সংহত স্বপ্ন মাত্র। অহমের মূল অজ্ঞাত, অদৃষ্ট বশে তাহা হইতে অসীম সংখ্যক অজ্ঞাত পদার্থের উদ্ভব হয়।" সংবিদ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, ইহাই বিজ্ঞানের শেষ কথা। যাহা বুদ্ধিহীন, তাহা হইতে বুদ্ধিমানের উদ্ভব হয়—পুনশ্চ তাহাতেই ফিরিয়া যাওয়া। অহং অনহমের কল্পনা করিয়া আপনার ব্যাখ্যা করে। প্রকৃত পক্ষে অহং স্বপ্নমাত্র, স্বপ্নে আপনার স্বপ্নের স্বপ্ন দেখে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির বিলোপ সাধন সম্ভব নহে। শেলিংএর দর্শনের ইহা হইতেই আরম্ভ। শারীর বিজ্ঞানের দিক হইতেও প্রকৃতি অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি—শারীরিক গঠনের ফল। এই ইন্দ্রজাল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় অহমের ধর্ম্মবিবেক হইতে উদ্ভূত কর্ম্ম। সদৃশ কর্ম্মে অহং আপনাকে স্বাধীন কারণ বলিয়া অনুভব করে। আপনার দায়িত্ব বোধ দ্বারা অহং কুহক জাল ছিন্ন করিয়া মায়ার যাদু গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া আসে। মায়া! বাস্তবিক মায়াই কি সত্য দেবতা? জ্ঞানী হিন্দুগণ বহুদিন পূর্ব্বে জগৎকে ব্রহ্মের স্বপ্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ফিকটের সঙ্গে আমরাও কি জগৎকে প্রত্যেক অহমের ব্যক্তিগত স্বপ্ন বলিয়া গণ্য করিব? তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্খই অসীমের ছত্রতলে বিশ্বরূপ বাজির সৃষ্টিকর্ত্তা—বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা হইলে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বৃথা চেষ্টার প্রয়োজন কি? অধিকাংশ স্বপ্নেই আমরা আপনাদিগকে সর্ব্বব্যাপী, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করি। স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা জাগ্রত অবস্থায় আমরা কি তবে কম কৌশলী ও সৃজনক্ষম?

মানব দর্শন[১] ও খৃষ্ট ধর্ম্ম

রুজের Die Academic পড়িলাম। কুনো ফিসার, কোলাচ্ প্রভৃতি নব্য হেগেলীয়দিগের প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে। পড়িয়া গত শতাব্দীর এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়িল। তাহারা যুক্তি ও বিচারদ্বারা সকলই বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু নূতন কিছু গঠন করিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না। গঠন নির্ভর করে অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর। ইঁহারা দার্শনিক জ্ঞানকে সাধন-শক্তি[২] এবং বুদ্ধির উন্নয়নকে হৃদয়ের উন্নয়ন মনে করিয়া ভুল করেন।...এই গ্রন্থের লেখকগণ ধর্ম্মের স্থানে দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব মানুষ এবং তাঁহাদের মতে মানুষের বুদ্ধিই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। তাহাদের ধর্ম্ম বুদ্ধির ধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম ইচ্ছার পরিবর্ত্তন দ্বারা মুক্তি আনিতে চায়, মানব-দর্শন মুক্তি আনিতে চায়—বুদ্ধির বন্ধন-মুক্তি দ্বারা।...উভয়েই মানুষকে তাহার আদর্শে পৌছাইয়া দিতে চায়। কিন্তু আদর্শের ভেদ আছে, আদর্শের আধেয়ের মধ্যে ভেদ না থাকিলেও, তাহার স্থান নির্দ্দেশে ভেদ আছে। অন্তর্নিহিত শক্তির এক অংশ মানব দর্শনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্য অংশ খৃষ্ট ধর্ম্মে।...খৃষ্ট-ধর্ম্ম চায় গুণের উৎকর্ষ বিধান দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতে, মানব-দর্শন চায় জ্ঞানালোক দ্বারা গুণের উৎকর্ষ বিধান করিতে—খৃষ্ট ও সক্রেটিসের মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য।

কিন্তু প্রধান সমস্যা হইতেছে পাপের সমস্যা। যাহা মানুষকে মুক্তি দেয়, তাহা কি? যাহা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হইতে সমর্থ করে, তাহা কি? তাহার মূলে দায়িত্ববোধ আছে কি না? তাহার চরম উদ্দেশ্য কি যাহা ন্যায় সংগত তাহা জানা, অথবা তাহা করা?—কার্য্য না চিন্তা? জ্ঞান হইতে যদি প্রেম উদ্ভূত না হয়, তাহা হইলে তাহা যথেষ্ট নহে। বিজ্ঞান হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে স্পিনোজার জ্ঞানভূয়িষ্ঠ প্রেম—উত্তাপবিহীন আলোক—ধ্যানমূলক আত্ম সমর্পণ। তাহা জমকাল বটে, কিন্তু অমানুষিক, কেন না তাহা অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করা অসম্ভব, তাহা দুর্লভ ও তাহাতে অতি অল্প সংখ্যক লোকের অধিকার। সুনীতির প্রেম দ্বারা মানুষের কেন্দ্র বিশ্বের মূলীভূত সত্তার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে অন্ততঃ মুক্তি তত্ত্ব এবং অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত আছে। প্রেমের ফল জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের ফল প্রেম নহে। সুতরাং বিজ্ঞান অথবা জ্ঞান ভূয়িষ্ঠ প্রেম হইতে যে মুক্তি হয়, তাহা ইচ্ছা অথবা সুনীতির প্রেম হইতে উদ্ভূত মুক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। বিজ্ঞানের মুক্তি মানুষকে আত্মাভিমান হইতে মুক্ত করিতে পারে, সুনীতির মুক্তি "অহং"কে আপনার বাহিরে লইয়া যায়, এবং তাহাকে ফলোৎপাদক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।...বিজ্ঞান যতই আধ্যাত্মিক ও সারবান হউক না কেন, প্রেমের তুলনায় তাহা নিষ্ক্রিয়। নৈতিক শক্তিই কর্ম্মের উৎস। সদৃশ বস্তুই সদৃশ বস্তুর উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম। সুতরাং তর্কদ্বারা লোককে ভাল করিতে চেষ্টা না করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা কর। অনুভূতি-দ্বারা অনুভূতি-উৎপাদনের চেষ্টা কর। প্রেমদ্বারা ভিন্ন প্রেমের উদ্বোধনের আশা করিও না। অন্যের যাহা হওয়া তুমি ইচ্ছা কর, নিজে তাহাই হও। তোমার প্রচার-কার্য্য করুক তোমার চরিত্র, তোমার কথা নয়।

দর্শন কখনও ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।...মানব-দার্শনিক-দিগের নেতিবাচক অংশ ভালোই। তাহাদ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম অনাবশ্যক বাহ্য-আচার হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু ফিউএরব্যাক্ ও রুজের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইবে না। দার্শনিকদিগের কর্ম্মের পরিসমাপ্তি

---

(১) Humaniam. (২) Realising power.

প্রেম তাহার বল। মানুষ মানুষ হয় তাহার বুদ্ধি-দ্বারা। কিন্তু মানুষ যে মানুষ, তাহার মূলে তাহার হৃদয়। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন দ্বারা জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

গণতন্ত্র

টকেভিলের De la Democratie en Amerique পড়িলাম।… পড়িয়া মনে এক প্রকার শান্তির উদ্ভব হইলেও একটা বিরাগেরও উৎপত্তি হয়। আমাদের চতুর্দ্দিকে যাহা ঘটিতেছে, তাহার ও আমাদের যে পরিণাম প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অপরিহার্য্যতা গ্রন্থ পাঠ করিয়া বোধগম্য হয়। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারা যায়, যে প্রত্যেক বিষয়ে মাধ্যমিক অবস্থার যুগের[১] আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থা সমস্ত কামনা প্রতিহত করে। সাম্য হইতে একবিধতার উদ্ভব হয়। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ, তাহা ধ্বংস করিয়া, যাহা নিকৃষ্ট তাহা উদ্ভূত হয়। সমষ্টির অসভ্যতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎকর্ষের লাঘব হয়।

মহৎ লোকের যুগ চলিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে বল্মীকের যুগ—বহুধা বিভক্ত প্রাণের যুগ—আরব্ধ হইতেছে। যদি সাম্যবাদ জয়লাভ করে, তাহা হইলে আর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হইবে না। অনবরত সমাজে সাম্য-স্থাপনের প্রচেষ্টা ও শ্রমবিভাগ-দ্বারা সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে, মানুষের কোনও মূল্য থাকিবে না। পর্ব্বত হইতে নিম্নে প্রবাহিত প্রস্তর-খণ্ড ও মৃত্তিকা-দ্বারা উপত্যকার উচ্চতা-বৃদ্ধি হয়। সাম্যবাদ-দ্বারাও "গড়ে" উন্নতি হইলেও, মহত্তের ক্ষতি করিয়াই সে উন্নতি সাধিত হইবে। যাহা অসাধারণ, তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না।… যাহা কাজে লাগে, তাহা সুন্দরের স্থান অধিকার করিবে। শিল্প অধিকার করিবে কলার স্থান, অর্থ-নীতি ধর্ম্মের স্থান এবং পাটিগণিত কবিত্বের স্থান।…

ইহাই কি গণতান্ত্রিক যুগের পরিণাম? সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই মূল্য কি অত্যধিক নহে। যে সৃষ্টিশক্তি অনবরত ভেদের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাই, তাহা কি তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিবে এবং এক এক করিয়া সকল ভেদের বিনাশ করিবে? যে সাম্য সৃষ্টির আদিতে ছিল—গতিহীন নিষ্ক্রিয়তা ও মৃত্যু—তাহাই কি প্রাণের স্বাভাবিক রূপ হইবে? অথবা যে রাজনৈতিক এবং আর্থিক সাম্য সমাজ-তন্ত্রবাদী ও অ-সমাজ-তন্ত্রবাদিগণের কাম্য এবং যাহা তাহাদের প্রচেষ্টার শেষ সীমা বলিয়া প্রায়ই পরিগণিত হয়, তাহার উপরে একটি "মনের রাজ্য" একটি পবিত্র আশ্রয়ের স্থল,[২] একটি মানবাত্মার সাধারণতন্ত্র[৩] কি উত্থিত হইবে না, যেখানে অধিকার ও হীন উপযোগের সীমার বাহিরে সৌন্দর্য্য, ভক্তি, পবিত্রতা, বীরত্ব, উৎসাহ, অসাধারণত্ব ও উপাসনা অসীম ও স্থায়ী বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে? উপযোগমূলক জড়বাদ, বন্যা সমৃদ্ধি, দেহের এবং অহমের পূজা, যাহা কি তাহার ও অর্থের পূজা—ইহারাই কি আমাদের প্রচেষ্টার শেষ হইবে? মানব-জাতির প্রচেষ্টার শেষ পুরস্কার হইবে? আমি বিশ্বাস করি না। মানব-জাতির আদর্শ ইহা হইতে ভিন্ন ও উচ্চ। কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ জৈব প্রবৃত্তিকে প্রথমে তৃপ্ত করিতে এবং যে কষ্ট অ-বশ্য নহে, যাহা সামাজিক ব্যবস্থার ফল, তাহা বিদূরিত করিয়া আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে আমরা নিশ্চয়ই ফিরিব।

হার্টমানের দর্শন

হার্টম্যানের Philosophy of the Unconscious গ্রন্থের জগতের সৃষ্টি একটি ভুল। ভীষণ মত! অসত্তা হইতেও জগৎ জীবন হইতে মৃত্যু ভাল!…আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস-বশতঃ জীবনের ভীষণত্ব আমরা দেখিতে পাই না এবং জীবনে দুঃসহ হইয়া উঠে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অস্তিত্বকে বলিতে হয় একটা এবং জীবনকে বলিতে হয় অমঙ্গল-স্বরূপ! তাহা হইলে আত্মা আত্মহত্যা, অথবা বুদ্ধ ও সোপেনহরের মতো জীবন ও পুনর্জন্মের হেতুভূত আশা ও কামনার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করাই শ্রেয় যাহাতে তাহারা পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে। ইহাই তো সমস্ত মৃত্যু তো পুনরারম্ভ। কিন্তু সম্পূর্ণ বিনাশই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের যাবতীয় কষ্টের মূল ব্যক্তিগত সংবিদ্! সেই সংবিদের প্রতি বর্জ্জন করিতে হইবে। কি ভীষণ ঈশ্বর-নিন্দা! কিন্তু কর্ত্তব্য ও মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের মধ্যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত ব্যক্তিগত ইচ্ছার মিলনের মধ্যে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার মূলে আছে প্রেম, এই বিশ্বাসের মধ্যেই মুক্তি নিহিত আছে।

যোগের অনুভূতি

গভীর শান্তি! ভিতরে বাহিরে শান্তি!…ভাবাবেগের যাহাই হউক না কেন, মৌন ধ্যানের সময় যখন আমরা ধ্যানসুখের ক্ষণিক দর্শন ও আস্বাদ প্রাপ্ত হই, তখনকার মাধুর্য্যের ইহার তুলনা হয় কিনা, আমি জানি না। কামনা ও ভয়, বিপদ উদ্বেগ তখন থাকে না। অস্তিত্ব তখন তাহার সরলতম রূপে বিশুদ্ধ আত্ম-সংবিদে পরিণত হয়। ইহা সামঞ্জস্যের অবস্থা; কোন কোন টান নাই, চাঞ্চল্য নাই—মৃত্যুর পরে আত্মার যে অবস্থা হয়, হয়তো সেই অবস্থা। প্রাচ্যদেশবাসিগণ সুখ বলিতে যাহা বোঝে, সেই সুখ—যাহাদের কোনও চেষ্টা নাই, কামনাও নাই, যাহারা পূজা করে এবং পূজার আনন্দ ভোগ করে, সেই সন্ন্যাসীদিগের এই অবস্থা বর্ণনা করিবার উপযোগী ভাষা পাওয়া কঠিন।…তখন সকল তাহাদের তত্ত্বের মধ্যে বিলীন হয়, স্মৃতি স্মৃতির মধ্যে হয়। আত্মার তখন আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের বোধ থাকে তখন সার্ব্বিক প্রাণের অনুভব হয়—ঈশ্বরের সূক্ষ্মতম

---

(১) Era of mediocrity. (২) Church of Refuge,

অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় সত্তার আনন্দ অসত্তার নিদ্রার সহিত মিশিয়া যায়। ইহা পরিচিন্তন নহে, ইচ্ছাও নহে, ইহা স্থির জীবন ও সুনীতির জীবন উভয়েরই ঊর্দ্ধে; ইহা একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন। প্লটিনাস্ ও প্রোক্লাস যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, ইহাই তাহা—যোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ। পাশ্চাত্ত্যগণ, বিশেষতঃ আমেরিকাবাসিগণ, এই অনুভূতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিরামহীন কর্ম্মই তাহাদের জীবন। অর্থ ও ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব-লাভের জন্য তাহারা লালায়িত। তাহাদের লক্ষ্য মানুষকে পিষ্ট করা এবং প্রকৃতিকে দাসে পরিণত করা।…আত্মার জীবন তাহাদের নয়। যাহা সনাতন ও অপরিণামী, তাহার প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা। তাহারা বাস করে সত্তার উপরিভাগে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।…এত প্রচেষ্টা, এত কলরব, এত সংঘর্ষ, এত লোভ কেন? ইহাদ্বারা আত্মা তো কেবল হতবুদ্ধি ও বধির হইয়া পড়ে। যখন মৃত্যু আসে, তখন তাহারা ইহা বুঝিতে পারে। তবে পূর্ব্বেই কেন ইহা স্বীকার করে না?

লাইব্‌নিট্‌জ ও হেগেল

দেহের জটিলতা ও তাহার বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বৈজ্ঞানিকের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক। আমার সত্তার সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে আমি আমার সমগ্র রূপের এবং তাহার ভঙ্গুরতার স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ অনুভূতির ফলে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। কেবল আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎকে না দেখিয়া আমি আমার নিজের বিশ্লেষণ করি।…আমার সত্তার উপরিভাগে অবস্থান না করিয়া আমি আমার অন্তরতম আত্মার মধ্যে প্রবেশ করি এবং আমার সূক্ষ্মতম কোষ ও পরমাণুদিগের জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলেও তাহাদের সমবায়ে গঠিত অংশ-পুঞ্জের—পেশীদিগের—জ্ঞান লাভ করি। আমার কেন্দ্রস্থিত মনাদ অধীনস্থ মনাদদিগের হইতে স্বতন্ত্র হয়—তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার মধ্যে সংগতি দেখিবার উদ্দেশ্যে।

শরীরের স্বাস্থ্য আমাদের দেহ ও তাহার অংশদিগের সহিত বাহ্য জগতের সাম্য-রক্ষা করে এবং বাহ্য জগতের জ্ঞান-লাভে সহায়তা করে। যখন স্বাস্থ্য-হানি হয়, তখন আমরা নূতন আধ্যাত্মিক সাম্যের সন্ধানে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হই। তখন আমাদের দেহের গঠনই আমাদের চিন্তার বিষয় হয়। তখন দেহে আত্মবোধ থাকে না। তখন দেহ জীবন-যাত্রার নৌকারূপে প্রতিভাত হয়—যে নৌকার দুর্ব্বল অংশ এবং গঠন তখন আমাদের গোচর হয়, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার একত্ব-বোধ থাকে না।

আত্মার চরম বাসস্থান কি? চিন্তা অথবা সংবিদ? কিন্তু সংবিদের নিম্নে তাহার বীজ অর্থাৎ স্বতঃক্রিয়ার[১] উৎস; কেন না সংবিদ আদিম নহে, তাহার উৎপত্তি হয়। প্রশ্ন এই—চিন্তাশীল মনাদ কি তাহার আবরণের মধ্যে অর্থাৎ অবিমিশ্র স্বতঃক্রিয়ার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে?—শক্যতার অন্ধকারময় গহ্বরে ফিরিতে পারে? আমি আশা করি, তাহা পারে না। রাজ্য যায়, কিন্তু রাজা থাকে। রাজপদই কি কেবল স্থায়ী অর্থাৎ "Idea"ই কি কেবল থাকে? ব্যক্তিত্ব কি অবিনশ্বর আইডিয়ার পরিবর্ত্তনশীল পরিচ্ছদ মাত্র? হেগেল ও লাইব্‌নিট্‌জের মধ্যে কাহার কথা সত্য? আত্মিক দেহে ব্যক্তি কি অমর? ব্যক্তিগত আইডিয়ারূপে সনাতন? সেণ্ট পল ও প্লেটোর মধ্যে কাহার দৃষ্টি সত্য? লাইবনিট্‌জের মত আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর, কেননা এই মতে অনন্ত জীবন এবং অসীম অভিব্যক্তির দ্বার উন্মুক্ত। যে মনাদের মধ্যে বিশ্বের বীজ নিহিত, তাহার অন্তস্থ অসীমের বিকাশের জন্য অনন্ত কালও অতিরিক্ত নহে। তবে বাহ্য প্রভাব তাহার জন্য স্বীকার করিতে হয়।

শিশুর নিদ্রা

একাকী জাগিয়া রহিলাম। দুই তিন বার শিশুদিগের ঘরে যাইলাম। হে শিশুমাতৃগণ, আমার মনে হইল আমি তোমাদিগকে বুঝিতে পারিয়াছি। নিদ্রা জীবনের রহস্য—নৈশ আলোক-বর্ত্তিকার আলোকভিন্ন এই অন্ধকার এবং দুইটি শিশুর ছান্দিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা পরিমিত এই নীরবতার মধ্যে গভীর মনোহারিত্ব আছে। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, যে আমি প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। সশ্রদ্ধভাবে আমি চাহিয়া রহিলাম। শিশু-শয্যার এই কবিত্ব—পরিবারের প্রতি এই প্রাচীন এবং নিত্য নূতন আশীর্ব্বাদ—ভাবাপ্লুত ও স্তব্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমি নীরবে কান পাতিয়া বসিয়া রহিলাম। ঈশ্বরের পক্ষতলে নিদ্রিত সৃষ্টি, চিন্তার ভার-মুক্ত বিশ্রামাভিলাষী সংবিদের অন্ধকারে অপসরণ, জীবনভার-মুক্ত বিশ্রাম-লোলুপ আত্মার ঈশ্বর-দত্ত শয্যারূপ মৃত্যু—ইহাদেরই প্রতীক নিদ্রা। আমাদের ভাবাবেগদিগকে ছাঁকিয়া নির্ম্মল করা, জীবনকে ক্লেদমুক্ত করা, জীবাত্মার জ্বরচাঞ্চল্য শান্ত করা, প্রকৃতি-মাতার বক্ষে ফিরিয়া গিয়া সেখান হইতে সুস্থ এবং সবল হইয়া বাহির হওয়া ইহাই নিদ্রা। দোষ-মুক্তি ও বিশুদ্ধীকরণই নিদ্রা। যিনি হতভাগ্য মানবসন্তানদিগকে জীবনের এই নিত্য বিশ্বস্ত সঙ্গী ও সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, তিনি ধন্য!

---

(১) Spontaneity.

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

উল্টো বুঝোনো হ'লই বা—বিশেষ যখন বিষয়টা অশুচি—গাইশা নর্তকী—এ ধরণের মন্তব্য হয়ত কেউ কেউ করবেন—বিশেষ যাঁরা মনে-প্রাণে আধ্যাত্মিক। তাঁদের সন্দিগ্ধতা আমি বুঝি না এমনও নয়। তবু বলব—আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন সাধকের কাছেও উচ্চ-বিকশিত সাংস্কৃতিক সৌকুমার্য—cultural refinement—আদরণীয় হওয়া উচিত। শ্রীঅরবিন্দকে আমি একসময়ে লিখতাম: যোগীরা অভদ্র হবে কেন, অপরিষ্কার হবে কেন? তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তার সার মর্ম এই যে—মানসিক সৌকুমার্য এক ভগবদ্‌ভাবে-ভাবিত সাধুর সৌকুমার্য আর। ব'লে জুড়ে দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে কোনোদিনই বলেন নি যে মানুষের বাহ্য প্রকৃতির রূপান্তর হওয়া অনাবশ্যক শুধু আন্তর উপলব্ধি হ'লেই হ'ল। এ নিয়ে তর্ক হয়েছে অনেক, হবেও অজস্র। আমি এ প্রসঙ্গ তুললাম শুধু এই কথাটি পেশ করতে যে আমার কাছে জাপানী শালীনতা ও সৌকুমার্য এত ভালো লেগেছে এই জন্যে যে বহু সৌন্দর্যসাধনের ফলে জাপান পৌঁছেছে এ-কলাসিদ্ধিতে, আর এ-সিদ্ধির চরম শিখরের মনোজ্ঞ হিল্লোল উপভোগ করতে হ'লে লক্ষ্য করতে হবে জাপানী রমণীর রূপপ্রসাধন ও সৌকুমার্য-সাধনা। জাপানী মহিলাকে আমাদের চোখে সুন্দরী মনে হবার কথা নয়, কিন্তু এদের হাবভাবের মাধুর্য বহু সাধনলব্ধ—এদের চালচলন, কথাবার্তা, অভিবাদন, ঘর সাজানো—সবই পরিচয় দেয় এক আশ্চর্য ঐকান্তিকতার—যার নাম দেওয়া যেতে পারে লাবণ্যপূজা। এদের প্রতি পদক্ষেপ সুন্দর, প্রতি ঠাট তপোলব্ধ।

একথা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হয়েছিল যখন গেলাম সেদিন এদের এক ধনী অভিজাতের বাড়ি। আমাদের দেশে বলে "রূপের ঘরে রূপের বাসা।" এদের দেশেও একথা সমান খাটে! নাওমি সাগাওয়ার ওখানে যেদিন গেলাম সেদিন একথা আরো বেশি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করলাম। বলি সে-কথা। বলবার ম'ত।

নাওমি সাগাওয়া এখানে একজন মস্ত ধনী। তাঁর আবাসকে নাম দেওয়া যেতে পারে সৌন্দর্যপুরী। স্বর্ণলঙ্কার মাধুর্যের কথা পড়েছি রামায়ণে। কিন্তু লঙ্কায় গিয়ে রম্যতম প্রাসাদেও পাই নি এ-রচনার চাক্ষুষ প্রমাণ—পেলাম সব প্রথম জাপানে এসে। য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ পুরী সভা হোটেল আরামকুটীর দেখেছি। কিন্তু কোনো রাজমহলেই সে-নয়নানন্দদায়িনী শোভা প্রত্যক্ষ করি নি, যা করলাম এ-ধনীদম্পতির বাসভবনে।

সামনে সুন্দর জাপানী উদ্যান। খুব বড় নয় কিন্তু অপরূপ। ছোট ছোট গাছ, জলের উপর সেতু, বাগানে ছোট মন্দির—আরো কত কী। ঢুকেই মনে হ'ল—আশ্চর্য! তার পরে ঘরের দোরগোড়ায় খুলতে হ'ল। পুরমলাবণ্যময়ী গৃহস্বামিনী নিজে পরিষ্কার চটি দিলেন। রাস্তার জুতো প'রে এখানে ঘরে ঢোকা মানা। অভ্যাগতের জন্যে দোরগোড়ায় সাজানো সার সার চটি। চটি উঠলাম এঁদের ম্যাটিং করা ঘরে—ফ্রেমওয়ালা মাদুরের নরম ম্যা নরম, কেননা মাদুরের নিচে থাকে নরম তোষক মতন। তারপর—কী বলব? রবীন্দ্রনাথের লেখনীও হার মেনে যেতে বা কেননা সে-সৌন্দর্য না দেখলে কল্পনা করা অসম্ভব, ব্যাখ্যা ক'রে তার কিছু আভাস মাত্র দেওয়া যেতে পারে—তার বেশি নয়।

দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী

ঘরের ফুলদানি—একটিতে দুটি তিনটি ফুল মস্ত জলপাত্রের বুরুশে আটকানো। ফুলগুলিও যেন শিখেছে গৃহকর্ত্রীর মতন প্রণত অভিবাদন করতে। ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—রাজপুরীতে নয়—(কারণ ঘরগুলি এদের খুব বড় নয়—বড় ঘর গরম রাখা যায় না ব'লে এরা ছোট ঘরেই থাকে)—কিন্তু কী কী দেয়াল, কী কড়িকাঠ, কী জান্‌লা! যেদিকে তাকাই চোখ মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি তৃণজাতীয় লম্বা পাতা। দেয়ালে ঝুলছে অপরূপ একটি চিত্রিত রেশম

... অর্পণ—মাত্র দু'একটি পাতা, কিন্তু কী অপরূপ তাদের বিন্যাস ... ! ঘরে বড় বড় কয়েকটি উজুন—কিন্তু সে-উজুন দেখলে কোনো ... আর কটূক্তি করা সম্ভব হ'ত না উজুনমুখী ব'লে, কেন না সে ... হ'য়ে দাঁড়াত স্তবগান।

তারপর আর একটি ঐ-রকম মাছুর-বিছানো ঘর। এখানে ওখানে ... ছবি, একটি বক, একটি পায়রা, একটি ছোট জলাশয়। কিন্তু ... বক, কী পায়রা, কী জলাশয় ! এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে ...। ইংরাজিতে বলে থ্রিল। রোমহর্ষণ বললে হয়ত ঠিক তর্জমা ...: না, পুলকিত—পুলকিত। তবু মনে জাগল পুলক। ঐ ... খুঁজছিলাম—mot juste !
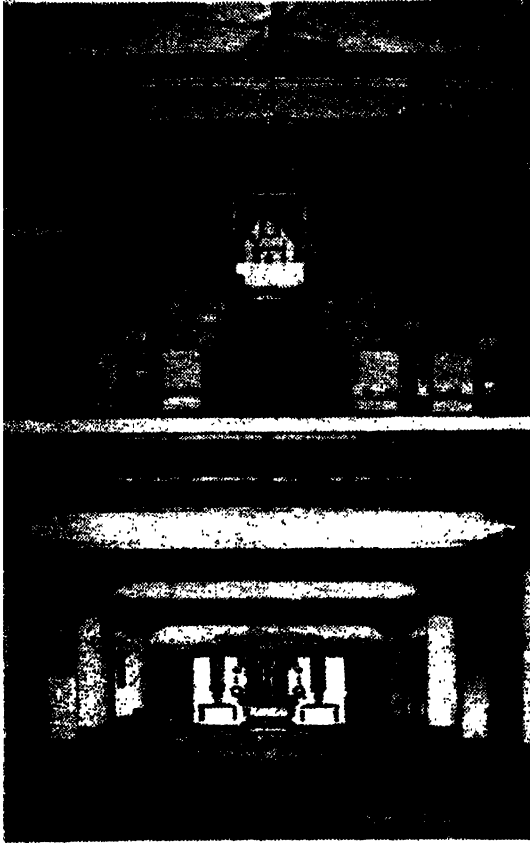
টৌকিয়োর বৌদ্ধ মন্দিরের অভ্যন্তর

তারপর গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী আমাদের বসালেন আর একটি ... ঐ একই মাছুর। তার উপর কুশন। আমি, ইন্দিরা, ডাক্তার ... শ্রীমতী রাউক, শ্রীযুক্ত সাগাওয়া, বন্ধুবর নায়ার ও আর একটি ... অধ্যাপক। ওঁরা ইংরাজি জানেন না কেউই। নায়ার হ'লেন ... দোভাষী কর্ণধার। তাঁর মাধ্যমেই আলাপ জমল। কিন্তু ... হ'ল অবান্তর, গৃহস্বামিনীর হাসি ও আহার্য পরিবেশন, ... নৃত্য আমাদের চিত্তজোষণ করল।

... বর্ণনা করব ? না:—কী হবে ক'রে—যখন ভালো লাগে না জাপানী রান্না। ... তা নয়—তবু গা কেমন করে। যখন ... গলদা চিংড়ি ... ছেড়ে বাঁচলাম। হ্যাঁ, মাশরুম, মাশরুম। বেশ আপন। কিন্তু য়ুরোপীয় মাশরুম রান্নায় আমরা অভ্যস্ত। এ যেন কাঁচা কাঁচা লাগে। তারপর শামুক। না, আর না। জাপানী রান্নার নিন্দা করার অধিকার আমার নেই—যেহেতু রসনারুচি দেশে দেশে বিভিন্ন। মনে আছে আমার এক তামিল গীতি-শিষ্যার কলকাতায় গিয়ে "রাজভোগ" মুখে দিয়েই থু থু ক'রে ফেলে দেওয়া। রুচির কোনো সার্বজনীন মাপকাঠি আছে কি না—কিন্তু থাক এ দুস্তর গবেষণা। রান্না পর্ব ছেড়ে আসি আহারান্তে নৃত্য পর্বে।

ভোজন সমাধা হ'লে গৃহস্বামিনী নাচলো গ্রামোফোন সঙ্গীতের সঙ্গে। জাপানী গায়কের গান তথা সামিসেন বাজনা। সে অশ্রাব্য। নৃত্য সুদৃশ্য, ভঙ্গি অনবদ্য, কিন্তু শুধুই ভাও-বাৎলানো। না আছে তাল না নিপুণ পদক্ষেপ। ইন্দিরা যখন নাচে মনে আনন্দ ছেয়ে যায় বহু দর্শক ও শ্রোতার মনে। জাপানী নৃত্যে চোখ একজাতীয় তৃপ্তি পায় বটে কিন্তু সে শুধু রূপপ্রসাধনের তৃপ্তি। কি সুন্দর কিমোনো ! শুনলাম আশি হাজার য়েন দাম—অর্থাৎ ১২০০৲ টাকা। তার উপরে চিত্রিত কটিবেষ্টনী ওবি—দাম না কি বিশ হাজার। হাতে দামী হীরের আংটি—এত বড় হীরের আংটি ! এছাড়া আর কোনো গহনা নেই, না হাতে বালা না কানে দুল, না গলায় হার। কিন্তু তা ব'লে সাজসজ্জার দৈন্য নেই। কত রকম অঙ্গাবরণী—রকমারি রঙের ! আর এ প্রতিযোগিতা করছে ওর সঙ্গে অথচ সব জড়িয়ে একটি ছবি ! না এদের নৃত্য অপূর্ব নয়, গান অশ্রাব্য। তবু এদের নৃত্যগীতেরও আবহ রূপের, প্রসাধন তপস্যার। রূপকে যাঁরা সাধনীয় শিল্প মনে করেন তাঁদের আসা চাই সব আগে জাপানে, দেখা চাই জাপানী রূপসীর বেশভূষা, শোনা চাই তাঁর মধুময় হাসি, কণ্ঠস্বর, সম্ভাষণ।

ঘর থেকে বেরুতেই কিন্তু চমকে উঠতে হ'ল ফের। গৃহস্বামিনী পুনরায় চটি পরিয়ে দিলেন নিজে হাতে। চুটিয়ে অতিথি-সৎকার বটে। আমাদের দেশে গৃহকর্ত্রী অতিথিকে বড়জোর পরিবেশন ক'রেই ক্ষান্ত, কিন্তু এদেশে তিনি নিজের হাতে জুতো না পরিয়ে ছাড়েন না। কিন্তু এ যেন একটু আতিশয্যের কোটায় পড়ে, নয় কি !

ঘণ্টা তিনেক লাগল ভোজন সমাধা হ'তে। তবে ডাক্তার রাউক ও নায়ার গল্পগুজবে জমিয়ে রাখলেন। হ্যাঁ বলতে ভুলেছি—সুরু এদের ওচা থেকে শেষও ওচায়। জাপানী সবুজ চা-র নাম ওচা। আমাদের দেশের চা-র নাম এরা দিয়েছে কোচা। তিনটি জাপানী গৃহে গিয়েছিলাম এখানে। প্রত্যেক গৃহেই ওচা ও কোচা দুইই দেওয়া হয়েছিল আমাদের। জানি না—আমরা বিদেশী ব'লে কিনা।

সব শেষে গৃহস্বামিনী পরিবেশন করলেন ওচা—... রীতি মেনে। কিসের রীতি ? না, ওচা-নোয়ু-র। ইংরাজিতে এর তর্জমা—tea-ceremony জাপানে ওচা-নোয়ু একটি ... উৎসব। তাই ...

জাপানী জাতি স্বভাবত আধ্যাত্মিক নয়। অথচ মানুষ তো—পূজার প্রবৃত্তি তার যাবে কোথায়? কাজেই ভগবানের ধরা-ছোঁয়া না পেয়ে ওরা সামাজিকতাকে বরণ করল প্রতিমা ব'লে। সুশীলতা শালীনতায় এদের অত্যাসক্তি এই বধূবরণের ফল। কিন্তু রকমারি শাখাই তো গজিয়ে ওঠে মূল কাণ্ডের চারধারে। রূপ পূজার একটি শাখা হ'ল এই ওচা-নোয়ু। চাকে উপলক্ষ ক'রে এদের রূপপূজাপ্রবৃত্তির একটি পরম প্রকাশ হয়েছে সামাজিকতার প্রাঙ্গণে। চিত্রকলা আর একটি শাখা, গৃহসজ্জা আর একটি। কিন্তু ওচা-নোয়ু হ'ল একটি জীবন্ত প্রকাশ—গতিময় ব্যঞ্জনা। ছবি, আসবাব স্থির দাঁড়িয়ে আছে। চা-পরিবেষণে গতির প্রকাশ। একটি একটি ক'রে পিয়ালা তুলে নিচ্ছেন গৃহস্বামিনী। পরম যত্নে, ভক্তিভরে ছোট ছোট তোয়ালে নিয়ে মুছছেন প্রতি পিয়ালাটি গরম জলে ধুয়ে। গরম জলে আগেই তো ধোয়া যেতে পারত, কিন্তু না, অতিথির সামনে করতে হবে একান্ত ঘটা ক'রে—যেমন পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে অঞ্জলি দেয় যজমানের সামনে। একলা ব'সে পূজা তর্পণ ও পাঁচজনের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে সবাই মিলে কীর্তন—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছেই। যাহোক, ভোজনকক্ষ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ওচা কক্ষে। যেখানে মাটিতে একটি গর্তে ফুটন্ত কেটলি বসানো, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। গৃহস্বামিনী আসন পিঁড়ি, না মুড়ি জাপানী ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে মাদুরে ব'সে একটি পিয়ালা উঠিয়ে নিলেন; গরম জল দিয়ে ধুলেন, উষ্ণ সিক্ত শুভ্র তোয়ালে দিয়ে প্রতি যত্নে মুছলেন; তারপর খুব ধীরচ্ছন্দে কেটলি থেকে ফুটন্ত জলএকটি হাতা দিয়ে তুলে পিয়ালায় ঢাললেন; তারপর তাতে একটি চামচ দিয়ে সবুজ ওচা মেশালেন; তারপর আর একটি বুরুশাকৃতি চামচ দিয়ে সে-জল ঘাঁটলেন। পরে পার্শ্ববর্তিনী পরিচারিকাকে দিলেন, সে আমাদের দিল আভূমি প্রণত অভিবাদন ক'রে। তারপর আমরা প্রত্যেকে পর পর অভিবাদন করলাম, গৃহস্বামিনীর অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে। এতশত ঘটার পরে তবে চা-পান। আমরা মাত্র কজন অতিথি, কিন্তু এই অল্পকয়জনকে ওচা-পরিবেষণ করতে লাগল অন্তত আধঘণ্টা। যদি চল্লিশজন অতিথি থাকতেন তবে এ-ওচা তর্পণের সময় লাগত অন্তত দুঘণ্টা এবং এ-ঘণ্টা সবাই প্রসন্নচিত্তে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন অপেক্ষা ক'রে। কেন? শুধু কি ঐ পিয়ালাটির জন্যে? না। এই সূত্রে জাপানী

টোকিয়োর বিখ্যাত গাইশা নর্তকীর গৃহে দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী

না কি এই ভাবে ওচা-নোয়ুর পুরশ্চরণ করত। আজকাল করেন ঘরে গৃহস্বামিনী। পাদ্রী ওয়াল্টার ওয়েষ্টন তাঁর বিখ্যাত "ম গ্রন্থে লিখছেন এই ওচা-নোয়ু তর্পণ রীতি সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে:

"Pending a loftier Conception of a ma Connection with the spirit world, it is surely bett for him, and happier to see divine influences touchi his life at every turn through the simplest mea than to see nothing divine at all."

মন্তব্যটি অনুধাবনীয়। কারণ জাপানের সৌন্দর্য-অভীপ্সার ম আছে একটি অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা যা পূজার কোঠায় পড়ে। আ দেশে পুরোহিত যজমানকে খুঁটিয়ে পড়ান কত কী মন্ত্র, দিতে শে কত রকমের পুষ্পাঞ্জলি—আচমন, তর্পণ, পুরশ্চরণের সে কত ঘট আমরা হয়ত অধিকাংশই এ-ধরণের মন্ত্রাবৃত্তি বা দীপারতির মধ্যে বি কিছু দেখতে পাই না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-সব অনুষ্ঠান যে প্রাণ আচার নিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়েছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। বলব যে কোনো লোকাচারকে শুধু তার চলতি প্রাণহীন রূপে দেখ ঠিক দেখা হয় না। দেখতে হবে কী আকৃতি চেয়েছে এসবের মধ্যে দি উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ। জাপান ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করতে পারে ভারতের মতন, অথচ পূজার অভীপ্সা থাকেই প্রতি মরমীর মর্মে উ কোনো গভীর আকাঙ্ক্ষাই নিজেকে নিরুদ্ধ রাখতে পারে না। এক না হ'লে ওভাবে সে করেই করে আত্মপ্রকাশ। জাপানে এই ঐকান্তি পূজাবৃত্তি ছাড়া পেয়েছে—খানিকটা অন্তত—তার সামাজিক মীমা

দের রূপানুরক্তি ও সুশীলতায় নিখুঁৎ কলাকার। আর এ-কলাকার এদের জাতীয় মনে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় মন্ত্রসিদ্ধির কোঠায়। কোনো জাতির নরনারীর মনে যে রূপানুরক্তি এতটা ব্যাপকভাবে প্রায় দেবভক্তির স্থান অধিকার করতে পারে ভাবতে পারা শক্ত। কিন্তু দেবতাকে এরা বরণ করে নি মনে প্রাণে, তাই রূপসিদ্ধিতে এরা হ'য়ে উঠল মহানুভব। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—বলে না?

একথা আর এক দিক দিয়ে উপলব্ধি করলাম– যেদিন গেলাম এদের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির দেখতে: টুসুকিজি হঙ্গানজি। টোকিয়োতে নাকি এইটিই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরটি দেখে অভিভূত হ'তে হয়। য়ুরোপের গির্জা দেখেছি তো কত শত! কিন্তু কোনো গির্জার স্থাপত্য শিল্পই সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ জাপানী বৌদ্ধমন্দিরের কাছাকাছিও আসতে পারে না। ভিতরে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত একটি বেদিকায়—সুরম্য স্বর্ণাভ কক্ষে। টুসুকিজি হঙ্গানজি মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ণনা করার চেষ্টা বিড়ম্বনা—চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে কোন মন্দির এত সুন্দর হ'তে পারে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরও এদের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের কাছে নিষ্প্রভ, যেমন আমেরিকান কুবেরদের ধনসম্পদের কাছে ভারতীয় ক্রোড়পতির বৈভব পাণ্ডুর। বামন ও মহাকায় মানুষের মধ্যে যে-তফাৎ এদের মন্দির-সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের কীর্তির সেই তফাৎ।

কিন্তু তারপর: দেখলাম কয়েকটি চৈনিক পুরোহিত করছে মন্ত্রপাঠ। শূন্যগর্ভ প্রাণহীন লাগল। জানি না তাদের কাছে কি রকম লাগে এধরণের গতানুগতিক মন্ত্রজপ! আমাকে একজন বৌদ্ধ মোহান্ত রেভারেণ্ড রিরি নাকায়ামা নিয়ে গিয়েছিলেন এ-মন্দিরে। এ মন্দিরের ভিতরে প্রকাণ্ড ফ্রেমে টাঙানো অজস্র সাজানো ফুল দেখলাম। অপরূপ সে ফুলসজ্জা। মন্দির যেন হেসে উঠল। কিন্তু হায় রে, ঐ পর্যন্তই। মৃত মন্দির: অমিতাভ বুদ্ধের অপূর্ব স্বর্ণাভ মূর্তি, কিন্তু তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে কে?

রেভারেণ্ড রিরি তারপর নিয়ে গেলেন গোকোকুজি নামক আর একটি বৌদ্ধ মন্দিরে। এ মন্দিরটি সৌন্দর্যে আগের মন্দিরটির প্রতিযোগী হ'তে পারে না, কিন্তু এখানে বৌদ্ধ সামগান শুনলাম। বহু নরনারী তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে সমতানে গাইল স্তবগান বুদ্ধ মূর্তির সামনে। জাপানে এই প্রথম শুনলাম এমন জাপানী গান যার সুর ও তাল আছে—যদিও সে-সুরের মাধুর্য বা বৈচিত্র্য বেশি নয়। না হোক—তবু প্রথম সুরেলা গান শুনে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বলল: আঃ, বাঁচলাম। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম ভাবতে এদের কাবুকি নাট্যনৃত্যের বেসুরা অশ্রাব্য গান। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

বৌদ্ধ নরনারীদের স্তবগানের আগে মন্দিরের পুরোহিত আমার নাম ক'রে সবাইকে কি যেন বললেন। সঙ্গী বন্ধুবর বললেন—মন্দিরের মোহান্ত আমার নাম পেশ করছেন সবার কাছে। এর কোনো দরকারই ছিল না—কিন্তু সেই জাপানী শালীনতা। মোহান্ত বললেন স্তবের পরে তাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধ মধ্যাহ্নভোজন করতে। কিন্তু সে যাক।
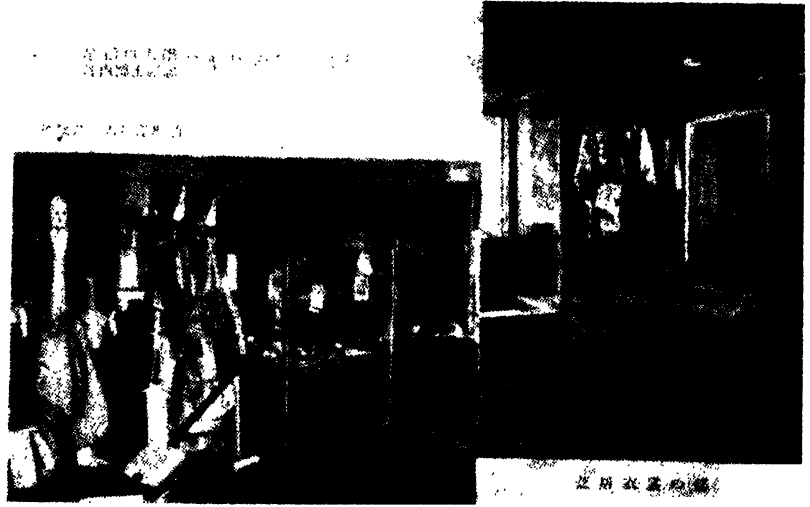
টোকিয়োর বৌদ্ধ পুরোহিত

গানের পরে এলেন এক এক ক'রে অনেকগুলি বৌদ্ধ পুরোহিত লাল নীল সবুজ লোহিত প্রভৃতি নানারঙা মহার্ঘ কিমোনো প'রে। গাঁরা বলেন ধর্মে বেশভূষার পারিপাট্য অচল তাঁদের দেখা দরকার এদের বেশভূষার চমক ও কেমন ক'রে এ আড়ম্বর চালু হ'য়ে গেছে এমন কি মন্দির রাজ্যেও। আমার ভালো লাগে, সুন্দর বেশ—তবে একথা স্বীকার করব, এতখানি আড়ম্বরে মন যেন সায় দিতে চায় না। তবে হয়ত ওদের কাছে এ-সজ্জা খুব সরল প্রসাধনের মতনই মনে হয়। একথা মনে হয় এই কারণে যে রূপকারুর বহু অনুশীলনের ফলে জাপানীর কাছে রূপরাগের দাবি খুব বেশি হ'য়ে উঠেছে। আমরা মন্দিরে "এঁটো" কিছু ফেলতে যেমন পিছপাও, এদের মোহান্তরা মন্দিরে কুরূপ সাজে স্তব গান করতে বোধহয় ততখানি পেছপাও, কিন্তু যা বলছিলাম।

(ক্রমশঃ)

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয় নাগ

বজ্র রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। একপাশে বিপুলবক্ষা জাহ্নবী, অপরপাশে নিবিড়কুন্তলা বনানী, মাঝখান প্রস্তর-খচিত উচ্চ যেন সন্তর্পণে দুইদিক বাঁচাইয়া চলিয়াছে। আকাশে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ভাগীরথীর জলস্পর্শে শীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের পথ-ক্লেশ নিবারণ করিতেছে।

রাজপথে যাত্রীর বাহুল্য নাই। কদাচিৎ দুই একটি সৈনিক-বেশধারী অশ্বারোহী দক্ষিণ হইতে উত্তরে কিম্বা উত্তর হইতে দক্ষিণে মন্দ-স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যাইতেছে, অন্যথা পথ নির্জন। নদীতীরে জনবসতি নাই, সম্ভবত প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গঙ্গার তুঙ্গস্ফীত জলধারা কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাই মানুষ এখানে বাসস্থান রচনা করিতে সাহসী হয় নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন বেলাভূমি; কোথাও কাশের গুল্ম জমিয়াছে, কোথাও বালুময় সৈকতে সঙ্গিহীন সারস এক পা তুলিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা উচ্চ পাড়ের গায়ে কোটরবাসী অসংখ্য গাঙ-শালিখের কিচিমিচি।

স্থল অপেক্ষা জলে বরং মানুষের চিহ্ন কিছু অধিক পাওয়া যায়। গঙ্গার স্রোতে দূরে দূরে ছোট ছোট ডিঙি ও ভরা ভাসিতেছে। কখনও বড় বহিত্র পাল তুলিয়া মরালগমনে চলিয়াছে; দূর হইতে তাহার পটপত্তনের উপর মানুষের সচল আকৃতি দেখা যাইতেছে। সব মিলিয়া বহিঃপ্রকৃতির একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রূপ; তৎপরতা আছে কিন্তু ত্বরা নাই।

সূর্য মধ্যগগনে আরোহণ করিলে বজ্র পথপার্শ্বের এক বৃহৎ অশ্বত্থতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃকাল হইতে অনেকখানি পথ হাঁটা হইয়াছে, এইবার একটু বিশ্রাম করা যাইতে পারে। জঠোরে অগ্নিদেব জ্বলিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারও শান্তিবিধান আবশ্যক।

কিন্তু সর্বাগ্রে গঙ্গায় অবগাহন স্নান। বজ্র অশ্ব ছায়াতলে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া তীরের দিকে অগ্র হইল।

নদীতট এইখানে ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। চকিত হইয়া দেখিল, জলের কিনারায় একটা উলঙ্গ মানুষ দাঁড়াইয়া আছে এবং গামোছার মতন রক্তবর্ণ এ বস্ত্রখণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাড়িতেছে। মানুষটার দৃষ্টি নদীর দিকে, তাই সে প্রথমে বজ্রকে দেখিতে পায় না কিন্তু বজ্র যখন তীরে নামিয়া গেল তখন তাহ দেখিয়া সে এমনভাবে চমকিয়া উঠিল যেন সে কো গর্হিত কার্যে ধরা পড়িয়াছে।

বজ্র লোকটিকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিল কি কোনও প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় ন লোকটির পরিধানে কেবল কৌপীন, গামোছার মত খণ্ডটি সম্ভবত তাহার কটিবাস। বজ্র ভাবিল, লোকটি হয় যাযাবর সম্প্রদায়ের ভিক্ষু, স্নান করিয়া কটিবাস শুকাইতে সে আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না, জলে নামিয়া আরামে স্নান করিতে লাগিল।

লোকটি কিন্তু চোখে উৎকণ্ঠা ভরিয়া বারবার তা পানে চাহিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দীর্ঘায়ত ও মুখে ঈষৎ শ্মশ্রুগুম্ফ আছে; কিন্তু দেখিলে সাধু-বৈর বলিয়া মনে হয় না। মুখে উদাসীনতা বা বৈরাগ চিহ্নমাত্র নাই।

অবশেষে লোকটি কথা কহিল, ছদ্ম তাচ্ছিল্যের স বলিল—'তুমি দেখছি দূরের যাত্রী। কোথা থে আসছ?'

বজ্র গাত্র-মার্জন করিতে করিতে বলিল—'উত্ত গ্রাম থেকে।'

'তুমি গ্রামবাসী! কোথায় যাবে?'

'কর্ণসুবর্ণে!'

'আগে কখনও কর্ণসুবর্ণে গিয়েছ?'

অপরিচিত ব্যক্তির এত অনুসন্ধিৎসা বজ্রের ভাল লাগিল না, তবু সে সহজভাবেই উত্তর দিল—'না।—তুমি কে?'

লোকটি অমনি নিজেকে ভিতরে গুটাইয়া লইল।

'আমি পরিব্রাজক।'

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না। লোকটী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল—'কর্ণসুবর্ণে কী কাজে যাচ্ছ?'

বজ্র এবার সতর্ক হইল। তাহার মনে হইল লোকটি কেবল কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিতেছে না, কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বজ্র উত্তর দিল—'গ্রামে কাজকর্ম নেই, তাই নগরে যাচ্ছি যদি কিছু কাজ পাই।'

স্নান সারিয়া সে তীরে উঠিল। লোকটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, আবার প্রশ্ন করিল—'তোমার হাতে ও কিসের অঙ্গদ? সোনার?'

বজ্র লঘুস্বরে বলিল—'না, পিতলের। সোনা কোথায় পাব?'

সে বস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্বত্থতলে ফিরিয়া গেল, পাতার মোড়ক খুলিয়া আহারে বসিল। প্রচুর কুক্কুট মাংস ও কয়েকটি সুপক্ক কদলী। পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই আহার করিতে করিতে বজ্র গলা বাড়াইয়া দেখিল লোকটি তখনও নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বৃক্ষের পানে সংশয়পূর্ণ পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার নদীর দিকে ফিরিয়া বস্ত্র আন্দোলিত করিতেছে।

বজ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। লোকটি কে? এমন অদ্ভুত আচরণ করিতেছে কেন? বজ্র আহার করিতে করিতে গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর দেখা গেল গঙ্গাবক্ষে একটা দীর্ঘ শীর্ণ ডিঙা তীরের দিকে আসিতেছে। ডিঙাতে আট দশজন লোক একের পর এক বসিয়া আছে, চারিটি দাঁড়ের আঘাতে ডিঙা হিংস্র হাঙ্গরের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে।

তীরের কাছাকাছি আসিলে ডিঙার লোকগুলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—'জয় নাগ!'

তীরের লোকটি উত্তর দিল—'জয় নাগ!'

ডিঙা তীরে ভিড়িল। দুইজন দাঁড়ী ছাড়া আর সকলে নামিয়া পড়িল। তখন ডিঙা আবার মুখ ঘুরাইয়া দূর পরপারের পানে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যে কয়জন লোক আসিয়াছিল তাহারা সকলে তীরস্থ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা সকলেই দৃঢ়কায় বলবান ব্যক্তি, বেশবাস প্রায় তীরস্থ ব্যক্তির ন্যায়। দেখিলে মনে হয় তাহারা একই সম্প্রদায়ের লোক।

তীরস্থ ব্যক্তি মৃদুকণ্ঠে অন্যদের কিছু বলিল; অন্যেরা ভ্রূকুটি করিয়া অশ্বত্থতলের দিকে তাকাইতে লাগিল।

বজ্র একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। লোকগুলার আচরণ রহস্যময়; ইহারা যদি দস্যুতস্কর হয় তাহা হইলে এতগুলা লোকের বিরুদ্ধে তাহার একার কোনও আশা নাই। কিন্তু বিপদের মুখে পলায়ন করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে বসিয়া আহার করিতে লাগিল।

লোকগুলা নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিল। তারপর একের পর এক সারি দিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বজ্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় তীক্ষ্ণভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গেল। বজ্র নিরুৎসুকভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিল।

বজ্র দেখিল নূতন লোকগুলি রাজপথ লঙ্ঘন করিয়া ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেবল পুরানো লোকটি গেল না। সে বন্ধুভাবে বজ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—'তুমি বোধহয় জাননা আমরা কে?'

বজ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

'আমরা নাগ সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।'

বজ্র সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করিল—'তাই বুঝি জয় নাগ বললে!'

'হাঁ। জয়নাগ শুনলে আমাদের দলের লোককে চিনতে পারি। তুমি যাদের দেখলে ওরা পুণ্ড্রদেশে তীর্থপর্যটনে গিয়েছিল।'

লোকগুলিকে দেখিলে পুণ্যলোভী তীর্থপর্যটক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বজ্র তাহা বলিল না। তাহার ভোজন শেষ হইয়াছিল, সে নদীতে গিয়া হাত মুখ ধুইল, জলপান করিল। বলিল—'আমি এবার চললাম। তুমি কি এখানেই থাকবে?'

নাগ পরিব্রাজক একবার দূরে গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, অবহেলা ভরে বলিল—'আমরা কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। তুমি চললে? ভাল। তোমার যেমন চেহারা নিশ্চয় রাজার সৈন্যদলে কর্ম পাবে।'

বজ্র ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিল—'রাজার নাম কি?'

পরিব্রাজক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'তুমি গৌড়ের মানুষ, রাজার নাম জান না?'

'না। কী নাম?'

পরিব্রাজক ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া বলিল—'কে জানে। আমরা নাগ-পন্থী বৈরাগী, রাজা রাজড়ার সংবাদ রাখি না।'

বজ্র একটু হাসিয়া যাত্রা করিল। সে বুঝিয়াছিল ইহারা ভণ্ড বৈরাগী, ইহাদের কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে; কিন্তু কী অভিসন্ধি তাহা অনুমান করা তাহার সাধ্য নয়। সে পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, নগর এখনও দূরে কিন্তু ইহারই মধ্যে নগরের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া তাহার পথের উপর পড়িয়াছে। নদী যতই সাগরের কাছে আসিতে থাকে, সাগরের সান্নিধ্য ততই তাহার সর্বাঙ্গে স্পন্দন-শিহরণ জাগাইয়া তোলে; বজ্র দূর হইতে তেমনই নগর-রূপী মহাজলধির গভীর স্পন্দন নিজ অন্তরে অনুভব করিল। গ্রাম ও বনের অকপট ঋজুতা আর নাই, জনসমুদ্রের কুটিল নক্রসঙ্কুল আবর্ত তাহাকে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গাতীরের এই রহস্যময় ঘটনা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল।

কর্ণসুবর্ণ ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল; পথপার্শ্বের বন শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইল। দিগন্তের কাছে মহানগরীর হর্ম্যচূড়া দেখা গেল। তারপর, রাক্ষসী বেলায়, বজ্র কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে এক বিশাল সংঘারামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। পশ্চিম দিগন্তে তখন রক্তমসী দিয়া রাত্রি ও দিবার মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতেছে।

বজ্র দেখিল, রাজপথ ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বহু বিস্তীর্ণ ভবন, উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। ইহাই রক্তমৃত্তিকার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম; চলিত ভাষায় রাঙামাটির মঠ।

নগরের উপকণ্ঠ বটে, কিন্তু বিশাল সংঘারাম ব্যতীত লোকালয় বেশী নাই, কেবল আশে পাশে দুই তিনটি ক্ষুদ্র বিপণি। নগর হইতে যাহারা সংঘে পূজা দিতে আসে, পূজা দিয়া আবার নগরে ফিরিয়া যায়। সংঘে প্রায় পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন, কিন্তু স্থানটি নির্জন শব্দহীন। এখানে সকল কার্যই নিঃশব্দে অলক্ষিতে সম্পাদিত হয়।

সংঘারামের প্রশস্ত তোরণদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্র ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। কবাটহীন তোরণদ্বার দিয়া সংঘ-ভূমি দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেখানে লোকজন কেহ নাই, দ্বারে দ্বারীও নাই। বাহিরে বিপণিগুলির আগড় বন্ধ, দোকানীরা সন্ধ্যার পূর্বেই দোকান বন্ধ করিয়া নগরে ফিরিয়া গিয়াছে।

সংঘদ্বারের দুই পাশে দুইটি দীপস্তম্ভ। সেকালে মঠ-মন্দির প্রভৃতির অগ্রে উচ্চ দীপস্তম্ভ রচনার রীতি ছিল। ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর থাকিত, পূজা-পার্বণের সময় কোটরগুলিতে দীপ জ্বালিয়া উৎসবের শোভা বর্দ্ধন হইত। বজ্র ঈষৎ বিভ্রান্ত ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইল, একটি দীপস্তম্ভমূলে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম পদ দক্ষিণ জানু-অস্থির উপর স্থাপিত, দুই হাতে যষ্টিতে ভর দিয়া এবং মস্তকটি বাহুর উপর রাখিয়া সে সারস পক্ষীর ন্যায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে।

বজ্র ত্বরিতপদে তাহার নিকটবর্তী হইতেই লোকটি চক্ষু মেলিল, দুই পায়ে দাঁড়াইল ও হাই তুলিল। তুড়ি দিয়া বলিল—'জয় নাগ।'

বজ্র আজ দ্বিতীয়বার 'জয় নাগ' শুনিল। সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মানুষটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, বলবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু মুখে ধূর্ততা মাখানো। বজ্র কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে বলিল—'কে বাপু তুমি, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে?'

বজ্র বলিল—'আমি পথিক, কর্ণসুবর্ণে যাব। নগর এখান থেকে কত দূর?'

লোকটি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল—'ক্রোশ দুই হবে। আলোয় আলোয় নগরে পৌঁছতে পারবে না।'

'রাত্রে পান্থশালায় কি আশ্রয় পাব না?'

'তুমি যদি নূতন লোক হও, রাত্রে পান্থশালা খুঁজে পাবে না।'

'তবে উপায়?'

'উপায় তো সামনেই রয়েছে। মঠে ঢুকে পড়, আশ্রয় ঢের পাবে।'

'কিন্তু—মঠে তো কাউকে দেখছি না।'

'ভেবেছ কি মঠ খালি?—পাঁচশ নেড়া মাথা আছে। তবে ভারি শান্তশিষ্ট। ভিতরে গেলেই দেখতে পাবে।'

লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গী লঘুতাব্যঞ্জক, বৌদ্ধদের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হয় না। বজ্র সংঘের দিকে পা বাড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল, বলিল—'তুমি কি এখানেই রাত কাটাবে? সংঘে যাবে না?'

লোকটি আবার এক পা তুলিয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল, বলিল—'আমার জন্যে ভেবো না। জয় নাগ।'

বজ্র প্রশ্ন করিল—'জয় নাগ কাকে বলে?'

'ও একটা মন্তর'—বলিয়া লোকটি চক্ষু মুদিল।

বজ্র ভাবিতে ভাবিতে সংঘদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অদ্ভুত লোকটা নাগসম্প্রদায়ের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই; আগন্তুক পান্থদের মধ্যে তাহার দলের কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য এই কূট-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য এই চাতুরীপূর্ণ কপটতা?

কিন্তু এ চিন্তা বজ্রের মস্তিষ্কে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, সংঘভূমির দৃশ্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শীলভদ্র

রক্তমৃত্তিকার মহাবিহার এক পাটক* ভূমির উপর অবস্থিত। তিন দিকে প্রাচীর, পিছনে গঙ্গা। বিহার ভূমির মধ্যস্থলে উচ্চ ত্রিভূমক হর্ম্য। নিম্নতল প্রশস্ত, দ্বিতল তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, ত্রিতল আরও ক্ষুদ্র; স্তূপের আকৃতি। এই স্তূপসদৃশ ভবনের মধ্য-তলে শাক্য মুনির দিব্য দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

এই গন্ধকুটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে সারি সারি ভিক্ষুগণের প্রকোষ্ঠ। অগণিত প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেকটিতে এক-জন ভিক্ষু বাস করেন। প্রকোষ্ঠগুলি নিরাভরণ, শয়নের জন্য একটি কাঠের পাটাতন ও একটি জলের কুম্ভ; অন্য কোনও তৈজস নাই।

* সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর ভূমিমাপ=৫ কুল্যবাপ।

বজ্র এদিক ওদিক দৃকপাত করিতে করিতে চলিল। অধিকাংশ পরিবেণই শূন্য, ভিক্ষুরা পরিক্রমণের জন্য গঙ্গার তীরে গিয়াছেন; শরীর রক্ষার জন্য ইহা তাঁহাদের নিত্য কর্ম। কদাচিৎ একটি দুইটি ভিক্ষু পরিবেণের কবাটহীন দ্বারের কাছে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছেন। সন্ধ্যার মন্দালোকে নত হইয়া তাঁহারা পাঠে নিমগ্ন; বজ্রকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন না।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বজ্র বিহারের পশ্চাদ্দিকে এক চত্বরের নিকট উপস্থিত হইল। বৃহৎ গোলাকৃতি চত্বর, তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ লঘু স্বরে আলাপ করিতে-ছেন। একটি বৃদ্ধ স্থূল ও খর্বকায়, মুখে মেদমণ্ডিত প্রসন্নতার সহিত পদাভিমানের গাম্ভীর্য। অন্য বৃদ্ধটি সম্পূর্ণ বিপরীত; দীর্ঘ দেহ ক্ষীণ ও তপঃকৃশ, স্কন্ধ হইতে মস্তক সম্মুখদিকে একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে; মুখে মাংসলতার অভাববশত চিবুক ও হনুর অস্থি তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়া আছে। ইঁহার মুখভাব হইতে পদবী অনুমান করা যায় না, নিম্নতম শ্রেণীর শ্রমণও হইতে পারেন। কিন্তু অন্য বৃদ্ধটি যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় ইনি সামান্য ব্যক্তি নয়।

বজ্র চত্বরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলে দুইজনে চক্ষু তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন, তাঁহাদের বাক্যালাপ স্থগিত হইল। বজ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদের সম্বোধন করিল—'মহাশয়, আমি দূরের পান্থ, কর্ণসুবর্ণে যাব। আজ রাত্রির জন্য সংঘে আশ্রয় পাব কি?

স্থূলকায় বৃদ্ধটি বলিলেন—'অবশ্য।'

তিনি এক হস্ত উত্তোলন করিতেই একটি অল্পবয়স্ক শ্রমণ আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—'মণি-পদ্ম, অতিথির পরিচর্যা কর।'

অন্য বৃদ্ধটি এতক্ষণ অপলক নেত্রে বজ্রের পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার শান্ত মুখে ক্রমশ বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। শ্রমণ মণিপদ্ম যখন অন্য বৃদ্ধের আদেশ পালনের জন্য বজ্রের দিকে পা বাড়াইল তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কিছু বলিলেন। মণিপদ্ম গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাঁহার কথা শুনিল, তারপর বজ্রের কাছে আসিয়া বলিল—'ভদ্র, আসুন আমার সঙ্গে

মণিপদ্ম প্রথমে বজ্রকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেল। বিস্তীর্ণ

ঘাটে রাত্রির ছায়া নামিয়াছে, জলের উপর ধূসর আলোর ম্লান প্রতিফলন। ঘাটের পৈঠাগুলির উপর পরিক্রমণ-রত ভিক্ষু শ্রমণের নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি। কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতেছে না, ক্ষণেকের জন্য গতি বিলম্বিত করিতেছে না, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ঘাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছে। দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ, বক্ষ বাহুবদ্ধ। এমন প্রায় তিন চারি শত শ্রমণ। বজ্র দেখিল, সংঘ নিতান্ত জনহীন নয়।

ঘাটে হস্ত মুখ প্রক্ষালণের পর বজ্রকে লইয়া মণিপদ্ম এক প্রকোষ্ঠে উপনীত করিল। ইতিমধ্যে প্রকোষ্ঠগুলিতে দীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েকজন শ্রমণ বর্তিকাহস্তে দ্বারে দ্বারে দীপ জ্বালাইয়া ফিরিতেছে। মণিপদ্ম প্রকোষ্ঠের দীপ জ্বালিয়া একপাশে রাখিল, বলিল—'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহার্য নিয়ে আসি।'

মণিপদ্ম চলিয়া গেল, বজ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিল। ক্রমে আশে পাশের পরিবেণগুলিতেও জন সমাগম হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোথাও চঞ্চলতার আভাস নাই। অস্পষ্ট আলোকে ছায়ার ন্যায় সঞ্চরমান মানুষগুলি; কদাচিৎ নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন; যেন ভৌতিক লোকের অবাস্তব পরিমণ্ডল।

তারপর গন্ধকুটি হইতে মধুর-স্বনে ঘন্টিকা বাজিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কক্ষ ছাড়িয়া সেইদিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে ভগবান তথাগতের পূজার্চনা হইবে, তারপর ভিক্ষুদের নৈশ ভোজন।

পূজার্চনার ঘন্টিকা নীরব হইবার কিয়ৎকাল পরে মণিপদ্ম বজ্রের আহার্য লইয়া উপস্থিত হইল। আহার্যের মধ্যে ঘৃত পক্ক তণ্ডুল ও গোধূমের একটা পিণ্ড এবং ফলমূল; কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। বজ্র আহারে বসিল; মণিপদ্ম সম্মুখে নতজানু হইয়া পরিবেশন করিল।

শ্রমণ মণিপদ্ম বজ্রেরই সমবয়স্ক। সুশ্রী ক্ষীণাঙ্গ প্রফুল্ল-মুখ যুবক; মুণ্ডিত মস্তক ও পীত বস্ত্র তাহার মনের সরসতা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার বৈরাগ্য সহজ আনন্দেরই রূপান্তর। বজ্র আহার করিতে করিতে তাহার সহিত দুই চারিটি বাক্যালাপ করিল; দেখিল মণিপদ্মের বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোনও কৌতূহল নাই, উচ্চকাঙ্ক্ষাও নাই; সকলের আজ্ঞা-ধীন হইয়া অন্যের সেবা করাই তাহার আনন্দময় স্বধর্ম।

আহার সমাধা হইলে মণিপদ্ম বলিল—'ভদ্র, একটি অনুরোধ আছে। যদি ক্লেশ না হয়, আর্য শীলভদ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বজ্র বলিল—'ক্লেশ কিসের? কিন্তু আর্য শীলভদ্র কে?'

মণিপদ্ম বলিল—'সদ্ধর্মভাণ্ডার আর্য শীলভদ্রের নাম শোনেন নি?'

বজ্র মাথা নাড়িল—'না। কে তিনি?'

মণিপদ্ম বিস্ময়াহতভাবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্রের নাম জানে না এমন মানুষ আছে? যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার আশায় সুদূর চীনদেশ হইতে গুণগ্রাহীরা ছুটিয়া আসে, দেশের লোক সেই শীলভদ্রের নাম জানে না! শেষে মণিপদ্ম বলিল—'আমার ধারণা ছিল শীলভদ্রের নাম সকলেই জানে। তিনি নালন্দা বিহারের মহাধ্যক্ষ; তাঁহার মত জ্ঞানী পৃথিবীতে নেই।'

বজ্র দীনকণ্ঠে বলিল—'ভাই, আমি গ্রামের ছেলে, পৃথিবীর কিছুই জানি না। আর্য শীলভদ্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?'

'তা জানি না। তিনি আদেশ করেছেন, যদি আপনার ক্লেশ না হয়, আহারের পর আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।'

'আমি প্রস্তুত। আজ সন্ধ্যাবেলা যে দুটি বৃদ্ধকে দেখলাম, ইনি কি তাঁদেরই একজন?'

'হাঁ। যিনি শীর্ণকায় অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি।'

'আর অন্যটি?'

'তিনি এই রক্তমৃত্তিকা বিহারের মহাস্থবির।'

অতঃপর মণিপদ্ম বজ্রকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। গন্ধকুটির নিম্নতলে এক কোণে একটি প্রকোষ্ঠে শীলভদ্র বসিয়া আছেন; কক্ষটি সাধারণ পরিবেণের মতই ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ। শীলভদ্র দীপের সম্মুখে বসিয়া একটি তালপত্রের পুঁথি দেখিতেছিলেন; অশীতি বৎসর বয়সেও তাহার চোখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই। বজ্র ও মণিপদ্ম তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি মণিপদ্মকে বলিলেন—'মণিপদ্ম, তুমি এবার আহার কর গিয়ে। আজ রাত্রে তোমার সেবার আর প্রয়োজন নেই বৎস।'

মণিপদ্ম হাসিমুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শীলভদ্র বজ্রকে বলিলেন—'এস, উপবেশন কর।'

বজ্র আসিয়া শীলভদ্রের সম্মুখে এক পীঠিকায় বসিল। শীলভদ্র পুঁথি বন্ধ করিয়া সূত্র দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার বাহুতে অঙ্গদ দেখিলেন, তারপর বলিলেন—'তোমার নাম কি বৎস?'

বজ্র বলিল—'আমার নাম বজ্রদেব।'

শীলভদ্র তখন ধীরস্বরে বলিলেন—'আমি তোমাকে দু একটি প্রশ্ন করব, ইচ্ছা না হয় উত্তর দিও না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে দেখে অনেক দিনের পুরানো কথা মনে পড়ে গেল, তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার পরিচয় বোধ হয় শুনেছ। আমি শীলভদ্র, নালন্দাবিহারের অধ্যক্ষ, প্রাচীমণ্ডলের বিহারগুলি পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছি; এখান থেকে সমতট যাব। সমতট আমার জন্মস্থান।* মৃত্যুর পূর্বে একবার জন্মভূমি দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। তারপর, যদি বুদ্ধের ইচ্ছা হয়, আবার এই পথে নালন্দায় ফিরে যাব।'

শীলভদ্র একটু হাসিয়া নীরব হইলেন; যেন নিজের পরিচয় দিয়া বজ্রকেও পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বজ্র তাঁহার শান্ত মুখের পানে চাহিয়া অনুভব করিল ইনি সাধারণ কৌতূহলী মানুষ নয়, অন্য স্তরের মানুষ। চাতক ঠাকুরের সহিত ইঁহার আকৃতির কোনই সাদৃশ্য নাই, কিন্তু তবু যেন কোথায় মিল আছে। বজ্র স্থির করিল, ইঁহার কাছে কোনও কথা গোপন করিবে না। সে বলিল—'আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।'

শীলভদ্র তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন—'তুমি বুদ্ধিমান। তোমার পিতার নাম কি?'

'আমার পিতার নাম শ্রীমানবদেব।'

স্মিতহাস্যে শীলভদ্রের চক্ষুপ্রান্ত কুঞ্চিত হইল; তিনি বলিলেন—'আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তুমি মানবদেবের পুত্র শশাঙ্কদেবের পৌত্র। ত্রিশ বছর আগে তোমার পিতাকে আমি দেখেছিলাম। তখন তাঁর বয়স ছিল তোমারই মত।'

বজ্র ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'আমার পিতা কোথায়? তিনি কি—তিনি কি এখন গৌড়ের রাজা নয়?'

শীলভদ্র করুণনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—'না। কিন্তু আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব।'

শীলভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বজ্র নিজ জন্ম ও জীবন-কথা, মাতার মুখে যেমন শুনিয়াছিল, সমস্ত অকপটে বলিল; কর্ণসুবর্ণে আসার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন। শেষে কোমলস্বরে বলিলেন—'বৎস, তোমার পিতা জীবিত নেই। তুমি কর্ণসুবর্ণে যেও না; সেখানে এমন লোক এখনও জীবিত আছে যারা তোমার পিতাকে চিনত, তোমাকে দেখলে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। সেটা তোমার পক্ষে শুভ হবে না। তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাও, আর তুমি যে মানবদেবের পুত্র এ কথাটা গোপন রাখার চেষ্টা কোরো।'

বজ্র বলিল—'কিন্তু আপনি কি স্থির জানেন আমার পিতা জীবিত নেই?'

শীলভদ্র বলিলেন—'তোমার পিতার সম্বন্ধে যা জানি বলছি। ত্রিশ বছর আগে শশাঙ্কদেব গৌড়ের রাজা ছিলেন; মানবদেব ছিলেন যুবরাজ। তখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের যুদ্ধ চলছে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ; তাই যুদ্ধের উত্তেজনায় শৈবধর্মী শশাঙ্ক গৌড়ের বৌদ্ধদের ওপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে আমি নালন্দা থেকে গৌড়ের রাজসভায় শশাঙ্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। যুবরাজ মানবদেবও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ফলে আমি সিদ্ধমনোরথ হয়ে নালন্দায় ফিরে যাই, শশাঙ্ক তারপর আর কারও ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করেন নি। তোমার পিতার সঙ্গে সেই একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখেই তাঁর মুখ স্মরণ হয়েছিল।

'যা হোক, এই ঘটনার দশ বছর পরে শশাঙ্কদেব দেহ রক্ষা করলেন, মানব রাজা হলেন। মানব সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরে ভাস্কর বর্মা উত্তর থেকে গৌড় আক্রমণ করলেন। কজঙ্গলে মানবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। মানব পরাজিত হয়ে কর্ণসুবর্ণে ফিরে এলেন।

'কিন্তু ভাস্কর বর্মা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন;

---

* শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুবর্ণে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হল। এবারও মানব পরাজিত হলেন; রাজপুরী রক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ভাস্কর বর্মার হাতে বন্দী হলেন। জনশ্রুতি আছে, মানব যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়; তারপর তাঁর মৃতদেহ রাজপুরীর প্রাকার থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়।'

শীলভদ্র নীরব হইলে বজ্রও বহুক্ষণ কথা বলিল না। এই ভাবে তাহার পিতার জীবনান্ত হয়, তাই তিনি তাহার মাতার কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই কিন্তু—

বজ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন রাজা কে? ভাস্করবর্মা?'

শীলভদ্র বলিলেন—'না। কয়েক বছর হল ভাস্করবর্মার মৃত্যু হয়েছে। এখন তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা রাজা।' ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'ভাস্করবর্মাও ধর্মে শৈব ছিলেন, এবং বিদ্যানুরাগী সুজন ছিলেন। অগ্নিবর্মা শুনেছি ঘোর নরাধম। কিন্তু তার আর বেশী দিন নয়।'

'বেশী দিন নয় কেন?'

'অগ্নিবর্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মনিরত; রাজকার্য দেখে না। এই সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের এক রাজা গৌড়দেশ গ্রাস করবার ষড়যন্ত্র করছে; ইতিমধ্যে দণ্ডভুক্তি গৌড়ের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু অগ্নিবর্মার কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই। দেশের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয় তখন রাজারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হন। আজ গৌড় পুণ্ড্র সমতট সর্বত্র এই দেখছি। শাসনশক্তিহীন রাজারা রমণীর মত পরস্পর কোন্দল করছেন, নয় বিলাস-ব্যসনে গা ঢেলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের অবস্থা ঘুণ-চর্বিত কাষ্ঠের ন্যায়। অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুই-ই উৎসন্ন গিয়েছে। প্রজার মনে সুখ নেই, ধর্মজ্ঞানও লুপ্তপ্রায়। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর থেকে দেশের এই দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে। কতদিন চলবে জানি না। যতদিন না দেশে নূতন কোনও শক্তিমান রাজার আবির্ভাব হবে ততদিন দেশের মঙ্গল নেই।'—

নিশ্বাস ফেলিয়া শীলভদ্র নীরব হইলেন।

বজ্র প্রশ্ন করিল—'আপনি আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে বলছেন কেন?'

শীলভদ্র বলিলেন—'তুমি নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় কর্ণসুবর্ণে যাচ্ছ। বর্তমান রাজার লোকেরা যদি জানতে পারে তুমি মানবদেবের পুত্র, তোমার জীবন-সংশয় হবে; যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল তারা তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সন্ধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মৃত; ব্যর্থ অন্বেষণে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি?'

বজ্র বলিল—'আমার পিতা বেঁচে আছেন এ সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই?'

শীলভদ্র বলিলেন—'তোমার পিতা বেঁচে থাকলে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতেন। গত বিশ বছরের মধ্যে সেরূপ কোনও চেষ্টা হয়নি।'

সুদীর্ঘ নীরবতার পর বজ্র ধীরে ধীরে বলিল—'পিতার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে মা'র কাছে ফিরে যেতে আমার মন সরছে না। আমি কর্ণসুবর্ণে যাব, তারপর যা হয় হবে।'

শীলভদ্র বলিলেন—'আর একটা কথা। কর্ণসুবর্ণে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। জয়নাগের জাল গুটিয়ে আসছে, হঠাৎ একদিন সমরানল জ্বলে উঠবে, কর্ণসুবর্ণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। তুমি বাহিরে আছ, ইচ্ছা করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? জয়নাগ যে-কোনও মুহূর্তে মাথা তুলতে পারে।'

আবার জয়নাগ! বজ্র চকিত হইয়া বলিল—'জয়নাগ কে?'

'যে-রাজা গৌড়দেশ অধিকার করবার চক্রান্ত করছে তার নাম জয়নাগ।'

বজ্র নাগদের সম্বন্ধে যে-সন্দেহ করিয়াছিল তাহা আরও দৃঢ় হইল, কিন্তু এ বিষয়ে শীলভদ্রের সহিত আলোচনা করিবার স্পৃহা তাহার হইল না। সে করজোড়ে বলিল—'আপনার সহৃদয়তা ভুলব না। আজ আজ্ঞা করুন।'

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'কর্ণসুবর্ণে যাবে?'

বজ্র বলিল—'পিতৃ-পিতামহের রাজধানীর এত কাছে এসে আমি ফিরে যাব না। আমাকে কর্ণসুবর্ণে যেতেই হবে।'

শীলভদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'সকলই তথাগতের ইচ্ছা। যাও। কিন্তু এক কাজ কর, তোমার ঐ অঙ্গদ ঢাকা দিয়ে রাখো।

'কেন?'

'দেশে সোনার বড় অভাব হয়েছে। তোমার হাতে সোনার অঙ্গদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কর্ণসুবর্ণে দস্যু-তস্করের অভাব নেই।'

শীলভদ্র কর্পটের ন্যায় একটি বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজ হস্তে বজ্রের অঙ্গদের উপর তাগা বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন—'যদি নগরে অর্থাভাব হয় কোনও স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে অঙ্গদ থেকে সোনা কেটে বিক্রয় কোরো। অন্যথা অঙ্গদ কাউকে দেখিও না। অরাজকতার দেশে সাধুও তস্কর হয়।'

শীলভদ্রের পদধূলি লইয়া বজ্র বলিল—'আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ। কর্ণসুবর্ণে আপনার পরিচিত কেউ আছে কি?'

শীলভদ্র চকিত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—'পরিচিত অনেক আছে, কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ হবে না। তুমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা কোরো। তাঁর নাম কোদণ্ড মিশ্র, নগরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে তাঁর কুটির।'

'তিনি কে?'

'তিনি এক সময় তোমার পিতামহের সচিব ছিলেন।'

পিতামহের সচিব! বজ্র আগ্রহভরে শীলভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না।

অতঃপর বজ্র বিদায় লইল। শীলভদ্র দীপ নিভাইয়া অন্ধকারে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—সুগত, তোমার মনে কি আছে জানিনা। এই বালকের হৃদয়ে নিষ্ঠা আছে, ধৈর্য আছে, দৃঢ়তা আছে। যদি প্রাক্তন পুণ্যবলে ও পিতৃরাজ্য ফিরে পায়, হয়তো দেশের ভাগ্যও ফিরবে। তাই ওকে কোদণ্ড মিশ্রের কাছে পাঠালাম। এখন তোমার ইচ্ছা।'

(ক্রমশঃ)

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ

অনুবাদক : শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

[লাই গোটামি (Li Gotami) শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শেষ ছাত্রী, যাঁকে চিত্রশিল্পে শিক্ষাদান করেছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। ছোট্ট পরিবেশে, টুকরো কথার ভেতর দিয়ে শিল্পাচার্যের শিল্পী জীবনের সম্যকভাবে পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা তাঁরই ছাত্রী জীবনের স্মৃতিকথায়।]

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে। আমি মাঠে চলেছি বেড়াতে আর মেঘ দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে, হাতে আমার একটা বই আর বাদ্যযন্ত্র। সহসা দূর থেকে কার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, বক্তৃতার ভেতর দিয়ে কে যেন বলে চলেছেন,"...যদি তোমার গান গাইতে ইচ্ছে হয় গান গাও, যদি তোমার ছবি আঁকবার ইচ্ছে হয় ছবি আঁকো...আমি শিক্ষক ও স্কুলে বিশ্বাস করিনা..."

এ বাণী যেন বজ্রের মতো এসে আমাকে আঘাত করলো।

কে এই লোকটি যিনি এ কথা বল্লেন? এ যে আমারই চিন্তাধারা, আমারই মনের গভীরের প্রতিধ্বনি মাত্র! শৈশব থেকে একথাই যে আমার হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিনিয়ত বেজে চলেছে। আমার গতি রোধ হ'য়ে গেল, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা ছবি আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌লো। সাত বছর বয়সে চীনে যাদুকরের কাছে একটি ম্যাজিক দেখেছিলাম তারই কথা। যাদুকর শূন্য থেকে দু'টো জীবন্ত পায়রা বের ক'রে আনলেন। দু' হাতে দু'টোকে দর্শকদের সম্মুখে ধ'রে বলেছিলেন, "আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন?...বিশ্বাস করবেন না—এ সত্য নয়! যা' দেখছেন, তা' বিশ্বাস করবেন না! যা শুনছেন তা বিশ্বাস করবেন না! যা অনুভব করা যায় তাই বিশ্বাস করবেন।"

এই বক্তৃতার কথা আর সেদিনকার যাদুকরের কথায় কোথায় যেন সামঞ্জস্য ছিল. আমি যেন ঠিকভাবে ধরতে পারছিলাম না—যদিও অন্তরে অনুভব করছিলাম গভীর ভাবে ও দু'টো কথাই যেন একেরই প্রতিধ্বনি। যা কিছু সত্য তা' সহজভাবে আমাদের অন্তরে এসে সাড়া দেয়, সত্যের পথ সরল পথ। যা' শুনি যা দেখতে পাই, তার চেয়ে যা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সহজে সাড়া দেয়—যা উপলব্ধি করি, সেটাই আমাদের জীবনের কাছে চরম সত্য বলে মনে হয়।

এরপর অবনীন্দ্রনাথের প্রতিটি বক্তৃতা-সভায় আমি তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারিনি। প্রতিটি সভায় আত্মগোপন ক'রে বসে থাকার চেষ্টা করলেও, তাঁর লক্ষ্যচ্যুত হইনি আমি।

একদিন আমি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছি, তিনি গোপনে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়ে আমার বাজনা শুনে চলেছেন! হঠাৎ চুরুটের গন্ধে আত্মসম্বিত ফিরে এলো, চকিত হ'য়ে পেছনে তাকালাম।

"বাজিয়ে যাও—চমৎকার বাজনা", বল্লেন তিনি আমাকে।

খুব ভয় পেলাম, একটা অসহায় অবস্থা যেন আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লো। এতো বড় শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করা কম কথা নয়! যদিও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'বার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু ভয়ে করিনি। তিনি অতিরিক্ত বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয় ব'লে অনেকেই আমাকে পূর্ব্বেই হুসিয়ার করে দিয়েছিল। সুতরাং ভয়ে ভয়ে মুখে একটু ম্লান হাসির রেখা টেনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ ধ'রে শুনছেন আপনি?"

উত্তরের পরিবর্তে তিনি হেসে বলেন, "তুমি কে? এখানে তুমি কি করছো?" চুরুট টান্‌তে টান্‌তে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "কিছুদিন ধ'রে আমি লক্ষ্য করছি, তুমি দূরে ঐ মাঠে ব'সে থাকো একান্তে নিরালায়। ওখানে ব'সে কি কর?"

"আমি এখানে সঙ্গীত ও কলাভবনের ছাত্রী," বল্লাম আমি। "সন্ধ্যা বেলায় ঐ প্রান্তরে বসে আমি বই পড়তে ও বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসি, কিংবা বসে মেঘের গতি বিধি লক্ষ্য ক'রে আনন্দ পাই।"

তিনি বল্লেন, "যে সব সভায় আমি বক্তৃতা দিই সে সব স্থানেও আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছি। কেন তুমি একেবারে সভার শেষ প্রান্তে ব'সে থাকো? আমার বক্তৃতা যদি তোমার শোনবারই ইচ্ছে হয়, কেন তুমি কাছে এসে বসো না? আমার কথা তা' হ'লে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আমাকে তোমার এতো ভয় কেন?"

জানিনা, সহসা এ কথোর প্রশ্নে আমি লাল হ'য়ে উঠেছিলাম কিনা!

তাঁর যাদুকরের কথাগুলো আমার মনের আকাশে যেন আবার ভেসে উঠ্‌লো। "যা শোনো তা বিশ্বাস করোনা, যা দেখতে পাওনা তা বিশ্বাস করোনা, গভীর ভাবে যা হৃদয়ঙ্গম করবে—তাই বিশ্বাস করবে।"

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লোকমুখে যে উক্তি শুনেছিলাম, তাঁর সংস্পর্শে এসে তার সন্ধান আমি কিছুই পেলাম না। এতো সহজে তাঁকে পাওয়া যায়, আর এতো সহজ ও চমৎকার তাঁর ব্যবহার—এমনি একটি বৃদ্ধের সঙ্গে আর কখনো পূর্ব্বে পরিচিত হ'য়েছি কিনা, স্মরণ নেই!

কিছুক্ষণ পরেই আমার আঁকা ছবিগুলো নিয়ে তিনি আমায় তাঁর ঘরে যেতে বল্লেন। সমবয়সী দু'টি শিশুর মতো ছবিগুলো নিয়ে তাঁর ঘরে বসে আমাদের আলোচনা চল্‌লো।

সেদিন থেকে অবনীন্দ্রনাথের প্রতি যে ভয় পোষণ ক'রে এসেছিলাম, তা যেন একেবারে মিলিয়ে গেল।

কয়েকঘণ্টা পরে যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন তিনি আমার ছবিগুলোর দিকে আর একবার লক্ষ্য ক'রে স্মিত হাস্যে বল্লেন, "মনে হয় তোমাকে নিয়ে আমি কিছু কাজ করতে পারি। আমি যে ঘরে বসি, কাল থেকে তোমার ডেস্কটি ও আসনটি সে ঘরে নিয়ে আসবে। সেখানে আমার সঙ্গে ব'সে তুমি ছবি আঁকার কাজ করবে।"

মনে হ'লো যেন স্বর্গের দ্বার আমার সুমুখে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। আমি আমার ঘরে ছুটে গেলাম। শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করা, নিজে স্বয়ং শিক্ষা দেবেন—চিত্রশিল্প—ছাত্রীর কাছে এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কিইবা থাকতে পারে!

সে রাতে ঘুমুতে পারলাম না!

তাঁর সঙ্গে আমার চিত্রশিল্পের কাজ আরম্ভ হ'লো। ছোট্ট শিশু যেমন হাল্কা মনে খেলা করে, তেমনি সহজ অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে। বস্তুতঃ খেলা, গান, গল্প আর খেলনা-তৈরীর ভেতর দিয়েই আমাদের কাজ এগিয়ে চল্‌লো।

ছন্দ ও সঙ্গীত, রঙ ও রসিকতার মতোই তাঁকে আকর্ষণ করতো খুব বেশি। যখন আমি কাজ করতাম তিনি তখন খেলনা-তৈরী বা ছবি আঁকতেন—আর তার মাঝে মাঝে কৌতুকপূর্ণ গল্প বলতেন, সে সূত্রে সঙ্গীত ও হাসির প্রবাহ বয়ে যেতো।

—অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, চিত্রশিল্পকে সংগীত, নৃত্য, নাটক বা আত্মপ্রকাশের অন্যান্য পথ থেকে বিমুক্ত করে দেখা অপরাধ মাত্র। বস্তুতঃ সত্যকারের শিল্পী-জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে হ'লে চিত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আত্মপ্রকাশের অন্যান্য শিল্পকলার অনুশীলন করতে হ'বে। যে কোনো শিল্প ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য। এ পন্থাই শিল্পীর জীবনকে আরও আনন্দময় ক'রে তুল্‌বে।

আইন-কানুনের ধার তিনি ধারতেন না। শিশুকাল থেকে আমিও যেন ধরা বাঁধা নানা আইন-কানুনের পক্ষপাতী ছিলাম না। জন্ম থেকেই বিদ্রোহ ভাবটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতো আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না।

একদিন ভোরে ছোট্ট একটি ছেলে এসে হাজির হ'লো আমাদের স্টুডিওতে পায়রার একটি ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে। ছেলেটি পিতৃমাতৃহীন, সন্নিকটেই থাকে, ছবি এঁকে কাজের গাফিলতির জন্য সে তার মনিবের কাছে তিরস্কৃত হ'য়েছে, তাই সে এসেছে ছুটে! পায়রার ছবিটা আঁকার মধ্যে তার কৃতিত্বের পরিচয় ছিল যথেষ্ট। তাকে তখনই আমরা গ্রহণ করলাম এবং অবিনাশ সেদিন থেকে আমাদেরই সঙ্গে আমাদের স্টুডিওতে ছবি আঁকার কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে।

"এখন থেকে আমি তোমায় শেখাবো, আর তুমি চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবে অবিনাশকে," বল্লেন অবনীন্দ্রনাথ। "তোমার পক্ষে এটা ভালোই হ'লো এবং আমিও দেখ্‌বো—তুমি আমার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করছো। কিন্তু বলে দিচ্ছি—যদি অবিনাশ শিখতে না পারে, তবে বুঝ্‌বো সেটা তার দোষ নয়, দোষ তোমার।"

কিছুদিন পর অবনীন্দ্রনাথ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পলাশ গাছের তলায় অবিনাশকে কি বলছিলে?"

"আপনি আমাকে যা বলেছেন, তাই ওকে বলছিলাম। যদি তোমার গান গাইতে ইচ্ছে হয় গান গাও, যদি তোমার নাচতে ইচ্ছে হয় নাচ, যদি তোমার ছবি আঁকতে ইচ্ছে হয় তুলি টেনে নিয়ে ছবি আঁকো কর! এ ছাড়া আমার নিজেরও বক্তব্য কিছু বলেছিলাম, গুরুদেব!"

"সেগুলো কি বলছিলে ?"—জিজ্ঞেস করলেন অবনীন্দ্রনাথ।

"বলেছিলাম—চিত্রশিল্প অনুশীলনে আমি আইন কানুনের ধার ধারিনা। যেমনি, ছবির সাধারণ দৃশ্যের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে লাল দেওয়া চলবে না, সুমুখে নীল প্রয়োগ অশোভন ইত্যাদি। কিংবা লাল রঙের গরু বা সবুজ রঙের মানুষ আঁকা অসংগত। আরও বলেছিলাম, যদি দৃশ্যে গরুটি লাল বলে তোমার মনে হয়, মানুষ সবুজ বলে প্রতিভাত হয়, তবে নির্ভয়ে তুলিতে সেই রঙ্‌ লাগিয়ে আঁকতে আরম্ভ করবে। যারা বলে থাকে, আমরা তো এমনি গরু বা মানুষ দেখতে পাইনে, তারা সত্যিকারের শিল্প জগতে বাস করেনা। চীনে যাদুকর একদিন যা আমাকে বলেছিল, আমি সে কথাগুলিও তাঁর কাছে আবৃত্তি করলাম। যা শোনো বা ভাখো তা বিশ্বাস করবে না, যা অনুভব করবে—তাই বিশ্বাস করবে !"

অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য শোনবার অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। ভয় হ'লো অবিনাশকে এভাবে উপদেশ দেবার জন্য শিল্পাচার্য হয়তো আমাকে ভর্ৎসনা করবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্লেন, "ভালো,—কিন্তু তুমি কি ওকে বলেছ লাল ও সবুজের সঙ্গে আর কি মেশালে গরু ও মানুষের ছবি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠ্‌বে ?"

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ সাধারণ গতানুগতিক পথ নয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তাঁর শিক্ষার ধারা ছিল প্রোজ্জ্বল। সহজ ভাবে, খেলার ছলেই তিনি শিক্ষা দিয়ে যেতেন, ঠিক যেন স্কুলের সহপাঠীর কাছ থেকে নতুন কিছু জ্ঞান লাভ করা।

ছবি আঁকার সময় ভয়ে ভয়ে আমি কাজ করে থাকি— এ সত্যটুকু অবনীন্দ্রনাথের কাছে একদিন ধরা পড়লো।

"কেন এতো ভয় কচ্ছ ?" বল্লেন তিনি। "যদি তোমার ছবিটাই নষ্ট হ'য়ে যায়, এতে শুধু দু'টো পয়সাই নষ্ট হবে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।"

তাঁকে বল্লাম, "ছোটবেলা থেকেই এমনি শিক্ষা লাভ করেছি—যে কাগজটুকুতে ছবি আঁকি তাকে স্বর্ণের পরিমাপেই বিচার ক'রে থাকি। প্রতিটি তুলির টান দেবার পূর্বে তিনবার ক'রে চিন্তা করি।"

আমার কথা শুনে তিনি সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন। দুষ্টু হাসির রেখা টেনে তিনি বল্লেন, "এসো তোমরা দু'জনে ভাখো, তোমাদের ভীতি আমি চিরকালের জন্য নষ্ট করে দিচ্ছি !"

স্টুডিওর ভেতর যেন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'লো।—নতুন কিছু একটা হ'তে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথকে দেখেও একটু অদ্ভুত ও চঞ্চল মনে হ'লো। আমরা দু'জনে এসে তাঁর সুমুখে দাঁড়ালাম, তাঁর কোলের উপর রক্ষিত সুন্দর ছবিটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম, ভোর থেকেই এ ছবিটি তিনি আঁকছিলেন। ছবিটি আঁকা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, দেখ্‌তে চমৎকার লাগ্‌ছে।

আমায় তিনি বল্লেন, "যাও বাথ-রুম থেকে আমার টুথপেষ্ট্‌ ও টুথ্‌ব্রাসটা তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে এসো।"

আমি নিশ্চল হ'য়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, অন্যমনস্কভাবে হয়তো কিছু তিনি বলেছেন। তখন পেষ্ট্‌ ও টুথ্‌-ব্রাসের কি-ই-বা প্রয়োজন থাকতে পারে ?

তিনি আদেশ করলেন, "যাও, নিয়ে এসো।" কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, টুথ্‌পেষ্টের টিউবটা টিপে টুথ্‌পেষ্ট বের ক'রে ছবিটির উপর একটা লাইন টেনে গেলেন। আমরা বিস্মিত হ'য়ে গেলাম !

"দয়া ক'রে অমনি করবেন না আপনি," চীৎকার ক'রে আমি তাঁর হাতটি টেনে ধরলাম একদিকে—যে হাতে তাঁর টুথ্‌পেষ্টের টিউবটি ছিল, আর তাঁর অপর হাতটি অবিনাশ জোরে ধরে রাখলো—যাতে টুথ্‌ব্রাসটি তিনি ব্যবহার না করতে পারেন। মনে হ'লো, আমরা এখনি কেঁদে ফেলবো।

আমি অনুরোধ করলাম, "আপনি এতো সুন্দর ছবিটিকে ও-ভাবে নষ্ট করবেন না।" কিন্তু তিনি আনন্দে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "ছবি নষ্ট হবার ভয়ে যদি সর্বদাই ভীত হ'য়ে কাজ কর তবে চিত্রশিল্পী হ'তে পারবে না। আমার হাত মুক্ত ক'রে দাও, ভাখো আমি তোমাদের কিছু দেখাচ্ছি।"

"কি ?"—আমরা সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম।

তিনি বল্লেন, "ম্যাজিক ! তোমরা দু'জনেই চুপ ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও ওখানে।"

আমরা উৎসুক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম ছবিটির দিকে। তাঁর কোলের সুন্দর ছবিটির উপর চার ইঞ্চি লম্বা টুথ্‌পেষ্টের একটি লাইন চলে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ আনন্দে হেসে উঠলেন। বল্লেন, "এই ভাখো দুষ্টু শাদা সাপটি, ভাব্‌ছে আমার এ ছবিটিকে গ্রাস ক'রে ফেলবে; কিন্তু সে এখনো জানেনা যে তাকে আমি মাংসে পরিণত করবো। এখন লক্ষ্য কর। টুথ্‌ব্রাসটি নিয়ে টুথ্‌পেষ্টগুলি সমস্ত ছবিটার উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিলেন তিনি।

"এখন ছবিটিকে আমরা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেব" এই ব'লে জলের টাবের ভেতর ছবিটি ফেলে দিলেন তিনি। ছবিটিকে যখন জল থেকে বের করে আনা হ'লো—ছবিটি বিবর্ণ হ'য়ে গেল না, বরং ছবিটি দেখতে বেশ ভালোই লাগ্‌লো। আমি ও অবিনাশ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে যেন ছবিটি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হ'লাম।

ঠিক সে সময়ে চা এলো। ছবিটি তুলে ধরে ছবিটির দিকে তাকিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন, "এর উপর আর কি দিতে পারি, বলো অবিনাশ ?"

অবিনাশ তার চোখ টিপে দুষ্টুমির একটু হাসি হেসে বল্লে, "কেন, চা দিতে পারি !"

"হাঁ, এটা ভালো আইডিয়া," তিনি বল্লেন। "ছবিটার উপর চা ঢেলে দাও," বল্লেন তিনি আমাকে।

অবিনাশের এই পাগলামো ইঙ্গিতে আমি খুব বিরক্ত হ'য়ে অবনীন্দ্রনাথকে বল্লাম, "না, দয়া ক'রে ও কাজ করবেন না। যা গরম ধুঁয়ো বের হ'চ্ছে চা থেকে, সমস্ত ছবিটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে তিনি পুনরায় উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। বল্লেন, "যে ম্যাজিক তোমরা দেখতে যাচ্ছ তার অর্ধেকও এখন পর্য্যন্ত তোমরা দেখনি। ভয় পেলে চিত্রশিল্পী হ'তে পারবে না তোমরা।"

অবনীন্দ্রনাথ ছবিটির উপর ক্রমান্বয়ে চা, দুধ ও চিনি ঢেলে দিলেন। ছবিটি যখন খুব শুকিয়ে গেল, তখন তিনি ছবিটির'দু' এক জায়গায় এখানে সেখানে একটু তুলি দিয়ে বুলিয়ে দিলেন, তারপর হাল্কা একটু বার্ণিশ ব্যবহার করলেন।

"সত্যিই এখন অনুভব ক'চ্ছ ছবিটি নষ্ট হ'য়ে গেছে?"—জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ছবিটি যেন পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠলো। এতক্ষণ যা এতে প্রয়োগ করা হ'লো, তা'তে ছবিটি যেন আরও মাধুর্য্যপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

"আপনি সত্যকারের যাদুকর, শিল্পাচার্য !" বিস্ময়ে বার বার প্রশংসা করতে লাগ্‌লাম।

এ ভাবেই অবনীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষাদান করতেন। শুধু একটি পন্থাই এখানে উল্লেখ করলাম মাত্র।

স্মরণ হয়, তাঁর ছবি নিয়ে তিনি কত রকমই না অভিনব পরীক্ষাই চালাতেন।

ভোরে হয়তো তিনি একটি দৃশ্যপট আঁকায় ব্যাপৃত। দুপুরে আহারের পূর্বে হয়তো ছবিটি একেবারে সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আহারের পর ফিরে এসে দেখি, একটি নতুন ছবি আঁকা চলেছে তাঁর, হয়তো সন্ধ্যারক্ত দৃশ্য বা এমনি একটা কিছু, ছবিটি প্রায় সমাপ্তির পথে।

আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলাম, "ভোরের সেই ছবিটি—কোথায় আপনার, ছবিটি কি আঁকা শেষ হ'য়ে গেছে?"

প্রত্যুত্তরে তিনি বলে উঠতেন, "এইতো সেই ছবিটি।" ছবিটি উল্টে ধরতেন তিনি, দেখতে পেতাম ভোরের প্রায় সেই সম্পূর্ণ আঁকা ছবিটির ক্ষীণ রেখা এখনো ম্লান হ'য়ে ফুটে রয়েছে!

"ছবিটি উল্টে ধ'রে মনে হ'লো এ ছবিটিই সুন্দর হবে বেশি, তাই ওটার পরিবর্ত্তে 'দৃশ্য' এঁকে ফেল্লাম।"—বলতেন তিনি।

অবনীন্দ্রনাথের আরেকটি অভ্যাস ছিল। এ অভ্যাসটি তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছাড়তে পারেন নি। তিনি প্রথমে একটি বড় ক'রে সুন্দর ছবি আঁকতেন। ছবিটি আঁকা একেবারে সম্পূর্ণ হ'লে তাকে পুনরায় ছোট ছোট ক'রে কেটে সেটাকে অনেকগুলো টুকরো ছবিতে পরিণত করতেন। তাঁর এ অভ্যাসটির জন্য আমরা আমাদের আঁকা ছবির জন্য সতর্ক হ'য়ে থাকতাম। ষ্টুডিও ছেড়ে বাইরে গেলে হয় নিজেদের আঁকা ছবি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতাম, নয়তো তাঁর দৃষ্টির অগোচরে লুকিয়ে রাখতাম।

বস্তুতঃ অবনীন্দ্রনাথের কাঁচি-জোড়া যেন আমার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হ'তো। কখন যে বড় একখানা ছবি টুকরো টুকরো হ'য়ে চার বা' পাঁচখানা ছবিতে পরিণত হ'য়ে যাবে আত্মবিসর্জন দিয়ে, তা কেউ না জানে!

রাগ ক'রে কাঁচি-জোড়া একদিন লুকিয়ে রাখলাম।

"আমার কাঁচি কোথায় গেল?"—জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কাঁচি জোড়া ঠিকই উবে গেছে, গুরুদেব," আমি জোর দিয়ে বল্লাম। "এটা আপনার একটা রোগ বিশেষে দাঁড়িয়েছে। যে ভাবে আপনি আপনার চমৎকার ছবিগুলোকে শিরচ্ছেদন করছেন তা লজ্জায়ই বিষয়। যদি ছবিগুলোকে মর্যাদা না দিতে পারেন, তবে ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দিন, কিন্তু ও ভাবে কেটে নষ্ট করবেন না! এ ব্যাপার আমিও আর দেখতে পারি না, আমার যেন অসহ্য হ'য়ে দাঁড়ায়!"—একথা বলেই আমি ষ্টুডিও থেকে বের হ'য়ে গেলাম, চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়লো।

আমার হৃদয়ের ব্যথা অবনীন্দ্রনাথের কাছে অগোচর রইল না। মিনিট দশেক পর, চাকরটি অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি পুতুল ও ছোট্ট চিঠি নিয়ে এসে হাজির হ'লো আমার কাছে। লেখা আছে, "আমি বিশেষ দুঃখিত, ফিরে এসো এখুনি।"

অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রশিল্পী আর গল্প বলিয়েই ছিলেন না, মনঃসমীক্ষণেও ছিলেন পারদর্শী—তাই যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তিনি সকলেরই হৃদয় জয় করতে পেরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু গল্পই বলা যেতে পারে। তাঁর তুলি ও রঙ্-এর উপর প্রভুত্ব, চিত্রাঙ্কনের ভেতর দিয়ে হাস্যকৌতুক, কাঠ ও টিনের টুকরো থেকে নানা অবয়ব আবিষ্কার—সব মিলে অবিনাশ ও আমার কাছে সত্যকারের ম্যাজিক বলেই মনে হ'তো। শ্রদ্ধানত হ'য়ে তাঁকে প্রায়ই বলতাম, "আপনি সত্যি একজন যাদুকর গুরুদেব।" হয়তো তাঁকে একথা হাজারবার বলেছি এবং এ সত্যটুকু হৃদয় দিয়েও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি আমি।

একদিন তিনি আমায় ডেকে ধারাবাহিক কিছু ছবি আঁকার জন্য আদেশ করলেন। "এক একটি পৃথক ছবি আঁকার মধ্যে কিছু নেই, আমি চাই তুমি তোমার পছন্দ মতো যে কোনো বইর ভিত্তিতে ছবি এঁকে তাকে প্রদীপিত কর।"

এ আদেশ পেয়ে, এ সমস্যার সমাধান করতে আমি কদ্দিন ঘুরে বেড়ালাম—কোন্ বইখানা আমি সম্ভবত চিত্রে রূপ দিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, হাজার হাজার ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় প্রসিদ্ধ বইগুলো যা সকলেরই সুপরিচিত—তার একটাও আমার মনে প্রেরণা যোগাতে পারলে না।

অবনীন্দ্রনাথকে বল্লাম, "কি যে করবো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যে বইগুলো আমি পড়েছি, তার একটা বইও চিত্রে রূপ দিতে আমি প্রেরণা পাচ্ছি না। 'হজরত' অন্তর্ধান হ'য়েছে অনুগ্রহ ক'রে তাকে একবার ধ'রে দিন।

'প্রেরণা' বুঝতেই আমরা 'হজরত' শব্দটি ব্যবহার করতাম। যেদিন অবনীন্দ্রনাথ কাজে মন বসাতে পারতেন না, একঘেয়েমি অনুভব করতেন, সেদিন হাস্যচ্ছলে আমাকে বলতেন, "আজ হজরত অন্তর্ধান হ'য়েছে।"

এ 'হজরত' কথাটির মুখে একটি চমৎকার কৌতূহলপূর্ণ গল্প আছে। অবনীন্দ্রনাথ একদিন গল্পটি অবিনাশ ও আমাকে বলেন।

একটি মুসলমান যাদুকর দর্শকদের কাছ থেকে নানা জিনিষ সংগ্রহ ক'রে, তা শূন্যে বিলীন ক'রে দিতেন, তারপর তিনবার করতালি দিয়ে 'হজরত, হজরত, হজরত' বলতেই জিনিষগুলো শূন্য থেকে বের হ'য়ে আসতো।

"দর্শকদের পক্ষে কিন্তু এটা বিপজ্জনক বলেই বোধ হতো। কারণ, একদিন যাদুকরটি জনৈক দর্শকের কাছ থেকে তাঁর সোনার পকেট ঘড়িটি ধার নিলেন, ঘড়িটি অন্তর্ধান হ'লো," বল্লেন অবনীন্দ্রনাথ।

ঘড়ির মালিক যাদুকরকে বল্লেন, "ঘড়িটি বের করুন।" যাদুকর 'হজরত—হজরত—হজরত' উচ্চারণ করলেন। কিন্তু সবই বিফল হ'লো, ঘড়িটি আর ফিরে এলো না। শেষে যাদুকর বল্লেন, "হজরত অন্তর্ধান হ'য়েছে, তিনি অসহায়, ঘড়িটি আর বের করতে পারবেন না।"

এ অর্থেই অবনীন্দ্রনাথকে আমি বলেছিলাম, "আপনি 'হজরতকে' ধরে কাছে দিন, যা'তে ক'রে আপনার আদেশ অনুসারে বইর ভিত্তিতে ধারাবাহিক চিত্রের রূপ দিতে পারি।"

কৌতুকের মধ্যেই কখনও কখনও সত্যকারের স্বপ্ন নিহিত থাকে। এ কৌতুক ছলেই অবনীন্দ্রনাথ 'হজরত—হজরত—হজরত' বলে শূন্য থেকে অদৃশ্য কি যেন আমার জন্য ধরলেন। আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, "শক্ত ক'রে ধর, আমার নিজের 'হজরতকে' তোমার কাছে পরিচালিত কচ্ছি। শক্ত ক'রে ধর, যাও তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো বইর ভিত্তিতে চিত্ররূপ দান কর।"

এ চমৎকার কৌতুক সন্দেহ নেই। এ কৌতুকের মধ্যে যে যাদুমন্ত্র নিহিত ছিল, সে প্রেরণায় আমার অভিপ্স বস্তুর সমাধান হ'লো। আমার অন্তরের দু'টি কল্পনাকে আমি শব্দে ও চিত্রে রূপায়িত ক'রে তুললাম। 'আমার 'যাদুকর' ও 'স্নানাগার' সচিত্র বই দু'টি সেই শ্রেষ্ঠ-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। এই শ্রেষ্ঠ যাদুকর চিত্রশিল্পী রং ও কালিতে, কাঠ ও পাথরে, কথা ও কল্পনায় আমার কাছে এক অভিনব সুন্দর ও অদ্ভুত জগৎ সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন, মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি আমি।

শিল্পাচার্যের সঙ্গে যে ক'বছর কাজ করবার আমার সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁর কাছ থেকে আমি বহু উপহারই লাভ করেছি। তাঁর দেওয়া সেই অমূল্য সম্পদ ছবি, স্কেচ, পুতুল, খেলনা আরও বহু ছোটোপাটো জিনিষগুলো আজো আমার দৃষ্টি এড়ায় না। তারা যেন আমায় ঘিরে কথা বলে, শুনতে পাই! কিন্তু সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার যা তিনি আমায় দিয়ে গেছেন, তা দেখা ও শোনার বাইরে—তা আমার অন্তরের গভীর অন্তঃপুরে আজো অনুভব করি, তা হ'লো প্রেরণার গোপন তথ্য।

তবু তুমি আস নাই

আশা দেবী

তিস্তার চরে উড়ে উড়ে যেত
দূরাচারী মরালের দল :
কাঁচের মতন জলে ছায়া ফেলে
আসন্ন বাদল,
তোমার পায়ের ধ্বনি শুনিতাম
মর্ম্মরিত আমলকি বনে—
ছায়া ফেলা ফেলা পথ
দীর্ঘ মনে হতো সেইক্ষণে।

তবু তুমি আস নাই
মন যবে আগ্রহে ব্যাকুল,
পথের কাঁটার দলে
সবে ভরে যেত ফুলে ফুল
আমার আঙ্গিনা তলে
যবে ফেলা নারিকেল ছায়ে
ঘুঘুরা ঘুমায়ে যেত মুখে মুখ দিয়ে।

অদূরে বাধের জলে ঝরে যেত
সজিনার ফুল,
মনের পলাশ বনে
যবে ভরে যেত নব-কিশলয়
আসন্ন ফাগের রঙে
কেবলি যে খুঁজেছি তোমায়।

তিস্তার চঞ্চল স্রোতে
ভেসে গেল উজানী পশরা :
ভিন গাঁয়ে চলে গেল—
লাল চেলি পরা নব বধূ
আমার আকাশ ঘিরে
এলো না তো সোনালী স্বপন-
বুনো হাঁস উড়ে গেল—
শূন্য নদী—চর,
পেল না তো নীড়ের সন্ধান॥

অভিনেতা, গায়ক ও চিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলাকার কথা-প্রসঙ্গে নিজে এক জায়গায় বলেছেন—"ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে. বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি।"

শরৎচন্দ্রের এই বিশেষ বৈচিত্র্যের লোভটি শুধু যে তাঁর ছেলেবেলাতেই ছিল তা নয়, জীবনের বহুদিন পর্যন্তও তিনি এই লোভ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কারণ যাত্রা-থিয়েটার ও গান-বাজনার উপর তাঁর একটা সহজাত ঝোঁকই ছিল। আর এই ঝোঁকের জন্যই তিনি তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই সাকরেদ থেকে একেবারে গুরুর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্র তাঁদের পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে একটা ছোট থিয়েটারের দল গঠন করেছিলেন। আর শুধু দল গঠনই নয়, এই দলটি কয়েকবার অভিনয়ও করেছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই দলের প্রাণস্বরূপ। তিনি একাধারে প্রযোজক, শিক্ষক, অভিনেতা সব কিছুই ছিলেন।

কোন নাটক অভিনয় করতে গেলে রীতিমত রিহার্সালের দরকার। তার উপর দলের সকলেই ছিলেন ছেলেমানুষ। তাই নাটক অভিনয়ের পূর্বে তাঁদের দস্তুর মত রিহার্সাল দিতে হ'ত। অভিভাবকদের লুকিয়ে, যখনই সকলে একত্র জুটতে পারতেন তখনই রিহার্সাল চালাতেন। আর রিহার্সালও হ'ত গুরুজনদের অজ্ঞাতে—কখন নির্জন যমুনিয়ার তীরে, কখন ভাঙা ও পরিত্যক্ত দেবালয়ে, আবার কখনও বা মুসলমানদের কবর স্থানে। এই থিয়েটারের দলটি সম্বন্ধে দলের অন্যতম সদস্য শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন—"আমরা যে পাড়ায় থাকিতাম, তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ার প্রতিবেশী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক ও শিক্ষক।......এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানদের কবরস্থান, দেব স্থান, কোন স্থানই বাদ যাইত না।"

এই সময় ভাগলপুরের আদমপুর পল্লীতে "আদমপুর ক্লাব" নামে একটা খুব নাম-করা ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের কর্ণধার ছিলেন স্থানীয় রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র। এই কুমার একাই ক্লাবের প্রায় সমস্ত ব্যয় ভারই বহন করতেন। ক্লাবে একদিকে যেমন টেনিস, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি নানারকমের খেলা-ধূলা হ'ত, আবার তেমনি সংগীত-চর্চা এবং নাটকের অভিনয়ও হ'ত। শরৎচন্দ্র এই আদমপুর ক্লাবেও যোগ দিয়েছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্লাবের একজন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। আদমপুর ক্লাব বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে সর্বপ্রথম অভিনয় করেছিল। এই নাটকে শরৎচন্দ্র মৃণালিনীর ভূমিকায় সাফল্যের সহিত অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ক্লাব যখন জনা ও বিল্বমঙ্গল নাটকের অভিনয় করে, শরৎচন্দ্র তখন এই দুই নাটকে যথাক্রমে জনা ও চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

আদমপুর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ— ভূমিতে উপবিষ্টদের মধ্যে বামদিকে প্রথমেই শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র একজন ভাল অভিনেতা হলেও অভিনয় অপেক্ষা সংগীতের উপরই কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মিষ্ট। তিনি একবার যে-গান শুনতেন, পরমুহূর্তেই সেই গানটি অবিকল সেই সুরে গাইতে পারতেন। শরৎচন্দ্রের গলা যেমন মিষ্টি ছিল, তেমনি তাঁর সুর নকল করার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়ীতে থাকতেন, সেই সময় প্রসিদ্ধ গায়ক ও লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের

পাড়াতেই বাস করতেন। এই সুরেনবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই গানের ও সাহিত্যের আসর বসত। শরৎচন্দ্র সংগীত ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে সুরেনবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। যেদিন গানের কি সাহিত্যের মজলিস্ হ'ত সেদিন শরৎচন্দ্র সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় নানা ফাইফরমাস্ খাটতেন এবং অতিথিদের চা, পান ও তামাক সরবরাহ করতেন।

এই সময়েই সুরেনবাবুর ছোটভাই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। রাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল রাজু।* রাজুও আদমপুর ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ক্লাবের মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ে রাজু যথাক্রমে গিরিজায়া ও পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

রাজু শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অল্প কিছু বড় ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বন্ধুটিকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি তাঁর আদেশ এবং নির্দেশও একজন অনুরাগী শিষ্যের মতই মেনে চলতেন। রাজু সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারতেন। আর হারমনিয়াম, তবলা, বেহালা প্রভৃতিতেও তাঁর ভাল হাত ছিল। শরৎচন্দ্র এই রাজুর কাছ থেকে সমস্ত যন্ত্রই অল্প-বিস্তর বাজাতে শিখেছিলেন।

রাজু যে শুধু যন্ত্র-সংগীতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তা নয়, নানারকম দুঃসাহসিক কাজেও তিনি ওস্তাদ ছিলেন। গভীর রাত্রে জেলেদের ফাঁকি দিয়ে নদীতে তাদের মাছ চুরি করতে যাওয়া, আবার সেই রাত্রেই লুকিয়ে মাছ বিক্রী করে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা, রোগীর সেবা ও মৃতদেহের সৎকার করা প্রভৃতি কাজে রাজুর জোড়া ছিল না। রাজুর এই সব দুঃসাহসিক কাজে শরৎচন্দ্রই ছিলেন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ও সহায়ক।

ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের বাড়ীতে একদিন বিল্বমঙ্গল অভিনয়ের রাত্রিতে রাজু নিরুদ্দেশ হন. সেই থেকে তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

রাজুর সংস্পর্শে আসার ফলে শরৎচন্দ্র যেমন যন্ত্র-সংগীত শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের সাহসও খুব বেড়ে গিয়েছিল। ভূতের বা সাপের ভয় তিনি আদৌ করতেন না। গভীর রাত্রে একাই তিনি গান গেয়ে ও বাঁশী বাজিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার এই সাহস ও গান-বাজনার কথা উল্লেখ করে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন—

"আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়ত এখনো আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটির সদ্গুণে 'মামদো' ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবর স্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ামসহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনদের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।"

শরৎচন্দ্র বিহারে বনেলী স্টেটে যখন চাকরী করতেন, সেই সময় (১৯০০ খ্রীঃ) একদিন তিনি কি ভেবে, কাকেও কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। তারপর গেরুয়া পরে সাধু বেশে তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি মজঃফরপুর শহরে আসেন। মজঃফরপুরে এসে শরৎচন্দ্র সেখানকার এক ধর্মশালায় উঠেছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্র রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসে আপন মনে গান গাইতেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শুনবার জন্য নীচে এদিকে রাস্তায় লোকের ভীড় জমে যেত।

এই গানের ব্যাপার নিয়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই সময় মজঃফরপুরের বিখ্যাত উকিল শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সুলেখিকা অনুরূপা দেবীর পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি এঁদের বাড়ীতেও কিছুদিন থেকেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই সময় এঁদের যে কি ভাবে পরিচয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনুরূপা দেবী নিজেই লিখেছেন—

"মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়. অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু তা নয়, লোকটি বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসব তাকে? গান শুনবে? তার খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে ভাল হয়।'...বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন ভাল কোন গায়ক পাওয়া গেলে গান বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ীর অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন।"

মজঃফরপুরে থাকার সময় অল্পদিনের মধ্যেই একজন ভাল গায়ক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এই সংগীতের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মজঃফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহুরও পরিচয় হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হলে মহাদেব সাহু শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতেও কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তখন শরৎচন্দ্র শিখরনাথবাবুর বাড়ী ছেড়ে মহাদেব সাহুর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। মহাদেব সাহু অত্যন্ত সংগীত-প্রিয় মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্রের গান শুনবার জন্যই তিনি বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্র চাকরীর সন্ধানে রেঙ্গুনে গিয়ে সেখানে যখন আবার বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় একবার এক বাউল গানের সূত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানকার ডেপুটি এগ্‌জামিনার অব্‌ একাউন্টস্ মণি মিত্রের পরিচয় হয়। মণিবাবু

---

* এই রাজুই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্রের গান শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর থেকেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে ওঠে। তখন মণিবাবু শরৎচন্দ্রকে নিজের অফিসে একটা চাকরী করে দেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত সেই চাকরীই করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব' নামে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ক্লাবের সদস্যরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংগীত, অভিনয়-চর্চা প্রভৃতিতে সময় কাটাতেন। শরৎচন্দ্রও এই ক্লাবের একজন সদস্য ছিলেন। ক্লাবের সদস্যরা যেদিন থেকে শরৎচন্দ্রকে গায়ক হিসাবে জানতে পারেন, সেইদিন থেকেই তিনি ক্লাবের প্রধান গায়ক হয়ে দাঁড়ান।

শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল রবীন্দ্র-সংগীত। তাই তিনি ক্লাবে প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সংগীতই গাইতেন। এ ছাড়া কীর্তন এবং ভজন গানও তিনি গাইতেন। আবার নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রাচীন কবিদের গানও মাঝে মাঝে গেয়ে শোনাতেন। ক্লাবের সদস্যরা মুগ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রের গান শুনতেন এবং তাঁর গান বারবার শুনতে চাইতেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে কবি নবীনচন্দ্র সেন একবার রেঙ্গুনে যান। তখন বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে নবীনচন্দ্রকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেদিনকার সেই সম্বর্ধনা সভায় উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের গানে মুগ্ধ হয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁকে "রেঙ্গুনরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে আসার পর কোন প্রকাশ্য সভায় বা কোন বৈঠকী আসরে, এমন কি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছেও আর গান করেন নি। তবে অনেক সময় তিনি একা থাকলে আপন মনে গান গাইতেন। এই সময় অবশ্য যদি কেউ এসে পড়তেন, তাহলেও তিনি গান বন্ধ করতেন না। এইভাবে শরৎচন্দ্রের গানের হঠাৎ-শ্রোতা হিসাবে তাঁর বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী গিরিজাকুমার বসু লিখেছেন—

"সকালবেলা চা খেতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে কতদিন তাঁকে গান গাইতে শুনেছি—বেশ মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। 'এই করেছ নিঠুর তুমি এই করেছ ভালো', 'পথের পথিক করেছ আমারে' রবীন্দ্রনাথের এই গান দুটি, বৈষ্ণব পদাবলীর 'বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে' নিধুবাবুর 'ভালো বাসিবে ব'লে' আর গোপাল উড়ের কয়েকটি গান তাঁকে প্রায়ই গাইতে শুনেছি!" (বিচিত্রা—মাঘ ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম আপন মনে গান গাইবার সময় কেউ এসে গেলে, গান বন্ধ করতেন না বটে, কিন্তু পরে তিনি গাইবার সময় কেউ এসে গেলেই গান বন্ধ করে দিতেন এবং শত অনুরোধ করলেও আর গাইতেন না। শরৎচন্দ্রের এই প্রকারের স্বভাবের উল্লেখ করে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "যাঁদের দেখেছি" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

"...আমি তখন পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পুরাতন বাড়ীতে। মা এসে বললেন, 'তোর পড়বার ঘরে কে একটি ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইছেন।' বিস্মিত হয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, গালিচার উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব'সে আপন মনে গান গাইছেন শরৎচন্দ্রই। কণ্ঠস্বরে ওস্তাদির ছাপ না থাকলেও বড় মিষ্ট গলা। গাইতেও পারেন ভালো। কিন্তু আমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গান থেমে গেল। বহু অনুরোধেও আর তিনি গাইলেন না। এর পরেও প্রায় তিনি আমার ঘরে এসে বসতেন, সেখানে তাঁর কণ্ঠে দ্বার থাকত অবারিত এবং মাঝে মাঝে আড়াল থেকে তাঁর গান শুনেছি আরো কয়েকবার। কিন্তু আমার সাড়া বা দেখা পেলেই, তাঁর গান হ'ত বন্ধ।"

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ দিকে গান একেবারে ছেড়ে দিলেও বাল্যকাল থেকে অনেক বছর ধরে তিনি গানের চর্চা করেন। যদিও গান-বাজনাকে তিনি তাঁর চিত্তবিনোদনের বা খেয়ালের প্রধানতম অঙ্গ হিসাবে কোনদিনই গ্রহণ করেন নি, তবুও ছেলেবেলা থেকেই গান-বাজনায় তিনি অনেক সময় দিয়েছেন। তবে তাঁর স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সংগীতের প্রতি আকর্ষণের জন্যই তাঁর সংগীত সাধনা অনেকটা সহজতর হয়েছিল। যাই হোক শরৎচন্দ্র যে তাঁর নিজের এই সংগীত-বিদ্যা সম্বন্ধে একেবারে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। তাই তিনি একবার শ্রীদিলীপকুমার রায়কে রসিকতা করেই হয়ত লিখেছিলেন—

"তোমার ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা পেলাম। কাল দিনে রেতে পড়ে শেষ করলাম। চমৎকার লাগলো। তবে দু'একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হ'লাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, অনবধানতাবশতঃই হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধরে দেবে তাতেও আমার লেশ মাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না।"

শরৎচন্দ্র শুধু গায়কই ছিলেন না, তিনি সংগীত রচনারও চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি ধৈর্যের অভাবের জন্যেই কয়েকটা গানের দুচার লাইন ছাড়া আর লিখতেই পারেন নি। তাঁর রচিত একটি মাত্র বাউল গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানটির রচনা তারিখ ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৪। শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রের এই গানটি সংগ্রহ করে ১৩৫১ সালে প্রকাশিত শারদীয়া বার্ষিকী "সম্প্রতি"তে প্রকাশ করেছিলেন। গানটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

তোর পাবার সময় ছিল যখন
ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশার ঘোরে
রইলি অচেতন।
তখন ছিল মণি, ছিল মাণিক
পথের ধারে ধারে,
এখন ডুব্‌লো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।

'আজ মিথ্যেরে তোর খোঁজাখুঁজি
মিথ্যে চোখের জল,
তারে কোথায় পাবি বল,
তোর অতল তলে তলিয়ে গেল
শেষ সাধনার ধন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় সাহিত্য এবং সংগীত ছাড়া আর একটি শিল্পেরও চর্চা করতেন। সেটি হ'ল চিত্রাঙ্কন। শরৎচন্দ্র সেই সময় এই ছবি আঁকা শেখার জন্যে বেশ কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি তৈলচিত্রও এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা প্রথম ছবিটির নাম ছিল—"রাবণ-মন্দোদরী"। আর তাঁর আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে তাঁর "মহাশ্বেতা" নামক ছবিটিই ছিল বিখ্যাত। এই "মহাশ্বেতা" ছবিটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন অফিসের সহকর্মী ও বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—

তাহার সর্বপ্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী' খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল, এখানা দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়, বাস্তবিকই তাহার মধ্যে Anatomyর জ্ঞান, Perspective এবং Background-এর আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, এক সঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্য চিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাই। এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা ঝাপসা দেখাইতেছে, ওপারে মেঘভারাগত আকাশ আরও অস্পষ্ট, উহারই একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য্য একটুখানি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশী সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা। রোরুদ্যমানা প্রকৃতি দেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।"

মহাশ্বেতা ছবিটি সম্বন্ধে যোগেনবাবুর এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ছবিটি বেশ উচ্চাঙ্গেরই হয়েছিল। কেন না দেহতত্ত্বজ্ঞান অনুযায়ী মহাশ্বেতার চিত্রাঙ্কন, তপস্বিনী মহাশ্বেতার পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনা, ছবিতে রঙের পরিবেশন প্রভৃতি সমস্তই নিখুঁত হওয়ায় এই ছবিখানি শরৎচন্দ্রের একটি সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর কিন্তু কোন গুরু ছিল না। তিনি নিজেই পড়াশুনা করে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর পড়েছিলেন। দেশ বিদেশের বড় বড় চিত্রকরদের সংবাদাদি তাঁর মুখস্থ ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের চিত্র সম্বন্ধে চিত্র-রসিক বন্ধুমহলে কোন কথা উঠলেই তিনি বলতেন—"র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় Art criticদের মতে তিসিয়ান (Tisian) সব চেয়ে বড় Painter।···একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলেঁর টার্ণারের খুব নাম। দুজনেই বিলাতী চিত্রকর। আর জোশুয়া রেনল্ড্‌স ও গেইনস্‌বরোর পর এঁরাই বিলাতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।······Landscape paintingএর চেয়ে Human painting ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত Anatomyর জ্ঞান না থাকলে Human painting ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে ত ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হ'ল না।" (ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র)

শরৎচন্দ্র ছবি আঁকা সম্বন্ধে কিরূপ যে ব্যাপক পড়াশুনা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর এই পৃথিবী-বিখ্যাত ছবি-আঁকিয়েদের ছবির আলোচনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্র এই সময় রেঙ্গুনে যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীতে একদিন আগুন লেগে যাওয়ায় বাড়ীটা পুড়ে ভস্মীভূত হয়। শরৎচন্দ্রের পুস্তকাদি বহু জিনিসের সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিগুলোও ঐদিন পুড়ে শেষ হয়ে যায়। শুধু তাঁর ছবি আঁকার সাজসরঞ্জামগুলো কোন রকমে আগুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই ছবি পোড়ার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তখন ২২-৩-১২ তারিখে রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—

"···আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন আমি পড়া ছাড়িয়া Oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি Oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।"

এই ছবি পোড়ার পর শরৎচন্দ্র আর ছবি আঁকায় হাত দেন নি। এরপর থেকে যেটা তাঁর আজন্মের প্রধানতম নেশা সেই সাহিত্য-সাধনাতেই শুধু মন দিয়েছিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই তিনি সাহিত্যে খ্যাতিও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগটা বরাবরই ছিল। এই ছবির ব্যাপার নিয়েই কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমুকুল দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। শরৎচন্দ্র অনেক সময়েই তাঁর এই শিল্পী-বন্ধুটির সঙ্গে ছবি সম্বন্ধে বহু আলোচনা করতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেবল সাহিত্য নিয়ে কাটালেও তিনি বেশ কয়েক বছর এই অভিনয়, সংগীত এবং চিত্রবিদ্যা নিয়েও কাটিয়েছিলেন। এই দিক থেকে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের মূলব্রত সাহিত্য ছাড়াও অভিনয়, সংগীত এবং চিত্রবিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন। আর সকলক্ষেত্রেই তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর চঞ্চল স্বভাব ও কুঁড়েমির জন্যে সংগীতাদিতে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাধনা ও নিষ্ঠা দিতে পারেন নি। সংগীতাদির উপর তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকলেও তিনি খেয়ালের বশে, কখনো বা বৈচিত্র্যের লোভে এই সবের অভ্যাস করেছিলেন মাত্র। তবে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় না হলেও, কি অভিনয়, কি সংগীত আর কি চিত্রশিল্প, শরৎচন্দ্র তাঁর যে বয়সেই হোক্ না কেন, যখন যাতে হাত দিয়েছেন, তিনি তাঁর আপন প্রতিভার বলে সকল ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

তৃতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের আপিস কক্ষ। যুধিষ্ঠির মায়াতত্ত্ববিষয়ক একটি বাউল গান গাহিতে গাহিতে আসবাবপত্র ঝাড়িতেছে ও জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে।

গান

মম— এ সংসার মায়ার ঘাঁটি। তুমি কার—কে তোমার।
তবু বেশ আছ পরিপাটি। ইত্যাদি

গানের মধ্যস্থলে দীনদয়াল দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুধিষ্ঠির গানে এবং কাজে এতই মত্ত যে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। যুধিষ্ঠির ছুরি-কাঁচি পরিষ্কার করিতে করিতে এদিক-ওদিক চাহিয়া, তাহার দুই-একটি ট্যাঁকে পুরিল। তাহার অলক্ষ্যে দীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিলেন। মনে হইল উপভোগই করিলেন। যুধিষ্ঠির ঘর হইতে চলিয়া যাইবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিল, দীনদয়াল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ধরা পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার চোখমুখের অবস্থা যাহা দাঁড়াইল—দীনদয়াল তাহাও উপভোগ করিলেন।

যুধিষ্ঠির॥ আজ্ঞে, কর্তা! আমি··আমি···মানে ব্যারামটা সেরে গিয়েও সারছে না। মাঝে মাঝে এমন মোচড় দেয় যে, মাঝে মাঝে এমন দু'একটা ছোটখাটো জিনিস···

দীনদয়াল॥ বেশ তো—বেশ তো—খুব চালাও। কিন্তু নজরটা এত ছোট কেন? মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার—না হয় পুকুর চুরি করো।

যুধিষ্ঠির॥ কী যে বলেন, কর্তা! এমন করে অধমকে লজ্জা দেবেন না, স্যর। আচ্ছা, কর্তা, কথাটা কি ঠিক? আপনার নাকি মাথার একটু দোষ হয়েছে?

দীনদয়াল॥ (চটিয়া গিয়া) মাথার দোষ হয়েছে আমার?

যুধিষ্ঠির॥ ভুজঙ্গবাবু তাই বলছেন, কর্তা। নোটিস মেরে দিয়েছেন।

দীনদয়াল॥ ভুজঙ্গবাবু! সেটা আবার কে?

যুধিষ্ঠির॥ কেন—ভুজঙ্গবাবু?

দীনদয়াল॥ চিনি না তো। যাঁকে চিনি, তিনি কোথায়?

যুধিষ্ঠির॥ কার কথা বলছেন, কর্তা?

দীনদয়াল॥ দীনদয়াল চৌধুরী।

যুধিষ্ঠির॥ কী বললেন কর্তা।

দীনদয়াল॥ দীনদয়াল চৌধুরী। ডাক্তার—ডাক্তার—তোমাদের হাসপাতালের ডাক্তার।

যুধিষ্ঠির॥ সে তো আপনি, স্যর।

দীনদয়াল॥ আমি! আমি দীনদয়াল চৌধুরী? হাঃ—হাঃ—হাঃ। (হাসিয়া উঠিলেন)। আমি এলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—আর এ লোকটা বলছে কিনা আমিই ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী। (হঠাৎ চটিয়া গিয়া) বলবি নে—কোথায় সে?

রুদ্রমূর্তিতে তাহার দিকে তাকাইলেন

যুধিষ্ঠির॥ ওরে বাবা!

বলিয়াই চকিতে হামাগুড়ি দিয়া দীনদয়ালের দুই পায়ের মধ্য দিয়া গড়াইতে গড়াইতে বাহিরে চলিয়া গেল এবং বাহিরে গিয়াই চিৎকার শুরু করিল "কে কোথায় আছ? কর্তা পাগল হয়ে গেছেন। কে কোথায় আছ? কর্তা পাগল হয়ে গেছেন।" বলিতে বলিতে দূরে চলিয়া গেল। দীনদয়াল উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন এবং মুখে তাঁহার হাসি ফুটিল। হঠাৎ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন "হাঃ হাঃ হাঃ।" পরক্ষণেই নেপথ্যে ভুজঙ্গের গলা শোনা গেল—"কোথায়? কোথায়?" যুধিষ্ঠিরেরও উত্তর শোনা গেল "আপিসঘরে, স্যর—আপিস ঘরে।" পরমুহূর্তেই যুধিষ্ঠির সহ ভুজঙ্গ, নিবারণবাবু এবং আরও কয়েকজন ট্রাস্টির প্রবেশ। ক্রমশ বেলা বসু, জয়া দেবী এবং অন্যান্য রোগীরা আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

যুধিষ্ঠির॥ ওই দেখুন, স্যর। উনি নাকি আমাদের দয়াল ডাক্তার নন।

ভুজঙ্গ॥ আপনি দয়াল ডাক্তার নন?

দীনদয়াল॥ আরে, মশাই, তার সঙ্গেই দেখা করতে আমি এসেছি।

ভুজঙ্গ ॥ দেখা করতে এসেছেন ! কোত্থেকে আসছেন ?

দীনদয়াল ॥ খাশ কলকাতা থেকে—আবার কোত্থেকে আসব ! সে লোকটা কোথায় ? তাকে আমি এখুনি চাই। ভাল চান তো আপনারা, মশাই তাকে বের করে দিন। নইলে আমাকে চেনেন না !

ভুজঙ্গ ॥ (হাতজোড় করিয়া) কে আপনি, মশাই ?

দীনদয়াল ॥ আমার নাম শোনেন নি ?

ভুজঙ্গ ॥ না, মহাত্মন। সে সৌভাগ্য তো এখনো হয় নি।

দীনদয়াল ॥ নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠবে—পিলে ফাটবে—ফট্ ফটাস্ !

ভুজঙ্গ ॥ ওরে বাবা ! থাক্—থাক্, শুনে তবে কাজ নেই। কী বলেন, নিবারণবাবু ?

নিবারণ ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

দীনদয়াল ॥ ভালো চাও তো—সব বলো—সেই পাপিষ্ঠ কোথায় ?

ভুজঙ্গ ॥ আজ্ঞে—শুনেছি, তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

দীনদয়াল ॥ পাগল হয়ে গেছেন ! (উৎকট হাস্য) হতেই হবে—হতেই হবে।

আনন্দে দীনদয়াল নৃত্য করিতে লাগিলেন

জয়া ॥ ভুজঙ্গবাবু, আজ বাবার এ দশার জন্য আপনারা দায়ী—আপনারা—ট্রাস্ট বোর্ডের মেম্বাররা—গ্রামের নেমকহারাম লোকেরা।

ভুজঙ্গ ॥ দায়ী আমরা ?

জয়া ॥ ষড়যন্ত্র করে দেবতার মতো একটা মানুষকে মাথা খারাপ অপবাদ দিয়ে তাঁর নিজের মন্দির থেকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছেন—পথের ধূলোয়। কে সইতে পারে এ আঘাত ? মানুষ পারে না—দেবতা পারেন না—উনিও পারেন নি। এক রাত্রে আজ ওঁর এই দশা। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি আপনারা—দীনদয়াল চৌধুরী কি সত্যিই পাগল ? দীনদুঃখীর দুঃখ দূর করতে তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন। জীবনপণ করেছিলেন। এ কী পাগলের কাজ ? বলুন—বলুন, আপনারা বলুন—

ভুজঙ্গ ॥ বলব ? তবে আমাকেও অনেক কিছু বলতে হবে। বলব, জয়াদেবী ?

দীনদয়াল ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ ! জানে না—কেউ কিচ্ছু জানে না—কেউ কিচ্ছু জানে না—কেউ কিচ্ছু শোনে নি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুপ্ত তথ্য ফাঁস করিবার ভঙ্গিতে

দীনদয়াল ॥ দীনদয়াল লোকটা ছিল আসলে একটা জোচ্চোর। লোকটার এই ধনদৌলত—এইসব ভালমানুষি—সবই একটা ফাঁকি। মেকী—মেকী—মেকী !

উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল

দীনদয়াল ॥ বোকার মত হাসছে ! হাসো—হাসো—হেসে নাও, দুদিন বই তো নয় ? (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) তোমাদের ওই দীনদয়াল ঠাকুর আমার সঙ্গেই পড়তো। জানো তোমরা ?

১ম রোগী ॥ না—না, স্যর। আপনি বলুন।

দীনদয়াল ॥ কেমিস্ট্রির একটা ফরমুলা ছিল আমার—সোনা তৈরি করার ফরমুলা। কিন্তু ওই শালা দীনদয়াল আমার সেই ফরমুলাটা চুরি করে পালিয়ে যায়। চুরি করে নিয়ে যায় আমার সবকিছু। আমার স্ত্রী—আমার টাকা-কড়ি আর আমার সেই পরশপাথর—সোনা তৈরি করার পরশপাথর।

সকলে হাসিয়া উঠিল

হাসছ ? তোমরা হাসছ ? (মমতাময়ীর ফোটো দেখাইয়া) উনি আমার স্ত্রী। আমারই টাকায় এখানকার এতবড় সম্পত্তি—এতবড় হাসপাতাল। আমারই পরশপাথরে গড়া এখানকার সবকিছু। সব আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছে ওই শালা দীনদয়াল। শুধু চোর নয়—জোচ্চোর নয়—কতবড় লম্পট, বলো।

ভুজঙ্গ ॥ তা যা বলেছেন।

উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন আসিয়া রুখিয়া দাড়াইল

১ম রোগী ॥ (ভুজঙ্গকে) তা যা বলেছেন মানে ? দীনদয়াল চৌধুরী চোর ছিলেন ? জোচ্চোর ছিলেন ? লম্পট ছিলেন ?

ভুজঙ্গ ॥ উনি নিজেই বলছেন।

জনৈক রোগী ॥ (চ্যাঁচাইয়া) উনি নিজেই বলছেন ! উনি তো পাগল। ওঁর কথার দাম কী। কিন্তু আপনি কেন বলছেন ?

আর এক ব্যক্তি রুখিয়া আসিল

২য় রোগী ॥ হাঁ—আপনি কেন সায় দিচ্ছেন ?

তৃতীয় ব্যক্তি চিৎকার করিয়া রুখিয়া আসিল

৩য় রোগী ॥ বউমা ঠিকই বলেছেন। এই লোকটার ষড়যন্ত্রেই আমাদের দয়াল ডাক্তার আজ পাগল, মারো শালাকে—মারো।

ভুজঙ্গ ॥ বটে! আমারই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ? দরোয়ান—দরোয়ান! এদের সব বের করে দাও।

দারোয়ান ছুটিয়া আসিল

১ম রোগী ॥ কার হাসপাতাল ?

২য় রোগী ॥ দয়াল ডাক্তারের হাসপাতাল।

৩য় রোগী ॥ আমাদের হাসপাতাল।

ভুজঙ্গ ॥ Get out—Get out you scoundrels!

রোগীরা ॥ বটে রে। তবে রে শালা—

হাতাহাতি শুরু হইল। দরোয়ান রোগীদের ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। ভুজঙ্গ, নিবারণবাবু প্রভৃতি বাহির হইয়া গেলেন—শুধু রহিলেন দীনদয়াল ও জয়া।

দীনদয়াল ॥ (আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন)

জয়া ॥ বাবা—বাবা!

দীনদয়াল ॥ কী, মা ?

জয়া ॥ দুনিয়ার সবাই কিছু ভুজঙ্গ নয়, বাবা। মানুষ আপনাকে ভুল বোঝে নি। দরকার হলে ওই অমানুষদের হাত থেকে আপনাকে বাচাতে ওরা প্রাণও দিতে পারে। আপনি শুধু একবার চেঁচিয়ে বলুন—আপনি পাগল নন। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে ওরা আপনাকে পাগল সাজিয়েছে।

দীনদয়াল ॥ না—না, পাগল সেজে থেকে আরো কটা দিন দেখি—মানুষ কত নীচে নামতে পারে—কত ওপরে উঠতে পারে। আমায় দেখতে দে, জয়ামা, আমায় দেখতে দে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হাসপাতালের পূর্বোক্ত আপিস-কক্ষ। রাত্রি। জয়া ও দীনদয়াল।

জয়া ॥ রাত অনেক হোলো, বাবা, নিজের ঘরে গিয়ে শোবেন, চলুন।

দীনদয়াল ॥ না, মা, এই ঘরেই আমি থাকব। মাসের ভেতর ক'দিন আমি শুই নিজের ঘরে? বছরের বেশির ভাগ রাত হাসপাতালের এই টেবিলই আমার শয্যা। এখানে থাকলে রোগীগুলো মনে সাহস পায়। বাড়িতে শুলে কেমন আমার ঘুমই হয় না। ওই যে তোমার শাশুড়ী —উনিও কত রাত জেগেছেন—এখানে—আমার সঙ্গে—রোগীদের শুশ্রূষায়।

জয়া ॥ আমিও আপনার কাছে থাকব, বাবা। চলুন খেয়ে আসবেন।

দীনদয়াল ॥ না, মা, তুমি বরং বাড়ি যাও—খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবারটা নিয়ে এসো।

জয়া প্রস্থানোদ্যত

আর, হ্যা, শোন।

জয়া ॥ কী, বাবা ?

দীনদয়াল ॥ গাধাটার খবর কি? চিঠি-টিঠি কিছু দিয়েছে ?

জয়া ॥ (সলজ্জ ভঙ্গিতে) না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ এই দেখো—আমাকেও এমনি করে চিরকাল জ্বালিয়েছে।

জয়া ॥ আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছি বাবা—এখানে চলে আসতে।

দীনদয়াল ॥ তা ভালোই করেছ—ভালোই করেছ।

জয়া চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় বেলা বসুর প্রবেশ।
বেলা জয়াকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল।

বেলা ॥ (জয়ার প্রতি) আপনি যাবেন না। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া ॥ উনি বাড়ি যাবেন না।

বেলা ॥ এখানে থাকবেন! সারারাত কে ওঁকে সামলাবে ?

জয়া ॥ আমি থাকব।

বেলা ॥ ভুজঙ্গবাবুও বোধহয় থাকবেন ?

জয়া ॥ সে জানেন ভুজঙ্গবাবু।

জয়ার প্রস্থান। বেলা একবার জয়ার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া দীনদয়ালের কাছে আসিল। দীনদয়াল তখন তাজমহলের মডেলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।

বেলা॥ হ্যালো, ডাক্তার, You have forgotten yourself! আপনি যে দীনদয়াল চৌধুরী—এ কথা কি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না?

দীনদয়াল॥ সরে যাও—সরে যাও। দেখছ না—কত বড় একটা স্বপ্নের প্রাসাদ আমি গড়ে তুলছি? যাও—বিরক্ত কোরো না।

স্বপ্নলোকে মগ্ন হইলেন

বেলা॥ I pity you, doctor! স্বপ্নের প্রাসাদ সত্যিই তুমি গড়েছিলে—কিন্তু তা ভেঙে গেছে। তাই যায়—সবারই যায়।

দীনদয়াল॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ—ঠিক বলেছে! শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েছে!

বেলা॥ সত্যিই তাই। তাই, ডাক্তার। আমার জীবনটাও তাই। কত আশা করেছিলাম, কত স্বপ্ন দেখেছিলাম—আজ দেখছি, সব মিথ্যে। ভুজঙ্গ—সত্যি সত্যিই ভুজঙ্গ।

দীনদয়াল॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ! সাপকে ভুজঙ্গ বলছে! লেখাপড়া শিখেছে!

বেলা॥ পাগল হয়ে তুমি বেঁচে গেছ, ডাক্তার। নইলে ওই সাপের বিষের জ্বালায় তুমি আত্মহত্যা করতে। ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে।

দীনদয়াল চমকিয়া উঠিলেন

দীনদয়াল॥ তুমি কী বলছ? ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে—কে? ভুজঙ্গ?

দীনদয়ালের মুখে এই স্বাভাবিক কথা শুনিয়া বেলা খানিকটা বিস্মিত হইল। হঠাৎ আবেগে বলিয়া উঠিল।

বেলা॥ ডাক্তার! ডাক্তার! তুমি কি আমার কথা শুনছ? আমার কথা বুঝছ?

দীনদয়াল বুঝিলেন যে, তাঁহার পাগলামির ভান ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি পুনরায় পাগলের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

দীনদয়াল॥ হাঃ হাঃ হাঃ! বলছে আমি ডাক্তার! খুকি খাবি—বিষ? সাপের বিষ? তোর ওই ভুজঙ্গের বিষ? সাপের বিষ? আমার কাছে আছে—খাবি?

বেলা॥ (চমকিয়া উঠিয়া) না—না—না! Doctor, be quiet—চুপ করো, ডাক্তার—নইলে ভুজঙ্গবাবু এসে অনর্থ করবেন।

জয়ার প্রবেশ

জয়া॥ কী হয়েছে?

বেলা॥ আপনার শ্বশুরকে ঘরে নিয়ে যান।

জয়া॥ কেন?

বেলা॥ আমার ডিউটি এখনি শেষ হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি আমার কোয়ার্টারে।

জয়া॥ বেশ তো—যাবেন। আমি আছি।

বেলা॥ কিন্তু এখানে সাপ আছে।

জয়া॥ (হাসিয়া) আপনি থাকলেন, আর আমি থাকতে পারব না?

বেলা॥ সাপের কামড় খেতে যদি এত শখ হয়—থাকুন।

বেলার প্রস্থান

জয়া॥ আপনি কিছু খেয়ে নিন, বাবা।

দীনদয়াল॥ কী আর খাব। মনে হচ্ছে, বিষ খেয়েছি মা—সাপের বিষ। ভুজঙ্গ যে এত খল, এত শঠ—এ আমি জানতাম না, জানতাম না। মেয়েটা বলে গেল, "ডাক্তার, ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে।" অসহায়ের মতো আমাকে এসব দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে। (গভীর হতাশায়) যে-দুনিয়ার এত ব্যাধি, এত বিষ—সে-দুনিয়ায় আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না—চাই না, জয়ামা।

জয়া॥ না, বাবা, এত সহজে আমরা আপনাকে হারাতে পারব না। ওদের প্রবঞ্চনা—ওদের ষড়যন্ত্র একদিন ধরা পড়বেই।

ভুজঙ্গের প্রবেশ

ভুজঙ্গ॥ কার ষড়যন্ত্র—কার প্রবঞ্চনা ধরা পড়বে, জয়া দেবী? আপনার? (হাসিয়া) কাচের বাড়িতে বাস করে আমার বাড়িতে ঢিল ছুঁড়বেন না, জয়া দেবী। দু'জনেই চুরমার হয়ে যাব।

দীনদয়াল॥ কাচের বাড়িতে বাস? তবে কি 'খুজা'? খুজার রোগী মনে করে, তার দেহ যেন কাচ-দ্বারা

নির্মিত—সে যেন স্বচ্ছ—মনে করে, আঘাত পেলেই সে ভেঙে পড়বে—ছড়িয়ে পড়বে—টুকরো টুকরো হয়ে—চতুর্দিকে। ভুজঙ্গ, 'থুজা'র লক্ষণযুক্ত কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি ভুগছ। আর তা ভুগছ বলেই আজ তুমি এত শঠ—এত খল। দোহাই তোমার, এক ডোজ 'থুজা' সি-এম্ এখনি খেয়ে ফেল।

ভুজঙ্গ ॥ পাগলামি সেরে গেছে দেখছি।

দীনদয়াল ॥ পাগল নই—পাগল নই, ভুজঙ্গ, আমি পাগল নই। দুনিয়াটাকে স্বরূপে দেখতে আমি পাগল সেজেছিলাম—পাগলের ভান করেছিলাম। দেখলাম, দুনিয়াটা ঠিকই চলছে—বাদে তুমি। তুমি যদি ভালো হও ভুজঙ্গ—তোমার ব্যাধিটা যদি সেরে যায়, ভুজঙ্গ—আমার এ সংসার আবার সোনার সংসার হবে। আমি তোমাকে এক ডোজ 'থুজা' দিচ্ছি—তুমি সেরে যাবে, তুমি ভাল হবে।

ঔষধের বাক্সের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহা লইয়া ঔষধ খুঁজিতে লাগিলেন

ভুজঙ্গ। জয়া দেবী, এ-হাসপাতালে পাগলের জন্য কোন বেড্ নেই। ওকে আপনি বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া ॥ উনি যাবেন না।

ভুজঙ্গ ॥ যাবেন না বললে তো চলবে না। ওকে যেতে হবে। ওকে হাসপাতালে রেখে আর দশজন রোগীর অসুবিধা ঘটাতে পারি না। এই, কে আছিস? দরোয়ানদের ডেকে দে।

দীনদয়াল ॥ বটে! এতদূর স্পর্ধা। আমারি হাস-পাতাল থেকে আমাকে তাড়াতে চায়? দেখি কার সাধ্য?

জয়া ॥ (দীনদয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া) শয়তানের অসাধ্য কিছু নেই। আপনি চলুন, বাবা।

দীনদয়াল ॥ না, আমি যাব না। এই ঘর ছেড়ে আমি যাব না। এই ঘরে বসে আমি হাসপাতাল চালাই। (ছুটিয়া তাজমহলটির কাছে গিয়া) এই তাজমহল দেখে আমি প্রেরণা পাই। কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে সরায়?

ভুজঙ্গ ॥ বটে! (উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন) এই, কে আছিস?

যুধিষ্ঠির দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া আসিল

যুধিষ্ঠির ॥ হুজুর!

ভুজঙ্গ ॥ (তাজমহলটি দেখাইয়া) ওটা নিয়ে যা। হাসপাতালের আপিসঘরে যত সব খেলনা! পাগলামি আর কাকে বলে!

দীনদয়াল ॥ খবরদার!

ভুজঙ্গ। শুনুন, আপনার এইসব খেলনা-টেল্না নিয়ে মানে মানে বাড়ি যাবেন কিনা, বলুন।

দীনদয়াল ॥ খেল্না! তাজমহল হোলো খেল্না! অক্ষয় প্রেমের প্রতীক—আমার প্রেরণা—শক্তির উৎস আমার—

ভুজঙ্গ ॥ (যুধিষ্ঠিরকে) কী শুনছিস্ পাগলের পাগলামি? ভালো চাস তো নিয়ে যা ওটা।

যুধিষ্ঠির ॥ ভালো আমি চাই নে, বাবু—আমাকে মাপ করুন।

ভুজঙ্গ ॥ হুঁ! ব্যাটা চোর!

যুধিষ্ঠির ॥ চোর হতে পারি, কর্তা—কিন্তু পুকুর-চুরি করি না। ডাকাত নই।

ভুজঙ্গ ॥ Shut up—shut up!

যুধিষ্ঠির ॥ রাখুন আপনার স্যাট-সপ্তোর। ভাত মারবেন তো? তা, সকলের ভাত যিনি দিচ্ছিলেন তাঁকেই যখন মারলেন—আমি কোন্ ছার।

ভুজঙ্গ ॥ Get out—দূর হয়ে যা।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই ভালো। চোখে আর এসব দেখতে পারি না।

যুধিষ্ঠির চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল

দীনদয়াল ॥ (স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন) ট্যারেনণ্টুলা—ট্যারেন্টুলা—হিস্প্যানিয়া! যুধিষ্ঠির সেরে উঠেছে—আর হামাগুড়ি দিচ্ছে না। বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে চলছে। Hanneman can never fail! Hanneman can never fail! (জয়ার প্রতি) মা, তুইও চলে যা, তুইও চলে যা, মা, ওর সঙ্গে—কলকাতায়।

ভুজঙ্গ ॥ উনি যাবার জন্যে আসেন নি—থাকবার জন্যই এসেছেন। কী বলেন জয়া দেবী? (একজন

ভুজঙ্গ ॥ দেখা করতে এসেছেন! কোত্থেকে আসছেন?

দীনদয়াল ॥ খাশ কলকাতা থেকে—আবার কোত্থেকে আসব! সে লোকটা কোথায়? তাকে আমি এখুনি চাই। ভাল চান তো আপনারা, মশাই তাকে বের করে দিন। নইলে আমাকে চেনেন না!

ভুজঙ্গ ॥ (হাতজোড় করিয়া) কে আপনি, মশাই?

দীনদয়াল ॥ আমার নাম শোনেন নি?

ভুজঙ্গ ॥ না, মহাত্মন। সে সৌভাগ্য তো এখনো হয় নি।

দীনদয়াল ॥ নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠবে—পিলে ফাটবে—ফট্ ফটাস্!

ভুজঙ্গ ॥ ওরে বাবা! থাক্—থাক্, শুনে তবে কাজ নেই। কী বলেন, নিবারণবাবু?

নিবারণ ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

দীনদয়াল ॥ ভালো চাও তো—সব বলো—সেই পাপিষ্ঠ কোথায়?

ভুজঙ্গ ॥ আজ্ঞে—শুনেছি, তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

দীনদয়াল ॥ পাগল হয়ে গেছেন! (উৎকট হাস্য) হতেই হবে—হতেই হবে।

আনন্দে দীনদয়াল নৃত্য করিতে লাগিলেন

জয়া ॥ ভুজঙ্গবাবু, আজ বাবার এ দশার জন্য আপনারা দায়ী—আপনারা—ট্রাস্ট বোর্ডের মেম্বাররা—গ্রামের নেমকহারাম লোকেরা।

ভুজঙ্গ ॥ দায়ী আমরা?

জয়া ॥ ষড়যন্ত্র করে দেবতার মতো একটা মানুষকে মাথা খারাপ অপবাদ দিয়ে তাঁর নিজের মন্দির থেকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছেন—পথের ধুলোয়। কে সইতে পারে এ আঘাত? মানুষ পারে না—দেবতা পারেন না—উনিও পারেন নি। এক রাত্রে আজ ওঁর এই দশা। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি আপনারা—দীনদয়াল চৌধুরী কি সত্যিই পাগল? দীনদুঃখীর দুঃখ দূর করতে তিনি তাঁর সবস্ব দিয়েছিলেন। জীবনপণ করেছিলেন। এ কী পাগলের কাজ? বলুন—বলুন, আপনারা বলুন—

ভুজঙ্গ ॥ বলব? তবে আমাকেও অনেক কিছু বলতে হয়। বলব, জয়াদেবী?

দীনদয়াল ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! জানে না—কেউ কিছু জানে না—কেউ কিছু জানে না—কেউ কিছু শোনে নি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুপ্ত তথ্য ফাঁস করিবার ভঙ্গিতে

দীনদয়াল ॥ দীনদয়াল লোকটা ছিল আসলে একটা জোচ্চোর। লোকটার এই ধনদৌলত—এইসব ভালমানুষি—সবই একটা ফাঁকি। মেকী—মেকী—মেকী!

উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল

দীনদয়াল ॥ বোকার মত হাসছে! হাসো—হাসো—হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়? (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) তোমাদের ওই দীনদয়াল ঠাকুর আমার সঙ্গেই পড়তো। জানো তোমরা?

১ম রোগী ॥ না—না, স্যর। আপনি বলুন।

দীনদয়াল ॥ কেমিস্ট্রির একটা ফরমুলা ছিল আমার—সোনা তৈরি করার ফরমুলা। কিন্তু ওই শালা দীনদয়াল আমার সেই ফরমুলাটা চুরি করে পালিয়ে যায়। চুরি করে নিয়ে যায় আমার সবকিছু। আমার স্ত্রী—আমার টাকা-কড়ি আর আমার সেই পরশপাথর—সোনা তৈরি করার পরশপাথর।

সকলে হাসিয়া উঠিল

হাসছ? তোমরা হাসছ? (মমতাময়ীর ফোটো দেখাইয়া) উনি আমার স্ত্রী। আমারই টাকায় এখানকার এতবড় সম্পত্তি—এতবড় হাসপাতাল। আমারই পরশপাথরে গড়া এখানকার সবকিছু। সব আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছে ওই শালা দীনদয়াল। শুধু চোর নয়—জোচ্চোর নয়—কতবড় লম্পট, বলো।

ভুজঙ্গ ॥ তা যা বলেছেন।

উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন আসিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল

১ম রোগী ॥ (ভুজঙ্গকে) তা যা বলেছেন মানে? দীনদয়াল চৌধুরী চোর ছিলেন? জোচ্চোর ছিলেন? লম্পট ছিলেন?

ভুজঙ্গ ॥ উনি নিজেই বলছেন।

জনৈক রোগী ॥ (চাঁচাইয়া) উনি নিজেই বলছেন! উনি তো পাগল। ওঁর কথার দাম কী। কিন্তু আপনি কেন বলছেন?

আর এক ব্যক্তি রুখিয়া আসিল

২য় রোগী ॥ হাঁ—আপনি কেন সায় দিচ্ছেন ?

তৃতীয় ব্যক্তি চিৎকার করিয়া রুখিয়া আসিল

৩য় রোগী ॥ বউমা ঠিকই বলেছেন। এই লোকটার ষড়যন্ত্রেই আমাদের দয়াল ডাক্তার আজ পাগল, মারো শালাকে—মারো।

ভুজঙ্গ ॥ বটে! আমারই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ? দরোয়ান—দরোয়ান! এদের সব বের করে দাও।

দারোয়ান ছুটিয়া আসিল

১ম রোগী ॥ কার হাসপাতাল ?

২য় রোগী ॥ দয়াল ডাক্তারের হাসপাতাল।

৩য় রোগী ॥ আমাদের হাসপাতাল।

ভুজঙ্গ ॥ Get out—Get out you scoundrels!

রোগীরা ॥ বটে রে। তবে রে শালা—

হাতাহাতি শুরু হইল। দরোয়ান রোগীদের ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেন। ভুজঙ্গ, নিবারণবাবু প্রভৃতি বাহির হইয়া গেলেন। শুধু রহিলেন দীনদয়াল ও জয়া।

দীনদয়াল ॥ (আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন)

জয়া ॥ বাবা—বাবা !

দীনদয়াল ॥ কী, মা ?

জয়া ॥ দুনিয়ার সবাই কিছু ভুজঙ্গ নয়, বাবা। মানুষ আপনাকে ভুল বোঝে নি। দরকার হলে ওই অমানুষদের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে ওরা প্রাণও দিতে পারে। আপনি শুধু একবার চেঁচিয়ে বলুন—আপনি পাগল নন। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে ওরা আপনাকে পাগল সাজিয়েছে।

দীনদয়াল ॥ না—না, পাগল সেজে থেকে আরো কটা দিন দেখি—মানুষ কত নীচে নামতে পারে—কত ওপরে উঠতে পারে। আমায় দেখতে দে, জয়ামা, আমায় দেখতে দে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হাসপাতালের পূর্বোক্ত আপিস-কক্ষ। রাত্রি। জয়া ও দীনদয়াল।

জয়া ॥ রাত অনেক হোলো, বাবা, নিজের ঘরে গিয়ে শোবেন, চলুন।

দীনদয়াল ॥ না, মা, এই ঘরেই আমি থাকব। মাসের ভেতর ক'দিন আমি শুই নিজের ঘরে? বছরের বেশির ভাগ রাত হাসপাতালের এই টেবিলই আমার শয্যা। এখানে থাকলে রোগীগুলো মনে সাহস পায়। বাড়িতে শুলে কেমন আমার ঘুমই হয় না। ওই যে তোমার শাশুড়ী—উনিও কত রাত জেগেছেন—এখানে—আমার সঙ্গে—রোগীদের শুশ্রূষায়।

জয়া ॥ আমিও আপনার কাছে থাকব, বাবা। চলুন খেয়ে আসবেন।

দীনদয়াল ॥ না, মা, তুমি বরং বাড়ি যাও—খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবারটা নিয়ে এসো।

জয়া প্রস্থানোদ্যত

আর, হ্যা, শোন।

জয়া ॥ কী, বাবা ?

দীনদয়াল ॥ গাধাটার খবর কি? চিঠি-টিঠি কিছু দিয়েছে ?

জয়া ॥ (সলজ্জ ভঙ্গিতে) না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ এই দেখো—আমাকেও এমনি করে চিরকাল জ্বালিয়েছে।

জয়া ॥ আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছি বাবা—এখানে চলে আসতে।

দীনদয়াল ॥ তা ভালোই করেছ—ভালোই করেছ।

জয়া চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় বেলা বসুর প্রবেশ।
বেলা জয়াকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল।

বেলা ॥ (জয়ার প্রতি) আপনি যাবেন না। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া ॥ উনি বাড়ি যাবেন না।

বেলা ॥ এখানে থাকবেন! সারারাত কে ওঁকে সামলাবে ?

জয়া ॥ আমি থাকব।

বেলা ॥ ভুজঙ্গবাবুও বোধহয় থাকবেন ?

জয়া ॥ সে জানেন ভুজঙ্গবাবু।

জয়ার প্রস্থান। বেলা একবার জয়ার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া দীনদয়ালের কাছে আসিল। দীনদয়াল তখন তাজমহলের মডেলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।

বেলা ॥ হ্যালো, ডাক্তার, You have forgotten yourself! আপনি যে দীনদয়াল চৌধুরী—এ কথা কি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না?

দীনদয়াল ॥ সরে যাও—সরে যাও। দেখছ না—কত বড় একটা স্বপ্নের প্রাসাদ আমি গড়ে তুলছি? যাও—বিরক্ত কোরো না।

মডেলে মগ্ন হইলেন

বেলা ॥ I pity you, doctor! স্বপ্নের প্রাসাদ সত্যিই তুমি গড়েছিলে—কিন্তু তা ভেঙে গেছে। তাই যায়—সবারই যায়।

দীনদয়াল ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ—ঠিক বলেছে! শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েছে!

বেলা ॥ সত্যিই তাই। তাই, ডাক্তার। আমার জীবনটাও তাই। কত আশা করেছিলাম, কত স্বপ্ন দেখেছিলাম—আজ দেখছি, সব মিথ্যে। ভুজঙ্গ—সত্যি সত্যিই ভুজঙ্গ।

দীনদয়াল ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ! সাপকে ভুজঙ্গ বলছে! লেখাপড়া শিখেছে!

বেলা ॥ পাগল হয়ে তুমি বেঁচে গেছ, ডাক্তার। নইলে ওই সাপের বিষের জ্বালায় তুমি আত্মহত্যা করতে। ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে।

দীনদয়াল চমকিয়া উঠিলেন

দীনদয়াল ॥ তুমি কী বলছ? ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে—কে? ভুজঙ্গ?

দীনদয়ালের মুখে এই স্বাভাবিক কথা শুনিয়া বেলা খানিকটা বিস্মিত হইল। হঠাৎ আবেগে বলিয়া উঠিল।

বেলা ॥ ডাক্তার! ডাক্তার! তুমি কি আমার কথা শুনছ? আমার কথা বুঝছ?

দীনদয়াল বুঝিলেন যে, তাঁহার পাগলামির ভান ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি পুনরায় পাগলের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

দীনদয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! বলছে আমি ডাক্তার! [illegible] খাবি—বিষ? সাপের বিষ? তোর ওই ভুজঙ্গের বিষ? সাপের বিষ? আমার কাছে আছে—খাবি?

বেলা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) না—না—না! Doctor, be quiet—চুপ করো, ডাক্তার—নইলে ভুজঙ্গবাবু এসে অনর্থ করবেন।

জয়ার প্রবেশ

জয়া ॥ কী হয়েছে?

বেলা ॥ আপনার শ্বশুরকে ঘরে নিয়ে যান।

জয়া ॥ কেন?

বেলা ॥ আমার ডিউটি এখনি শেষ হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি আমার কোয়ার্টারে।

জয়া ॥ বেশ তো—যাবেন। আমি আছি।

বেলা ॥ কিন্তু এখানে সাপ আছে।

জয়া ॥ (হাসিয়া) আপনি থাকলেন, আর আমি থাকতে পারব না?

বেলা ॥ সাপের কামড় খেতে যদি এত শখ হয়—থাকুন।

বেলার প্রস্থান

জয়া ॥ আপনি কিছু খেয়ে নিন, বাবা।

দীনদয়াল ॥ কী আর খাব। মনে হচ্ছে, বিষ খেয়েছি মা—সাপের বিষ। ভুজঙ্গ যে এত খল, এত শঠ—এ আমি জানতাম না, জানতাম না। মেয়েটা বলে গেল, "ডাক্তার, ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে।" অসহায়ের মতো আমাকে এসব দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে। (গভীর হতাশায়) যে-দুনিয়ায় এত ব্যাধি, এত বিষ—সে-দুনিয়ায় আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না—চাই না, জয়ামা।

জয়া ॥ না, বাবা, এত সহজে আমরা আপনাকে হারাতে পারব না। ওদের প্রবঞ্চনা—ওদের ষড়যন্ত্র একদিন ধরা পড়বেই।

ভুজঙ্গের প্রবেশ

ভুজঙ্গ ॥ কার ষড়যন্ত্র—কার প্রবঞ্চনা ধরা পড়বে, জয়া দেবী? আপনার? (হাসিয়া) কাচের বাড়িতে বাস করে আমার বাড়িতে ঢিল ছুঁড়বেন না, জয়া দেবী। দু'জনেই চুরমার হয়ে যাব।

দীনদয়াল ॥ কাচের বাড়িতে বাস? তবে কি 'থুজা'? থুজার রোগী মনে করে, তার দেহ যেন কাচ-দ্বারা

ভেঙে পড়বে—ছড়িয়ে পড়বে—টুকরো টুকরো হয়ে—চতুর্দিকে। ভুজঙ্গ, 'খুজা'র লক্ষণযুক্ত কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি ভুগছ। আর তা ভুগছ বলেই আজ তুমি এত শঠ—এত খল। দোহাই তোমার, এক ডোজ 'খুজা' সি-এম্ এখনি খেয়ে ফেল।

ভুজঙ্গ॥ পাগলামি সেরে গেছে দেখছি।

দীনদয়াল॥ পাগল নই—পাগল নই, ভুজঙ্গ, আমি পাগল নই। দুনিয়াটাকে স্বরূপে দেখতে আমি পাগল সেজেছিলাম—পাগলের ভান করেছিলাম। দেখলাম, দুনিয়াটা ঠিকই চলছে—বাদে তুমি। তুমি যদি ভালো হও ভুজঙ্গ—তোমার ব্যাধিটা যদি সেরে যায়, ভুজঙ্গ—আমার এ সংসার আবার সোনার সংসার হবে। আমি তোমাকে এক ডোজ 'খুজা' দিচ্ছি—তুমি সেরে যাবে, তুমি ভাল হবে।

ঔষধের বাক্সের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহা লইয়া ঔষধ খুঁজিতে লাগিলেন

ভুজঙ্গ। জয়া দেবী, এ-হাসপাতালে পাগলের জন্য কোন বেড্ নেই। ওকে আপনি বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া॥ উনি যাবেন না।

ভুজঙ্গ॥ যাবেন না বললে তো চলবে না। ওকে যেতে হবে। ওকে হাসপাতালে রেখে আর দশজন রোগীর অসুবিধা ঘটাতে পারি না। এই, কে আছিস? দরোয়ানদের ডেকে দে।

দীনদয়াল॥ বটে! এতদূর স্পর্ধা। আমারি হাস-পাতাল থেকে আমাকে তাড়াতে চায়? দেখি কার সাধ্য?

জয়া॥ (দীনদয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া) শয়তানের অসাধ্য কিছু নেই। আপনি চলুন, বাবা।

দীনদয়াল॥ না, আমি যাব না। এই ঘর ছেড়ে আমি যাব না। এই ঘরে বসে আমি হাসপাতাল চালাই। (ছুটিয়া তাজমহলটির কাছে গিয়া) এই তাজমহল দেখে আমি প্রেরণা পাই। কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে সরায়?

ভুজঙ্গ॥ বটে! (উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন) এই, কে আছিস?

যুধিষ্ঠির দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া আসিল

যুধিষ্ঠির॥ হুজুর!

ভুজঙ্গ॥ (তাজমহলটি দেখাইয়া) ওটা নিয়ে যা হাসপাতালের আপিসঘরে যত সব খেলনা! পাগলামি আর কাকে বলে!

দীনদয়াল॥ খবরদার!

ভুজঙ্গ। শুনুন, আপনার এইসব খেলনা-টেলনা নিয়ে মানে মানে বাড়ি যাবেন কিনা, বলুন।

দীনদয়াল॥ খেলনা! তাজমহল তোলো খেলনা অক্ষয় প্রেমের প্রতীক—আমার প্রেরণা—শক্তির উৎস আমার—

ভুজঙ্গ॥ (যুধিষ্ঠিরকে) কী শুনছিস্ পাগলের পাগলামি? ভালো চাস তো নিয়ে যা ওটা।

যুধিষ্ঠির॥ ভালো আমি চাই নে, বাবু—আমাকে মাপ করুন।

ভুজঙ্গ॥ হুঁ! ব্যাটা চোর!

যুধিষ্ঠির॥ চোর হতে পারি, কর্তা—কিন্তু পুকুর-চুরি করি না। ডাকাত নই।

ভুজঙ্গ॥ Shut up—shut up!

যুধিষ্ঠির॥ রাখুন আপনার শাট-সন্তোর। ভাত মারবেন তো? তা, সকলের ভাত যিনি দিচ্ছিলেন তাঁকেই যখন মারলেন—আমি কোন্ ছার।

ভুজঙ্গ॥ Get out—দূর হয়ে যা।

যুধিষ্ঠির॥ সেই ভালো। চোখে আর এসব দেখতে পারি না।

যুধিষ্ঠির চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল

দীনদয়াল॥ (স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন) ট্যারেনটুলা—ট্যারেনটুলা—হিস্প্যানিয়া! যুধিষ্ঠির সেরে উঠেছে—আর হামাগুড়ি দিচ্ছে না। বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে চলছে। Hanneman can never fail! Hanneman can never fail! (জয়ার প্রতি) মা, তুইও চলে যা, তুইও চলে যা, মা, ওর সঙ্গে—কলকাতায়।

ভুজঙ্গ॥ উনি যাবার জন্যে আসেন নি—থাকবার জন্যই এসেছেন। কী বলেন জয়া দেবী? (একজন

অনুচরকে তাজমহলটি দেখাইয়া) এই, নে যাও—খাশ-কামরায়।

দীনদয়াল॥ খবরদার!

দীনদয়াল গুর্খাকে রুদ্রমূর্তিতে রুখিলেন। অন্য অনুচর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া দীনদয়ালকে সরাইয়া দিল। দীনদয়াল ভূপতিত হইয়া চেতনা হারাইলেন।

জয়া॥ (আর্তনাদ করিয়া কাছে ছুটিয়া গেল) বাবা! বাবা!

এই ফাঁকে তাজমহল কক্ষান্তরে অপসারিত হইল

জয়া॥ (সাড়া না পাইয়া) বাবা! বাবা! (ভুজঙ্গের প্রতি চাহিয়া) ভুজঙ্গবাবু! ভুজঙ্গবাবু!

ভুজঙ্গ॥ নার্স! নার্স! ফার্স্ট এড্…বিশেষ কিছু হয় নি জয়া দেবী। মাথায় একটু চোট লেগে থাকবে। নার্স আসছে। ফার্স্ট এড্ দিলেই জ্ঞান ফিরে আসবে। না—না, ভাববেন না। অত সহজে উনি যাবেন না। আমি যাচ্ছি—ওঁর খাস কামরায় একটা বেড দিচ্ছি। (নার্স আসিলে তাহার প্রতি) একে attend কর।

ভুজঙ্গ চলিয়া গেল। নার্স দীনদয়ালের কাছে গিয়া তাহার পরিচর্যায় রত হইল। ক্ষণপরে দীনদয়ালের চৈতন্যসঞ্চার হইল। নার্স তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। দীনদয়াল চারিদিকে চাহিয়া কী খুঁজিতে লাগিলেন। এবার তিনি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছেন।

দীনদয়াল॥ আমার তাজমহল! আমার তাজমহল! তাজমহল তো দেখছি না! (হঠাৎ জয়ার প্রতি নজর পড়িল) কে তুমি? জাহানারা? তুই কাঁদছিস্ মা?… কাঁদো—কাঁদো—হতভাগিনী কাঁদো। কাঁদবারই কথা। পুত্র যখন পিতাকে বন্দী করে—জগৎ-সংসার কাঁদে—তুমি কাঁদবে না, জাহানারা!

জয়া॥ আমায় চিনতে পারছেন না, বাবা! আমি জয়া—আপনার জয়ামা।

দীনদয়াল॥ ভেবেছিস নাম বদলালে ঔরংজেবের হাত থেকে মুক্তি পাবি? ভুল—ভুল, জাহানারা। ঔরংজেবকে তবে তুই এখনো চিনিস নি। সর্পের মতো কুটিল—ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র—শৃগালের মতো চতুর—ওই শয়তান ঔরংজেবের হাত থেকে কারো মুক্তি নেই। পালা—পালা—

নার্স॥ Behave, doctor, behave—শান্ত হোন।

দীনদয়াল॥ কে তুই, বাঁদী? (গুর্খা অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া) কে তুই, বান্দা? তোরা এখানে কেন? জাহানারা, ওদের মতলব? আমার তাজমহল চূর্ণ করেছে। এবার বুঝি এসেছে আমাকে হত্যা করতে? বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রেখেও বুঝি ঔরংজেবের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি?

এমন সময় জয়ন্ত প্রবেশ করিয়া পিতার কাছে ছুটিয়া গেল। পশ্চাতে আসিল ভুজঙ্গ।

জয়ন্ত॥ বাবা! বাবা!

দীনদয়াল॥ কে? দারা? তুই এসেছিস? আয়—আয়, বৎস—আমার বুকের ভেতর আয়।

ভুজঙ্গ॥ দারা! এরা আছে বেশ। হাঃ হাঃ হাঃ।

দীনদয়াল॥ (ভুজঙ্গের শয়তানী হাসিতে চমকিত হইয়া) না—না, আমাকে হত্যা না করে দারাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। হই না কেন বন্দী—তবুও আমি সাজাহান—ভারতসম্রাট সাজাহান।

ভুজঙ্গ॥ ভারতসম্রাট সাজাহান! (পৈশাচিক হাস্য)।

দীনদয়াল॥ বটে! এই, কে আছিস? আমার চাবুক—

ভুজঙ্গ॥ (কপট অভিনয়, যেন ভয় পাইয়াই হঠাৎ নতজানু হইল) ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন, সম্রাট! আপনার সাম্রাজ্য অক্ষয়, অমর হোক। খোদা, ভারতসম্রাট সাজাহানকে দীর্ঘজীবী করো।

দীনদয়াল॥ (সানন্দে) এই তো আমার পুত্র! বৎস, তোমাকে আমি আমার সমগ্র সাম্রাজ্য দান করলাম। তুমি শুধু আমায় ফিরিয়ে দাও—দান করো—আমার চোখের আলো—বুকের ধন—তাজমহল—আমার তাজমহল।

(ক্রমশঃ)

কয়েকটি পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধের রাসায়নিক স্বরূপ

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম-এস-সি

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্লেমিং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামে একশ্রেণীর ছত্রাক (fungus) নিয়ে গবেষণা করবার সময় একপ্রকার দ্রবণীয় পদার্থ আবিষ্কার করলেন, যার দ্বারা ষ্টাফাইলোকক্কাস্ অরিয়াস নামে জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হল। এই পদার্থকে শোধন করবার পর পেনিসিলিন আখ্যা দিলেন। এই ঘটনার প্রায় ১০ বৎসর পরে ডুবস টাইরোথ্রাইসিন নামে এই শ্রেণীর আর একটি পদার্থ আবিষ্কার করলেন এবং উহার দ্বারা কয়েকটি জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে চেইন, ফ্লোরী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হলেও ইঁদুর প্রভৃতি জীব-জন্তুদের উপর পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ডাওসন, হবি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পেনিসিলিনের রোগ-নিরাময়ক শক্তি পরীক্ষা করে ভাল ফল পেলেন। দীর্ঘদিনের পরীক্ষার ফলেই আজ এই পেনিসিলিনই জীবাণুধ্বংসী ঔষধ-সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি এই শ্রেণীর আরও দু'একটি শক্তিশালী ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার বিষয় আমরা পরে আলোচনা করব।

পেনিসিলিনজাতীয় ঔষধের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করার আগে এই সকল জীবাণুধ্বংসী ঔষধ (অ্যান্টিবায়োটিক্স্) এর জন্মকথা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পেনিসিলিন আবিষ্কারের আরও অনেক পূর্বে এই শ্রেণীর ঔষধের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পায়োসিয়ানেজ নামক একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হয় এবং ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগ-জীবাণু ধ্বংস করার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ দেখা যায় যে রোগজীবাণুর সঙ্গে এই শ্রেণীর ঔষধ স্বভাবতঃই পাওয়া যায় এবং জীবাণুর কালচার করবার সময়— এমন সব পদার্থ নিঃসৃত হয় যার দ্বারা অপরাপর শ্রেণীর দু'একটি জীবাণুও ধ্বংস করা সম্ভব। ল্যাবরেটরিতে জীবাণু-কালচার করবার সময় এই শ্রেণীর ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব। প্রকৃতিজাত গাছপালার মধ্যেও এই শ্রেণীর ঔষধ পাওয়া যেতে পারে। রসুন (garlic) একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ইহার মধ্যেও জীবাণুধ্বংসী অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকৃতিজাত এই সকল ঔষধের মধ্যে কয়েকটি রাসায়নিক উপায়ে ল্যাবরেটরিতে সংশ্লেষণ (synthesis) করাও সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীর ঔষধের রোগ-জীবাণুধ্বংসী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে আজ অনেকগুলি জীবাণুজাত ঔষধ (অ্যান্টিবায়োটিক) আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইহারা সালফনামাইড জাতীয় ঔষধের স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে বলা যায়। এই সকল সালফনামাইড্ রোগজীবাণু নষ্ট করতে সক্ষম হলেও দেখা যায় অনেক সময় জীবকোষের মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম-এর পক্ষে ক্ষতিকর এবং বেশীমাত্রায় ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানিকর। সুতরাং জীবাণুজাত ঔষধ (অ্যান্টিবায়োটিক্স) আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সকল জীবাণুজাত ঔষধকণা জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ জীবাণুসমূহকে নিষ্ক্রিয় (bacteriostatic) করিয়া বিতাড়িত করে একেবারে সালফনামাইডের মত বিনষ্ট করতে পারে না। সেজন্য ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণ (relapse) হলে ফল ভয়াবহ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল জীবাণু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে দেখা যায়। অবশ্য ঔষধের মাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায়।

এক্ষণে কয়েকটি জীবাণুনাশক ঔষধের রাসায়নিক প্রকৃতির বিষয় কিছু সমালোচনা করা যেতে পারে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে একটিনোমাইসিন আবিষ্কৃত হয়, একটিনোমাইসিস্ নামক ব্যাকটিরিয়ার বিষ থেকে। এই ঔষধ কয়েকটি জীবাণু ধ্বংস করে।

এসপারজিলাস্ ফ্লেভাস নামক ব্যাকটিরিয়ার বিষ থেকে তৈরী হয় এসপারজিলিক এসিড নামক ঔষধ। ইহা অনেক রকম ব্যাকটিরিয়া ও রোগজীবাণু নিধন করে। গ্যাসগ্যাংগ্রিণ চিকিৎসায় ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে।

১৯৪১ সালে রাইষ্ট্রিক এবং স্মিথ পেনিসিলিয়াম সাইট্রিনাম নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে সাইট্রিনিন তৈরী করেছেন। ইহা জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত। এ, ক্লাভাটাস্ নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে ক্লাভাসিন তৈরী হয়েছে এবং ইহা কয়েকটি রোগজীবাণু এবং ছত্রাক (fungus) বিনাশ করতে সক্ষম।

এসপারজিলাস্ ফিউমিগেটাস্ নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে ফিউমিগ্যাসিন তৈরী হয়েছে। ইহার কার্য্যকারিতা আছে।

এইরূপে আমরা হেলভলিক এসিড, পেনিসিলিক এসিড প্রভৃতি আরও ক[illegible] সন্ধান পাই। এই শ্রেণীর ঔষধের আবি[illegible] ফ্লেমিং তাঁর পেনিসিলিন সম্বন্ধে গবেষণ[illegible]

বিভিন্ন [illegible]ার পেনিসিলিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। [illegible] মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রকৃতিজাত ছত্রাক (fungus) থেকে যে পেনিসিলিন তৈরী হয়, তার সমপর্য্যায়ভুক্ত আর একপ্রকার জি-পেনিসিলিন ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়েছে। ইহার রাসায়নিক নাম বেঞ্জিল পেনিসিলিন। ১৯৪৬ সালে ভিগনাউড, রাচেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সর্বপ্রথম ডি-পেনিসিলামাইন্ প্রভৃতি উপাদান থেকে ইহা তৈরী করতে সক্ষম হন। কৃত্রিম উপায়ে জি-পেনিসিলিন প্রস্তুত করা বেশ দুরূহ

[illegible] ছিলেন তার ফলে এখনও পর্যন্ত পি, নোটেটাম এবং পি, ক্রাইসোজেনাম শ্রেণীর প্রকৃতিজাত ছত্রাক (fungus) থেকে পেনিসিলিন তৈরী করা হচ্ছে এবং সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার জন্য সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিযুক্ত বিরাট কারখানাসমূহ নির্মিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পেনিসিলিন পাওয়া সুকঠিন, তবে পেনিসিলিন সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম লবণ বিশুদ্ধ করতে পারা যায়। খাঁটি পেনিসিলিন একপ্রকার মনোকার্বক্সিলিক এসিড এবং দ্রবণাবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণ পেনিসিলিনের সোডিয়াম লবণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করা উচিত। পেনিসিলিনের বেরিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এমোনিয়াম এবং সিলভারযুক্ত লবণ প্রস্তুত হয়েছে। পেনিসিলিন তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং সুরাসার, গ্লিসারিণ, কার্বলিক এসিড, [illegible]জিন প্রভৃতি তরলপদার্থের সংস্রবে নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকশ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া থেকে উৎপন্ন পেনিসিলিনেজ নামক এনজাইম এই ঔষধ নষ্ট করে। বিজওয়াক্স তেলএ পেনিসিলিন মিশ্রিত করলে সহজে নষ্ট হয় না। প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড নামক লবণ ও সোডিয়াম পেনিসিলিন-এর সংমিশ্রণে প্রোকেইন্ পেনিসিলিন জি তৈরী হয় এব [illegible] এলুমিনিয়াম ষ্টিয়ারেট সংযোগে তেলে মিশালে ভাল ফল পাওয়া যায়। পেনিসিলিন ব্যবহারের প্রক্রিয়ার উপরে উহার শক্তি অনেকটা নির্ভর করে।

বি, ব্রেভিস নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে ডুবস টাইরোথ্রাইসিন আবিষ্কার করেছিলেন। ইহা গ্রামিসিডিন এবং টাইরোসিডিন নামক দুইটি [illegible] পদার্থের সংমিশ্রণ এবং প্রচুর পরিমাণ জীবাণুধ্বংসী শক্তি ইহাতে বিদ্যমান। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উহার ভালরূপ প্রয়োগ নাই।

ওয়াক্সম্যান ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিজিয়াস নামক ছত্রাক (Fungus) থেকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি এ, শাজ এবং ই, বুগি নামক বিজ্ঞানীদ্বয়ের সহযোগিতায় উক্ত ঔষধের (ষ্ট্রেপটোমাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড) রাসায়নিক প্রকৃতি আবিষ্কার করেন। ষ্ট্রেপটোমাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড এলকোহল, এসিটিক এসিড এবং পিরিডিনএ দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু মিথাইল এলকোহলে দ্রবণীয়। কষ্টিকসোডার সংস্পর্শে ষ্ট্রেপটোমাইসিনের কার্য্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। হাইড্রোজেন গ্যাস সহযোগে ষ্ট্রেপটোমাইসিন থেকে ডাইহাইড্রো ষ্ট্রেপটো[illegible] করা হয়েছে তাহাও বেশ কার্য্যকরী। ষ্ট্রেপটোমাইসিন [illegible] পদার্থ এবং পেনিসিলিন একটি এসিড, সুতরাং এসিড সহযোগে ষ্ট্রেপটোমাইসিনের লবণ প্রস্তুত করা হয়। ষ্ট্রেপটোমাইসিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি পদার্থের সংমিশ্রণ দেখা যায়, একটি ষ্ট্রেপটিডিন এবং অপরটি ষ্ট্রেপটোবাইয়োসেমাইন। সাধারণতঃ পেনিসিলিন যে সমস্ত জীবাণু প্রতিরোধ করতে অক্ষম সেইসব জীবাণুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে ষ্ট্রেপটোমাইসিনের প্রয়োজন দেখা যায়। যক্ষ্মারোগের জীবাণু ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষ্ট্রেপটোমাইসিন মানবদেহের যক্ষ্মার জীবাণুকে (human type) পক্ষীদেহের যক্ষ্মার জীবাণু (avian type) অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বিনষ্ট করতে সক্ষম। সুতরাং মানবদেহের যক্ষ্মার আক্রমণ [illegible] করবার জন্যই যেন ষ্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কার হয়েছে এরূপ বলা যেতে পারে। অন্যান্য রোগের মধ্যে প্লেগের জীবাণুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতেও ষ্ট্রেপটোমাইসিনের উপযোগিতা দেখা গেছে।

লিওন এ সুইট ১৯৪৯ সালে ক্লোরোমাইসেটিন সংশ্লেষণ করেন। তিনি এই ঔষধ অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় বেশী মাত্রায় প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে ইহা অদ্বিতীয় আবিষ্কার।

আমেরিকার লেডারলি ল্যাবরেটরির রাসায়নিক ডুগার অরিওমাইসিন আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। এই বিখ্যাত ঔষধের আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন ঐ ল্যাবরেটরির সুব্বারাও নামক একজন স্বর্গত ভারতীয় রাসায়নিক। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। ষ্ট্রেপটোমাইসেস অরিওফেসিয়েনস্ নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে অরিওমাইসিন প্রস্তুত হয়েছে। এই ঔষধ দেখতে স্বর্ণের মত সুন্দর এবং উজ্জ্বল। এই ঔষধের রোগ-নিরাময়ক শক্তি প্রচুর এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিনের মত সহজে এই ঔষধ ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। বিশেষক্ষেত্রে পেনিসিলিন এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন অত্যধিক ফলদায়ী সন্দেহ নাই, তবে সাধারণভাবে অরিওমাইসিনের কার্য্যকারিতা পেনিসিলিন এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন অপেক্ষা মোটেই কম নয়।

ওয়াক্সম্যান ষ্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার করবার পর রবার্ট কচ্ আবিষ্কৃত মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক যক্ষ্মার জীবাণুর আক্রমণ থেকে অনেকটা আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি তিনি আরও বেশী শক্তিশালী ঔষধ তৈরী করবার চেষ্টা করাতে নিওমাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। ওয়াকসম্যান প্রমাণ করেছেন যে নিওমাইসিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। অধিকন্তু নিওমাইসিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন অপেক্ষা বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করাও নিরাপদ এবং শরীরে তাদৃশ বিষক্রিয়া (toxic action) দেখা যায় না।

এই সকল জীবাণুধ্বংসী ঔষধ (antibiotics) প্রস্তুত করবার উপাদানসমূহ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যেও দুএকটি শক্তিশালী ছত্রাকের (fungus) সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলিরও সদ্ব্যবহার হওয়া কর্ত্তব্য।

ছত্রাক (fungus) ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদে (phanerogams) মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে এরূপশ্রেণীর উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐসকল উদ্ভিদ থেকে রস বের করে ক্লোরোফিল বাদ দিয়ে জীবাণুধ্বংসী ঔষধসমূহ তৈরী করতে পারা গেছে। এবিষয়ে গবেষণা আরও হওয়া দরকার এবং অজানা উদ্ভিদের মধ্যে হয়ত এমন শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হতে পারে যার কার্য্যকারিতা পেনিসিলিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন থেকে কম হবে না।

অ্যালিয়াম স্যাটিভাম্ (রসুন) থেকে অ্যান্টিবায়োটিক্ ঔষধ অ্যালিসিন্ তৈরী হয়েছে। ইহার রোগ-নিরাময়ক শক্তি সম্বন্ধে এখন গবেষণা চলছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে ইহা [illegible]

আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। জাতীয় সরকারের এই শ্রেণীর গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য, কারণ ভারতীয় উপাদানসমূহ থেকে যদি কোন শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়ে যায় ত দেশের সম্পদ অনেক বেড়ে যাবে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন এদেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত তৈরী করে বোধ হয় খুব লাভজনক হবে না, কারণ ওদেশের মত অত বিরাট কারখানা স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত খরচও অনেক বেশী দাঁড়াবে। অবশ্য দেশের মান রক্ষার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা দরকার। বিশুদ্ধ গবেষণার দিক দিয়ে ভারতীয় উদ্ভিদ (phenerogams) এবং ছত্রাক (fungus) বেশ কার্য্যকরী হবে সন্দেহ নাই।

আজ পর্য্যন্ত চল্লিশটির বেশী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির ল্যাবরেটারিতে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন এবং টিরো... এই পাঁচটি বিশেষ ফলদায়ী প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণা এখনও ... এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী সংখ্যার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হবে সন্দেহ নাই। এখনও দুএকটি দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে যার শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হবে আশা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সৃষ্টির অন্ত নাই এবং সে সৃষ্টি যেন জীবরক্ষায় কল্যাণে নিয়োজিত হয়—আণবিক শক্তির মত মানবজাতির ধ্বংসকারক না হয় তাহাই বিজ্ঞানীকে দেখতে হবে।

তিরুমলয় তিরুপটি দেবস্থানম্

শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত

মাদ্রাজ প্রদেশের ন্যায় তীর্থ ও দেবস্থানবহুল প্রদেশ বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড় অঞ্চলে যে ধর্ম ও ভক্তির ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা মাদ্রদেশের—বিশেষত: পূর্ব-কূল প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং বৈষ্ণব ধর্মগুরু আলোয়ারগণের প্রভাবে এই ধর্মভাব বিশিষ্ট ভাবে শক্তি অর্জন করে। তাহারই ফল-স্বরূপ দাক্ষিণাত্যে ইতস্তত: নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বহু দেবালয়ের উদ্ভব।

সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যের তীর্থযাত্রী বা দেবদর্শন-অভিলাষীরা বরাবর সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিয়া পথে যে সকল বিশিষ্ট তীর্থস্থান যথা মাদুরা তাঞ্জোর ইত্যাদি পড়ে তাহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের তীর্থ সমাপন করেন। কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে এমন অনেক বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আছে যাহাদের বিষয় আমরা জ্ঞাত নহি এবং সেই তীর্থক্ষেত্রে আমাদের যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। এমনি একটি বিখ্যাত অথচ আমাদের অজ্ঞাত তীর্থস্থান তিরুমলয় তিরুপটি।

মাদ্রাজ সহরের উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে একটি পাহাড়ের উপর এই তিরুমলয় তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে সহর ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম তিরুপটি। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই একটি চৌলট্রি অর্থাৎ ধর্মশালা আছে। ইহার মধ্যেই পোষ্ট আফিস হাসপাতাল ইত্যাদি আছে। আবশ্যকীয় খাদ্য-দ্রব্য উচিত মূল্যে ও রন্ধনের তৈজসপত্রাদি বিনামূল্যে এখানে পাওয়া যায়। এখান হইতে মোটরবাসে পাহাড়ের পাদদেশে যাইতে হয়, সেখানে একটি নবনির্মিত বিরাট ধর্মশালা আছে। সেখানেও সকল রকম সুবিধা পাওয়া যায়। এখান হইতে প্রত্যেক আধঘণ্টা অন্তর একটি মোটর ছাড়ে; তাহাতে ঘণ্টা দুয়েক যায়। মোটরবাসের রাস্তা ছাড়া আর একটি পায়ে-হাঁটা প্রাচীন পথ আছে। ঐ পথ অনেকাংশে ঘন চন্দন-বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পথ ধরিয়া মন্দিরে পৌঁছিতে প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা লাগে।

দুই পত্নীসহ শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মূর্ত্তি
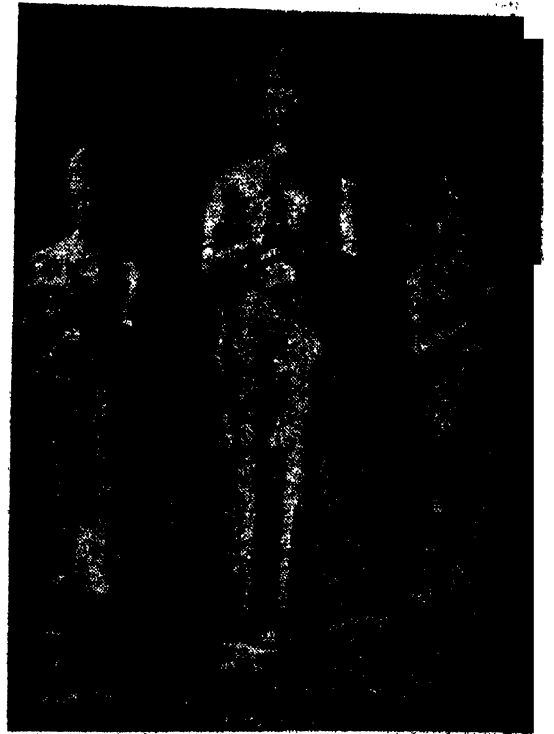
[illegible] স্থাপন ছিল। একদা সহস্র-ফণা শেষনাগ ও পবনদেবের বিতর্ক হয় যে উভয়ের মধ্যে শক্তিমান কে। শেষনাগ তাহার প্রকাশ করিবার জন্ত মেরু-পর্বতের একটি শিখর তাহার ফণার উপরে উত্তোলন করে। এমন সময় পবনদেব এমন এক বিষম ঝড় [illegible] যে শিখরটি উড়াইয়া লইয়া যায় এবং তাহা মর্ত্তে পড়ে। এইরূপে [illegible] পর্বতের সৃষ্টি হয়। ইহার অপর নাম শেষাচলম্। এই পর্বতের একটি শিখরে মন্দির অবস্থিত। শেষনাগ ও পবনদেবের বিতর্কের [illegible] সমাধান হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই কিন্তু ধরণীর লাভ হইল [illegible] তীর্থক্ষেত্র। ভক্তগণের বিশ্বাস যে তিরুমলয় মন্দির মনুষ্য নির্ম্মিত [illegible]। স্বয়ং বিষ্ণু, এখানে বালাজী বেঙ্কটেশ্বর নামে পরিচিত, মর্ত্তের উদ্ধারের জন্ত বৈকুণ্ঠধাম ছাড়িয়া এখানে প্রকট হ'ন। ইহাই [illegible] বৈকুণ্ঠধাম।
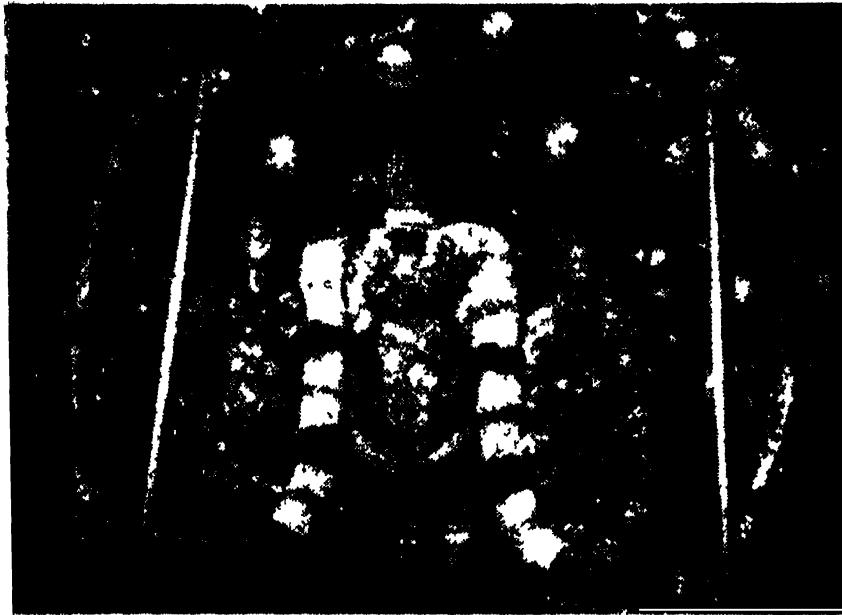
এই তীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কবে কোন [illegible] যুগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, তাই ইহাতে অলৌকিকত্ব আরোপণ করা হয়। একাদশ শতাব্দীতে আচার্য রামানুজ এই তীর্থে আগমন করেন এবং মন্দিরের পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। সেই বিধান অনুযায়ী পূজা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে রামানুজের আগমনের পূর্বেও এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কথিত আছে যে কোদণ্ড স্বামীর ([illegible]) মন্দির তাঁহার সেনাধ্যক্ষ জাম্ববান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। [illegible] ত্রেতাযুগের কথা। ইহা কিংবদন্তি হইলেও এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব [illegible] করা যায় না।

[illegible] প্রবেশের প্রথম গোপুরমের পার্শ্বে একটি বৃহৎ গহ আছে সেখানে মস্তকমুণ্ডনকারী যাত্রীদের জন্য মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। [illegible] গোপুরম পার হইলে মন্দির সংলগ্ন সহর বা লোকালয় পড়ে। চতুর্দিকে দোকান-পাট বাসগৃহ ধর্মশালা ইত্যাদি আছে। মন্দিরের উত্তর কোণে একটি টেপ্পাকুলম—নাম স্বামী পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী সকল তীর্থ বারির মূল উৎস। এখানে স্নানাদি করিয়া যাত্রীরা মন্দিরের দেব দর্শনে যান। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি বহু কারুকার্য খচিত মণ্ডপ আছে। বিগ্রহের জল-বিহারের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে শ্রীবরাহ স্বামীর মন্দির। ইহা বেঙ্কট স্বামীর মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীন। এখানে নৈবেদ্যাদি দিয়া পরে বেঙ্কটেশ্বরের পূজা হয়। মূর্তি বরাহমূর্তি, ক্রোড়ে ভূ দেবী। প্রবাদ যে বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধরিয়া ধরণীকে সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। পরে বেঙ্কটেশ্বরের এখানে আবির্ভাব। তাই বরাহমূর্তির পূজা প্রথমেই হয়।

কল্প বৃক্ষম

মুখ্য মন্দিরে তিনটি প্রদক্ষিণের পথ আছে। প্রথম সাম্পাঙ্গী প্রদক্ষিণম্। এই পথে বালীপীঠ ও ধ্বজ স্তম্ভ আছে। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথ বিমানস্তম্ভ বেষ্টন করিয়া বিমান প্রদক্ষিণম্। বিমানটি সুবর্ণ পাত মণ্ডিত ও কারুকার্য খচিত। এই পথে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে যথা বকুলমালিকার মন্দির, নরসিংহ স্বামী, রামানুজ, বরদরাজ স্বামী, বিশ্বকসেন ও গরুড় মন্দির। তৃতীয় পথ মন্দিরের গর্ভ গৃহ বেষ্টন করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণম্। এই পথটি বৎসরে মাত্র একবার বৈকুণ্ঠ একাদশীর দিন খোলা হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথের একপাশে তিনটি ধাতুময় মূর্তি আছে যাহা সকল কলা রসিকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। মূর্তি তিনটি যথাক্রমে বিজয়নগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণদেব রায় ও তাঁহার দুই সহধর্মিণী চিন্নাদেবী ও তিরুমল দেবীর মূর্তি। এমন সুষমা-মণ্ডিত মূর্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না। মন্দির গাত্রে তাঁহাদের বহু দানের কথা উল্লেখ আছে।

মন্দিরের গর্ভ-গৃহের প্রবেশ পথের দুই ধারে দুইটি বৃহৎ দ্বারপালের মূর্তি। গর্ভ-গৃহের দুইটি দ্বার সুবর্ণপাতমণ্ডিত ও বহু বিচিত্র কারু-কার্য্য খচিত। গর্ভগৃহের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন [illegible] উচ্চ, দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি, অন্য নাম শ্রীবেঙ্কটেশ্বর অথবা বালাজী। এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে গদা, অন্য এক হস্তে পদ্ম ও [illegible] অলৌকিক প্রকাশ দেখাইবার জন্য এক হস্ত [illegible]।

[illegible] (শ্রীবেঙ্কটেশ্বর) এখানে একাই হইয়া অবস্থান করেন। ইহাই এই মহাতীর্থের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব। প্রত্যেক মাসে ঐ দিন একটি উৎসব হয়।

এখানে কয়েকটি মাসিক উৎসব হয়—যথা, শ্রবণা, রোহিণী অরুণ (অনুরাধা কি?) তিথিতে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন পুনর্বসু তিথিতে, মহীশূরের রাজার জন্মদিন উত্তরভদ্রা তিথিতে, অন্য কোন রাজার জন্মদিন দ্বাদশীর দিন ও রামানুজের জন্মদিন উপলক্ষে। এই দিন বেঙ্কটেশ্বরের উৎসব মূর্তি রামানুজ মন্দিরের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয় ও রামানুজের মূর্তির সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়।

বাৎসরিক উৎসব হয় সাতটি—যথা, ব্রহ্মোৎসব, বসন্তোৎসব, নিত্যোৎসব, জলবিহার, এমুমোহোৎসব, অধ্যায়োনৎসব ও রথ সপ্তমী। এই কয়টি উৎসবের মধ্যে ব্রহ্মোৎসবই প্রধান ও জনপ্রিয়! আশ্বিন মাসে নয়দিন ব্যাপী এই উৎসব বিপুল সমারোহে পালিত হয়। প্রথমদিন ধ্বজারোহণ, এই দিন উৎসব মূর্তিকে বিবিধ মূল্যবান রত্নখচিত "বজ্র কবচে" সজ্জিত করিয়া বাহির করা হয়। অন্যান্য দিন ভিন্ন ভিন্ন বাহনের সহিত যথা শেষ বাহন, গরুড় বাহন ইত্যাদির সহিত উৎসব বিগ্রহ বাহির করা হয়। একদিন কল্পবৃক্ষ মূর্তিও বাহির করা হয়। বলা বাহুল্য যে এ কয়দিন এই তীর্থে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় এবং তাহাদের সমবেত কণ্ঠে গোবিন্দম্ গোবিন্দম্ ধ্বনিতে তীর্থস্থান মুখরিত হইয়া উঠে ও অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়। দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—একটি বিগ্রহের এমন কি দ্বারপালেরও মুখমণ্ডল চন্দন বা কাগজ দ্বারা আবৃত রাখা হয় এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। অপর বিশেষত্ব এই যে আচার্য্য রামানুজকে দেবতাদের মধ্যে স্থান দিয়া তাঁহার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বালাজীর মন্দির দ্রাবিড়ীয় পদ্ধতিতে তৈয়ারী—সেই গোপুরম্, সেই সহস্র মণ্ডপ, সেই ধ্বজস্তম্ভ, প্রদক্ষিণ পথ ইত্যাদি। এই মন্দিরের আয় বাৎসরিক প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং বহু রত্নখচিত বিভিন্ন বহুমূল্য অলঙ্কার আছে। একটি [illegible] [illegible] লক্ষ টাকা।

তিরুমলয় তীর্থ সমাপন করিয়া, পাহাড়ের নীচে বিগ্রহাদি দ্রষ্টব্য। যথা কপিল তীর্থ পাহাড়ের পাদদেশে একটি যাহার উৎস একটি পার্ব্বতীয় ঝরণা, শ্রীগোবিন্দরাজ মন্দির। ষ্টেশনের নিকটে আচার্য্য রামানুজের সময় নির্মিত। কথিত রামানুজই তিরুপটি সহরের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং মন্দির মধ্যে গোবিন্দরাজের শক্তি অণ্ডাল দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য মন্দির—শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীরামানুজ মন্দির, শ্রীতিরুমলা, শ্রীবেদান্ত দেশিকা, শ্রীমনোরথ মহামুনি ইত্যাদি। অন্যান্য মন্দির বিখ্যাত আলোয়ারদের নামে উৎসর্গীকৃত। একটি উল্লেখ্য মন্দির জায়বান প্রতিষ্ঠিত কোদণ্ড স্বামীর মন্দির, মূর্তি—কোদণ্ড সহিত লক্ষ্মণ ও সীতা। সহরের প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে পদ্মাবতী থায়ারলু, বেঙ্কটেশ্বরের শক্তি। প্রকাশ যে বেঙ্কটেশ্বরকে পাইবার জন্য আরাধনা করেন। লক্ষ্মী একটি পদ্মের উপর প্রকট তাই তাঁহার নাম পদ্মাবতী, পুষ্করিণীর নাম পদ্ম সরোবর।

এই মন্দিরের পরিচালনার ভার একটি দেবস্থানম্ পরিষদের ন্যস্ত। এই কমিটির বর্তমান সভাপতি শ্রীবেঙ্কটস্বামী নাইডু, স্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও মাদ্রাজ সহরের [illegible] তিনি নানা কাজের মধ্যেও মন্দিরের কাজ কর্ম্ম আন্তরিকভাবে করেন এবং যাহাতে সব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার চেষ্টা করেন। যাত্রীদের সুখ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে [illegible] মনোযোগ দেন। মন্দিরের বিপুল আয় মন্দিরে বিগ্রহাদির সেবা ব্যয় বাদে রাস্তাঘাট মেরামত চৌলাটি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি হয়। ইহারা কয়েকটি অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কুষ্ঠাশ্রম ইত্যাদি সাধু কার্য্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক তীর্থ-যাত্রীর তিরুমলয় তিরুপাটি মহাতীর্থ অবশ্য দর্শন করা উচিত।

জন্মদিন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[illegible] জীবন পথে তরঙ্গের উচ্ছল স্পন্দন,—
অনন্ত প্রবাহের অগণিত ক্ষণ!
মাঝে মাঝে রেখা তার—যায় রেখে;
[illegible] তিলকে—
[illegible] জীব যাত্রা পথে!
আর বার চলা শুরু—সেই বিন্দু হ'তে
সিন্ধুর অসীমে,—নিরুক্ত সাধনা!
সুন্দরের আরাধনা—
যেথা পরিপূর্ণ পরিণতি আনি,
উত্তীর্ণ অমৃত-লয়ে শুনাইবে জীবনের বাণী।
পূর্ণতার মহোৎসবে শ্রেষ্ঠতম দান;
সেই ক্ষণে জানি তব হবে সত্য আবির্ভাব।

(পূর্বানুবৃত্তি)

[illegible]কাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইহা যেন [illegible] চাঁদ নয়। মনে হইতেছিল বিধাতার গোপন শিল্প-[illegible]কেতন হইতে ইহা যেন সদ্য বাহির হইয়া আসিয়াছে [illegible] নিশাচর নিশাচরীদের নয়নে নূতন স্বপ্ন সৃজন করিবে [illegible]। নিস্তব্ধ গভীর রজনীর মর্ম্মলোকে সত্যই নূতন [illegible] অপরূপ মহিমায় মূর্ত্ত হইতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে [illegible] নিবিয়া গেল। দুই দিক হইতে দুইটি কালো মেঘ [illegible] চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল।

প্রথম মেঘ অধীরভাবে বলিল, "ভাল করে' একটু তলিয়ে [illegible] দেখতে চাই, তাই আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকার [illegible] ভাবা যায় না ভাল করে'—"

দ্বিতীয় মেঘ প্রশ্ন করিল, "কি ভাবতে চান—"

"ভাবতে চাই যে আমরা দুজনে সেই অনাদিকাল থেকে [illegible] কি"

"খেলা"

"খেলাটাও কি সত্যি? না ওটাও ছলনা"

"কাকে আমরা ছলনা করব বলুন"

"নিজেদের"

"নিজেদের ছলনা করতে যাব কেন"

"আমরা যে কিছু করছি না এই সত্যটাকে নিজেদের থেকেই যথাসম্ভব সরিয়ে রাখবার জন্য।"

"তাই বা করবার দরকার কি আমাদের"

"সত্যটা যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমি কিছু করছি এই ধারণাটা কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায় বল। তোমার বিধায় আমরা সত্যি খেলাই করছি?"

"আমি যা উত্তর দেব, তা তো আপনার মনেই আছে। সেটা শুনতে চান?"

প্রথম মেঘের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হইল। পরমুহূর্ত্তে বজ্রগর্জ্জনে ধ্বনিত হইল—"চাই। আমার মনের অতলে কি যে আছে তা জানি না। তাকে ভাষা দাও—"

"আপনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেকেই খুঁজছেন"

"অন্ধকারটাই বা কি, আমিই বা কে—"

"অন্ধকার অনিশ্চয়তা, আপনি জিজ্ঞাসা। অন্ধকার পতিত ভূমি, আপনি হলায়ুধ কৃষক। আপনি যাচাই করছেন নিজের শক্তিকে, রূপ দিতে চাইছেন অনন্ত কল্পনাকে। সংক্ষেপে নিজেকেই খুঁজছেন আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে—"

"চার্ব্বাকদের বিরুদ্ধে আমার রাগটা তাহলে মেকি বল!"

"আপনার রাগ অনুরাগ বিরাগ কিছু নেই। আপনি নির্ব্বিকার স্রষ্টা। নিজেকে নিয়ে খেলাই করছেন কেবল অনাদিকাল থেকে। খেলনাগুলো আপনার খেলার উপলক্ষমাত্র, কখনও সেগুলো সাজাচ্ছেন, কখনও আবার অবহেলাভরে ফেলে দিচ্ছেন। কখনও গড়ছেন, কখনও ভাঙছেন—"

"কিন্তু সত্যিই কি কিছু গড়ে' উঠছে, না ওটাও আমার কল্পনার ফাঁকি—"

"কোনটা ফাঁকি, কোনটা ফাঁকি নয়—কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব তা নিয়ে মাথা ঘামাক অ-কবিরা। আপনি যা করছেন তাই করুন—"

যে মেঘ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎগর্ভ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা জ্যোৎস্না-মণ্ডিত মনোহর হইয়া উঠিল। ক্রমশ তাহারা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইল। অনাবৃত চন্দ্র-কিরণে যখন দিগদিগন্ত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে তখন [illegible] গেল দুইটি পক্ষী দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালনে [illegible] অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা [illegible] বলিতেছিল তাহা পক্ষী-ভাষায় [illegible]

কিন্তু [illegible] যেন তাহারা বলিতেছে—'তাই-করি-চল, তাই-করি-চল, তাই-করি-চল'।

জালার ভিতর হইতে চার্ব্বাক যখন সন্তর্পণে বাহির হইল তখনও চন্দ্রকিরণে চতুর্দ্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন। চার্ব্বাকের সমস্ত অন্তরও স্বপ্নাচ্ছন্ন। নীলোৎপলার সুরা-পান করিয়া সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহাই যেন নূতনরূপে তাহাকে অভিভূত করিল। স্বপ্নে যে সুন্দরীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সে রূপকথালোকে প্রবেশ করিয়াছিল সে সুন্দরী সুরঙ্গমারূপে যেন তাহার নব-স্বপ্নলোকে আসিয়া তাহাকে বলিতেছিল—"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মতো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে' দেয়।" তাহার নাস্তিক্যবুদ্ধি তর্ক করিতে উদ্যত হইলে সুরঙ্গমা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে তাহাকে শাসন করিতেছিল। বলিতেছিল "তুমিই ভণ্ড কালকূট। বর্ণমালিনী তোমারই চাকচিক্যময়ী প্রতিভা, তাহার ভয়ে তুমি ত্রস্ত, তাহাকে তুমি তুষ্ট রাখিতে চাও। অথচ তাহারই সহায়তায় তুমি লাভ করিতে চাও অসম্ভবা মেঘমালতীকে, মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে যে মূর্ত্ত হয়ে আছে কবির কল্পনালোকে, তোমার নাগালের বাইরে। তাকেই পাবার জন্যে তুমি উদ্বাহু হয়ে আছ। তোমার কামনা নদীরূপ ধারণ করে' তোমাকে যা বলেছিল তাই তোমার সত্য পরিচয়। তুমি যুক্তিবাদী, কিন্তু কামনার প্ররোচনায় তুমি তোমার যুক্তিকেও লঙ্ঘন করতে ইতস্তত কর না। যুক্তিবাদ তোমার জীবন-দর্শন নয় তোমার কামনা-উপভোগের একটা সেতু মাত্র, প্রয়োজন হলে এ সেতু পরিত্যাগ করতে তোমার আপত্তি নেই।" কল্পনায় সুরঙ্গমার ভ্রূভঙ্গী-মনোহর মুখের দিকে চার্ব্বাক চাহিয়াছিল, সিংহগর্জ্জনে সহসা চমকাইয়া উঠিল। কিসের গর্জ্জন এ? এদিক ওদিক চাহিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর কিছুদূরে বিরাট পিঞ্জরটা তাহার চোখে পড়িল। ভীত-বিস্মিত-চিত্তে গাছের ছায়ায় ছায়ায় সরিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। গহ্বর হইতে [illegible] তুলিয়া মিস্ত্রির তাহাকে একটি সুদৃঢ় লৌহ-পিঞ্জরে [illegible] করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক সেই পিঞ্জরের [illegible] বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। [illegible] করিতেছে! সহসা সিংহটা পিঞ্জরের [illegible] গর্জ্জন করিয়া আগাইয়া গেল এবং সেইখানেই [illegible] বসিল। একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া সে [illegible] অন্ধকার হইয়াছিল তবু কিন্তু চার্ব্বাক দেখিতে পাইল, [illegible] অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্ত্তির মতো কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। চার্ব্বাকের ভয় হইল। যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চার্ব্বাক সরিয়া যাইতেছিল কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত [illegible] ঘটাতে তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। ছায়ামূর্ত্তি মধুর [illegible] গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। মনে হইল সিংহকে গান শোনাইবার জন্যই যেন সে এই গভীর রাত্রে [illegible] অন্ধকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চার্ব্বাক উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার [illegible] আর সন্দেহ রহিল না। ওই ছায়ামূর্ত্তি সুরঙ্গমা [illegible] আর কেহ নয়। অমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কি আর কাহারো হইতে পারে? চার্ব্বাক ছায়া-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"সুরঙ্গমা"

"কে"

"আমি চার্ব্বাক"

"মহর্ষি চার্ব্বাক! আপনি এখানে!"

"তোমার জন্য এসেছি"

"আমার জন্য? কেন!"

চার্ব্বাকের ইচ্ছা হইল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রণয় নিবেদন [illegible] কিন্তু পারিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সংযতস্বরে বলিল—"তোমাকে বাঁচাতে। সুন্দরানন্দের যজ্ঞের [illegible] আমি শুনেছি। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমি [illegible] দেব না—"

সিংহটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"এ সিংহ কোথা থেকে এল"

"আমরা ফাঁদ পেতে ধরেছি"

"কেন"

"সুন্দরানন্দের একজন বন্ধু এসেছেন, তাঁর [illegible] সিংহ ধরায়"

ক্ষণকাল নীরবতার পর সুরঙ্গমা বলিল, "[illegible]

লুকিয়ে—"

"লুকিয়েই চলে' যান তাহলে। আপনার এখানে থাকা নিরাপদ নয়"

"কেন—"

"মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে তাঁর কন্যা ধারামতী এখানে এসেছে। সে অন্তঃসত্ত্বা। ধারামতী সুন্দরানন্দের কাছে ব্যক্ত করেছে তা আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয়। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে বন্দী করে' আনতে। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে আপনার কঠোর শাস্তি হবে। মহর্ষি পর্ব্বতের কন্যার সতীত্ব হরণ করা সামান্য অপরাধ নয়। আপনি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি আপনার আগমন বার্ত্তা কারো কাছে প্রকাশ করব না"

"কিন্তু আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। কতকগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত পশু যজ্ঞের নামে তোমাকে হত্যা করবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি ফুটিল।

"কি করবেন আপনি? ওরা আপনার চেয়ে বেশী শক্তিমান। ওদের সঙ্গে কি পারবেন"

"ওরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিমান হতে পারে, কিন্তু বেশী বুদ্ধিমান নয়। বলে না পারি, ছলে বা কৌশলে আমি তোমাকে উদ্ধার করব এ বিশ্বাস আছে বলেই এত কষ্ট করে' এখানে এসেছি—"

এমন সময় অরণ্যের অন্ধকারে একটা খসখস শব্দ শোনা গেল।

"কেউ আসছে এদিকে। আপনি সরে' যান এখন এখান থেকে—"

"আমি এই অরণ্যেই লুকিয়ে থাকব। কাল রাত্রে আবার আসব, তোমার দেখা যেন পাই"

"আচ্ছা—"

চার্ব্বাক অরণ্যের অন্ধকারে অন্তর্দ্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাও থামিয়া গেল। সুরঙ্গমা কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে-ও চলিয়া গেল। সিংহটা থাবা পাতিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল উঠিয়া সে গর গরর, গর গরর্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল আবার, মনে হইল তাহার হৃদয় বুঝি শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিদীর্ণ হইবারই কথা, কারণ তাহার খাঁচার ঠিক বাহিরেই এক শশক-দম্পতি আসিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল এবং স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পশুরাজের পক্ষে এ ধৃষ্টতা সহ্য করা অসম্ভব।

সুরঙ্গমা অরণ্যের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া মির্ম্মিরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মির্ম্মির চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন, সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই চক্ষু উন্মীলিত হইল, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"গান শুনে সিংহ শান্ত হল একটু—?"

"হচ্ছিল, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না ওখানে, বড় মশা আর দুর্গন্ধ—"

"গান সাপকে মুগ্ধ করে জানি, সিংহকেও করে কি না জানবার কৌতূহল ছিল। আচ্ছা, কাল আবার একবার চেষ্টা করবেন। ঘুমুবেন না কি এখনই—"

"ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু"

সুরঙ্গমা ন-যযৌ-ন-তস্থৌ অবস্থায় ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আজ রাতটা যদি আপনার শয়নকক্ষে কাটাই আপনি আপত্তি করবেন?"

মির্ম্মির হাসিয়া বলিলেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, যদি কুমারের আপত্তি না থাকে—"

"আপনারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুমার আমাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন। যে মুহূর্ত্তে স্থির হয়ে গেছে যে আমি যজ্ঞের বলি হব, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন। আপনি তো জানেন তিনি আমার গানও আর শোনেন নি, আমাকে আর নৃত্য করতেও আদেশ দেন নি। আপনিই অনেকদিন পরে আজ বললেন সিংহকে গান শোনাতে। সেটাও আপনার এক বিশেষ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। আপনারা দুজনেই আমাকে ব্যবহার করে' নিজ নিজ স্ফূর্ত্তি সন্ধান করছেন, করুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। পুরুষের খেয়ালের স্রোতে গা ভাসিয়েই সারাটা জীবন [illegible] আমার। নিজেরও নানারকম খেয়াল [illegible] জীবনে মিটিয়েছি আমি।

আমি আপনার মনের স্বরূপ ভাল করে' দেখে যাব। আপনি যদি অনুমতি দেন আজ আপনার সঙ্গেই রাতটা কাটাই"

মিশ্মির হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি আমার স্বরূপ জানতে পারবে?"

সুরঙ্গমার নয়নের দৃষ্টিতে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে মধুর হাসিয়া সে বলিল "পারব। পুরুষের স্বরূপ জানতে মেয়েদের দেরী হয় না"

"অধিকাংশ পুরুষের বললে কথাটা ঠিক হত হয়তো। যে পথ দিয়ে তোমরা সাধারণত পুরুষের স্বরূপ সন্ধান কর আমার সে পথ আমি তানের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে' দিয়েছি। তানের দেহ যখন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল আমিও তখন উপবেশন করেছিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের উপর। পৌরুষের শারীরিক চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেছে আমার।..."

সুরঙ্গমার নয়ন আনত হইল। অধরে চাপা একটি হাসি স্ফুরণোন্মুখ হইয়া উঠিল। মিশ্মিরের দিকে আপাঙ্গে একবার চাহিয়া সে বলিল, "আপনার শরীর সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, আমার আগ্রহ আপনার মনের স্বরূপ জানবার—"

"আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি তা জানতে পারবে?"

"বিশ্বাস আছে পারব। আপনিই তো সেদিন বলছিলেন রাত্রির নিবিড়তায় এমন অনেক সত্য জানা যায় যা দিনের আলোয় জানা সম্ভব নয়"

মিশ্মিরের নয়নদ্বয় আবার নিমীলিত হইল। মনে হইল অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি কি যেন সন্ধান করিতেছেন! সহসা চক্ষু খুলিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, তানে মানা করছে"

"তানে? সে কোথায়—"

"এইখানে"

মিশ্মির নিজের বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "তাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছি বলেই সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি"

সুরঙ্গমা কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া মন স্থির করিয়া বলিল, "সম্পূর্ণ ত্যাগ করছেন সম্পূর্ণরূপে পাবেন তাই? আমারও যদি সে উপায় থাকত"

"উপায় আছে বই কি"

"আমি সামান্যা নর্ত্তকী। আমাকে কুমার অনায়াসে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করে' ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু আমি কি কুমারকে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করার কথা ভাবতেও পারি!"

"ইচ্ছে করলে তুমি কুমারকে এই মুহূর্তে চিরকালের মত ত্যাগ করে' যেতে পার। সে স্বাধীনতা তোমার আছে বই কি"

"কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছায় কথা দিয়েছি যে কুমারের যজ্ঞে আত্মবলি দেব। সামান্যা নর্ত্তকী হলেও আমার কথার মূল্য আছে"

"মহর্ষি পর্ব্বত কাল বলছিলেন শাস্ত্রে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তোমার বদলে আর কাউকে বলি দিলে শাস্ত্রমতে কোনও অন্যায় হবে না। কুমার পশু না দিয়ে মানুষও যদি দিতে চান তা-ও কিনতে পাওয়া যাবে"

"মহর্ষি পর্ব্বত এ নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামাচ্ছেন কেন"

"তোমার সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে লক্ষ্য করেছি। তিনি বলছিলেন সুরঙ্গমার মতো অমন একটা অনবদ্যা রূপসীকে পুড়িয়ে মারার কোনও প্রয়োজন নেই, তার বদলে অন্য মানুষ দিলেও চলে—"

"কুমার শুনেছেন?"

"শুনেছেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করেন নি"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর মিশ্মিরের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিংহের পিঞ্জরের সম্মুখে যে শশকদম্পতী উবু হইয়া বসিয়া সম্মুখের পদযুগল দ্বারা গুম্ফ-পরিচর্য্যায় নিরত ছিল সহসা তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

প্রথম শশক দ্বিতীয় শশককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "খুব জমেছে, কি বল"

"খুব"

"সুরঙ্গমা কি করবে বলতো—"

"তা তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন"

নিয়ন্ত্রণের স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচনার [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত [illegible] যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং দামোদরের বাম পাড়টিকে [illegible] করা। অবিলম্বে এর কাজ আরম্ভ হয় এবং যথাসময়ে কাজ শেষ [illegible]। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ধমানের মহারাজাধিরাজকে [illegible] ও ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে সদস্য ক'রে একটি কমিটি গঠিত [illegible]। কমিটি জলাধার নিয়ন্ত্রণ ও বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের [illegible] করেন। বর্তমানে যে পরিকল্পনা রূপায়িত করার চেষ্টা চলেছে [illegible] ঐ কমিটি প্রদত্ত পরিকল্পনারই ভিন্ন রূপ।

[illegible] দামোদরের বাঁধানো বাম পাড়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান অনেক রাস্তা [illegible] রেলপথ, মূল্যবান চাষের জমি ও উন্নত অঞ্চলগুলিকে বন্যার প্রকোপ [illegible] রক্ষা করাই এই গুরুত্বের কারণ। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কলকাতা [illegible] বাঁধানো পাড়ের জন্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, তা না [illegible] দামোদরের কূল ভাসানো জল হুগলী নদীকে ফাঁপিয়ে তুলে [illegible] শহরের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারতো। অপর পক্ষে [illegible] দক্ষিণ পাড়টি বাঁধানো হয়নি বলে বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত [illegible]।

দামোদর পরিকল্পনায় এই সমস্ত সমস্যাগুলি বিবেচনা ক'রে তার [illegible] চেষ্টা করা হয়েছে। উপরি উক্ত বাঁধগুলি দ্বারা রচিত জলাধার একত্র জমিতে দোফসলী চাষ হবে। পশ্চিমবঙ্গের [illegible] আসবে বর্ধমান, হুগলী, হওড়া এবং বাঁকুড়া জেলা। অতিরিক্ত ফসল আশা করা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে প্রায় সওয়া তিন লক্ষ টন।

দামোদর পরিকল্পনায় জন্য তিনটি উদ্দেশ্য আমাদের সফল হবে—বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎশক্তি প্রাপ্তি এবং সেচ ব্যবস্থা।

দামোদরের ঊর্ধ্ব উপত্যকায় আর্দ্রতা বজায়, ভূমি সংরক্ষণ, বন্যা হ্রাস এবং দামোদর নদীর খালগুলি প্রবাহমান রাখার জন্য অরণ্য ও ভূমি[illegible] সংরক্ষণের কাজ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত হয়েছে। দামোদর নদের পাহাড় অঞ্চলের অববাহিকা অন্যান্য সমস্যা-সংকুল অববাহিকার চেয়েও বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের নদী সমস্যার সমাধানে ক্রমে এই ব্যবস্থা অন্যান্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করবে।

কলকাতার কিছু দূরে হুগলী নদী থেকে রাণীগঞ্জ কয়লা খনি পর্যন্ত একটি সেচখাল ধ'রে নৌচলাচলের ব্যবস্থা হবে। তা ছাড়া এখন যে সব খাল শুকিয়ে আছে, সেগুলিতে সবসময়ের জন্য জল প্রবাহিত রাখা যাবে। উপরন্তু বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার মজা খালগুলিও সেচ অথবা জল নিকাশের জন্য ব্যবহার করা চলবে। এইভাবে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার দরুণ এক বিরাট জল-ভূমির উন্নয়ন সম্ভব হবে যার অবদান উন্নত কৃষি এবং উন্নত স্বাস্থ্য।

প্রশ্ন

সন্তোষকুমার অধিকারী

যদি এক রাত্রি শেষে জীবনের ঘুম ভেঙে যায়,
প্রভাতের নবারুণে পৃথিবীকে দেখায় সুদূর,
যদি প্রত্যূষের ক্রেদ বিচূর্ণ রাত্রির কুয়াশায়
অতুল মৃত্যুর লোভে জলে ওঠে অমৃত মধুর,—
অনন্তের বলয়েতে পথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে
মনে কি পড়িবে নাকো দিনান্তের বিষণ্ণ গোধূলি?
কোন এক মুহূর্তের হৃদয়ের স্নেহান্ধ আকুতি!
জীব নাকি আরবার আপনাকে রাখিবে না খুলি?

এই সুখ দুঃখ আর মায়ার মাধুর্য্যভরা দিন
বিচ্ছেদ বেদনা শোকে বিরহের আকুল ক্রন্দন,
দুর্নিবার যন্ত্রণায় কাঁদে ক্লিষ্ট হৃদয় আমার
নিয়ত প্রার্থনা করে—মুক্ত করো আমার বন্ধন
—তবু যদি ঘুচে যায় পৃথিবীর সবটুকু মোহ,
নিভে যায় জীবনের গোধূলি রঙীন সমারোহ,—
সেদিন কি হেঁটে যেতে সীমাহীন রাত্রির আকাশে
মনে কি পড়িবে না 'এ' জীবনের উজ্জ্বল আঁধারে

মুখর মুহূর্তগুলি? হৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা
খুঁজিবে না আরবার সময়ের মুহূর্ত সান্ত্বনা?

গোঁফ

(মার্কিন গল্প : লেখক—সলোমন স্মিথ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মার্কিন-সহরে থাকে—নাম জেক্স্।·· নিজের চেহারার সম্বন্ধে ভারী হুঁশিয়ার···ভাবে, তার মত সুপুরুষ দেশে আর নেই। দেখতে ভালো—সাজ-পোষাকে রীতিমত নজর। দশ-আঙুলে দশটি আংটি—বুকে আঁটা চমৎকার প্যাটার্ণের ব্রেষ্ট-পিন—হ্যাট কোট ভেষ্ট বুট · সব সময়ে ফিটফাট···হাতে আঁটে দস্তানা ছাগলের চামড়ায় তৈরী দুধের মত সাদা ধপ্ ধপ্ করছে। মাথায় চুলে ক্রীম···একেলে-ফ্যাশনে আঁচড়ানো · বেশে ভূষায় চেহারায় রমণীর মন ভোলাবার জন্য আকিঞ্চন এবং গোঁফ জোড়া যা বানিয়েছে—যেন মেয়েধরা ফাঁদ। লম্বা মস্ত গোঁফ—গোঁফের ডগা দুটো ক্রীম লাগিয়ে পাকিয়ে এমন বানিয়েছে—যেন ইঁদুরের ল্যাজ !··মেয়েমহলে জেক্স ঘোরে—মেয়েদের এতটুকু ফরমাশ খাটতে সে বুঝি জান্ দিতে পারে।

সেদিন এক ব্রোকারের অফিস কামরায় বসে আছি, হঠাৎ সেখানে জেক্সের আবির্ভাব ! সে এলো নিউ ইয়র্কের কোন্ বণ্ডের না শেয়ারের দর জানতে। ব্রোকার-বন্ধু তাকে বসতে চেয়ার দিলেন···খাতির করে ভালো সিগার দিলেন জেক্সের হাতে ! দুজনে কথাবার্ত্তা চললো · নানান্ বণ্ড আর শেয়ার কেনা-বেচা সম্বন্ধে। অফিসে আরো একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বললেন—[illegible] হয়েছে, এখন কোনো বণ্ড বা শেয়ার বেচা [illegible] হবে না। বাজার উঠলে তখন বেচার কথা ··

[illegible] বললে—কিন্তু আমার টাকা চাই···নগদ টাকা। [illegible] আমার যা-কিছু আছে আমি বেচতে চাই। না মশায় · সব-কিছু · উঁহু পারেন আপনি আপনার ঐ গোঁফ জোড়া ?

কথাটা শেষ করে ও-ভদ্রলোক হো হো করে উঠলেন। জেক্স বললে—নিশ্চয় ! কিন্তু মেবে যে কিনবে সে তো বেচতে পারবে না ··টাকাটা কি লোকসান · তাই মানে ··

জেক্স একটি নিশ্বাস ফেললো।

আমার কি খেয়াল হলো, · আমি বললুম—' পারি কিনতে · অবশ্য দর যদি চড়া না হয়।

জেক্স তাকালো আমার দিকে, বললে—আমি দাম নেবো না···ন্যায্য দামেই বেচবো।

আমি বললুম—ন্যায্য দাম মানে। কত ?

সিগারের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জেক্স বললে—পঞ্চাশ ডলার যদি দাম পাই, এখনি বেচবো !

গম্ভীর কণ্ঠে আমি বললুম—পঞ্চাশ ডলার·· হু, [illegible] দাম·· নিশ্চয় ! · মানে, তুমি তোমার গোঁফ জোড়া আমা[illegible] সত্যই বেচবে, পঞ্চাশ ডলার যদি তার জন্য আমি দিই দাম ?

—আলবৎ !

—জোড়া-কে-জোড়া ?

—হ্যাঁ।

আমি বললুম—আমি কিনবো। · কখন দিতে [illegible] ডেলিভারী ?

—যে-মুহূর্ত্তে বলবে।

আমি বললুম—বহুৎ আচ্ছা ! তাহলে চুক্তি [illegible] আমি কিনবো ও গোঁফ জোড়া তাহলে। আমার··[illegible]

চারদিকে ঐ গোঁফের কথা! কি করে' এ খবর রটে গেছে সারা সহরে, জানিনা! পথে-ঘাটে ক্লাবে - সর্ব্বত্র জেকসের গোঁফের গল্প। ছেলেরা ছড়া বানিয়ে ফেলেছে · জেকসকে দেখলেই তাবা ছড়া আওড়ায় ·

সলোমনের গোঁফ জোড়াতে
মুখে বাহার খুলে
ওই চলেছে বেকায়দা
লজ্জা সরম ভুলে!

ক'মাস ধরে গজিয়ে গজিয়ে গোঁফ ছাঁট-কাট মানা [illegible] যা বেড়েছে,—ওঃ! সেজন্যে অস্বস্তিও কম নয় জেকস-এর। আমি বুঝি, ও-গোঁফ বিদায় করতে পাবলে জেকস্ যেন বর্ত্তে যায়! ·

ভোজের টেবিলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কজন [illegible] হাজির সেই ব্রোকারের অফিসেব গোঁফের সওদা [illegible] কি করে, তাঁরা তা জানেন। তাঁরা জিদ ধরলেন—, না সলোমন আজই মাহেন্দ্রক্ষণ নাচের আসবে ও [illegible]জারীর মতো নর্ত্তন-কুর্দন করবে, আজই ওব গোঁফ [illegible] নাও ভারী মজা হবে। গোঁফ হাবিয়ে হয়তো [illegible] আসরে যেতেই পাববে না ও।

তাঁদের কথায় আমি রাজী হলুম—বললুম—বেশ [illegible] ব্রোকারের অফিসে সন্ধ্যাব আগে থেকো, আমি [illegible] সওদা ডেলিভারী নেবার ব্যবস্থা কববো।

সন্ধ্যার আগে সকলে জড়ো হলুম ব্রোকার-বন্ধুর অফিসে সেখান থেকে নাপিতকে ডেকে পাঠালুম সঙ্গে সঙ্গে [illegible] চিঠি পাঠালুম। লিখলুম—অবিলম্বে এখানে এসে [illegible] করবে।

[illegible] জন্য সাজপোষাক পরে জেকস্ রেডি এমন সময় [illegible] সেই চিঠি পৌঁছুলো তার হাতে জেকস্ এলো [illegible]। এসেই বললে কণ্ঠে বিরক্তি · দু-চোখে বিরক্তির [illegible]··· জেকস্ বললে—চটপট্ খোদা আমার তাড়া আছে [illegible] বলতে পারবো না। অনেকগুলি মহিলা আমার [illegible] বলে···আমাকে নিয়ে যেতে হবে তাঁদের বলের [illegible]!

[illegible] জেকস্ বসলো একখানা চেয়ারে · বসেই ঘড়ি

[illegible]—ঠিক কথা···মানে, ওখানকার আসবে [illegible] কর্মকর্তা···আমি তা জানি হে! তা [illegible]দিকের গোঁফ সাফ্ দিব্যি [illegible]!

আয়না নিয়ে জেকস্ মুখখানা একবার দেখে তারপর ডান-হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নাপিতকে [illegible] নাও হে এবার এদিকটা · চটপট্ আমার [illegible] আছে।

সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমি বললুম—দাঁড়াও · তাড়া [illegible] না। গোঁফের মালিক আমি আমার মর্জ্জি মতো ছাঁটা। ওদিকটা আজ থাক তোমার আবার [illegible] আছে অনেকগুলি মহিলা তোমার পথ চেয়ে আছেন, তাঁদের তুমি নিয়ে যাবে বল-নাচের আসরে! না··· আর নয়।

ঘরশুদ্ধ লোক হো-হো করে হেসে উঠলো—অট্ট[illegible] সকলে যেন ফেটে পড়বে।

জেকস্-এর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে—সে বললে—এ অন্যায়—সল্ একদিকে গোঁফ—আর একদিকে নেই কি-রকম?

আমি বললুম—আমার খেয়াল! নাপিতের দিকে [illegible] বললুম—আজ এই পর্য্যন্ত ওদিককার গোঁফ [illegible] খবর দেবো—

নাপিত তার সরঞ্জামপত্র গুছিয়ে ব্যাগে তুলছে··· [illegible] বলে উঠলো দোহাই সল্ এদিককার গোঁফ ··[illegible] জন্যে কি-দাম পেলে তুমি আমাকে রেহাই দেবে?

আশ্চর্য্যভাব দেখিয়ে আমি বললুম—দাম! রেহাই!

—হ্যাঁ। জেকস্ বললে—মানে, এদিককার গোঁ[illegible] তোমার কাছ থেকে আমি ফিরে-ফিরতি কিনতে চাই নগদ দাম দিয়ে। মানে, ব্যবসা—

—হুঁ! আমি বললুম—মন্দ কথা নয়—বেশ—[illegible] তুমি ও গোঁফের জন্য কত দেবে, বলো?

জেকস্ বললে—পঞ্চাশ ডলার।

আমি বললুম—না। ওর ডবল যদি দাও

—তার মানে—একশো ডলার?

আমি বললুম—হ্যাঁ। ওর এক কার্দিং কমে ও গোঁফ বেচবো না!

—বেশ বেশ তাই দেবো একশো ডলারই নাও ·

বলে' দশখানা দশ ডলারের নোট পার্শ [illegible] আমার দিকে ছুঁড়ে জেকস্ বললে—এই নাও, [illegible] তারপর চেয়ারে বসে নাপিতকে বললে—[illegible]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[illegible] হোটেলের খুব কাছেই মস্কোর বোল্‌শুই অপেরা হাউস। [illegible] হোটেলের গলি থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তা—মোটর, ট্রলিবাস [illegible] পথচারীর ভিড়ে ভরা। সেই রাস্তা ধরে দু'পা এগুলে ডাইনে [illegible] পাশে চোখে পড়ে, ওদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রঙ্গালয় Maly Theatre (Small বা Little Theatre) অর্থাৎ 'ছোট নাট্যশালা'। [illegible] পুরনো সেকালের ছাঁদে, নামে লিটল্ হলেও আয়তনে বড়—[illegible] বোল্‌শুই থিয়েটারের মত বিরাট নয়। নিত্য সন্ধ্যায় এই মালি [থিয়ে]টারে বসে নানারকম নাটকের অভিনয় আসর…সে সব অভিনয় [দেখ]তে দর্শক-সমাগম হয় প্রচুর। সোভিয়েট রাজ্য সফরকালে এখানকার [illegible] কয়েকটি নাটকের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সে কথা [illegible]—আপাততঃ পথে এগিয়ে চলি, বোল্‌শুই থিয়েটারে।

[মা]লি থিয়েটারের ঠিক উল্টো দিকে পথের অপরপ্রান্তে মাথা উঁচু [করে] [illegible] রয়েছে ওদেশের প্রসিদ্ধ পান্থ-নিবাস—Hotel Metropole। [illegible] প্রাচীন হলেও, এ-হোটেলে সেবার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ আধুনিক [এবং] ঐতিহ্য-পরিমাতেও রীতিমত খানদানী। দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েট [দে]শের [illegible] এবং সামাজিক বহু ভোজ সভার বিশেষ আসর বসে আসছে [এ]ই হোটেল মেট্রোপোলের সুরম্য কক্ষে। দেশ বিদেশের অভ্যাগত [illegible] সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে এখানে প্রায় খানা পিনা, আলাপ [illegible] বৈঠক বসে। এখানকার বিরাট সজ্জিত সুবিশাল [Ban]quet-Hall-এ অনুষ্ঠিত ভোজ-সভায় সোভিয়েট-রাজ্যের চলচ্চিত্র [illegible] সভ্যেরা ভারতের চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধিত করেছিলেন [illegible] এবং সেই সুযোগে এ-হোটেলের অপরূপ বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে [illegible] প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

হোটেল মেট্রোপোল ছাড়িয়ে সুপ্রশস্ত চৌমাথা…চৌমাথার বাঁ দিকে [illegible] উদ্যান সুন্দর সাজানো বাগান। এই বাগানের সামনে [বোল্‌]শুই অপেরা হাউস।

[illegible]শালার বাইরের ও ভিতরের অজস্র লোকে লোকারণ্য…যেন [illegible] মেলা বসেছে। নানা বয়সের, নানা ছাঁদের নানা বেশে [illegible] আত্মীয়পরিজনসহ নর-নারীর ভিড়ে গিস্ গিস্ করছে থিয়েটার… বিশৃঙ্খলা নেই…সর্ব্বত্র শান্ত, সহজ, সংযত, শালীনতার ভাব—আমাদের দেশের থিয়েটার বা সিনেমা-হলে যা একান্ত দুর্লভ।

স্থাপত্য-কলার দিক দিয়েও বোল্‌শুই থিয়েটারের গঠন বৈশিষ্ট্যটি বেশ অভিনব। সুদৃঢ় বিরাট অথচ সুন্দর অনাড়ম্বর রূপ এই সুবিশাল নাট্যশালাটির—মোটা মোটা দীর্ঘ থামের সারি…বড় বড় খিলান গম্বুজ… বিচিত্র মার্বেল পাথরে মোড়া ফর্শ্যাতল…স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম বর্ণচ্ছটায় রঙীন প্রশস্ত ঘর-দোর, দালান বারান্দা—আগাগোড়া লাল ভেলভেটের কার্পেট বিছানো। বাড়ীর ভিতর বাহির ঝকঝকে-তকতকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন…কোথাও এতটুকু ধুলো বালি, বা কদর্য্যতা নেই। অপেরা হাউসের সাজ সজ্জাও বহুমূল্য এবং সুরুচিসম্পন্ন…মনে হয় যেন রাজা-রাজড়ার প্রাসাদে, এসেছি। সোভিয়েট দেশের এই নাট্যশালায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মন আনন্দের অপরূপ আভায় ভরে ওঠে! রঙ্গালয় যে রস সৃষ্টির রূপ নিকেতন…শিক্ষা এবং কলাকৃষ্টির সংস্কৃতি কেন্দ্র… জনগণের চিত্ত-বিনোদনের আনন্দ আসর—এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন বলেই সোভিয়েট নাট্যকলাবিশারদের দল দেশের দর্শকবৃন্দের সুখ-সুবিধা, আরাম স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ পরিবেশনের বিষয়ে এতখানি সজাগ এবং তৎপর…এতখানি আগ্রহশীল। এঁদেরই অক্লান্ত-প্রয়াস, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আন্তরিক সাধনায় সোভিয়েট-রাজ্যে প্রত্যেকটি রঙ্গালয় আজ ওদেশের জাতীয় জীবনে লোকশিক্ষা এবং কলা-কৃষ্টি প্রগতির অভিনব প্রতিষ্ঠান হিসাবে গৌরবলাভ করেছে। সোভিয়েট নাট্যকলা সংস্কৃতির এই বিচিত্র উন্নতি সাধনে ওদেশের কলা-রসিক দর্শকজনের সহানুভূতি সহযোগিতাও অপরিসীম। বিশাল-বিস্তৃত সোভিয়েট রাজ্যের সর্ব্বত্র ছোট বড় প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ে নৃত্য-গীত নাটকাভিনয়ের আসরে প্রত্যহ যে অসম্ভব জনসমাগম দেখেছি, তা থেকে ওদেশী দর্শকদের কলানুরাগ এবং রঙ্গালয়প্রীতির পরিচয় পাই। সোভিয়েট-দেশবাসীর এই নাট্যকলারসানুরাগিতার ঝোঁক, সত্য বলতে বিদেশীদের চোখে প্রথম প্রথম অদ্ভুত ঠেকে—মনে হয়, যেন বাড়াবাড়ি…[illegible] পাগলামি ভাব…দেশের সকলেই যেন একজোটে থিয়েটার-[illegible] উঠেছে হঠাৎ! তবে, ওদেশে কিছুদিন থাকলে এবং [illegible] ভালো করে মিশলে, স্পষ্ট বোঝা যায়, [illegible]

দৃশ্যারম্ভ আগে আমাদের প্রত্যেকের হাতে 'রুশ্‌লান্‌ লুদ্‌মিলা' চিত্রবিচিত্রিত প্রোগ্রাম-পুস্তিকা দিয়ে গেলেন। সুবৃহৎ আসনগুলি ক্রমে ভরে গেল দর্শকের ভিড়ে। দোভাষী সঙ্গীদের মুখে শুনলুম যে বোল্‌শই থিয়েটারের একটি মাত্র সন্ধ্যা-আসরে প্রত্যহ টিকিট-বিক্রী হয় প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার রুব্‌ল।

অভিনয়-আরম্ভের সংকেত হতে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর মালা ধীরে-ধীরে ম্লান-স্তিমিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাদ-প্রদীপের আলোর ছটা ফুটে উঠলো মঞ্চের উপরে… যন্ত্রীরা সুরু করলেন সুললিত ঐকতান বা গীতিচন্দ্রিকা! সেই যন্ত্র-অভিব্যঞ্জনার মাঝে সরে গেল যবনিকা… দর্শকদের উন্মুখ-দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠলো সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েট গীতি-

বোল্‌শই থিয়েটারের কাছেই—মস্কোর মেট্রোপোল হোটেল

মস্কোতে আমাদের বাসস্থান—ঐ হোটেলের খানাঘরের একাংশ

'রুশ্‌লান্‌লুদ্‌মিলার' এক অপরূপ দৃশ্য…ছন্দে-গানে দৃশ্যসজ্জায়, আলোকসম্পাতের রঙীন এবং প্রাণবন্ত-অভিনয়ের দীপ্ত-লীলায় মুখর!

সুপ্রসিদ্ধ রুশ গীতি-নাট্যকার গ্লিন্‌কা ওদেশের একটি জনপ্রিয় সরল রূপকথা অবলম্বনে ছন্দে-গানে-সুরলালিত্যে রচনা করেছিলেন তাঁর অমর গীতি-নাট্যখানি। খ্যাতনামা সোভিয়েট নাট্য-প্রযোজক পরিকল্পনায় বোল্‌শই থিয়েটারের আসরে এ-নাটিকার সার্থক-

নাটিকার কাহিনী সরল…রূপকথার ধরণের—রচনার মাধুর্যে এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সেটি দাঁড়িয়েছে অসাধারণ! অভিভূত-চিত্তে উপভোগ করলুম সেই অপরূপ গীতি নাট্য। দোভাষী-সহচর সঙ্গীরা গীতি-নাট্যের কাহিনীটি আমাদের জানিয়ে রেখেছিলেন—সুতরাং অভিনয়ের মর্মানুসরণে এবং রসগ্রহণে কারো অসুবিধা ঘটেনি। তাছাড়া প্রতিটি দৃশ্যাভিনয়ের সময় নাটকের ভাষা, ভাব এবং যা কিছু জ্ঞাতব্য সঙ্গে সঙ্গে সবই অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের এই বন্ধুরা—সেজন্য বিশেষ আরো সুবিধা হয়েছিল অভিনয়ের মর্ম গ্রহণের। এই অভিনব নাট্য লীলার কোথাও একটু খুঁত চোখে পড়ে না—এমন সুষ্ঠু-নিপুণ অভিনয় ও প্রয়োগ-কলাকৌশল। তাছাড়া এমন অপূর্ব একটি আন্তরিক যোগ team spirit এঁদের সকলের মধ্যে যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্লভ! মঞ্চের দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা এবং আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থাও অভিনব বিচিত্র! ওদেশের রঙ্গালয়ে অতি আধুনিক এমন সব বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে যে সে-সবের সাহায্যে মঞ্চের উপর নিমেষে বড়-বড় দৃশ্য-নাট্যসজ্জার পরিবর্তন-সাধিত হচ্ছে অতি অল্প আয়াসে। তাছাড়া সোভিয়েট-রঙ্গমঞ্চের সুদক্ষ মঞ্চ-শিল্পীর দল সুনিপুণ-কৌশলে প্রত্যেকটি দৃশ্যের ভূষণ সজ্জা এমন নিখুঁত পরিপাটিভাবে রচনা করেন যে দর্শকদের চোখে সেগুলি বাস্তব বলে মনে হয়—এমন অপরূপ throc-dimentional effect দেবার পদ্ধতি। 'রুশ্‌লান্‌-লুদ্‌মিলা' গীতি-নাট্যের একটি দৃশ্যে ছিল—সাগর-তীরে নায়ক রুশ্‌লানের সঙ্গে সমুদ্র-তলবাসী জলের রাজার সাক্ষাৎ। রূপকথার এই বিচিত্র চিত্রটি কল্পনায় যেমন রঙীন হয়ে ফোটে মঞ্চের উপরে এ-দৃশ্যটির বাস্তব-অভিব্যঞ্জনায় আমরা ঠিক রূপকথার সেই রূপটা পেয়েছিলুম…ওদেশের কলা-কুশলী শিল্পীদের নিপুণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মঞ্চের উপর রঙীন রূপকথার সেই কল্পনার [illegible] বাস্তব-প্রতিরূপে মূর্ত-বিকশিত হয়ে উঠেছে দেখেছি! [illegible]

জল-রাজার বিরাট মুখ—মাথায় তাঁর শুক্তি-প্রবাল-খচিত স্বর্ণ-মুকুট! নায়ক কুশ্‌চুলোয়ের সঙ্গে জল-রাজের বাক্যালাপ হবার পর আবার সাগরের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে গেল সেই বিরাট মুখ! এই কাল্পনিক ব্যাপারটিকে আশ্চর্য্যরকম সুন্দর এবং নিপুণভাবে সে রাত্রে মঞ্চের অভিনয় আসরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কুশলী সোভিয়েট নাট্যকলাবিদের দল।

নাটকাভিনয়ের বিরাম-অবসরেও আমাদের সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দোভাষী সহচর সঙ্গীত্রয়ের কি সদয়-দৃষ্টি! তাঁদেরই অনুরোধে রঙ্গালয়ের 'রেস্তোরাঁয়' বসে ফলের রস আর ওদেশী 'লিমোনাড্' (Lemonade) পান করছি এমন সময় বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সার্জন ডক্টর বালিগার সঙ্গে দেখা। আমাদের সোভিয়েট পরিক্রমার ক'মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞান-বিদ্ চিকিৎসকদের যে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন এদেশে—ডক্টর বালিগা সেই দলের বিশিষ্ট সভ্য। সোভিয়েট সফর সেরে দলের অন্য প্রতিনিধিরা ভারতে ফিরে গেছেন বটে কিন্তু ইনি সস্ত্রীক কিছুকালের জন্য রয়ে গেছেন এ-দেশে—সোভিয়েট রাজ্যের চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার অনুশীলন করবেন বলে। প্রায় ছমাস ধরে ইনি বিশিষ্ট সোভিয়েট এবার ফিরবেন ভারতে। আর ডক্টর বালিগা [illegible] বোলশোই থিয়েটারে গীতি-নাট্যাভিনয় দেখতে—দেশের [illegible] পেয়ে তাঁরা মহা-উৎসাহে এসে বসলেন আমাদের টেবিলে—[illegible] আলাপ সালাপ। ডক্টর বালিগার মুখে সোভিয়েট-রাজ্যের চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার অপূর্ব্ব প্রগতি কল্যাণের কথা শুনলুম! নিজের [illegible] উল্লেখ করে তিনি বললেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সোভিয়েট এমন অগ্রসর হয়ে চলেছে যে মনে হয়—অচিরে এঁরা মৃত-মানুষ পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারবেন। আলোচনা বৈঠকটি সবে জমেছে, বিরাম অন্তে আবার অভিনয় আরম্ভের সঙ্কেত রঙ্গালয়ের [illegible] দিকে। তখনকার মত বালিগা দম্পতীর কাছে বিদায় নিয়ে [illegible] প্রেক্ষাগৃহে আমাদের বক্সে ফিরে এলুম।

বিরতির পর আবার সুরু হলো অভিনয়। রূপে রসে সঙ্গীতে স্বপ্নজালে এমন তন্ময় হয়েছিলুম সকলে, যে সময়ের খেয়াল ছিল না, রাত এগারোটা নাগাদ শেষ হলো অভিনয়ের পালা। আমরা ফিরে হোটেলে—অভিনয়ের ভাব বিহ্বলতায় অভিভূত চিত্তে। (ক্রমশঃ

কাশিমবাজার

কবিশেখর—শ্রীকালিদাস রায়

পূর্ব্বভারতীয় ধূর্ত্ত ব্যবসায়িদল
তোমা বঙ্গইতিহাসে অমরতা দেয়নি কেবল।
বদান্য ভূস্বামী তব দানধারা ঢালি' নিরন্তর
কত না সদনুষ্ঠানে বঙ্গে তোমা করেছে অমর।
আমি দীন কবি
সাহিত্যে করিব তোমা অমর গৌরবী
ছন্দের বন্ধনে
বন্দী হয়ে রবে তুমি চিরদিন বাঙ্গালীর মনে।
তব তরু তব লতা পশুপাখী তব
ঋতুতে ঋতুতে তব রূপ নব নব,
তব কাটিগঙ্গাতীরে জীর্ণ দেবালয়
পুষ্প কুঞ্জ পথঘাট ফলোদ্যান স্নিগ্ধ ছায়াময়
মৃদঙ্গ, কূজন হ্রেষা, গুঞ্জরণ মরালের স্বর,
কমলকুমুদ পদ্মী তব সরোবর,
প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র, অতীতের যত ভগ্নস্তূপ
সকলি গড়িবে মোর কাব্যে রস রূপ।
কত জনই কত ধনই লভিয়াছে তোমার ভাণ্ডারে
বিলায়েছ তুমি নির্ব্বিচারে,
[illegible] পরিচয় দাতা গ্রহীতার
[illegible], চিহ্ন নাহি তার।
যে বস্তু পেয়েছি আমি নাই তার তুলা,

তখন বুঝিনি আমি তোমার সে দান
জীবনে হইবে হেন উপচীয়মান।
নিখিলের মাধুর্য্য হরিয়া
আমারে দিয়াছ তুমি অঞ্জলি ভরিয়া।
কেহ তা'ত জানিত না দিলে তুমি নীরবে নিভৃতে।
সবার হরিলে ক্ষুধা, মোর চিত্ত ভরিলে অমৃতে!
দরিদ্র কিশোর আমি চাইনিক কিছু
চলেছিনু ক'রে মাথা নীচু।
জানিনা আমারে শুধু কেন তুমি বেসেছিলে ভালো,
অন্ধকার বনপথে জেলেছিলে জোনাকির আলো।
ভুলিনি তোমার দান, ভোলা কি সম্ভব?
এ জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে আছে, করি অনুভব।
ক'দিনের পরিচয়! দান তবু নহে পরিমেয়,
সারা জীবনের পথে তাই মোর সম্বল পাথেয়।
তোমার দানেরে আমি রেখে যাব দিয়া ছন্দোরূপ,
বাগ্দেবীর শ্রীমন্দিরে হবে তাই শত শত ধূপ।
আজো সেই কিশোর উদাসী
তুমি যা শিখায়েছিলে সেই সুরে বাজায়েছে বাঁশী
ওপারের বাঁশী তারে ডাকিয়াছে, নিতে আসে, [illegible]
রাখিবে না মনে তারে যারে তুমি রেখেছিলে [illegible]
তোমারে পূজিয়া যাই, উপচার সুধা রেখো [illegible]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

জম্মু আন্দোলন—

কাশ্মীরের প্রজা-পরিষদের জম্মু আন্দোলনের উত্তাপ কিছুটা মন্দীভূত হইলেও আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। এই আন্দোলনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গ যোগদান করায় দিল্লীর তথা ভারতের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণভাবে ভারতভুক্তিই প্রজা-পরিষদের দাবী। প্রজা-পরিষদের মূল দাবী হইল ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে এবং ভারতীয় সংবিধানের অভ্যন্তরে কাশ্মীরের স্থান যাহাতে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়, কাশ্মীরের দিক হইতে তাহার ঘোষণা। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন আইন, শাসনতন্ত্র এবং নীতির দিক দিয়া কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রজা-পরিষদ ইহা মানিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের দাবী হইতেছে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ কার্য্যকরীভাবে ভারতভুক্তি।

প্রজা-পরিষদের আন্দোলনের মূলে যে দাবী রহিয়াছে তাহা মূলে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক। প্রজা-পরিষদের দাবীর পশ্চাতে যে কোনও [illegible] নাই একথা বলা চলে না; কিন্তু একথাও ঠিক যে এই আন্দোলনের [illegible] নয়। সরকারের পক্ষে যেমন হটকারিতা করিয়া আন্দোলনের [illegible] গ্রেপ্তার করা ঠিক হয় নাই, জনসঙ্ঘ প্রমুখ রাজনৈতিক [illegible] তেমনি কাশ্মীরের ন্যায় গোলযোগপূর্ণ সীমান্তপ্রদেশের একটি আন্দোলনে—যার ফল শুভ না হইয়া আরও অশুভ পরিণতি লাভ করিতে পারে—এরূপ সমর্থন ও সহযোগ করা উচিত হয় নাই। আশা করি সরকার ও আন্দোলনকারী নেতৃবর্গ আপোষে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নাগাভূমির অশান্তি—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর আসাম সীমান্তের নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে [illegible] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত হইয়াছে। [illegible] পণ্ডিত নেহরু অপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ [illegible] কোহিমায় পণ্ডিত নেহরুর [illegible] চলিয়া যায়। [illegible] "নাগা জাতীয় পরিষদ" নামে একটি দল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নাগা রাজ্য গঠনের দাবী প্রধান মন্ত্রীর নিকট জানায় এবং প্রধান মন্ত্রী তাহাতে কর্ণপাত না করায় তাহারা প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এক শ্রেণীর নাগাদের এই অসভ্য ও অশোভন আচরণ এবং তাহাদের এইরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত দাবীর পশ্চাতে কাহাদের অদৃশ্য হস্তের উস্কানি রহিয়াছে তাহা প্রধান মন্ত্রীর উক্তি হইতে কিছুটা অনুমান করা যায়। মনে হয় ঐ অঞ্চলের বেতকায় মিশনারীরাই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া একদল নাগাকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নাগারাজ্যের দাবী করাইতেছে। নাগাদের এই অসঙ্গত দাবী পূরণ করা হইবে না ইহা সত্য, কিন্তু নাগা জাতির একটি অংশ যে বাহিরের উস্কানি পাইয়া ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যাইতেছে তাহাও সত্য—এবং ভারত সরকারের প্রতি এক শ্রেণীর নাগাদের মনের এই বিরূপ ও বিদ্বেষ ভাব ভবিষ্যতে ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার সম্ভাবনাও প্রবল।

এই নাগা অঞ্চলগুলি ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। বিশেষ করিয়া দূর প্রাচ্যের রাজনীতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত গণ্ডোগোল সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করিয়াছে। অনেকদিন আগে হইতেই এইরূপ সন্দেহের কারণ দেখা গিয়াছিল। তাই ভারত ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের এই যুগ্ম সফর বিশেষ সময়োচিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা ও তাঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত নাগাদের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে। তবে যতদিন না সর্ব্বশ্রেণীর নাগা-সম্প্রদায় ভারত রাষ্ট্রের একান্ত অনুগত হইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য সীমান্ত রক্ষীতে পরিণত হইয়া এই অশান্তির অবসান করে, ততদিন পর্য্যন্ত যেন ভারত সরকার ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হন।

কোয়ালিশনের সম্ভাবনা—

কংগ্রেস ও প্রজা-সোস্যালিষ্ট দল যুক্ত হইয়া [illegible] গঠনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল [illegible]। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু [illegible] নেতৃবর্গের সহিত [illegible]

[illegible] নীতিগুলির প্রয়োগে তাঁহার এই মনোভাব স্পষ্টভাবে [illegible]। গত ৩ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং [illegible] পদত্যাগ করিয়া তাঁহার এই নূতন প্রচেষ্টার বিবরণ তিনি যখন [illegible] তখন দেশের রাজনৈতিক মহলে একটি আশাপ্রদ প্রতিক্রিয়া [দে]খা যায়। বিশেষ করিয়া বোম্বাইএ প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের মধ্যে বিশেষ [আ]শা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ও সমাজতন্ত্রী-[দ]লের নেতা শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণের মধ্যে আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর [হ]ইবার পর দেখা গেল যে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। [প]ণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণের আলোচনা হইতে বোঝা যায় [যে] কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রীদলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বিশেষ নাই। খালি [এ]ই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করিবার পদ্ধতিটিই কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন। [য]খন জমিদারী প্রথা বিলোপ করিতে উভয় দলই আগ্রহশীল কিন্তু জমি[দা]রকে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রজা-সমাজতন্ত্রীদল রাজী নয়। যাহাই হোক, ইহা [ঠি]ক যে কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের মধ্যে দলগত মতানৈক্য খুব [বে]শী নাই এবং আগ্রহ থাকিলে দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য এই দুই [প্র]ধান দলের মিলনের ও কেন্দ্রে কোয়ালিশন্ গভর্ণমেণ্ট গঠনের সম্ভাবনা [সু]দূরপরাহত নয়। ভারতবর্ষের মত অগণ্যসমস্যাসঙ্কুল বিশাল দেশ [এ]কটিমাত্র পার্টির দ্বারা শাসিত হওয়ারবহু অন্তরায় রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী [প]ণ্ডিত নেহেরুরও মত তাহাই বলিয়া মনে হয়। তাই কোয়ালিশন্ যদি [ক]রিতেই হয় তাহা হইলে অন্যান্য দল অপেক্ষা যে দলের আদর্শ প্রায় [ক]ংগ্রেসেরই অনুরূপ এবং যে দলের নেতাগণ কংগ্রেসেরই প্রাক্তন [স্ত]ম্ভবর্গ—যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসেরই পতাকাতলে একত্র যুদ্ধ [ক]রিয়াছিলেন—সেই সমাজতন্ত্রীদলের সহিতই মিলিত হইয়া কোয়ালিশন্ [গভ]র্ণমেণ্ট গঠন করাই সমীচীন হইবে। তবে দলগত প্রশ্ন বাদ দিয়া [ড]াক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্থান সর্ব্বসময় ও সর্ব্বকালেই কোয়ালিশন সরকারের [ম]ধ্য থাকা উচিত।

কোয়ালিশন সরকার গঠনের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত [হ]ইয়াছে সত্য, কিন্তু আজিকার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই ভবিষ্যতের [স]ফল সূচিত হইতেছে এবং এরূপ সম্ভাবনাও অসম্ভব নয় যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতপ্রধান পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে সমালোচনামুক্ত [হ]ইয়া কোয়ালিশন সরকার ভারত রাষ্ট্র শাসন করিবে।

[illegible]—

১৯৪৮-৪৯ সাল হইতেই লৌহ-যবনিকার [illegible] বিচার, স্বীকারোক্তি ও চরম দণ্ডাদেশের [illegible] মহাযুদ্ধোত্তরকালে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, [illegible] প্রভৃতি দেশে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর [illegible] সেদিন পর্য্যন্ত এই দেশগুলিতে এইরূপ বিচার ও চরমদণ্ড [illegible] কষ্টভ, গ্রোমুলকা প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট পার্টির নায়কগণ, [illegible] ইউরোপে কম্যুনিজম্ প্রচার ও বহাল করিতে পার্টিকে [illegible] সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও একদিন ব্যতিক্রমবাদী ও [illegible] স্বতন্ত্রবাদীরূপে অভিহিত হইয়া চরমদণ্ড লাভ করিতে হইয়াছে। ষ্ট্যালিনের অবর্ত্তমানে রাশিয়ার শাসকেরা আমাদের [illegible] উদ্দেশ্যেই হোক মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত চিকিৎসকগণকে [illegible] নিজেদের ভুল স্বীকার করিয়া সততা দেখাইয়াছেন তাহা সত্য। তাহাতেই এই ব্যাপারের উপর যবনিকাপাত হয় নাই; বরং যবনিকার অন্তরালের বিচার প্রভৃতি বহু ঘটনার সম্বন্ধেই [illegible] সাধারণ লোকের মন স্বভাবতঃই সন্দেহ ও সংশয়ের দোলায় [illegible] হইবে এবং সোভিয়েট সরকারকেও বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

তাহা ছাড়া সোভিয়েট সরকার ইহাও স্বীকার করিয়াছেন [illegible] স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, আইনানুমোদিত নয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের পর এ কথা স্বীকার[illegible] হইয়াছে অর্থাৎ ঐ উপায়েই—যাহা সভ্য জগতের আইন [illegible] স্বীকারোক্তি আদায় করা হইয়াছে। প্রশ্ন এই, অতীতে কম্যুনিষ্ট [illegible] সোভিয়েট সরকারের প্রভাবশীল ও উচ্চপদস্থ যে সব ব্যক্তি [illegible] স্বীকারোক্তি দিয়া চরমদণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন [illegible] ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি আদায়ের কোন্ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল [illegible] অভিযুক্ত চিকিৎসকদেরও হয়ত সেই হতভাগ্যদের পথই অনুসরণ [illegible] হইত, যদি না ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট নায়কদের [illegible] পরিবর্ত্তন হইত।

রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিরও একটি বিরাট পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত [illegible] যখন কোরিয়া যুদ্ধের অবসানকল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনীত সোভিয়েট [illegible] কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে আন্তরিকতা ও শান্তি স্থাপনের সত্যকার [illegible] আভাস পাওয়া গেল। ইহার ফলস্বরূপ আহত ও অসুস্থ [illegible] বিনিময়ও নির্বিবাদে আরম্ভ হইল। শুধু ইহাই নহে, [illegible] কিছুদিন পূর্ব্বে কোরিয়া যুদ্ধের অবসানকল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনীত [illegible]

...আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট সাংবাদিক ও সরকারী ...দের একত্র পানভোজন এবং জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও ম: ...তের বাহ্যগান! এই সব ঘটনা অভাবনীয় তো বটেই ...পূর্বও!

যাহাই হোক, রাশিয়ার এই রূপান্তরের অর্থ এবং ঘরে ও বাহিরে ...রাষ্ট্রনীতির এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধারণের কাছে ... দুর্জ্ঞেয়। তবে যদি রাশিয়ার এই নীতি পরিবর্তন কোরিয়া ...ইউরোপের cold warএর অবসান ঘটাইয়া পৃথিবীতে চিরশান্তি ...ত পারে তাহা হইলে বর্তমানের সোভিয়েট কর্ণধারগণ বিশ্ববাসির ...অভিনন্দন লাভ করিবেন।

পাকিস্থানের পরিস্থিতি—

পাকিস্থানের ভিতরকার পরিস্থিতি যে কিরূপ গোলযোগপূর্ণ ও ...রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্বপাকিস্থানের ...আন্দোলন ও তাহার দমন, আহমদিয়া আন্দোলনের বীভৎসতা ও ...পরি পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আকস্মিক ...অপসারণের মধ্য দিয়া। প্রধান মন্ত্রীর অপসারণ ও আহমদিয়া ...আন্দোলনের বীভৎস রূপ আজ জগতের নিকট পাকিস্থানের স্বরূপ কিছুটা ...প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

পাকিস্থানের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলীর ...স্থলাভিষিক্ত প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটে এক ...নাটকীয় ধরণে। সাধারণ ভাবে এক মন্ত্রীর কার্য্য শেষে বা ...জোরে আর একজন সে স্থলে বসিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল ... কিন্তু খাজা সাহেবের মন্ত্রীত্বের অবসান যে ভাবে ঘটিয়াছে তাহা ...নীয় নূতন বটেই, অধুনাতন রাজনৈতিক ইতিহাসেও বিরল দৃষ্টান্ত। ...মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে পাকিস্থানের গভর্ণর-জেনারেল ডাকিয়া ...এবং তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যে ইস্তফা ...বলা হয়। খাজা সাহেব ইহাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে সরাসরি ...করা হয়। ঘটনাটি প্রায় এইরূপ ভাবেই ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ...কালের সঠিক কারণ যে কি তাহা বাহির হইতে বলা দুষ্কর। ...কারণ যে একটিমাত্র নয় তাহাতে যেমন কোনও সন্দেহ নাই—এই ...যে আকস্মিক ঘটনা নহে এবং ইহার পশ্চাতে যে একটি ...পরিকল্পনা আছে তাহাও ঠিক। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ...থাকিলে কখনই তাঁহাকে ... না। কিন্তু খাজা সাহেবের যে ... এই কর্মপ্রচেষ্টার অভাবের একটি কারণ ... আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি। অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য নাজিমুদ্দীনকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যায় না। তাঁহার পূর্ববর্তীগণ এবং পাকিস্থানের অন্যান্য কর্ণধারগণও ইহার জন্য সমভাবেই দায়ী। তবে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে মন কষাকষি, পূর্ব পাকিস্থানের ভাষা আন্দোলন ও বিশেষ করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সহিত বৈরিতাই নাজিমুদ্দীনের পতনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নয়।

যাহাই হোক, নাজিমুদ্দীনের উত্থান ও পতনের মধ্যকার রাজত্ব সময়ে পাকিস্থানের উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। ইসলামধর্মের ভিত্তির উপরই রাজ্য শাসনের স্পৃহা খাজা সাহেব দেখাইয়াছেন কিন্তু পাকিস্থানের নিজস্ব সংবিধান রচনার চেষ্টা করেন নাই। উপরন্তু খাজা সাহেব তাঁহার পূর্ববর্তী প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলীর ভারতের প্রতি বৈরীভাবের প্রতীক চিহ্ন সেই 'উদ্যত মুষ্টি'ই বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন এবং হিন্দু বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতাই প্রচার ও অনুসরণ করিতেছিলেন! তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী কিন্তু মন্ত্রীত্ব ভার গ্রহণ করিয়াই ভারতের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে ভারতের প্রতি পাকিস্থানের মূল নীতির সুনিশ্চিত পরিবর্তন সূচিত হইতেছে কি না তাহা সঠিক ভাবে বর্তমানে বলা না চলিলেও ইহা নিশ্চিত যে কিছুটা পরিবর্তন—এবং তাহা যে মন্দের দিকে নহে—অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে। তবে এই পরিবর্তিত মনোভাব বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর নিজস্বই না পাকিস্থানের অন্যান্য কর্ণধারগণেরও ইহাতে সহযোগ আছে তাহা বর্তমানে পরিষ্কার বোঝা না যাইলেও ভবিষ্যতই তাহা প্রমাণ করিবে। কিন্তু মিঃ মহম্মদ আলীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই ভারতের প্রতি এই সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ সত্যই প্রশংসনীয়।

আশা করা যায় মিঃ মহম্মদ আলী তাঁহার নূতন প্রচেষ্টায় ... করিবেন এবং পাকিস্থানের ভিতর বাহিরের সমস্ত গোলযোগ ও ...র অবসান ঘটাইয়া শান্তি ও গণতন্ত্রের আলোকে পাকিস্থানকে উদ্ভাসিত করিতে পারিবেন।

২০শে বৈশাখ—১৩৬০

দিনে দিনে আরও
মসৃণ ও রমণীয় ত্বক
রেক্সোনা

—ছয়—

"O que ? Não e possivel !"

রাজশেখর শ্রেষ্ঠী চাকারিয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তি। অনেকগুলি বহর আছে তাঁর—প্রায় সারা বছরই তারা বাইরের সমুদ্রে বাণিজ্য করে বেড়ায়। রাজশেখর নিজে যে কত সহস্র সহস্র যোজন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন, তার কোনো হিসেব তিনি নিজেও করতে পারেন না। উদার মহাসাগর—অফুরন্ত তার বিস্তার। কত রূপে—কত বর্ণে এই বিরাটকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। কত কূলে-উপকূলে দেখেছেন তার আশ্চর্য রূপান্তর। অতলান্ত গভীরতায় নীল কাজলের মতো তার মৃত্যুময় রূপ; শিলাবন্ধর তটে তার শুভ্র ফেনার উচ্ছ্বাস; উড়িষ্যার কূলে কূলে সে আকাশী নীল; গাঙ্গেয় সমতটের পলিমাটি ছড়ানো প্রান্ত রেখায় তার রঙে গৈরিক মেশানো।

কোথাও নীল জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে আছে নগ্ন কালো পাহাড়; তার মাথার ওপরে কলধ্বনি করে পাখীর ঝাঁক—তার ফোকরের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে শিকারের প্রতীক্ষা করে অষ্টভুজ রাক্ষস—ওর হাতীর শুঁড়ের মতো করাল বন্ধনে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই কারো। কোথাও ডুবো পাহাড় জোয়ারে তলিয়ে যায়—ভাঁটায় ভেসে ওঠে; ওর ওপরে একবার জাহাজ গিয়ে পড়লে তার অবধারিত বিনাশ। কোথাও কোনো নির্জন দ্বীপের কূলে কোনো অভিশপ্ত জাহাজের ধ্বংস শেষ। কোথাও দুটি একটি মানুষের মৃতদেহ—তাদের ওপর হাজার হাজার লাল কাঁকড়া আর ইঁদুরের ভোজ বসেছে। কোথাও অগভীর জলের তলায় মুক্তার ঝিলিক, কিন্তু নামবার উপায় নেই—ওৎ পেতে আছে মানুষ-খাওয়া হাঙর—শঙ্কর মাছে চাবুকের ঘায়ে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ জলজ শৈবাল। কোথাও বা বালির ডাঙার ওপর অজস্র কড়ি—সমুদ্রের ঢেউয়ে ছিটকে পড়া এক আধটা শঙ্খ মৃত্যু-যন্ত্রণা ছটফট করছে, কিন্তু নামবার উপায় নেই, ওখানে চোর বালির মৃত্যুফাঁদ—বালির ওপরে ছড়ানো কয়েকটা কঙ্কালে তার প্রমাণ। আবার কোথাও নারিকেল-বনের ছায়া-দোল দ্বীপ—মিষ্টি জলের ঝর্ণা, পাখী, নানা রঙের রাশি রাশি ফুল।

সমুদ্র আশ্চর্য—সমুদ্র অপরূপ। ঝড় ওঠে—ঢেউ হা দাঁড়ায় আকাশের দিকে, হাজার হাজার মণ উড়ন্ত বালি নিয়ে নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মতো হাওয়া ছুটে আসে মনে হয়, যমরাজের সমস্ত দূতকেই বুঝি একসঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয়েছে! আবার কখনো বৃষ্টির শেষে রামধনু ওঠে: যেন স্বপ্ন দেখে সমুদ্র—রূপকথার স্বপ্ন! গভী কালো রাত্রিতে তার বুকে সংখ্যাতীত প্রেতাত্মার যে কান্না শোনা যায়—পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর সমস্ত গান—সমস্ত সুর তার ওপরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

রাজশেখর বলেন, সমুদ্রের মায়া যাকে টেনেছে তা আর কিছুতেই মন বসবে না। তাছাড়া সমুদ্রই তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ওখান থেকেই তো লক্ষ্মী উঠেছিলেন।

অতএব সমুদ্রের টানে রাজশেখর যে বেরিয়ে পড়েছে বার বার, তাতে তাঁর দুদিক থেকেই লাভ হয়েছে। এক দিকে যেমন তিনি এই বিরাটের লীলাকে দেখতে পেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি অঞ্জলি ভরে পেয়েছেন মহালক্ষ্মীর দান এ অঞ্চলে তিনি সবচেয়ে ধনী। উদার হস্তে অথবা

করাতেও কার্পণ্য নেই তাঁর। দুটি বড় বড় দীঘি কাটিয়েছেন—পর পর কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—সারা গ্রীষ্মকালে চারদিকে জলসত্র ছড়িয়ে দেন তিনি। চাকারিয়ার নবাব খান্ খান্ খুদা বক্স খাঁ তাঁকে যথেষ্ট খাতির করেন—দরকার পড়লে ঋণ করেন তাঁর কাছ থেকে।

এই রাজশেখর এবার রক্তেশ্বরের মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন স্বপর্ণার কল্যাণ কামনায়। এমন একটি মন্দির—যার চূড়ো ধবলগিরির মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠবে—যার ঘণ্টাধ্বনি একক্রোশ দূর থেকেও লোকে শুনতে পাবে। যেখানে তিনি মন্দিরটির পত্তন করেছেন, তার কাছেই একটি বিশাল বৌদ্ধবিহার—একটি ছোট টিলার ওপরে তার উদ্ধত মাথা। রাজশেখর তার চাইতে বড় একটি টিলা বেছে নিয়েছেন—বৌদ্ধবিহারকে ম্লান করে দেবে এমনি একটি মন্দির গড়ার সংকল্প তাঁর।

কিন্তু এ কী বললেন সোমদেব? এ কী অদ্ভুত আদেশ?

সোমদেব বলেছিলেন, এই তো স্বাভাবিক। শক্তি তো শিবেরই গৃহিণী।

—তা বটে। তবে—

—তবে নেই এতে। আর শিব তো নির্বিকার পুরুষ, শক্তিই হলেন কর্মরূপিণী। তাই শিব শব হয়ে পড়ে থাকেন, আর মহাকালী লীলা করেন তাঁর বুকের ওপরে।

—সে তো ঠিক, তবুও—

—মিথ্যেই তুমি দ্বিধা করছ রাজশেখর—সোমদেবের চন্দনমাখা ললাটে দেখা দিল ভ্রূকুটি, রক্তাভ চোখে চকিত হয়ে উঠল জ্বালা: ভেবে দেখো কোন্ নিয়মে চলছে সৃষ্টি। শিব হলেন আদি দেবতা, যোগরূঢ়, চির শান্ত। তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে তিনি শক্তির সৃষ্টি করেছেন। বিনাশের লগ্ন যখন আসে, তখন এই অন্ধকার রূপিণীকে তিনি দেন সংহারের আদেশ—কালীর তাণ্ডব নৃত্যের জন্যে বেদী রচনা করেন নিজের বুক পেতে দিয়ে। আজ সেই লগ্ন উপস্থিত। আজ শঙ্করের শবে চামুণ্ডার অভ্যুত্থান।

রাজশেখর কিছুক্ষণ বিবর্ণ হয়ে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এই একটা কথা কিছুদিন থেকেই আপনি বলছেন। বলছেন, সময় হয়েছে—আর দেরি করা চলবে না। কিন্তু আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিসের সময়? কিসের জন্যে চামুণ্ডার সাধনা করতে চান আপনি?

—তাও কি বুঝতে পারো না?—সোমদেবের স্বরে ধিক্কার ফুটে উঠেছিল: দেশ থেকে বিধর্মীদের দূর করতে চাই আমি।

—কারা তারা?

—মুসলমান।

—মুসলমান?—রাজশেখর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন: তাদের প্রতি কেন এমন বিদ্বেষ আপনার?

—বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ কেন, তারও কারণ জানতে চাও?—বজ্রগভ মেঘের মতো মনে হয়েছিল সোমদেবের স্বর: দেশ যারা অধিকার করে নিয়েছে—মন্দির ভেঙে মসজিদ বসিয়েছে, হাজার হাজার মানুষের ধর্মান্তর ঘটিয়েছে—

আরো বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখর: অপরাধ ক্ষমা করবেন প্রভু, আমি তো এর মধ্যে অসঙ্গত কিছু দেখছি না। আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো অনার্য শবর কিরাতদের পরাজিত করে তাদের মধ্যে নিজের ধর্ম প্রচার করেছে। পরধর্ম সম্পর্কে আমাদেরও যে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে একথা আমরাও বলতে পারি? আমি নিজের চোখেই কতবার দেখেছি, ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে নিষ্ঠুরভাবে কত বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আজ দলে দলে যারা ইস্লামের দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের অধিকাংশই যে সেই সব নিপীড়িত বৌদ্ধের দল—প্রভু তা নিজেও জানেন।

—হুঁ।

সোমদেবের মেঘের মতো মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন রাজশেখর। গুরু তাঁর কথাগুলো কী ভাবে গ্রহণ করছেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কষ্টিপাথরে খোদাইকরা কালভৈরবের মতো বিকারহীন তাঁর নিষ্ঠুর মুখশ্রী—তার মধ্যে থেকে কখনো কোনো কিছু তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। তাই সোমদেবের মৃদু গম্ভীর শব্দটাকে প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত মনে করে তিনি আরো বলে গিয়েছিলেন: তা ছাড়া সমাজের যারা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য, তাদেরও মর্যাদা দিচ্ছে। সকালে উঠে যাদের মু

দেখলে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করি আমরা, মাথায় গঙ্গাজল দিই— ইসলামে তাদেরও জায়গা হয়ে গেছে। আমাদের চাকারিয়াতেই এক চণ্ডাল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে। বললে বিশ্বাস করবেননা প্রভু, ঈদগাহের নামাজের দিনে স্বয়ং নবাব খোদাবক্স খাঁ সেই চণ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন।

—হুঁ।

এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখর, কিন্তু কথার ঝোঁকটা সামলাতে পারেননি: আমরা যাদের ঠাঁই দিইনি, ইসলাম তাদের কাছে টেনে নিয়েছে।

—আর নারীহরণ?

—দুর্জন চিরদিনই ছিল প্রভু, চিরকালই থাকবে। তাই বলে—

—যথেষ্ট হয়েছে, থামো।—আর ধৈর্য রাখতে পারেননি সোমদেব: তোমার মতো নির্বোধ তার্কিকের সঙ্গে কথা বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও কোনোদিন মুসলমান হয়ে যাবে। তা হলে আর মন্দির প্রতিষ্ঠা দিয়ে কী হবে? তার জায়গায় তুমি মসজিদ তৈরি করো গে। আমাকেও আর তোমার দরকার নেই— তুমি কোনো মৌলভীকেই ডেকে নাও!

কিছুক্ষণ পাথর হয়ে বসেছিলেন রাজশেখর—কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দও আর উচ্চারণ করতে পারেননি। পাষাণে-গড়া কালভৈরব জেগে উঠেছেন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

তার পর তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন সোমদেবের পায়ের তলায়: অপরাধ হয়ে গেছে প্রভু, বাচালতা হয়ে গেছে। আমাকে মার্জনা করুন।

অনেক কষ্টে, অনেক সাধ্যসাধনার ফলে, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন সোমদেব—প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু ওই এক সর্তে। রক্তেশ্বরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দুদিন পরে হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু মহাকালীর জাগরণ অবিলম্বে প্রয়োজন আজই—এই মুহূর্তেই।

তবু মনের সংশয় কাটেনি রাজশেখরের।

দেশে বিধর্মী না থাকলে হয়তো সবাই-ই খুশি হয়। কিন্তু থাকলেই বা ক্ষতি কী? প্রথম যারা অপরিচিত শত্রু হয়ে এসেছিল—আজ তারা ঘরের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে যে সব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বেঁধেছে—এক ধর্ম ছাড়া তাদের সঙ্গে আর তো কোনো ব্যবধানই নেই। এমন কি, নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে তারা। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে। এই লোহার মতো জোয়ান মানুষগুলোর হাতে যেমন চলে লাঠি, তেমনি ঘোরে তলোয়ার। এদের ভয়ে ডাকাতের উৎপাত পর্যন্ত কমে এসেছে আজকাল। মাইনে দিয়ে যারা পাঠান রেখেছে ঘরে, তারা যেন বাস করে পাহাড়ের আড়ালে। নিজের শেষ রক্তকণা দিয়েও এরা রক্ষা করবে অন্নদাতাকে— এমনি এদের ইমান।

এমনভাবে যারা ঘরের মানুষ হয়ে গেছে—তারা বিদেশীই হোক, বিধর্মীই হোক—তাদের ওপর কোনো বিদ্বেষের স্পষ্ট হেতু যেন পাননা রাজশেখর। এই তো কিছুদিন আগে সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মাথা নুইয়েছে তার নামে, তাঁকে বলেছে "নৃপতি-তিলক।" চট্টগ্রামেরই ছুটি খাঁ—পরাগল খাঁর মতো ক'জন মহাপ্রাণ হিন্দুর সন্ধান মিলবে আশে পাশে?

তবু সোমদেব। পাথরে খোদাই করা কালভৈরব। তাঁর জ্বলন্ত দু-চোখে যেন ত্রিকালদৃষ্টি। হয়তো তিনিই ঠিক বুঝেছেন। তাঁর কথার প্রতিবাদ করবে শক্তি কোথায় সোমদেবের—মনেই কি সে জোর আছে তাঁর?

রাত্রি। মেঘ আর কুয়াশা-ঢাকা জ্যোৎস্নার ছায়ামায়া দুলছে কর্ণফুলীর জলে। দু-খানি বজরা চলেছে পাল তুলে। একখানিতে সোমদেব, আর একখানিতে রাজশেখর আর সুপর্ণা।

কাচের আবরণের মধ্যে একটি প্রদীপ দুলছে বজরার ভেতরে। সেই আলোয় তিনি দেখলেন ঘুমন্ত সুপর্ণাকে। পাণ্ডু মুখখানা ক্লান্ত করুণতা দিয়ে ছাওয়া—এখনো শরীর থেকে তার অসুস্থতার জের কাটেনি। গভীর স্নেহে আর করুণায় মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজশেখর। কোথা থেকে একটা কঠিন দুর্ভাবনা এসে আঘাত করেছে তাঁকে।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, এই আয়োজন—সবই তো সুপর্ণার জন্যে। কিন্তু সূচনাতেই কেন এমন করে বিঘ্ন বাধিয়ে বসলেন সোমদেব—এমন করে সব কিছুকে বিস্বাদ করে

বলেন? একটা অকল্যাণ ঘটবেনা তো—আসন্ন হবেনা তা কোনো অশুভযোগ?

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল রাজশেখরের: গুরুদেব, ফিরে যান—ফিরে যান আপনি। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।—কিন্তু বলতে পারলেননা, সে শক্তি কোথায় তাঁর? শুধু রোমাঞ্চিত দেহে, উৎকর্ণভাবে তিনি শুনতে লাগলেন গভীর গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ—কর্ণফুলীর কলধ্বনি ছাপিয়ে, বাতাস-লাগা পালের একটানা শব্দকে অতিক্রম করে—সেই অমানুষিক অলৌকিক মন্ত্ররব ছড়িয়ে পড়ছে—সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে সুদূর আকাশের নীরব গম্ভীর তারায় তারায়।

* * * *

কারাগারের ভেতরে সাতজন পর্তুগীজই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল।

দিনের বেলাতেও কঠিন অন্ধকার দিয়ে ছাওয়া ঘর। তারি মাঝে দু-দিক থেকে চিত্রকরা সাপের মতো দুটো প্রলম্বিত আলো ছড়িয়ে আছে। ওই আলো এসেছে ঘরের দু ধারের প্রায় ছাদঘেঁষা দুটি অর্ধচন্দ্রাকার জানালা থেকে। মেঝে থেকে প্রায় দশ হাত উঁচুতে আলো-হাওয়া আসবার ওই দুইটি যা কিছু রাস্তা। মোটা মোটা লোহার গরাদে দিয়ে এমনভাবে সুরক্ষিত যে তাদের ভেতর দিয়ে গলে-আসা একটি পায়রার পক্ষে পর্যন্ত কষ্টকর।

পায়ের নীচে স্যাঁৎসেঁতে মেঝে। এখানে ওখানে দু একটা ছোট ছোট গর্ত—কত বন্দী অসহায়ভাবে ওখানে মাথা খুঁড়ে মরেছে কে জানে। শ্যাওলা-ধরা পাথরের দেওয়াল শীতের স্পর্শে মৃত্যুহিম। চারদিকে বড় বড় পাথরের থাম, তাদের গায়ে ঝুলছে ভারী ভারী লোহার কড়া। ডি-মেলো দেখেই বুঝতে পারলেন। যে সব বন্দীরা কারাগারে থেকেও যথেষ্ট বাগ মানেনা—ওই সব কড়ায় বেঁধে তাদের চাবুক মারার বন্দোবস্ত।

এখানে ওখানে কয়েকটি ছোট বড় আধভাঙা বেদী, কয়েদীদের শোয়া-বসার জন্যে। তারই ওপরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পর্তুগীজেরা বসেছিল নিঃশব্দে। কেউ কেউ জলন্ত চোখে তাকিয়েছিল দরজার দিকেও। কিন্তু দরজা বলে কিছু আর দেখা যাচ্ছেনা—দুখানা লোহার প্রাচীরের ভেতর দুটি কালো ফোকর ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

পাশেই চুপ করে আছে গঞ্জালো। দেবদূতের মতো মুখ—সোনার মতো চুল, চৌদ্দ বছরের কিশোর। কেমন আর্তদৃষ্টি ফেলে থেকে থেকে তাকাচ্ছে ডি-মেলোর দিকে। আবছা অন্ধকারে ডি-মেলো দেখতে পারছেন না ভালো করে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তার দুচোখের অব্যক্ত যন্ত্রণা। হিংস্র ক্রোধে সমস্ত শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। যদি কখনো দিন আসে, যদি কখনো আসে অনুকূল অবসর—তা হলে একবার ওই কোতোয়ালকে—ওই নবাবকে একবার তিনি দেখিয়ে আনবেন লিসবনের কারাগার। সেখানে আছে লৌহকুমারীর আলিঙ্গন—সেই আলিঙ্গনে তাদের পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেই দু দিক থেকে আসবে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলক—মুহূর্তের মধ্যে হাড় মাংস শুদ্ধ বিদীর্ণ করে দেবে।

বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে ওই-ই উপযুক্ত জায়গা—উপযুক্ত শাস্তি।

ঠাণ্ডা ঘর থেকে কন্‌কনে শীত উঠছে—কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর। চারদিকের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেন প্রেতের ছায়া দুলছে। একটা উগ্র বিষাক্ত দুর্গন্ধ ভেসে উঠছে থেকে থেকে—কোথাও ইঁদুর মরেছে খুব সম্ভব। অথবা, কিছুই বিশ্বাস নেই মুরদের—এই ঘরেরই কোনো ছায়াঘন একান্তে কোনো দুভাগা বন্দীর গলিত দেহ-শেষ পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে!

আর সহ্য হল না। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলেন ডি-মেলো।

—কাকা!—একটা ক্ষীণ স্বর শোনা গেল গঞ্জালোর।

—কিছু ভয় নেই—চলতে চলতে থেমে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, আশ্বাস দিয়ে বলতে চাইলেন: কিছু ভয় নেই গঞ্জালো—সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে! কী ভাবে ঠিক হয়ে যাবে? একমাত্র মুরদের সর্ত মানলেই তা সম্ভবপর। তাঁরা পর্তুগীজ—একমাত্র হিস্পানিয়ার সিংহাসন ছাড়া আর কারো কাছে তাঁরা মাথা নত করতে জানেন না। সারা হিন্দে তাঁরা মানতে পারেন একমাত্র নুনো-ডি-কুন্‌হার নির্দেশ। আজ যদি খুদাবক্স খাঁর সর্ত তাঁরা মেনে নেন, কী হবে তা হলে? তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—তাঁরা হবেন নিতান্তই এই মুরদের

আজ্ঞাবহ সৈনিক। তারা যা হুকুম দেবে—তাই মানতে হবে, প্রতি মুহূর্তে বশ্যতা মেনে চলতে হবে তাঁদের।

কিন্তু তাতেই যে নিষ্কৃতি আছে—কে বলতে পারে সে কথা? সিল্‌ভিয়ার সতর্কবাণী মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কোয়েল্‌গোর কথা। মুরদের বিশ্বাস নেই। এক দাসত্ব থেকে আর এক দাসত্বে তারা ঠেলে দেবে—ঘুরিয়ে মারবে নিষ্ঠুর পাপচক্রে। কী করে বিশ্বাস করবেন ডি-মেলো?

—ক্যাপিটান!—কে একজন এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কে? পেড্রো? কী বলতে চাও?

—এভাবে বন্দী হয়ে থাকার কোনো অর্থই হয় না ক্যাপিটান।

—সে আমি জানি। কিন্তু কী করা যাবে?

পেড্রো বললে, আমরা শুধুই গোঁয়ার্তুমি করছি। এর কোনো প্রয়োজন ছিলনা।

ডি-মেলো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন সন্দেহে।

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না পেড্রো।

—নবাবের প্রস্তাবে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত ছিল!

—সম্মত?—ডি-মেলো গর্জন করে উঠলেন: O que? Nos e possivel! (কী? না—সে অসম্ভব।)

—কেন অসম্ভব?—পেড্রো প্রশ্ন করলে।

—তার কারণ, আমরা খুদাবক্স খাঁর সৈন্য নই—স্বাধীন পর্তুগীজ। তার হুকুম তামিল করার জন্যেই আমরা বেঙ্গালাতে আসিনি।

—তা বটে!—পেড্রো ব্যঙ্গের হাসি হাসল: স্বাধীন যে সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

ক্রুদ্ধ সিংহের মতো পেড্রোর দিকে তাকালেন ডি-মেলো: তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ পেড্রো? মনে রেখো, আমি তোমাদের অধিনায়ক—আমার সঙ্গে তোমাদের ব্যঙ্গের সম্বন্ধ নয়।

পেড্রোর চোখ সাপের মতো চকচক করে উঠল: যে অধিনায়ক নিছক নির্বুদ্ধিতার জন্যে কারাগার বেছে নেয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাষায় কথা বলা কঠিন।

—পেড্রো!

তীব্র স্বরে পেড্রো বললে, এই বন্দিত্ব মানতে আমরা রাজী নই। ক্যাপিটান ইচ্ছে করলে যত খুশি করাবাসের সুখভোগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা নবাবকে জানাতে চাই—তাঁর সর্তেই আমরা রাজী।

—বিদ্রোহ?—আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো, হাত চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে। কিন্তু সেখানে তলোয়ার ছিলনা।

ডি-মেলো আবার বললেন: বিদ্রোহ? তোমরা সবাই?

—না, সবাই নয় ক্যাপিটান!—চক্ষের পলকে পাঁচ সাতজন উঠে এল, আড়াল করে ধরল ডি-মেলোকে। অন্য দিক থেকে এল আরো তিন চারজন—দাঁড়ালো পেড্রোর পাশাপাশি।

—পেড্রো শয়তান, পেড্রো মুরদের দলে যোগ দিয়েছে!—কিশোর গঞ্জালোর তীক্ষ্ণস্বর ভেসে উঠল।

হয়তো পরক্ষণেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ত পেড্রো—পরক্ষণেই মারামারি শুরু হয়ে যেত দুই দলের ভেতরে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে দুদিকে সরে গেল লোহার প্রাচীরের মতো দরজা দুটো। গরাদের বাইরে প্রহরীর পাশে দেখা গেল দুজন পর্তুগীজের মূর্তি।

চক্ষের পলকে দুদলই ভুলে গেল বিদ্বেষ—ভুলে গেল এতক্ষণের ক্ষিপ্ত হিংস্রতা। এক সঙ্গেই সকলের গলা থেকে বেরিয়ে এল আর্তস্বর: ভ্যাস্‌কন্‌সেলস! কোয়েলহো!

ঝড়ে ডি-মেলোর যে দুখানি জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তাদেরই দুজন নায়ক শেষ পর্যন্ত চাকারিয়ায় এসে পৌচেছে। শুধু এসেই পৌছোয়নি—সেই সঙ্গে এনেছে মা মেরীর আশীর্বাদ—মুক্তির বাণী।

সেই কথাই শোনা গেল ভ্যাস্‌কনসেলসের কাছ থেকে।

—কোনো ভয় নেই বন্ধুগণ। নবাবের সঙ্গে আলোচনা করে এখনি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু মুক্তি! কী ভয়ঙ্কর—কী নিষ্ঠুর মূল্য যে তার জন্যে দিতে হবে, সে দুঃস্বপ্ন কি কল্পনাতেও ছিল অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর?

(ক্রমশঃ)
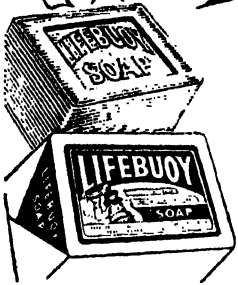
ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন—

২৮শে এপ্রিল মহারাষ্ট্র সফরে যাইয়া বেলগাঁওএ এক সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারত রাষ্ট্রে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি কমিশন গঠন করিবেন। কমিশন ভাষার সহিত অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির কথাও বিবেচনা করিবেন। অন্ধ্র রাজ্য গঠনের পর সুবিধা-অসুবিধাগুলি বুঝা যাইবে। কমিশনের রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে তদনুসারে রাজ্য বিভাগ করার আইন করা হইবে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন করিতে যাইয়া যাহাতে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা না আসে, সেজন্য সকলকে সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, ভাষা সমস্যা তাহাদের অন্যতম। ধীরে ধীরে এ সমস্যার সমাধান হইলে কোন পক্ষেরই অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

বিহার রাজ্যে বাংলা ভাষা স্বীকার—

বিহার রাজ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দানের দাবী ও এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইয়া বিহার আইন সভার ৯ জন বাঙালী সদস্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট ১লা মে পাটনা হইতে এক আবেদন পাঠাইয়াছেন। স্বাক্ষর করিয়াছেন—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনিলকুমার সেন, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাতো, শ্রীঅতুলচন্দ্র সিং, শ্রীদীনদাস কর্মকার, শ্রীআনন্দপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘোষ ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস। এই দাবী আদৌ অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে—কাজেই আমাদের বিশ্বাস, রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে সুসঙ্গত আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বিহারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দাবী—

গত ৪ঠা মে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিহারে যাহাতে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয়, সে জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়া একটি বেসরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ইহার ফলে বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের ভাষা সমস্যার সমাধান হইবে।

রেল ব্যবস্থায় বাঙ্গলার অভিযোগ—

গত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতা গার্ডেন রীচ কোয়ার্টার্সে ইষ্টার্ণ রেলসমূহের যে শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বিভাগ বাঙ্গালীর অভিযোগ উপেক্ষা করিয়া ইষ্টার্ণ রেল ব্যবস্থা করায় ডাক্তার রায় সে দিনের বক্তৃতায় বাঙ্গালীর দাবীর কথা সমর্থন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব, নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিণাম—প্রভৃতির কথা এবং রেল বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা যে কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করেন নাই, সেদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রেলের নূতন বিভাগ ব্যবস্থায় যে বাঙ্গালা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সর্বজন-বিদিত।

কলিকাতার পূর্বদিকে সহর নির্মাণ—

কলিকাতা সহরের বিস্তৃতির প্রয়োজনের ফলে উহা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাড়িয়া যাইতেছে ও উহার দৈর্ঘ্য বাড়িতেছে। উহা প্রস্থে বড় করিবার জন্য গত ২৮শে এপ্রিল বঙ্গীয় বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে কলিকাতা সহরের পূর্বদিকের লবণ-জলা এলাকা বাসোপযোগী করা হইবে। ঐ অঞ্চলে বিরাট ভূমি খণ্ডে লবণাক্ত জল আটকাইয়া থাকে—অনেক স্থানে মাছের চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহাও তেমন লাভজনক হয় না। ঐ অঞ্চল হইতে জল সরাইয়া, জমী উন্নত করিয়া তথায় সহর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিলে সত্যই কলিকাতার বহু লোক ঐ সকল স্থানে যাইয়া বাস করিতে পারিবে। সহরের অতি নিকটে কয়েক শত বর্গ মাইল জমী ঐ ভাবে পড়িয়া থাকার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বর্তমান পশ্চিম
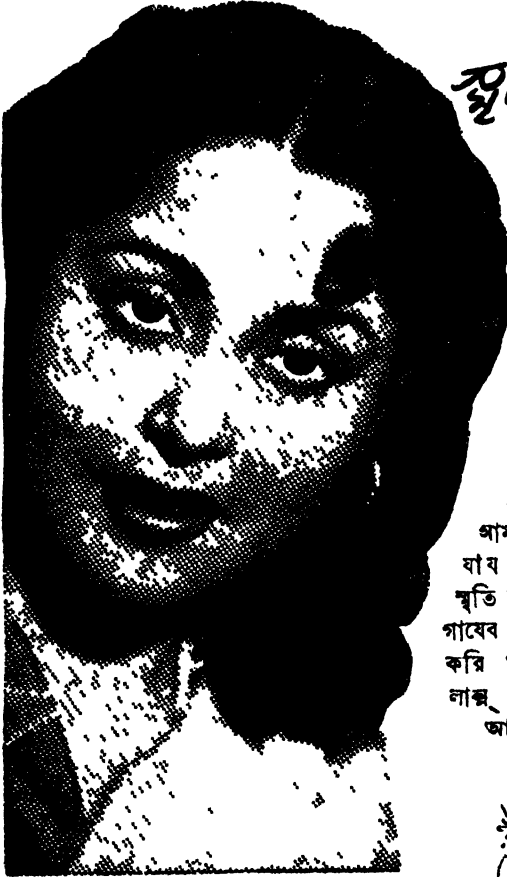
জ সরকার সত্বর এ বিষয়ে কার্য করিলে দেশের—বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরের লোক উপকৃত হইবে।

কলিকাতা সহরের উন্নতি বিধান—

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে সম্প্রতি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকারের (কংগ্রেস) চেষ্টায় কলিকাতা সহরের উন্নতি বিধান সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে (১) কলিকাতা কর্পোরেশন ও পোর্ট কমিশনার্সের সহিত একযোগে সহরের জল-নিকাশ ও জল-সরবরাহের সমস্যা সমাধান (২) সহরের বিস্তৃতির জন্য লবণাক্ত জলার উন্নতিবিধান (৩) বিদ্যাধরী নদী ও টালীর নালা সংস্কার (৪) সহরের নিকটস্থ নিম্ন জমীসমূহ হইতে জল বহিষ্কার (৫) বৃহত্তর কলিকাতা নির্মাণের সকল ব্যবস্থা অবলম্বন—প্রয়োজন হইলে সহরতলীর মিউনিসিপ্যালিটী-গুলিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইতোমধ্যেই উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। সহর সত্বর বড় করা না হইলে যে কোন সময়ে সহরের অবস্থা বিপন্ন হইতে পারে। এই প্রস্তাবটি সময়োপযোগী হওয়ায় কেহই এ বিষয়ে আপত্তি করেন নাই।

পরলোকে সার সম্মুখম চেটী—

ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব অর্থ-সচিব সার আর-কে-সম্মুখম চেটী গত ৫ই মে মাদ্রাজের কইম্বাটোর সহরে মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে তিনি তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ও মুক্তি আন্দোলনে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে গত ২ মাস কাল তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন—

প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু মহারাষ্ট্র রাজ্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে সফরে যাইয়া গত ৩০শে এপ্রিল অগেনবাদি সহরে এক জনসভায় বলিয়াছেন—আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভারত খাদ্যের ব্যাপারে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই হইবে না, পরন্তু খাদ্যপ্রার্থী অপরকেও অন্নদান করার মত অবস্থা তাহার হইবে। বর্ত্তমানে ধনিক ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যে আর্থিক ব্যবধান রহিয়াছে তাহা হ্রাস করার জন্য বৈষয়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ভারতের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় সমাধান সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ সচেতন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তাঁহার ক্ষমতানুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। শ্রীনেহরু ভারতের সর্বত্র এই কথাই বলিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, দেশের জনসাধারণ প্রয়োজন মত সহযোগিতা করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন।

ভূদান-যজ্ঞের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—

আচার্য্য বিনোবা ভাবের সহিত পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমানে উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন সম্বন্ধে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—ভূদান-যজ্ঞ দানের আন্দোলন নহে, বরং তাহার বিপরীত। আইন প্রণয়নের অসুবিধার জন্যই এই আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই—ভূদান আন্দোলনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। এই আন্দোলন সমগ্র জন-সমাজকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিতে চাহে, যে কোনরূপে শোষণ অসম্ভব করিয়া তোলাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। সম্পত্তি সম্পর্কে যে অসাম্য বিদ্যমান, ভূদান আন্দোলন সেই প্রচলিত অচল অবস্থার মূলে আঘাত করিতেছে। বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় সুপণ্ডিত, সুধী ব্যক্তি। তিনি জমীদার, কাজেই তিনি এই আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে দেশ উপকৃত হইবে।

হরিংঘাটায় নদী গবেষণা মন্দির—

কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে হরিংঘাটায় নদী গবেষণা মন্দিরের যে নূতন গৃহ নির্মিত হইতেছে, গত ৯ঠা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সেই গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে নদী গবেষণা মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল—আজ তাহা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইল। ইহার ফলে নদীমাতৃক বাংলা দেশ নানাভাবে উপকৃত হইবে।

পরলোকে প্রজাপতি মিশ্র—

বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র গত ৪ঠা মে পাটনায় মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৭ মাস তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪২ সালে তিনি মুক্তি আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP

S. 201-50 BG

যক্ষ্মা হাসপাতালে বাঙ্গুর ভবন—

গত ২৬শে এপ্রিল কলিকাতা যাদবপুরে কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের নূতন বাঙ্গুর ভবনের উদ্বোধন হইয়াছে। নূতন গৃহে ২৩জন রোগীর স্থান হইলে হাসপাতালে মোট রোগী থাকিবে ৫২৭ জন। উদ্বোধন বক্তৃতায় রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—৫ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর যক্ষ্মায় প্রাণত্যাগ করে। সেজন্য হাসপাতালে সকলের অর্থ দান করা উচিত। নূতন গৃহ নির্মাণে ৭৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথায় এক হাজার রোগী রাখার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন।

লাডাকের ভারতে অন্তর্ভুক্তি—

লাডাকের প্রধান লামা কুশক বাকুলা ২৭শে মার্চ জম্মুতে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—লাডাকিদিগের শেষ উদ্দেশ্য ভারতের সহিত লাডাককে পূর্ণভাবে সংযুক্ত করা। যথাকালে যাহাতে লাডাককে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সে ভার লাডাকবাসীরা ভারতের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছেন। লাডাকের বৌদ্ধরা সংখ্যা গরিষ্ঠ—তাঁহারা এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির উপাসক—পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপেক্ষা তাহারা নিশ্চিহ্ন হওয়া শ্রেয় মনে করে। লাডাকের বৌদ্ধদের মধ্যে—ভারতীয় সংসদ বা কাশ্মীর সরকারে কোন প্রতিনিধি নাই।

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

১৯৫২-৫৩ সালের জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ৫ হাজার টাকা অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে প্রদান করা হইয়াছে। দীনেশবাবু সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন—তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া হুগলীতে বাস করিতেছেন। যে বই লিখিয়া তিনি এই পুরস্কার পাইলেন তাহার নাম—'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান।' তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ভারত-ব্রহ্ম মৈত্রী প্রতিষ্ঠা—

ভারতরাষ্ট্র ও ব্রহ্মদেশের যে সুদীর্ঘ সীমান্তে নানা জাতির পার্বত্য অধিবাসী বাস করে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বিপক্ষদিগের প্রচার ফলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়। তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মৈত্রীর কথা প্রচারের জন্য গত ২৯শে মার্চ হইতে ৭দিন ধরিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী শ্রী ইউ-নু সীমান্ত অঞ্চলে একত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। সর্বত্র অধিবাসীরা দুইটি বৃহৎ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে একত্র দেখিয়া, একই কথা বলিতে শুনিয়া উৎসাহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশে বহুসংখ্যক কুওমিংটান সৈন্য উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মবাসীরা—বিশেষ করিয়া ভারত ও ব্রহ্ম সীমান্তের অধিবাসীরা ভীত হইয়াছিল। শ্রীনেহরু ও শ্রী নু সকল স্থানে বলিয়াছেন—তাঁহারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের উন্নতি সাধন করিতে চান—যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া কোন দেশের ধ্বংস সাধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল জাতি যুদ্ধের চেষ্টা করিবে, তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করাই শ্রীনেহরু ও শ্রীনুর একত্র সফর করার মূল উদ্দেশ্য। এক সময়ে ব্রহ্ম ভারতের সংস্কৃতি মানিয়া লইয়াছিল—আজ আবার নূতন করিয়া উভয় দেশ একই উদ্দেশ্যে চালিত হইলে উভয় দেশই উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবে।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার—

গত চৈত্র মাসে ভারতবর্ষ পত্রে রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় আমাদের কোন কোন পাঠক আমাদিগের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। বাংলার অধিকাংশ সাময়িক পত্রে বহু দিন হইতে রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা থাকিলেও আমরা এতদিন নানাকারণে তাহা করি নাই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের পত্রগুলিতেও রচনার সহিত বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা আছে—তাহারই অনুকরণে এদেশেও ঐ প্রথা চলিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রায় সকল সাময়িকপত্রই ঐ প্রথা গ্রহণ করায় অনন্যোপায় হইয়া আমরাও চৈত্র মাস হইতে ঐ প্রথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহা দ্বারা পত্রিকার বা গ্রাহকগণের কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না। বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে আমরা পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিলাম—আশা করি, গ্রাহক ও পাঠকমণ্ডলী ইহাকে অন্য ভাবে গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ব্বের মতই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই দলের সঙ্গে বাংলাদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সেমি-ফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে ১-০ গোলে হারিয়ে বোম্বাই উপর্যুপরি তৃতীয় বার ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের

পলি উমরীগড়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেষ্টে দলের পক্ষে ব্যাটিং গড়পড়তায় শীর্ষস্থান

সেমি-ফাইনালে বাংলাদল ৪-০ গোলে মাদ্রাজকে হারিয়ে ফাইনালে যায়।

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪৭ সালে। প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি প্রথম তিনবছর চ্যাম্পিয়ান হয় বোম্বাই, চতুর্থ বছরে মধ্যপ্রদেশ। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ান হয় এবং ১৯৫৩ সালের ফাইনালে যাওয়াতে পুনরায় উপর্যুপরি তিনবছর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতার সূচনা, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত এই সাত বছরের প্রতিযোগিতায় বাংলাদল ৬বার ফাইনালে খেলেছে। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলাটি তিনদিন খেলার পরও জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি। প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিন, প্রথম রি-প্লে খেলায় উভয়পক্ষে সমান ২-২ গোল হয়। খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে বাংলা দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মেরী ডি' সেনা গোল ক'রে খেলার

সুভাষ গুপ্তে

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেষ্টে দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট লাভ

ফলাফল সমান করেন। দ্বিতীয় দিনের রি-প্লে খেলায় কোন পক্ষেই গোল না হওয়ায় প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে উভয় দলকে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা করা হয়েছে। বোম্বাই দল পূর্ব্ব বছরের চ্যাম্পিয়ান থাকায় প্রথম ছ'মাস লেডী রতন টাটা ট্রফি অধিকারের সম্মান লাভ করেছে।

হকি লীগ ঃ

১৯৫৩ সালের ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ভবানীপুর ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায়

চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ভবানীপুর দলের পক্ষে এ সম্মান এই প্রথম। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে ১৯০৫ সালে। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে মাত্র তিনটি ভারতীয় দল—গ্রীয়ার, মোহনবাগান এবং ভবানীপুর হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে মোহনবাগান হয়েছে ৩বার—১৯৩৫, ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে। এবছর ভারতীয় দলের পক্ষে উপর্যুপরি ৩বার লীগ চ্যাম্পিয়ানের রেকর্ড করার সুযোগ হাতে পেয়েও মোহনবাগান হারালো। মোহনবাগান গত দু'বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান—কিন্তু সেই খ্যাতি অনুপাতে খেলতে পারেনি। লীগ তালিকায় তাদের স্থান উল্লেখযোগ্য হয়নি, ৩য়। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছিল—ভবানীপুর এবং কাষ্টমস। সমান খেলায় দু'জনেরই সমান পয়েণ্ট। খেলা একটা বাকি—পরস্পরের মধ্যে। বাংলা দেশের হকি খেলার ইতিহাসে কাষ্টমস ছিল এক সময়ে দুর্দ্ধর্ষ—লীগ এবং বাইটন কাপে তাদের বিবিধ রেকর্ড ভাঙ্গা দূরের কথা, কোন কোন রেকর্ডের ধারে কাছেও অন্য কোন দল যেতে পারেনি। নৈতিক শক্তির দিক থেকে এই সুমহান ঐতিহ্য কাষ্টমস দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে যথেষ্ট বৈকি! কিন্তু ভবানীপুর দলের নৈতিক বল কম ছিল না—তাদের দলের অধিনায়ক ছিলেন ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু)। ভবানীপুর ১-০ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় সম্মান নিয়ে লীগ পেল। দুবে জয়সূচক গোলটি করেন।

প্রথম বিভাগ হকি লীগ খেলায় কাষ্টমস দল শেষ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৫০ সালে। কাষ্টমস এ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৬ বার—(রেকর্ড)। উপর্যুপরি লীগ পেয়েছে ৪ বছর হিসাবে ২বার—১৯৩৬-৩৯ এবং ১৯৩০-৩৩—রেকর্ড। অপরাজেয় রেকর্ড—১৯৩৮ এবং ১৯৩৯।

লীগ খেলায় ভবানীপুর দলের খেলার ফলাফল:

জয়: বি জি প্রেসকে ২-০, কালীঘাটকে ৪-২, আর্মড পুলিসকে ২-০, সেণ্টজোসেফকে ২-১, ষ্টোপাকে ৬-০, রেঞ্জার্সকে ২-০, রাজস্থানকে ২-১, পোর্ট কমিশনার্সকে ৭-০, ডালহৌসীকে ১-০, এরিয়ান্সকে ২-০, আর্মেনিয়ান্সকে ২-০, মেজারার্সকে ২-১, পুলিশকে ৪-১, পাঞ্জাব স্পোর্টসকে ৪-০, গ্রীয়ারকে ৫-২ এবং কাষ্টমসকে ১-০ গোলে হারিয়ে।

খেলা ড্র: মহমেডান স্পোর্টিং ০-০, ইস্টবেঙ্গল ১-১, মোহনবাগান ০-০।

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা:

১৯৫৩ সালের ফাইনালে লুসিটিনিয়ান্স স্পোর্টস ক্লাব ১-০ গোলে গত তিন বছরের বিজয়ী টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ড্র যায়, কোন পক্ষেই গোল হয়নি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'ভারতবর্ষ' একচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বর্ষ যাবৎ 'ভারতবর্ষ' বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭৷৷০, + (মণিঅর্ডার ফি ৵০) এবং ভিঃ পিঃতে ৮৵০। যাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, + (মণিঅর্ডার ফি ৵০)—ভিঃ পিঃতে ৪৷৷৵০। ডাকবিভাগের নিয়মানুসারে গ্রাহকগণের নিকট হইতে অনুমতি পত্র না পাইলে ভিঃ-পিঃ পাঠানো যায় না। সুতরাং ভিঃ-পিঃতে 'ভারতবর্ষ' লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভিঃ পিঃর কাগজ পাইতেও বহু বিলম্ব হয় এবং যাহার ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও দেরি হইয়া যায়।

আমরা সকল গ্রাহককে আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মণিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইতে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। যাহারা ভিঃ-পিঃ করিবার জন্য পত্র দিবেন শুধু তাঁহাদেরই ভিঃ-পিঃতে কাগজ পাঠানো হইবে।

আশা করি গ্রাহকগণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আগামী বৎসরের চাঁদা (গ্রাহক নম্বর সহ) মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—'ভারতবর্ষ'

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়